ধর্ম্ম ও সমাজতত্ত্ব বিষয়ক পাক্ষিক পত্রিকা।

২৩ সংখ্যা।
১৬ ভাগ।

১লা জ্যৈষ্ঠ রবিবার, ১৮১৫ শক, ব্রাহ্ম সম্বৎ ৬৪।

বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২৷৷০
মফস্বলে ৩
প্রতি খণ্ডের মূল্য ৵০

বন্দনা।

তোমারি রচনা, হে জগ-কারণ,
দৃশ্য অদৃশ্য এ অগণ্য ভুবন;
তোমারি জ্যোতিতে বিশ্ব জ্যোতির্ম্ময়,
তোমার শক্তিতে সৃষ্টি স্থিতি লয়;
এক অদ্বিতীয় অক্ষয় অবিনাশী,
কোটী রূপে বিশ্বে আপনা প্রকাশি',
রহিয়াছ সৃষ্টি তব ক্রোড়ে ক'রে;
জয় জয় জয় জগদীশ হরে।

কি ভীম নিনাদে বিশাল গগন,
তোমারি মহিমা করিছে কীর্ত্তন!
হরষ উল্লাসে হয়ে উচ্ছ্বসিত,
ভৈরব গর্জ্জনে সিন্ধু গাহে গীত!
জ্যোতির্ম্ময় বৈভব কোটী চন্দ্র তারা,
মহিমা বন্দনে সবে মাতোয়ারা!
ধ্বনিছে সঙ্গীত সদা সমস্বরে;
জয় জয় জয় জগদীশ হরে।

অসীম প্রতাপে তুমি হে রাজন্!
সর্ব্ব চরাচর করিছ শাসন;
নেহারি তোমার ইচ্ছার ইঙ্গিত,
স্থাবর জঙ্গম হয় যে স্তম্ভিত!
অযুত তারকা কোটী চন্দ্র ভানু,
চরণে চাহিয়া সবে নত জানু!
নমিছে কৃতজ্ঞ প্রেম ভক্তি ভরে;
জয় জয় জয় জগদীশ হরে।

এ লোক আশ্রয়, পরলোক গতি,
অনাদি অনন্ত বিভু বিশ্বপতি;
পূর্ণ, পরাৎপর, মঙ্গল-হেতু,
সংসার অর্ণবে তুমি মহা সেতু;
হৃদয়ে হৃদয়ে প্রতিমা তোমারি,
ও পদ পূজিয়া ধন্য নরনারী,
ভক্তি প্রেমোচ্ছ্বাসে বিশ্ব গেছে ভরে;
জয় জয় জয় জগদীশ হরে।

সম্পাদকীয় মন্তব্য।

ব্রাহ্মসমাজ-শক্তিকে ঘনীভূত করিবার উপায় কি?—ব্রাহ্মধর্ম্ম সামাজিক ধর্ম্ম। সামাজিক ধর্ম্ম হইতে গেলেই ইহাকে সমাজের পাপতাপের সহিত সংগ্রাম করিতে হইবে। জগতের পাপ তাপের সহিত সংগ্রাম করিতে গেলেই তদুপযুক্ত বল চাই। বহু দিনের সঞ্চিত পাপরাশির সহিত সংগ্রাম করা কিরূপ শ্রমসাপেক্ষ ও তাহাতে কত বলের প্রয়োজন তাহা আমরা প্রতিনিয়ত লক্ষ্য করিতেছি। ব্রাহ্মগণ ব্রাহ্মসমাজকে কিরূপ দেখিতে চান? ব্রাহ্মসমাজ একটী ক্ষীণ দুর্ব্বল ও শক্তিহীন দল হইয়া রহিয়াছে, কেহ কথা শোনে না, প্রচারে শক্তি নাই, পাপের সহিত সংগ্রাম করিবার ক্ষমতা নাই; ইহার অধিকাংশ সভ্যগণ বিষয়সুখে রত, স্বসুখপরতন্ত্র ও উৎসাহহীন, এরূপ দেখিতে চান? অথবা ব্রাহ্মসমাজ জাগ্রত ও জীবন্ত শক্তিরূপে কার্য্য করিতেছে, দলে দলে পাপীর হৃদয় পরিবর্ত্তন করিয়া দিতেছে, বহু দিনের পাপরাশি উন্মূলন করিতেছে, সত্য ধর্ম্মের শক্তি সর্ব্বত্র বিকীর্ণ হইতেছে, এরূপ দেখিতে চান? অধিকাংশ ব্রাহ্ম বোধ হয় বলিবেন, আমরা ব্রাহ্মসমাজকে জাগ্রত ও জীবন্ত শক্তিরূপে দেখিতে চাই। কিন্তু প্রশ্ন এই, ব্রাহ্মসমাজ জাগ্রত শক্তিরূপ ধারণ করিবে কিরূপে? কোন্ সাধনাতে সেই শক্তি আসিবে? ইহার উত্তরে আমরা বলি—"এই আমাদের ব্রাহ্মধর্ম্ম, দেখ ব্রাহ্মধর্ম্মের আদর্শ কেমন উচ্চ, ইহার নীতি কেমন মহৎ" বলিয়া চীৎকার করিয়া বেড়াইলে হইবে না। অন্ততঃ কয়েকজন প্রতিজ্ঞা করিয়া বস, যে আমরা ব্রাহ্মধর্ম্ম জীবনে সাধন করিব। যখন তাহা জীবনে সাধিত হইবে, তখন লোকে দেখিবে ব্রাহ্মধর্ম্ম কাহাকে বলে, এবং তখনি ইহার শক্তি জাগিবে। কেবল উপদেশে যদি মানব হৃদয় পরিবর্ত্তিত হইত, তাহা হইলে শাস্ত্রে এত সদুপদেশ থাকিতে দেশের

এত দুর্গতি হইত না। কেতাবের উপদেশ জীবনে ফলাইতে হইবে। অতএব ব্রাহ্মসমাজের একটী সাধনক্ষেত্র চাই, যেখানে থাকিয়া ব্রাহ্মসাধকগণ নিবিষ্টচিত্তে ব্রাহ্মধর্ম্ম সাধন করিবেন। বলা বাহুল্য যে, এই কারণেই ব্রাহ্মসাধনাশ্রম বা Brahmo Workers' Shelter স্থাপিত হইয়াছে। ব্রাহ্মসমাজের শক্তিকে ঘনীভূত ও বর্দ্ধিত করা ইহার প্রধান উদ্দেশ্য। সেই শক্তিকে ঘনীভূত করিতে পারিলে, তবে আমরা দেশের বহুদিনের সঞ্চিত পাপরাশির সহিত সংগ্রাম করিতে সমর্থ হইব। ঈশ্বর করুন, সাধনাশ্রম দ্বারা এই মহৎ উদ্দেশ্য সাধিত হউক।

কৃপাসিদ্ধ ও সাধনসিদ্ধ—পৃথিবীতে দুই শ্রেণীর ধনী দৃষ্ট হয়। কতকগুলি লোক উত্তরাধিকারী সূত্রে প্রচুর বিভব ও ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইয়াছেন, অথবা হঠাৎ কোনও কারণে সম্পদ তাঁহাদের হস্তগত হইয়াছে। ঐ সম্পদ উপার্জ্জন করিতে এক সময়ে যথেষ্ট শ্রম করিতে হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু সে শ্রম ঐ ধন সম্পত্তির বর্ত্তমান অধিকারীদিগকে করিতে হয় নাই। তাঁহাদের পিতা পিতামহ প্রভৃতি গুরুজন বা অপর কেহ করিয়াছিলেন। তাঁহারা বিনা শ্রমে পাইয়াছেন এবং অল্প আয়াসে বর্দ্ধিত করিয়াছেন। ইহারা প্রথমোক্ত শ্রেণীর ধনী; দ্বিতীয় শ্রেণীর ধনী অন্য প্রকারের। তাঁহারা স্বনামা পুরুষ; নিজ পরিশ্রম, মিতব্যয়িতা প্রভৃতি গুণে প্রচুর সম্পত্তি সঞ্চয় করিয়াছেন। এইরূপে এই জগতে লক্ষ লক্ষ লোক প্রতিদিন ব্যবসায় বাণিজ্য প্রভৃতির দ্বারা বিভবশালী হইতেছেন। নিত্য নিত্য তাঁহাদের হস্ত দিয়া কত অর্থ আয় কত অর্থ ব্যয় হইয়া যাইতেছে; কিন্তু একটী বিষয়ে তাঁহারা অত্যন্ত মনোযোগী। মূলধনের প্রতি তাঁহাদের সর্ব্বদা সজাগ দৃষ্টি। সমুদায় আয় ব্যয়ের মধ্যে গড়ের উপরে মূলধন বাড়িতেছে কি কমিতেছে, তাঁহারা সর্ব্বদা তাহা অনুসন্ধান করিয়া থাকেন। এজন্য বুদ্ধিমান ব্যবসায়ী মাত্রেই আয় ব্যয়ের হিসাব প্রতিদিন মনোযোগ পূর্ব্বক রক্ষা করিয়া থাকেন। এতদ্দেশে এবিষয়ে কত কৌতুককর গল্প প্রচলিত আছে। এক পয়সায় গড়মিল মিটাইবার জন্য পাঁচ পয়সার তৈল ব্যয় হয়, ইত্যাদি। যে দোকানদার কেবল দোকান খুলিয়া বসিয়া থাকে, কেবল দ্রব্য সামগ্রী আনিতেছে ও বেচিতেছে, কিন্তু হিসাব নিকাশের দিকে দৃষ্টি নাই, মূলধন বাড়িতেছে কি কমিতেছে সে বিষয়ে মনোযোগ নাই, তাহার দুর্দ্দশা ত্বরায় ঘটিয়া থাকে। ত্বরায় সে ঋণজালে জড়িত হইয়া মূলধন হইতে বঞ্চিত হয়। পৃথিবীতে ধনসঞ্চয় নিতান্ত সতর্কতা মিতব্যয়িতা ও আত্মপরীক্ষার কর্ম্ম।

ধনসঞ্চয়ের ন্যায় ধর্ম্মসাধন বিষয়েও দুই শ্রেণী দৃষ্ট হয়, কৃপাসিদ্ধ ও সাধনসিদ্ধ। যাঁহারা কৃপাসিদ্ধ তাঁহারা যেন হঠাৎ কোনও গুপ্তধনের অধিকারী হইয়াছেন। সৌভাগ্যক্রমে কোনও সাধু সঙ্গ মিলিয়া যাওয়াতে তাহাদের হৃদয় পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, ও অন্তরে এত ধর্ম্মবল লাভ করিয়াছেন, যে তাহা তাঁহাদের চিরজীবনের সম্বল হইয়া গিয়াছে। কোনও কোনও সময়ে ঈশ্বরের কৃপাবারি প্রবল জলস্রোতের ন্যায় আসিয়া মানব অন্তরে প্রবেশ করে। সেই প্রবল স্রোতে মানুষকে ভাসাইয়া লইয়া যায়। যাহা অপর সময়ে দুঃসাধ্য ছিল তাহা এই কৃপাস্রোতের প্রভাবে সুসাধ্য হইয়া যায়। কিন্তু এরূপ সাধুসঙ্গ ও করুণাস্রোত সকল জীবনে ও সকল সময়ে মিলে না। অধিকাংশ মানবকে সাধনের দ্বারা ধর্ম্মজীবনকে গঠন করিতে হয়। এই সাধনকে তপস্যা বলা যাইতে পারে। তপস্যা বলিলে কৃচ্ছ্র সাধন বুঝিতে হইবে না; শরীরকে যম, নিয়ম, উপবাসাদির দ্বারা ভগ্ন ও জীর্ণ করা বুঝিতে হইবে না; গ্রীষ্মে পঞ্চতপা হওয়া ও শীতে আকণ্ঠ জলে নিমগ্ন হইয়া ইষ্টদেবতার নাম করা বুঝিতে হইবে না; কিন্তু তপস্যার অর্থ ধর্ম্মজীবন গঠনের উদ্দেশ্যে বৈরাগ্য ও সংযমের দ্বারা আত্ম-শাসন করা। এই আত্ম-শাসন আত্মপরীক্ষা-সাপেক্ষ। যে উচ্চ উদ্দেশ্যকে মূলধন স্বরূপ সম্মুখে রাখা গিয়াছে, সে বিষয়ে কি পরিমাণে উন্নতি হইতেছে, তাহা সর্ব্বদা আলোচনীয়। ব্যক্তিগত জীবনে যেরূপ, সামাজিক জীবনেও সেইরূপ। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বয়ঃক্রম যে পঞ্চদশ বৎসরের অধিক হইতে চলিল, আমাদের চিন্তা করিয়া দেখা উচিত, ইহার উচ্চ আদর্শ কতদূর সাধিত হইয়াছে বা হইতেছে।

রাণারের ডাক—এদেশে রেলওয়ে প্রবর্ত্তিত হইবার পূর্ব্বে রাণারের দ্বারা ডাকের চিঠী প্রেরণ করা হইত। এখনও অনেক স্থানে রাণারগণ ডাক বহন করিয়া থাকে। প্রত্যেক তিন কি চারি মাইল অন্তর রাণারদিগের এক একটা আড্ডা থাকে। একদল রাণার ডাক লইয়া দৌড়িতে থাকে, আর একদল রাণার যথাসময়ে আড্ডাতে প্রস্তুত হইয়া বসিয়া থাকে। যেই প্রথমোক্ত দল উপস্থিত হয়, এবং আপনাদের স্কন্ধের বোঝা নামাইয়া দেয় অমনি আর একদল তৎক্ষণাৎ সেই বোঝা স্কন্ধে তুলিয়া লয় এবং দৌড়িতে আরম্ভ করে। এইরূপে ডাক যথাসময়ে স্বীয় গন্তব্য স্থানে উপস্থিত হইয়া থাকে। দেশের মানসিক বা আধ্যাত্মিক উন্নতিও এই রাণারের ডাকের ন্যায়। যে দেশে এক শ্রেণীর লোক স্কন্ধের বোঝা নামাইবামাত্র আর একদল সেই ভার স্কন্ধে তুলিয়া লইবার জন্য প্রস্তুত, সেই দেশের উন্নতি অবাধে চলিয়া থাকে। কিন্তু যেখানে একদল কৃতী লোক অন্তর্হিত হইলে তাঁহাদের কার্য্য ভার স্বীয় স্বীয় স্কন্ধে লইবার জন্য অপর কোনও দল প্রস্তুত দেখা যায় না, সে দেশের উন্নতির স্রোত ত্বরায় বন্ধ হইয়া যায়। আমাদের দেশের সেই প্রকার অবস্থা দেখিতেছি। একদল কৃতী লোক অন্তর্হিত হইলে তাঁহাদের স্থান অধিকার করিবার লোক দেখা যাইতেছে না। কি রাজনীতিবিভাগে, কি শিক্ষা বিভাগে, কি সামাজিক ও আধ্যাত্মিক কার্য্যে সর্ব্বত্রই এই দুর্দ্দশা দৃষ্ট হইতেছে। এক কৃষ্ণদাস পাল অন্তর্হিত হইলেন, তাঁহার স্থান অধিকার করিবার লোক নাই; এক ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র গেলেন, তাঁহার স্থানাভিষিক্ত হইবার কেহ নাই; এক কেশবচন্দ্র সেন গেলেন, তাঁহার ভার বহন করিবার উপযুক্ত আর কাহাকেও পাওয়া গেল না; সর্ব্বত্রই এই দুর্দ্দশা। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের পঞ্চদশ জন্মোৎসব উপস্থিত; ইহার সভ্যগণ একবার বিবেচনা

করুন, তাঁহাদের সমাজের কার্য্য ও প্রচার কার্য্য সমুচিতরূপে চালাইবার উপযুক্ত লোক কিরূপ প্রস্তুত হইতেছে। ইহার প্রচারক সংখ্যা দিন দিন বর্দ্ধিত না হইয়া হ্রাস প্রাপ্ত হইয়াছে। অপরাপর বিভাগেও কার্য্য করিবার উপযুক্ত কৃতী লোকের সংখ্যা বর্দ্ধিত হইতে দেখা যাইতেছে না। প্রশ্ন এই, বর্ত্তমান সময়ে কার্য্যভার যাঁহাদের উপরে ন্যস্ত রহিয়াছে তাঁহারা যখন অন্তর্হিত হইবেন, তখন কোন্ দল তাঁহাদের কার্য্যভার মস্তকে গ্রহণ করিবেন? এবং এরূপ লোক প্রস্তুত করিবার জন্য সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ কি উপায় অবলম্বন করিয়াছেন? আমরা কোনও প্রকারে উপস্থিত কার্য্যটা চালাইয়া দিতেছি, কিন্তু মানুষ প্রস্তুত করিবার জন্য বিশেষ উপায় অবলম্বন করিতেছি না। মানুষ প্রস্তুত হওয়া না হওয়া অনেকটা শিক্ষা প্রণালীর উপরে নির্ভর করে। আমাদের যে উৎসাহী, কার্য্যদক্ষ ও অনুরাগী পুরুষ ও মহিলার অপ্রতুল আছে, অথবা শিক্ষা ও উন্নতির অবসর ও সুবিধার অভাব আছে তাহা নহে; কিন্তু তাঁহাদের শক্তি সকলকে সমবেত করিয়া শিক্ষিত ও উন্নত করিবার উপযুক্ত বন্দোবস্ত নাই, এবং সেরূপ করিতে পারেন এরূপ শক্তিশালী পুরুষও নাই। এইজন্য আমাদের দুর্ব্বলতা রহিয়া যাইতেছে, আমরা কার্য্যের বিস্তৃতির দিকে যত মনোযোগ দিতেছি, স্থায়িত্বের দিকে তত মনোযোগী হইতেছি না।

প্রচার কার্য্যের বিস্তৃতি ও গভীরতা।—বিগত কয়েক বৎসর হইতে যে ভাবে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রচার কার্য্য চলিতেছে তাহা এই ;—দেশের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে যে সকল ব্রাহ্মসমাজ আছে, তাহাদের সভ্যগণ উৎসব বা অনুষ্ঠানাদির সময়ে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যনির্ব্বাহক সভার নিকটে প্রচারক চাহিয়া পাঠাইয়াছেন; সেই নিমন্ত্রণ রক্ষা করিবার জন্য কার্য্যনির্ব্বাহক সভা প্রচারকদিগকে প্রেরণ করিয়াছেন। প্রচারক মহাশয়গণ তদুপলক্ষে যথাসাধ্য অপরাপর সমাজও পরিদর্শন করিয়াছেন। এইরূপে আমাদের যে কতিপয় প্রচারক আছেন তাঁহাদের অধিকাংশই নানাস্থানে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছেন, কাহাকেও মানুষ প্রস্তুত করিবার জন্য কলিকাতাতে স্থায়ীরূপে রাখিবার বন্দোবস্ত করা হয় নাই। ইহার ফল এই হইয়াছে, যে পরিমাণে প্রচার কার্য্যের বিস্তৃতি দেখা যাইতেছে সেই পরিমাণে গভীরতা ও স্থায়িত্ব দৃষ্ট হয় না। পঞ্চদশ বৎসরে হিমালয় হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত ব্রাহ্মধর্ম্মের কথা ছড়াইতে গিয়া আট জন প্রচারকের চারি জনকে ছাড়ান ভাল হইয়াছে; না, এই পঞ্চদশ বৎসর কাল দুই জনকে কলিকাতাতে আবদ্ধ রাখিয়া আট জন প্রচারকের স্থলে কুড়ি জন প্রচারক করিতে পারিলে ভাল হইত? যীশু দ্বাদশ জন মানুষ প্রস্তুত করিয়া দিয়া গিয়াছেন, তাহাতেই জগৎ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। মহম্মদ চারিজন খলিফা ছাড়িয়া দিয়া গিয়াছিলেন, তাঁহারাই পৃথিবী কাঁপাইয়াছেন; চৈতন্য, নিত্যানন্দ, শ্রীবাস, রূপসনাতন, প্রভৃতি কতিপয় মানুষ প্রস্তুত করিয়া রাখিয়া গিয়াছিলেন তাহাতেই হরিনাম বঙ্গদেশের ঘরে ঘরে কীর্ত্তিত হইয়াছে। অপরদিকে দেখা যায়, থিয়োডোর পার্কারের ন্যায় তেজস্বী পুরুষ স্থির হইয়া বসিলেন না, মানুষ প্রস্তুত করিবার দিকে মনোযোগী হইলেন না, কেবল দাসত্ব-প্রথা ও উপধর্ম্মের প্রতিবাদ করিয়া অধিকাংশ সময় রেলওয়ে গাড়ী ও হোটেলে যাপন করিলেন। তার ফল এই হইল যে, তাঁহার কার্য্য চালাইবার জন্য তাঁহার পরবর্ত্তী কেহই রহিল না এবং তাঁহার প্রতিষ্ঠিত উপাসক-মণ্ডলী ক্রমশঃ হীন ও ক্ষীণ হইয়া অবশেষে বিগত ২।৩ বৎসর হইল ইউনিটেরিয়ান সম্প্রদায়ভুক্ত হইয়া গেল। আমেরিকা দেশে সত্যধর্ম্মের যে এক মাত্র বিজয় নিশান ছিল, তাহাও বিলুপ্ত হইয়া গেল। অতএব বলিতেছি, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্যগণ ধর্ম্মসাধন ও ধর্ম্মপ্রচারের বিস্তৃতি অপেক্ষা গভীরতা ও স্থায়িত্বের দিকে অধিক মনোযোগী হউন। উপরে উপরে ধর্ম্মের কথা ছড়াইয়া সন্তুষ্ট না হইয়া মানুষ প্রস্তুত করিবার জন্য ব্যগ্র হউন। ঈশ্বর-কৃপাতে সাধনাশ্রম নামে যে আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহারই উদ্দেশ্য এই, ধর্ম্মজীবনের গভীরতা ও স্থায়িত্ব বিধান করা এবং ব্রাহ্মসমাজের ভাবী কার্য্যের জন্য মানুষ প্রস্তুত করা। ব্রাহ্ম-সাধারণ আশ্রমের এই লক্ষ্য সাধনে সহায় হউন। এজন্য যদি আমাদের প্রচারক মহাশয়দিগের মধ্যে কাহাকেও কিছু দিনের জন্য স্থায়িরূপে আবদ্ধ রাখিতে হয় তাহাও বাঞ্ছনীয়।

ব্রাহ্মসমাজে নারীশক্তি।—ব্রাহ্মসমাজ এদেশে অনেক শ্রেণীর লোকের পক্ষে আশার বাণী আনিয়াছেন। অনেক বিষয়ে সুমহৎ পরিবর্ত্তন ঘটাইয়াছেন ও পরে আরও ঘটাইবেন। কিন্তু ভারতীয় নারীগণের অবস্থার উন্নতি বিষয়ে ব্রাহ্মসমাজ যাহা করিয়াছেন ও ভবিষ্যতে আরও করিবেন তাহা অপরাপর বিভাগের কার্য্য অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন নহে। ব্রাহ্মমহিলাগণ ব্রাহ্মসমাজের প্রসাদে শিক্ষা ও স্বাধীনতার সুখ সম্ভোগ করিতেছেন, পারিবারিক সুখ ও শান্তির অধিকারিণী হইয়াছেন, গৃহে ও সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন। সুতরাং তাঁহারা ব্রাহ্মসমাজের নিকট বিশেষভাবে ঋণী। দেখিতে দেখিতে ব্রাহ্মসমাজ মধ্যে পবিত্রচরিত্রা, সুশিক্ষিতা ও ধর্ম্মানুরাগিণী রমণীর সংখ্যা বর্দ্ধিত হইতেছে। এক্ষণে একমাত্র কলিকাতার ব্রাহ্ম-ছাত্রীনিবাসেই প্রায় চল্লিশটি বালিকা বাস করিয়া যথাবিধি শিক্ষা লাভ করিতেছে। এই সংখ্যা দিন দিন বর্দ্ধিত হইবে, হ্রাস হইবার সম্ভাবনা দেখা যায় না। কিন্তু প্রশ্ন এই, ব্রাহ্মসমাজ এই নারীশক্তিকে বর্দ্ধিত ও নিজের এবং জনসমাজের সেবাতে নিযুক্ত করিবার কি উপায় করিতেছেন? বর্ত্তমান সময়ে যে সকল কার্য্যের ভার পুরুষদিগের হস্তে ন্যস্ত রহিয়াছে, তাহার অনেকগুলি নারীদিগের হস্তে থাকিলে উৎকৃষ্টতর ফল ফলিতে পারে। যে সকল কার্য্যক্ষেত্রে পুরুষের পদার্পণ করা আশঙ্কাজনক, সেখানে নারীগণ অবাধে বিচরণ করিতে পারেন। কিন্তু সে সকল কার্য্যের ভার লইবার উপযুক্ত মহিলা কৈ? আবার যাঁহারা আছেন তাঁহাদিগকে কার্য্যে লাগাইবার উপযুক্ত উপায়ই বা কি আছে? আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি এবং আবার বলিতেছি, যে বর্ত্তমান বর্ষে ব্রাহ্মসমাজের নারীশক্তিকে সমবেত ও বর্দ্ধিত করিবার উপায় বিধান করা কর্ত্তব্য।

প্রশংসা ব্যাধি—ব্যাধি নানাপ্রকার। মানুষ যখন আত্মপ্রীতিতে অন্ধ হইয়া পরকীয় গুণরাশি দর্শনে অনিচ্ছুক হয়, সংকীর্ণতার সীমা যখন অত্যন্ত বর্দ্ধিত হইয়া দৃষ্টিকে ক্ষুদ্র স্থানে আবদ্ধ রাখে এবং অপরের গুণ দর্শনে অক্ষম করে, তখন সে মারাত্মক ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া আপনার সমূহ অনিষ্ট সাধন করে। এ প্রকার ব্যাধি অতি ভয়ানক ব্যাধি। এই ব্যাধি মানবের সর্ব্বপ্রকার উন্নতির প্রতিবোধক; সুতরাং সর্ব্বথা পরিত্যজ্য। কিন্তু আর এক প্রকার ব্যাধি আছে, তাহা স্বভাবতঃ ব্যাধি না হইলেও ক্রমে ব্যাধিতে পরিণত হয়। তাহা প্রশংসার ব্যাধি। কাহারও সংগুণ দেখিলে রসনা তাঁহার উপযুক্ত প্রশংসা করিবে, ইহা স্বাভাবিক। কিন্তু সৎকীর্ত্তির প্রশংসা করা অতি প্রশংসনীয় কার্য্য হইলেও তাহা কখন কখন ব্যাধির আকার ধারণ করে। যখন পরকীয় গুণরাজির বর্ণনায় একমাত্র রসনাই ব্যবহৃত হয়, যখন বক্তৃতার গভীর ধ্বনির সহিতই প্রশংসার পর্য্যবসান হয়, যখন আকাশের তর্জ্জন গর্জ্জনের ন্যায় বৃথা আস্ফালনেই প্রশংসার পরিসমাপ্তি হয়, তখন সেই প্রশংসাও ব্যাধিরূপ পরিগ্রহ করে। কারণ সেই প্রকার প্রশংসা ধ্বনি মানবকে আত্মপ্রতারিত করিয়া থাকে। সে মনে করে যাহা কিছু সৎ, যাহা কিছু সাধু তাহার প্রশংসায় ত আমি সর্ব্বদাই প্রস্তুত, সর্ব্বদাই রত; আর কি চাই? ইহাই যথেষ্ট। এইরূপ অর্থহীন বাক্য ব্যয়েই যাহার মন সন্তুষ্ট, তাহার পক্ষে সদ্দৃষ্টান্তের অনুসরণ করা এক প্রকার অসম্ভব হয়। বাক্‌যন্ত্রের অতিশয় চালনার দ্বারা অন্তর দৃষ্টিহীন হয় এবং অকারণ সন্তোষ প্রাপ্ত হইয়া সেখানেই আপন কর্ত্তব্য শেষ করিয়া থাকে। এ প্রকার বৃথা বাক্যব্যয় করা ব্রাহ্মগণের পক্ষে এক প্রকার স্বভাবের মধ্যে পরিণত হইয়াছে। তাঁহারা অপরাপর ধর্ম্মসম্প্রদায়ের অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠানগুলির প্রশংসায় সর্ব্বদা ব্যস্ত, অপরের কষ্ট সহিষ্ণুতা, ও ধর্ম্মপ্রচারের জন্য সর্ব্ববিধ ত্যাগ স্বীকার, ও একান্ত যত্নপরায়ণতার প্রশংসায় নিয়ত নিযুক্ত রহিয়াছেন। কোথায় একজন প্রচারক কর্ত্তৃপক্ষের আদেশ পাইবামাত্র আপনার সকল প্রকার প্রিয় আশা ও উদ্দেশ্য পরিবর্জ্জন করিয়া আত্মীয় বান্ধবগণের সঙ্গ পরিত্যাগ পূর্ব্বক অম্লান বদনে শত শত যোজন দূরে চলিয়া যাইতেছেন, কোথায় কোন্ ব্যক্তি সংসার-ধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক ধর্ম্মপ্রচারে প্রবৃত্ত হইতেছেন, কোথায় বা কে আপনার যথাসর্ব্বস্ব সদনুষ্ঠানে প্রদান করিতেছেন, কোথায় বা সংক্রামক ব্যাধিগ্রস্তগণের সেবায় আত্মসমর্পণ করিতেছেন, ইত্যাদি বিষয় উল্লেখ করিয়া বক্তৃতার পর বক্তৃতা করিতে ব্রাহ্মগণ কখনই বিমুখ নহেন। তাঁহাদের বাক্‌যন্ত্রের চালনায় সর্ব্বদাই তাঁহারা অতিশয় ব্যগ্র। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে ব্রাহ্মগণ ইহাতেই সন্তুষ্ট, ইহাই আদি এবং ইহাই অন্ত; সেই সকল অনুষ্ঠানের সময় যখন উপস্থিত হয়, তখন আর কাহারও সাহত দেখা নাই। এই প্রকার অসার বাক্য মাত্র প্রয়োগেই যাহারা সন্তুষ্ট, তাহারা কি ব্যাধিগ্রস্ত নহে? এই ব্যাধি মানবকে অকারণ আত্মসন্তুষ্টিতে ভুলাইয়া রাখে। যাহাতে কিছুই ব্যয় নাই পায়ে একটা আঁচড়ও লাগে না, এমন অর্থশূন্য প্রশংসা বাক্য প্রয়োগ করা কিছুই কঠিন কার্য্য নয়। এইরূপ প্রশংসা বাক্য প্রয়োগ করা না করায় বিশেষ কোন প্রভেদও দৃষ্ট হয় না। যাহারা সেরূপ প্রশংসা ধ্বনির ব্যবহার করে না তাহারাও যেমন কিছুই করে না, অপরেরাও বাক্‌-যন্ত্রের চালনা ভিন্ন কার্য্যতঃ কিছুই করেন না। লাভের মধ্যে প্রথম পক্ষ অন্যের প্রশংসা করেন বলিয়া কোনরূপ অর্থহীন সন্তুষ্টি লাভ করেন না,—গর্ব্বিত হন না; কিন্তু শেষ পক্ষ অকারণ আত্ম-সন্তুষ্টি লাভ করিয়া বৃথা গর্ব্বিত হন, এবং কর্ত্তব্যবিমুখ হইয়াও সন্তোষ লাভ করিয়া থাকেন। সুতরাং যে প্রশংসা বাক্য মাত্রেই পর্য্যবসিত হয় তাহাও ব্যাধি বিশেষ। এই ব্যাধি অতি সংক্রামক। ইহা ব্রাহ্মগণকে আক্রমণ করিয়াছে এবং দিন দিন তাহাদিগকে প্রগল্‌ভতার চরম সীমায় লইয়া যাইতেছে। আশা করি ব্রাহ্মগণ বৃথা বাক্যপ্রয়োগরূপ প্রশংসার পরিবর্ত্তে কিয়ৎপরিমাণে কার্য্যতঃ তাঁহাদের সদনুষ্ঠান সকলের অনুসরণ করিয়া, উপযুক্ত প্রশংসা করিতে প্রস্তুত হইবেন।

সম্পাদকীয় ও প্রাপ্ত প্রবন্ধ।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের জন্মোৎসব উপলক্ষে আত্মপরীক্ষা।

দেখিতে দেখিতে বিধাতার কৃপাতে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বয়ঃক্রম পঞ্চদশ বৎসর অতিক্রান্ত হইয়া গেল। কিরূপ সংগ্রাম ও আন্দোলনের মধ্যে ইহার জন্ম হইয়াছিল এবং আজ কিরূপ কার্য্যক্ষেত্র ইহার সম্মুখে বিস্তৃত তাহা চিন্তা করিলে বিস্মিত হইতে হয়। ইহার জন্মকালে কত লোকে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন যে, ইহার জীবন দীর্ঘকাল ব্যাপী হইবে না। পরলোকগত কেশবচন্দ্র সেন মহাশয় বলিয়াছিলেন "ব্যক্তিগত বিদ্বেষে যাহার জন্ম, তাহার স্থায়িত্ব সম্ভব নহে।" সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ আপনার পঞ্চদশবর্ষব্যাপী জীবনের দ্বারা প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে ব্যক্তিগত বিদ্বেষে ইহার জন্ম হয় নাই পরন্তু বিধাতার শুভইচ্ছায় এবং তাঁহারই মঙ্গল বিধিতে ইহার অভ্যুদয় হইয়াছিল। নতুবা এই পঞ্চদশ বৎসর কাল জীবিত থাকিয়া কার্য্য করা ইহার পক্ষে সম্ভব হইত না। আমরা এই পঞ্চদশ বৎসরের মধ্যে ইহার কার্য্যপ্রণালীতে কি কি গুণ ও দোষ লক্ষ্য করিলাম তাহা একবার আলোচনা করা যাউক।

ব্রাহ্মধর্ম্মের পবিত্রতা সংরক্ষণ—ইহা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না, যে ব্রাহ্মধর্ম্মের মত ও অনুষ্ঠানের বিশুদ্ধতা রক্ষা করিয়া সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ একটি মহোপকার সাধন করিয়াছেন। যথাসময়ে এই সমাজ অভ্যুদিত না হইলে ব্রাহ্মধর্ম্মের মধ্যে নরপূজা, মধ্যবর্ত্তিবাদ প্রভৃতি কত কুসংস্কার যে প্রবিষ্ট হইত তাহাকে বলিতে পারে? ভক্তিভাজন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় ব্রাহ্মধর্ম্ম সাধন ও ব্রাহ্মধর্ম্ম অনুষ্ঠানের যে বিশুদ্ধ ও যুক্তিযুক্ত প্রণালী প্রদর্শন করিয়াছিলেন

এবং মহাত্মা কেশবচন্দ্র প্রথম বয়সে যাহার পূর্ণতা বিধানের জন্য প্রাণপণে প্রয়াস পাইয়াছিলেন, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ সেই আদর্শের সংরক্ষণ ও উন্নতি বিধানে নিযুক্ত রহিয়াছেন। একথা বলিলে অত্যুক্তি হয় না যে, এক্ষণে ব্রাহ্মধর্ম্মানুরাগীদিগের দৃষ্টি প্রধানতঃ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের দিকেই আকৃষ্ট। ব্রাহ্মসমাজ বলিতে লোকে ইহাকেই বুঝিয়া থাকে এবং ইহার প্রচারিত উদার সার্ব্বভৌমিক এবং বুদ্ধি ও বিবেকসঙ্গত ধর্ম্মই ব্রাহ্মধর্ম্ম বলিয়া পরিচিত। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ এই মহোপকার সাধনে সমর্থ হইয়াছেন, এজন্য বিধাতাকে আমরা অন্তরের সহিত ধন্যবাদ করিতেছি।

কার্য্যোৎসাহ—সমুদায় একতন্ত্র শাসনপ্রণালীর দোষ এই যে, সমাজের কার্য্যের দায়িত্বভার প্রধানতঃ মন্ত্রণা স্বরূপ কতিপয় ব্যক্তির উপর ন্যস্ত থাকে এবং সমাজের অধিকাংশ লোক সামাজিক কার্য্যে উদাসীন ও পরমুখাপেক্ষী হইয়া পড়ে। নিয়মতন্ত্র শাসনপ্রণালীর গুণ এই যে, ইহাতে দায়িত্বভার সমাজের অঙ্গীভূত প্রত্যেক ব্যক্তির উপরে লইয়া যায়। দায়িত্বজ্ঞানের ন্যায় মানবের স্বাধীন চিন্তার উন্নতি ও চরিত্রের বিকাশের অন্য উপায় অতি অল্পই দেখা যায়। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ যখন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তখন আমরা আশা করিয়াছিলাম যে, ইহার নিয়মতন্ত্র প্রণালী দ্বারা ব্রাহ্মসাধারণের কার্য্যোৎসাহ বর্দ্ধিত হইবে। যাঁহারা ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যে ঔদাসীন্য অবলম্বন করিয়াছেন তাঁহারা পুনরায় কার্য্যে মনোযোগী হইবেন এবং যে সকল শক্তি চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া রহিয়াছে তাহা ব্রাহ্মসমাজের উন্নতি সাধনার্থ সমবেত হইবে। আজ পঞ্চদশ বৎসরের পরীক্ষার পর মঙ্গলময় বিধাতাকে ধন্যবাদ প্রদান পূর্ব্বক বলিতেছি যে, আমাদের সে আশা অনেক পরিমাণে পূর্ণ হইয়াছে। ব্রাহ্মসমাজের ক্ষেত্রে যাঁহারা আজ কার্য্য করিতেছেন, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ না হইলে তাঁহারা কোথায় থাকিতেন? ব্রাহ্মদলের ন্যায় ক্ষুদ্রদলের দ্বারা যে সকল সদনুষ্ঠানের আয়োজন হইতেছে তাহাই বা কোথায় থাকিত?

নিয়মতন্ত্র প্রণালীজনিত একতা —জনসমাজের কার্য্য দ্বিবিধ রূপে নিষ্পন্ন হইতে পারে। হয়,কোন প্রতিভাশালী পুরুষের হস্তে সমুদায় কার্য্যভার অর্পণ করিয়া তাঁহারই নেতৃত্বাধীনে থাকিয়া কার্য্য করা, না হয় দশজনে মিলিত হইয়া নিয়মতন্ত্র প্রণালী অনুসারে কার্য্য করা। যেখানে কোন প্রতিভাশালী পুরুষের নেতৃত্ব নাই এবং নিয়মতন্ত্র প্রণালী অনুসারে কার্য্য করিবার রীতিও নাই, সেখানে কার্য্য অচল হইয়া যায় এবং সেই দল ত্বরায় ছিন্ন বিচ্ছিন্ন ও টুক্‌রা টুক্‌রা হইয়া পড়ে। ইহার দৃষ্টান্ত দেখিবার জন্য অনেক দূরে যাইতে হইবে না। নববিধানস্থ বন্ধুগণ যে আপনাদেরই মধ্যে মিলিত হইয়া কার্য্য করিতে পারিতেছেন না তাহার কারণও এই। তাঁহাদের মধ্যে অনেক সাধনশীল ধর্ম্মানুরাগী ও ত্যাগী পুরুষ আছেন, যাঁহারা সমবেত হইলে কত মহৎ কার্য্য সাধন করিতে পারেন। কিন্তু বৃথা বিবাদে তাঁহাদের অধিকাংশ শক্তি ক্ষয় হইয়া যাইতেছে। ইহার কারণ কি? কারণ এই, মহাত্মা কেশব চন্দ্রের পরলোক গমনের পর তাঁহারা এমন কোন প্রতিভাশালী পুরুষ পাইতেছেন না যাঁহার নেতৃত্বাধীনে তাঁহারা সকলে হৃষ্টচিত্তে সম্মিলিত হইয়া কার্য্য করিতে পারেন। অথচ দশ জনে মিলিত হইয়া নিয়মতন্ত্র প্রণালী অনুসারে যে কার্য্য করিবেন তাহারও উপায় নাই। নববিধানাচার্য্য মহাশয় সে পথ বন্ধ করিয়া গিয়াছেন। তিনি আপন দলস্থ লোকদিগকে নিয়মতন্ত্র প্রণালীকে ঘৃণার চক্ষে দেখিতে শিখাইয়া গিয়াছেন। প্রতিভাশালী ব্যক্তির নেতৃত্ব নাই, নিয়মতন্ত্র প্রণালীও নাই, ইহার ফল যাহা ঘটিতে পারে তাহাই ঘটিতেছে। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্যদিগের মধ্যে যে মতদ্বৈধ নাই তাহা নহে। আমাদের মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দল আছে; তাঁহারা বিশেষ বিশেষ ভাবাপন্ন। মত ও ভাবে এক দলের সহিত অন্য দলের অনেক অনৈক্য আছে, তথাপি নিয়মতন্ত্র প্রণালী থাকাতে এই সমুদয় দল একত্র থাকিয়া কার্য্য করিতে পারিতেছেন। নিয়মতন্ত্র প্রণালীতে ইঁহাদিগকে এই শিক্ষা দিয়াছে যে, পরস্পরের মত ও ভাবের প্রতি সমুচিত শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা কর্ত্তব্য। এবং ইহাও শিখাইয়াছে যে ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য কোন এক বিশেষ ব্যক্তির বা বিশেষ দলের নহে, কিন্তু সকলেরই কার্য্য। এই উভয় শিক্ষার গুণে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্যগণ একত্র সম্বদ্ধ হইয়া কার্য্য করিতে পারিতেছেন।

সমাজসংস্কার—সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হওয়া অবধি সমাজ সংস্কার বিষয়ে ইহার সভ্যদিগের বিশেষ মনোযোগ দৃষ্ট হইতেছে। নারীগণের শিক্ষা ও স্বাধীনতা লাভের বিষয়ে ইঁহারা বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন। এজন্য দেশের লোকের হস্তে ইঁহাদিগকে অনেক নির্য্যাতন সহ্য করিতে হইয়াছে। ইঁহারা নারীগণের অবস্থার উন্নতি করিতে চান, এই অপরাধে পথে ঘাটে, বক্তৃতাস্থলে, রঙ্গভূমিতে ইঁহাদিগের কত প্রকার কুৎসা রটনা করা হইয়াছে। কিন্তু বিধাতার কৃপায় এই সমাজের সভ্যগণ আপনাদের অবলম্বিত সংস্কার পথ হইতে অদ্যাপি ভ্রষ্ট হন নাই। যখন দেশের সর্ব্বত্রই হিন্দু ধর্ম্মের পুনরুত্থান স্রোত প্রবাহিত, যখন দলে দলে লোক সকল প্রকার সংস্কারের বিরোধী হইতেছে, তখন কেবল এই সমাজের সভ্যগণ অটল ও নির্ভীকচিত্তে সমাজ সংস্কারের নিশান উড্ডীন রাখিয়াছেন। ইহা চিন্তা করিলেই সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের দ্বারা যে দেশের মহোপকার সাধিত হইয়াছে ও হইতেছে তাহা অনুভব করিতে পারা যায়। এই সমাজ জীবিত না থাকিলে আজ বঙ্গদেশের নাম ভারতে ডুবিয়া যাইত, এবং বাঙ্গালীগণ ভারতে সর্ব্বাপেক্ষা পশ্চাৎবর্ত্তী জাতি বলিয়া পরিগণিত হইত। এইতো গেল গুণের কথা,দোষের কথাও কিছু আছে। প্রথম:—

ধর্ম্মসাধনে ঔদাসীন্য—প্রধানতঃ দুইটী বিষয় ধরিয়া সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের নাম হইয়াছিল। (১) সমাজসংস্কার। (২) নিয়মতন্ত্র প্রণালী স্থাপন। বাল্য বিবাহের প্রতিবাদ ও ব্রাহ্মসমাজ মধ্যে নিয়মতন্ত্র প্রণালী স্থাপন করিবার জন্য সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের উদ্‌যোগকারিগণ প্রধানতঃ উৎসাহী হইয়াছিলেন। দুঃখের বিষয় এই, বিগত পঞ্চদশ বর্ষকাল সেই আদিম ভাবই প্রবল দৃষ্ট হইয়াছে। সমাজসংস্কার ও নিয়ম-

তন্ত্র প্রণালী, এই দুইটী বিষয়ে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্যগণের যেরূপ উৎসাহ দেখা গিয়াছে, ব্রাহ্মধর্ম্ম সাধন, ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার এবং ব্রাহ্মসমাজ ও জনসাধারণের সেবা বিষয়ে সেরূপ উৎসাহ দৃষ্ট হয় নাই। ইহার প্রমাণ হস্তের নিকটই আছে। পোনের বৎসরের মধ্যে ইহার সভ্যগণ নিয়মাবলী প্রণয়ন, সংশোধনাদি বিষয়ে যেরূপ পরিপক্কতা প্রকাশ করিয়াছেন তাহা ভাবিলে চমৎকৃত হইতে হয়। এত কালের মধ্যে অনেক গবর্ণমেণ্টও এত নিয়ম প্রণয়ন করেন নাই। নিয়মতন্ত্র প্রণালীর ব্যবস্থাটী যাহাতে সুন্দর ও উন্নত হয় সে বিষয়ে সভ্যদিগের মনোযোগের কোন দিন ত্রুটি হয় নাই। কিন্তু ব্রাহ্মধর্ম্ম সাধন ও ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার বিষয়ে এমনই মনোযোগ যে প্রচারক সংখ্যা কমিয়া যাইতেছে; এবং যে অল্পসংখ্যক আছেন তাঁহাদিগকেও প্রতিপালন করা কষ্টকর হইয়া উঠিয়াছে। আবার এই নিয়মতন্ত্র প্রণালীর ভাবের মধ্যে প্রবেশ করিলে দেখা যায় যে, ইহার যে মুখ্য উদ্দেশ্য, তাহা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্যগণের হৃদয়ে ভাল করিয়া বসে নাই। তাঁহারা যখন সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন, তখন নিয়মতন্ত্র প্রণালীর এই অর্থ বুঝিয়াছিলেন যে, ব্যক্তিগত প্রভুত্বকে দমনে রাখা। তাঁহারা মনে মনে বলিয়াছিলেন "ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজে কেশব বাবুর সর্ব্বময় কর্ত্তৃত্ব, কিন্তু আমাদের মধ্যে এরূপ হইবে না; আমরা নিয়মতন্ত্র প্রণালী অনুসারে কার্য্য করিব অর্থাৎ ব্যক্তিগত প্রাধান্যকে সর্ব্বদা শাসনে রাখিব।" দুঃখের বিষয়, এই ভাব এখনও অনেকের মনে প্রবল রহিয়াছে। এবং এই ভাব প্রবল থাকাতেই সমাজের আধ্যাত্মিক কার্য্যের অনেক ক্ষতি হইতেছে। পরস্পরের সহায়তা করা অপেক্ষা পরস্পরকে দখলে রাখার দিকে অধিক দৃষ্টি দেখা যাইতেছে। নিয়মতন্ত্র প্রণালীর উদ্দেশ্য আমরা এই বুঝি যে, পরস্পরের বিচ্ছিন্ন শক্তিকে সমবেত করিয়া প্রভু পরমেশ্বরের সেবাতে নিয়োগ করা; পরস্পরের বিরোধী হইয়া শক্তিক্ষয় করা দূরে থাক্, সত্য নির্দ্ধারণে, সত্য সাধনে ও সমাজের উন্নতি বিধানে পরস্পরের সহায় হওয়া ও পরস্পরকে সবল করা। কিন্তু আমাদের বিগত পঞ্চদশ বর্ষের কার্য্যে বোধ হইয়াছে যে, পরস্পরকে সবল না করিয়া বরং দুর্ব্বল করাই যেন আমরা নিয়মতন্ত্র প্রণালীর লক্ষ্য বলিয়া বুঝিয়া রাখিয়াছি।

মানবশক্তির প্রাধান্য—নববিধানস্থ বন্ধুগণ 'বিধান, বিধান' করিয়া জগতকে অস্থির করিয়া তুলিয়াছেন। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্যগণ তাঁহাদের প্রতিবাদী, সুতরাং নিজেদের সমাজকে বিধান বলিতে যেন ভয় পান। ইহাদের কার্য্য দেখিলে এইরূপ বোধ হয়, যেন উঁহাদের সমাজে ঈশ্বর লীলা করুন, আর আমাদের সমাজে আমরাই লীলা করি। আমরা কার্য্যনির্ব্বাহক সভা গঠন করিয়াছি, আমরা অধ্যক্ষ সভা নিয়োগ করিয়াছি, আমরা প্রচারক গ্রহণ, শাসন ও বর্জ্জন করিতে পারি। আমরা, আমরা, আমরা, সর্ব্বত্রই আমরা। এই উৎকট অহংভাব নিবন্ধন কার্য্যের সমূহ ক্ষতি হইতেছে। আমাদের সমাজের সভ্যগণই স্বীয় সমাজকে বিশ্বাস ও নিষ্ঠার চক্ষে দেখিতে পাইতেছেন না, ইহার জন্য স্বার্থত্যাগকে ঈশ্বরের জন্য স্বার্থত্যাগ বলিয়া মনে করিতে পারিতেছেন না! চিন্তা করিলেই দেখা যাইবে, যে এই কারণেই সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য তেমন করিয়া জমিতেছে না।

এসকল পুরাতন কথা, অনেক বার বলা হইয়াছে। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের জন্মোৎসবের প্রাক্কালে সকলের আলোচনার্থ আর একবার উপস্থিত করা গেল। আশা করি সভ্যগণ প্রশান্তচিত্তে এসকল বিষয় আলোচনা করিবেন এবং এই সকল অভাব মোচনার্থ ব্যাকুলচিত্তে ঈশ্বরের শরণাপন্ন হইবেন।

নিষ্ঠা।

বিগত ২৫শে বৈশাখ রবিবার সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে শ্রীযুক্ত নবদ্বীপচন্দ্র দাস কর্ত্তৃক বিবৃত উপদেশ।

তিন প্রকার বন্ধনে ধর্ম্মসমাজে নরনারীগণ সংযুক্ত থাকেন। মতের বন্ধন, সাধনের বন্ধন এবং সামাজিকপ্রেমের বন্ধন। মত, সাধন ও সমাজপ্রেম এই তিন বিষয়েই যাঁহার নিষ্ঠা আছে, সাধ্য কি কোনও প্রলোভন তাঁহাকে ধর্ম্মসমাজ হইতে ভ্রষ্ট করে? অটল অচল পর্ব্বতের ন্যায় তিনি সকল নির্য্যাতন, অপমান সহ্য করিয়া স্বধর্ম্ম রক্ষা করিতে থাকেন। এমন কি ধর্ম্মরক্ষার জন্য বিরোধীদিগের হস্তে প্রাণদান করিতেও তিনি কুণ্ঠিত হন না।

হিন্দুসমাজের সাধন প্রণালীতে বহুপ্রকার ভিন্নতা থাকা সত্ত্বেও মতে তাঁহারা একীভূত। খৃষ্টীয় রোমানক্যাথলিক সম্প্রদায়েও ঐরূপ দেখা যায়। রোমানক্যাথলিকদিগের মধ্যে সাধনের ভিন্নতা আছে; কিন্তু মূল ধর্ম্মমতের ভিন্নতা নাই। বৌদ্ধসমাজে এই মূল মতের একতা দেখা যায় না—একদল বৌদ্ধ ঈশ্বরবাদী, একদল নিরীশ্বর; কিন্তু তাহাদের সাধনে কোনও বিভিন্নতা নাই। মুসলমানদিগের মতে ও সাধনে কিছু কিছু ভিন্নতা থাকা সত্ত্বেও সমাজের প্রতি প্রত্যেক মুসলমানের অবিচলিত প্রেমে সকলকে একীভূত করিয়া রাখিয়াছে। যদিচ ধর্ম্মসমাজ সুদৃঢ় রাখিবার জন্য এই তিন শক্তিরই প্রয়োজন, কিন্তু অভাব পক্ষে কোনও একটিতে বিশেষ নিষ্ঠা না থাকিলে সমাজ তরু দণ্ডায়মান থাকিতেই পারে না। ব্রাহ্মসমাজ এই ত্রিবিধ শক্তিরই সমন্বয় প্রদর্শন করিবেন। ব্রাহ্মগণ শুধু মতে, কিম্বা সাধনে অথবা সামাজিক প্রেমে আকৃষ্ট হইলে আদর্শ ব্রাহ্মসমাজ গঠিত হইবে না। ব্রাহ্মধর্ম্ম যেমন পূর্ণাঙ্গ, সমাজও তেমনি পূর্ণাঙ্গ হইবে। ব্রাহ্মসমাজ হিন্দু, কিম্বা খ্রীষ্টান অথবা বৌদ্ধসমাজের ন্যায় গঠিত হইলে, ঐ সকল সমাজের মধ্যে যে সমুদয় অভাব ও অপূর্ণতা রহিয়াছে সে সকল অভাব ও অপূর্ণতা এ সমাজেও থাকিয়া যাইবে। অতএব মতে, সাধনে ও প্রেমে ব্রাহ্মগণ একীভূত হইয়া যাইবেন এবং আদর্শ সমাজ গঠন করিয়া তদনুকরণে জগতের প্রবৃত্তি জন্মাইবেন।

ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাসে দেখা যায়, মতের বন্ধন ছিন্ন হওয়াতেই "আদি" ও "ভারতবর্ষীয়" দুইটি দল গঠিত হইয়া-

ছিল। পুনরায় পরস্পর যেই কিছু মতের অমিল হইল, অমনি শেষোক্ত সমাজ ভাঙ্গিয়া দুটি হইল; কিন্তু আজ কাল ব্রাহ্মসমাজে সাধনের ভিন্নতা উপস্থিত হইয়াছে। ব্রাহ্মসমাজে এরূপ ঘটনা এই নূতন। ব্রাহ্মসমাজের মূল মত অতি পবিত্র, অপরিবর্ত্তনীয়। আনুষঙ্গিক কোন কোনও বিষয় পরিবর্ত্তিত কিম্বা পরিবর্দ্ধিত হইতে পারে। জীবে ব্রহ্মে সাক্ষাৎ সম্বন্ধ, আত্মার অনন্ত উন্নতি ইত্যাদি মূল মতগুলি অভ্রান্ত ও অপরিবর্ত্তনীয়। এই মতানুসারে সাধন অবলম্বন করিতে গিয়াই ব্রাহ্মগণ অভ্রান্ত গুরুবাদ, অভ্রান্ত শাস্ত্রবাদ প্রভৃতির অলীকতা দেখিতেছেন এবং সে সকল পরিত্যাগ করিতেছেন। যাহাতে লক্ষ্যপথে যাইতে বাধা জন্মায় এবং ধর্ম্মসমাজের জীবন্ত শক্তিকে বিনাশ করে, তাহা সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাজ্য। এই জন্যই ব্রাহ্মগণ অনেক পূর্ব্ব সংস্কার পরিত্যাগ করিয়াছেন। সাধন সম্বন্ধেও এই কথা। ব্রাহ্মসমাজের সাধনের অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলি পরিবর্ত্তিত হইতে পারে। সাধকের প্রাণে যতই ঈশ্বর লাভের পিপাসা বলবতী হইবে, ততই সাধন-কামনা পূর্ণ করিবার জন্য নানাপ্রকার উপায় অবলম্বিত হইবে। কিন্তু ব্রহ্মসাধনের মূল প্রণালী—স্বরূপ-সাধন, চিরদিন অব্যর্থ থাকিবে। ব্রহ্ম অপরিবর্ত্তনীয় নিত্যপুরুষ, তাঁহার স্বরূপও অপরিবর্ত্তনীয়, নিত্য। এখন আমরা তাঁহাকে সত্য, জ্ঞান, প্রেম, আনন্দ, পুণ্য বলিতেছি, কোটি কোটি বৎসর পরও সাধকগণ এই কথাই বলিবেন। তিনি কখনও অসত্য, অপ্রেম হইবেন না—পাপাবহ হইবেন না; তিনি চিরদিনই সত্যং জ্ঞানমনন্তং, শান্তং মঙ্গলং এবং ধর্ম্মাবহ পাপনুদং। সুতরাং আরাধনা সাধনে—স্বরূপসাধনে যাঁহারা একনিষ্ঠ হইবেন না, তাঁহারা বিশুদ্ধ ব্রহ্মজ্ঞান হইতে বাস্তবিকই বঞ্চিত থাকিবেন। একদিকে যেমন জীব ও ব্রহ্মের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ বিষয়ে সম্পূর্ণ আস্থা স্থাপন করিতে হইবে, তেমনি স্বরূপ সাধনে একনিষ্ঠ হইতে হইবে। স্বরূপ সাধনে বিশেষ রূপ রত না থাকিলে ধর্ম্ম ও ঈশ্বর সম্বন্ধীয় জ্ঞান ম্লান হয়, এবং সেই অবস্থাতেই সাধক কুসংস্কার, পৌত্তলিকতা এবং মধ্যবর্ত্তি বাদের অন্ধকারে পতিত হইয়া থাকেন। তরঙ্গায়িত সাগর-বক্ষে নিমগ্ন ব্যক্তির পক্ষে ভেলা যেমন জীবন রক্ষার উপায় স্বরূপ, এই কুসংস্কার এবং পাপ মোহময় সংসারে ভগবানের স্বরূপ সাধন তেমনি আমাদের একমাত্র আশ্রয়-সেতু। দিগ্‌ভ্রান্ত নাবিক যেমন ধ্রুব নক্ষত্র লক্ষ্য করিয়া সমুদ্রে গমন করে, তেমন আমরাও ভগবানের স্বরূপ মনন, চিন্তন, করিয়া ভবসমুদ্রে গন্তব্য পথের অনুসরণ করিব।

একদিকে যেমন মত ও সাধনে নিষ্ঠা থাকিবে, অপর দিকে ব্রাহ্মসমাজের প্রতি তেমন প্রীতি থাকা বাঞ্ছনীয়। ব্রাহ্মসমাজকে যিনি প্রাণের সহিত ভাল বাসিতে পারেন না, সাধনে ও মতে তিনি কখনও সুদৃঢ় থাকিতে পারিবেন না। যাঁহাদের ভগবানে প্রেম জন্মিয়াছে, তাঁহারাই মানবপ্রেমিক হইতে পারেন। অতএব মত, সাধন এবং সমাজপ্রেম এই তিন অঙ্গে ব্রাহ্মদিগকে পূর্ণতা লাভ করিতে হইবে।

কেহ কেহ বলেন, "আগে নিজের পরিত্রাণ, তারপর সমাজ। আমার পরিত্রাণের উপায় অন্বেষণ না করিয়া কি সমাজের চিন্তা করিতে পারি?" কিন্তু তাঁহারা একবার স্থিরভাবে বিবেচনা করিয়া দেখিলে একথার অসঙ্গতি দোষ সহজেই অনুভব করিতে পারেন। যদি বিশ্বাস করেন যে, বর্ত্তমান সময়ে জীবের পরিত্রাণের জন্য প্রভু পরমেশ্বর ব্রাহ্মধর্ম্মকে প্রেরণ করিয়াছেন, তবে সমাজ ও নিজের মধ্যে সীমা স্থাপন করিতেছেন কেন? যাহাতে আমার পরিত্রাণ, আমার আত্মীয় স্বজনের ও সেই উপায়েই পরিত্রাণ হইবে। আপন পরের পার্থক্য ভুলিতে না পারিলে ধর্ম্মের নিগূঢ় মহিমা বুঝিতে পারা যায় না। অন্যের পরিত্রাণের উপায় না করিলে, নিজের পরিত্রাণ হইবে না, একথার রহস্য অনেকে চিন্তা করেন না। যিনি কেবল নিজকে লইয়া ব্যস্ত, তিনি আত্মপরায়ণ। এই আত্মপরায়ণতার জাল ছিন্ন করিয়া সমাজপ্রেম স্বাধীন না করিলে মুক্তি নাই, ঈশ্বরের সহবাসে থাকিবার উপায় নাই। পরমেশ্বর আমাদের কৃপা করুন, মতে, সাধনে এবং সমাজপ্রেমে দিন দিন অগ্রসর হইয়া ব্রাহ্মসমাজ তাঁহার মহিমা ঘোষণা করুন।

নির্জ্জন-চিন্তা।

(জনৈক মহিলা লিখিত)

দেখ দেব! শোক আসিয়া যখন প্রাণের প্রিয়বস্তুগুলি হরণ করিবে, তখন যেন অধীর হইয়া তোমা হইতে দূরে গিয়া না পড়ি। বরং শোকের মধ্যেই যেন সুখের চিহ্ন দেখিয়া ধৈর্য্যাবলম্বন করিতে পারি। আমার প্রাণের দেবতা, তুমি যে ক্লেশ দিবে তাহা সহ্য করিতে পারিবনা? এত অপ্রেমিকের কথা! তুমি প্রিয়তম! তুমি যে ক্লেশ দিবে তাহা সহ্য করিব না, তবে আমার তোমার প্রতি প্রেম কি? শুধু কি শোক, তাহা ছাড়া আরও কঠোর হইতে কঠোরতম যত ক্লেশ হইবে, সকলি অকাতরে সহিব,তবেত প্রকৃত প্রেমিকের কার্য্য হয়! তবে দেব, তবে এই প্রার্থনা—হৃদয়ে সেই বল দাও যাহাতে প্রবল বন্যার ভীমস্রোতে অতলে মগ্ন না হই, যেন তোমা হইতে বিচ্যুত না হই।

দেখ দেব! আমার কি শোচনীয় দশা! "হৃদয় থাল ভরি, ভক্তি পুষ্পহার" লইয়া আমি তোমার নিকট যাই, তোমার ধ্যানে মনকে নিয়োজিত করি, হঠাৎ একি হইল, যাহা তোমাকে দিতে আসিয়াছিলাম তাহা যে আমাকে আমি অর্পণ করিলাম! তোমার নাম করিতে নিজেরই নাম করি—তোমার গুণ গান করিতে নিজেরই গুণ গান করিয়া ফেলি; প্রাণ জুড়াইতে আসিয়া প্রাণের দাবানল প্রজ্বলিত করি; পুণ্য প্রেমে ভূষিত হইতে আসিয়া পাপে তাপে বিদগ্ধ হই। দেব, রক্ষা কর; এ দুর্দ্দশা হইতে আমাকে উদ্ধার কর।

প্রহরী যখন চোরের হস্ত বাঁধিয়া লইয়া যায়, তখন সেই চোরের কেমন একটা ভয়াবহ ঘন নৈরাশ মিশ্রিত অবস্থা হয়; বিষাদে তাহার মুখ বিষন্ন হয়, প্রাণ দারুণ অনুতাপাগ্নিতে দগ্ধ হইতে থাকে। ধরা পড়িয়াছে, আর রক্ষা নাই, এই ভয়ে সে মৃতপ্রায় হয়। সেইরূপ যখন বিবেক প্রহরী আসিয়া পাপকে

ধরিয়া ফেলে তখন পাপেরও ওইরূপ অবস্থা হয়, তখন দীনতা আসে, আত্মগ্লানি আসে, আত্মদৃষ্টি প্রখর হয়।

এমনও দেখা যায়, কত প্রচণ্ড দস্যু কারাবাসের ভীষণ যাতনা ভোগ করিয়া সকল দুষ্কর্ম্ম পরিত্যাগ করে। সেইরূপ এই বিবেক প্রহরীর আক্রমণে অনেক ঘোর পাপী মহাসাধু হইয়া জগতের কল্যাণ করিতে থাকে।

মন সংশয় যুক্ত হইলে, বিশ্বাস টলটল করিলে, ধর্ম্মপথ ভ্রষ্ট হইবার উপক্রম হইলে, জগতের সাধু মহাজনদিগের জীবন অনুধ্যান করি। পাপীর উদ্ধার কিরূপে হইয়াছিল তাহাই স্মরণ করি, তখন প্রাণে দুর্জ্জয় বল প্রাপ্ত হই, সমস্ত সংশয় ছেদ হইয়া যায়।

মানবের চক্ষের সম্মুখে তাঁহার অতুল প্রেমচ্ছবি উজ্জ্বলরূপে প্রকাশিত রহিয়াছে। পিতার অতুল ভালবাসায় তাঁহার পিতৃভাব, মাতার অপার্থিব স্নেহে তাঁহার মাতৃত্বের পরিচয় এবং বিশ্বপ্রেমিকতায় তাহারই অনন্ত প্রেমের নিদর্শন। তাই সাধক বিহ্বলচিত্তে বলেন, তুমি পিতা, তুমি মাতা, পরিত্রাতা।

সেই বিবাহে প্রকৃত ফল প্রসব করে এবং তাহাই প্রকৃত বিবাহ, যাহার উদ্দেশ্য থাকে জগতে প্রকৃত সাধু মহাত্মা ও মনস্বিনীর আবির্ভাব হইবে—তাহাদের দ্বারা পরমেশ্বরের নাম জয়যুক্ত হইবে—জগতের কল্যাণ হইবে। সেরূপ সংকল্প লইয়া কেহ যদি বিবাহ করিতে প্রস্তুত থাকেন তিনি নমস্য।

সকল বাসনার সমাধি হউক। কেবল একটি বাসনা বলবতী হউক, যাহাতে নবজীবন লাভ করি। সকল আশার ধ্বংস হউক হে প্রভো, কেবল তোমার আশা প্রাণের একমাত্র সম্বল হউক।

পাপই মোহ, মানুষ সুখ সরোবর ভাবিয়া তাহাতে ঝাঁপ দেয়, কিন্তু চিরসুখের পরিবর্ত্তে চিরদুঃখ পায়।

আমার অন্তরে যত কিছু কু আছে সে সকল পৃথিবীর দ্রব্য। পৃথিবীর মলিনতা আমাকে কলঙ্কিত করে। আমি মহান অনন্ত পুণ্যের সন্তান—আমার উপর পৃথিবীর কু রাজত্ব করিবে? কে বড়? পৃথিবীর কু বড় কি আমার সু বড়? কুর সহিত সংগ্রাম করিয়া আপনাকে জয়যুক্ত করিতে হইবে। তা না হইলে ঈশ্বরের সন্তান নামে পরিচয় দিতে পারিব না।

ঈশ্বরকে ডাকিবার শ্রেষ্ঠ পথ কাতর ব্যাকুলতা। যখনি প্রাণ শূন্যভাবে হাহাকার করে, তখনি বুঝি তাঁহাকে ডাকিবার সুসময় উপস্থিত হইয়াছে। যখন নিরাশ অবসন্ন শূন্যহৃদয়ে চতুর্দ্দিক শূন্য দেখি, তখন তাঁহাকে ডাকিবার সুসময়।

তাঁহার করুণার বিশেষ চিহ্ন আত্মপ্রসাদ ও নির্ম্মল সুখ।

যখন কোন পাপে পড়িবার উপক্রম হইবে, প্রকৃত অনুতাপের সহিত প্রার্থনা করিব।

যিনি ঈশ্বর-প্রত্যাশী তিনি তাঁহার চিত্তের প্রতি সতত প্রখর দৃষ্টি রাখেন। অজ্ঞাতসারে যদি সামান্য পাপ তাঁহাকে আক্রমণ করে, বিবেক অমনি দংশন করিতে থাকে। তাঁর নিকট বিবেক সর্ব্বদা দণ্ড লইয়া বসিয়া আছে, যখনি একটু ক্ষুদ্র পাপ হইবে, বিবেক আত্মগ্লানিরূপ শাণিত ছুরিকা হৃদয়ে বিদ্ধ করিতে থাকে, সে তীক্ষ্ণ আঘাতে তাঁহার ধর্ম্মজীবনের প্রভূত কল্যাণ হয়।

মৃত্যু এক এক সময় আসিয়া সম্ভাষণ করিয়া যায়, "আমি আসিতেছি, আসিতেছি, প্রস্তুত থাক।" অতি সুমিষ্ট স্বরে বলিয়া যায় "আমিই অমৃতের দিকে লইয়া যাইব, অনন্তের পথ দেখাইয়া দিব, তুমি নির্ব্বিঘ্নে চলিয়া যাইবে, ভয় কি? জীবনের শেষ মুহূর্ত্তে দেখিবে, দেখিবে আমি কত কোমল।"

পঞ্জাব প্রচারযাত্রীদিগের পত্র।

আমরা লক্ষ্ণৌ হইতে রওনা হইয়া ৪ঠা এপ্রিল হরিদ্বারে পৌঁছি। এখানে পঞ্জাবী বন্ধু শ্রীযুক্ত সুন্দর দাস ভল্লা আমাদিগকে আগ্রহের সহিত গ্রহণ করেন। মধ্যাহ্নে তাঁহার গৃহে হিন্দিতে উপাসনা হয়, শ্রীযুক্ত প্রকাশদেব আচার্য্যের কার্য্য করেন। অপরাহ্নে আমরা হরিদ্বারের হিন্দুতীর্থস্থান দর্শন করিতে যাই। এ স্থান পরম রমণীয়। পর্ব্বতের পাদমূলে বেগবতী গঙ্গা প্রবাহিত হইতেছে। এ স্থান হিন্দুদিগের প্রধান তীর্থস্থান। ভারতবর্ষের নানা দেশবাসী হিন্দুগণের এখানে সমাগম হইয়া থাকে। বিহার, উত্তর পশ্চিম প্রদেশ, পঞ্জাব প্রভৃতি স্থানের লোকই অধিকাংশ। যোগী, সন্ন্যাসী, গৃহস্থ প্রভৃতি সকল শ্রেণীর লোকই এখানে স্নান করিতে আগমন করেন। আমরা এখান হইতে পাকনী নামক স্থানে শ্রীযুক্ত বৈষ্ণবদাস ভল্লার আলয়ে গমন করি। তথায় উপাসনা হয়, শ্রীযুক্ত প্রকাশদেব উপাসনা করেন এবং গীতার একটী শ্লোক ব্যাখ্যা করিয়া উপদেশ দেন।

লাহোর।

৬ই এপ্রিল—প্রাতঃকালে আমরা লাহোর পৌঁছি। স্থানীয় ব্রাহ্মসমাজের প্রায় ৩০ জন সভ্য আমাদিগের অভ্যর্থনার জন্য ষ্টেশনে উপস্থিত হইয়াছিলেন। অনেক দিন হইতে তাঁহারা আমাদের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, অদ্য এই সম্মিলনে তাঁহারা সকলেই বিশেষ আনন্দিত হইলেন। আমরা বন্ধুবর বাবু অবিনাশ চন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের ভবনে সাদরে গৃহীত হইলাম। অপরাহ্নে ব্রাহ্মবন্ধুদিগের সহিত কথা বার্ত্তা হয়।

৭ই এপ্রিল—এখানে "সৎসঙ্গ" বলিয়া একটি সভা আছে। তাহাতে ধর্ম্মবিষয়ে আলোচনা হইয়া থাকে। অদ্য তাহার অধিবেশন। আলোচ্য বিষয়—"ঈশ্বরের অস্তিত্ব"। শ্রদ্ধাস্পদ শাস্ত্রী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। তিনি সত্তাবাদ (Ontological argument), কারণবাদ, (Causal argument), কৌশলবাদ (Design argument) এবং বিবেকবাদ (Moral argument) এই চারি প্রকারের যুক্তি দ্বারা আলোচ্য বিষয়টি অতি সুন্দর রূপে শ্রোতৃমণ্ডলীকে বুঝাইয়া দিলেন।

৮ই এপ্রিল—অপরাহ্নে ব্রহ্মমন্দিরে ধর্ম্মবিষয়ে কথা বার্ত্তা হয়। একজন পুত্রশোকার্ত্ত ব্যক্তি "শান্তিলাভের উপায় কি?" এই প্রশ্ন করেন। শাস্ত্রী মহাশয় শাস্ত্রের, বিবিধ বচন উদ্ধৃত, এবং নিজের ও অপরের জীবনের পরীক্ষিত সত্য সকল বিবৃত করিয়া মানব জীবনের প্রকৃত শান্তির উপায় অতি বিশদরূপে নির্দ্দেশ করেন।

৯ই রবিবার—মধ্যাহ্নে সম্মিলনী (কন্‌ফারেন্স) হয়; আলোচ্য বিষয়—সাধনমণ্ডলী (Brahmo Workers' Shelter) গঠন। এখানে কিরূপে একটি সহায় দল সংগঠিত হইতে পারে, সে বিষয়ে বিশেষ আলোচনা হইয়া সহায়দল গঠনের প্রস্তাব স্থির হয়। সায়ংকালে শাস্ত্রী মহাশয় মন্দিরে উপাসনা করেন। পরাবিদ্যা ও অপরাবিদ্যা সম্বন্ধে উপদেশ দেন। এই উপদেশে তিনি সমুদায় ধর্ম্মশাস্ত্রকে দেশভ্রমণকারীদিগের গাইড্ বুকের সহিত তুলনা করেন। যদি কেহ ঘরে বসিয়া কেবল গাইড্ বুক পড়ে ও নিজে দেশ ভ্রমণ না করে, তাহার যে দশা হয়, যে ব্যক্তি কেবল শাস্ত্রে ধর্ম্মের কথা পড়ে, কিন্তু নিজে সাধন না করে, তাহারও সেই দশা হয়।

১০ই, সোমবার—সায়ংকালে ব্রহ্মমন্দিরে স্থানীয় বাঙ্গালীদিগের এক আলোচনা সভা হয়।

১১ই, মঙ্গলবার—সায়ংকালে মন্দিরে ইংরাজীতে উপাসনা ও উপদেশ হয়। শাস্ত্রী মহাশয় আচার্য্যের কার্য্য করেন। উপদেশের বিষয় "ব্রহ্মোপাসনার আবশ্যকতা"।

১২ই, বুধবার—স্থানীয় ব্রাহ্মবন্ধু শ্রীযুক্ত গিরিধর রায় মহাশয়ের ভবনে সায়ংসমিতি হয়।

১৩ই, বৃহস্পতিবার—সায়াহ্নে মন্দিরে শাস্ত্রী মহাশয় ইংরাজীতে বক্তৃতা করেন। বক্তৃতার বিষয় "বর্ত্তমান সময়ের বিশেষ চিহ্ন"।

১৪ই, শুক্রবার—সৎসঙ্গের অধিবেশন হয়, আলোচ্য বিষয় "নীতিশিক্ষা"। শাস্ত্রী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

১৫ই শনিবার—সায়ংকালে মন্দিরে বাঙ্গালায় উপাসনা হয়, শাস্ত্রী মহাশয় আচার্য্যের কার্য্য করেন। "ধর্ম্ম যদি আত্মার অন্নপানের অভাব দূর না করে, ও জীবনকে পরিবর্ত্তিত না করে, তবে তাহা ধর্ম্মই নয়" এবিষয়ে উপদেশ দেন।

১৭ই, সোমবার—প্রাতে শ্রীযুক্ত বাবু তারাপ্রসন্ন দত্ত মহাশয়ের গৃহে উপাসনা হয়, শাস্ত্রী মহাশয় উপাসনা করেন। সায়ংকালে শ্রীযুক্ত বাবু রামনারায়ণ সরকার মহাশয়ের গৃহে সায়ংসমিতি হয়।

১৮ই, মঙ্গলবার—পঞ্জাবের সরদার (Chief) দিগের শিক্ষার জন্য এখানে "Chiefs' College" নামে একটি কলেজ আছে। প্রাতে আমরা উক্ত কলেজের জনৈক শিক্ষক কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া কলেজ পরিদর্শন করিতে যাই। কলেজের সহিত একটি বোর্ডিং আছে, শিক্ষার্থীগণ এই বোর্ডিংএ থাকে। এই বোর্ডিংএর নিয়মাদি এবং শিক্ষার্থীদিগের শারীরিক, মানসিক ও নৈতিক শিক্ষার বন্দোবস্ত দেখিয়া আমরা সুখী হইলাম। এই কলেজ ও বোর্ডিং দ্বারা পঞ্জাবের সরদারদিগের শিক্ষার বিশেষ সুবিধা হইয়াছে। এই কলেজ গবর্ণমেন্টের তত্ত্বাবধানাধীন।

অপরাহ্নে মন্দিরে ইংরাজি ভাষায় উপাসনা হয়, শাস্ত্রী মহাশয় আচার্য্যের কার্য্য করেন। "আত্মানমেব প্রিয়মুপাসীত" উপনিষদের এই শ্লোক উল্লেখ করিয়া উপদেশ দেন।

১৯এ, বুধবার—সায়ংকালে মহেন্দ্রনাথ সরকার নামক এখানকার একজন বাঙ্গালি বাবুর গৃহে "জগাই মাধাই উদ্ধার" সম্বন্ধে বাবু হরিমোহন ঘোষাল কথকতা করেন। কথকতার মধ্যে মধ্যে সংকীর্ত্তনও হইয়াছিল।

২১এ, শুক্রবার—সায়ংকালে শাস্ত্রী মহাশয় মন্দিরে "চরিত্রের শাসন" বিষয়ে ইংরাজী ভাষায় বক্তৃতা করেন। বক্তৃতা শুনিয়া সকলেই আকৃষ্ট হইয়াছিলেন।

২২এ, শনিবার—সায়ংকালে মন্দিরে ইংরাজী বক্তৃতা হয়। বক্তা শাস্ত্রী মহাশয়, বিষয়—"ব্রাহ্মসমাজ ও ইহার কার্য্য।" তিনি বক্তৃতাতে ব্রাহ্মসমাজের উদ্দেশ্য ও ইহা দ্বারা কি কি কার্য্য হইয়াছে সংক্ষেপে অতি স্পষ্ট ভাষায় বুঝাইয়া দেন।

২৩এ, রবিবার—প্রাতে শ্রীযুক্ত সুন্দর সিংহ মন্দিরে উর্দ্দুতে উপাসনা করেন। অপরাহ্নে স্থানীয় শিক্ষা-সভা হলে বঙ্গসাহিত্য সভার বার্ষিক অধিবেশন উপলক্ষে শাস্ত্রী মহাশয় ইংরাজীতে শিক্ষা সম্বন্ধে সংক্ষেপে একটী বক্তৃতা করেন। সায়ংকালে ভাই প্রকাশদেব মন্দিরে উর্দ্দুতে উপাসনা করেন। "জীবনে ধর্ম্ম লাভ করা চাই" এ বিষয়ে উপদেশ দেন। তাঁহার ভাবের উচ্ছ্বাস ও ভাষার লালিত্যে সকলেই মুগ্ধ হইয়াছিলেন।

২৪এ, সোমবার—বাবু তারণচন্দ্র দাস মহাশয়ের গৃহে উপাসনা হয়; শাস্ত্রী মহাশয় আচার্য্যের কার্য্য করেন। "যোবৈ ভূমা তৎ সুখম্, নাল্পে সুখমস্তি" উপনিষদের এই শ্লোক ব্যাখ্যা করিয়া একটি সারগর্ভ উপদেশ দেন।

স্থানীয় ব্রাহ্মসমাজের কতিপয় উৎসাহী সভ্য সাধনাশ্রমের সহিত বিশেষ সহানুভূতি প্রকাশ করেন। তাঁহাদিগকে লইয়া একদিন উদ্যান-সম্মিলন হয়। তথায় শ্রদ্ধেয় শাস্ত্রীমহাশয় সাধনাশ্রমের উদ্দেশ্য ও কার্য্যপ্রণালী বর্ণন করেন। তৎপর তাঁহাদের অনেকে ইহার "সহায়" (Helpers) শ্রেণীভুক্ত হইতে ইচ্ছা করেন। এই জন্য ২৬এ তারিখে ভাই গিরিধর রায়ের গৃহে বিশেষ উপাসনা হয়। উপাসনান্তে শাস্ত্রী মহাশয় সাধনমণ্ডলী সম্বন্ধে অনেক উপদেশজনক কথা বলেন। তদনন্তর কয়েকজন ভদ্র মহোদয় ও ভদ্রমহিলা সহায়শ্রেণীভুক্ত হন।

এবার পঞ্জাবস্থ বন্ধুগণের সহিত আমাদের প্রাণের বিশেষ যোগ সংস্থাপিত হইয়াছে। ভগবানের করুণাতে এরূপে তাঁহার ভিন্ন ভিন্ন স্থানের সন্তানদিগের মধ্যে প্রেমের সম্বন্ধ সংস্থাপিত হইয়া থাকে। এখানকার ব্রাহ্মবন্ধুদিগের উৎসাহ অনেক গুণে বর্দ্ধিত হইয়াছে। কয়েক জন নূতন লোক ব্রাহ্মসমাজের দিকে আকৃষ্ট হইয়াছেন। তত্ত্বকৌমুদী ও মেসেঞ্জারের কয়েকজন গ্রাহক হইয়াছেন। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের পুরাতন প্রাপ্য চাঁদা প্রভৃতি প্রায় ৮০৲ টাকা আদায় হইয়াছে। একজন মহিলাপ্রদত্ত ১০০৲ শত টাকা দান সাধনাশ্রমে প্রেরিত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন সর্দ্দার দয়াল সিংহ মহোদয় পঞ্জাবে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যে বিশেষ সাহায্য করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন এবং আমাদের পাথেয় ব্যয়ের সাহায্যার্থ ২২০৲ টাকা দান করিয়াছেন। আমরা পঞ্জাববাসী ভ্রাতা ভগিনীদিগকে অন্তরের সহিত ধন্যবাদ দিয়া ২৭শে এপ্রিল অমৃতসর যাত্রা করি।

পঞ্জাব প্রদেশে অমৃতসর একটী প্রধান স্থান। এখানে রণজিৎ সিংহ "হরমন্দির" নামে সুবিখ্যাত এক স্বর্ণমন্দির নির্ম্মাণ করেন। এই মন্দির অমৃতসর নামক প্রকাণ্ড দীর্ঘিকার মধ্যস্থলে স্থাপিত। মহাত্মা নানকের শিখধর্ম্ম পঞ্জাবে কিরূপ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল, এই হরমন্দির দর্শন করিলে

তাহা সহজেই অনুভূত হয়। এই মন্দিরে দিন রাত্রি প্রায় ২৪ ঘণ্টাই (রাত্রি তিনটা হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত দিন এবং রাত্রি ১১টা পর্য্যন্ত) ধর্ম্মালোচনা, ভজন (সঙ্গীত) ও পাঠ হইয়া থাকে। এই ভজন ও পাঠাদিতে এক অদ্বিতীয়, মহান পরমেশ্বরের মহিমা কীর্ত্তন হয়। একেশ্বর বাদের পবিত্রতা রক্ষার জন্য গুরু নানকের যে কিরূপ প্রাণগত চেষ্টা ছিল, তাহা এই ভজন ও পাঠাদি শ্রবণ করিলেই বুঝা যায়। কিন্তু কি দুঃখের বিষয়, নানকের সেই পবিত্র ধর্ম্মও এখন গ্রন্থ-পূজায় ও নানারূপ কুসংস্কারে পরিণত হইয়াছে। মন্দিরে পাঠ ভজনাদির নিয়ম সমূহ বৃত্তিভোগী লোক ও পুরোহিতগণ দ্বারা প্রতিপালিত হইয়া থাকে। দিবারাত্রি শত শত নরনারী এই মন্দির দর্শন ও প্রদক্ষিণ করিতেছে; ইহাদের অধিকাংশই শিখ। ইহাদের ধর্ম্মালোচনা এবং লোক সমাগমের স্রোত দর্শন করিলে মনে আশ্চর্য্য ভাবের উদয় হয়। এখানে একটি দৃশ্য বড়ই সুন্দর দেখিলাম; সেটী ইহাদের নরসেবার ভাব। আপনি ক্লান্ত হইয়া আসিয়াছেন, অমনি হয়ত একজন আসিয়া আপনাকে পাখার বাতাস দিতে লাগিল। এরূপ বিনয় ও সেবা সকলেরই অনুকরণীয়।

আমরা অমৃতসর হইতে দিল্লী যাত্রা করি। এখানে বাবু হেমচন্দ্র সেন ডাক্তার মহাশয় তাঁহার গৃহে একদিন আমাদিগকে আহ্বান করেন। সেখানে সঙ্গীতাদি হয়। শাস্ত্রী মহাশয় উপনিষদের একটী শ্লোক অবলম্বন করিয়া উপদেশ দেন। স্থানীয় আরও কয়েকজন বাঙ্গালী উপস্থিত ছিলেন।

পর দিবস আমরা আগ্রা সহরে গমন করি। এখানে আমাদের বন্ধু বাবু নীলমণি ধর মহাশয় বাস করেন। আমরা তাঁহারই গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করি। মধ্যাহ্নে পারিবারিক উপাসনা হয়, শাস্ত্রী মহাশয় উপাসনা করেন। অপরাহ্নে ডাক্তার বাবু অমূল্যরতন বসাকের গৃহে উপদেশ, সঙ্গীত, সংকীর্ত্তন ও প্রার্থনাদি হয়। শাস্ত্রী মহাশয় আচার্য্যের কার্য্য করেন। প্রায় ৫০ জন বাঙ্গালী ও কয়েকজন মহিলা উপস্থিত ছিলেন।

৩রা মে—প্রাতে নীলমণি বাবুর গৃহে উপাসনা হয়, শাস্ত্রী মহাশয় উপাসনা করেন। আমাদের এই দৈনিক উপাসনায় আমরা দিন দিন ভগবানের কৃপা অধিকতর অনুভব করিতেছি। অপরাহ্নে স্থানীয় ভিক্টোরিয়া কলেজ গৃহে এক সভা হয়। স্কুল কলেজ বন্ধ থাকাতেও শতাধিক শিক্ষিত লোক উপস্থিত ছিলেন। প্রথমতঃ একটি হিন্দি সঙ্গীত হয় তৎপর ভাই প্রকাশ দেব উর্দ্দুতে সংক্ষেপে অথচ উজ্জ্বলরূপে ব্রাহ্মধর্ম্ম ও ব্রাহ্মসমাজের উদ্দেশ্য বুঝাইয়া দেন; তৎপর শাস্ত্রী মহাশয় ইংরাজীতে তৎসম্বন্ধে একটি সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা করেন। সর্ব্বশেষে আর একটি সঙ্গীত হয়। এখানকার লোকে ব্রাহ্মধর্ম্ম ও ব্রাহ্মসমাজ সম্বন্ধে একরূপ কিছুই অবগত নহে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু তাঁহাদের মনোযোগ ও একাগ্রচিত্ততা দেখিয়া বোধ হইল বক্তব্য বিষয়ের প্রতি তাঁহারা আকৃষ্ট হইয়াছেন। বক্তৃতান্তে সবজজ লালা বৈজিনাথ বক্তাদ্বয়কে ধন্যবাদ দিয়া বলেন যে, বক্তৃতা অতি সারগর্ভ হইয়াছে, সকলেরই উচিত, যে এই উপদেশানুসারে জীবন পরিচালিত করেন। এখানে ব্রাহ্মধর্ম্ম সম্বন্ধীয় কতকগুলি বই বিক্রয় হয়, এবং কোন কোন উচ্চপদস্থ লোক নীলমণি বাবুর গৃহে আসিয়া আগ্রহের সহিত ব্রাহ্মধর্ম্মের তত্ত্ব জিজ্ঞাসা করেন। এস্থান ধর্ম্মপ্রচারের একটি উপযুক্ত ক্ষেত্র বলিয়া মনে হয়। যত্নের সহিত কার্য্য করিলে এখানে সুফল ফলিতে পারে।

ব্রাহ্মসমাজ।

সেবা-সংবাদ—সাধনাশ্রম হইতে বাবু চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রচারার্থ বিক্রমপুরে গমন করিয়াছেন, যথাসময়ে এসংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। তিনি বজ্রযোগিনী নামক গ্রামে উপস্থিত হইবার কিছুদিন পরে গ্রামস্থ অনেক লোক বিসূচিকা রোগে আক্রান্ত হয়, চণ্ডী বাবু প্রচারার্থ অন্য কোনও স্থানে গমন না করিয়া রোগীদিগের সেবা শুশ্রূষা করিতে আরম্ভ করেন। সংক্রামক ব্যাধি ক্রমশঃ ভয়ানক মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। এপর্য্যন্ত চৌদ্দ জন লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। এ সংবাদ পাইয়া সাঃ ব্রাঃ সমাজের দাতব্য বিভাগের সম্পাদক মহাশয় বাবু কুঞ্জবিহারী গুহ নামক একজন সেবার্থীকে কিছু ঔষধ সহ তথায় প্রেরণ করিয়াছেন। বিক্রমপুর নিবাসী ব্রাহ্মগণের নিকট অনুরোধ যে, তাঁহারা এসময় যথোচিত অর্থ সাহায্য দ্বারা উপকৃত করেন। "২১০ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, শ্রীযুক্ত বাবু গুরুচরণ মহলানবিস, দাতব্য বিভাগের সম্পাদক" এই ঠিকানায় সাহায্য পাঠাইবেন।

পঞ্জাব প্রচার যাত্রীদল—পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীপ্রমুখ পঞ্জাব প্রচার যাত্রীদল পথে বাঁকীপুর, বারাণসী, ফয়জাবাদ, লক্ষ্নৌ এবং হরিদ্বার প্রভৃতি স্থানে প্রচার করিয়া লাহোরে উপনীত হন। তথায় প্রায় তিন সপ্তাহকাল তাঁহারা অবস্থিতি করিয়া ইংরাজী, বাঙ্গালা, হিন্দিতে উপাসনা, বক্তৃতা এবং আলোচনাদি করেন। প্রভু পরমেশ্বরের কৃপায় লাহোরের ব্রাহ্মভ্রাতাগণের নবোৎসাহ উদ্দীপ্ত হইয়াছে। কোন কোন নূতন লোক ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছেন। লাহোরে ব্রাহ্মধর্ম্ম সাধন, ব্রাহ্মসমাজের সেবা এবং ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার উদ্দেশ্যে একটি সহায়দল সংগঠিত হইয়াছে। তাঁহারা প্রভুর আশীর্ব্বাদ মস্তকে গ্রহণ করিয়া নব উদ্যমে কার্য্যক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হউন, এই প্রার্থনা।

তথায় এসময়ে তত্ত্বকৌমুদী এবং মেসেঞ্জারের কয়েকজন গ্রাহক হইয়াছেন। একজন মহিলা ১০০৲ এক শত টাকা ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারোদ্দেশ্যে দান করিয়াছেন। লাহোরে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের জন্য আমাদের বন্ধুবর সরদার দয়ালসিংহ মহাশয় বিশেষ মনোযোগী এবং উৎসাহী হইয়াছেন। লাহোরে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের স্থায়ী প্রচারক মণ্ডলী গঠনের জন্য তিনি বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন। পরমেশ্বর তাঁহার এই শুভসংকল্পের সহায় হউন। তিনি পঞ্জাব প্রচার যাত্রীগণের পাথেয় ব্যয় স্বরূপ ২২০৲ টাকা দান করিয়াছেন। আমরা পঞ্জাববাসী ভ্রাতা ভগিনীদিগকে আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

সাধনাশ্রম—পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী লাহোর অঞ্চলে গমন করায়, শ্রীযুক্ত নবদ্বীপচন্দ্র দাস আশ্রমের তত্ত্বাবধায়ক পদে বৃত হইয়াছেন। তিনি আশ্রমে বাস করিয়া নিয়মিত উপাসনাদি করিতেছেন।

নামকরণ—বাবু কুঞ্জবিহারী সেনের প্রথম পুত্রের নামকরণ গত ২৮শে বৈশাখ সাধনাশ্রমে সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত নবদ্বীপচন্দ্র দাস আচার্য্যের কার্য্য করেন। সন্তানের নাম ধ্রুবজ্যোতি ব্রহ্মানন্দ রাখা হইয়াছে। এতদুপলক্ষে কুঞ্জবাবু সাঃ ব্রাঃ সমাজের প্রচার বিভাগে ১৲ টাকা দান করিয়াছেন।

জাতকর্ম্ম—বাবু বঙ্কবিহারী বসুর গ্রেষ্ট্রীটের বাড়ীতে তাঁহার পঞ্চম সন্তানের (দ্বিতীয় পুত্র) জাতকর্ম্ম উপলক্ষে উপাসনা হইয়াছে। শ্রীযুক্ত নবদ্বীপচন্দ্র দাস উপাসনা করেন। বঙ্কবাবু সাঃ ব্রাঃ সমাজে ১৲ টাকা দান করিয়াছেন।

বাবু মধুসূদন সেনের দৌহিত্রের জন্ম উপলক্ষে গত ২৪শে বৈশাখ তাঁহার কলিকাতাস্থ বাসাতে উপাসনা হইয়াছে। শ্রীযুক্ত নবদ্বীপচন্দ্র দাস আচার্য্যের কার্য্য করেন ও সন্তানের পিতা শ্রীমান্ জ্ঞানেশরঞ্জন রায় প্রার্থনা করেন। পরমেশ্বর শিশুদিগের মঙ্গল বিধান করুন।

শ্রাদ্ধ—শ্রীমান্ লালমোহন চট্টোপাধ্যায়ের বাটী বিক্রমপুর, বজ্রযোগিনী গ্রামে। ইনি কলিকাতায় থাকিয়া অধ্যয়ন করেন। ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া ইনি উপবীত পরিত্যাগ করিয়াছেন। কয়েক দিন হইল ইঁহার পিতা পরলোক গমন করিয়াছেন; হিন্দু সমাজের আত্মীয় স্বজনগণ হিন্দুমতে শ্রাদ্ধাদি করিবার জন্য বিশেষ পীড়াপীড়ি করেন; কিন্তু গত ২৩এশ বৈশাখ তিনি নিজ গ্রামে ব্রাহ্মধর্ম্মানুসারেই পিতার আদ্যশ্রাদ্ধক্রিয়া সম্পন্ন করিয়াছেন। বাবু চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় আচার্য্যের কার্য্য করেন। পরমেশ্বর পরলোকগত আত্মাকে শান্তিদান করুন এবং শ্রীমান্ লালমোহনের প্রাণে ধর্ম্মবল বিধান করুন।

দীক্ষা-সংবাদ—মোনাই চা বাগান হইতে বাবু ক্ষেত্রনাথ নন্দী লিখিয়াছেন;—"কিছুদিন পূর্ব্বে তত্ত্বকৌমুদীতে, আমাদের সুকবি আসামী ভ্রাতা শ্রীযুক্ত কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্যের ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হওয়ার সংবাদ প্রকাশিত হয়। বিগত ১১ই বৈশাখ মোনাই চা-বাগান ব্রাহ্মসমাজে তাঁহার আর দুইটী কনিষ্ঠ ভ্রাতা, শ্রীযুক্ত সর্ব্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য ও জগন্নাথ ভট্টাচার্য্য, প্রতিজ্ঞাপত্র পাঠপূর্ব্বক যথারীতি ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছেন। এই উপলক্ষে আমাদের বন্ধু বাবু মতিলাল হালদার উপাসনার কার্য্য করেন। উপাসনা ও দীক্ষার পর, তিনি সরল ও সুমিষ্ট ভাষায় ভ্রাতৃদ্বয়কে তাঁহাদের নিজ নিজ জীবন ও ব্রাহ্মসমাজ সম্বন্ধে দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য কি তাহা সুন্দররূপে বুঝাইয়া দেন। আসামের ন্যায় শিক্ষা ও জ্ঞানালোচনা সম্বন্ধে এরূপ পশ্চাৎপদ প্রদেশে একটী সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ পরিবার, কুসংস্কারের বন্ধন ছিন্ন করিয়া, ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করিলেন, ইহা ব্রাহ্মগণের পক্ষে অত্যন্ত আনন্দের সংবাদ সন্দেহ নাই।"

বার্ষিক উৎসব—বগুড়া ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক বাবু যাদবচন্দ্র পাল লিখিয়াছেন,—বগুড়া ব্রাহ্মসমাজের সাম্বৎসরিক উৎসবোপলক্ষে কলিকাতা হইতে শ্রদ্ধেয় প্রচারক শ্রীযুক্ত বাবু শশিভূষণ বসু মহাশয় এখানে আগমন করেন। তিনি গত ৩১শে চৈত্র বুধবার এখানে পৌছেন। সেই দিন সূত্রাপুর ব্রাহ্মসমাজের সাপ্তাহিক উপাসনায় তিনি আচার্য্যের কার্য্য করেন। পর দিন ১লা বৈশাখ নববর্ষোৎসব উপলক্ষে উক্ত সমাজে দুইবেলা আচার্য্যের কার্য্য করেন। ২রা বৈশাখ আধ্যাত্মিক বিদ্যালয়ের সাম্বৎসরিক উৎসব। এই উপলক্ষে পূর্ব্বাহ্নে উপাসনা, সংগীত ও সংকীর্ত্তন হয়। প্রচারক মহাশয় উপাসনার কার্য্য করেন। অপরাহ্নে আধ্যাত্মিক তত্ত্ব সম্বন্ধে একটী বক্তৃতা করেন। উক্ত বিদ্যালয়ের ছাত্রগণও কিছু কিছু বলেন।

৩রা বৈশাখ বাবু শরদিন্দু ঘোষ মহাশয়ের বাসায় পারিবারিক উপাসনা হয়, শশী বাবু আচার্য্যের কার্য্য করেন।

৪ঠা বৈশাখ রবিবার দুইবেলা সমাজে উপাসনাদি হয়।

৫ই বৈশাখ সোমবার বাবু শ্রীমন্ত চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের বাসায় সংকীর্ত্তন ও প্রার্থনা হয়।

৬ বৈশাখ অপরাহ্নে বগুড়া ব্রাহ্মসমাজের সাম্বৎসরিক উৎসবের উদ্বোধন হয়। সেই দিন হইতে ৯ই বৈশাখ রাত্রি পর্য্যন্ত উৎসব চলিয়াছিল। উৎসবে উপাসনা, সংগীত, সংকীর্ত্তন, পাঠ, আলোচনা এবং উপদেশাদি হইয়াছিল।

৮ই বৈশাখ প্রচারক মহাশয় টম্সন্ হলে ব্যক্তিগত ও জাতিগত উন্নতি সম্বন্ধে একটী তেজস্বিনী বক্তৃতা করেন, বক্তৃতা হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল।

৯ বৈশাখ সায়ংকালে নগরসংকীর্ত্তন বাহির হয়। সংকীর্ত্তনদল বাজারে উপস্থিত হইলে শশীবাবু বক্তৃতা করেন। বক্তৃতা প্রাণস্পর্শী হইয়াছিল।

ইহা ভিন্ন গরিব বিদ্যালয়ের (Poor's Institution) "সুনীতি সঞ্চারিণী" নামক ছাত্রসভাতে "ছাত্রজীবন কিরূপ হওয়া উচিত?" এই সম্বন্ধে একটী উপদেশ পূর্ণ বক্তৃতা করেন।

১১ই বৈশাখ রবিবার দুই বেলাই শশীবাবু উপাসনা করেন। ঐ দিন অপরাহ্নে উপাসনান্তে আমাদের শ্রদ্ধেয় বন্ধু বাবু কেদারনাথ সাহা মহাশয়ের বাসায় প্রীতি ভোজন হইয়া উৎসব পরিসমাপ্ত হয়। শশীবাবুর আগমনে এখানে সকলেই বিশেষ উপকার লাভ করিয়াছেন।

উৎসব—কাকিনা ব্রাহ্মসমাজের উৎসব উপলক্ষে প্রচারক বাবু শশিভূষণ বসু তথায় গমন করেন। ১লা মে হইতে ৪ঠা

যে পর্য্যন্ত উৎসব হয়। উৎসবে তিনি আচার্য্যের কার্য্য করেন, "ধর্ম্মোন্নতি" সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা এবং আলোচনাদি করেন; বাবু অক্ষয়কুমার গুপ্ত মহাশয়ের বাটিতে সমবেত উপাসনা হয়, তাহাতে আচার্য্যের কার্য্য করেন।

দান—কাকিনার বাবু অক্ষয়কুমার গুপ্ত ॥০ এবং বাবু করুণাকুমার সেন ১৲ টাকা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রচারবিভাগে দান করিয়াছেন। দাতাদিগকে ধন্যবাদ প্রদান করা যাইতেছে।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের জন্মোৎসব—নিম্ন লিখিত প্রণালী অনুসারে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের ষোড়শ-জন্মদিনের উৎসব সম্পন্ন হইবে।

১লা জ্যৈষ্ঠ রবিবার—প্রাতে ও সন্ধ্যাকালে উপাসনা। সন্ধ্যাকালে উপাসনার পূর্ব্বে সংকীর্ত্তন হইবে।

২রা জ্যৈষ্ঠ সোমবার—পূর্ব্বাহ্ন ৬ ঘটিকার সময় সংকীর্ত্তন ৭ টার সময় উপাসনা। অপরাহ্নে শাস্ত্র পাঠ ও ধর্ম্মালোচনা। সন্ধ্যাকালে উপাসনা।

বিজ্ঞাপন।

আগামী ১৫ই ও ১৬ই জুলাই, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অধীনস্থ ব্রহ্মবিদ্যালয়ের সংশ্রবে বর্ত্তমান বৎসরের ব্রহ্মবিদ্যা বিষয়ক বার্ষিক পরীক্ষা গৃহীত হইবে। কলিকাতাস্থ পরীক্ষার্থীগণ সিটিকলেজ গৃহে এবং প্রদেশীয় পরীক্ষার্থীগণ আপন আপন স্থানে সুপরিচিত ব্রাহ্মগণের তত্ত্বাবধানে পরীক্ষিত হইবেন। যে সকল পরীক্ষার্থী ব্রহ্মবিদ্যালয়ের ছাত্র নহেন, তাঁহাদিগকে আগামী ১লা জুলাই কিম্বা তৎপূর্ব্বে বিদ্যালয়ের সম্পাদকের নিকট আবেদন করিতে হইবে। প্রত্যেক আবেদন পত্রের সঙ্গে পরীক্ষার্থীর সচ্চরিত্রতা সম্বন্ধে কোন সুপরিচিত ব্রাহ্ম বা ব্রাহ্মিকার স্বাক্ষরিত প্রশংসাপত্র পাঠাইতে হইবে। আবেদন পত্রে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি থাকা আবশ্যক:—পরীক্ষার্থীর নাম, বয়স, ব্যবসায় (ছাত্র হইলে কলেজ বা স্কুল ও শ্রেণীর নাম), ধর্ম্ম, অভিভাবকের নাম, এবং যে ব্রাহ্ম বা ব্রাহ্মিকার তত্ত্বাবধানে পরীক্ষা দিতে চান তাঁহার নাম।

পরীক্ষার বিষয়।

ENGLISH SENIOR COURSE:—Caird's *Introduction to the Philosophy of Religion*: Chaps. I—V, and Chap. VIII. *The New Testament* in English: The Four Gospels. and the *Bhagavadgita*: Chaps. I—XII.

ENGLISH JUNIOR COURSE:—Wright's *Grounds and Principles of Religion*: Chaps. I—XI; and any one of the following—(1) *The New Testament* in English: The Four Gospels, (2) The *Bhagavadgita*: Chaps. I—XII.

বাঙ্গালা উচ্চতর কোর্স্:—বাবু সীতানাথদত্ত-প্রণীত 'ব্রহ্মজিজ্ঞাসা'; পণ্ডিত অঘোরনাথ গুপ্ত-প্রণীত 'শাক্যমুনিচরিত'; ও 'ভগবদ্গীতার' বঙ্গানুবাদ, ১ম—১২শ অধ্যায়।

বাঙ্গালা নিম্নতর কোর্স্:—বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়-প্রণীত 'ধর্ম্মজিজ্ঞাসা ১ম ভাগ', প্রথম তিন বক্তৃতা; আদি ব্রাহ্মসমাজ-প্রকাশিত 'ব্রাহ্মধর্ম্মের মত ও বিশ্বাস', ৭ম—১০ম অধ্যায়; ও শ্রীযুক্ত চিরঞ্জীবশর্ম্মা-প্রণীত 'ঈশাচরিতামৃত'।

কলিকাতা,
২১০।৩।২, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট,
১৪ই মে, ১৮৯৩।

শ্রীসীতানাথ দত্ত,
ব্রহ্মবিদ্যালয়-সম্পাদক।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের আর্থিক অবস্থা বড় মন্দ, আয় অপেক্ষা ব্যয় অধিক হইয়াছে। কি প্রকারে কিছু আয় বৃদ্ধি হয়, আমরা সে বিষয়ে চিন্তা করিতেছি। ইহার সভ্য মহোদয়গণ যদি কিছু কিছু চাঁদা বৃদ্ধি করিয়া দেন, তাহা হইলে যথেষ্ট উপকার করা হয়। কিন্তু সমাজের চাঁদা এবং তত্ত্বকৌমুদী, মেসেঞ্জার ও পুস্তক হিসাবে এত টাকা বাকী পড়িয়া রহিয়াছে যে, সেই সকল বাকী আদায় করা সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য। অতএব আমাদিগের বিনীত নিবেদন এই যে, সভ্য ও গ্রাহক মহোদয়গণ অনুগ্রহ পূর্ব্বক যত শীঘ্র পারেন এই সমস্ত বাকী শোধ করিয়া এবং সমাজের আয় বৃদ্ধি সম্বন্ধে অনুরূপে বিশেষ চেষ্টা করিয়া বাধিত করিবেন।

সাঃ ব্রাঃ সমাজ কার্য্যালয়
২১১নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

শ্রীঅঘোরনাথ মুখোপাধ্যায়,
সহকারী সম্পাদক,
সাঃ ব্রাঃ সমাজ।

কলিকাতা অথবা মফঃস্বলস্থ ব্রাহ্ম পরিবার ও ছাত্রাবাসে যে সকল অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়, তাহার অনেক সংবাদ তত্ত্বকৌমুদী বা মেসেঞ্জার পত্রিকায় যথা সময়ে—এমন কি কোন কোন অনুষ্ঠান আদৌ, প্রকাশিত হয় না। অতএব আমাদিগের বিনীত নিবেদন এই যে, ব্রাহ্মসমাজ স্তম্ভে প্রকাশযোগ্য প্রত্যেক অনুষ্ঠানের সংবাদ অথবা অন্যান্য সংবাদাদি আমাদিগের পরিচারক, ও সেবকগণ এবং মফস্বলস্থ ব্রাহ্ম বন্ধুগণ যথাসময়ে প্রচারক, অনুগ্রহপূর্ব্বক নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইয়া বাধিত করিবেন।

সাঃ ব্রাঃ সমাজ কার্য্যালয়
২১১নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

শ্রীঅঘোরনাথ মুখোপাধ্যায়,
সহকারী সম্পাদক,
সাঃ ব্রাঃ সমাজ।

২১১নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, ব্রাহ্ম মিশন প্রেসে শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দত্ত কর্তৃক ৩১শে বৈশাখ মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

তত্ত্ব কৌমুদী

ধর্ম্ম ও সমাজতত্ত্ব-বিষয়ক পাক্ষিক পত্রিকা।

৪র্থ সংখ্যা। ১৬শ ভাগ।

১৬ই জ্যৈষ্ঠ, সোমবার, ১৮১৫ শক, ব্রাহ্ম সম্বৎ ৬৪।

বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২॥০
মফস্বলে ৩৲
প্রতি খণ্ডের মূল্য ৵০

প্রার্থনা।

হে ব্রাহ্মসমাজের অধিপতি, ব্রাহ্মসমাজ ত তোমারই বিধি। সংসারের তাপিত ও শোকসন্তপ্ত নরনারী ইহার আশ্রয়ে আসিয়া শান্তিলাভ করিবে, পাপের জ্বালা নির্ব্বাণ করিবে, ইহাই তোমার ইচ্ছা। তোমার এই পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্ম কাহারও নিকট নিরাশার কথা বলে না। মহাপাপীও তোমার এই প্রেমেরধর্ম্মের প্রসাদে পরিত্রাণ পাইবে। তুমি পরিত্রাতা, মুক্তিদাতা, স্বয়ং এবার পাপীর পরিত্রাণের ভার লইয়াছ! তোমার ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রসাদে অস্পৃশ্য মহাপাপীর নিকট স্বর্গের দ্বার খুলিয়া গিয়াছে। কতলোক অনন্ত নরকের ভয় দেখাইয়া গুরু ও মধ্যবর্ত্তীর চরণে আশ্রয় লইতে উপদেশ দিতেছিলেন; কিন্তু তুমি এবার পাপীর নিকটে প্রকাশিত হইয়া আশার সুমধুর বাণী শ্রবণ করাইতেছ;—"নরনারী সাধারণের সমান অধিকার, যার আছে ভক্তি, সেই পাবে মুক্তি, নাহি জাত বিচার।"

প্রভো, তুমি তোমার এই মহৎকার্য্যে সাক্ষ্য দিবার জন্য বারংবার আমাদিগকে আহ্বান করিতেছ, জগতে আশার সুসমাচার প্রচার করিতে বলিতেছ। কিন্তু আমরা তোমার কৃপার আহ্বানধ্বনি শুনিয়াও শুনিতেছি না, তোমার দয়ার বিধি ব্যবস্থা দেখিয়াও দেখিতেছি না, নিষ্ঠা ও ভক্তির সহিত তোমার পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্ম সাধন করিতে পারিতেছি না, তাই আমাদের নিরাশা ও সংশয় ঘুচিতেছে না। প্রভো, আমাদের ত অপরাধের সীমা নাই, তোমার অযাচিত করুণার দান, এই ব্রাহ্মধর্ম্ম পাইয়াও তাহার সমাদর করিলাম না, জীবনে সাধন করিলামনা, অসার বিষয় লইয়াই ব্যস্ত রহিলাম; এবং যাঁহারা তোমার দয়ার কথা শুনিয়া তোমার এই ব্রাহ্মধর্ম্ম-তরুতলে আশ্রয় লইতে আসিতেছিলেন, তাঁহাদিগের নিকট তোমার কৃপার সাক্ষ্য না দিয়া, আশার কথা না বলিয়া, কেবল নিরাশার কথা বলিয়া বলিয়া সংশয় ও নিরাশার উদয় করিলাম। জীবনের অবস্থা ও কার্য্য দ্বারা যেন বলিতেছি, তোমার দয়াতে ব্রাহ্মধর্ম্ম-সাধনে, পাপীর উদ্ধার হয় না। প্রভো, এই মহা অপরাধ হইতে উদ্ধার কর—সুমতি দেও। আশীর্ব্বাদ কর, যেন আমরা তোমার ব্রাহ্মধর্ম্ম নিষ্ঠার সহিত সাধন করিতে পারি, জীবনে তোমার করুণার সাক্ষ্য দিতে পারি। তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক।

সম্পাদকীয় মন্তব্য।

আশার কথা—আজ কাল কেহ কেহ নিরাশার কথা বলিতেছেন। এ সকল কথায় তাঁহাদের নিজের যেমন অপকার হইতেছে, তেমন অপরের জীবনেও মহা অনিষ্ট ঘটিতেছে। ১০, ১২, ১৫ বৎসর কাল যাঁহারা ব্রাহ্মসমাজের আশ্রয়ে রহিয়াছেন, তাঁহারাও আপন আপন জীবনের অভিজ্ঞতার কথা বলিয়া এই নিরাশার মাত্রা বৃদ্ধি করিতেছেন; "ব্রাহ্মসমাজে আসিয়া ঈপ্সিতবস্তু পাইলাম না, ব্রাহ্মধর্ম্ম জীবনের পাপ তাপ দূর করিতে পারিল না; এত দিন ব্রাহ্ম-সমাজে বাস করিলাম, উপাসনায় যোগ দিলাম, কত উপদেশ শুনিলাম, কিন্তু পাপ গেল না, প্রাণে শান্তি পাইলাম না।" ইত্যাদি অনেক কথা বলিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মের দ্বারা যে কিছুই হয় না, ইহাই যেন প্রমাণ করিতেছেন। কেহ গুরুর আশ্রয় লইতে উপদেশ দিতেছেন, কেহ সাধন প্রণালীর দোষ দিতেছেন, কেহ বা সংসর্গের দোষ ইত্যাদি কারণ উল্লেখ করিতেছেন।

যাঁহারা এইরূপ নিরাশার কথা বলিয়া নিজে ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছেন ও অন্যের গুরুতর অনিষ্ট করিতেছেন, তাঁহারা তাঁহাদের কার্য্যের গুরুত্ব ও দায়িত্ব কিছুমাত্র অনুভব করিতেছেন বলিয়া মনে হয় না। ব্রাহ্ম ব্রাহ্মিকা, প্রাণের দিকে চাহিয়া বল দেখি, যতদিন ব্রাহ্মসমাজে আসিয়াছ, নিষ্ঠা ও শ্রদ্ধার সহিত ব্রাহ্মধর্ম্ম সাধন করিয়াছ কি? নিজের জীবনের দিকে দৃষ্টিপাত কর, কোথায় ছিলে, করুণাময়ের অযাচিত করুণারগুণে কোথায় আসিয়াছ! যে দয়া মহাপাপের হস্ত হইতে উদ্ধার করিয়া নবজীবনের দ্বারে আনয়ন করিয়াছে, সেই করুণার বিরুদ্ধে কথা বলিতে কি জিহ্বা সঙ্কুচিত হয় না? তাঁহার দান এই ব্রাহ্মধর্ম্ম, তাঁহার বিধি এই ব্রহ্মোপাসনা। তাঁহার দয়ায় পাপীর পরিত্রাণ হয় না, এই কথা বলিবার পূর্ব্বে ব্রাহ্মের শত বার চিন্তাকরা উচিত।

জীবন দিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম সাধন করিলাম না, ইন্দ্রিয়সংযম কাহাকে বলে জানিলাম না, সংসারের ভোগ বিলাসেই সময়

কাটাইলাম, অথচ বলিতেছি "ব্রহ্মকৃপাহিকেবলম্" কথাটি অর্থশূন্য; ব্রাহ্মধর্ম্ম পাপীর উদ্ধার করিতে পারিল না!"

"বিনা দুঃখে হয় না সাধন, সেই যোগিজনার বাঞ্ছিত চরণ রে! সুখশয্যায় শুয়ে কেবা পেয়েছে কখন, সেই দেবের দুর্লভ অমূল্য রতন রে! অশ্রুপাত ক'রে বীজ কর রে বপন রে, যদি মনের আনন্দে শস্য করিবে কর্ত্তন রে।"

মানুষের নামে মিথ্যা সাক্ষ্য দিলে পৃথিবীর রাজার নিকট দণ্ড ভোগ করিতে হয়; ঈশ্বরের করুণার বিরুদ্ধে কথা বলিলে কি নিস্তার আছে? ব্রাহ্ম ব্রাহ্মিকা, নিজের শত দোষ দুর্ব্বলতার কথা বল; কিন্তু ব্রাহ্মধর্ম্ম তোমার পরিত্রাণ দিতে পারিল না, ঈশ্বরের করুণা পাপীর উদ্ধার করিতে পারিল না, এমন কথা কখনও মুখে আনিও না। ভাই বোন, আশা কর, সহিষ্ণু হইয়া তাঁহার দুয়ারে পড়িয়া থাক, নিষ্ঠা ও সহিষ্ণুতার সহিত তাঁহার উপাসনা কর, নিশ্চয় তাঁহার দর্শন পাইবে। ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবঞ্চনা নাই; তিনি যাঁহাকে আশা দিয়া আনিয়াছেন, তাঁহার প্রাণের পিপাসা মিটাইবেন। সাবধান, সংসারের ঘোলা জলে পিপাসা মিটাইয়া বসিয়া থাকিও না। তাঁহার করুণার প্রতীক্ষা কর, তোমার এই দুর্দ্দিন থাকিবে না।

সঙ্গীত ব্যবহারে সাবধানতা—ব্রহ্মসঙ্গীত অতি উপাদেয়, অতি লোভনীয় এবং অতিশয় উপকারী। ব্রহ্মোপাসনার পক্ষে সঙ্গীত এক প্রকৃষ্ট সহায় এবং মানব-মনের উপর ইহার প্রভাব অসাধারণ। এজন্য প্রায় সকল শ্রেণীর সাধকই ব্রহ্মোপাসনার সময় সঙ্গীত [illegible] থাকেন। যে সঙ্গীত সর্ব্বসাধারণের এত প্রিয় এবং এমন সাধন-সহায়, তাহারও ব্যবহারের রীতির বিকৃতিতে কেমন অনিষ্ট ফল উৎপন্ন হয়, এবং এরূপ সর্ব্বজনপ্রিয় ও কল্যাণসাধক বিষয় কেমন অকল্যাণের হেতু বলিয়া গণ্য হয়, সে বিষয়ে আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়া অতি বাঞ্ছনীয়। ব্রাহ্মগণ প্রিয় ব্রহ্মসঙ্গীতের কেমন অযথা ব্যবহার করেন, এবং তদ্রূপ ব্যবহারে কিরূপ অনিষ্টোৎপাদন হয়, তাহার আলোচনা হওয়া একান্ত আবশ্যক। সঙ্গীতের প্রকৃত ব্যবহার না হইলে যে তাহা অনিষ্টোৎপাদক হয়, তাহা আমরা সহসা বুঝিতে পারি না, এবং বুঝিতে পারি না বলিয়াই তন্নিবারণে যত্নশীল হই না। সঙ্গীতের অনুরোধে অনেক সময় অবস্থার অতিরিক্ত এমন কি প্রতিকূল ভাবযুক্ত কথাও ব্যক্ত করিতে হয়। একজন কোন বিশেষ সময়ে বিশেষ ভাবে যে বিষয় অনুভব করিয়া সঙ্গীতে তাহা প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, সর্ব্বাংশে তাহা যে অপরের প্রাণের অবস্থার সঙ্গে মিলিবে এরূপ সম্ভাবনা অল্প। হয় ত সঙ্গীতের এক অংশের সহিত প্রাণের মিল আছে এবং সেই অংশের জন্যই গানটী গাওয়া আবশ্যক হয়, কিন্তু গানের একাংশ গাইয়া অপরাংশ পরিত্যাগের রীতি প্রায় দৃষ্ট হয় না। একটী গান ধরিলে শেষ পর্য্যন্ত গাওয়াই রীতি। ইহাতে অনেক সময় দেখা যায়; যে প্রার্থনা করিবার সময় যাহা প্রার্থনা করা কখনই উচিত মনে হয় নাই, সেই গানের অনুরোধে তেমন বিষয়ও প্রার্থনা করা হয়। এরূপ ব্যবহার অজ্ঞাতসারে গানের অনুরোধে হইয়া থাকে, এবং ইহাদ্বারা যে আত্ম-প্রতারিত হইবার সম্ভাবনা আছে তাহাও জানা যায় না। অনেক সময় লোকে সহজ কথায় যাহা বলিতে পারে না, সুর তালের সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া সে সব কথা অতি সহজে ব্যক্ত করে, এবং এরূপ ব্যবহারে যে অসরলতাও, আত্মদৃষ্টির অভাব প্রকাশ পায় তাহাও বুঝিতে পারে না। ইহা দ্বারা অকারণ কাল্পনিক ভাবসকল মনের উপর আসিয়া থাকে, এবং তাহা মানুষকে অতি উচ্চ অবস্থায় উপস্থিত করিতেছে বলিয়া ভ্রান্তি জন্মায়। এজন্য সঙ্গীত করিবার সময় অতিশয় আত্ম-দৃষ্টিপরায়ণ হওয়া আবশ্যক। গানের অনুরোধে অবস্থার অতিরিক্ত ভাব প্রকাশের একটি মাত্র দৃষ্টান্ত এবং তাহার অনিষ্টের বিষয় উল্লেখ করা যাইতেছে। ঘটনাটী সত্য সুতরাং ইহাদ্বারাই প্রতীয়মান হইবে, সঙ্গীত করিবার সময় কত সাবধানতা গ্রহণ করা আবশ্যক। একটী গানের প্রথম অংশ এই যে, "আমায় অনেক দিয়াছ নাথ"; এবং এই গানের শেষ অংশে আছে যে, "তোমারে না পেলে আমি ফিরিব না ফিরিব না।" এই গানটি অতি সুন্দর, কবিত্বপূর্ণ এবং অত্যন্ত ব্যাকুল প্রাণের উক্তি। ইহার সুর এবং তাল অতি সুমধুর এজন্য গানটী গাহিতে যেমন ভাল লাগে, তেমনি প্রাণে বিশেষ তৃপ্তিলাভ হইয়া থাকে। সুতরাং এরূপ গান গাহিতে প্রবৃত্তি হওয়া অতি স্বাভাবিক। একদা মন্দিরে এই সঙ্গীতটি গীত হইতেছিল। মন্দিরে অনেক শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন, ধর্ম্মের জন্য ব্যাকুলপ্রাণ অনেক ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন; অনেকেই গানের ভাবে বিমুগ্ধ হইয়া গেলেন। গানটি শেষ হইয়া গেলে, উপাসনাও শেষ হইল এবং উপাসনান্তে যেমন প্রতিদিন সকলে গৃহে গমন করিয়া থাকেন, সেরূপ সেদিনও সকলেই চলিয়া গেলেন। কিন্তু সেদিন একটী বালিকা উপাসনায় উপস্থিত ছিল, সে নিতান্ত সরলপ্রাণা এবং তাহার অনেক শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি উপাসনাস্থলে ছিলেন, সে তাঁহাদিগকে অতিশয় সত্যনিষ্ঠ ও ব্যাকুলপ্রাণ বলিয়াই জানিত, সুতরাং সে মনে করিয়াছিল যে, ইঁহারা আজ আর ঈশ্বরকে লাভ না করিয়া ফিরিয়া যাইবেন না। কারণ গানের শেষভাগে আছে, "তোমারে না পেলে আমি ফিরিব না ফিরিব না।" সে এই মনে করিয়া চুপ করিয়া চক্ষু মুদিয়া বসিয়া আছে। কতক্ষণ পরে সে বুঝিতে পারিল যে, সকলেই চলিয়া যাইতেছেন। ইহাদ্বারা তাহার মনের অবস্থা কেমন হইল, সহজেই তাহা বুঝিতে পারা যায়। এই প্রকারে কত লোকের যে কত সদ্‌ভাব বিনষ্ট হইয়া যায়, লোকের প্রতি পূর্ব্বসঞ্চিতশ্রদ্ধা বিচলিত হইয়া তৎস্থানে অশ্রদ্ধার সঞ্চার হয়, তাহা কে বলিতে পারে। এজন্য সঙ্গীত, শুধু সঙ্গীত কেন, সকল প্রকার ভাব প্রকাশের সময়েই সাবধান হওয়া উচিত। সঙ্গীত সম্বন্ধে এত কথা বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, ইহার সুর এবং তালে মানুষকে বড়ই প্রতারিত করিয়া থাকে; আত্মহারা করিয়া ফেলে। এ সকল বিষয়ে আমরা দৃষ্টিহীন হইলে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইব।

ব্রহ্ম-বাণী—নানা বিষয়ে আসক্ত ও নানা আকর্ষণে আকৃষ্ট এবং সদা বিভ্রান্ত মানব মনের পক্ষে গন্তব্য পথ নির্ণয়

করিবার জন্য ব্রহ্মবাণী শ্রবণ করা অতি আবশ্যক। সর্ব্বতোভাবে এই ব্রহ্মবাণীর অনুসরণ করিতে প্রস্তুত না হইলে, মানবের পক্ষে কল্যাণের পথে অগ্রসর হওয়া সম্ভবপর নহে। বিশেষতঃ যাঁহারা কোন নির্দ্দিষ্ট গ্রন্থ বা মহাপুরুষের অনুবর্ত্তী হইয়া চলেন না, তাহাদের পক্ষে আত্মায় প্রকাশিত স্বর্গীয় আলোক অনুভব করা এবং ব্রহ্মবাণী শ্রবণ করা যে কতদূর আবশ্যক তাহা সহজেই অনুমিত হইতে পারে। কিন্তু এই ব্রহ্মবাণী শ্রবণ ও তাহার অনুসরণ, সরল ধর্ম্মপিপাসুর পক্ষে সহজ, ও অন্নপান-গ্রহণের ন্যায় স্বাভাবিক হইলেও সাধারণতঃ ইহা অতিশয় কঠিন এবং অতি দুর্লভ। ইহা এইজন্য কঠিন ও দুর্লভ নয়, যে ঈশ্বরের বাণী কদাচিৎ প্রকাশিত হয়, এবং সকলের নিকট তাহা প্রকাশিত হয় না। কাঠিন্য এইজন্য যে, সেই বাণী শ্রবণের জন্য মানব-মনের যেরূপ আগ্রহ ও একাগ্রতা এবং যেরূপ সরলতা ও সত্যপ্রিয়তা থাকা আবশ্যক সাধারণতঃ তাহা দৃষ্ট হয় না। আমরা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বাহ্য বিষয় সম্বন্ধেই যেরূপ গোলযোগ করি ও ভ্রমে পড়ি, তাহাতে সম্পূর্ণরূপে অতীন্দ্রিয় বিষয় ঠিকভাবে অনুভব করিতে ভুল হইবার সম্ভাবনা আরও কত অধিক। বাহ্য বিষয় অনুভব করিতেই সচরাচর কেমন ভুল হয়, সে বিষয়ে একটি গল্প আছে। একদা প্রাতঃকালে তিত্তির পক্ষীর ডাক শ্রবণ করিয়া একজন মুসলমান বলিলেন, যে এই পক্ষী বলিতেছে, "সোভান্ তেরি কুদ্রৎ।" সেই ডাক একজন হিন্দু শ্রবণ করিয়া বলিলেন "না আপনি ভুল বলিতেছেন; ও ত 'সোভান্ তেরি কুদ্রৎ' এইকথা বলে নাই; ও বলিতেছে, 'রাম, লক্ষ্মণ, দশরথ'।" তাঁহাদের দুইজনের মধ্যে যখন এবিষয়ে ঐক্য হইল না, তখন তাঁহারা নিকটস্থ এক দোকানদারকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে তিত্তির পক্ষী কি বলিতেছে। দোকানদার বলিল যে, "আপনাদের দুই জনেরই ভুল হইয়াছে; পক্ষী বলিতেছে, প্যাজ, রসুন, আদক।" প্রশ্নের মীমাংসা না হইয়া, আরও গোল বাঁধিল দেখিয়া তাঁহারা তিন জনেই আবার একজন পালোয়ানের নিকট সেই কথা জিজ্ঞাসা করিলেন; তিনি বলিলেন, "এবিষয়ে আপনারা সকলেই ভ্রমে পড়িয়াছেন, তিত্তির পক্ষী ও সব কিছুই বলিতেছে না, সে বলিতেছে 'দণ্ড, মুগুর, কসরৎ'।" এই ভাবে চারিজনে চারি প্রকার বলিলে তাঁহাদের কোন মীমাংসাই হইল না এবং উত্তরোত্তর গোলযোগ বৃদ্ধি হওয়ায় তাঁহারা ক্ষান্ত হইয়া আপনাপন সিদ্ধান্তই ঠিক মনে করিলেন। একটা সামান্য বাহ্য বিষয়েই যদি এত মতের অনৈক্য সম্ভবে, এবং আপনাপন রুচির অনুরূপ সিদ্ধান্ত হয়, তাহা হইলে অন্তরগ্রাহ্য, অন্তরেন্দ্রিয়ের উপলব্ধির বিষয়ে কত অনৈক্য ঘটিবার সম্ভাবনা। এই জন্যই দেখা যায়, ব্রহ্মের বাণী শ্রবণ; এবং তাহার অভিপ্রায় প্রকৃত রূপে অনুভব করিবার পক্ষে বিষম কাঠিন্য আছে। সচরাচর মানুষ আপনাপন পার্থিব শিক্ষা, সংস্কার, রুচি ও স্বার্থের অনুরূপ ভাবেই বাণী শ্রবণ করিয়া থাকে অথবা প্রকাশিত বাণী সেই ভাবেই গ্রহণ করিয়া থাকে। যাহা রুচি বিরুদ্ধ, বা সংস্কার বিরুদ্ধ এরূপ আদেশ শুনিবার দৃষ্টান্ত প্রায়ই দেখা যায় না। বাস্তবিক যাহারা সম্পূর্ণরূপে সরল ও উদার নহে, যাহারা সম্পূর্ণরূপে পূর্ব্বসংস্কারবর্জ্জিত নহে, যাহারা সম্পূর্ণরূপে স্বার্থ ও আত্ম-রুচি পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত ও সমর্থ নহে, তাহাদের পক্ষে ব্রহ্মবাণীর প্রকৃত তাৎপর্য্য পরিগ্রহ করা সম্ভবপর নয়। এজন্যই বিভিন্ন ব্যক্তি এবং নানা সম্প্রদায় ব্রহ্মবাণীর বিভিন্নভাব ও অর্থ ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। নিজের জন্যই যখন ব্রহ্মবাণীর প্রকৃত তাৎপর্য্য গ্রহণ এত কঠিন; যখন অতি সরল, নিঃস্বার্থ ও সম্পূর্ণ-রূপে পূর্ব্বসংস্কারবর্জ্জিত ব্যক্তি ভিন্ন অন্য কেহ ব্রহ্মবাণী শ্রবণ করিতে পারে না, তখন অপরের সম্বন্ধে বাণীশ্রবণ ও তাহার প্রকৃত তাৎপর্য্য পরিগ্রহ যে আরও কত কঠিন, তাহা সহজেই অনুভব করা যাইতে পারে। যাঁহারা এইরূপ গুরুতর কার্য্যের ভার গ্রহণ করেন, তাঁহাদের সাহসকে দুঃসাহস ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে? ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায় এবং ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকগণের মতানৈক্যের ইহাই প্রকৃত কারণ। এসকল দেখিয়া শুনিয়া ব্রাহ্মগণের সাবধান হওয়া আবশ্যক, যে তাঁহারা যেন সম্পূর্ণরূপে পূর্ব্বসংস্কার, স্বার্থ, ও রুচি বর্জ্জিত হইয়া ব্রহ্মবাণী শ্রবণের প্রয়াসী হন; এবং নিরন্তর তাহারই অপেক্ষা করেন।

জীবে দয়া—জীবে দয়া ব্রাহ্মধর্ম্মের একটি প্রধান সাধন। যিনি ভগবানের অনন্ত কৃপা স্বীয় জীবনে নিয়ত ভোগ করিতেছেন, তিনি কি প্রাণীদিগের প্রতি নিষ্ঠুর ব্যবহার করিতে পারেন? বাস্তবিক ধর্ম্মপথে যিনি যে পরিমাণে অগ্রসর হইবেন, তাঁহার হৃদয় সেই পরিমাণে দয়া ও প্রেমে পূর্ণ হইবে। সাধক ভগবানের সন্নিকটে উপস্থিত হইলে, তাঁহার সৃষ্ট জীব-দিগকে প্রাণের সহিত আলিঙ্গন না দিয়া থাকিতে পারেন না। তখন তিনি সর্ব্বজীবে সেই প্রাণরূপী, চৈতন্যরূপী পরব্রহ্মকে দর্শন করিয়া আত্মপর গণনা বিস্মৃত হইয়া যান। তখন বনের বৃক্ষ লতা পর্য্যন্ত তাঁহার আপনার হইয়া যায়। জড় ও চৈতন্য সর্ব্বপ্রকার পদার্থের মধ্যে ব্রহ্মকে দর্শন করিয়া তিনি আনন্দিত হন, এবং দুই বাহু প্রসারণ করিয়া সকলকে আলিঙ্গন করেন। এই অবস্থাই হিন্দু ঋষি এইরূপে বর্ণন করিয়াছেন:—

> অয়ং বন্ধুরয়ং নেতি গণনা ক্ষুদ্রচেতসাং
> উদারচরিতানান্তু বসুধৈব কুটুম্বকং।

অর্থাৎ, "ইনি বন্ধু, ইনি বন্ধু নহেন, এইরূপ গণনা ক্ষুদ্রচিত্ত অজ্ঞানী লোকের স্বভাব, উদারচিত্ত লোকের পক্ষে জগতের সকলেই কুটুম্ব।" বাস্তবিক ধার্ম্মিকদিগের নিকট এই সংসার স্বীয় পরিবারের ন্যায়। সমস্তই তাঁহার প্রাণপ্রিয় বস্তু। কিন্তু এখন একটি গুরুতর প্রশ্ন এই যে, যাহারা জগৎ সংসারের মধ্যে ব্রহ্মস্ফূর্ত্তি উপলব্ধি করিয়া সকলকে আপনার করিবার জন্য সাধন অবলম্বন করিয়াছেন, তাঁহারা প্রাণীবধ করিতে পারেন কি না? এস্থলে মনুষ্যবধের কথা উল্লিখিত হইতেছেনা, পশু পক্ষীর জীবন নাশের বিষয়ই আলোচ্য। বিশ্বপ্রেম লাভ করিবেন বলিয়া যখন ব্রাহ্মসাধক সাধনা অবলম্বন করিয়াছেন, তখন তাঁহার পক্ষে পশু পক্ষ্যাদির প্রাণনাশ করা বা তৎসাহায্য করা কি কর্ত্তব্য?

নিরামিষ ভোজনের পক্ষে ও বিপক্ষে বিভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্ন প্রকার যুক্তি প্রদর্শন করিয়া স্বীয় স্বীয় মত সমর্থন করিয়া থাকেন। আমরা সে সকল জটিল তর্কের কথা উত্থাপন করিতেছি না। আমাদের আলোচ্য বিষয় এই যে, একদিকে বিশ্বপ্রেম ও অপর দিকে জীবের প্রাণনাশ, এই দুই বিষয়ে সামঞ্জস্য কোথায়? সময় সময় ব্রাহ্মসমাজের বেদী হইতেও জীবে দয়া সম্বন্ধে কত উপদেশ প্রদত্ত হইয়া থাকে। এমন কি জীবে দয়া যে মুক্তির একটি অঙ্গ বিশেষ, তাহাও কোন কোন আচার্য্য প্রকাশ করিতেছেন। অথচ সাধারণতঃ আমরা দেখিতে পাই, অনেকেই জীবহত্যা করিয়া থাকেন। পশু পক্ষী মৎস্যাদির প্রাণনাশে রত থাকিলে কি রূপে সর্ব্বজীবে প্রেম-সাধন হইবে? প্রেম-সাধনের প্রথমেই জীবে দয়া অভ্যাস করিতে হয়। জীবের প্রতি দয়া করিতে অভ্যস্ত না হইলে প্রেম-সাধন কখনও হইবে না।

মহাভারতের আদি-পর্ব্বে শততম অধ্যায়ে শান্তনুর রাজ্যের বর্ণনার মধ্যে এই কথা লিখিত আছে,—"তাঁহার (শান্তনুর) শাসন সময়ে মৃগ, বরাহ প্রভৃতি পশু পক্ষীদিগের প্রতি হিংসা হইত না। তাঁহার রাজ্যে অহিংসা রূপ ব্রাহ্ম ধর্ম্ম প্রধান ছিল।" প্রাচীন কালের ব্রাহ্ম ধর্ম্মের লক্ষণের মধ্যেও জীবে দয়ার কথা স্পষ্ট উল্লিখিত হইয়াছে! জীবে দয়া সাধন না করিলে সে কালের ব্রাহ্মধর্ম্ম সাধন হইত না। আমাদের মধ্যেও এবিষয়ের বিধি ব্যবস্থা আছে। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ-প্রকাশিত পত্রিকায় ব্রাহ্মধর্ম্মের যে নয়টি মূল মত প্রকাশিত হইতেছে, তাহার ৭ম সংখ্যক মতে লিখিত আছে—The Father-hood of God and the Brother-hood of Man and kindness to all living beings ইহার অর্থ এই যে, ঈশ্বরের পিতৃত্ব স্বীকার ও মানবের ভ্রাতৃত্ব এবং সমুদয় প্রাণীদিগের প্রতি দয়া করিতে হইবে। ব্রাহ্মধর্ম্মের এই মতের সহিত জীবহত্যার সামঞ্জস্য কিরূপে রক্ষিত হইতে পারে? Kindness to all living beings এর অর্থ কি, তাহার আলোচনা হওয়া বিশেষ প্রয়োজন। এই মতের সহিত আমাদের ব্যবহারের সামঞ্জস্য আছে কি না, এবং ভগবৎপ্রেম লাভ করিতে হইলে, প্রাণীগণের প্রতি দয়ালু হওয়া কর্ত্তব্য কি না, ইত্যাদি বিষয় সকলে গভীরভাবে চিন্তা করেন, ইহা প্রার্থনীয়।

সম্পাদকীয় ও প্রাপ্ত প্রবন্ধ।

সাধনা ও করুণা।

ধর্ম্মোপদেষ্টাগণ ধর্ম্মজীবন লাভ ও ঈশ্বর লাভের জন্য এক দিকে যেমন নানা প্রকার উপায় অবলম্বন করিতে উপদেশ দিয়া থাকেন, তেমনি তাঁহারা সঙ্গে সঙ্গে বলিয়া থাকেন, এ সকল অবলম্বন করিলেই হইবে না, ঈশ্বরের করুণা ভিন্ন কেহ ধর্ম্মজীবন প্রাপ্ত হয় না, ঈশ্বর লাভের অধিকারী হয় না। তাঁহারা এক দিকে যেমন বলিয়া থাকেন, সৎগ্রন্থ পাঠ কর, সৎসঙ্গ কর, নিরন্তর আত্মদৃষ্টির সহিত আত্ম-নিগ্রহ কর, ঈশ্বরের আরাধনা, শ্রবণ, কীর্ত্তন এবং ধ্যান ধারণাতে নিযুক্ত থাক, অপর দিকে তাঁহারা সঙ্গে সঙ্গেই বলিয়া থাকেন, ইহাই যথেষ্ট নহে, ঈশ্বরের করুণা ভিন্ন কেহ ধর্ম্মজীবন পাইতে পারে না, তাঁহার অনুগ্রহ ভিন্ন কেহ তাঁহাকে লাভ করিতে পারে না। আপাততঃ এই দুই প্রকারের উক্তিকে বিরুদ্ধবৎ মনে হয়। মনে হয় যদি ঈশ্বরের অনুগ্রহ ভিন্ন ধর্ম্মজীবন লাভ না হয়, তাঁহাকে পাওয়া না যায়, তবে আর ধর্ম্মসাধন করিয়া কি ফল? সাধুসঙ্গ করিয়া, সৎগ্রন্থ সকল অধ্যয়ন করিয়া, নানা প্রকারে কষ্টকর ও পরিশ্রমজনক সাধন ভজনে প্রবৃত্ত হইয়া কি ফল? আমি যখন চেষ্টা করিয়া, পরিশ্রম করিয়া তাঁহাকে পাইতেই পারিব না, তাঁহার করুণা ভিন্ন যখন প্রকৃত জীবন লাভ হইবেই না, তখন আর এ সকল আয়োজনের কি প্রয়োজন? যখন তাঁহার অনুগ্রহ হইবে তখনই জীবন লাভ হইবে, তখনই তাঁহাকে প্রাপ্ত হইব। বৃথা কষ্টকর ব্যাপারে যাইয়া কি ফল? আপাততঃ উক্ত দুই প্রকারের উক্তিকে বিরুদ্ধবৎ মনে হইলেও বিশেষভাবে অনুসন্ধান এবং চিন্তা করিলে দেখা যাইবে, একদিকে যেমন ধর্ম্মসাধনের আবশ্যকতা আছে, অপরদিকে তেমনি ঈশ্বরের দয়া ভিন্ন তাঁহাকে পাওয়া যায় না। ধর্ম্মসাধন ও ঈশ্বরের করুণা দুই-ই আবশ্যক। উহার একটির অভাবে ধর্ম্মজীবন কখনই পাওয়া যায় না।

যাঁহারা মনে করেন, ঈশ্বর সকল সময়ে দয়া করেন না, তিনি উদাসীন; মানবের তপস্যা, স্তব স্তুতিতে সন্তুষ্ট হইয়া তবে তাঁহার প্রার্থনা পূর্ণ করেন; তিনি মানবের সুখ দুঃখের প্রতি উদাসীন হইয়া আছেন, বহু তপস্যার পর তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ করিয়া তাঁহার প্রসন্ন দৃষ্টিকে আকর্ষণ করিতে হয়, তাঁহাদের পক্ষে এ প্রশ্নের মীমাংসা করিতে অধিক আয়াস করিতে হয় না। এক কথাতেই ইহার উত্তর হয় যে, সাধন ভজন দ্বারা তাঁহার অনুগ্রহকে আকর্ষণ করিলেই মনস্কামনা সিদ্ধ হইতে পারে। এ স্থলে সাধন ও কৃপা উভয়েরই প্রয়োজন দেখা যাইতেছে। কিন্তু আমরা সেরূপ মনে করি না, আমরা বিশ্বাস করি, ঈশ্বর নিয়ত করুণাময়, নিয়ত জাগ্রত, তাঁহার প্রসন্ন-দৃষ্টি লাভের জন্য মানবের চেষ্টা যত্নের অপেক্ষা নাই। তিনি চিরপ্রসন্ন, চিরপ্রেমময়, তাঁহার সন্তানের অভাব মোচনের জন্য তাঁহার ইচ্ছার কখনও বিরাম নাই,—তাঁহার করুণাস্রোত কোনও সময়ে প্রবাহিত, কোনও সময়ে অবরুদ্ধ হয় তাহা নয়। কিন্তু তাহা সর্ব্বদাই আমাদের কল্যাণের জন্য নিয়ত প্রবাহিত। যদি তাহাই হয়, তিনি যদি নিয়ত করুণাময় এবং নিয়ত প্রসন্ন হন, তাঁহার প্রেমলাভ করিবার জন্য যদি আমাদের স্তব স্তুতির অপেক্ষা না থাকে, তবে আর সাধন ভজনের কি প্রয়োজন?

প্রয়োজন এই যে, ঈশ্বরের কৃপাস্রোত নিয়ত প্রবাহিত হইলেও, তিনি নিয়ত সহায় এবং প্রসন্ন হইলেও, নানাকারণে আমরা তাহা লাভ করিবার অধিকারী থাকি না। আমাদের মধ্যে এমন প্রতিকূলতা নিয়ত বাস করিতেছে, যাহা সেই নিয়ত প্রবাহিত করুণাস্রোতকেও আমাদের মধ্যে প্রবিষ্ট হইতে দেয় না।

যেমন, প্রবল বর্ষার সময়ও যদি কেহ উপযুক্তরূপে দেহ আবৃত করিয়া বাহিরে গমন করে, তাহা হইলে সেই বৃষ্টির ধারা তাহার পক্ষে কোন কার্য্যকর হয় না; যদি কেহ সুদৃঢ় প্রস্তর নির্ম্মিত গৃহে বাস করে, বর্ষার ধারা পতিত হওয়া না হওয়া তাহার পক্ষে দুইই সমান; যেমন রুদ্ধ দ্বার গৃহবাসীর পক্ষে সূর্য্যোদয় হওয়া না হওয়ার ইতর বিশেষ কিছুই নাই, সেইরূপ আমরা নানাপ্রকারে ঈশ্বরের দয়াকে আমাদিগের হইতে দূরে রাখিয়া থাকি, আমাদের অনিচ্ছা, আমাদের উদাসীনতা এবং আত্মপ্রভাব প্রভৃতি সর্ব্বদাই সেই করুণা হইতে আমাদিগকে বঞ্চিত রাখিতেছে। নিয়ত যে করুণা-সাগরে আমরা নিমগ্ন আছি, আমাদের এমনই স্বভাবের বিকৃতি যে, তাহাও অনুভব করিবার শক্তি আমাদের থাকে না। আমরা আমাদের মধ্যে এমন বিরুদ্ধ ভাবের সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছি, যাহা সেই প্রেমময়ের নিয়ত প্রেম প্রবাহকেও বাধা দিয়া আমাদিগকে সেই প্রেমধারা হইতে দূরে রাখে,—তাহা হইতে বঞ্চিত করে।

যতদিন না এই বিরুদ্ধভাব অপনীত হইয়া মানুষ আপনার দীনতানুভব করিতে সমর্থ হয়, যতদিন না সে প্রকৃতরূপে অকিঞ্চন হইয়া সেই করুণার প্রার্থী হয়, ততদিন সেই করুণা থাকিয়াও না থাকার মধ্যে পরিণত হয়। তাহার প্রভাব কোন কার্য্যকর হয় না। একদিকে যেমন সরল ও অকিঞ্চন না হইলে তাঁহার করুণা সম্ভোগের অধিকারী হওয়া যায় না, অপরদিকে ইহাও দৃষ্ট হয় যে, তাঁহার করুণা যেন সর্ব্বদাই অবিভক্ত অনুরাগের অপেক্ষা করে। যে হৃদয় অবিভক্ত অনুরাগের সহিত ঈশ্বর লাভের জন্য প্রয়াসী নয়, করুণা যেন সে স্থলে অভিমানীর ন্যায় প্রত্যাখ্যান করিয়া যায়। একাগ্রতাময়ী শ্রদ্ধা ভিন্ন সেই করুণা কোথাও স্থির হইয়া কার্য্য করে না। ঈশ্বর সর্ব্বদাই আমাদের সমগ্র প্রাণের প্রয়াসী, আমরা যে কতক তাঁহাকে দিব আর কতক অপরের জন্য রাখিয়া দিব, এমন শ্রদ্ধা ভক্তি তিনি চাহেন না। এজন্য প্রাণের সমগ্র অকিঞ্চন ভাব ও ঐকান্তিক ভক্তিই সেই করুণা লাভের জন্য প্রয়োগ করিতে হয়। সেই অবস্থাতেই মানবের পক্ষে ঈশ্বর লাভ সহজ ও সুসাধ্য হয়।

এই অকিঞ্চনতা ও ঐকান্তিক ভক্তি লাভের জন্য ধর্ম্ম সাধনের প্রয়োজন। মানব প্রথমেই আপনার শক্তি ও সামর্থ্যের প্রকৃত পরিচয় পায় না। সে মনে করে, আমি সাধন ভজন করিয়া আত্মচেষ্টাতেই সেই ব্রহ্মধনকে লাভ করিব। আমার তপস্যা প্রভাবেই তিনি নিকটস্থ হইবেন। যতদিন মানবের এ প্রকার জ্ঞান থাকে, ততদিন সে উপায়ের পর উপায় গ্রহণ করিতে থাকে। কিন্তু তাহার পরিজ্ঞাত এবং লোক-প্রচলিত উপায় সমূহ গ্রহণ করিয়াও যখন বিশেষ কোন সুবিধা পায় না, তখন তাহার আত্ম-শক্তির প্রতি সন্দেহ জন্মিতে থাকে; তখন আত্ম-প্রভাব এবং আত্ম সাধন-ভজনের মূল্য যে অতি সামান্য, তাহা সে বুঝিতে সমর্থ হয়। তখনই বাস্তবিক সে অকিঞ্চনতা লাভের অধিকারী হয়। মানুষ কল্পনা করিয়া, ভাবিয়া চিন্তিয়া যে এই অকিঞ্চনতা আনয়ন করিবে, তাহার সম্ভাবনা নিতান্ত অল্প। বার বার পরাস্ত হইয়া—বার বার আত্ম-শক্তির অকর্ম্মণ্যতার পরিচয় পাইলেই আত্মায় অকিঞ্চনতা আসিতে পারে—সাধক তখনই বাস্তবিক ব্যাকুলতার সহিত প্রার্থনা-পরায়ণ-চিত্তে ঈশ্বর-করুণার ভিখারী হয় এবং তাহার অপেক্ষায় জীবনধারণ করিতে থাকে এবং তখনই সেই করুণা তাহাকে চিরদিনের জন্য আশ্রয় দেয়—আলিঙ্গন করে—তখনই সে নিরাপদ অবস্থায় যাইবার উপযুক্ততা লাভ করে।

একদিকে সাধন ভজন দ্বারা যেমন আত্মশক্তির অকর্ম্মণ্যতা অসামর্থ্য অনুভব হয়, অপর দিকে তেমনি সেই করুণাময়ের জন্য ক্রমশঃ আকাঙ্ক্ষার পরিবৃদ্ধি হইতে থাকে—তাঁহার আনন্দময়সত্তা অনুভবের জন্য ব্যাকুলতা বর্দ্ধিত হইতে থাকে। তখন আর ব্রহ্ম-করুণা সেই আত্মার উপর স্বীয় প্রভাব বিস্তার করিতে বাধা প্রাপ্ত হয় না এবং তাহাকে একবারে অধিকার করিয়া বসে। সুতরাং তাহার পক্ষে প্রকৃত জীবন লাভ এবং ঈশ্বর লাভ সহজ হয়।

অতএব দেখা যাইতেছে, একদিকে যেমন তাঁহার করুণাই তাঁহাকে পাইবার পক্ষে একান্ত সহায়, আত্মচেষ্টার যেন কোনই মূল্য নাই, অপরদিকে সাধন ভজন ভিন্নও সেই করুণার আশ্রয় পাইবার সম্ভাবনা নাই। সেই নিয়ত প্রবাহিত করুণাস্রোত যাহাতে অবাধে আত্মার উপর আত্মপ্রভাব বিস্তার করিতে পারে তাহারই জন্য আত্মার অকিঞ্চনতা এবং ঐকান্তিক ভক্তির সঞ্চার হওয়া আবশ্যক। সেই অকিঞ্চনতা ও ভক্তির সমাবেশ কল্পনা বা চিন্তা দ্বারা লাভের সম্ভাবনা নাই। তাহা পাইতে হইলেই নিয়ত চেষ্টাপরায়ণ চিত্তে সাধন ভজনে প্রবৃত্ত থাকিতে হয়। আত্মশক্তির অকর্ম্মণ্যতা কেহ ভাবিয়া ভাবিয়া অনুভব করিতে পারে না এবং অবস্থায় পড়িয়া স্বীয় স্বীয় শক্তিহীনতার পরিচয় লাভ না করিলেও কেহই প্রকৃতরূপে অকিঞ্চন হইতে পারে না। এজন্য যেমন যথানিয়মে সাধন ভজন করা আবশ্যক, তেমনি সেই করুণাময়ের করুণা লাভ করা নিতান্ত প্রয়োজন। এই দুইয়ের সম্মিলনেই সাধক সিদ্ধ-মনোরথ হইয়া থাকেন।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের জন্মদিন।

(সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের ষোড়শ জন্মদিন উপলক্ষে লিখিত।)

১১ই মাঘ এদেশে ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত হয়। ২রা জ্যৈষ্ঠ অদ্যাকারদিনে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের জন্ম। সমাজ আমাদের পিতা মাতা—পিতা মাতার জন্মদিনে যেমন সন্তানগণ আনন্দ প্রকাশ করেন, আমরাও আজ তেমনিভাবে ক্ষুদ্র হৃদয়ের আনন্দ-ধারা সেই জগজ্জননীর পাদ পদ্মে অর্পণ করিব। কোন শ্রেণীর সন্তানেরা পিতা মাতার জন্মোৎসবে আনন্দ প্রকাশ করে না?—যাহারা পোষ্য-পুত্র। পোষ্য-পুত্র স্বীয় জনক জননীর সম্বন্ধে চির উদাসীন। পরন্তু তাহারা যে ধর্ম্ম পিতা মাতার কাছে লালিত পালিত হয়, তাহাদের প্রতিও তেমন অনুরাগ জন্মে না। আজ আমরা আনন্দ প্রকাশ করিব—কারণ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ আমাদের পিতা মাতা।

ধর্ম্ম জগতের ইতিহাসে দেখা যায়, মহাজনগণের অনেকেই সামান্য ভাবে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। যাঁহার প্রেম-ধর্ম্ম

জগতের নরনারী গ্রহণ করিয়া সংসারের সর্ব্ববিধ দুঃখ দুর্দ্দশা প্রশমিত করিতেছে, সেই মহাত্মা ঈশা গরিব সূত্রধরের গৃহে গোচারণ আস্তাবলে জন্ম গ্রহণ করেন। বুদ্ধ রাজপুত্র হইলেও লুম্বিনী নামক স্থানে শালবৃক্ষ মূলে জন্মিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহারা নিতান্ত দীন দুঃখীর মত জন্ম গ্রহণ করিয়াও জগতের উপর আজ পর্য্যন্ত অবিচলিত প্রভুত্ব করিতেছেন। অপরদিকে যাঁহারা জগৎকে ধর্ম্ম শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের অপেক্ষা তাঁহাদের সমকালে কত বিদ্বান, বুদ্ধিমান, জ্ঞানবান পণ্ডিত ছিলেন, যাঁহারা ক্ষুর ধারের ন্যায় তীক্ষ্ণ তর্ক যুক্তি দ্বারা বিপক্ষের মত সমূহ খণ্ডন করিয়া স্বীয় মত প্রতিষ্ঠিত করিতে সমর্থ ছিলেন; কিন্তু তাঁহাদের দ্বারা একটী লোকও জগতে পরিত্রাণের পথে অগ্রসর হয় নাই। সাধারণ লোক দ্বারাই পরমেশ্বর ধর্ম্ম বিপ্লব সংঘটন করিয়াছেন। ইহাতে প্রভু পরমেশ্বরের এই অভিপ্রায় প্রকাশ পাইতেছে যে, তিনি সাধু দৃষ্টান্ত প্রদর্শনের জন্য অতি সামান্য লোকের দ্বারাই মহৎকার্য্যাদি সম্পাদন করিয়া থাকেন। তিনি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বালু বিন্দুর সমবায়ে পর্ব্বত রচনা করেন, বিন্দু বিন্দু জল কণার সমাবেশে সমুদ্র সৃষ্টি করেন, তিনি জালজীবী, শিকারী এবং গরিবদিগের দ্বারাই পৃথিবীতে যুগপ্রলয় সম্পন্ন করিয়াছেন।

ব্রাহ্মসমাজ-সৃষ্টির ভিতরেও ঈশ্বরের এই অপূর্ব্ব লীলা নিহিত রহিয়াছে! ধনে, মানে, জ্ঞানে, প্রভুত্বে পৃথিবীর কত দেশ শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে। সে সকল স্থানে ব্রাহ্মসমাজের অভ্যুদয় না হইয়া দুর্ব্বল, অল্প-জ্ঞান, হীনতেজ বঙ্গদেশে কেন ইহার জন্ম হইল? এই খানেই প্রভুর লীলা দেখিতে পাওয়া যায়। বঙ্গদেশে ব্রাহ্মসমাজের জন্ম না হইলে প্রভুর মহত্ত্ব বাড়ে কিসে?

ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত হইল, ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারিত হইতে লাগিল; কিন্তু ইহাতে ও বিধাতার লীলা পূর্ণ হইল না। লোকে ভাবিতে লাগিল "দেশের কতকগুলি গণ্য মান্য বড় লোক একত্রিত হইয়া স্বীয় স্বীয় ক্ষমতার পরিচয় দিতেছে। বড়-লোকদিগের দ্বারাই এরূপ কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে।" তাই এবার প্রভু লীলা পূর্ণ করিলেন। পৃথিবীর মধ্যে যাহারা দুর্ব্বল, একতা-বিহীন, এবং নানাপ্রকার কুসংস্কার-রত সন্তান, তাহাদিগের প্রতি দয়া করিয়া যেমন স্বর্গের পবিত্র ধর্ম্ম প্রেরণ করিয়াছিলেন, এখন সেই দুর্ব্বলদিগের মধ্যে যাহারা বিদ্যা বুদ্ধি ও জ্ঞানে অধিকতর পশ্চাৎপদ তাহাদের দ্বারা এই নব শক্তির উৎসস্বরূপ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করিলেন। দুর্ব্বল সন্তানদিগের দ্বারা অতি মহৎ কার্য্য সম্পাদন করাই এই লীলার উদ্দেশ্য।

এই সুবিস্তৃত সুদৃশ্য ব্রহ্মমন্দির কাহাদের দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছে? কোন্ শ্রেণীর লোক এখানে সমবেত হইয়া ভগবানের নাম করিয়া থাকেন? যাহাদের ধন বল নাই, পদ বল নাই, যাহারা দেশে তেমন সুপরিচিত নহে, তাহারাই এ সমাজের আশ্রিত।

রাজপথ দিয়া কত লোক গমনাগমন করিবার কালে মন্দির দর্শন করিয়া জিজ্ঞাসা করে,—"এই কি সাধারণ সমাজের ব্রহ্মমন্দির? এত বড় মন্দির; কিন্তু এখানকার লোকদিগকে ত চিনি না। রাজপুরুষগণ বলেন,—"ইহাদিগকে ত চিনি না।" ইহারা চিরকাল অচেনাই থাকুক, প্রভুর মহিমা—প্রভুর গৌরব প্রকাশিত হউক।

আজ কোন্ শ্রেণীর লোক বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিতেছেন? যাঁহারা এ সমাজে বিধাতার হস্ত দেখিতেছেন,—ইহাকে বিধাতার লীলাক্ষেত্র ভাবিয়া ইহার আশ্রয়ে বাস করিতেছেন। আজ তাঁহারাই আনন্দ প্রকাশ করিতেছেন, যাঁহারা এ সমাজের উপাসনা প্রণালী, এ সমাজের কার্য্যপ্রণালী, নিয়মাদি প্রতিপালন করিতে পরাঙ্মুখ নহেন। অদ্য তাঁহাদেরই মুখ প্রফুল্ল, যাহারা গুরুবাদ, মধ্যবর্ত্তীবাদ, শাস্ত্রবাদ প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকারের বাধা অতিক্রম করিয়া ভগবানের সহিত সাধারণ ভূমিতে দণ্ডায়মান হইতে অভিলাষী।

কৃষ্ণের জন্মোৎসবে বৈষ্ণবের কত আনন্দ। খ্রীষ্টের জন্মদিনে অতি দরিদ্র খৃষ্টানেরও মুখের বিষাদ কালিমা বিমুক্ত হয়। অদ্য সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের জন্মদিনে ইহার আশ্রিতগণ কি তদপেক্ষা অধিকতর আনন্দ প্রকাশ করিবেন না?

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ আমাদের অতি প্রিয় বস্তু। আমাদের রক্ত দান করিয়া কি ইহার চরণ বিধৌত করিব না? ইহার সেবা করিব না? আমাদের জ্ঞান, আমাদের সাধন ভজন, আমাদের জনহিতকর কার্য্য সকলই এই সমাজ হইতে প্রসূত হইতেছে। এই মাতৃদেবীর সেবায় কি আমরা প্রত্যেকে আজীবন চেষ্টা করিব না?

মনে কি নাই বন্ধুগণ! কত রাত্রি জাগরণে যাপন করিয়াছ, কত পরিশ্রম করিয়াছ, ইহার সেবার জন্য কত উৎসাহ উদ্যম এবং সৎসাহস প্রদর্শন করিয়াছ? আজ তাহা স্মরণ কর। অবসন্ন হৃদয়ে আশা উদ্দীপ্ত হইবে।

কে আমাদিগকে এখানে আনিয়াছেন, কে একত্রিত করিয়াছেন, সাধন করাইতেছেন? আমরা বিচ্ছিন্ন, অজ্ঞাত, অপরিচিত ভাবে কোথায় পড়িয়া রহিয়াছিলাম। এই সমন্বয় কে করিলেন? ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তৃণ লইয়া কে এই ঘর বাঁধিলেন? এই মন্দির কাহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে? এ সকল কি লৌকিক ব্যাপার! এ সকল ঘটনা কি মানব-বুদ্ধি দ্বারা সম্পন্ন হইতেছে? না, সেই মহান্ পরমেশ্বরের লীলা। তিনি প্রত্যক্ষভাবে এ সমাজ পরিচালিত করিতেছেন। ব্রাহ্মধর্ম্মের মূল সত্য রক্ষার জন্য তাঁহার এই অত্যদ্ভুত লীলার বিকাশ।

বন্ধুগণ! আমরা ইহাকে ছাড়িয়া কোথায় যাইব? এই মহৎ দান উপেক্ষা করিয়া কোন্ বস্তু গ্রহণ করিব? কাঞ্চন পরিত্যাগ করিয়া কাচ গ্রহণ করিব কি? এমন দুর্ম্মতি যেন আমাদের কাহারও না হয়।

ভাই ভগিনীগণ! তোমাদের চরণে বিনীত প্রার্থনা, বর্ত্তমান যুগে পরিত্রাণের একমাত্র উপায় এই ব্রাহ্মসমাজ। আসুন, আমরা ইহার সহিত প্রাণের পূর্ণযোগ স্থাপন করি। ইহাকে পরিত্রাণের উপায় জানিয়া বিদ্যা, বুদ্ধি, ধন ও ক্ষমতা সমুদয় ইহার চরণতলে অর্পণ করি। এ সমাজ মানব রচিত নয়, পরমেশ্বরের লীলা-নিকেতন। আমরা এখানে মুক্তির জন্য

আসিয়াছি, সাংসারিক কার্য্য সিদ্ধির জন্ত আসি নাই। এ সমাজের কল্যাণোদ্দেশে দিতে পারি না, আমাদের এমন কোন্ প্রিয় বস্তু আছে? আমরা যথাসর্ব্বস্ব ইহাতে আহুতি দান করিব। তবেই ব্রহ্মকৃপা অবতীর্ণ হইবে। পরমেশ্বর আমাদিগকে শুভবুদ্ধি দান করুন।

সত্যং।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের ষোড়শ জন্মোৎসব উপলক্ষে ৭ই জ্যৈষ্ঠ রবিবার প্রাতঃকালীন উপাসনার পর শ্রীযুক্ত নবদ্বীপচন্দ্র দাস কর্ত্তৃক বিবৃত উপদেশ।

আরাধনাতে প্রধানতঃ এই কয়টি স্বরূপ সাধনের ব্যবস্থা আছে;—সত্য, জ্ঞান, অনন্ত, অখণ্ড এবং আনন্দ শান্ত মঙ্গল ও পবিত্র। সকল স্বরূপের আদি এবং ভিত্তি ভূমি সত্য স্বরূপ "সত্যং" বলিলেই প্রকাশিত, অপ্রকাশিত, মানবের জ্ঞাত অজ্ঞাত মহান্ পরমেশ্বরের সমুদয় স্বরূপ বলা হয়। সত্যের অভ্যন্তরে সমুদয় স্বরূপ নিহিত রহিয়াছে। সত্য স্বরূপ সাধন না করিলে অন্ত কোনও স্বরূপের ভাবও উপলব্ধি হইতে পারে না। অন্যান্য স্বরূপগুলি সত্য স্বরূপের অন্তরঙ্গ অঙ্গ বিশেষ।

এতদ্দেশীয় ধর্ম্মোপদেষ্টাগণ তিন শ্রেণীতে সাধকদিগকে বিভক্ত করিয়াছেন;—প্রবর্ত্তক, সাধক এবং সিদ্ধ। তাঁহারা এবিষয়টি এইরূপে ব্যক্ত করিয়াছেন;—প্রবর্ত্তক সাধক বাহ্য জগতে পরমেশ্বরের সত্তা উপলব্ধি করিতে ইচ্ছুক হন। কিন্তু তিনি কোনও স্থানে তাঁহাকে দেখিতে না পাইয়া "নেতি নেতি" "অর্থাৎ ইহা নয় ইহা নয়" বলিয়া নিরাশ হন। ঊর্দ্ধে অনন্ত আকাশে অনন্ত তারকারাজি প্রস্ফুটিত, নিম্নে সুবিশাল সমুদ্র, পর্ব্বত নদ নদী ও সুশ্যামল বৃক্ষ লতা পরিপূর্ণ বসুধা; কিন্তু ইহার কিছুই ত সত্য নয়। সকলই সৃষ্টি স্থিতি লয়ের অধীন। সাগর শুষ্ক হইয়া মরুক্ষেত্রে পরিণত হইতেছে, মরুভূমি আবার সাগর হইতেছে; উন্নতশীর্ষ পর্ব্বত সমভূমি হইতেছে, সমতল ক্ষেত্র উচ্চ পর্ব্বতের আকার ধারণ করিতেছে। অপরদিকে প্রিয়তম জনগণ এক একটি করিয়া অদৃশ্য হইতেছে। শিশু, যুবা, বৃদ্ধ সকলেই অনন্ত মরণ সাগরে ঝাঁপ দিতেছে। অদ্য যে গৃহ আনন্দ, শান্তিতে প্রফুল্ল, কল্য সে গৃহে হাহাকার ধ্বনি উত্থিত হইতেছে। যে সুখ ও সম্পদের লীলা ভূমিতে মানব এই মুহূর্ত্তে পরমানন্দে বিচরণ করিতেছে, কিছুক্ষণ পরে সে স্থান শ্মশানক্ষেত্র রূপে দর্শন করিয়া ভীতচিত্তে পশ্চাৎপদ হইতেছে। অতএব ঊর্দ্ধে অধোভাগে, চতুর্দ্দিকে জড় ও জীবজগতে নিয়ত পরিবর্ত্তনের মধ্যে অপরিবর্ত্তনীয় ধ্রুব সত্য কোথায়? অটল, অচল, অবিনাশী বস্তু কোথায়? অনিত্যের মধ্যে নিত্য অক্ষয় পুরুষ কোথায়? এবম্বিধ চিন্তা পরম্পরা দ্বারা ব্যাকুল মানবাত্মা যখন সত্যের অনুসন্ধান করিতে ইতস্ততঃ ধাবমান হয়, সেই অবস্থাকে সাধকগণ প্রবর্ত্তকের অবস্থা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

এই অবস্থা অনুসন্ধানের অবস্থা। সত্যানুসন্ধানই সাধকের মুখ্যউদ্দেশ্য। চারিদিকে অসত্য ও অস্থায়ী বস্তু দর্শন করিয়া সাধক সত্য লাভের জন্য অস্থির হইয়া উঠেন। সাধক চাহেন সত্য বস্তু— ধ্রুব বস্তু; কিন্তু দেখেন চারিদিকে কেবল অসার ও অনিত্য। এই জন্যই তিনি বলিতে থাকেন "ইহা নয়, ইহা নয়।"

বাহ্য জগতে নিরাশ হইয়া সাধক আত্মার অভ্যন্তরে প্রবেশ করেন। তখন দেখিতে পান, এক অক্ষর অবিনাশী সত্যের সহিত তিনি সংযুক্ত আছেন। এক পূর্ণ অমৃত ভাণ্ডার হইতে তিনি জ্ঞান, প্রেম, পবিত্রতা প্রভৃতি আত্মিক ভাবসমূহ প্রাপ্ত হইতেছেন। এই মহাসত্য হইতে মানবাত্মার সকল সম্পত্তি প্রসূত হইতেছে। এই চৈতন্য রূপী আদি সত্তার সহিত আত্মার নিগূঢ়যোগ দেখিয়া সাধক বলিয়া উঠেন "অস্তীতি অস্তীতি" "তিনি আছেন, তিনি আছেন।" এই যে, আমার আশ্রয়-কর্ত্তা, মূলাধার রূপে চিন্ময় পুরুষ আমারই হৃদয়ে বাস করিতেছেন।" এই অবস্থাতেই ব্রহ্মসাধক বলেন—"কোথা যাস্‌রে ভাই তার অন্বেষণে বল দেখি আমায়? যে জন ডাকতে জানে, কাতরপ্রাণে ঘরে বসে সে যে পায়"।

সাধক আত্মার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া সত্যস্বরূপের সাধনে তন্ময় হইয়া যান। এতদিন বাহ্য জগতে যাঁহার দর্শন না পাইয়া তিনি ব্যাকুল ও নিরাশচিত্তে অতিকষ্টে কাল যাপন করিতেছিলেন, এখন অন্তরে সেই দুর্লভ বস্তুর সাক্ষাৎ পাইয়া মোহিত হইলেন। এই সাধনের অবস্থা যখন পরিপক্ব হয়, যখন সত্য বস্তুর সহিত আত্মার নিগূঢ় ঘনিষ্ট যোগ হয়—যখন সংশয়, কল্পনা, ভাবুকতা তিরোহিত হইয়া উজ্জ্বল ব্রহ্মজ্ঞান বিকশিত হয়, তখন সাধকের প্রাণের অন্তস্তল ভেদ করিয়া সুমধুর ধ্বনি উত্থিত হয় "ত্বংহি ত্বংহি" তুমিই তুমিই। তখন তিনি যাহা দর্শন করেন, যাহা শ্রবণ করেন, সকলের মধ্যেই সেই প্রাণের দেবতাকে দেখিতে পান। তখন তিনি আকাশে, চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্রে এবং প্রকৃতির রমণীয় আভরণের মধ্যে তাঁহাকে দেখেন। শিশুর কোমল মুখে, ফুলের সৌন্দর্য্যে তাঁহারই সৌন্দর্য্য দেখিতে পান। সকল অস্থায়ী ও অসারের প্রাণরূপে সেই সত্যস্বরূপকে দর্শন করিয়া তিনি নিশ্চিন্ত হন, ইহাকেই সিদ্ধাবস্থা বলে। সিদ্ধাবস্থায় অন্তর বাহির এক হইয়া যায়। তখন চক্ষু মুদিত ও অমুদিত একই অবস্থা। সাধক আশ্রিত রূপে,—অনুগৃহীত রূপে, ব্রহ্ম সহবাস লাভ করেন।

কেহ কেহ বলেন;—"নাম সাধন কর, নামেতেই মুক্তি। নাম করিতে করিতে ঈশ্বরের স্বরূপ যখন প্রস্ফুটিত হইবে, তখনই আরাধনা করিবে, তৎপূর্ব্বে আরাধনা সাধনের প্রয়োজনীয়তা নাই।" কেহ কেহ বা বলেন;—"দিবানিশি ধ্যান কর, ধ্যানই অনন্ত-কালের সম্বল। আবার কেহ কেহ বলেন;—"আরাধনা সাধন কেবল ধ্যানরাজ্যে প্রবেশের জন্য। আরাধনার সহিত মানবাত্মার নিত্যকালের সম্বন্ধ নাই। ধ্যানই আত্মার লক্ষ্য। সুতরাং সাধক যখন ব্রহ্মধ্যানে তন্ময় হইয়া যান, তখন আর আরাধনার প্রয়োজন কি? অতএব সাধন করিতে করিতে এমন উচ্চাবস্থা লাভ হইবে, যখন আরাধনা সাধনের প্রয়োজন থাকিবে না।"

এমন কি এই সকল যুক্তি অবলম্বন করতঃ কেহ কেহ আরাধনা পরিত্যাগ করিয়া অন্য উপায়ে সাধন করিতেও কুণ্ঠিত হন না। কিন্তু ভগবানের কৃপায় সাধন রাজ্যের যতটুকু মর্ম্ম বুঝিয়াছি, তাহাতে ইহাই বিশ্বাস হইয়াছে যে, আরাধনা অনন্তকালের সাধন।

মানবাত্মার মধ্যে জ্ঞান, ভাব, ইচ্ছা এই তিনটি বিষয় রহিয়াছে। অনন্ত কাল এই তিনেরই উন্নতি হইবে। আত্মার অনন্ত উন্নতি শব্দের অর্থ, আত্মা জ্ঞান ভাব ইচ্ছাতে উন্নত হওয়া। এই জ্ঞান, ভাব, ইচ্ছাতে উন্নত হইতে গেলেই ভগবানের স্বরূপ সাধন অপরিহার্য্য। পরমেশ্বরের স্বরূপ সাধন ভিন্ন কখনও আত্মার এই সকল অপূর্ব্ব শক্তি প্রস্ফুটিত হইতে পারে না। অনন্ত জ্ঞান, প্রেম ও পুণ্যের আদর্শ সম্মুখে না রাখিয়া মানবাত্মা কিরূপে জ্ঞান, প্রেম, পুণ্যে অনন্ত উন্নতি লাভ করিবে? পরমেশ্বর স্বীয়রূপে যদি সাধকের নিকট অনন্ত কাল প্রকাশিত না থাকেন, তবে পথিক কোন বস্তু অবলম্বন করিয়া অনন্ত উন্নতি পথে গমন করিবে? ঈশ্বর আমাদের পরিচালক, আদর্শ এবং উন্নতিদাতা, স্বরূপ সাধনের মধ্য দিয়াই আমরা এই জ্ঞান লাভ করিয়া থাকি।

পরন্তু পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, সত্যস্বরূপের অন্তরে সমুদয় স্বরূপ নিহিত রহিয়াছে। সত্যে তন্ময় হওয়া অর্থাৎ তাঁহার উপলব্ধি করাই ধ্যানের উদ্দেশ্য। সুতরাং সমুদয় স্বরূপের আদি, সত্যস্বরূপ সাধনাই ধ্যানের লক্ষ্য। স্বরূপ সাধন ও ধ্যান বাহিরে ভিন্নার্থ বোধক হইলেও মূলে অভেদাত্মক বিষয়। যাহারা স্বরূপসাধন পরিত্যাগ করিয়া ধ্যান করিতে আরম্ভ করেন, তাঁহাদের সাধনের উদ্দেশ্য কি তাহা কেহ বুঝিতে পারে না।

সাধনের যে তিনটি অবস্থা উল্লিখিত হইল, সেই তিন অবস্থাতেই আরাধনা সাধন—সত্যের সাধন প্রয়োজনীয়। সাধক প্রথম অবস্থায় সত্যের জন্য লালায়িত হন, দ্বিতীয় অবস্থায় সত্যের সহিত পরিচিত হন, এবং তৃতীয় অর্থাৎ সিদ্ধাবস্থায় সত্যের সহিত যুক্ত হন, তখন তাঁহার সত্যের ভোগ হয়। সুতরাং সাধকের আধ্যাত্মিক উচ্চাবস্থার সঙ্গে সঙ্গে আরাধনার মূলমন্ত্রগুলি পরিবর্ত্তিত হয় না। "তুমি সত্য, তুমি জ্ঞান, তুমি প্রেম, তুমি পুণ্য" ইত্যাদি সাধন অনন্ত কালের সঙ্গী। তবে অধিকারী ভেদে উপলব্ধির তারতম্য হয় মাত্র। কেহ সত্য কি তাহা জানিবার জন্য ব্যাকুল, কেহ সত্য বস্তু জানিয়া আনন্দিত, কেহ বা সত্যস্বরূপের সম্ভোগে শান্তিপ্রাপ্ত। কিন্তু উচ্চ ও নীচ সকল শ্রেণীর সাধকই সত্যের সাধন করিবেন, নতুবা লক্ষ্যভ্রষ্ট তরণীর ন্যায় বিপথগামী হইতে হইবে।

সত্য স্বরূপসাগরে নিমগ্ন হইলে দেখা যায়, আরাধনা অমৃত রাজ্য বিশেষ। ইহার প্রতি স্বরূপে মধুচক্র রচিত। পিপাসিত মনভৃঙ্গ অনন্তকাল পান করিলেও অমৃত ভাণ্ডারের পরিসমাপ্ত হইবে না। মানবাত্মার অনন্ত আকাঙ্ক্ষার নিকট ভগবানের পূর্ণ স্বরূপগুলিই উপযুক্ত প্রলোভনীয় বস্তু। সুতরাং সত্যস্বরূপের সাধন—স্বরূপ সাধন পরিত্যাগ করিয়া অন্যবিধ সাধন অস্বাভাবিক। সেরূপ কোনও সাধনে কখনও সাধকের প্রাণের আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত হইবে না। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, এই অমূল্য ধন প্রাপ্ত হইয়াও আমরা সমুচিতরূপে ব্যবহার করিতে পারিতেছি না। অদ্য সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের জন্মোৎসবের পূর্ব্বদিনে আমরা সকলে এই বিষয়টি বিশেষভাবে স্মরণ করি যে, পরমেশ্বরের অযাচিত কৃপাগুণে বর্ত্তমান সাধন প্রণালী আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। জাতিভেদ ও নানাপ্রকার পাপমোহাচ্ছন্ন দেশে সত্যের সাধন করিবার জন্য পরমেশ্বর এই দুর্ব্বল দীন সন্তানদিগকে আহ্বান করিয়াছেন। যাঁহারা এই সাধন প্রণালীকে পরিত্রাণের উপায় বলিয়া বিশ্বাস করিবেন, তাঁহারাই পরমেশ্বরের আশীর্ব্বাদ প্রাপ্ত হইবেন। সত্যের সাধন করা—আরাধনাসাধনা করা—তাঁহারই আদেশ। আমরা এই আদেশ শিরোধার্য্য পূর্ব্বক যেন এই সাধনে নিয়োজিত থাকি। সত্যস্বরূপ পরমেশ্বর আমাদিগকে কৃপা করুন, আমরা যেন প্রকৃত সত্য লাভ করিতে সমর্থ হই।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ ও তাহার কার্য্য।

(বিগত ১লা জ্যৈষ্ঠ রবিবার সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের জন্মোৎসব উপলক্ষে শ্রীযুক্ত শশিভূষণ বসু কর্ত্তৃক মন্দিরে বিবৃত উপদেশ।)

আগামী কল্য আমাদের প্রিয় সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের জন্ম দিন। আমাদের সকলেরই বড় আনন্দের দিন। এ সময় প্রাণ খুলিয়া দুই একটী কথা বলিতে ইচ্ছা হইতেছে। শুনিয়াছি জর্ম্মণীর মহাত্মা মার্টিন লুথারের সমাধির উপর প্রশ্নোত্তর ছলে এই কয়েকটী কথা লিখিত আছে;—

Is it mans? It shall fade away.

Is it God's? It shall stand for ever.

ইহা কি মানবের? তাহা হইলে ইহা ধ্বংস হইয়া যাইবে। ইহা কি মহান্ পরমেশ্বরের? তাহা হইলে ইহা চিরদিন স্থায়ী হইবে।

আজ, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের দ্বারে দাঁড়াইয়া অনেকেই এই প্রশ্ন করিতে পারেন যে, "ইহা মানবের, না, সেই মহান্ পরমেশ্বরের?" এই পঞ্চদশ বৎসরের কার্য্যপ্রণালী জ্বলন্ত সাক্ষ্য দিতেছে যে, ইহা তাঁহারই দান।

আমরা সকলেই জানি যে, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ নিয়মতন্ত্র প্রণালী প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন। আজ কাল প্রায় সমস্ত সুসভ্য জগতেই রাজনৈতিক ও অন্যান্য বিভাগে নিয়মতন্ত্রপ্রণালী প্রবর্ত্তিত হইতেছে। রাজনৈতিক বিভাগের বড় বড় লোকেরা সাধারণ নিয়মতন্ত্রে লোকদিগকে শিক্ষিত করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন। আমেরিকা মহাদেশে সাধারণতন্ত্র অথবা নিয়মতন্ত্র প্রবর্ত্তিত হওয়ায় অশেষ কল্যাণ হইয়াছে। ইংলণ্ড দেশের বড় লোকেরা এক্ষণে রাজার পরিবর্ত্তে প্রজাতন্ত্র প্রণালী প্রবর্ত্তনের জন্য উৎসুক হইয়াছেন। পরমেশ্বর মানবকে স্বাধীন করিয়াছেন। তিনি তাহাকে জগতে প্রেরণ করিবার সময় তাহার হৃদয় ভূমিতে উজ্জ্বল অক্ষরে এই কথা লিখিয়া দিয়াছেন। "ওরে মানব তুই অভ্রান্ত শাস্ত্র কিম্বা অভ্রান্ত গুরুর কথা শুনিয়া চলিস্ নে।" স্বাধীনতাতেই সুখ, ইহাতেই মানবের তৃপ্তি ও আনন্দ।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজও সেই নিয়মতন্ত্রপ্রণালী ধর্ম্মসমাজে প্রবর্ত্তিত করিতে যত্নবান্ হইয়াছেন। নিয়মতন্ত্রপ্রণালী কি? এক সাধারণ নিয়মে লোকদিগকে পরিচালিত করা। অগাধ বারিধি-গর্ভে যেমন বৃহৎ তিমিও থাকে এবং ক্ষুদ্র মৎস্যও থাকে, উভয়েই আনন্দ-মনে সঞ্চরণ করে;—যেমন নীল আকাশে বৃহৎ বাজপক্ষী ও চকোর উভয়েই পক্ষ বিস্তার করিয়া মুক্তভাবে উড়িয়া বেড়ায়, এই নিয়মতন্ত্র প্রণালীতে সেইরূপ সকলে সমীন-ভাবে কার্য্য করিতে পারে। ইহাদ্বারা নরনারীর মনের ভাব বিকশিত হয়। ইহাতে মানব মনের শক্তির বিকাশ হয়। ইহা বর্ত্তমান সময়ে পরমেশ্বরের প্রত্যক্ষ বিধান।

যিনি সামান্য লোক, তাঁহারও যদি গুণ থাকে, তিনিও এখানে এক বৎসর, না হয় দুই বৎসর, না হয় দশ বৎসর পরে আপনার ক্ষমতানুসারে যোগ্য স্থান প্রাপ্ত হইবেন। এই প্রণালীতে মানবের প্রকৃত কল্যাণ হয়। রাজনৈতিক বিভাগে আমরা দেখিয়াছি, যেখানে রাজারই প্রতাপে দেশ শাসিত হয়, সেখানে কোন লোক মাথা তুলিতে চেষ্টা করিলে রাজা তাহার মস্তক টিপিয়া ধরেন। নিয়মতন্ত্র অথবা সাধারণ তন্ত্র সেরূপ নহে। ইহাতে বালক, যুবা, যুবতী, প্রবীণ ও প্রবীণার সকলের যথাযোগ্য অধিকার।

দ্বিতীয়তঃ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ ধর্ম্মের জটিলভাব হইতে জন-সমাজকে রক্ষা করিবার জন্য বিধিমতে চেষ্টা করিয়াছেন। এই ভারতে ধর্ম্মের এমন সকল প্রণালী ও এমন সকল কথা আছে, যাহার মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করা বড় কঠিন ব্যাপার। সে সকল এত জটিল যে, ঠিক জিলিপির পাকের ন্যায় বোধ হয়। অনেক কথার প্রকৃত তাৎপর্য্য বুঝিতে হইলে ধর্ম্মের অভিধান হস্তে করিয়া বেড়াইতে হয়। ধর্ম্মের এইরূপ জটিল ও কুটিল ভাবে ভারতের সমূহ অনিষ্ট হইয়াছে। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ এই প্রচার করি-য়াছেন যে, সরল ভাবে ডাকিলেই পরমেশ্বরকে লাভ [illegible] যায়। ছোট ছেলে যেমন তাহার পিতাকে পিতা বলিয়া সম্বোধন করে, ছোট বালক যেমন ক্ষুধার সময় জননীর অঞ্চল ধরিয়া খাবার প্রার্থনা করে; তৃষ্ণার সময় মানব যেমন জল-পান করে—তাহার মধ্যে যেমন কোন কৃত্রিমতা নাই, সেইরূপ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ ও এই শিক্ষা দিতেছেন যে, "সরল প্রার্থনাই মুক্তির পরম সাধন।"

যাঁহারা অন্যান্য গুরু ও শাস্ত্রের আদেশে চলিতে চান, তাঁহা-দের এ সংসারে অনেক বিপদ ঘটিয়া থাকে। তাঁহাদের সেই দশা হয়, যেমন এক জাহাজের নাবিকেরা জাহাজস্থিত কম্পা-সের নিকটে কাপ্তেনের মৃত্যুতে তৎক্ষণাৎ সেই দিগ্দর্শন শলা-কার গতি পেরেক দিয়া রুদ্ধ করিয়া দিয়াছিল, এবং সেই গতি-হীন যন্ত্রের অনুসারে চলিয়া অবশেষে বিপাকে পড়িয়াছিল। সেইরূপ যাহারা এ সংসারে জীবন-তরি চালাইতে যায়, তাহা-দেরও পদে পদে ঐ অজ্ঞ নাবিকদিগের দশা ঘটিয়া থাকে। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ বিশেষভাবে এই কয়েক বৎসর এই শিক্ষা দিতেছেন যে, সরলভাবে পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা করা, তাঁহার ধ্যান করা ইহাই ব্রাহ্মধর্ম্মের আদেশ।

আমাদের উপাসনা-প্রণালীর ন্যায় উৎকৃষ্ট উপাসনা-প্রণালী আর কখন পৃথিবীতে হয় নাই। এই প্রণালীমত সাধন করিলে মানবের জীবন গঠিত হয় এবং পরিত্রাণ হয়। কে বলে এ সাধনে উপকার হয় না? আমরা অনেকেই শুনিয়াছি, মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথ, যখন "সত্যম্" বলেন, তখন তাঁহার সমস্ত শরীরের রোম সকল খাড়া হইয়া উঠে। "সত্যম্, জ্ঞানম্" বলিয়াই ভারতের ঋষিরা নির্জ্জনে ও গিরি শিখরে বসিয়া সেই মহান্ পরমেশ্বরের বন্দনা করিয়া অপার আনন্দ সম্ভোগ করিয়া গিয়াছেন।

তৃতীয়তঃ সকল প্রকার সামাজিক উন্নতি সাধনে তৎপরতা। এই কয়েক বৎসরের মধ্যে আমাদের প্রিয় সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ সামাজিক উন্নতি বিষয়ে পরমেশ্বরের কৃপায় অনেক পরিমাণে অগ্রসর হইতে সমর্থ হইয়াছেন। সামাজিক উন্নতি ধর্ম্মের একটি প্রধান অঙ্গ। এই কয়েক বৎসরে যে সকল সাধু কার্য্যের অনুষ্ঠান হইয়াছে, তাহাতে আমাদের প্রাণে অত্যন্ত আনন্দ হইয়াছে। সামাজিক উন্নতি সম্বন্ধে অনেক কার্য্য প্রত্যক্ষভাবে সমাজ হইতে না হইলেও ইহার সুযোগ্য সভ্যদিগের দ্বারা সম্পাদিত হইয়াছে ও হইতেছে। ইহাতে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের জয় চারিদিকে ঘোষিত হইতেছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ আমাদের একখানি বাঙ্গালা সাপ্তাহিক পত্রিকার নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। কয়েকজন সুযোগ্য সভ্যের দ্বারা ইহা পরিচালিত হই-তেছে। এই পত্রিকা দেশে বিদেশে প্রচারিত হইয়া অনেক মঙ্গল সাধন করিতেছে, এবং রাজনৈতিক বিভাগে ঘোর আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছে। দীন দরিদ্র কুলীদের উপর যাহারা নৃশংস ব্যবহার করে, তাহাদিগকে দমন করিতে এই পত্রিকাই কিয়ৎপরিমাণে সক্ষম হইয়াছে। এই পত্রিকা দীন দুঃখিদের পিতা মাতা হইয়া নানারূপে দেশের অনেক হিতসাধন করিতেছে।

রমণীদিগের বিষয়েও এখানে কিছু বলা আবশ্যক। কয়েক বৎসরে রমণীদিগের অনেক বিষয়ে উন্নতি লক্ষিত হইয়াছে। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ রমণীদিগকে স্বাধী-নতা ও শিক্ষা দানে তৎপর হইয়াছেন। আরিষ্টটল বলিয়াছিলেন যে, রমণীদিগের আত্মা নাই, তিনি যদি আজ জীবিত থাকিতেন, তাহা হইলে দেখিতেন, ভারতে রমণীদিগের দ্বারা কত কার্য্য সম্পাদিত হইতেছে। রমণীরা জ্ঞানে ও ধর্ম্মে কত উন্নতি লাভ করিতেছেন। আমাদের আদর্শ অতি উচ্চ। যদিও অনেক বিষয়ে আমাদের দুর্ব্বলতা আছে, কিন্তু এই উচ্চ আদর্শ অনুসারে আমরা চলিতে অভিলাষী হইয়াছি, এবং জগতের নিকট এই সুন্দর আদর্শ ধরিতে প্রস্তুত হইয়াছি। জ্ঞান, প্রেম, কার্য্যের সামঞ্জস্য করাই আমাদের উদ্দেশ্য। রাজনীতি, সমাজ, বিজ্ঞান এবং দর্শন সকলেরই উন্নতি করা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের আর একটি প্রধান কার্য্য এই, সত্য ও চরিত্রকে আদর করা। আমরা ধ্যানকে আদর করি, কিন্তু যদি দেখি, এক ব্যক্তি পাঁচ ঘণ্টা ধ্যান করে, অথচ তাহার চরিত্র হীন, তাহার সত্যানুরাগ নাই—সে ব্যক্তি সমাজের ভয়ে ভীত—তাহা হইলে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ সেরূপ ধ্যানের কোন মূল্য দেন না। আমরা ধ্যানের সঙ্গে সঙ্গে ধ্যানীর চরিত্র দেখিতে

চাই, সত্যানুরাগ দেখিতে চাই। সত্যের প্রভাব বিস্তার করাই সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের এক প্রধান লক্ষণ। এই কয়েক বৎসরের মধ্যে অনেক বালক কাহারও কথা না শুনিয়া এবং সমাজের ভয়ে ভীত না হইয়া উপবীত পরিত্যাগ করিয়াছেন। অনেক পুরুষ ও রমণী স্বার্থত্যাগের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন। কত যুবাপুরুষ উৎসাহের সহিত এখানে যোগদান করিয়াছেন। যাঁহাদের আনন্দযুক্ত বদন দেখিলে প্রাণ আনন্দে পূর্ণ হয়।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের পুত্র কন্যাগণ, শুভাকাঙ্ক্ষী ও শুভাকাঙ্ক্ষিণীগণ! আপনাদের নিকট এই বিনীত প্রার্থনা যে, আপনারা পরমেশ্বরের উপর নির্ভর করিয়া দেশে বিদেশে মহান্ পরমেশ্বরের জয় ঘোষণা করুন। মহাত্মা ঈশা বলিয়াছিলেন, "Let your light so shine before men, that they may See your good works, and glorify your Father which is in Heaven. ইহার ভাব এই, জীবনের জ্যোতি চারিদিকে বিস্তার কর তাহা হইলে লোকে তোমাদের কার্য্য দর্শন করিয়া সেই পরমেশ্বরের জয় ঘোষণা করিবে। বন্ধুগণ ভগ্নীগণ সেই মহান পরমেশ্বরের নাম চারিদিকে ঘোষণা কর। ব্রাহ্মসমাজ ভিন্ন নরনারীর আর পরিত্রাণের পথ নাই। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের উচ্চ আদর্শ আমরা সকল স্থানে ধরিব। বন্ধুগণ! ইহা মানবের, না সেই মহান্ পরমেশ্বরের? ইহা সেই মহান্ পরমেশ্বরেরই দান। ইহা দ্বারা দেশের কল্যাণ হইবে এবং জগতের মঙ্গল হইবে।

পঞ্জাব-প্রচার-যাত্রীদিগের পত্র।

আমরা ৪ঠা মে ঝান্সী পৌছি। এখানে কতিপয় বাঙ্গালী ভদ্রলোকের যত্নে একটি প্রার্থনাসমাজ স্থাপিত হইয়াছে। এই প্রার্থনা সমাজের সম্পাদক মহাশয় আমাদিগকে আহ্বান করেন। সমাজের কয়েক জন সভ্য আমাদিগকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য ষ্টেশনে উপস্থিত ছিলেন। বাবু মহেন্দ্রনাথ দাস মহাশয়ের গৃহে আমরা অবস্থিতি করি।

৫ই মে—অপরাহ্নে মহেন্দ্র বাবুর গৃহে সঙ্গীত, সংকীর্ত্তন এবং প্রার্থনাদি হয়। শাস্ত্রী মহাশয় উপনিষদের শ্লোক অবলম্বন করিয়া উপদেশ দেন। উপদেশ এরূপ প্রাণস্পর্শী হইয়াছিল যে, কেহ কেহ অশ্রু সংবরণ করিতে পারেন নাই।

৬ই মে—অপরাহ্নে মারহাট্টা স্কুল গৃহের প্রাঙ্গণে এক প্রকাশ্য সভা হয়। ইংরাজ, পার্শী, মারহাট্টা, হিন্দুস্থানী, বাঙ্গালী প্রভৃতি নানা শ্রেণীর প্রায় তিন শত লোক সভায় উপস্থিত ছিলেন। প্রথমতঃ একটি হিন্দি সঙ্গীত হয়, তৎপর শ্রীযুক্ত সুন্দর সিংহ ও প্রকাশ দেব উর্দ্দু ভাষায় সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা করেন। সুন্দর সিংহের বক্তৃতার সার মর্ম্ম—"ধর্ম্ম প্রবৃত্তি মানবের স্বাভাবিক। যেমন ক্ষুৎপিপাসা শরীরের পক্ষে, তেমন ধর্ম্মপিপাসা আত্মার পক্ষে স্বাভাবিক। সুতরাং ধর্ম্মলাভ করিবার জন্য কোনও অভ্রান্ত গ্রন্থ বা গুরুর প্রয়োজন হয় না। আত্মা স্বভাবতই ধর্ম্মের জন্য ব্যাকুল, পরমেশ্বর গুরু ও উপদেষ্টা হইয়া সেই ব্যাকুল, তৃষিত আত্মাতে ধর্ম্মবারি প্রদান করেন।" বক্তা কয়েকটি দৃষ্টান্ত দ্বারা সংক্ষেপে এবিষয়টি সুন্দররূপে বর্ণন করেন। শ্রীযুক্ত প্রকাশ দেবের বক্তৃতার স্থূলমর্ম্ম এই;—"যে ধর্ম্ম মানুষকে নবজীবন দিতে পারে না, তাহা প্রকৃত ধর্ম্ম নহে। কেবল ধর্ম্মের উচ্চ মত মানিলে কোন ফল হয় না। বেদ, বাইবেল, কোরাণ প্রভৃতি গ্রন্থে উচ্চ সত্য নিহিত আছে; তাহাতে আমার কি? আমার জীবনে যদি সত্য প্রতিফলিত না হইল, তবে উচ্চ তত্ত্ব কণ্ঠস্থ করিয়া কি ফল হইবে? আমাদের দেশে কত লোক শাস্ত্রে বিশ্বাস করিয়া ধর্ম্মের নানা প্রকার বাহ্য অনুষ্ঠান—কৃচ্ছ্র সাধন ইত্যাদি করিয়া থাকে। কিন্তু তাহাদের জীবন দেখিলে ধর্ম্মের প্রতি লোকের অবিশ্বাস জন্মিয়া যায়। এমনই অসত্য, দুষ্ক্রিয়া পাপাচরণে তাহাদের জীবন পূর্ণ অতএব আমাদিগকে সত্যে প্রতিষ্ঠিত হইতে হইবে। ধর্ম্ম এবং ব্যবহারিক জীবন একরূপ না হইলে নবজীবন লাভ করা যায় না। ব্রাহ্মধর্ম্ম নবজীবন দিবার জন্য আসিয়াছে। কার্য্য ও বাক্যে সম্পূর্ণরূপে সত্যে প্রতিষ্ঠিত হওয়াই ব্রাহ্মধর্ম্ম সাধন। ঈশ্বর করুন এ ধর্ম্ম জীবনে অবতীর্ণ হউক।"

তৎপর শাস্ত্রী মহাশয় ইংরাজীতে বক্তৃতা করেন। বক্তৃতার সার মর্ম্ম এই, "পৃথিবীতে সভ্যতার এই উন্নতির দিনে সংকীর্ণ ধর্ম্ম তিষ্ঠিতে পারিবে না। যতই শিক্ষার বিস্তার হইতেছে, ততই লোকের ধর্ম্মান্ধতা চলিয়া যাইতেছে। ধর্ম্ম-বিশ্বাস, গ্রন্থ, তীর্থ স্থান ও ব্যক্তি বিশেষকে অতিক্রম করিয়া এক বিশ্বজনীন উদারাকার দিকে ছুটিতেছে। এমন সময় আসিবে, যখন লোকে সেই বিশ্বজনীন উদার ধর্ম্মের ছায়াতে আসিয়া বিশ্রাম লাভ করিবে। এই ধর্ম্ম কোন জাতি বিশেষের নহে, কিন্তু সকল জাতিরই পরিত্রাণের ধর্ম্ম হইবে। এ ধর্ম্মের ঈশ্বরের প্রকাশ (revealation) একটি লক্ষণ, কিন্তু কোন গ্রন্থ বিশেষে ইহা আবদ্ধ নহে। এ ধর্ম্মে মানবাত্মায় ঈশ্বরের প্রকাশ হয় ইহাও একটি লক্ষণ; কিন্তু কোন ব্যক্তি বিশেষে ও সময় বিশেষে আবদ্ধ থাকিবে না। উদারতা, ঈশ্বরের পিতৃত্ব, মানবের ভ্রাতৃত্ব ইহার অন্যবিধ লক্ষণ। আধ্যাত্মিকতা এই ধর্ম্মের স্বরূপ। ব্রাহ্মধর্ম্মই এই উদার বিশ্বজনীন ধর্ম্ম।" বক্তা নানারূপ দৃষ্টান্ত দ্বারা এ বিষয়টি অতি উজ্জ্বলরূপে প্রকাশ করেন। বক্তৃতা অতি সারগর্ভ ও প্রাণস্পর্শী হইয়াছিল। বক্তৃতান্তে মিঃ সোরাবজী বাইরামজী নামক একজন সম্ভ্রান্ত পার্শী ইংরাজিতে বলিলেন, "আমরা ধর্ম্মের বাহ্যাড়ম্বরের মধ্যে বাস করিতেছি, ধর্ম্মের নানারূপ অনুষ্ঠান করিয়াও ঈশ্বর হইতে অনেক দূরে রহিয়াছি। আমাদের মধ্যে কত অন্যায় রহিয়াছে। বাস্তবিক আমরা প্রকৃত ধর্ম্ম হইতে অনেক দূরে। এই অন্ধকারের মধ্যে শ্রদ্ধাস্পদ শাস্ত্রী মহাশয় ও অপর বক্তাদ্বয় যে প্রকৃত ধর্ম্মের সুসংবাদ আমাদের নিকট প্রচার করিলেন এজন্য ইঁহাদিগকে ও ব্রাহ্মসমাজকে এই সভার পক্ষ হইতে আমি অন্তরের সহিত ধন্যবাদ প্রদান করি। আর ইঁহাদের নিকট প্রার্থনা এই যে, ইঁহারা যেন আমাদিগকে বিস্মৃত হইয়া না যান, যেমন অনুগ্রহ পূর্ব্বক ইঁহারা আমাদিগকে ব্রাহ্মধর্ম্মের সুসংবাদ শ্রবণ করাইলেন; যেন এরূপ মধ্যে মধ্যে আসিয়া আমাদিগকে উপকৃত করেন।" তৎপর

স্থানীয় প্রার্থনা সমাজের পক্ষ হইতে বাবু যদুনাথ চক্রবর্ত্তী ধন্যবাদ প্রদান করেন। অবশেষে আর একটী হিন্দী সঙ্গীত হইলে সভা ভঙ্গ হয়।

তৎপর দিবস প্রাতে শ্রীযুক্ত গিরীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী নামক একজন প্রাচীন হিন্দু আমাদিগকে তাঁহার গৃহে আহ্বান করেন। তথায় উপাসনা ও উপদেশ এবং কীর্ত্তনাদি হয়। শাস্ত্রী মহাশয় আচার্য্যের কার্য্য করেন। তথায় প্রায় ২৫ জন বাঙ্গালী উপস্থিত ছিলেন।

উপরোক্ত যদুনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের যত্নে এখানে একটি অনাথালয় স্থাপিত হইয়াছে। ইহা কিয়ৎপরিমাণে আমাদের দাসাশ্রমের অনুরূপ। এখানে আপাততঃ ১৫টি রোগী আশ্রয় পাইয়াছে। বেতন ভোগী ভৃত্যগণ ইহাদের সেবা শুশ্রূষা করিয়া থাকে। যদুবাবু স্বয়ং ইহার তত্ত্বাবধান করেন। যদুবাবুর বয়স ৮০ বৎসর, তিনি গভর্ণমেণ্ট হইতে পেন্সন পান। তিনি যদিও বৃদ্ধ, কিন্তু তিনি নিদ্রা বা উপবেশনে—আলস্যে দিন কর্ত্তন করেন না। তাঁহার সমুদয় সময় নানারূপ জনহিতকর কার্য্যে ব্যয়িত হয়। তাঁহার শরীর ও মনের সুস্থতা, কার্য্যোৎসাহ, শ্রমশীলতা এবং সহৃদয়তা অনুকরণীয়। যদুবাবু আমাদিগকে তাঁহার অনাথালয় দর্শন করিতে আহ্বান করেন। আমরা উপাসনান্তে তথায় যাই। মিঃ সোরাবজি এবং আর কয়েক জন বাঙ্গালী ও হিন্দুস্থানীও গমন করেন। রোগিগণ এক স্থানে মিলিত হইলে তাহাদিগকে সঙ্গীত ও বাদ্য শ্রবণ করান হয়। পরে শ্রীযুক্ত সুন্দর সিংহ সরল উর্দ্দু ভাষায় কিছু ধর্ম্মোপদেশ দেন।

ইহাদের প্রকৃতি অতি সরল, আগ্রহের সহিত ইহারা উপদেশ শ্রবণ করিল। যদু বাবু ইহাদের জন্য নানারূপ ফল ও মিষ্টান্ন আনিয়া রাখিয়াছিলেন, পরিশেষে তাহা ইহাদিগকে প্রচুর পরিমাণে বিতরণ করা হয়। যাহাদের সংসারে কেহ নাই, তাহারা এরূপ সস্নেহ ব্যবহার প্রাপ্ত হইতেছে, এ দৃশ্য আমাদের দেশে নূতন। ভগবান করুন, এরূপ সাধু-কার্য্যের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি প্রাপ্তি হউক।

অপরাহ্নে যদু বাবুর গৃহে পাঠ, ব্যাখ্যা, প্রার্থনা ও সঙ্গীত কীর্ত্তনাদি হয়। শাস্ত্রী মহাশয় আচার্য্যের কার্য্য করেন। প্রায় ৪০ জন ভদ্রলোক ও ১২ জন মহিলা উপস্থিত ছিলেন। অদ্যকার সম্মিলন প্রধানতঃ মহিলাদিগের জন্যই হইয়াছিল। উপদেশ, প্রার্থনা ও সংকীর্ত্তনাদি অতি সরস হইয়াছিল। আমাদের ঝান্সীর কার্য্য এবার এখানেই শেষ হইল। ভগবানের কৃপায় এখানে একটা নূতন ভাবের উদয় হইয়াছে। এখানে অনেকেই ব্রাহ্মধর্ম্ম ও ব্রাহ্মসমাজ সম্বন্ধে প্রায় কিছু জানিতেন না। তাঁহাদের দৃষ্টি ব্রাহ্মসমাজের দিকে আকৃষ্ট হইয়াছে। কেহ কেহ আমাদের কাগজের গ্রাহক হইয়াছেন ও ব্রাহ্মধর্ম্ম বিষয়ক পুস্তকাদি ক্রয় করিয়াছেন এবং সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াছেন। (ক্রমশঃ)

ব্রাহ্মসমাজ।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের ষোড়শ জন্মোৎসব—সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের ষোড়শ জন্মদিন উপলক্ষে গত ১লা ও ২রা জ্যৈষ্ঠ উৎসব হইয়াছে। ১লা রবিবার প্রাতে মন্দিরে উপাসনা হয়। শ্রীযুক্ত নবদ্বীপচন্দ্র দাস আচার্য্যের কার্য্য করেন এবং উপদেশ প্রদান করেন। ঐদিন সন্ধ্যাকালে বাবু শশিভূষণ বসু আচার্য্যের কার্য্য করেন। ইঁহাদের প্রদত্ত দুইটী উপদেশ স্থানান্তরে মুদ্রিত হইয়াছে। ২রা জ্যৈষ্ঠ প্রাতে শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র দত্ত আচার্য্যের কার্য্য করেন। অপরাহ্নে বাবু সীতানাথ দত্ত ইংরাজি ও সংস্কৃত পুস্তক হইতে ব্রাহ্মধর্ম্মানুমোদিত প্রবন্ধ ও শ্লোক পাঠ করেন, তৎপর আরাধনা সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা হয়। শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র দত্ত, বাবু মনোরঞ্জন গুহ, বাবু কৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বাবু সীতানাথ দত্ত, বাবু মহেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বাবু বিপিনচন্দ্র পাল এবং বাবু কাশীচন্দ্র ঘোষাল প্রভৃতি আরাধনা ও উপাসনা প্রণালী সম্বন্ধে স্বীয় স্বীয় মন্তব্য প্রকাশ করেন। সন্ধ্যা সমাগমে কীর্ত্তন হয়। তৎপর শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় উপাসনা করেন। তাঁহার উপদেশ স্থানাভাব বশতঃ এবার প্রকাশিত হইল না। ব্রাহ্মধর্ম্ম ও ব্রাহ্মসমাজের বিশুদ্ধতা রক্ষা করিবার জন্য পরমেশ্বর এই সাধারণ ব্রাহ্মসমাজকে স্থাপন করিয়াছেন। আমরা যেন এখানে ব্রহ্মের জীবন্ত লীলা দর্শন করিয়া, দিন দিন ইহার সেবায় অধিকতর আকৃষ্ট হই।

পঞ্জাব-প্রচার যাত্রীদল—আমরা আনন্দের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে, পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী প্রমুখ পঞ্জাব প্রচার-যাত্রিগণ দুই মাসের পর, গত ১২ই জ্যৈষ্ঠ কলিকাতায় উপনীত হইয়াছেন। ইঁহারা লাহোর গমনের সময় যেমন স্থানে স্থানে প্রচার করিয়াছিলেন, আসিবার কালেও আগ্রা, খাণ্ডোয়া, ঝান্সী, এলাহাবাদ প্রভৃতি স্থানে প্রচার করিয়াছেন। এবার প্রচারকার্য্যে বিশেষ শুভ লক্ষণ দেখা গিয়াছে। ইঁহাদের উপাসনা, ধর্ম্মালোচনা, শ্লোক-ব্যাখ্যা এবং বক্তৃতা ও সঙ্গীতাদি শ্রবণ করিয়া ব্রাহ্মসমাজের বিরোধীগণও সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াছেন এবং অনেক ধর্ম্মপিপাসু প্রাণ এ ধর্ম্মের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছে। ইঁহারা যে স্থানে গমন করিয়াছেন, সেখানেই বিশেষ ধর্ম্মান্দোলন হইয়াছে। বিধাতা ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণের জন্য দিন দিন যে ভারতের ক্ষেত্র প্রস্তুত করিতেছেন, এ যাত্রায় তাহার স্পষ্ট নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে। পরমেশ্বর তাঁহার সত্যধর্ম্ম জগতে প্রচার করুন।

উৎসব—গত ২০শে চৈত্র শ্যামবাজার ব্রাহ্মসমাজের বার্ষিক উৎসব সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত আচার্য্যের কার্য্য করেন, শ্রীযুক্ত বাবু দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর একটী লিখিত উপদেশ পাঠ করেন। উপদেশটী অতি সারগর্ভ ও চিন্তাপূর্ণ হইয়াছিল।

চাকোবাগ ব্রাহ্মসমাজের উৎসব উপলক্ষে কলিকাতা হইতে প্রচারক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় এবং বাবু রেবতীমোহন সেন তথায় গমন করিয়াছিলেন। উৎসবে উপাসনা, আলোচনা, বক্তৃতা ও কথকতা ইত্যাদি হইয়াছিল। নগেন্দ্র বাবু দুইদিন বক্তৃতা করেন এবং রেবতী বাবু চৈতন্যলীলা সম্বন্ধে কথকতা করেন। বক্তৃতা ও কথকতা অতি হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। উৎসবের বিস্তৃত বিবরণ প্রাপ্ত হইলে পরে প্রকাশ করা যাইবে।

জন্মদিন — মাণিকদহের জমিদার বাবু বিপিনবিহারী রায় স্বীয় জন্মদিন উপলক্ষে সাঃ ব্রাঃ সমাজে ২৲, সাধনাশ্রমে ২৲, ব্রাহ্ম-বালিকা-শিক্ষালয়ে ২৲, এবং দাসাশ্রমে ২৲ টাকা দান করিয়াছেন।

জাতকর্ম্ম—হরিনাভিনিবাসী বাবু শ্রীশচন্দ্র রায়ের পুত্রের জাতকর্ম্ম সাধনাশ্রমে সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত নবদ্বীপচন্দ্র দাস আচার্য্যের কার্য্য করেন। এতদুপলক্ষে শ্রীশবাবু সাধনাশ্রমে ২৲ টাকা দান করিয়াছেন।

৪ঠা জ্যৈষ্ঠ ঔন্দার সার্কিউলার রোডস্থ ভবনে শ্রীযুক্ত গুরুদাস চক্রবর্ত্তীর নবজাত কুমারের জাতকর্ম্ম উপলক্ষে বিশেষভাবে উপাসনাদি হইয়াছে। বাবু কালীচন্দ্র ঘোষাল পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন, বাবু মহেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় উপাসনা এবং বাবু নবদ্বীপচন্দ্র দাস উপদেশ দান করেন। পরমেশ্বর শিশুদিগের মঙ্গল করুন।

শ্রাদ্ধ—পরলোকগত জগদীশ্বর গুপ্ত মহাশয়ের মাতার বার্ষিক শ্রাদ্ধ গত ১২ই জ্যৈষ্ঠ ২১০।৪ নং ভবনে সম্পন্ন হইয়াছে। শাস্ত্রী মহাশয় আচার্য্যের কার্য্য করেন, বাবু দেবীপ্রসন্ন রায়-চৌধুরী স্বর্গীয়া দেবীর জীবন চরিতের অংশবিশেষ পাঠ করেন। জগদীশ্বর বাবুর উইল অনুসারে তাঁহার পত্নী এতদুপলক্ষে নিম্নলিখিতরূপে দশটি টাকা দান করিয়াছেন,—সাধনাশ্রম ২৲, অনাথাশ্রম ১৲, জয়গায়ক দল ২৲ ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের প্রচার ভাণ্ডার ১৲ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ ১৲ সাঃ ব্রাঃ সমাজের দাতব্য বিভাগ ১৲ দাসাশ্রম ১৲ জলধাবার ১৲।

৩রা জ্যৈষ্ঠ বহুবাজারস্থ বাবু হরিমোহন দত্তের পরলোগত পিতার বার্ষিক শ্রাদ্ধ সম্পন্ন হইয়াছে। প্রত্যুষে বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত এবং রাত্রিতে বাবু কেদার নাথ রায় উপাসনা করেন। পরমেশ্বর পরলোকগত আত্মাদিগের মঙ্গল বিধান করুন।

পরলোকগতা বালিকার জন্মোৎসব—২রা জ্যৈষ্ঠ বাবু দেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরীর পরলোকগতা কন্যা অপরাজিতার জন্মোৎসব উপলক্ষে বিশেষ উপাসনা হয়। এতদুপলক্ষে দেবী বাবু সাঃ ব্রাঃ সমাজে ১৲ এবং সাধনাশ্রমে ১৲ টাকা দান করিয়াছেন।

উপনিষদ প্রকাশ—ব্রহ্মজিজ্ঞাসা প্রভৃতি প্রণেতা বাবু সীতানাথ দত্ত কর্ত্তৃক ঈশ, কেন, কঠ, প্রশ্ন, মুণ্ডক, মাণ্ডুক্য, এই ছয় খানি উপনিষদের সরল ও সংক্ষিপ্ত সংস্কৃত টিকা এবং বঙ্গানুবাদ শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে। সুপ্রসিদ্ধ বৈদিক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সত্যব্রত সামশ্রমী এই গ্রন্থ সংশোধন করিয়া দিতেছেন ও তাঁহার সাক্ষাৎ তত্ত্বাবধানে মুদ্রিত হইতেছে। সুতরাং অনুবাদ যে বিশুদ্ধ ও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইবে, তাহার সন্দেহ নাই। ২১০।৩।২ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট ঠিকানায় পত্র লিখিলে পুস্তক ভি, পি, পার্শেলে প্রেরিত হইবে। মূল্য ।৵০ আনা।

পত্রপ্রেরকদিগের প্রতি—বাবু দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় এবং বাবু দ্বারকানাথ সরকারের একই বিষয়ের দুইখানি পত্র পাওয়া গিয়াছে। এবার স্থানাভাব বশতঃ প্রকাশিত হইল না। পত্রপ্রেরকগণ ক্ষমা করিবেন।

দানপ্রাপ্তি স্বীকার।

কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি যে, নিম্নলিখিত মহাশয়গণ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের দাতব্য বিভাগে ১৮৯২ সালে নিম্নলিখিত অর্থদান করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত বাবু গোপালচাঁদ বসু কলিকাতা মাসিক দান ১২৲ বাবু অন্নদাচরণ মল্লিক ৭৲ শ্রীমতী শিবমনোমোহিনী সিংহ, মুঙ্গের ১৲ বসন্তকুমারী বসু কলিকাতা ॥০ বাবু সত্যরঞ্জন খাস্তগির শিবপুর ২৲ বাবু আদিনাথ চট্টোপাধ্যায় কলিকাতা ।০ বাবু গুরুদাস চক্রবর্ত্তী ।০ বাবু উপেন্দ্রনাথ মিত্র বার্ষিক চাঁদা ৫৲ বাবু যদুনাথ ঘোষ ১৲ বাবু কেদারনাথ মিত্র ৩৲ বাবু বিপিনবিহারী দত্ত ১৲ বাবু বিহারীলাল মল্লিক ১৲ বাবু হেমচন্দ্র সুর ৩৵১০ শ্রীমান সুবোধ প্রবোধের জন্মদিন উপলক্ষে ১৲ শ্রীমতী কিশোরীবালা চক্রবর্ত্তী দারজিলিং ১৲ বাবু গৌরীকান্ত রায় সীমলা হিল ৫৲ বাবু বেণীমাধব মিত্র ১৲ কালীপ্রসন্ন বসু তাঁহার সুদের দরুণ ৩৩৲ রায় গুনাভিরাম বড়ুয়া বাহাদুর কলিকাতা ১৫৲ বাবু ভবসিন্ধু দত্ত ২৲ বাবু বরদানাথ হালদার ১০৲ বাবু ভুবনমোহন ঘোষ ১৲ বাবু গুরুচরণ মহলানবিস ২৲ বাবু মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় ৫৲ বাবু নন্দকুমার চৌধুরী ২৲ বাবু রাখালচন্দ্র সেন ১৲ বাবু বিপিনবিহারী রায় জমিদার মাণিকদহ বাবু নন্দলাল সেন কলিকাতা ২৲ বাবু রাইচরণ দাস উকিল কুষ্টিয়া ১৲ বাবু এককড়ি সাহা বানিবন ১৲ বাবু ফণীন্দ্রমোহন বসু কলিকাতা ১৫৲ বাবু বাণীকান্ত রায় চৌধুরী ১॥০ বাবু পার্ব্বতীচরণ দাস পূর্ণীয়া ১০৲ বাবু গোপালচন্দ্র মল্লিক ২৲ উমাচরণ দাস ভবানীপুর ৫৲ বাবু প্রমাদদাস মল্লিক কলিকাতা ৫০৲ কোন দীনভ্রাতা ৫৲ বাবু ভগবানচন্দ্র গুহ সিরাজগঞ্জ ১৲ বাবু দেবকণ্ঠ রায়ের গৃহিণী ১৲ তাঁহার বিধবা ভ্রাতৃজায়া ১৲ বাবু প্রাণচন্দ্র লাহিড়ী সিমলা হিল ২৲ বাবু বিপিনবিহারী বসু লক্ষ্ণৌ ১৲ বাবু রাধানাথ দেব কলিকাতা ২৲ বাবু কুঞ্জলাল শীল মাণিকদহ ১৲ বাবু গোপালচন্দ্র রক্ষিত কলিকাতা ১৲ বাবু জগদীশচন্দ্র বসু ২৫৲ রায় বিপিনকৃষ্ণ বসু বাহাদুর নাগপুর ১০৲ বাবু যোগেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী কাকিনিয়া ১৲ বাবু কানাইলাল সাহা তিল্লি ১৲ বাবু যোগেন্দ্রচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কলিকাতা ১৲ শ্রীমতী রমাসুন্দরী ঘোষ ১৲ বাবু রাধাগোবিন্দ সাহা কুমারখালি ৬৲ কোন বন্ধু কলিকাতা ৩০৲ পণ্ডিত রামগতি ভট্টাচার্য্য মজিলপুর ২৲ শ্রীমতী জগৎলক্ষ্মী ঘোষ কলিকাতা ১৲ বাবু কালীপ্রসন্ন বসু ১॥০ শ্রীমতী গোলাপমণি ঘোষ (মাঃ বাবু সারদাপ্রসাদ সিংহ) ২৲ মোট ৩২৮॥৵১০।

শ্রীগুরুচরণ মহলানবিশ
সম্পাদক দাতব্য বিভাগ, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ।

২১১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, ব্রাহ্ম মিশন প্রেসে শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দত্ত কর্ত্তৃক ১৬ই জ্যৈষ্ঠ মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

ধর্ম্ম ও সমাজতত্ত্ব বিষয়ক পাক্ষিক পত্রিকা।

৫ম সংখ্যা।
১৬শ ভাগ।

১লা আষাঢ়, বুধবার, ১৮১৫ শক, ব্রাহ্ম সম্বৎ ৬৪।

বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২॥০
মফস্বলে ৩৲
প্রতি খণ্ডের মূল্য ৵০

তপস্যা।

তপস্যা সংযম বিনা প্রকৃতি দুরন্ত,
বসেনা ত সত্যের সাধনে;
বাসনা কামনা শত নাহি যার অন্ত,
থাকে চিত্ত তাহারি চিন্তনে।

অস্থির চঞ্চল মনে বসাইতে চাহি,
ধীর স্থির ক্ষণমাত্র নয়;
কি ভাবে, কি চাহে, তার আদি অন্ত নাহি,
ক্ষুদ্র সুখ লয়ে শুধু রয়।

কে জেনেছে সার তত্ত্ব তপস্যা বিহনে,
দিব্য জ্ঞান হয়েছে প্রকাশ?
কে করেছে সিদ্ধিলাভ কঠোর-সাধনে,
কে করেছে বাসনা-বিনাশ?

দেও সে তপস্যা-বল, প্রবৃত্তি-কুয়াসা,
কেটে যাক্ দিব্য জ্ঞানোদয়ে;
ঘুচে যাক্ চঞ্চলতা, সংশয় নিরাশা;
সার তত্ত্ব ফুটুক হৃদয়ে।

সম্পাদকীয় মন্তব্য।

তপস্যা ও সাধন—জগতের ইতিবৃত্তে দেখি, যে সকল সাধু মহাত্মা জগতে অধ্যাত্মতত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছেন, এবং লক্ষ লক্ষ নরনারীকে মুক্তির পথ প্রদর্শন করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই কঠোর তপস্যাদ্বারা সেই সকল সত্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। বহুদিনের নির্জ্জনবাস, চিন্তা, ও আত্ম-নিগ্রহের পর যাহা লাভ করিয়াছিলেন, তাহাই সজ্জনে আসিয়া বিতরণ করিয়াছিলেন। যেখানেই সাধনা, যেখানেই তপস্যা, সেই খানেই বিষয়ে বৈরাগ্য ও আত্ম-নিগ্রহ। কিন্তু তপস্যা করিতে হইলেই যে সাধককে অরণ্যবাসী হইতেই হইবে তাহা নহে। প্রতিনিয়ত মানব-সমাজের মধ্যে এক একটী বিদ্যালাভের জন্য কত তপস্যা দৃষ্ট হইতেছে। যিনি বিশ্ব বিদ্যালয়ের এম, এ উপাধি লাভ করিয়া বহির্গত হইয়াছেন, তাঁহার তপস্যার বিষয় একবার স্মরণ কর। একাদিক্রমে ত্রয়োদশ কি চতুর্দ্দশ বর্ষকাল নিত্য বিদ্যালয়ে গতায়াত করিয়াছেন; আপনার সুখপ্রিয় প্রকৃতিকে নিয়মিত করিয়া প্রত্যহ চারি পাঁচ ঘণ্টা বিদ্যালয়ে বদ্ধ থাকিয়াছেন; গৃহে পাঠাভ্যাসে রাত্রির অধিক কাল যাপন করিয়াছেন; তৎপরে উপাধিলাভ করিয়াছেন। যে সুগায়কের মধুর কণ্ঠনিঃসৃত সংগীত শ্রবণ করিয়া মুগ্ধ হইতেছ, তাঁহার তপস্যার বিষয়ে একবার মনে ধারণা কর। তিনি কতদিন শিক্ষকের দ্বারে পড়িয়া থাকিয়াছেন, প্রতিদিন প্রত্যূষে উঠিয়া কতকাল ধরিয়া রাগ রাগিণীর আলাপ করিয়াছেন। এ সকল কি তপস্যা নহে? ধর্ম্মও সেইরূপ তপস্যাসাধ্য। আধ্যাত্মিক সত্য সকলকে আয়ত্ত করিবার জন্যও সেইরূপ তপস্যার প্রয়োজন। সেইরূপ চিত্তের একাগ্রতা, আত্মনিগ্রহ ও অনুশীলনের প্রয়োজন। যে সত্য তপস্যা ও সাধন-লব্ধ নহে, তাহা জীবনে স্থায়ী হয় না। তপস্যা যেন শাণ পাথরের ন্যায়, তাহাতে হৃদয়কে শাণ দিয়া সত্যকে উজ্জ্বল ও ধারাল করিতে হয়। তপস্যাদ্বারা চিত্তশুদ্ধি হয়, চিত্তশুদ্ধি হইলে আত্মার আধ্যাত্মিক দৃষ্টি উজ্জ্বল ও সত্য-ধারণের শক্তি বর্দ্ধিত হয়। সেইরূপ চিত্তেই অধ্যাত্ম-তত্ত্ব সকল প্রতিভাত হইয়া থাকে। যে চিত্তে নির্জ্জন চিন্তা ও তপস্যা নাই, সে চিত্ত গভীর তত্ত্ব গ্রহণের উপযোগী নহে; তাহা সর্ব্বদা উপরে উপরে বিচরণ করে ও বহির্ম্মুখীন হইয়া থাকে।

ব্রাহ্মসমাজে তপস্যার ভাবকে জাগ্রত করা বিশেষ প্রয়োজন। আমরা যেরূপ চিন্তাবিহীন ভাবে কথা বলি ও কার্য্য করি, তাহাতে এক এক সময়ে নিজেদেরই লজ্জা হয়। আমাদের মধ্যে একজন তপস্বী অদ্যাপি উজ্জ্বল আদর্শ স্বরূপ বিদ্যমান রহিয়াছেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মধর্ম্ম সাধনের জন্য যেরূপ কঠোর তপস্যা করিয়াছেন, তাহা স্মরণ করিলে ও চমৎকৃত হইতে হয়। তাহার ফল এই হইয়াছে, তিনি যে টুকু লাভ করিয়াছেন তাহা চিরদিন ধরিয়া আছেন। কিছুতেই সেই ভূমি হইতে তাহাকে বিচলিত করিতে পারিতেছে না। তাঁহার অবলম্বিত পন্থা সম্পূর্ণরূপে আমাদের অবলম্বনীয় না হইলেও তাঁহার দৃঢ়তা ও সাধন পরায়ণতা যে অনুকরণীয় তাহা কে অস্বীকার করিবেন। এই তপস্যাতে তিনি যখন প্রবৃত্ত

হইয়াছিলেন, তখন ব্রাহ্মধর্ম্ম সাধনকে লক্ষ্য ও অপর সকল কার্য্যকে উপলক্ষ্য করিয়াছিলেন। আমাদিগকে ও সেই ভাবে তপস্যা করিতে হইবে, তবেই ব্রাহ্মধর্ম্ম আমাদের জীবনে সাধিত হইবে।

সজন উপাসনা—উৎকৃষ্ট বস্তুর অপব্যবহারে সর্ব্বত্রই বিষময় ফল ফলে। একভাবাপন্ন, সরল কতিপয় ধর্ম্মপিপাসু আত্মা সমবেত হইয়া, যখন জগদীশ্বরের আরাধনা করেন; তখন তাহার মধ্যে অপূর্ব্ব ভাবের সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যায়। একের প্রাণের সরলতা ও ব্যাকুলতা অন্য পাঁচজনকে অনুপ্রাণিত করে, একের ভক্তি ও বিশ্বাস অন্যের মৃত প্রায় ভাবগুলিকে জাগ্রত করে। সরল ও ব্যাকুল হৃদয়গুলির সমবেত প্রেমের উপর প্রভু পরমেশ্বরের কৃপা পড়িয়া অপূর্ব্ব ভাবের উদয় করে। কিন্তু যখন হৃদয়ের মধ্যে সরলতার অভাব দেখা যায়, প্রাণে ব্যাকুলতা আর তেমন থাকে না, নিজের জীবন অপেক্ষা অন্যের জীবনের উপর অধিক দৃষ্টি পড়ে, নিজে ডুবিবার চেষ্টা না করিয়া, অন্যকে ভাবে ভাসাইবার চেষ্টা হয়, এক কথায় যখন প্রার্থনা ও উপাসনার সময় ঈশ্বরের উপর দৃষ্টি স্থাপিত না হইয়া অন্যের উপর পড়ে, তখন সেই সমবেত উপাসনা-দ্বারা উপকার না হইয়া জীবনের সমূহ অনিষ্ট উৎপন্ন হয়।

ব্রাহ্মসমাজে শব্দের দ্বারা আরাধনা ও প্রার্থনা করিবার যে প্রথা আছে, তাহাদ্বারা উপাসনা ও প্রার্থনাতে অসত্যভাব প্রবেশ করিতেছে কিনা, সমবেত উপাসনার উপর লোকের অশ্রদ্ধা উৎপন্ন হইতেছে কিনা, তাহা একবার গভীরভাবে ভাবিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে। ঈশ্বরের নাম মুখে রহিয়াছে, কিন্তু চক্ষু রহিয়াছে মনুষ্যের উপর; প্রার্থনা করিতেছি ঈশ্বরের নামে, কিন্তু অন্তরে অন্যকে উপদেশ দেওয়ার দিকে দৃষ্টি রহিয়াছে। অল্লাধিক পরিমাণে ইহা সকলেই অনুভব করিতেছেন যে, বর্ত্তমান সময়ে আমাদের সামাজিক উপাসনা কিঞ্চিৎ পাতলা ভাব ধারণ করিয়াছে, অনেক সময় ইহাও শুনা যায় যে উপাসনার সময় আচার্য্যগণ অন্যের মধ্যে ভাবের উদয় করিবার জন্য নানা কথা বলিয়া থাকেন। ব্রাহ্মের একপ্রাণ হইবার স্থান উপাসনা-ক্ষেত্র। সামাজিক উপাসনাই ব্রাহ্ম-সমাজের সাধন-প্রণালীর বিশেষত্ব। এই সম্মিলনের স্থানে যদি পরস্পরের প্রতি অশ্রদ্ধা ও অবিশ্বাস উৎপন্ন হয়, তবে ব্রাহ্মের বড় বিপদ। উপাসনার সময় সপ্তম স্বর্গের কথা বলিয়া, ভাবের তরঙ্গে অন্যকে ভাসাইতে চেষ্টা হইল, অথচ জীবনের মধ্যে তাহার কোন লক্ষণ নাই। সেই মহান্ পরমেশ্বরের উপর যখন প্রাণের দৃষ্টি পড়ে, তখন রসনা সংযত হয়; প্রাণ মন প্রশান্ত ভাব ধারণ করে।

আরও একটী বিষয় ভাবিবার আছে। একদিকে যেমন পাঁচজনের মধ্যে বসিয়া ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিবার সময় সাধকের জীবনের নিষ্ঠা, সরলতা ও ঈশ্বরের প্রতি গভীর দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য, অন্য দিকে যাঁহারা উপাসক তাঁহাদের এক ভাবাপন্ন হওয়া আবশ্যক। যাঁহাদের সহিত প্রাণের মিল নাই, পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা নাই, তাঁহাদের সঙ্গে বসিয়া সমবেত উপাসনা প্রকৃতভাবে হওয়া কঠিন। সর্ব্বপ্রকার লোকের নিকট ব্রাহ্মধর্ম্মের সত্য প্রচার করা এক কথা, আর যখন প্রাণ খুলিয়া ব্রহ্ম চরণে আত্ম-নিবেদন করি, তখন সর্ব্বশ্রেণীর লোককে উপস্থিত হইতে দেওয়া অন্য কথা। সামাজিক উপাসনাতে যখন নানা শ্রেণীর সম-বিশ্বাসী লোক উপস্থিত হন, তখন উপাসনার প্রণালী পরিবর্ত্তিত করা আবশ্যক কিনা তাহাও ভাবিবার বিষয়। সরলতা, ভাবের একতা ও পরস্পরের প্রতি প্রীতি ও শ্রদ্ধার যোগ এবং প্রণালীতে আস্থা, সমবেত উপাসনার প্রাণ। এই বিষয়ে ব্রাহ্মসাধারণের বিশেষতঃ যাঁহারা উপাসনাদি করেন, তাঁহাদের মনোযোগ হওয়া আবশ্যক।

সঙ্কল্প পালন—পরমেশ্বর কৃপা করিয়া তাঁহার সন্তান-দিগের প্রাণে সাধু সঙ্কল্প অভ্যুদিত করেন। যিনি সেই সঙ্কল্প-পথে আজীবন স্থির থাকেন, তিনিই তাঁহার প্রিয় সন্তান। যিনি সঙ্কল্প প্রতিপালনে পরাঙ্মুখ, তিনি ধর্ম্মরাজ্য হইতে বহু পশ্চাতে গমন করেন। সাংসারিক কার্য্যে আমরা দেখিতে পাই, অঙ্গীকার প্রতিপালন করা সামাজিক ও রাজনৈতিক আদেশ। কেহ যদি তোমার নিকট অঙ্গীকার করে যে, সে তোমার গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া দিবে; নিরূপিত সময়ে তাহা না করিলে রাজপুরুষগণ তাহার দণ্ডবিধান করিবেন এবং জনসমাজ তাহাকে প্রবঞ্চক মিথ্যাচারী বলিয়া ঘৃণা করিবে। যিনি পরমেশ্বরের সিংহাসনতলে দাঁড়াইয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন যে, ব্রাহ্মধর্ম্ম-সাধনে জনসমাজের সেবাতে কিম্বা ধর্ম্ম-প্রচারে জীবন দান করিবেন, তিনি যদি সেই অঙ্গীকার পালন না করেন, তবে পরমেশ্বরের সম্মুখে তাঁহার স্থান আছে কি? তিনি নিশ্চয়ই সত্যরাজ্য হইতে ভ্রষ্ট হইবেন। সকল দেশেই প্রতিজ্ঞা পালনের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দেখা যায়।

যাঁহারা কোনও প্রকার সাধু সঙ্কল্প প্রকাশ করিবেন, তাঁহাদের প্রতি নিবেদন এই যে, বিশেষ চিন্তা, প্রার্থনা ও আলোচনা না করিয়া যেন কেহ প্রতিজ্ঞা-পাশে বদ্ধ না হন। কিন্তু যে অঙ্গীকার একবার মুখ হইতে বাহির হইবে, তাহা প্রতিপালন করিতে যেন সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকেন। পরমেশ্বরের এবং সম-সাধকদিগের নিকট অঙ্গীকার করা খেলা নহে। সঙ্কল্প না করা ভাল, কিন্তু একবার কোনও সঙ্কল্প প্রকাশ করিলে শরীর মন দিয়া তাহা পালন করিতে হইবে। যেখানেই আমরা সঙ্কল্প প্রতিপালনের শিথিলতা দেখিতে পাই, সেখানেই মনে ব্যথা পাই। আমরা ব্রত-রক্ষার জন্য সঙ্কল্প পালনের জন্য প্রাণপাত করিব। পরমেশ্বর আমাদের সহায় হউন।

জীবনপ্রদ-মন্ত্র—প্রতিদিন কত ব্রাহ্ম ব্রাহ্মিকা আরাধনা-মন্ত্র সাধন করিতেছেন, কত স্থান হইতে সত্যং জ্ঞানমনন্তং ধ্বনি উত্থিত হইতেছে, কিন্তু উপাসনার বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে তেমন গভীরতা কেন জন্মিতেছে না? অধিকাংশ স্থলে এই

মহামন্ত্র কেবল বায়ুতরঙ্গে পর্য্যবসিত হইতেছে কেন? মন্ত্র-সাধনের সহিত সাধকের জীবন কেন গঠিত হইতেছে না? এ কথার উত্তর অতি সহজ। মন্ত্র তাহারই পক্ষে জীবিত এবং কার্য্যকর, যিনি তাহা বিশ্বাসের সহিত উচ্চারণ করেন। ব্রহ্মনাম সেই ক্ষেত্রেই ফল প্রসব করে,যে ক্ষেত্রের জমি বিশ্বাস ও ভক্তি জলে আর্দ্র। বিশ্বাসবিহীনের কাছে আরাধনা মন্ত্রের—ব্রহ্মনামের কোনই মূল্য নাই। কত লোকে দিন রাত্রি সত্যং উচ্চারণ করিতেছেন, কিন্তু উচ্চারণের সহিত হৃদয়ের কোনই যোগ দেখা যায় না। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ যখন সত্যং শব্দ উচ্চারণ করেন, তখন হয় ত তাঁহার সমগ্র শরীর কণ্টকিত হইয়া উঠে, তিনি সম্মুখে সত্যকে দেখিতে পান। "সত্যং" এই শব্দ তাঁহার কাছে কোন শব্দ নহে, জীবন্ত পরমেশ্বর।

বিশ্বাসী ব্যাকুল আত্মার কাছেই মন্ত্র জীবিত; অন্যের কাছে মৃত। কেবল পাখীর মত উচ্চারণ করিলে কখনও জীবন পরিবর্ত্তন হয় না, ধর্ম্মভাব বৃদ্ধি হয় না, বিশ্বাস ও ব্যাকুলতার প্রয়োজন। কেহ কেহ সমস্ত জীবন "সত্য সত্য" করিয়া কোনও ফল পাইতেছেন না, শেষে আরাধনার প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়া ভিন্ন সাধন অবলম্বন করিতেছেন। মন্ত্রের দোষ নহে, দোষ নিজের। বিশ্বাসী না হইলে মন্ত্র-সাধনে ফল ফলে না; বিশ্বাসী না হইলে ব্রহ্মকৃপা লাভ হয় না; সূর্য্যরশ্মি সকল প্রকার কাচেতেই পতিত হয়; কিন্তু অয়স্কান্ত মণিতে পতিত হইলেই অগ্নি উদ্গীরণ করিয়া থাকে। তদ্রূপ নাম সকলেই উচ্চারণ করেন; কিন্তু বিশ্বাসী হৃদয়েই নামের ফল ফলিয়া থাকে। কেহ যদি গৃহদ্বার রুদ্ধ করিয়া তন্মধ্যে অবস্থিত করেন এবং বলিতে থাকেন যে, বিধাতার কিরূপ বিচার, এই ঘরে বাতাস ও আলোক দিতেছেন না। তবে যেমন সকলেই তাঁহার অজ্ঞতা দেখিয়া হাস্য করেন, তেমনি স্বার্থপরতা, বিষয়াসক্তিদ্বারা চিত্তদ্বার রুদ্ধ করিয়া যাঁহারা বসিয়া আছেন, তাঁহারা যদি বলেন যে, সাধনে কিছু হয় না, আরাধনাতে তাঁহাকে পাওয়া যায় না,তবে তাঁহারা ও উপহাসাস্পদ হন। মুখে উচ্চারিত মন্ত্র সঞ্জীবিত হয় না। অতএব মন্ত্র জীবিত হওয়ার পক্ষে সর্ব্বাগ্রে আমাদিগের সর্ব্ববিধ উপায় অবলম্বন করা কর্ত্তব্য। তবেই মন্ত্রদ্বারা সাধনায় সিদ্ধি লাভ হইবে, নতুবা কণ্ঠস্থ মন্ত্রোচ্চারণে কোনই ফল নাই। প্রস্তুত না হইলে, কোন ফলই প্রস্তুত হয় না।

ধর্ম্মজীবন ও ধর্ম্মসমাজ—১লা জ্যৈষ্ঠের তত্ত্ব-কৌমুদীতে "সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের জন্মোৎসব উপলক্ষে আত্ম-পরীক্ষা" নামে একটী প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। প্রবন্ধটী ইচ্ছা করিয়াই এরূপ ভাবে লিখিত হইয়াছিল, যাহাতে লোকের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইতে পারে। আমাদের সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে। প্রবন্ধটী অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। কাহারও কাহারও বিরাগ উৎপন্ন হইয়াছে। তাঁহারা অনুভব করিতেছেন যে, উক্ত প্রবন্ধে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্যগণের প্রতি যে অভিযোগ করা হইয়াছে, তাঁহারা তাহার পাত্র নহেন। আমরা এ সম্বন্ধে দুইখানি পত্রও প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহার একখানি যথাস্থানে প্রকাশিত হইল। তত্ত্বকৌমুদী মনোযোগপূর্ব্বক যাঁহারা পাঠ করিয়া থাকেন, তাঁহারা সকলেই অবগত আছেন যে, উক্ত প্রবন্ধের লিখিত বিষয়গুলি আরও অনেকবার তত্ত্ব-কৌমুদীতেই প্রকাশিত হইয়াছে, কিন্তু পূর্ব্বে কাহারও দৃষ্টি এরূপ আকৃষ্ট হয় নাই। যাহা হউক এবিষয়ে সকলের মনোযোগ যখন হইয়াছে,তখন এই উপলক্ষে কতকগুলি অতি প্রয়োজনীয় বিষয়ের আলোচনা করা যাউক।

উক্ত প্রবন্ধ পাঠ করিয়া যদি কাহারও মনে এ প্রকার ধারণা জন্মিয়া থাকে যে, উক্ত প্রবন্ধ-লেখক নিয়মতন্ত্র প্রণালীর প্রতি আস্থা ও বিশ্বাসহীন হইয়াছেন, তবে তিনি সে সংস্কার পরিত্যাগ করিবেন। এ সম্বন্ধে প্রবন্ধলেখকের বক্তব্য এই;—মানব-সমাজের ইতিবৃত্ত-পাঠক মাত্রেই জানেন যে, সুশৃঙ্খলরূপে মানব-সমাজের কার্য্য পরিচালনার জন্য অদ্যাবধি যত প্রকার শাসন-প্রণালী উদ্ভাবিত হইয়াছে, তন্মধ্যে স্বায়ত্ত শাসন-প্রণালী অথবা নিয়মতন্ত্র-প্রণালীই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। ইহাও যে সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ তাহা নহে; তবে অপরাপর শাসন-প্রণালীর দোষভাগের সহিত তুলনা করিলে, ইহার দোষ ভাগ সামান্য বলিয়া বোধ হয়। এই নিয়মতন্ত্র-প্রণালীর দুইটী প্রধান গুণ; প্রথম ইহাতে অন্যথা ব্যক্তিগত শক্তিকে শাসনাধীনে রক্ষা করে; দ্বিতীয় এতদ্দ্বারা বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত শক্তি সকলকে সমাজের কল্যাণ-সাধনে নিযুক্ত করে। প্রথম কার্য্যটী Negative অভাবাত্মক, দ্বিতীয়টি Positive ভাবাত্মক। অভাবাত্মক কার্য্যটী অপেক্ষা ভাবাত্মক কার্য্যটীর দিকেই বুদ্ধিমান ব্যক্তির দৃষ্টি অধিক নিবদ্ধ হওয়া আবশ্যক। দ্বিতীয় আর একটী কথা স্মরণ রাখিবার উপযুক্ত; অগ্রে জীবনীশক্তি পরে তাহাকে শৃঙ্খলাধীন করা। ধর্ম্মজীবনের উন্নতি কিরূপে হইবে? এই প্রশ্ন ধর্ম্মসমাজের পক্ষে সর্ব্বপ্রধান। কিরূপ শাসন-প্রণালীদ্বারা তাহা নিয়মিত হইবে, সে প্রশ্ন দ্বিতীয় স্থানীয়। আমাদের সমাজের সভ্যগণের প্রতি ক্ষোভ করিয়া এই কথা বলা হইয়াছে যে, তাঁহারা যেন নিয়মতন্ত্র-প্রণালীর ভাবাত্মক দিক অপেক্ষা অভাবাত্মক দিকের প্রতি অধিক মনোযোগী এবং নিয়মতন্ত্র প্রণালীর উন্নতির জন্য তাঁহারা যেরূপ পরিশ্রম করিয়াছেন, ব্রাহ্মধর্ম্ম-সাধন ও প্রচারের উন্নতি-বিধানার্থ সেরূপ শ্রম করেন নাই। ইহা আত্মপরীক্ষার মুহূর্ত্তে আপনাদের দুর্ব্বলতা দেখিয়া ক্ষোভের কথা। যাহা হউক একটী সত্য আমাদিগকে সর্ব্বদাই মনে রাখিতে হইবে, অগ্রে ধর্ম্মজীবনের উন্নতির ব্যবস্থা, পরে সমাজের কার্য্য চালাইবার বিধি ব্যবস্থা। ঈশ্বর করুন সেই প্রধান কার্য্যের প্রতি আমাদের দৃষ্টি দিন দিন অধিকতররূপে আকৃষ্ট হউক।

প্রচার ও প্রচারের ব্যবস্থা—পূর্ব্বোক্ত প্রবন্ধে আমরা ক্ষোভ করিয়া বলিয়াছি যে, প্রচারকার্য্যে সভ্যদিগের এমনি মনোযোগ যে, প্রচারক সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি না হইয়া হ্রাস হইয়া গিয়াছে। ইহার অর্থ এরূপ নহে, সভ্যগণের দোষে পুরাতন প্রচারকগণ প্রচারক-পদত্যাগ করিয়াছেন। সাধারণ

ব্রাহ্মসমাজের সভ্যগণের প্রতি ও তাঁহাদের প্রতিনিধিস্বরূপ কার্য্যনির্ব্বাহক সভার প্রতি কেহ এরূপ অভিযোগ করিতে পারেন না যে, তাঁহারা প্রচারকদিগের প্রতি সহিষ্ণুতা ও সমুচিত শ্রদ্ধার সহিত ব্যবহার করেন নাই। পূর্ব্বোক্ত অভিযোগের অর্থ এই যে, প্রচারকার্য্যে আশানুরূপ উৎসাহ থাকিলে প্রচারক সংখ্যা বর্দ্ধিত হইত। সে বিষয়ে মনোযোগের অভাব দৃষ্ট হয়। আমরা যদি প্রথম অবধি প্রচার কার্য্যের বিস্তৃতি অপেক্ষা গভীরতার দিকে অধিক দৃষ্টি রাখিতাম, যদি পূর্ব্ব হইতে একদল উপযুক্ত প্রচারক প্রস্তুত করিবার দিকে মনোযোগী হইতাম, তাহা হইলে এতদিনে ভারতের নানা স্থানের কার্য্যক্ষেত্রে কার্য্য করিবার কত লোক পাইতাম। বড় বিস্তীর্ণ-ক্ষেত্রের উপরে সাময়িক প্রচার-কার্য্যে চতুর্দ্দশ বৎসর শক্তিক্ষয় না করিয়া সেই শক্তির কিয়দংশ যদি কতকগুলি মানুষ প্রস্তুত করিবার জন্য নিয়োগ করা যাইত, তাহা হইলে, বোধ হয়, অধিকতর উৎকৃষ্ট ফল দেখা যাইত। এই মাত্র বক্তব্য যে, আমরা যদি নিজেদের অভাব ও ত্রুটী লক্ষ্য না করি, যদি তাহা সংশোধন করিবার প্রয়াস না পাই, তাহা হইলে, সে সকল কিরূপে সংশোধিত হইবে?

সম্পাদকীয় ও প্রাপ্ত প্রবন্ধ।

মুক্ত ও শান্তভাব-সাধন।

ভগবদ্গীতার নবম অধ্যায়ে নিম্নলিখিত শ্লোকদ্বয় প্রাপ্ত হওয়া যায়;—

> প্রকৃতিং স্বামবষ্টভ্য বিসৃজামি পুনঃ পুনঃ।
> ভূতগ্রামমিমং কৃৎস্নমবশং প্রকৃতের্বশাৎ॥
> ন চ মাং তানি কর্ম্মাণি নিবধ্নন্তি ধনঞ্জয়।
> উদাসীনবদাসীনমসক্তং তেষু কর্ম্মসু॥

অর্থ:—"হে অর্জ্জুন, আমি স্বীয় প্রকৃতিকে স্ববশে রাখিয়া, বার বার এই সকল ভূতকে সৃজন করিতেছি; ইহারা স্বীয় প্রকৃতির বশীভূত। আমাকে এই সকল কর্ম্ম আবদ্ধ করিতে পারে না; আমি এই সকল কর্ম্মে অনাসক্ত থাকিয়া, ইহাদিগেরই মধ্যে উদাসীনবৎ আসীন আছি।"

এই কতিপয় বচনের মধ্যে অধ্যাত্মরাজ্যের কতকগুলি গভীর তত্ত্ব নিহিত আছে। সংক্ষেপে তাহার কিঞ্চিৎ প্রদর্শন করা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। সেই অনন্ত অবিনাশী পুরুষের সহিত আমাদের আত্মার প্রভেদ কোথায়? আমরা সচরাচর বলিয়া থাকি, তিনি পূর্ণ, আর আমরা অপূর্ণ, এই উভয়ের মধ্যে মহাপ্রভেদ; ইহা সত্য। কিন্তু নিগূঢ়ভাবে চিন্তা করিলে দৃষ্ট হইবে যে, আর একটী বিষয়ে আত্মা ও পরমাত্মাতে গুরুতর প্রভেদ আছে। তিনি মুক্ত, আমরা বদ্ধ। কি জড়, কি চেতন, ঈশ্বর ভিন্ন আর যাবৎ পদার্থই কঠিন দাসত্বশৃঙ্খলে আবদ্ধ। জড়ের বিচিত্র শক্তির বিচিত্র ক্রীড়া; কিন্তু সে ক্রীড়ার সাধ্য নাই যে রেখামাত্রও স্বীয় নির্দ্দিষ্ট পথ অতিক্রম করিয়া যায়। জড়ের শক্তি সমূহ দুর্ভেদ্য কার্য্য কারণের নিয়ম দ্বারা শাসিত। প্রকাণ্ড সূর্য্য হইতে সাগর-কূলবর্ত্তী ক্ষুদ্র বালুকাকণা পর্য্যন্ত কোন জড়পিণ্ডের সাধ্য নাই যে আপনার স্থিতি বা গতিকে অনুবিধ করে। জড় সম্পূর্ণরূপে স্বাধীনতা বিরহিত।

যখন জড়রাজ্য ত্যাগ করিয়া প্রাণিরাজ্যে প্রবেশ করি, তখন জড়ের স্থিতিশীলতার পরিবর্ত্তে প্রাণীর গতিশীলতার পরিচয় পাই বটে, চিন্তারাজ্যে জ্ঞানক্রিয়া সম্পন্ন জীবের আবির্ভাব দেখিতে পাই বটে, কিন্তু মনুষ্য-হৃদয়ের কর্তৃত্ববুদ্ধির কোন নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায় না। জড়ের ন্যায় না হইলেও তাহারা কর্তৃত্ববিহীন ও অন্ধশক্তিদ্বারা চালিত। ইতর প্রাণিরাজ্য পরিহার করিয়া যখন মানব জীবনে প্রবেশ করি, তখন দেখি মানবজীবন দেহ ও আত্মা এই উভয় রাজ্যে বিভক্ত। মানবদেহ অপরাপর জড়পিণ্ডের ন্যায় প্রাকৃতিক শক্তি সমূহের অনুগত ও সম্পূর্ণরূপে কর্তৃত্ববিহীন। কেবল মানবাত্মাতেই আমরা কর্তৃত্ববুদ্ধির প্রথম আভাস প্রাপ্ত হই। কিন্তু সেই কর্তৃত্ব জ্ঞানটুকুও এত অজ্ঞতাতে আবৃত, দুর্ব্বলতাতে অভিভূত ও মোহে জড়িত যে, তাহা কিছুই নয় বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এইরূপে জড় ও চেতন রাজ্যে সর্ব্বত্রই দাসত্ব ও বদ্ধভাব; ইহার সহিত সেই পরম পুরুষের মুক্ত ভাবের তুলনা কর।

তিনি সকলের মধ্যেই আছেন অথচ কাহারও অধীন নহেন। ঘোর বিপ্লবকারী প্রচণ্ড বাত্যা, পর্ব্বত সমান সাগর তরঙ্গের বিকট নৃত্য, আগ্নেয়গিরি সকলের মহা বিনাশকারী অগ্ন্যুদ্গম, সভ্য জনপদ সকলের গর্ব্বখর্ব্বকারী ভীষণ ভূমিকম্প এই সকলের মধ্যেই তিনি বর্ত্তমান অথচ কাহারও অধীন নহেন। তিনি যেন এই সকল দুর্জ্জয় শক্তির ক্রীড়ার মধ্যে উদাসীনবৎ আসীন আছেন। ইহারা তাঁহারই ইচ্ছা হইতে উৎসারিত হইয়া ভুবনকে কম্পিত করিতেছে, ভাঙ্গিতেছে, চূর্ণ করিতেছে, গড়িতেছে, কিন্তু তিনি সর্ব্বোপরি অধিপতি রূপে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া নিষ্ক্রিয় ও শান্তভাবে বিরাজিত আছেন; অপর দিকে মানবাত্মার সংগ্রামের মধ্যে ও তিনি। মানবের রোগ, শোক, দারিদ্র্য, পাপের আত্মগ্লানি, আশা ও নিরাশা, হর্ষ ও বিষাদ, প্রভৃতি কত ভাব ও চিন্তার তরঙ্গ ক্ষুদ্র ও দুর্ব্বল হৃদয় দিয়া বাহিয়া যাইতেছে; তিনি এই সকলের সাক্ষী এবং তাঁহার অমোঘ সাহায্য ধর্ম্মের বিজয় বিধানে নিযুক্ত; অথচ তিনি এই সকল বিক্ষোভকারী কারণের মধ্যে থাকিয়া ও এই সকলের অতীত। এ সকলে তাঁহাকে বিক্ষুব্ধ বা তাঁহার সত্য সঙ্কল্প হইতে তাঁহাকে বিচলিত করিতে পারিতেছে না। তিনি মানবের ভাব তরঙ্গের উপরে উদাসীনবৎ আসীন রহিয়াছেন। কেবল ব্যক্তিগত জীবনের সংগ্রামের মধ্যে নহে; কিন্তু মানবসমাজের বিবাদ, বিদ্রোহ, রক্তপাত, হাহাকার, বিষয় বাণিজ্যের ব্যস্ততা, কার্য্যতৎপরতা সকলের মধ্যেই তিনি প্রতিষ্ঠিত আছেন অথচ তিনি এ সকলের অতীত; এ সকল তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। তিনি স্বীয় শুভ সঙ্কল্পে সুপ্রতিষ্ঠিত থাকিয়া কল্যাণফল-বিধাতা হইয়া রহিয়াছেন।

ঈশ্বরের এই মুক্ত-ভাবের ত্রিবিধ কারণ দৃষ্ট হয়;—১ম তাঁহাতে জ্ঞানের অভাব নাই—২য় তাঁহাতে শক্তির অভাব

নাই, তর তাঁহাতে প্রেমের অভাব নাই। আমরা অল্পজ্ঞান-সম্পন্ন, সেই কারণেই আমরা সম্পূর্ণ আত্মরক্ষা-বিধানে অসমর্থ; সর্ব্বদা ভীত, উৎকণ্ঠিত ও উদ্বিগ্ন। আমাদের কার্য্যের ফলাফল ও পরিণাম অধিকাংশ স্থলেই আমাদের জ্ঞানের অগোচরে থাকে; সুতরাং ভবিষ্যৎ সর্ব্বদাই আমাদের নিকট তমসাচ্ছাদিত ও আশঙ্কা-জনক। তিনি পূর্ণ জ্ঞান, সুতরাং তাঁহাতে কোন উৎকণ্ঠা বা আশঙ্কার কারণ বিদ্যমান নাই; নিজের অবলম্বিত পথ সম্বন্ধে কোন সন্দেহ বা বিতর্ক নাই। ২য়তঃ অনেক সময় দেখিতে পাই যে, আমরা জ্ঞানদ্বারা যাহা লক্ষ্য করি, অশক্তি-নিবন্ধন তাহা অবলম্বন বা পরিহার করিতে পারি না, সেই স্থানেই দুঃখের উৎপত্তি হয়। তাঁহাতে এরূপ দুঃখ সম্ভবে না। তিনি পূর্ণ শক্তি, সুতরাং তাঁহার ইচ্ছার চরিতার্থতা তাঁহার আয়ত্তাধীন; তাঁহার শুভ সঙ্কল্প সিদ্ধ করিবার পথে কোন অন্তরায় নাই। তাঁহার প্রেমের ও অন্ত নাই। মানবের শুভ সঙ্কল্পের ন্যায় তাঁহার শুভ সঙ্কল্প স্বীয় অবলম্বিত পথ হইতে বিচলিত হয় না। তাঁহার প্রেম হইতে মানব-প্রেমের এই প্রভেদ দেখিতে পাই যে মানব-প্রেম সচরাচর প্রেমাস্পদকেই আলিঙ্গন করে। যে ব্যক্তি শরীর মনের সৌন্দর্য্যদ্বারা বা অন্য কোন প্রকার কমনীয় গুণের দ্বারা আমাদের প্রেমকে আকর্ষণ করে, সেই আমাদের প্রীতিভাজন হয়। কিন্তু যাহার প্রেমোদ্দীপক কোন কমনীয় গুণ নাই; অথবা যে ব্যক্তি দেহ মনের কদর্য্যতাদ্বারা আমাদের প্রেমকে বাধা দেয়, আমাদের দুর্ব্বল মন অনেক স্থলেই আর সেরূপ ব্যক্তিকে আলিঙ্গন করিতে পারে না। ঐশ প্রেমের প্রকৃতি অন্য প্রকার। তাহা প্রেমের অপাত্রকেও প্রীতি করিতে পারে। যে স্বীয় প্রকৃতি ও চরিত্রের কদর্য্যতা বশতঃ মানবের ঘৃণাস্পদ, মানবীয় প্রেম যাহার পাপাচারে পরাস্ত হইয়া তাহাকে দূরে পরিহার করিয়াছে, ঐশ-প্রেম তাহারও উদ্ধার-সাধনে নিযুক্ত হয়। পাপী আপনার চারিদিকে পাপের প্রাচীর তুলিয়া দেয়, মনে করে তাহার সেই প্রকোষ্ঠের মধ্যে ব্রহ্মশক্তিরও প্রবেশ সম্ভব নহে, কিন্তু ঐশ-প্রেম সে প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিয়া পাপীর উদ্ধার-সাধন করে। বাজপক্ষী যখন অন্য পক্ষীর পশ্চাদ্ধাবিত হয়, তখন উপর হইতে নিম্নে, নিম্ন হইতে উপরে, এক বৃক্ষ হইতে আর এক বৃক্ষে, এক বন হইতে আর এক বনে এইরূপে স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল প্রদক্ষিণ করিয়াও ক্লান্ত হয় না। সে তাহার বধ্য জীবকে ধরিবেই ধরিবে। সেইরূপ ব্রহ্মকৃপা পাপীর পশ্চাতে ধাবিত হইয়া তাহার উদ্ধার সাধন করিবেই করিবে।

ঐশ-প্রেম যেরূপ প্রেমের অপাত্রকেও আলিঙ্গন করে, সেইরূপ ঐশভাবাপন্ন ব্যক্তিরাও ঘৃণাস্পদকে আলিঙ্গন করিয়া থাকেন। একদিকে দেখিতে গেলে ইহা দ্বারাই প্রকৃত ঈশ্বর প্রীতির বিচার হয়। যিনি ঘৃণাস্পদের প্রতি যে পরিমাণে প্রীতি করিতে সমর্থ, তিনি সেই পরিমাণে ঈশ্বরের প্রতি প্রীতিমান। জগতে এক প্রকার ধার্ম্মিকতার প্রশংসা শুনিতে পাওয়া যায়। যাহাতে নীতি আছে, পবিত্রতা আছে, বিনয় আছে, সৌজন্য আছে, কিন্তু ঘৃণাস্পদের প্রতি প্রবল প্রীতি নাই। আমরা বলি সে জীবনে ব্রহ্ম-শক্তির কার্য্য সমুচিতরূপে আরম্ভ হয় নাই। মানব-প্রেমে যেমন ঘৃণাস্পদকে প্রীতি করিতে পারে না, তেমনি উহাতে হ্রাস বৃদ্ধি আছে। ইহা এক সময়ে সতেজ, উগ্র ও উষ্ণ থাকে আর এক সময়ে দুর্ব্বল, মৃদু ও শীতল হয়। এইরূপে মানবসমাজে মানুষ প্রেমাস্পদকে সততই পরিত্যাগ করিতেছে। ঐশ-প্রেমের প্রকৃতি এরূপ নহে। তাহাতে প্রবলতা ও স্থিরতা চিরবিদ্যমান।

• ঈশ্বর পূর্ণজ্ঞান, পূর্ণশক্তি ও পূর্ণপ্রেম, সুতরাং তিনি স্বভাবতঃই মুক্ত; তিনি সকল নিয়মেরই অধিপতি অথচ কোন নিয়মেরই বশীভূত নহেন; তিনি সকল সংগ্রামেরই সাক্ষী অথচ কোন সংগ্রামদ্বারা বিক্ষুব্ধ নহেন। তিনি মানবের সকল ভাব তরঙ্গের মধ্যে বিদ্যমান অথচ কিছুতেই স্বীয় শুভসংকল্প হইতে বিচ্যুত হন না। তিনি আত্ম-প্রতিষ্ঠিত, স্বতন্ত্র ও শান্ত। জ্ঞানশালী ধীরেরা ও বিশ্বাসী ভক্তেরা যখন তাঁহাকে সত্যের সত্য জানিয়া তাঁহাতে সম্যক্‌রূপে প্রতিষ্ঠিত হন, তখন তাঁহারা জীবন্মুক্ত হইয়া এই শান্ত অবস্থাতে উপনীত হন। তখন আর তাঁহাদের চিত্ত শোক মোহের অধীন হইয়া স্বীয় শুভ সংকল্প হইতে বিচলিত হয় না ও সকল প্রকার বিক্ষোভকারী ঘটনার মধ্যে তাঁহাদের চিত্ত সেই পরাৎপরে বিশ্রান্তি লাভ করিয়া পরমানন্দ উপভোগ করিতে থাকে।

উৎসব উপলক্ষে ২রা জ্যৈষ্ঠ অপরাহ্নে মন্দিরে উপাসনার পর শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের প্রদত্ত উপদেশ।

আমাদের দেশের প্রাচীন অধ্যাত্ম-শাস্ত্র পাঠ করিলে দেখা যায়, মহর্ষিগণ কোনও স্থলে বলিতেছেন, "জ্ঞানদ্বারাই ব্রহ্মলাভ করা যায়।" আবার অন্যত্র বলিতেছেন, "জ্ঞানদ্বারা তাঁহাকে লাভ করা যায় না।" উপনিষৎ (যাহা বেদের শিরোভূষণ) পাঠ করিলে এ সম্বন্ধে বিপরীত ভাবের শ্লোক দেখা যায়।—

"ন চক্ষুষা গৃহ্যতে নাপি বাচা, নান্যৈর্দেবৈস্তপসা কর্ম্মণা বা; জ্ঞানপ্রসাদেন বিশুদ্ধসত্ত্বঃ ততস্তু তং পশ্যতে নিষ্কলং ধ্যায়মানঃ।"

চক্ষুদ্বারা তাঁহাকে প্রাপ্ত হওয়া যায় না, বাক্যদ্বারা, যাগ যজ্ঞাদি কর্ম্ম দ্বারা তাঁহাকে লাভ করা যায় না। তবে কি প্রকারে তাঁহাকে লাভ করা যায়? জ্ঞানপ্রসাদে নির্ম্মলচিত্ত হইয়া ধ্যানপরায়ণ হইলেই সেই নিরুপাধি ব্রহ্মকে লাভ করা যায়। আবার স্থানান্তরে বলিতেছেন—

না বিরতো দুশ্চরিতান্নাশান্তো না সমাহিতঃ
না শান্তমানসো বাপি প্রজ্ঞানেনৈনমাপ্নুয়াৎ।

যে দুশ্চরিত্র হইতে বিরত হয় নাই, যাহার চিত্ত শান্ত সমাহিত হয় নাই, সে কেবল জ্ঞানের দ্বারা তাঁহাকে প্রাপ্ত হয় না। এই দুই শ্লোকের মধ্যে সামঞ্জস্য কোথায়? যেখানে বলা হইয়াছে যে, জ্ঞানের দ্বারা তাঁহাকে লাভ করা যায় না, সেখানে জ্ঞান শব্দে লৌকিক জ্ঞান, বুদ্ধির চাতুর্য্য, বিচারশক্তি, অথবা তর্কশক্তি বুঝিতে হইবে। যেখানে বলিতেছেন, জ্ঞান দ্বারা তাঁহাকে প্রাপ্ত হওয়া যায়, সেখানে পারমার্থিক জ্ঞান উদ্দেশ্য। অনেকে মনে করেন, মানুষ সকল প্রকার জ্ঞানই বুদ্ধি ও

বিচারশক্তিদ্বারা লাভ করে। ইহার তুল্য ভ্রান্ত মত আর কিছুই নাই। তীক্ষ্ণ বুদ্ধিদ্বারা দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক সত্য সকল লাভ করা যায়, কিন্তু ধর্ম্ম কেবল বুদ্ধি ও বিচার শক্তির সাহায্যে লাভ করা যায় না। ধর্ম্ম হৃদয়ের বিষয়, সাধনার বিষয়। বিচার শক্তির পরিচালনাদ্বারা ধর্ম্মতত্ত্ব শিক্ষা করা যায়, কিন্তু ধর্ম্মকে পাওয়া যায় না—ধর্ম্ম ও ধর্ম্মতত্ত্ব এক নহে। আমরা কি দেখি নাই, ধর্ম্মতত্ত্বে ও ধর্ম্মশাস্ত্রে সুপণ্ডিত কত ব্যক্তি জীবন সম্বন্ধে নিতান্ত হীন? তাঁহাদের জীবনে ধর্ম্মের কোন লক্ষণ নাই। মহাপণ্ডিত বলিয়া জগতে বিখ্যাত অথচ ভক্তি জানে না, উপাসনায় মন স্থির থাকে না, ভগবানে মন বসে না; শাস্ত্র-জ্ঞানে পণ্ডিত, ধর্ম্মবিজ্ঞানে অভিজ্ঞ হইয়াও ছয় রিপুর গোলাম। ধর্ম্মতত্ত্বে পাণ্ডিত্য এবং জীবনগত ধর্ম্মে অনেক তফাৎ। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদিগকে ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় প্রশ্ন দিলে তাহারা পুস্তক হইতে মুখস্থ করিয়া সমুদায় উত্তমরূপে উত্তর করিতে পারে। দুঃখের বিষয়, যাহারা এইরূপে ধর্ম্মতত্ত্বে শিক্ষিত হয়, তাহাদিগের মধ্যে অতি অল্প লোকেই জীবনে ধর্ম্মলাভ করিয়া থাকে।

যাহাদিগের জীবনের লক্ষ্য স্থির আছে, শাস্ত্র ও বিচার-শক্তি তাহাদিগকে উদ্দেশ্য-পথে গমন করিতে সাহায্য করে। কেবল ধর্ম্ম শাস্ত্র নয়, সকল শাস্ত্র সম্বন্ধেই এই রূপ; সমুদায় জ্ঞানই সেই পরম জ্ঞানের প্রতি চিত্তকে নিবিষ্ট করে, যদি জীবনের লক্ষ্য ঠিক থাকে। বুদ্ধি ও বিচার-শক্তি ভিন্ন যে সত্য লাভের অন্য রাস্তা নাই তাহা নহে। বাহিরের সত্য সম্বন্ধেও একথা খাটে। যে পূর্ণিমার চাঁদ দেখিয়া গোল থালার মত চক্‌চকে একটা জিনিস বই কিছু দেখিল না, যে মজিল না, সেই সৌন্দর্য্যে যার প্রাণ গলিল না, তাহার কিছুই দেখা হইল না। বাগানে গোলাপ ফুল দেখিতে গিয়া, যদি তুমি তাহার রং, দৈর্ঘ্য, প্রস্থ দেখিয়া আইস; কিন্তু তোমার হৃদয়ের ফুল না ফোটে, তবে তোমার গোলাপ ফুল দেখা হইল না। গোলাপ ফুল কেবল চামড়ার চোখে দেখা যায় না; হৃদয়ের চক্ষু চাই। যতক্ষণ দুই চক্ষু না দেখে, ততক্ষণ দেখা হয় না। কেবল শুষ্ক জ্ঞানতে ধর্ম্মজীবন লাভ করা যায় না। যাহাতে প্রাণ শীতল করে, যাহাতে হৃদয়ের জ্বালা দূর হয়, সেই কৃপার জল অন্তরে না পড়িলে ধর্ম্ম হয় না। চাতক যেমন নদী সরোবরের জল উপেক্ষা করিয়া "ফটিক-জল" বলিয়া চীৎকার করে, ব্রহ্মসাধক ও সেইরূপ সংসারের সহস্র ভোগের বিষয় উপেক্ষা করিয়া, বিদ্যা বুদ্ধি ও তর্কে অতৃপ্ত হইয়া, ব্রহ্মের করুণাবারি লাভের জন্য ব্যাকুল হন।

অধিকাংশ লোক শুষ্ক ধর্ম্মমত লইয়াই ব্যস্ত। প্রকৃত ধর্ম্ম যাহা তাহা তাহাদের হৃদয়ে স্থান পায় না। পাষাণ প্রাণ তাঁহার করুণা ভিন্ন গলে না। বিশুদ্ধ মত, দর্শন ও বিজ্ঞানেতে মুক্তি হয় না। বড় তৃষ্ণার্ত্ত যে, সে জল চায়; তাহাকে যদি শুষ্ক তর্কের বালুকা দাও, তবে তাহার তৃষ্ণা মিটিবে কেন? সে ঘোলাজলও খাবে, কিন্তু তপ্ত বালুকায় তাহার তৃষ্ণা-নিবারণ হবে না। তোমাদের কাছে পরিষ্কার জল থাকে তো দাও। নতুবা যে ধর্ম্মপিপাসু সে শুষ্ক মতে ভুলিবে না, সে ঘোলা খাবেই। তোমরা পরিষ্কার জল দিতে পার না? ইহা প্রাণের পিপাসা বোঝে না, যে কেবল তর্ক বিচার লইয়া ব্যস্ত, সে এক জগতের লোক; আর যে প্রাণের যাতনায় অস্থির, ষড়রিপুর আঘাতে ব্যতিব্যস্ত, সে আর এক জগতের লোক। সে শুষ্ক মতের ধর্ম্মে ভুলে না। অবশ্যই মতামত দৃঢ় থাকা চাই। দর্শন বিজ্ঞানের যে প্রয়োজন নাই তা নয়। কিন্তু শুধু তাহাতে প্রাণ ভিজে না। তাহাতে ছটা রিপুর উৎপাত ঘুচে না। এক বিন্দু ভক্তি পেলে বেঁচে যাই। অনেক শাস্ত্র-চর্চ্চা করিয়া দেখিলাম, তাহাতে প্রাণে শান্তি পাইলাম না। ব্রাহ্মসমাজে এক বিন্দু ভক্তি আসুক, বাচালতা চলিয়া যাক্, মরুভূমিতে বন্যা প্রবাহিত হউক্।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ এদেশের অনেক উপকার করিয়াছেন; ব্রাহ্মধর্ম্মের মতের বিশুদ্ধতা রক্ষা করিয়াছেন ও করিতেছেন। নরনারীর আধ্যাত্মিক স্বাধীনতা সমর্থন করিয়াছেন ও করিতেছেন। আজ আমাদের নারীগণ জ্ঞানে ও শিক্ষায় উন্নতি লাভ করিয়াছেন; আমরা জাতিভেদের উন্মূলন করিতেছি; পৌত্তলিকতা তুলিয়া দিতেছি; কিন্তু কেবল এই সকল সংস্কারে তৃপ্ত হইলে চলিবে না। এ সকল সব ভাল। কিন্তু ভাই ভগিনীগণ! প্রাণের ভিতর ভগবানের প্রতি স্থায়ী ভক্তি লাভ করিতে পারিয়াছি কি না? যাহারা সংশয়বাদী, নাস্তিক তাহারাও তো এই সকল সংস্কারের কাজে ব্রতী। ইংলণ্ডে ব্রাড্‌ল প্রভৃতি কত নিরীশ্বরবাদী প্রাণগত পরিশ্রম করিয়া, জীবন দিয়া সংস্কারের কার্য্য করিয়াছেন। মহৎ কার্য্য যেমন আস্তিকের তেমনি নাস্তিকেরও কর্ত্তব্য। কিন্তু আমাদিগের বিশেষ কর্ত্তব্য আছে। সর্ব্বদা অন্তর্দৃষ্টি যেন জাগ্রত থাকে, যে প্রাণের ভিতর প্রাণেশ্বরকে দেখিতে পাইতেছি কি না? আমাদিগের মধ্যে বিশ্বাস ভক্তি আসুক। তাঁর নামে সকলে এক হইয়া যাই।

প্রত্যেক ব্রাহ্মিকা ও ব্রাহ্মের হৃদয়ে ভক্তির ফোয়ারা খুলে যাক। ঈশ্বরেতে সকলে এক হইয়া যাক্। তাঁহার অনুগত জীবন যাহাতে হয়, সেজন্য ব্যস্ত হই। শুষ্ক ভাব, নীরস ভাব, বাচালতা আর ভাল লাগে না। শুষ্ক কথায় আর প্রাণ ঠাণ্ডা হয় না। প্রাণ শীতল হয় না। শুষ্ক কথায় ধর্ম্মপিপাসুর প্রাণের তৃষ্ণা মিটে না। জল দাও, জল দাও, বাঁচি। সেই যৌবন কাল হইতে ধর্ম্ম ধর্ম্ম করিতেছি; এখন বৃদ্ধ হইতে চলিয়াছি, এখনও কি ধর্ম্মের কথা লইয়াই থাকিব? আসুক্ আমাদিগের মধ্যে ভক্তি আসুক, আধ্যাত্মিকতা আসুক। এই যে রিপু কটা—এই যে কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য, হে ব্রাহ্মগণ, প্রাণেরদিকে তাকাইয়া একটা একটা করিয়া গণিয়া লও দেখি, কার কটা কমিয়াছে? যাহার যত বয়স, সে ততটা মৃত্যুর নিকটবর্ত্তী; পরকালের জন্য কে কতটা প্রস্তুত ভাবিয়া দেখ। "ইহা করিয়াছি, তাহা করিয়াছি" বলিয়া জবাব দিলে হইবে না। হৃদয় পবিত্র হইয়াছে কি না? রিপু দমন হইয়াছে কি না? সত্য-স্বরূপেতে হৃদয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে কি না? তাঁহার ধর্ম্মকে জীবনের উদ্দেশ্য করিয়াছ কি না? এসকল প্রশ্নের উত্তর দাও।

ব্যাখ্যান-রত্নাবলী।

২৫শে মে, ১৮৯৩, সাধনাশ্রমে ব্যাখ্যাত।

'Many there be which say of my soul, There is no help for him in God.

"But thou, O Lord art a shield for me; my glory and the lifter up of mine head.

"I cried unto the Lord with my voice, and he heard me out of his holy hill.

"I laid me down and slept; I awaked; for the Lord sustained me." Ps. III, 2-5.

"এমন অনেক লোক আছে, যাহারা আমার আত্মার সম্বন্ধে বলে 'ও যে সর্ব্বদা 'ঈশ্বর ঈশ্বর' করে, ঈশ্বর হইতে ওর কোন আশা নাই।' কিন্তু তুমি আমার বর্ম্মস্বরূপ, আমার ঢাল আমার গৌরব তুমিই আমার মস্তক উন্নত করিয়া রাখিয়াছ।

"আমি প্রভু পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিলাম; তিনি দয়া করিয়া আমার প্রার্থনা শুনিয়াছেন। সুতরাং আমি অকাতরে নিদ্রা গেলাম ও সুখে জাগ্রত হইলাম। কারণ প্রভু পরমেশ্বর আমাকে রক্ষা করিয়াছেন।"

যখনই ঈশ্বরের কোনও সাধক তাঁহার করুণার উপর নির্ভর স্থাপন করিতে অগ্রসর হন, তখনই পৃথিবীর লোক বলে "ও লোকটা বৃথা 'ঈশ্বর, ঈশ্বর' করে; ঈশ্বরের নিকট হইতে কোন সাহায্যের আশা নাই।" নানাপ্রকার লোক এইরূপ বলিয়া থাকে। প্রথমতঃ যাহারা সংসারে আসক্ত, বিষয়সুখে নিমগ্ন, মোহে অন্ধ; যাহারা বিষয়কে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জানিয়া তাহারই পূজা করে, যাহারা ধর্ম্মের ধার ধারে না, যাহারা ঈশ্বরচিন্তাকে হৃদয় হইতে বিদায় করিয়াছে, যাহারা ঈশ্বরে বিশ্বাসস্থাপন করে না। তাহারাই বলে "এব্যক্তি বাতুল এ পাগল, এ 'ঈশ্বর ঈশ্বর' করিয়া জীবনটা নষ্ট করিল। কোথায় বা ঈশ্বর, কোথায় তাঁর দয়া? ঈশ্বর ঈশ্বর করিয়া কিছুই হইবে না। ঈশ্বরের নিকট ইহার কোনও আশাই নাই"। দ্বিতীয়তঃ যাহারা পাপেতে আসক্ত, মৌমাছি মধুর ভিতর যেমন জড়াইয়া পড়ে ডুবিয়া যায়, উঠিতে পারে না, তেমনি পাপাসক্তির প্রবলতা বশতঃ, চিত্তের নিকৃষ্টতা ও স্থূলতা বশতঃ, যাহারা পাপে ডুবে, আর উঠিতে পারে না, তাহারা এইরূপ কথা বলিয়া থাকে। অনেক সময় হয় তো তাহারা ধর্ম্মবিষয়ক কথা বলে, ধর্ম্মের তত্ত্ব সকল লইয়া নাড়াচাড়া করে; তাহারা 'কোথায় ঈশ্বর,' ঈশ্বরের সাহায্য পাওয়ার আশা বৃথা' এইরূপ কথা মুখে না বলিলেও নিজেদের ব্যবহার দ্বারা বলে। কারণ কি, যদি সত্য পরমেশ্বরেতে মানুষের ঠিক বিশ্বাস থাকে, তবে তার কখনই পাপে মতি হইতে পারে না, সে কখনই ক্ষুদ্র সুখে ডুবে না। পাপাসক্ত ব্যক্তি মুখে না বলুক, কাজে নাস্তিক। তৃতীয়তঃ, যাহারা নাস্তিক, যাহারা অনেক চিন্তা করিয়া, বিচার করিয়া দেখিয়াছে, যে ঈশ্বরের সত্তার কোন প্রমাণ নাই, ঈশ্বরের করুণার কথা তাহাদের হৃদয়ে স্থান পায় না। এই সকল লোক বলিয়া থাকে, "কোথায় ঈশ্বর, 'ঈশ্বর ঈশ্বর করিতেছ কেন? ঈশ্বরের হাত তো কোথাও নাই।"

কিন্তু এই তিন শ্রেণী ভিন্ন আর এক শ্রেণীর লোক এরূপ কথা বলিয়া থাকে। আমার বোধ হয় এই তিন শ্রেণীর লোক অপেক্ষা সেই লোকদের অবস্থা অধিক শোচনীয়। এই সকল লোক ধর্ম্মসমাজেই বাস করে। ইহারা ধর্ম্মের কথা মুখে বলে, ঈশ্বরের নাম ইহাদের রসনাতে সর্ব্বদাই আছে, ধর্ম্মকর্ম্মেও ধর্ম্মসমাজের কাছে ইহাদের উৎসাহ খুব আছে। কিন্তু অন্তরে ইহারা বিষয়াসক্ত। পরমেশ্বরকে সত্য বস্তু বলে, কিন্তু পরমেশ্বরের উপর নির্ভর করিয়া চলাকে নির্ব্বোধের কাজ মনে করে। মুখে ইহারা সর্ব্বদা বলে 'ধর্ম্ম আমাদের প্রাণ হউক, ধর্ম্মেতে আমাদের উৎসাহ হউক,' কিন্তু অন্তরে ঈশ্বরে নির্ভর রাখে না। যখনই কোন লোক ঈশ্বরে সম্পূর্ণ নির্ভর করে, তখনই তাহাকে জিজ্ঞাসা করে, 'তোমার কি ক'রে চলে?' যদি বলা যায় 'ঈশ্বরের অনুগ্রহে দিন চলিতেছে,' তবে তাহারা বলিবে 'হাঁ, ঈশ্বরের অনুগ্রহে তো চলিতেছে; তবে, কি ক'রে চলে?' ইহারা বলে "ঈশ্বর, ঈশ্বর' কর, ঈশ্বরের পূজা কর, কিন্তু নিজের কাছে এমন কিছু রাখ, যাতে নিজেকে বাঁচান যায়।" ইহারা নির্ভর নিজের উপর রাখে, ঈশ্বরের উপর রাখে না। ইহারা ধর্ম্মসমাজের নাস্তিক। ইহারা অন্য তিন শ্রেণীর নাস্তিক অপেক্ষা হীন। সত্য বলিয়া কোন মানুষ ঈশ্বরের উপর নির্ভর করিলে ইহারা বলে, "পরমেশ্বর হইতে তোমাদের কোন সাহায্যের আশা নাই।" প্রকৃত বিশ্বাসী যিনি, তিনি এ সকল শুনিয়া বলেন, But thou, O Lord, art a shield for me; My glory and the lifter-up of mine head.—এ সকল কথা তো শুনিতেছি, কিন্তু হে প্রভু তুমি আমার হৃদয়ের ঢাল, তুমি আমার গৌরব। 'তুমি আমার গৌরব' একথার অর্থ কি? আমাদের সকল ভরসা সব তিনি; আমাদের যা কিছু উৎসাহ তাঁহারি জন্য; আমাদের যাহা কিছু কোমরের জোর তা তাঁহারি; আমাদের যাহা কিছু কাজ তা তাঁহারি; আমাদের যাহা কিছু শক্তি তা তাঁহারি; আমাদের যাহা কিছু ভরসা, তাঁহারই উপর। "তুমি আমাদের শক্তি, আমাদের পিতা, চিরকাল সঙ্গে আছ," এই বিশ্বাস চিত্তে জাগ্রত থাকাই বিশ্বাসী ব্যক্তির লক্ষণ। এই বিশ্বাসের কাছে যখন আপনার জীবন মিলাই, তখন লজ্জায় মাথা মাটিতে পুঁতিয়া ফেলিতে ইচ্ছা হয়। তখন বলি 'কেন পরমেশ্বরের সাক্ষী দিতে যাই, কেন ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিতে যাই, কেন ব্রহ্মশক্তির কথা বলি?' সত্য ঈশ্বরের উপর নির্ভর করিলে কি ভয় মনে থাকিতে পারে? মানুষ আগুন হয়ে যায় যে ধর্ম্মে, কাম ক্রোধ লোভ পুড়ে যায় যাতে, হৃদয় পরিশুদ্ধ হয় যাতে, সে অগ্নিতে কেন প্রজ্বলিত হই না? আমরা নিশ্চয়ই এই চারি শ্রেণীর কোন শ্রেণীতে রহিয়াছি। নিশ্চয়ই ঈশ্বরেতে নির্ভর এখনও হয় নাই। হয় মানুষের উপর, নয় নিজের শক্তির উপর, নয় অন্য কিছুর উপর নির্ভর রহিয়াছে। একখানা মন বলে, 'ঈশ্বরেতে নির্ভর করি,' আর আধখানা বলে 'There is no help for me in God.' এরূপ মন নিয়ে কাজ ক'র্ত্তে আর ইচ্ছা করে না। ভগবানের কৃপায়

সেই সত্য বিশ্বাস যদি আসে, যাতে সমুদয় হৃদয়ের সহিত বলা যায়, 'আছেন, আমার জন্ত প্রভু পরমেশ্বর সহায় আছেন', তাহা হইলে আমাদের দিয়ে তাঁর কাজ হবে। নতুবা এ প্রকার আধখানা মনের আধখানা বিশ্বাস, আধখানা নির্ভর দিয়ে কিছু হবে না।

পাঞ্জাব প্রচারযাত্রীর পত্র।

একটী বিশেষ কারণে ঝান্সি হইতে আমাদিগের প্রচার-দল দুই ভাগে বিভক্ত হয়, শাস্ত্রী মহাশয় এবং শ্রীযুক্ত প্রকাশদেব হোসেঙ্গাবাদ হইয়া ইন্দোর এবং বাবু হরিমোহন ঘোষাল ও শ্রীযুক্ত সুন্দর সিংহ কানপুর হইয়া এলাহাবাদ যাত্রা করেন। ইন্দোরের কার্য্য বিবরণ :—

১২ই মে ইন্দোর—প্রাতে স্থানীয় ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনা হয়। শ্রীযুক্ত প্রকাশদেব উপাসনা করেন। সন্ধ্যার সময় সঙ্গীত প্রার্থনা এবং স্থানীয় ব্রাহ্ম বন্ধুগণের সহিত কথা বার্ত্তা হয়।

১৪ই মে—শাস্ত্রী মহাশয় প্রাতে হিন্দিতে উপাসনা এবং অপরাহ্নে মন্দিরে ইংরাজীতে বক্তৃতা করেন। বক্তৃতা সভায় দুই শতের অধিক লোক উপস্থিত ছিলেন। সন্ধ্যার সময় শ্রীযুক্ত প্রকাশদেব মন্দিরে উপাসনা করেন ও "নবজীবন লাভ ভিন্ন কেহ ঈশ্বর দর্শন করিতে পারে না" এই বিষয়ে উপদেশ দেন। উপাসনা ও উপদেশে উপাসকগণের মধ্যে এক অপূর্ব্ব ভক্তির স্রোত প্রবাহিত হইয়াছিল, সকলে কৃতার্থ হইয়া ঈশ্বরকে ধন্যবাদ করেন।

দ্বিতীয় দলের কার্য্যবিবরণ—বাবু হরিমোহন ঘোষাল ও শ্রীযুক্ত সুন্দর সিংহ ৮ই মে কানপুরে পৌছেন। এবং ইঁহাদের সহিত শ্রীমান্ জগদীশচন্দ্র রায় লক্ষ্ণৌ হইতে আসিয়া যোগদান করেন। ইঁহারা শ্রীযুক্ত বাবু ক্ষেত্রনাথ ঘোষ গবর্ণমেণ্ট উকীল মহাশয়ের গৃহে অবস্থিতি করেন। ঐ দিন সন্ধ্যাকালে তাঁহার বাসায় সংগীত সংকীর্ত্তন ও প্রার্থনাদি হয়। শ্রীযুক্ত সুন্দর সিংহ প্রার্থনা করেন। তৎপর দিবস প্রাতে পারিবারিক উপাসনা হয়, শ্রীযুক্ত সুন্দর সিংহ উপাসনা করেন। অপরাহ্নে ঐ বাসাতেই উর্দুতে বক্তৃতা হয়, বক্তা শ্রীযুক্ত সুন্দর সিংহ বিষয়—"বিশ্বজনীন শুভ সংবাদ।" বক্তৃতা সারগর্ভ ও হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল।

১০ই মে—প্রাতে ক্ষেত্র বাবুর গৃহে উপাসনা হয়, হরিমোহন বাবু উপাসনা করেন। অপরাহ্নে ধর্ম্মশাস্ত্রের বচন উল্লেখ করিয়া হরিমোহন বাবু ও শ্রীমান্ জগদীশচন্দ্র রায় কিছু কিছু বলেন, তৎপর সঙ্কীর্ত্তন হয়।

১১ই মে—ক্ষেত্র বাবুর গৃহে উপাসনা হয়, শ্রীযুক্ত সুন্দর সিংহ উপাসনা করেন। সন্ধ্যার সময় হরিমোহন বাবুর কথকতা হয়। তৎপর দিবস ইঁহারা এলাহাবাদ যাত্রা করেন। স্থানীয় ব্রাহ্মবন্ধুগণ ইঁহাদিগকে সাদরে অভ্যর্থনা করেন, ইঁহারা উকিল শ্রীযুক্ত বাবু প্রিয়নাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের গৃহে অবস্থিতি করেন।

১২ই মে—সন্ধ্যার সময় প্রিয়বাবুর গৃহে সঙ্গীত সংকীর্ত্তন ও প্রার্থনা হয়, শ্রীযুক্ত সুন্দর সিংহ প্রার্থনা করেন।

১৩ই মে—প্রাতে প্রিয়বাবুর গৃহে উপাসনা হয়, হরিমোহন বাবু উপাসনা করেন। স্থানীয় ব্রাহ্মসমাজের ৬৭ জন সভ্য উপস্থিত ছিলেন। সন্ধ্যার পর প্রায় ১০।১২ জন বাঙ্গালী আসিয়া একত্রিত হন। শ্রীযুক্ত সুন্দর সিংহ প্রার্থনা করেন, সঙ্গীত ও সংকীর্ত্তন হয়।

১৪ই মে—বাবু কেদারনাথ মণ্ডল মহাশয়ের গৃহে উপাসনা হয়, হরিমোহন বাবু উপাসনা করেন। সন্ধ্যার পর স্থানীয় ব্রহ্মোপাসনালয়ে সাপ্তাহিক উপাসনা হয়। হরিমোহন বাবু উপাসনার কার্য্য করেন। প্রায় ২৫ জন বাঙ্গালী উপস্থিত ছিলেন। অদ্যকার উপাসনা ও কীর্ত্তনাদি অতি মধুর হইয়াছিল।

১৫ই মে—অদ্য প্রাতে ইঁহারা গঙ্গাযমুনা-সঙ্গম প্রয়াগতীর্থ দেখিতে যান। অমাবস্যা উপলক্ষে নানা শ্রেণীর অনেক লোক স্নান করিতে আসিয়াছিলেন। কোন কোন যাত্রীর দু একটি কার্য্য অতি আশ্চর্য্য জনক হইয়াছিল। একজন আপনার মস্তক বালুকায় (গলদেশ পর্য্যন্ত) প্রোথিত করিয়া পড়িয়া আছেন এবং দুই হস্তবিস্তার করিয়া যাত্রীদিগের নিকট ভিক্ষা চাহিতেছেন। আর একজন উর্দ্ধবাহু, চিরকালের জন্ত বাম হস্তখানা উর্দ্ধ উত্তোলন করিয়া রাখিয়াছেন। হাতের অবস্থা দেখিলে শরীর শিহরিয়া উঠে। ইনিও ভিক্ষার জন্ত ব্যস্ত। অদ্য সন্ধ্যার সময় রামচরণ শুকুল নামক একটী বাবুর গৃহে পাঠ, ব্যাখ্যা, কীর্ত্তন ও প্রার্থনাদি হয়। হরিমোহন বাবু সমুদায় কার্য্য সম্পাদন করেন। প্রায় ৪০ জন বাঙ্গালী উপস্থিত ছিলেন। ইঁহাদের অধিকাংশই হরিসভার সভ্য। সকলেই অতি আগ্রহের সহিত কীর্ত্তনাদি শ্রবণ করেন।

১৬ই মে—গঙ্গার অপর পারে ঝুন্সী নামক একটি স্থান আছে, এস্থান নির্জ্জন, দৃশ্য অতি মনোহর। এখানে অনেক সন্ন্যাসী ফকির বাস করেন। অদ্য ইঁহারা এই স্থান দেখিতে গমন করেন এবং হংসরাজ নামক একজন পরমহংসের আশ্রমে অতিথি হন। পরমহংস মহাশয় ইঁহাদিগকে সাদরে অভ্যর্থনা করেন। তাঁহার সৌম্যমূর্ত্তি, বিনীত ভাব ও মিষ্ট বাক্য এবং উদার ধর্ম্মমতে সহজেই চিত্ত আকৃষ্ট হয়। প্রসঙ্গক্রমে তিনি অনেক সার কথা বলেন, তাহার মধ্যে প্রধান তিনটি এই—(১) যাহা ভাল, সত্য বলিয়া বুঝিবে, তাহা প্রাণপণে করিবে, আর যাহা মন্দ, অসত্য তাহা পরিত্যাগ করিবে। (২) সাবধান কোন লোকের ফাঁদে পড়িও না। স্বভাবের নিয়ম কেহ লঙ্ঘন্ করিতে পারে না। স্বভাবকে অতিক্রম করিয়া যাহারা ২।১ ঘণ্টার মধ্যে কিছু লাভ করিতে চায়, তাহারা অনেক দূরে সরিয়া পড়ে। মানুষের সাহায্য চাই বটে, কিন্তু চিনিয়া লওয়া বড় কঠিন। তাঁহার (ভগবানের) মধ্য দিয়া যে সাধুকে পাওয়া যায়, সেই প্রকৃত সাধু। (৩) বিশ্বাস চাই, তাঁহার উপর নির্ভর করিয়া পড়িয়া থাকিতে পারিলে যেখানেই থাক, কৃতকার্য্য হইবে। তৎপর হিন্দিতে ভজন ও প্রার্থনা হয়। শ্রীযুক্ত সুন্দর সিংহ প্রার্থনা করেন। পরমহংস মহাশয় নিবিষ্ট চিত্তে যোগ দেন এবং আদি সমাজের সঙ্গীত শুনিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে, সংগীত করা হয়।

ইঁহারা আশ্রমে রাত্রি যাপন করিয়া, তৎপর দিবস প্রাতে সহরে প্রতিগমন করেন।

সন্ধ্যার সময় স্থানীয় হরিসভার সম্পাদক মহাশয়ের যত্নে এক সভা আহূত হয়। প্রায় ৫০ জন হিন্দু মহিলা ও শতাধিক ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন। এই সভায় বাবু হরিমোহন ঘোষাল জগাই মাধাই উদ্ধার বিষয়ে কথকতা করেন। ভগবানের নামের শক্তি অদ্ভুত, তাঁহার নামে সকলের হৃদয় বিগলিত হইল, এক মধুর ভক্তির স্রোত প্রবাহিত হইল। ভগবানের শক্তিতে জগাই মাধাইর নবজীবন লাভ, পাপীর জীবনে বিধাতার লীলার এক অপূর্ব্ব দৃষ্টান্ত। ইহাতে প্রাণ কাহার না বিগলিত হয়?

১৮ই মে—সন্ধ্যার সময় পণ্ডিত যোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় নামক একটী বাবুর গৃহে পাঠ, ব্যাখ্যা, প্রার্থনা ও কীর্ত্তন হয়। প্রথমে শ্রীযুক্ত সুন্দর সিংহ প্রার্থনা করেন, পরে শ্রীমান্ জগদীশচন্দ্র রায় শাস্ত্রীয় বচন পাঠ করিয়া কিছু বলেন, তৎপর বাবু হরিমোহন ঘোষাল কিছু বলেন। প্রায় ৪০ জন ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন। ইঁহাদের অধিকাংশ হরিসভার সভ্য। সকলেই অতি আগ্রহের সহিত কীর্ত্তনাদি শ্রবণ করেন ও আনন্দ প্রকাশ করেন।

১৯এ মে—অপরাহ্ণে কায়স্থ পাঠশালা হলে এক সভা হয়, সভায় প্রায় শতাধিক লোক উপস্থিত ছিলেন। আরম্ভ সূচক একটী হিন্দি সঙ্গীত হইলে, শ্রীযুক্ত সুন্দর সিংহ উর্দ্দুতে "ধর্ম্ম মানবের স্বাভাবিক" এ বিষয়ে বক্তৃতা করেন, তৎপর আর একটি সঙ্গীত হয় এবং বাবু হরিমোহন ঘোষাল "ধর্ম্ম সাধনের উপায় ও জীবনে তাহার প্রকাশ" এই বিষয়ে সংক্ষেপে কিছু বলেন; সর্ব্বশেষে আর একটী সঙ্গীত হয়। বক্তৃতা সারগর্ভ ও হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। স্থানীয় কোর্টের উকিল শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বক্তাদ্বয়কে ধন্যবাদ দেন ও ব্রাহ্মসমাজের উদ্দেশ্য ও কার্য্য সম্বন্ধে ইংরাজিতে কিছু বলেন, তৎপর সভা ভঙ্গ হয়।

২০এ মে—অদ্য মুরদাবাদস্থ বাবু শরচ্চন্দ্র গাঙ্গুলী বি, এ, ইঁহাদিগকে তাঁহার গৃহে আহ্বান করেন। সেখানে হরিমোহন বাবুর কথকতা হয়। প্রায় ৬০ জন ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন।

২১এ মে—অদ্য শাস্ত্রী মহাশয় ও শ্রীযুক্ত প্রকাশ দেব ইন্দোর হইতে এলাহাবাদে আসিয়া ইঁহাদের সহিত সম্মিলিত হইলেন। প্রায় এক পক্ষ কাল পরে আবার সকলে সম্মিলিত হইলেন। সন্ধ্যার সময় স্থানীয় উপাসনালয়ে শাস্ত্রী মহাশয় সাপ্তাহিক উপাসনায় আচার্য্যের কার্য্য করেন। অদ্যকার উপাসনা ও উপদেশ প্রাণস্পর্শী হইয়াছিল। প্রায় ৫০ জন বাঙ্গালী উপস্থিত ছিলেন।

২২এ মে—প্রাতে প্রিয়নাথ বাবুর গৃহে উপাসনা হয়, শাস্ত্রী মহাশয় উপাসনা করেন। প্রায় ২০ জন লোক উপস্থিত ছিলেন। অপরাহ্ণে কায়স্থ পাঠশালা হলে শাস্ত্রী মহাশয় ইংরাজিতে বক্তৃতা করেন। প্রায় দেড় শত লোক উপস্থিত ছিলেন। ব্রাহ্মধর্ম্ম উদার বিশ্বজনীন ধর্ম্ম, কালে এ ধর্ম্মই সমস্ত জাতির ধর্ম্ম হইবে এই বিষয় অতি উজ্জ্বলরূপে বর্ণন করেন। তৎপর প্রিয়নাথ বাবু এই বলিয়া বক্তাকে ধন্যবাদ দেন, যে "আমরা অতি সারগর্ভ ও চিন্তাপূর্ণ বক্তৃতা শ্রবণ করিলাম। ইহাই সত্যধর্ম্ম, ইহা সরল ও সকলের উপযোগী, এই উপদেশ পূর্ণ বক্তৃতার জন্য আমরা বক্তাকে অন্তরের সহিত ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।" সর্ব্বশেষে একটী সঙ্গীত হইয়া সভা ভঙ্গ হয়।

আমাদের প্রচার কার্য্য এবার এখানেই শেষ হইল। এলাহাবাদস্থ অনেকেই আমাদিগকে তাঁহাদের গৃহে উক্তরূপে কার্য্য করিবার জন্য আগ্রহের সহিত আহ্বান করিয়াছিলেন। কিন্তু আমাদিগকে শীঘ্রই প্রত্যাগমন করিতে হইল বলিয়া আমরা তাঁহাদের অনুরোধ রক্ষা করিতে পারি নাই। তাঁহাদের সদিচ্ছার জন্য অন্তরের সহিত আমরা ধন্যবাদ করি।

দু একটী কথা বলিয়া উপসংহার করিব। পঞ্জাবের অবস্থা পূর্ব্বেই প্রকাশ করিয়াছি। বাঙ্গালা দেশ অপেক্ষা পঞ্জাবের প্রচারক্ষেত্র অধিকতর ফলোপধায়ী। মহাত্মা নানক এই ভূমি অনেক পরিমাণে প্রস্তুত করিয়া গিয়াছেন। জাতিভেদ প্রথাও এখানে অত্যন্ত শিথিল এবং লোকের হৃদয় স্বভাবতই ধর্ম্মপ্রবণ। এ সময়ে এখানে যত্নপূর্ব্বক ব্রাহ্মধর্ম্মের সত্য প্রচার করিলে অচিরে সুফল ফলিবে।

শেষ কথা এই, এবার আমরা উজ্জ্বলরূপে অনুভব করিয়াছি, মানবের শক্তিতে কিছুই হয় না। মানুষ বুদ্ধি বিবেচনাদ্বারা সত্যরাজ্য প্রতিষ্ঠা করিতে পারে না। স্বয়ং পরমেশ্বরই তাঁহার ধর্ম্ম প্রচার করেন। তাঁহার শক্তিতেই কার্য্য হয়। এলাহাবাদে মাত্র ৬।৭ জন বাঙ্গালী ব্রাহ্মসমাজের সহানুভূতিকারক আছেন; আর কেহই ব্রাহ্মধর্ম্ম বা ব্রাহ্মসমাজের সহিত কোনও সংস্রব রাখিতেন না। তাঁদের যোগ হরিসভার সহিত। কিন্তু ব্রহ্মের নামের শক্তিতে আশাতীত ফল দেখা গিয়াছে। সাধারণতঃ প্রায় সকলেরই ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতি শ্রদ্ধা আকৃষ্ট হইয়াছে। তিন জনের বিশেষভাবে হৃদয় পরিবর্ত্তন হইয়াছে। তাঁহাদের একজন উকিল ও একজন গ্রাজুয়েট। আর একজন সাধনাশ্রমের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছেন। একজন হিন্দুস্থানীর মত পরিবর্ত্তন হইয়াছে, তিনি আমাদের কাগজের গ্রাহক হইয়াছেন। আমরা যেখানে নিরাশ হইয়াছিলাম, ভগবান সেখানে আশাতীত ফল দিয়াছেন। আমরা ২৪এ মে কলিকাতায় পৌঁছি। শেণ্টার সংস্রষ্ট কতিপয় বন্ধু আমাদিগকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য হাবড়া ষ্টেশনে উপস্থিত হইয়াছিলেন।

প্রেরিত পত্র।

(পত্র প্রেরকদিগের মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন।)

মান্যবর

শ্রীযুক্ত তত্ত্বকৌমুদী সম্পাদক

মহাশয় সমীপেষু।

মহাশয়! গত ১লা জ্যৈষ্ঠের তত্ত্বকৌমুদীতে সাধারণ "ব্রাহ্মসমাজের জন্মোৎসব উপলক্ষে আত্মপরীক্ষা" নামক যে প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা পাঠ করিয়া দুঃখিত ও মর্ম্মাহত হইলাম।

কেন একথা বলিতেছি, তাহা এই পত্রে যথাশক্তি খুলিয়া বলিতে চেষ্টা করিব। প্রবন্ধটীর শেষাংশ পাঠ করিয়া বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিনের একটী কথা মনে পড়িল। তিনি নিজ জীবন-বিবরণীর একস্থানে বলিয়াছেন, "আমি নিরহঙ্কারী হইয়া কথা বলিব, একথা আমি বলিব না। কেন না যখনই দেখিয়াছি যে, কোন ব্যক্তি নিরহঙ্কারিতার অভিমান করিয়া, কথা কহিবার সূচনা করিয়াছেন, তাহারই অব্যবহিত পরে তাঁহার আত্ম অহমিকার বিলক্ষণ পরিচয় পাইয়াছি।" আমিও দেখিতেছি যে "আত্মপরীক্ষা" প্রবন্ধের লেখক যখন আমাদের সমাজের সভ্যগণ স্বীয় সমাজকে বিশ্বাস ও নিষ্ঠার চক্ষে দেখিতে পাইতেছেন না" বলিয়া অনুযোগ করিতেছেন, তখন তিনি নিজে স্বীয় সমাজকে কোন্ চক্ষে দেখিতেছেন তৎপ্রতি একবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন নাই। তিনি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজকে যে বর্ণে চিত্রিত করিয়াছেন তাহা কি নিজ সমাজের উপর "বিশ্বাস ও নিষ্ঠার" পরিচায়ক? সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের "সর্ব্বত্রই 'আমরা'" ও "উৎকট অহংভাব" বিদ্যমান, ধর্ম্মসাধনে ও প্রচারে এবং জনহিত-ব্রতে কোন উৎসাহ নাই, এইরূপ কলঙ্ক নিজ সমাজের স্কন্ধে ক্ষেপণ করাই যদি সমাজের প্রতি বিশ্বাস ও নিষ্ঠার লক্ষণ হয়, তবে সে বিশ্বাস ও নিষ্ঠা না থাকাই বরং শ্রেয়ঃ। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজকে এই চক্ষে দর্শন করিয়া লেখক যে কিরূপে পঞ্চদশ বৎসরের পরীক্ষার পর মঙ্গলময় বিধাতাকে ধন্যবাদ প্রদান" করিলেন তাহা আমি বুঝিয়া উঠিতে পারি না। যে সমাজ কেবল "নিয়মতন্ত্রপ্রণালী-স্থাপন" ও "বাল্যবিবাহের প্রতিবাদ" করিবার জন্য সংস্থাপিত হইয়াছিল, তাহা ধর্ম্মসমাজ বলিয়া গণ্য হইবার কখনই যোগ্য নহে! "ব্রাহ্মসমাজ বলিলে লোকে" যদি সে সমাজকে বুঝিয়া থাকে, এবং সে সমাজের ধর্ম্মই যদি "উদার সার্ব্বভৌমিক এবং বুদ্ধি বিবেকসঙ্গত ব্রাহ্মধর্ম্ম" হয়, তবে আমি বলিব ব্রাহ্মসমাজ লুপ্ত হইয়াছে, ব্রাহ্মধর্ম্ম ভারতবর্ষ হইতে দিদূরিত হইয়াছে। অহমিকার ধর্ম্ম কখনই ব্রাহ্মধর্ম্ম নহে। লেখক যে কথাগুলি অপরকে "প্রশান্তচিত্তে" আলোচনা করিতে অনুরোধ করিয়াছেন, তাহা যদি নিজে "প্রশান্তচিত্তে" ভাবিয়া লিখিতেন, তাহা হইলে এরূপ পরস্পর বিরোধী কথার কখনও উল্লেখ করিতে সাহসী হইতেন না। তিনি একস্থলে যে কথা বলিয়াছেন, অপরস্থলে নিজেই তাহা খণ্ডন করিয়াছেন। এস্থলে আরও দুই একটী দৃষ্টান্ত দেওয়া আবশ্যক। লেখক একস্থলে বলিতেছেন, "পোনের বৎসরের মধ্যে ইহার সভ্যগণ নিয়মাবলী প্রণয়ন, সংশোধনাদি বিষয়ে যেরূপে পরিপক্কতা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা ভাবিলে চমৎকৃত হইতে হয়। ইহা প্রশংসা কল্পে কি শ্লেষচ্ছলে লেখা হইয়াছে বুঝিতে পারিলাম না। কেননা পরক্ষণেই লেখা হইয়াছে যে, "ইহার (নিয়মতন্ত্র প্রণালীর) যে মুখ্য উদ্দেশ্য, তাহা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্যগণের হৃদয়ে স্থান করিয়া বসে নাই। যাহাদিগের মূলেই ভুল, তাঁহাদিগের "পরিপক্কতা" চমৎকারই বটে। তাঁহারা যে নিয়মতন্ত্র প্রণালীর ব্যবস্থাটী কেমন "সুন্দর" ও "উন্নত" করিতে সমর্থ হইয়াছেন, ইহা অনায়াসেই বুঝিতে পারা যায়। যে নিয়মতন্ত্র প্রণালীর "সুন্দর" ও "উন্নত" ব্যবস্থা একটী ধর্ম্ম সমাজের "আধ্যাত্মিক কার্য্যের অনেক ক্ষতি" করিতেছে, তাহার আবার গুণ কি, সে গুণের কথা না বলাই সঙ্গত ছিল। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ যদি আধ্যাত্মিকতার ক্ষতিকারক হয়, অহং ভাবের প্রশ্রয়দাতা হয়, তবে "বিধাতার শুভ-ইচ্ছায় এবং তাহারই মঙ্গল বিধিতে ইহার অভ্যুদয় হইয়াছিল, লেখক কোন্ প্রাণে একথা বলিতে সাহসী হইলেন বুঝিতে পারিতেছি না। বিধাতার মঙ্গল বিধির উপর যাহা সংস্থাপিত নহে, তাহার পক্ষে "পঞ্চদশ বৎসর কাল জীবিত থাকিয়া কার্য্য করা" সম্ভব নহে, এই অদ্ভুত আবিষ্ক্রিয়া কোন্ ঐতিহাসিক গবেষণার উপর নির্ভর করিতেছে, তাহা লেখকই বলিতে পারেন। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের গুণ স্বরূপ যাহা উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহা এই, কার্য্যোৎসাহ, নিয়মতন্ত্র-প্রণালী-স্থাপন এবং সমাজ সংস্কার। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ যদি কেবল মাত্র এই গুণত্রয়ের সমষ্টি হয়, তবে উহা ঈশ্বরের কার্য্য হইলেও ধর্ম্মসমাজ বলিয়া অভিহিত হইবার উপযুক্ত নহে। এই তিনটী শক্তি বিদ্যমান না থাকিলে কোন সমাজই সজীব অবস্থায় অবস্থিতি করিতে পারে না। কিন্তু এ নিমিত্ত উহাকে ব্রাহ্মসমাজ নামে অভিহিত করিবার কোন কারণ দেখা যায় না। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ না বলিয়া কেবল সাধারণ সমাজ বলিলেই যথেষ্ট হইতে পারে। আমাদিগের বিপক্ষেরা যাহা বলিয়া থাকেন, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজকে যিনি বিশ্বাস ও নিষ্ঠার চক্ষে দেখেন, এমন এক ব্যক্তি আজ সে কথার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছেন। এই নিমিত্তই দুঃখিত ও মর্ম্মাহত হইয়াছি। যদি প্রবন্ধ-লেখকের কথা বিশ্বাস করা যায়, তবে ইহাই বলিতে হয় যে, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ একটী ধর্ম্ম সমাজ নহে, উহা কতকগুলি কার্য্যোৎসাহী লোকের অধিষ্ঠানভূত নিয়মতন্ত্র-প্রণালীগত সমাজ-সংস্কার সভা। যে সভার কার্য্যোৎসাহ জনসাধারণের সেবায় নহে, সর্ব্বত্রই কেবল অহং ভাব প্রচারে নিযুক্ত এবং যাহার নিয়মতন্ত্র-প্রণালী আধ্যাত্মিক ভাব বিনাশেই আপনার সুন্দর ও উন্নত পরিপক্কতার পরিচয় দিয়া থাকেন। সে সভা সমাজ-সংস্কারের মধ্যেও হেয়। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের এই হিতৈষীমিত্র জন সাধারণের সম্মুখে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের যে চিত্র উপস্থিত করিয়াছেন, উহার নীচতম শত্রু ও তদপেক্ষা কুৎসিত চিত্র অঙ্কিত করিতে সমর্থ হইতেন না।

আর একটী বিষয়ে কয়েকটী কথা বলিয়াই আমার বক্তব্য শেষ করিব। প্রথমতঃ ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার সম্বন্ধে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রচুর উৎসাহের যদি অভাব দৃষ্ট হয়, তবে তাহার নিমিত্ত ব্রাহ্মসাধারণ অপেক্ষা ব্রাহ্ম-প্রচারকগণই অধিক দায়ী। প্রচারক সংখ্যা যে কমিয়া যাইতেছে, ইহা ব্রাহ্মসাধারণের অমনোযোগ বশতঃ নহে, প্রচারকদিগের মতিচ্ছন্নতা বশতঃ। মতিচ্ছন্নতা কথাটী কঠিন হইলেও আমি ইচ্ছাপূর্ব্বক উহা প্রয়োগ করিতেছি। যাঁহারা এক সময়ে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রচারক ছিলেন, এখন সরিয়া পড়িয়া কেহ আপনাকে অবতার বলিয়া পরিচয় দিতেছেন, কেহ কালীর দ্বারে, কেহ বা শিবমন্দিরে শিরলুণ্ঠন করিতেছেন, এ সকল দেখিয়া শুনিয়া কে তাঁহাদিগকে মতিচ্ছন্ন বলিয়া মনে

না করিয়া থাকিতে পারে? মতিচ্ছন্ন না ভাবিলে তাঁহাদিগের চরিত্রের বিরুদ্ধে আরও গুরুতর অভিযোগ উপস্থিত হয়। যাঁহারা এখনও ব্রাহ্মসমাজের প্রচারক রহিয়াছেন, তাঁহাদিগের মধ্যেও কাহারও কাহারও গতি এই মতিচ্ছন্নতার পথেই পরিধাবিত হইতেছে। এই সকল দৃষ্টান্ত দেখিয়া প্রচার কার্য্যে ব্রাহ্মদিগের যে উৎসাহের হানি হইবে, প্রচারকদিগকে প্রতি-পালন করিতে তত সঙ্কুচিত হইবে, তাহা তত আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। যদি ধর্ম্মসাধনার ফল এইরূপ বিকৃত হয়, প্রচলিত সাধনার প্রতি লোকের যে অনাস্থা জন্মিবে তাহা অসম্ভব নহে। যে সাধনায় আপনার বিশ্বাস ও চরিত্রকে কোন স্থায়ী ভিত্তির উপর সংস্থাপিত করিতে সমর্থ নহে, সে সাধনা প্রকৃত নহে। অথচ ব্রাহ্মসমাজে তাঁহারাই সাধক বলিয়া গণ্য, যাঁহারা এইরূপ উৎশৃঙ্খলতার পশ্চাতে ব্যস্ততা সহকারে প্রধাবিত হন, যাঁহারা মতিচ্ছন্ন ব্যক্তির পদতলে লুণ্ঠিত হইয়া, তাঁহাদিগের নিকট ধর্ম্মোপদেশ ভিক্ষা করেন, তাঁহাদিগকে গুরু বলিয়া গ্রহণ করেন। সমাজের যাঁহারা ধর্ম্মোপদেশক ছিলেন, তাঁহা-দিগের ধর্ম্মের গতি যখন বিপরীত দিকে প্রবাহিত হইতেছে, তখন প্রকৃত সাধনা কি, সে সম্বন্ধে লোকের মনে স্বভাবতঃই সন্দেহ উপস্থিত হইতে পারে। গুরুমন্ত্র যে দেশের লোকের প্রধান সাধনা, ঈশ্বরের স্থানে গুরুকে স্থাপিত করিতে যে দেশের লোকের আগ্রহ, যে দেশের সাধকমণ্ডলী ঈশ্বরের পূজা প্রচলিত করা অপেক্ষা আত্মসেবালাভে অধিকতর কৃতার্থ হন, সে দেশে ব্যক্তিগত প্রভুত্বকে সংযত রাখিবার আবশ্যকতা যে সর্ব্বদাই বিদ্যমান থাকিবে, ইহা প্রকৃতির নিয়ম-সঙ্গত। বরং ইহার অন্যথা হইলেই বিপদের আশঙ্কা। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ ব্যক্তিগত প্রাধান্যকে যদি প্রথম উদ্যমেই বিনাশ করিয়া থাকেন, তাহা ব্যক্তিগত বিদ্বেষ বশতঃ নহে, তাহা ব্রাহ্মধর্ম্মের পবিত্রতা ও ব্রাহ্ম অনুষ্ঠানের বিশুদ্ধতা রক্ষার জন্য। এই শুভ উদ্দেশ্যে যখনই প্রয়োজন হইবে, ব্রাহ্মসমাজ ব্যক্তিগত প্রভুত্ব দমন বা বিনাশ করিতে প্রস্তত হইবেন। যখন এ কার্য্যে অসমর্থ হইবেন, তখনই মনে করিতে হইবে, ব্রাহ্মসমাজের জীবনীশক্তি লোপ হইয়াছে। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ যে সমুচিত পরিমাণে ব্যক্তিগত প্রভুত্ব দমন করিতে পারেন নাই, সেই কারণেই দেখিতেছি যে সকল ব্যক্তি ব্রাহ্মসমাজ পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন, পূর্ব্বকার ব্যক্তিগত প্রাধান্য বশতঃ তাঁহারাও অদ্যাপি ব্রাহ্মের উপর প্রভুত্ব বিস্তার করিতে সমর্থ হইতেছেন। তাঁহাদিগের পদানুসরণ করিয়া ক্রমে ক্রমে অনেকে ব্রাহ্মসমাজ হইতে না হউক ব্রাহ্মের লক্ষ্য হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়িতেছেন। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের যদি অমঙ্গল হয়, তবে ব্যক্তিগত অন্যায় প্রভুত্ব বিনাশের চেষ্টাবশতঃ এবং নিয়মতন্ত্রপ্রণালীর অনুসরণ হেতু হইবে না, এই উভয়ের উপেক্ষা নিবন্ধনই হইবে।

আমি জানি আমার এই পত্রখানি অনেকের অপ্রীতিকর হইবে, অনেকে ইহার প্রতিবাদ করিতে উৎসুক হইবেন। তবে প্রতিবাদ করা আবশ্যক মনে করিবেন কি না বলিতে পারি না। যদি কেহ প্রতিবাদ করিতে প্রবৃত্ত হন, তাঁহার নিকট আমার সানুনয় অনুরোধ এই, যেন নিজ নাম দিয়া প্রতিবাদ করেন। অনামিক প্রতিবাদ করা আমার অভ্যাস নাই; সুতরাং অপরেও আত্মনাম গোপন রাখিয়া, আমার কোন কথার প্রতিবাদ করেন, ইহা প্রার্থনীয় মনে করি না।

নিবেদক
শ্রীদ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়।

ব্রাহ্মসমাজ।

সাধনাশ্রমের উৎসব—গত ১লা জুন সাধনাশ্রমে বিশেষ উৎসব হইয়াছে। ঐ দিন ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে কতিপয় নির্দ্দিষ্ট উপাসক সমবেত হইয়া বিশেষ উপাসনা করেন। ঐ উপাসনা-স্থলে একজন বি,এ উপাধিধারী ব্রাহ্মযুবক ভবিষ্যতে ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যে সমস্ত দেহ মন নিয়োগ করিবেন বলিয়া সংকল্প প্রকাশ করেন। এই যুবক অতি অল্পবয়সে হিন্দু সমাজের ভয়ানক উৎপীড়ন সহ্য করিয়া স্বীয় বিশ্বাস পথে দৃঢ় রহিয়াছেন। আমাদের আশা হয়, এই ধর্ম্মভাবাপন্ন যুবক যে গুরুতর সংকল্প করিয়াছেন, তাহা চিরজীবন পালন করিতে সমর্থ হইবেন। পরমেশ্বর ইহার প্রাণে বল দান করুন।

বেলা ৭টার সময় নিমন্ত্রিত ও নিয়মিত উপাসকগণ উপস্থিত হইলে ব্রহ্মোপাসনা আরম্ভ হয়। শাস্ত্রী মহাশয় উপাসনা করেন। মধ্যাহ্নে ধর্ম্মালোচনা হয়। সন্ধ্যারপর পুনরায় উপাসনা হয়। এবেলাও শাস্ত্রী মহাশয় আচার্য্যের কার্য্য করেন। সময় সময় জলধারা পতিত হইয়া যেরূপ নিদাঘের শুষ্ক মৃত্তিকা আর্দ্র করিয়া দেয়, সেইরূপ উৎসবের সময় ব্রহ্ম-কৃপা অবতীর্ণ হইয়া উপাসকের নীরস প্রাণকে সরস করিয়া দেয়। এই উৎসবে অনেকেই ব্রহ্ম-কৃপালাভ করিয়া থাকেন।

দান—আসামের বাবু রামদুর্ল্লভ মজুমদার তাঁহার মাতার আদ্য শ্রাদ্ধোপলক্ষে সাঃ ব্রাঃ সমাজে ৫৲ টাকা দান করিয়াছেন। এবং ধুবড়ীর বাবু অম্বিকাচরণ মুখোপাধ্যায় তাঁহার পুত্র শ্রীমান্ রমেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রথম চাকুরীতে প্রবেশ করায় প্রথম মাসের বেতন হইতে সাঃ ব্রাঃ সমাজে ১৲ ও সাধনাশ্রমে ১৲ টাকা দান করিয়াছেন। জাঙ্গিপাড়া কৃষ্ণনগরের বাবু এককড়ি সিংহের পিতার বার্ষিক শ্রাদ্ধোপলক্ষে সাঃ ব্রাঃ সমাজে ১৲, সাধনাশ্রমে ১৲ ও দাসাশ্রমে ২৲ টাকা দান করিয়াছেন। আমরা দাতাদিগকে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

লাহোরে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের জন্মোৎসব—লাহোর হইতে বাবু অবিনাশচন্দ্র মজুমদার লিখিয়াছেন যে, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের গত ষোড়শ জন্মদিন উপলক্ষে তথায় উপাসনাদি হইয়াছে। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের জন্মোৎসব উপলক্ষে সকল স্থানে এরূপ অনুষ্ঠান হয়, ইহা একান্ত প্রার্থনীয়।

বিবাহ—শ্রীমতী বসন্তকুমারী দেবীর সহিত ময়মনসিংহের প্রচারক বাবু গুরুগোবিন্দ চক্রবর্ত্তীর বিবাহ হইয়াছে।

পাত্র পাত্রী উভয়েরই নিবাস ময়মন সিংহ জেলায়। বিবাহ কলিকাতা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে সম্পন্ন হইয়াছে। বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় উপাসনার কার্য্য করেন।

১০৩নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটস্থ ভবনে আরও একটী বিবাহ হইয়া গিয়াছে। পাত্রী শ্রীমতী সুরবালা মিত্র, পাত্র বাবু নির্ম্মলচন্দ্র মল্লিক। বাবু অঘোরনাথ মুখোপাধ্যায় আচার্য্যের কার্য্য করেন। উভয় বিবাহই ৩ আইন অনুসারে রেজেষ্টরী হইয়াছে। প্রথমোক্ত বিবাহ উপলক্ষে ১৲ টাকা, দ্বিতীয় বিবাহ উপলক্ষে ২৲ টাকা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে দান করা হইয়াছে। আমরা পাত্র ও পাত্রীগণের শুভ কামনা করিতেছি। পরমেশ্বর ইঁহাদের মঙ্গল বিধান করুন।

নামকরণ—ডিব্রুগড়ের বাবু ক্ষেত্রনাথ ঘোষের দ্বিতীয় পুত্রের নামকরণ হইয়াছে। বাবু গণেশচন্দ্র ঘোষ আচার্য্যের কার্য্য করেন। পরমেশ্বর শিশুর মঙ্গল করুন।

উৎসব—মুর্শিদাবাদ হইতে বাবু রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায় লিখিয়াছেন,—মুর্শিদাবাদ ব্রাহ্মসমাজের সাম্বৎসরিক উৎসব উপলক্ষে কলিকাতা হইতে শ্রদ্ধেয় প্রচারক শ্রীযুক্ত নবদ্বীপচন্দ্র দাস মহাশয় এখানে আগমন করেন। ১৭ই, ১৮ই ও ১৯এ জ্যৈষ্ঠ এই তিন দিন এখানে উৎসব হইয়াছিল। ১৭ই জ্যৈষ্ঠ প্রচারক মহাশয় উপস্থিত হইতে পারেন নাই, তজ্জন্য উক্ত দিবস প্রাতে সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু রামগোপাল রায় উৎসবের উদ্বোধন সূচক উপাসনা এবং অপরাহ্নে ধর্ম্ম বিষয়ে বক্তৃতা করেন। ঐ দিন রাত্রে নবদ্বীপ বাবু এখানে পৌছেন। ১৮ই জ্যৈষ্ঠ বুধবার উৎসবের দিন প্রাতে মন্দিরে তিনি উপাসনা করেন। ঈশ্বরে সম্পূর্ণ নির্ভর না করিলে জীবের পরিত্রাণ নাই, এই বিষয়ে উপদেশ দেন। ২টার পর হইতে আলোচনা, সংগীত, সংকীর্ত্তনাদি হইয়াছিল। সন্ধ্যারপর উপাসনা হয় ও কবিরের দোঁহা পাঠ করিয়া তদবলম্বনে উপদেশ দেন। ঈশ্বরের কৃপা ভিন্ন যে পাপের মূল নষ্ট হয় না, ইহাই উপদেশের বিষয় ছিল। ১৯এ জ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতিবার প্রাতে সম্পাদক-ভবনে পারিবারিক উপাসনা হয়। টাঙ্গাইল হইতে সমাগত শ্রীযুক্ত বাবু দুর্গাদাস বসু মহাশয় উপাসনার কার্য্য করেন। অপরাহ্নে নগরসঙ্কীর্ত্তন ও চকে বক্তৃতা হয়। নবদ্বীপ বাবু ও দুর্গাদাস বাবু বক্তৃতা করেন। ২১শে জ্যৈষ্ঠ শনিবার জুবিলী হলে "পরিত্রাণের সঙ্কেত" বিষয়ে নবদ্বীপ বাবু বক্তৃতা করেন। বক্তৃতা প্রাণস্পর্শী হইয়াছিল। ২২এ জ্যৈষ্ঠ রবিবার সন্ধ্যারপর মন্দিরে তিনি আচার্য্যের কার্য্য করেন। নবদ্বীপ বাবুর আগমনে এখানে সকলেই বিশেষ উপকার লাভ করিয়াছেন।

দোগাছিয়ার উৎসব—এই উৎসব উপলক্ষে কলিকাতা হইতে শ্রীযুক্ত নবদ্বীপচন্দ্র দাস প্রমুখ কতিপয় ব্রাহ্মভ্রাতা তথায় গমন করেন। ১৯শে মে প্রাতে উৎসব মণ্ডপে উপাসনা হয়, প্রচারক নবদ্বীপচন্দ্র দাস আচার্য্যের কার্য্য করেন। অপরাহ্নে নগরসংকীর্ত্তন হয়; প্রচারক বাবু শশিভূষণ বসু বক্তৃতা করেন। বক্তৃতাস্থলে অনেক লোক সমাগম হইয়াছিল। পর দিবস ২০শে মে শ্রীযুক্ত বাবু করালীচরণ রায়ের বাটীতে উপাসনা হয়, নবদ্বীপ বাবু আচার্য্যের কার্য্য করেন। অপরাহ্নে উৎসবমণ্ডপে পাঠ, আলোচনা ও "কার্য্যের দ্বারাই মানবের পরিচয়" বিষয়ে বক্তৃতা হয়। শশী বাবু অসুস্থ হওয়ায় নবদ্বীপ বাবুই সকল কার্য্য সম্পাদন করেন। আলোচনাতে জাতিভেদ সম্বন্ধেই অনেক কথাবার্ত্তা হইয়াছিল।

২১শে মে প্রাতে প্রচার-দল রহিমপুর নামক গ্রামে গমন করিয়া বাবু নগেন্দ্রনাথ নিয়োগীর বাটীতে আতিথ্য গ্রহণ করেন। প্রাতে স্থানীয় হরিসভায় সংকীর্ত্তন ও উপাসনাদি হয়। নবদ্বীপ বাবু আচার্য্যের কার্য্য করেন এবং মনের চঞ্চলতা নিবারিত না হইলে ব্রহ্মকে প্রাণে লাভ করা যায় না, এই মর্ম্মে একটী সুন্দর উপদেশ প্রদান করেন। তৎপর তিনি আলোচনা, পাঠ ও "কিরূপে পরমেশ্বরের কৃপা মানবকে পরিত্রাণ করে" এই সম্বন্ধে একটী বক্তৃতা করেন। সভায় অনেক লোক উপস্থিত ছিলেন। উপবীত পরিত্যাগ সম্বন্ধে বিশেষরূপে আলোচনা হয়।

২২শে মে প্রাতে দোগাছিয়া গ্রামে প্রচার-দল গমন করেন। উৎসব-মণ্ডপে উপাসনা হয়। নবদ্বীপ বাবু আচার্য্যের কার্য্য করেন। অপরাহ্নে করালী বাবুর বাটীতে উপাসনা ও আলোচনাদি হয়। নবদ্বীপ বাবুই আচার্য্যের কার্য্য করেন। আলোচনার সময় বাটীর মহিলাগণ, পৌত্তলিকতার উৎপত্তি, জাতিভেদ, মিলিত উপাসনার আবশ্যকতা বিষয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করেন।

২৩শে মে প্রচার-দল বাবু এককড়ি সিংহের পিতার বার্ষিক শ্রাদ্ধোপলক্ষে জাঙ্গিপাড়া কৃষ্ণনগরে মাধবপুর নামক স্থানে আগমন করেন। উক্ত দিবস মাধ্যাহ্নিক উপাসনা নবদ্বীপ বাবু সম্পন্ন করেন। রজনীতে নিকটবর্ত্তী কোন স্থানে বাবু রেবতীমোহন সেন "চৈতন্য লীলা" সম্বন্ধে কথকতা করেন। কথকতা অনেকের প্রীতিপ্রদ হইয়াছিল। পর দিবস ২৪শে মে এককড়ি বাবুর পিতার বার্ষিক শ্রাদ্ধোপলক্ষে নবদ্বীপ বাবু আচার্য্যের কার্য্য করেন। এককড়ি বাবু তাঁহার পিতার স্মরণচিহ্ন স্বরূপ ভস্মপ্রোথিতসমাধির উপর পিতার জন্ম ও মৃত্যুর দিন লিখিত প্রস্তর খণ্ড স্থাপন করেন। অদ্য সায়ংকালে প্রচার-দল কৃষ্ণনগরস্থ বাহিরগড়া নামক স্থানীয় প্রসিদ্ধ জমিদারের বাটীতে গমন করেন। বাবু ক্ষেত্রনাথ সিংহরায় ও বাবু বেদকণ্ঠ সিংহরায় ইহাদিগকে বিশেষ যত্ন সহকারে আপনাদিগের ভবনে স্থান দান করেন। অদ্য রাত্রে তাঁহাদের বহির্বাটীতে উপাসনা হয়; শশী বাবু উপাসনা করেন। শশী বাবু উপাসনান্তে একটী শ্লোক অবলম্বন করিয়া উপদেশ প্রদান করেন। ২৫শে হইতে ২৭শে মে পর্য্যন্ত অত্যন্ত ঝড় ও বৃষ্টির জন্য বিশেষ কোন কার্য্য হয় নাই, কেবল রেবতী বাবু একদিন "চৈতন্য লীলা" কথকতা করেন। ২৮শে মে সায়ংকালে বিশেষ উপাসনা হয়, শশী বাবু আচার্য্যের কার্য্য করেন এবং বিনয়, সরলতা ও সত্যানুরাগ যে ধর্ম্মসাধনের প্রধান সহায় এই মর্ম্মে একটী উপদেশ প্রদান করেন।

২১১নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, ব্রাহ্ম মিশন প্রেসে শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দত্ত কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

তত্ত্ব-কৌমুদী

ধর্ম্ম ও সমাজতত্ত্ব বিষয়ক পাক্ষিক পত্রিকা।

৬ষ্ঠ সংখ্যা।
১৬শ ভাগ।

১৬ই আষাঢ়, বৃহস্পতিবার, ১৮১৫ শক, ব্রাহ্ম সম্বৎ ৬৪

বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ৩॥০
মফস্বলে
প্রতি খণ্ডের মূল্য ৵০

সাধন-ঘর।

চল যাই নির্জ্জন-মন্দিরে;
জগতে করিয়া পৃষ্ঠ চল ধীরে ধীরে,
পশি গিয়ে সাধন-কুটীরে;
পশে যথা মীন স্থির সুগভীর নীরে।

চল চল চিন্তার আগারে;
বিষয় বাণিজ্য দ্রোহ, বিতর্ক বিচারে,
ফেলে চল সকল অসারে;
রোধো দ্বার, কোলাহল থাকুক সংসারে।

বড় ভীরু স্বর্গীয় বিহঙ্গ;
বাসা বাঁধে সুনির্জ্জনে ছাড়ি লোক-সঙ্গ;
স্বর্ণ-কান্তি তার সেই অঙ্গ
দেখিবে ত মৌনী থাক; দিও নাক ভঙ্গ।

সুনির্জ্জনে দেখা প্রিয় সনে;
কবে আসে কবে যায়, জানে কোন্ জনে?
যদি আশা প্রেম-আস্বাদনে,
একাকী জাগিয়া থাক নির্জ্জন ভবনে।

গুপ্ত ধন গাড়া ধরণীতে;
চাও যদি সেই ধন খুঁড়িয়া তুলিতে,
চিন্তার খনিত্র হাতে বসো এক ভিতে,
খোঁড়ো মাটী এক-নিষ্ঠ-চিতে।

সম্পাদকীয় মন্তব্য।

সাধনা—মনু বলিয়াছেন যে, খনিত্রের দ্বারা ভূমি খনন করিয়া মানুষ যেমন বারি প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ মানুষকে জ্ঞান লাভ করিতে হইবে। বিদ্যালাভের পক্ষে ইহা অতি উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। একদিকে বলিতে গেলে বিদ্যা সকলের হস্তের নিকটেই আছে। যে জড় ও আত্ম-জগতের তত্ত্ব আলোচনা করিয়া জ্ঞানিগণ প্রভূত জ্ঞান সঞ্চয় করিয়াছেন, সেই জড় জগৎ ও সেই মানব মনরূপ গ্রন্থ আমাদের প্রত্যেকেরই সমক্ষে উদ্ঘাটিত রহিয়াছে। কেবল অভিনিবেশ সহকারে তাহার মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া তত্ত্ব সকল উদ্ধার করিতে হয়। এই অভিনিবেশ যেন খনিত্রের ন্যায়, ইহার গুণে মন ক্রমশঃ ভিতর হইতে আরও ভিতরে প্রবিষ্ট হইতে থাকে এবং অবশেষে অভীষ্ট বিষয়ের উদ্দেশ পাইয়া সিদ্ধি লাভ করে। কেবল যে পদার্থতত্ত্ব ও মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধেই এই নিয়ম তাহা নহে। অধ্যাত্ম-তত্ত্ব সম্বন্ধে ও এই সাধনা আরও প্রয়োজনীয় বলিয়া বোধ হয়। সে সম্বন্ধেও এ কথা বলিতে পারা যায় যে, মানবের মুক্তিপ্রদ শান্তি-বারি প্রত্যেকের হস্তের নিকটেই রহিয়াছে। যে সংসারকে মরুভূমি বলিয়া অনেক সাধক বর্ণনা করিয়াছেন, সেই মরুর মধ্যেই জল নিহিত হইয়া রহিয়াছে। কেবল সাধনখনিত্রের সাহায্য চাই। একাগ্রচিত্তে খনন করিতে করিতে কঠিন ভূমির অন্তরাল হইতেই ভক্তিপ্রদ বারি বিনির্গত হইতে পারে। এই যে সাধনের একাগ্রতা ইহাকেই তপস্যা বলা যায়। সত্য জ্ঞানের ন্যায় সত্য ধর্ম্ম লোক মুখে পাওয়া যায় না। ধর্ম্ম যে নিজে উপার্জ্জন করিতে না পারে তাহার জন্য ধর্ম্ম নাই। পর-মুখাপেক্ষী ও শ্রমকাতর ব্যক্তির যেমন বিদ্যালাভ হয় না, তেমনি পরমুখাপেক্ষী ও শ্রমকাতর ব্যক্তির ধর্ম্ম লাভও হয় না। এই তত্ত্বটী আমাদের সর্ব্বদা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য।

অটল-ভিত্তি—ব্রাহ্মসমাজের প্রতি ইহার বিরোধী ব্যক্তিগণ এই দোষারোপ করিতেছেন যে, ইহাদের সাধনের ও কার্য্যের স্থিরতা নাই। ইহার অগ্রণী ব্যক্তিগণ এক সময়ে যে সকল মত ও কার্য্য-প্রণালী প্রচার করিয়াছেন, আবার কিছু দিনের মধ্যে সে সকলকে পরিত্যাগ করিতেছেন বা পরিবর্ত্তিত করিয়া ফেলিতেছেন। যৌবনের কথা বার্দ্ধক্যে স্থির থাকিতেছে না। এই অভিযোগ যে কিয়ৎ পরিমাণে সত্য নহে, তাহা নহে। আমাদের বোধ হয় নির্জ্জন চিন্তা ও সাধন পরায়ণতার অভাবেই এরূপ ঘটিয়া থাকে। অনেক তত্ত্ব আমরা গভীর চিন্তা না করিয়াই অবলম্বন করিয়া থাকি। আপাততঃ উপরে উপরে যে সকল যুক্তি আমাদের হৃদয়-গ্রাহী বোধ হয়, তাহাই অবলম্বন করি। নিগূঢ় রূপে নিবিষ্ট হইয়া তত্ত্বালোচনা করি না। ইহার ফল এই হয় যে, আমাদের বিশ্বাস ও

কার্য্য সকল অগভীর ভিত্তির উপরে স্থাপিত হইয়া থাকে। পূর্ব্বে অবস্থার পরিবর্ত্তনে যখন নূতন ভাব ও নূতন সত্য সকল আমাদের দৃষ্টিকে আকর্ষণ করিতে থাকে, তখন আমাদের ভাবান্তর উপস্থিত হয়। গভীর নির্জ্জন চিন্তা ও সাধনা-দ্বারা লোকে যে সকল তত্ত্ব লাভ করে, তাহার সম্বন্ধে এরূপ ঘটে না। তাহার স্থিতি ক্ষণিক ভাব-স্রোতের উপরে নির্ভর করে না। মহাত্মা যীশু একদিন উপদেশ দিবার সময়ে শিষ্যদিগকে বলিয়াছিলেন যে, "যাহারা তাঁহার উপদেশ শুনিয়া তদনুরূপ কার্য্য করে তাহাদের জীবন সুদৃঢ় পাষাণ-নির্ম্মিত ভূমির উপরে স্থাপিত হয়। কিন্তু যাহারা তাহা করে না, তাহাদের জীবন যেন বালুকা রাশির উপরে স্থাপিত। ঝড় বৃষ্টি প্রভৃতিতে বিনষ্ট হইয়া যায়।" এই উপদেশের তাৎপর্য্য এই, জীবন সম্বন্ধীয় কোনও উপদেশকে যতক্ষণ কার্য্যে পরিণত করিতে না পারা যায়, ততক্ষণ তাহার গুরুত্ব ও গভীরতা সম্যক রূপে প্রতীতি করিতে পারা যায় না। কার্য্যে পরিণত করিতে গেলেই একদিকে আপনাদের বলের পরিমাণ, অপর দিকে সেই সত্যের গুরুত্ব আমরা অনুভব করিতে পারি; এবং বারংবার আলোচনা দ্বারা তাহার জ্ঞান আমাদের হৃদয়ে উজ্জ্বল হইতে থাকে। তখন আমরা তাহার সপক্ষে ও বিপক্ষে কি কি যুক্তি আছে তাহা সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ করিতে থাকি। তখন আর তাহা লোকের মতের উপরে নির্ভর করে না। তৎসম্বন্ধীয় প্রত্যেক বিষয়ই আমাদের সাক্ষাৎ গোচর হয়, এরূপ ভাবে যে বিশ্বাস একবার উৎপন্ন হয়, তাহা অটল ভূমির উপরে স্থাপিত হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি সাধন করে না, তাহার ভাব অন্য প্রকার। তাহার সমুদায় মত ও বিশ্বাস কেবল পরের মুখের উপর ও কল্পনার উপর স্থাপিত; সুতরাং তাহা প্রতিকূল স্রোতের মুখে দাঁড়াইয়া থাকিতে পারে না।

স্বপাক-সাধন—নিজ হাতে পাক করিয়া আহার করিলে যে এক প্রকার অপূর্ব্ব তৃপ্তি হয়, তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন। অন্যে নানারূপ উপাদেয় খাদ্য প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন, তাহার মধ্যেও দেখা গিয়াছে, নিজ হাতের রান্না করা অন্ন ব্যঞ্জন যেমন তৃপ্তিকর হয়, সে সকল তেমন তৃপ্তিকর হয় না। অনেকে এইরূপে স্বপাক-সাধন করিয়া থাকেন। তবে কি পুনরায় ব্রাহ্ম-সমাজে "বার রাজপুতের তের চুলা" আরম্ভ হইবে? সকলেই কি পুনরায় স্বপাক খাইতে আরম্ভ করিব? যদিচ শারীরিক আহারে এ সাধনের তত প্রয়োজন নাই, বরং ইহাতে সময়ের অপচয় এবং বৃথা ধর্ম্মাভিমান অর্জ্জিত হয়, (তবে মাঝে মাঝে করা যাইতে পারে) কিন্তু আধ্যাত্মিক স্বপাক সকলেরই প্রয়োজনীয় এবং ইহার উপকারিতা সম্বন্ধে প্রত্যেকে নিজ জীবনে সাক্ষ্যও দিতে পারিবেন। নিজে ধর্ম্ম সাধন করা যদিও শ্রমসাধ্য, ঈশ্বরের সঙ্গে যোগসাধন সকলের পক্ষে সহজ নয়, এবং ভক্তি প্রেমে গদ-গদ হইয়া ভগবৎ আরাধনা করা বড়ই কঠিন, তথাপি নিজে সেই পবিত্র স্বরূপের সহবাসের বিমল আনন্দ সম্ভোগের জন্য যাহা কিছু করি, তাহাতেই যথেষ্ট চরিতার্থতা লাভ করি। এ সাক্ষ্য সকলেই দিবেন। এই প্রকার নিজে নিজে যদি সেই প্রেমস্বরূপের প্রেমান্ন পাক করি, এবং আহার করি; এবং চারিদিক হইতে যদি সেই মধু সঞ্চয় করি এবং জীবনে সম্ভোগ করি; ইহাতে যে তৃপ্তি, অন্যের পাক করা কি সঞ্চয় করা প্রেমান্নে কি প্রেমমধুতে সে তৃপ্তি হয় না। তাই ব্রাহ্মধর্ম্ম এই স্বপাকের ব্যবস্থা করিয়া-ছেন। শুধু আচার্য্য প্রেমান্ন পাক করিবেন আর সকলে আহার করিবেন তাহা নহে; সকলকেই তাহার জন্য খাটিতে হইবে; সকলকেই সে অন্ন নিজ হাতে পাক করিয়া লইতে হইবে। সাক্ষাৎ ধর্ম্মের এই মহিমা, অন্য সকল ধর্ম্মে গুরু প্রভৃতির উপরভার আছে, তাঁহারা পাক করিবেন ও সঞ্চয় করিবেন, আর সকলে সেই অন্ন আহার করিবে। ইহাতে আয়াস আছে, কিন্তু তৃপ্তি নাই, স্বাস্থ্যও রক্ষা হয় না। অপিচ দূষিত অন্ন আত্মাতে প্রবেশ করিয়া আত্মাকে ধ্বংস করে। যাহারা নিজে পাক করিয়া আহার করিতে শিক্ষা করে—পথে ঘাটে একাকী হইলেও কখনই তাহারা আহারাভাবে মারা যায় না। যাহারা স্বয়ং পাক করিতে অভ্যস্ত, শেষে তাহারা অন্যের পাক করা দ্রব্য স্বাদু কি বিস্বাদু চিনিয়া লইতে পারে; তাহাতে কোন্ বস্তুর অভাব আছে, বলিয়া দিতে পারে। যে নিজে রাঁধিতে জানে, সেই অন্যের রন্ধনের দোষ গুণ ধরিতে পারে; তখন পরের হাতে খাইতেও আপত্তি হয় না। কেন না সে তখন যা তা আহার করিয়া তৃপ্তি লাভ করিতে পারে না, সুতরাং যাহা সুস্বাদু, যাহা পুষ্টিকর, তাহাই গ্রহণ করিয়া থাকে। অতএব প্রত্যেকে স্বপাক-সাধন করিতে হইবে। নিত্য সাক্ষাৎ-ভাবে প্রেম ভক্তি, জ্ঞান বিশ্বাস অর্জ্জন করিতে হইবে; তবে ধর্ম্মজীবন বাঁচিবে এবং বর্দ্ধিত হইবে। ধন্য ব্রাহ্মধর্ম্ম! জীবকে এই স্বপাকসাধন শিক্ষা দিতেছেন, ধন্য ঈশ্বর এবার কাহাকেও আলস্যে থাকিতে দিতেছেন না এবং পরের হাতে পাক করা অন্নে আর সুখী হইতে দিতেছেন না। যদি তাঁহাকে চাও, নিজে খাট এবং "নিজ হাতে দাও আহার" এই বলিয়া দ্বারে পড়িয়া থাক। অবিশ্বাসী হইও না; অসহিষ্ণু হইও না; দাতা দয়ালু ঈশ্বর তোমাদের বাঞ্ছা পূর্ণ করিবেন।

এ সাধন কে দিল?—জগতে যত প্রকার ধর্ম্ম-সাধনের প্রণালী আছে, সেই সকল প্রণালীর সাধকদিগকে জিজ্ঞাসা করিলে এক ভাবাপন্ন দুটী উত্তর শুনিতে পাওয়া যায়। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ বলেন এই সাধন আপ্তবাক্য, ঈশ্বর স্বয়ং আমাদের মধ্যে প্রকাশ করিয়াছেন, আবার কেহ বা বলেন কোন দেবতা, এঞ্জেল বা গুরু ইহা দান করিয়াছেন। এখন দেখা যাউক এই ব্রাহ্মসমাজের সাধন-প্রণালী কোথা হইতে পাওয়া গেল। মানবাত্মার পরিত্রাণের জন্য যখন যাহা প্রয়োজন স্বয়ং বিধাতাই তাহার বিধান করিতেছেন। ব্রাহ্মসমাজের উৎকৃষ্ট আরাধনা-প্রণালী অর্থাৎ ঈশ্বরের স্বরূপ-সাধন "সত্যংজ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম ইত্যাদি" প্রথমতঃ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় প্রচলন করেন। তিনি ঈশ্বরদ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়াই ইহার ব্যবস্থা করেন ও ইহার অনুসরণ করেন। আরাধনার শেষাংশ "শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্" পরলোকগত নববিধানাচার্য্য কেশবচন্দ্র সেন মহাশয় প্রচলিত করেন, শ্রদ্ধাস্পদ রাজনারায়ণ বসু মহাশয় ইহার শেষে "ধর্ম্মাবহং

পাপনুদং ভগেশং" এই কয়েকটী কথা যোগ করিয়া লইয়াছেন। বর্ত্তমান প্রণালীর ধ্যানের অংশ যাহা প্রাচীন আর্য্য ঋষিদের প্রাণের ধন, তাহাও মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ প্রচলিত করেন। তৎপর সমস্বরে মিলিত প্রার্থনা শ্রদ্ধেয় রাজনারায়ণ বাবু আনয়ন করেন। এইরূপে ইহার পূর্ণাঙ্গ সাধনের প্রণালী ব্রাহ্মসমাজ মধ্যে প্রচলিত হয়। কেশবচন্দ্র সেন মহাশয় প্রার্থনার শেষাংশ কিছু পরিবর্ত্তন করেন। যাঁহারা বিশ্বাসী তাঁহারা দেখিতেছেন এই সাধন-প্রণালী ঈশ্বরের এক মহৎ দান; তিনিই জীবের ত্রাণের জন্য ইহা পৃথিবীতে আনয়ন করিয়াছেন এবং ব্রাহ্মদিগকে দান করিয়াছেন। অন্তর্যামী বিধাতাপুরুষ সর্ব্বদাই দেখিতেছেন তাঁহার সন্তানের কখন কি অবস্থা; কোন পাঠ দিলে, কি প্রণালীতে শিক্ষা দিলে উত্তম জ্ঞান লাভ করিতে পারিবে এবং তাহার তত্ত্ব সকল বুঝিতে পারিবে ও তাঁহাকে লাভ করিতে পারিবে। তিনি তাহা জানিয়াই উপযুক্ত সময়ে উপযুক্ত ব্যবস্থা করেন এবং পুরাতনকে রহিত করেন। ঈশ্বর-প্রেরিত নূতন ব্যবস্থা যেই মানব গ্রহণ করিতে থাকে। অমনি তাহার শ্রেষ্ঠতা জনসমাজ মধ্যে ঘোষিত হইতে থাকে। অবশ্যই এই নূতন ব্যবস্থা অতি অল্প লোকেই গ্রহণ করিতে পারে ও ধারণ করিতে পারে। প্রথমতঃ ইহা অতি অল্প লোকেই গ্রহণ করে। কিন্তু কি আশ্চর্য্যের বিষয় যত অল্প লোকেই গ্রহণ করুক না কেন, যেই ইহার তেজ প্রকাশ পাইতে থাকে, অমনি পুরাতন সব যেন জাগিয়া উঠিতে থাকে। যাহারা একরূপ চির নিদ্রায় অভিভূত ছিল, দেখি তাহাদের যেন ঘুমের ঘোর ভাঙ্গিয়া যায়; তাহারা পুনরায় সেই পুরাতনকে আবার নূতন ভাবাপন্ন করিয়া রক্ষা করিবার চেষ্টা পায়। কিন্তু সে বৃথা চেষ্টা; যখন স্বয়ং ঈশ্বর নূতন ব্যবস্থা করিয়াছেন, তখন আর পুরাতনের প্রয়োজন নাই। যদি পুরাতনের প্রয়োজন থাকিত, তাহা হইলে আর নূতন ব্যবস্থা হইত না, এখন নূতনের প্রয়োজন সেইজন্য তিনি নূতন বিধি করিয়াছেন। যাহারা ইহাকে ধরিতে পারিবে তাহাদেরই মঙ্গল। ধর্ম্ম জগতের ইতিহাস ইহার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত প্রদান করিতেছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় যাহারা এক সময়ে এই নূতনকে ধরিয়াছিল, তাহারাই সাধনাভাবে ইহাকে জীবনে পরিণত করিতে না পারিয়া আবার পুরাতনকে গ্রহণ করিল! কোথায় তাহারা নূতনের আবশ্যকতা অনুভব করিয়া দৃঢ়তার সহিত সাধনে পড়িয়া থাকিবে, না অবিশ্বাসীদের ন্যায় তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল, পুরাতনে গিয়া আপনার পরিত্রাণের পথে কণ্টক রোপণ করিল। এখন প্রশ্ন এই; নূতন ব্যবস্থা হইয়াছে বলিয়া কি আর পুরাতনকে একেবারেই চাহিবে না? চাই বই কি, যেমন ব্রাহ্মধর্ম্মের মূলমন্ত্রের মধ্যে একমেবাদ্বিতীয়ং এইটী বিশ্বাস করি, ইহা অতি পুরাতন। কিন্তু নূতন কথা জীব ব্রহ্মের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ। সেইরূপ ধ্যানের কথা অতি প্রাচীন; কিন্তু এই জীবন্ত আরাধনা নূতন ব্যবস্থা। ইহাকে ছাড়িয়া এসময়ে ঈশ্বর লাভ হয় না। এখন ব্রাহ্মদের প্রতি অতিগুরুতর ভার অর্পিত হইয়াছে; গুরুতর দায়িত্ব পড়িয়াছে। এই নূতন সাধনপ্রণালী দ্বারা, সাক্ষাৎ ভাবে জীবন্ত ব্রহ্মের আরাধনাদ্বারা, পরিত্রাণ লাভ করিয়া, পরম পিতা মাতা পরমেশ্বরকে লাভ করিয়া জগতকে দেখাইতে হইবে। তাঁহারা নিষ্ঠার সহিত সাধনে রত থাকিয়া জীবনে ইহার ফল না দেখাইলে ঈশ্বরের নিকট অপরাধী হইবেন এবং জগতের নিকট ও অপরাধী হইবেন। তাঁহারা এ সাধনে সিদ্ধ হইতে পারিলে, যাঁহারা আজিও আকৃষ্ট হন নাই, তাহারাও আকৃষ্ট হইবেন; যাঁহারা ফিরিয়া গিয়াছেন, তাঁহারাও পুনরায় আসিবেন। হে করুণাময় পিতা, যদি ব্রাহ্মদিগকে দয়া করিয়া এই নূতন সাধন দিয়াছ, তবে ইহাতে সিদ্ধি দান কর; নূতন সাধনে নবজীবন দেও।

• • ———

প্রচারে প্রেম ও সহিষ্ণুতা—প্রচারক জীবনের দায়িত্ব অতি গুরুতর। কাহারও অনুরোধে উপরোধে কেহ প্রচারক ব্রত গ্রহণ করেন নাই। কাহারও মনস্তুষ্টি-সাধন প্রচারকের জীবনের উদ্দেশ্য নহে। পবিত্র জীবনের আস্বাদ পাইয়া, ঈশ্বর-প্রেম ও ভক্তির মধুরতা অনুভব করিয়া, তাঁহাদের প্রাণে স্বতঃ এই ইচ্ছা হয় যে যাহারা এই সুখের অধিকারী হয় নাই, তাহাদের নিকট এই ধন বিতরণ করা কর্ত্তব্য। ঈশ্বরভক্ত অন্যের পরিত্রাণ ও মুক্তির কথা ভাবেন না; ভাবেন আপনার মুক্তি ও পরিত্রাণ। তিনি দিয়াই সুখী, দিয়াই কৃতার্থ হন। প্রেম ও কৃতজ্ঞতা এই মুক্তির খবর সকলের নিকট বলিবার জন্য তাঁহাকে উৎসাহিত করে। তিনি এই প্রচার ব্রত অন্যের উদ্ধারের জন্য গ্রহণ করেন না। —কিন্তু এ কার্য্য দ্বারা তিনিই মুক্তির পথে অগ্রসর হইতে পারিবেন এই বিশ্বাসের অধীন হইয়াই তিনি প্রচারব্রত গ্রহণ করেন। ইহার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার মনে দাস-ভাব জাগ্রত হয়, আমি প্রভুর সন্তানগণের দাস—আমি তাঁহাদের সেবা করিতে নিযুক্ত, তাঁহাদের উপর প্রভুত্ব করিতে নিযুক্ত নই। সকলে এই পরিত্রাণের সংবাদ শুনিতেছে না, সকলে হয় ত নিন্দা করিতেছে ও তাঁহার বিরুদ্ধ আচরণ করিতেছে; তথাপি তাঁহার প্রেম ও সহিষ্ণুতার অভাব হইতেছে না। যখনই পৃথিবীতে নির্যাতন ও উৎপীড়ন আসিতেছে, তখনই তিনি তাঁহার প্রাণস্থিত দেবতার দিকে দৃষ্টি করিতেছেন ও বলিতেছেন:— "পিতা প্রেম দাও সহিষ্ণুতা দাও—তুমি যেমন প্রেম ও সহিষ্ণুতা দ্বারা সকলকে টানিতেছ, আমাকে সেই ভাবে টানিতে সমর্থ কর। প্রচারকজীবনের এই প্রেম ও সহিষ্ণুতার অভাবে সকল ধর্ম্মসমাজে মহা অনিষ্ট উৎপন্ন হইতেছে।

ঈশ্বরের সেবক তাঁহার প্রভুর আদর্শ সম্মুখে রাখিবেন। ঈশ্বরের করুণা যেমন পাপাসক্ত ও সংসারাসক্ত ব্যক্তির গৃহে যাইয়া তাহার মন ফিরাইবার জন্য প্রেম ও সহিষ্ণুতার সহিত প্রতীক্ষা করে, ঈশ্বরের প্রেমিক সাধক তেমনি পাপীর পশ্চাতে ধাবিত হন, তাঁহার আকৃতিতে প্রেম লাগিয়া রহিয়াছে। তাঁহার মুখে একটাও উচ্চ কথা নাই—মধুরতা সর্ব্বদাই তাঁহার হৃদয় পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছে। যাঁহারা জীবনে ঈশ্বরের দাসত্ব গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন—তাঁহারা সর্ব্ব প্রথমে আপনার হৃদয়কে প্রেম ও দাস্যভাবে পূর্ণ করুন। কত তিরস্কার নিন্দা, উপকারের পরিবর্ত্তে অকৃতজ্ঞতা পাইবেন—কিন্তু প্রেম ও সহিষ্ণুতা দ্বারা সকল সময় কার্য্য করিতে হইবে।

যে পদের যত গৌরব তাহার শিক্ষা ও উপযুক্ততাও তত

অধিক। প্রভুর দাস হইয়া যাঁহারা তাঁহার পবিত্র নাম, পবিত্র ধর্ম্মের কথা জগৎকে বলিবেন তাঁহারা কি সর্ব্বাপেক্ষা গৌরব-জনক পদে অভিষিক্ত নহেন? একার্য্যের প্রথম উপযুক্ততা প্রেম, দ্বিতীয় প্রেম, তৃতীয়ও প্রেম। প্রেমহীন জীবনে এ ব্রত প্রতিপালন করিতে পারিবেন না। কেহ কেহ জ্ঞানের প্রভাবে অনেককে অনেক তত্ত্ব বলিতে পারেন। তাহাতে প্রভুর নাম প্রচার হইবে না; আত্ম-প্রচার সম্ভবে। দীনদাস, প্রেমদাস, আত্মদমনকারী ব্যক্তিদ্বারাই তাঁহার কার্য্য হইবে। ঈশ্বর তাঁহার দাসপদ-প্রার্থীদিগকে উপযুক্ত করুন।

সম্পাদকীয় ও প্রাপ্ত প্রবন্ধ

সাধন-ঘর।

জগতের ইতিবৃত্ত পাঠ করিলেই দেখিতে পাওয়া যায় যে যে সকল সাধু মহাজন আধ্যাত্মিকতা ও ধর্ম্ম-বিশ্বাসের বলে মানবসমাজে তুমুল ধর্ম্ম বিপ্লব উপস্থিত করিয়া গিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই নির্জ্জন-বাস ও গভীর তপস্যাদ্বারা সেই সকল সত্য লাভ করিয়াছিলেন। শাক্যসিংহের কঠোর তপস্যার বিষয় সকলেই অবগত আছেন। সুতরাং তাহার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। মহাত্মা যীশুর পূর্ব্ব জীবনের বিষয়ে অতি অল্পই উল্লেখ দৃষ্ট হয়। কিন্তু তথাপি যাহা অবগত হওয়া যায়, তাহাতে স্পষ্টই অনুমান করা যাইতে পারে যে তিনি জলাভিষেককারী জনের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া বহুদিন অরণ্য-মধ্যে নির্জ্জনবাস ও তপস্যা করিয়াছিলেন। চৈতন্যের জীবনচরিত যাঁহারা পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই জানেন যে তিনি একাকী তীর্থ পর্যটন ও নির্জ্জনবাসের সময়েই ভক্তিতত্ত্বের মহত্ব অনুভব করেন ও তৎপরে বহুদিন শ্রীবাসের গৃহে দ্বার রুদ্ধ করিয়া সেই ভক্তির সাধন করেন এবং পরে প্রচারার্থে বহির্গত হন। মহাপুরুষ মহম্মদের তপস্যা বিষয়ে তাঁহার জীবনচরিতে যাহা বর্ণিত হইয়াছে, তাহার কিয়দংশ শ্রদ্ধাস্পদ ব্রাহ্ম বন্ধু, গিরিশচন্দ্র সেন মহাশয়-প্রণীত গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত করিতেছি;—

"যখন প্রকৃত ভাবে প্রত্যাদিষ্ট হওয়ার সময় নিকটবর্ত্তী হইল, তখন লোক-সংসর্গ ছাড়িয়া নির্জ্জনে ঈশ্বর চিন্তায় দিন যাপন করিবার জন্য তাঁহার মন একান্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিল। তিনি সেই সময় হেরা পর্ব্বতের নিভৃত গহ্বরে যাইয়া বসিলেন। অহর্নিশি সেই গর্ত্ত মধ্যে ঈশ্বর-মনন-চিন্তায় নিযুক্ত থাকিতেন, কিয়দ্দিন অন্তর আবশ্যকমতে গৃহে আসিয়া পরিবারের সঙ্গে মিলিত হইতেন, তৎপরে পুনর্ব্বার গহ্বরে প্রবেশ করিয়া নির্জ্জন সাধনায় নিবিষ্ট থাকিতেন। যে গর্ত্তে তিনি সাধন ভজনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তাহার দৈর্ঘ্য আট হস্ত, পরিসর দুই হস্ত পরিমাণ, উহা মক্কা হইতে তিন মাইল অন্তর। কাবা মন্দির হইতে যাহারা মেনাবাজারে গমন করে, হেরা পর্ব্বত তাহাদের বামপার্শ্বে থাকে। যে কালে হজরত এইরূপ নির্জ্জন সাধনায় প্রবৃত্ত হন, তখন তাঁহার চল্লিশ বৎসর বয়ঃক্রম। হজরত মহম্মদ অধিকাংশ সময় আপনার প্রিয় গিরিগহ্বর কুটীরে যাপন করিতে লাগিলেন। তাহা দেখিয়া কোরেশ নারীগণ সময়ে সময়ে আসিয়া খাদিজাকে অনুযোগ করিয়া বলিতেন "অয়ি যোষিৎকুল-গৌরবে, মহম্মদকে তুমি নানা প্রকার অনুগ্রহে অনুগৃহীত করিলে, ধন-সম্পত্তি মান সম্ভ্রম তাঁহার প্রেমের অনুরোধে বিসর্জ্জন করিয়া বসিলে, এদিকে এইক্ষণ তিনি তোমার প্রণয় সংসর্গ ছাড়িয়া দূরে থাকেন, তাঁহার জন্য এত করিলে, তিনি তোমার প্রতি এইক্ষণ বীতরাগ, এ কেমন?" খাদিজা তদুত্তরে কহিতেন, 'ভগিনীগণ, তোমরা যাহা কল্পনা করিয়া দুঃখ প্রকাশ করিতেছ, আমার মন তদ্বিষয়ে নিশ্চিন্ত; হজরত হইতে যাহা সংঘটিত হইতেছে তাহা আমার প্রতি বীরাগ ও অপ্রেমপ্রযুক্ত নহে, বরং তাহা সৌভাগ্য ঊষার উদয় বশতঃ ঘটিতেছে। প্রেরিতত্ব সূর্য্যের প্রকাশ হওয়ার উপক্রম, স্বর্গীয় সম্পদের রশ্মিজালে আমার চিত্তাকাশ যে অচিরে আলোকিত হইবে, তাহার পূর্ব্বাভাস দেখিতেছি। বহু বৎসর যাবৎ আমি হৃদয়ক্ষেত্রে এই কামনা বীজ বপন করিয়াছি, অনেক কাল হইল আমার সুখ শান্তিরূপ মূলধন এই মহাপণ্য লাভের আকাঙ্ক্ষায় উৎসর্গ করিয়া বসিয়াছি। এইক্ষণ সেই সময় উপস্থিত যে, হজরত অনুপ্রাণিত হইবেন, পবিত্রাত্মার আলোক স্বর্গ হইতে আসিতেছে, কিন্তু মনুষ্যের সামান্য চক্ষু তাহা দেখিতে পাইতেছে না।

যাহা হউক, তিনি অনেক সময় এইরূপে লোকসংসর্গ পরিত্যাগ করিয়া নিভৃত হেরা গহ্বরে গভীর চিন্তায় মগ্ন থাকিতেন। ক্রমে নির্জ্জন প্রদেশে ঐশ্বরিক জ্যোতি ও একতত্ত্ববাদের গূঢ়তত্ত্ব তাঁহার অন্তরে প্রকাশিত ও প্রতিফলিত হইতে লাগিল; মোহকালিমা তদীয় হৃদয় দর্পণ হইতে নিষ্কাষিত হইল, স্বর্গীয় আলোকের প্রকাশে মনের অন্ধকার পলায়ন করিল। তিনি সংসার-বন্ধন ছিন্ন করিয়া জনসংসর্গ হইতে দূরে অবস্থান করিলেন। আরবীয় জ্ঞানবান লোকেরা লক্ষণ বুঝিয়া পরস্পর বলিতে লাগিলেন যে "অবশ্য মোহম্মদ ঈশ্বরপ্রেমে আকৃষ্ট হইয়াছে।" এদিকে হজরত সাধন বারি সিঞ্চনে স্বীয় হৃদয়োদ্যানকে অনুক্ষণ স্নিগ্ধ ও সতেজ রাখিতেছিলেন, প্রেমের পতাকা অনুরাগ ভূমিতে উন্নমিত করিয়াছিলেন। ক্রমে তাঁহার প্রশান্তচিত্তে অনুপ্রাণনের লক্ষণ সকল স্পষ্ট প্রকাশ পাইতে লাগিল; তাঁহার প্রশস্ত অন্তঃকরণ স্বর্গাধিপতির নিষেধ বিধির অবতরণ ভূমি হইল।"

এইরূপ সকল মহাজনের জীবনেই দৃষ্ট হয় যে তাঁহারা নির্জ্জনে সাধনাদ্বারা যাহা লাভ করিয়াছেন, তাহাই সজনে আসিয়া বিতরণ করিয়াছেন। আমাদের ব্রাহ্মসমাজের ক্ষুদ্র ইতিবৃত্তের মধ্যেও দেখিতে পাওয়া যায়, যে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ দুই বৎসর কাল গিরি শৃঙ্গে বাস ও তপস্যা করিয়া যে শক্তি লাভ করিয়া আসিয়াছিলেন, সেই শক্তির প্রভাবেই ব্রাহ্মসমাজ পুনরুজ্জীবিত হইয়া, বর্ত্তমান আকার ধারণ করিয়াছে।

কেবল অধ্যাত্ম বিষয়েই বা কেন, কি রাজনৈতিক, কি সামাজিক, কি শিক্ষাসম্বন্ধীয়, কি বিজ্ঞানসম্বন্ধীয় কোন

গভীর তত্ত্বই বিনা নির্জ্জন সাধনায় আবিষ্কৃত হয় না। একটা সামান্য বাহিরের বিষয়ের উল্লেখ করা যাইতেছে। প্রায় সকল লোকের মুখেই ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের পোষ্ট আফিসের বন্দোবস্তের প্রশংসা শুনিতে পাওয়া যায়, কিন্তু পরম্পরাক্রমে কত লোকের নির্জ্জনচিন্তার ফলে ঐ বন্দোবস্ত দাঁড়াইয়াছে, তাহা একবার ভাবিয়া দেখুন। ইংরাজদিগের জীবনে নির্জ্জন-চিন্তা আছে বলিয়াই তাঁহারা সারবান বিষয় সকল উৎপন্ন করিতে পারেন। প্রায় প্রত্যেক ইংরাজ গৃহস্থের গৃহে একটী নির্জ্জনগৃহ দেখিতে পাওয়া যায়, সেটী পাঠাগার বা চিন্তাগার (study)। তিনি যখন সেই গৃহে প্রবিষ্ট হন, তখন পরিবার পরিজনের সকলেই জানেন, যে তিনি পাঠ বা চিন্তাতে নিযুক্ত আছেন, গুরুতর কারণ ব্যতীত তাঁহার চিন্তার ব্যাঘাত করা কর্ত্তব্য নহে। এই বন্দোবস্তের গুণে সে নির্জ্জনগৃহটী অনেক সময় গিরিগহ্বরের ন্যায় নির্জ্জন ও নিস্তব্ধ থাকে। সেখানে বসিয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা চলিয়া যায়, গৃহস্বামী চিন্তাতে নিমগ্ন থাকেন। এইরূপ নির্জ্জনবাসের প্রথা না থাকিলে গ্লাডষ্টোন প্রভৃতি রাজ-পুরুষগণ প্রতিদিন যে পরিমাণে পাঠ চিন্তা ও অন্যান্য কাজ করিতেছেন, তাহার দশ ভাগের এক ভাগও করিতে পারিতেন না।

প্রাচীন হিন্দু গৃহস্থদিগের গৃহে নির্জ্জন-চিন্তা ও পাঠের জন্য স্বতন্ত্র গৃহ না থাকুক একটা ঠাকুর ঘর থাকিত। সেটী পূজার ঘর। স্নানান্তে সকলে সেই ঘরে প্রবেশ করিয়া ইষ্ট দেবতার আরাধনা করিতেন। গৃহের বালক বালিকা, দাস দাসী অতিথি অভ্যাগত সকলেই জানিত, ওটা ঠাকুর ঘর, উহাতে পবিত্র ভাবে প্রবেশ করিতে হয় এবং পূজার্থই প্রবেশ করিতে হয়।

বর্ত্তমান সময়ে দেখিতেছি ব্রাহ্মগৃহস্থ নবীনের অনুকরণ করিয়া না নির্জ্জন পাঠ মন্দির রাখিতেছেন, না প্রাচীনের অনুকরণ করিয়া ঠাকুর ঘর রাখিতেছেন। তাঁহাদের পুত্র কন্যাগণ ইহা দেখিতে পাইতেছে না, যে গৃহস্থধর্ম্ম করিতে গেলে যেমন রন্ধনের জন্য রান্নাঘর রাখিতে হয়, আহারের জন্য খাবার ঘর রাখিতে হয়, তেমনি পাঠ, চিন্তা ও উপাসনার জন্যও সাধন-ঘর রাখিতে হয়। ইহার অভাবে যে তাহারা ধর্ম্মভাববিহীন হইয়া বর্দ্ধিত হইবে, তাহাতে বিচিত্রতা কি? আমরা এ বিষয়ে ব্রাহ্মগৃহস্থদিগের দৃষ্টিকে আকর্ষণ করিতেছি। ব্রাহ্মগৃহস্থের গৃহে নির্জ্জনবাস, আত্মচিন্তা ও সাধন ভজনের জন্য সাধন-ঘর থাকা নিতান্ত প্রয়োজনীয়।

দেহাত্মবুদ্ধি।

(প্রাপ্ত)

শ্রীভগবানুবাচ—

যস্যাত্মবুদ্ধিঃ কুণপে ত্রিধাতুকে স্বধীঃ কলত্রাদিষু ভৌম ইজ্যধীঃ।
যত্তীর্থবুদ্ধিঃ সলিলে ন কর্হিচিজ্জনেষ্বভিজ্ঞেষু স এব গোখরঃ।

(শ্রীমদ্ভাগবৎ দশম স্কন্ধ)

ভগবান্ বলিতেছেন:—

বাতপিত্ত শ্লেষ্মময় শরীরে যাহার আত্মজ্ঞান, পুত্র কলত্রাদিতে যাহার আত্মীয় জ্ঞান, মৃত্তিকা-বিকারে যাহার দেবতাবুদ্ধি, ও জলেতে যাহার তীর্থজ্ঞান; সাধুতে যাহার সে জ্ঞান নাই, সে ব্যক্তি গো তৃণবাহী গর্দ্দভস্বরূপ। যদিও বাত-পিত্ত-শ্লেষ্মাময় ক্ষণভঙ্গুর শরীর আত্মা নহে, তথাপি সংসারের অধিকাংশ লোকের কার্য্য-কলাপ পর্য্যালোচনা করিলে মনে হয়, তাহারা যেন দেহকে সারবস্তু বলিয়া স্থির করিয়া রাখিয়াছেন। অনেকে দেহকে সুসজ্জিত করা, দেহের লাবণ্য এবং সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করা যত প্রয়োজনীয় মনে করেন, আত্মার সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করা তত প্রয়োজনীয় মনে করেন না। দেহের সামান্য রোগ উপস্থিত হইলে, তাহা হইতে অব্যাহতি লাভের জন্য ব্যতিব্যস্ত হইয়া থাকেন, কিন্তু আত্মার কঠিন রোগ উপস্থিত হইলেও তৎপ্রতি দৃষ্টি করেন না। যখন দেহ ও আত্মার বিবাদ উপস্থিত হয়, তখন দেহের প্রাধান্য স্বীকার করিয়া আত্মার কল্যাণের প্রতি ঔদাসীন্য প্রদর্শন করেন। ধর্ম্মকে অগ্রাহ্য করিয়া অবৈধ উপায়ে অর্থ উপার্জ্জন করেন এবং তদ্দ্বারা দেহ রক্ষার বন্দোবস্ত করিয়া থাকেন। নীতির মস্তকে পদাঘাত করিয়া শরীর-পালনের বন্দোবস্ত করেন। ইঁহারা কেবল স্ব স্ব শরীর রক্ষার জন্য ব্যগ্র হইতেছেন তাহা নহে। আত্মীয়দিগের শরীর রক্ষার জন্যও ব্যস্ত, কিন্তু তাহাদিগের আত্মারক্ষার জন্য তেমন ব্যস্ত নহেন। প্রিয়তম ব্যক্তির পীড়া হইলে আর আত্মীয়ের প্রাণে শান্তি থাকে না; তিনি যাতনায় অস্থির। কি উপায় অবলম্বন করিলে রুগ্ন ব্যক্তি অচিরে রোগমুক্ত হইবে, তাহারই জন্য উৎকণ্ঠিত হন, কিন্তু সে ব্যক্তি যদি দুর্নীতিরূপ গরলপানে আত্মাকে বিপদাপন্ন করিতে থাকে, তাহা হইলে তত উৎকণ্ঠা দেখিতে পাওয়া যায় না। নাস্তিকতার বাণে তাহার আত্মা জর্জ্জরিত হইলেও আত্মীয়ের প্রাণে কিঞ্চিন্মাত্র দুঃখের উদ্রেক হয় না। মায়াবিনী কপটতা তাহার সমস্ত আত্মাকে গ্রাস করিলেও আত্মীয়ের প্রাণে বিন্দুমাত্র কষ্ট হয় কিনা সন্দেহ।

আত্মীয় আত্মীয়ের জন্য যাহা করিতেছেন, পরোপকারী ব্যক্তিদিগের কোন কোন মহাত্মাও তদনুরূপ অনুষ্ঠান করিতেছেন। কোন দেশে প্রবল দুর্ভিক্ষের অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল; অনশনে অনেক নরনারী প্রাণ পরিত্যাগ করিতে লাগিল, কোনও সদাশয় ব্যক্তি দূরদেশ হইতে এই দুর্গতির কথা শুনিয়া হয় ত তথায় শত শত মুদ্রা প্রেরণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু সে দেশের লোক সকল ঈশ্বরকে ভুলিয়া পাপের গভীর কূপে ডুবিয়া মরিতেছেন। এই কথা শুনিয়া হয় ত তাঁহার প্রাণে কিঞ্চিন্মাত্রও আঘাত লাগিল না। কোন দেশ মহামারীর প্রবল আক্রমণে জনশূন্য হইয়া যাইতেছে, তিনি শ্রবণ করিয়া অস্থির হইলেন। সুচিকিৎসার বন্দোবস্ত করিবার জন্য চিকিৎসক ও ঔষধ প্রেরণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু পানাসক্তির ঘোরতর মহামারীদ্বারা যে সে দেশের নরনারীর আত্মার দুর্গতির একশেষ হইতেছে, ইহা শুনিয়া তাঁহার চিত্তে দয়ার আবির্ভাব হইতেছে না। তিনি শারীরিক কুষ্ঠরোগাক্রান্ত ব্যক্তিদিগের অবস্থানের জন্য লক্ষ মুদ্রা ব্যয়ে এক মনোরম বাড়ী নির্ম্মাণ করিয়া দিলেন। কিন্তু আধ্যাত্মিক কুষ্ঠ রোগাক্রান্ত ব্যক্তিদিগের দুর্দ্দশার বিষয় একবারও ভাবিতেছেন না।

এইরূপ ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত দ্বারা প্রমাণ করা যাইতে পারে, যে দেহাত্মবুদ্ধি আজিও অধিকাংশ লোকের মনে ষোল আনা রাজত্ব করিতেছে। দুঃখের বিষয় যে, যাঁহারা মুখে ধর্ম্মকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রচার করিতেছেন, তাঁহারাও কার্য্যতঃ শরীরকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়া থাকেন। এতদ্দ্বারা আমরা শরীর-নিগ্রহের পক্ষ সমর্থন করিতেছি না। কোন কোন ব্যক্তি শরীর ধারণ পূর্ব্বজন্মকৃত পাপের শাস্তি মনে করেন, সুতরাং তাঁহাদিগের মতে শরীর-নিগ্রহ মুক্তি-সাধনের অন্যতর উপায়। আমরা তাহা মনে করি না। প্রত্যুত আমরা মনে করি যে, শরীর ও আত্মায় গূঢ় সম্বন্ধ রহিয়াছে। শরীরে কোন রূপ গ্লানি উপস্থিত হইলে, নিরুদ্বেগে ধর্ম্ম সাধন চলিতে পারে না। এজন্য শরীর সুস্থ রাখা কর্ত্তব্য। কিন্তু সর্ব্বদাই শরীরের কল্যাণ উপলক্ষ্য, আত্মার কল্যাণ লক্ষ্য হওয়া উচিত। শরীরকে যাঁহারা লক্ষ্য মনে করিতেছেন এবং লক্ষ্য মনে করিয়া কেবল তাহার কল্যাণসাধনেই ব্যস্ত থাকেন, তাঁহারাই দেহাত্মবাদী। ভাগবতের শ্লোক তাঁহাদিগের সম্বন্ধেই প্রযুজ্য, তাঁহারাই উপলক্ষ্যকে লক্ষ্য মনে করিয়া গন্তব্য পথ হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়িতেছেন।

কৃপণ যেরূপ লক্ষ্য—সুখস্বাচ্ছন্দ্যে জলাঞ্জলি দিয়া, উপলক্ষ্য—ধন সঞ্চয়ের জন্যই ব্যগ্র হয়, দেহাত্মবাদিগণও তদ্রূপ আত্মার মঙ্গল সাধনে পরাঙ্মুখ হইয়া কেবল শরীর লইয়াই ব্যস্ত থাকে। শরীর ও আত্মার মধ্যে যখন বিবাদ উপস্থিত হয়, তখন দেহাত্মবুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যাইতে পারে। ক, দুশ্চিকিৎস্য ব্যাধিগ্রস্ত হইয়াছেন। চিকিৎসক ব্যবস্থা দিলেন যে মহামাস তৈল ভিন্ন ব্যাধির অবসান হইবে না। ক যদি ব্যাধির হস্ত হইতে মুক্তি লাভ করিবার জন্য জীবন্ত মনুষ্য হত্যা করিতে প্রস্তুত হন, তাহা হইলে বলিতে হইবে, তিনি দেহকে আত্মা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ মনে করিতেছেন। কারণ জীবন্ত মনুষ্য হত্যাদ্বারা আত্মার দুর্গতি হইয়া থাকে।

এই দেহাত্মবুদ্ধি কিরূপে দূরীকৃত হইতে পারে, তাহার আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া আবশ্যক। আত্মাকে জানিতে পারিলে এবং দেহের সহিত তাহার কি সম্বন্ধ তাহা বিশেষ রূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইলে, দেহাত্মবুদ্ধির অবসান সম্ভবপর। আত্মাকে জানিতে হইলে, অধ্যবসায়ের সহিত অন্তর পরীক্ষা করা প্রয়োজনীয়। মনের স্বাভাবিক দৃষ্টি বহির্মুখী। মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইবার পর শিশু জ্ঞানেন্দ্রিয় সমূহ দ্বারা বহির্জ্জগতের জ্ঞান লাভ করিতে থাকে। বহির্জ্জগৎই সর্ব্বাগ্রে তাহার চিত্তকে আকর্ষণ করে। বহুদিন এইভাবে গত হয়। তৎপর বিশেষ শিক্ষা প্রদত্ত হইলে, অন্তর্দৃষ্টি খুলিতে পারে। অসভ্য দেশের প্রায় সকল নরনারী এবং সুসভ্য দেশের সুশিক্ষিত ব্যক্তি সমূহ বহির্জ্জগৎ লইয়াই জীবনাতিবাহিত করে, সুতরাং স্থূল ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য বস্তু ভিন্ন তাঁহাদিগের অন্যাবিধ সত্তা উপলব্ধি করিবার সাধ্য নাই। এজন্য স্থূল শরীরই তাঁহাদিগের দৃষ্টিপথে পতিত হয় এবং সমস্ত জীবন এই শরীরের সেবাতেই অতিবাহিত হইয়া থাকে। মানুষ বিশেষ শিক্ষা পাইলে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য স্থূল বহির্জ্জগৎ ও শরীর অতিক্রম করিয়া তন্মূলে অতীন্দ্রিয়, নিরাকার, চৈতন্যময় শক্তির রাজ্য দেখিতে সমর্থ হয়। এই বিশেষ শিক্ষা কি? প্রথমতঃ অতীন্দ্রিয় রাজ্যের তত্ত্ব যাঁহারা অবগত আছেন, তাঁহাদিগের বাক্যে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া, তাঁহাদিগের অবলম্বিত পথ আশ্রয় করিতে হয়। বিশ্বাসীদিগের বাক্যে এতটুকু আস্থা রাখিতে না পারিলে, যথারীতি অনুসন্ধানের প্রবৃত্তি জন্মিবে না। অনুসন্ধান করিতে করিতে যদি বিশ্বাসীবাক্যের সত্যতা প্রতিপাদিত হয়, তাহা হইলে অতীন্দ্রিয় আত্মার জ্ঞান বদ্ধমূল হইতে থাকিবে, এবং তৎসঙ্গে দেহাত্মবুদ্ধি লোপ পাইতে থাকিবে। এখন জিজ্ঞাস্য এই, বিশ্বাসী লোকের পরিচয় পাইবার উপায় কি? যে ব্যক্তি বাহ্য ব্যবহারে প্রমাণ করিতেছেন যে, আত্মাই সার বস্তু এবং যিনি আত্মার কল্যাণকে উপেক্ষা করিয়া দেহের কল্যাণের জন্য ব্যস্ত হন না, পরন্তু প্রয়োজন হইলে আত্মার জন্য দেহকে বিসর্জ্জন দিতে প্রস্তুত, তিনিই দেহাত্মবুদ্ধির হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়াছেন, তিনিই অতীন্দ্রিয় আত্মাকে বিলক্ষণরূপে জানিতে পারিয়াছেন। কেহ মনে করিতে পারেন, আমরা এতদ্দ্বারা অভ্রান্ত গুরুবাদ সমর্থন করিতেছি। অতীন্দ্রিয় আত্মজ্ঞান পরায়ণ ব্যক্তির উপদেশ বিশ্বাস পূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া তদনুরূপ আচরণ করিলে, তাঁহাকে কি অভ্রান্ত গুরু বলিয়া স্বীকার করা হইতেছে না? মতে তাঁহাকে অভ্রান্ত না বলিলেও কার্য্যতঃ তাঁহাকে অভ্রান্ত বলা হইতেছে। মানবের উপদেশ গ্রহণ ভিন্ন জীবন-পথে অগ্রসর হইবার সাধ্য নাই। বাল্যকালে পিতামাতা কিংবা অন্য কোন গুরুজনের উপদেশ লইয়া চলিতে হয়, যৌবনে ও বার্দ্ধক্যে কত বিষয়ে কত জনের উপদেশ লইতে হয়। শরীরে ব্যাধি জন্মিলে চিকিৎসকের উপদেশ লওয়া কর্ত্তব্য। গৃহ প্রস্তুত করিতে ইঞ্জিনিয়ারের ব্যবস্থা লওয়া হইতেছে। বিদ্যালয়ে শিক্ষক ও অধ্যাপকের উপদেশ গ্রহণে চলিতে হয়। এই সকল উপদেষ্টাদিগকে কি অভ্রান্ত বলিতে হইবে? প্রত্যুত ইহা দৃষ্টিগোচর হইতেছে যে, যিনি দশ স্থলে কৃতকার্য্য হইয়াছেন, তিনি একাদশ স্থলে অকৃতকার্য্য হইলেন। জনৈক চিকিৎসক কোন এক রোগাক্রান্ত এক শত ব্যক্তিকে রোগমুক্ত করিলেন, কিন্তু সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিয়া সেই শ্রেণীর রোগাক্রান্ত অন্য ব্যক্তিকে আরোগ্য করিতে পারিলেন না। চিকিৎসকের অকৃতকার্য্যতার এই দৃষ্টান্ত দেখিয়া যেমন তাঁহার ভ্রম স্বীকার করিতে হয়, ধর্ম্মযাজকদিগের অকৃতকার্য্যতা দেখিয়া সেইরূপ তাঁহাদিগকে ভ্রমাধীন বলিয়া মানিয়া লইতে হইবে। একজন ধর্ম্মোপদেষ্টা দুই শত শিষ্যকে ধর্ম্মোপদেশ করিলেন, তাহার মধ্যে দেড় শত শিষ্য উপকার পাইলেন, অবশিষ্ট পঞ্চাশ জনের কোন ফল হইল না, তখনও যদি এই পঞ্চাশ জন লোক তাঁহার উপদেশকে শিরোধার্য্য করিয়া তাঁহাকে পরম গুরু বলিয়া স্বীকার করে, তাহা হইলে বলিব, এই সকল লোক জ্ঞানকে জলাঞ্জলি দিয়াছে। ইহারা ভ্রান্ত গুরুর কুফলপ্রদ উপদেশকে অগ্রাহ্য না করিয়া তৎপথেই চলিতেছে। এই সকল ব্যক্তি যদি কোন চিকিৎসকের অকৃতকার্য্যতা দেখিয়া তাঁহাকে তৎক্ষণাৎ পরিত্যাগ করেন এবং অন্য চিকিৎসক অন্বেষণ করিতে থাকেন, তবে

ধর্ম্মোপদেষ্টা সম্বন্ধে তদ্রূপ না করিলে, বলিব যে, ইহারা অভ্রান্ত গুরুবাদ মানিয়া লইতেছেন। কিন্তু কোন ব্যক্তি কোন ধর্ম্মোপদেষ্টার উপদেশ মতে চলিয়া উপকার হয় কি না দেখিবার জন্য সে উপদেশ গ্রহণ করিলে, উপকার হইলে তাহা পরিত্যাগ না করিলে এবং উপকার না হইলে তাহা তৎক্ষণাৎ বর্জ্জন করিলে, তাঁহার তদ্রূপ আচরণ অভ্রান্ত গুরুবাদের পক্ষসমর্থক বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে না। সুতরাং আমরা যেরূপ উপদেশ গ্রহণের ব্যবস্থা দিয়া আসিয়াছি, তদ্দ্বারা ঘুণাক্ষরেও অভ্রান্ত গুরুবাদ সমর্থিত হইতেছে না। তবে যেমন অল্প অনভিজ্ঞ বা দশ বিষয়ে অনভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ বহুদর্শী অভিজ্ঞ ব্যক্তিদিগের উপদেশ সকল বিশ্বাস পূর্ব্বক পরীক্ষার্থ গ্রহণ করিয়া থাকে, ধর্ম্ম বিষয়েও তদ্রূপ উপদেশ গ্রহণ করা যাইতে পারে। কেহ এরূপ করিলে তাঁহাকে দোষী করা যাইতে পারে না। আমরা দেহাত্মবুদ্ধির সম্বন্ধে অনেক আলোচনা করিলাম। যাঁহারা স্বয়ং আত্মজ্ঞান লাভ করিয়া দেহাত্ম-বাদের হস্ত হইতে অব্যাহতি পাইতে পারেন নাই, তাঁহারা বিশ্বাসী আত্মার নিকট গমন পূর্ব্বক তাঁহাদিগের অবলম্বিত পথ গ্রহণে দেহাত্মবুদ্ধি পরিত্যাগ করিবেন।

প্রেম-তত্ত্ব।

(কবিরের উক্তি)

(১) ইয়ে তো ঘর হায় প্রেমকা খালাকা ঘর নহি, শীশ উতারে ভূঁয়ি ধরে তব্ পঁহুছে ঘর মাহি।

এই প্রেমের গৃহ সামান্য নহে, যে আপনার মস্তক ছেদন করিয়া ভূমিতে রাখিতে পারে, সেই এই প্রেমের গৃহে প্রবেশ করিতে পারে।

(২) প্রেম না বাড়ী উপজে, প্রেম না হাটে বিকায়, রাজা রাণা যো রুচে শীশ দেয় লেযায়।

প্রেম ক্ষেত্রে উৎপন্ন হয় না, বাজারেও বিক্রয় হয় না, কিন্তু রাজা রাণা যাহার ইচ্ছা হয়, মস্তক দিলেই লাভ করিতে পারে।

(৩) প্রেম পিয়ালা যো পিয়ে শীশ দক্ষিণাদে, লোভী শীশ নাদে সেকে নাম প্রেমকা লে।

যে প্রেম পাত্র পান করিতে চায়, তাহাকে আপনার মস্তক দাক্ষিণা দিতে হয়, এজন্য লোভী ব্যক্তি মস্তক দিতে পারে না। কেবল বৃথা প্রেমের নাম করিয়া থাকে।

(৪) আয়া প্রেম কাহা গয়া দেখামা সব্ কোয় ছিন, রোয়ে ছিন্ মে হাসে সো তো প্রেম নাহোয়।

প্রেম যখন আসিয়াছিল তখন সকলেই দেখিয়াছিল, কিন্তু সে প্রেম কোথায় চলিয়া গেল? যে প্রেমে ক্ষণে হাসে ক্ষণে কাঁদে তাহাকে প্রেম বলা যায় না।

(৫) প্রেম প্রেম-সব কোই কহে, প্রেম না চিন্হে কো আট পহের ভিজা রহে, প্রেম কহাওয়ে সো।

সকলেই প্রেম প্রেম বলিয়া থাকে, কিন্তু প্রেম কেহ চিনে না; যে প্রেম অষ্ট প্রহর সিক্ত রাখে, তাহাকেই প্রেম কহে।

(৬) বাড়ে ঘাটে ছিন্ একমে সো তো প্রেম না হোয় অঘট প্রেম পিঞ্জর বসে প্রেম কাহাওয়ে সো।

যে প্রেম ক্ষণে বৃদ্ধি পায় ও ক্ষণে হ্রাস হয় তাহা প্রকৃত নহে, কিন্তু যে প্রেমের কখন হ্রাস হয় না তাহাই প্রকৃত প্রেম।

(৭) প্রেম পিয়ারে লাল সোঁ মন দে কীজে ভাও, সৎ-গুরুকে রূপাসে ভালা বনায় দাও।

আপনার মন দিয়া প্রিয়তমের প্রেমের দরকার, সৎগুরুর (ভগবানের) কৃপায় এই দাও (বাজি) ভালই হইয়াছে।

(৮) যা ঘট প্রেম নী সঞ্চারে সো ঘট জান শ্মশান, যেইসে খাল লোহার কি শ্বাস লেৎ বিন প্রাণ।

কর্ম্মকারের ভস্ত্রার যেমন শ্বাস প্রশ্বাস আছে। কিন্তু প্রাণ নাই। সেই প্রকার প্রেমহীন ব্যক্তির হৃদয় শ্মশানের মত।

(৯) প্রেম বাণিজ্য নাহি কর সেকে, চড়ে না নামকি গেল, মানুষ কেরি খালেড়ি ওড় ফিরে জুঁ বয়েল।

প্রেম বাণিজ্য দ্বারা লাভ করা যায় না, অথবা প্রেমের নাম লইলেই প্রেমিক হওয়া যায় না, যে প্রকার বৃষ মনুষ্যের চর্ম্ম গায়ে পরিয়া মনুষ্য হইতে পারে না।

(১০) প্রেম বিনা ধীরজ নাহি বিরহ নাহি বৈরাগ, সৎ গুরু বিনা মিটে নাহি মন কাসাকা দাগ।

প্রেম বিনা ধৈর্য্য হয় না, বিরহ বিনে বৈরাগ্য হয় না, আর ভগবানের কৃপা না হইলে মনের দাগ ঘুচে না।

ব্যাখ্যান-রত্নাবলী।

সাধনাশ্রম ২৬এ মে, ১৮৯৩ ব্যাখ্যাত।

"My defence is of God, which saveth the upright in heart."—Ps. vi, 10.

"আমার রক্ষা প্রভু পরমেশ্বর হইতেই হয়, যিনি বিশুদ্ধ-হৃদয় ব্যক্তিদিগকে পরিত্রাণ করেন।"

ঈশ্বরের পরিত্রাণপ্রদ শক্তি সকল আত্মার নিকটেই সর্ব্বদা বিদ্যমান; কিন্তু সকল আত্মায় উহা প্রকাশিত হয় না; যেমন তাড়িত সকল বস্তুতে, সকল স্থানে প্রচ্ছন্ন ভাবে নিহিত রহিয়াছে, কিন্তু উহার শক্তি সকল স্থানে প্রকাশ পায় না। উহার প্রকাশ পাইবার জন্য যেমন বিশেষ অবস্থা প্রয়োজন, তেমনি পরিত্রাতা পরমেশ্বরের পরিত্রাণপ্রদ শক্তির প্রকাশের জন্য আত্মার বিশেষ অবস্থার আবশ্যক। সে অবস্থা কি?—uprightness of heart. যাঁহাদের হৃদয় বিশুদ্ধ, হৃদয়ে নিকৃষ্ট অভিসন্ধি, মলিন বাসনা নাই, যাঁহাদের হৃদয়ে স্বার্থের কোন সম্বন্ধ নাই, সেই সকল আত্মাতেই তাঁহার পরিত্রাণপ্রদ শক্তি প্রকাশ পায়। যে পরিমাণে হৃদয়কে এই অবস্থায় মানুষ লইয়া যায়, সেই পরিমাণে তাহাতে সেই শক্তি প্রকাশ হয়। এই শক্তি সর্ব্বদা হৃদয়ে বিদ্যমান; কিন্তু তখনই ইহার বিক্রম, ইহার তেজ, ইহার শক্তি দর্শন করা যায়, যখন হৃদয় পবিত্র হয়, অভিসন্ধি রহিত হয়। তখনই চিত্তে ঈশ্বরের শক্তি দুর্জ্জয় বিক্রমে কাজ করে। তখনই মানবাত্মার সেই শক্তির তেজ, সেই শক্তির গভীরতা, সেই শক্তির বিক্রম দেখিয়া জগৎ স্তব্ধ

হয়। এই জন্যই এই বিশ্বাসী ব্যক্তি বলিতেছেন, তিনি বিশুদ্ধ-হৃদয় ব্যক্তিকেই পরিত্রাণ করেন। হৃদয়ের বিশুদ্ধতা না হইলে এই শক্তি অবতীর্ণ হয় না। যাঁহারা আপনাদের হৃদয়ে এই বিশুদ্ধতা অনুভব করিয়াছেন, তাঁহারাই বলিয়াছেন, My defence is of God; প্রভু পরমেশ্বর আমার রক্ষক। তাঁহারা সেই সাহসে সাহসী, সেই বলে বলী, তাঁহারা সেই শক্তিতে শক্তিমান্। তাঁহারা সত্যের বলে সাহসী, ঈশ্বরের উপর নির্ভর করিয়া সাহসী। যাঁহাদের হৃদয় বিশুদ্ধ, যাঁহাদের হৃদয়ে পরমেশ্বরের সেবা ভিন্ন অন্য কোন অভিসন্ধি নাই, তাঁহাদের সাহস, পরাক্রম দেখিয়া জগৎ স্তব্ধ হইয়াছে। সংসারে যাহার কোন সম্বন্ধ নাই, সংসারে যার এমন ঐশ্বর্য্য কিছু নাই, যাহাতে সাহস হইতে পারে, এমন ব্যক্তি বীরের ন্যায় দণ্ডায়মান হইয়া সত্যধর্ম্মের জয় জীবনে দেখাইয়াছেন, জগতের নিকট ঈশ্বরের নামের সাক্ষ্য দিয়াছেন। সংসারাসক্ত লোক এই প্রকার ব্যক্তির প্রতি কত অভিসন্ধির আরোপ করে; কিন্তু সমুদয় বাধা উৎপীড়ন অগ্রাহ্য করিয়া নির্ভীক হৃদয়ে পরমেশ্বরের মহৎ নামের সাক্ষ্য দিয়াছেন। আর কোন্ জিনিস হ'তে এইরূপ সাহস আসিতে পারে? নির্ম্মলচিত্ত হ'তে বিশুদ্ধ হৃদয় হ'তে, অভিসন্ধিরহিত, বাসনা-কামনা বিবর্জ্জিত চিত্ত হ'তেই সে সাহস হয়। My defence is of God. প্রভু পরমেশ্বর হইতে আমার রক্ষা। যাঁহারা আপনাকে সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরের হস্তে রাখিয়াছেন, তাঁহাদিগের রক্ষা এইরূপে। কিন্তু যাহাদের হৃদয় বিশুদ্ধ নয়, যাহাদের চিত্তে মলিন বাসনা আছে, অভিসন্ধিতে মলিনতা আছে, তাহাদের রক্ষা এই রকমে নয়। যে কিছু চায় অন্তরে তার আর সাহস হয় না। সে মরণের গোড়া নিজের মধ্যে রাখিয়া দিয়াছে। যে পরিমাণে চিত্তের বিশুদ্ধতা, সেই পরিমাণে সাহস, সেই পরিমাণে প্রসন্নতা, সেই পরিমাণে পরমেশ্বর হইতে রক্ষা। যখনই বিশ্বাসী বলিয়া লোকে বাধা দেয়, উৎপীড়ন করে, সমালোচনা করে, তখনই বিশ্বাসীর কর্ত্তব্য যে হৃদয়ের অভিসন্ধি কামনা পরীক্ষা করেন। লোকের উপর প্রতিহিংসা লইবার প্রবৃত্তি, লোকের উপর ক্রোধের ভাব রাখা অত্যন্ত অন্যায়। হৃদয়ের অভিসন্ধি পরীক্ষা করিয়া দেখ; যদি স্বার্থপরতা, সুখপ্রিয়তা বা কোন রকমের দুর্ব্বলতা, কোন রকমের মলিনতা থাকে, তবে আপনাকে মেরেছ। নিজের মৃত্যু তোমার নিজের কাছেই আছে। তবে আর মানুষকে দোষ দেখিয়ে দিতে হবে না। তুমি নিজেই অন্তরের মধ্যে গলিত কুষ্ঠ রাখিয়াছ। নিজেই মৃত্যু ডাকিয়াছ; নিজেই নিজের সর্ব্বনাশ করিয়াছ। কিন্তু যদি তোমার চিত্তের বিশুদ্ধতা থাকে, যদি একমাত্র প্রভু পরমেশ্বরের সেবা করা ভিন্ন, তাঁহার দাসানুদাস হইয়া তাঁহারই আশ্রয় গ্রহণ ভিন্ন অন্য উদ্দেশ্য অন্য অভিসন্ধি না থাকে, তবে তোমার শক্তি সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বর হ'তে, তোমার রক্ষা ঈশ্বরের দিক হইতে। সকল বিশুদ্ধচিত্ত ব্যক্তির রক্ষা তাঁহার নিকট হইতে। "আমার রক্ষা প্রভু পরমেশ্বর হইতে, কারণ আমার মধ্যে অন্য অভিসন্ধি কিছুই নাই।"

এই আশ্রমে ঈশ্বরের শক্তির প্রকাশ দেখিতে হইলে কি প্রয়োজন? রোজই তো মেঘ হইতেছে; কিন্তু সকল সময় কি তাড়িতের শক্তি প্রকাশ পাইতেছে? মেঘের বিশেষ অবস্থা হইলেই তাড়িত শক্তির প্রকাশ হয়। আশ্রম করিলেই কি হইল? দশ জন লোক একত্র থাকিলেই কি হইল? দশ জনে একত্র বসিলেই কি হয়? বিশুদ্ধতা, বিশুদ্ধতা, বিশুদ্ধতা, হৃদয়ের বিশুদ্ধতা চাই। বিশুদ্ধতা যদি থাকে, একজন ব'স, দুজন ব'স, দেখিবে ব্রহ্মশক্তি অবতীর্ণ হয় কি না! He Saveth the upright in heart. তিনি বিশুদ্ধ অন্তঃকরণ ব্যক্তিদিগের উদ্ধার করিবেন। অতএব আমরা যেন তাঁর করুণায় এমন অবস্থা পাই, যাহাতে হৃদয়ে হাত দিয়া বলিতে পারি, "My defence is of God, which saveth the upright in heart, প্রভু পরমেশ্বর ভিন্ন আমার অন্য কোন উদ্দেশ্য নাই, অতএব ঈশ্বরের নিকট হইতে আমার রক্ষা।"

ব্রাহ্ম সাধনাশ্রম

বা

BRAHMO WORKER'S SHELTER

সংক্রান্ত নিয়মাবলী।

১। আশ্রম-স্থাপনের উদ্দেশ্য—যাঁহারা বিষয়কর্ম্মে নির্লিপ্ত থাকিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মসাধন, ব্রাহ্মধর্ম্মপ্রচার এবং ব্রাহ্মসমাজ ও জনসাধারণের সেবাতে সমুদয় দেহ মন নিয়োগ করিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের একত্র বাস, একত্র সাধন ও একত্র কর্ম্ম করিবার ব্যবস্থা করিয়া একটী ঘনাবিষ্ট ব্রাহ্ম সাধকদল গঠন করা ইহার প্রথম উদ্দেশ্য। তদ্ভিন্ন ব্রাহ্মধর্ম্ম সাধনার্থী ও সেবার্থী সকল শ্রেণীর নরনারীর সাধনের ও সম্মিলনের একটী ক্ষেত্র প্রস্তুত করা ও রক্ষা করা ইহার দ্বিতীয় উদ্দেশ্য।

২। ব্রাহ্মধর্ম্ম-সাধন—জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম্মযোগে একমাত্র নিরাকার সত্যস্বরূপ, মঙ্গলস্বরূপ, পবিত্রস্বরূপ পরমেশ্বরের সহিত যুক্ত হওয়া এবং তাঁহার ইচ্ছার বশবর্ত্তী হইয়া জগতের প্রতি প্রীতিতে ও জগতের কল্যাণসাধনে দেহ মনকে নিয়োগ করাই ব্রাহ্মধর্ম্মসাধন। এই আশ্রমের অবলম্বিত সাধনপ্রণালীতে পূর্ব্বোক্ত মহদুদ্দেশ্য সর্ব্বদাই লক্ষ্য স্থানে রাখা হইবে। এখানে সর্ব্ব দেশের ও সকল কালের ঈশ্বরপরায়ণ জ্ঞানী, ভক্ত, ও কর্ম্মী সাধুগণের প্রতি এবং সকল সম্প্রদায়ের ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রতি সমুচিত শ্রদ্ধা প্রদর্শিত হইবে এবং জ্ঞান, ভক্তি ও সদনুষ্ঠানের প্রতি দৃষ্টি রাখা হইবে।

৩। সাধন-প্রণালী—এখানে আরাধনা, ধ্যান, প্রার্থনা, শাস্ত্রপাঠ, সদালোচনা ও সদনুষ্ঠান প্রভৃতি স্বাভাবিক ও আধ্যাত্মিক উপায়ে ধর্ম্মসাধন করা হইবে।

৪। আশ্রমবাসীদিগের ও ব্রাহ্মধর্ম্ম সাধনার্থী অন্যান্য ব্যক্তিগণের ধর্ম্মসাধনের সাহায্যার্থ এখানে প্রতিদিন প্রাতে সমবেত ব্রহ্মোপাসনা হইবে। বিশেষ বিঘ্ন না ঘটিলে আশ্রমস্থ ব্যক্তিগণ উপাসনায় যোগ দিতে বিরত হইবেন না।

৫। আশ্রমের ওয়ার্কারদিগের কার্য্য—ব্রাহ্মগণের ধর্ম্মসাধনের সহায়তা করা, ব্রাহ্ম-পরিবার সকল পরিদর্শন করা, ব্রাহ্মধর্ম্মপ্রতিপাদক পুস্তক পুস্তিকা লেখা, মুদ্রিত করা, ও বিক্রয় করা, ব্রাহ্ম বালক বালিকাদিগের শিক্ষা বিষয়ে সহায়তা করা, ব্রাহ্মগৃহস্থের ও ছাত্রদিগের কেহ পীড়িত ও সাহায্য-প্রার্থী হইলে তাহার ব্যবস্থা করা, নানা স্থানে ও নানা উপায়ে ব্রাহ্মধর্ম্মপ্রচার করা, তদ্ভিন্ন সর্ব্বপ্রকার জনহিতকর কার্য্যে যথাসাধ্য সাহায্য করা ইত্যাদি ওয়ার্কারদিগের কার্য্য।

৬। এই আশ্রমের ওয়ার্কারগণ ব্রাহ্মধর্ম্মসাধন, ব্রাহ্ম-ধর্ম্মপ্রচার ও ব্রাহ্মসমাজের সেবার জন্য সকল প্রকার কার্য্য করিতে ও সকল প্রকার ক্লেশ বহন করিতে প্রস্তুত থাকিবেন। এখানে বৈরাগ্যের জন্য বৈরাগ্য শিক্ষা দেওয়া বা অভ্যাস করা হইবে না এবং যিনি যে প্রকার কার্য্যের উপযুক্ত সেই প্রকার কাজে তাঁহাকে নিযুক্ত করিবার দিকে দৃষ্টি রাখা হইবে; কিন্তু ওয়ার্কারদিগের মনের ভাব এইরূপ হওয়া আবশ্যক যে, ঈশ্বরের জন্য ও ব্রাহ্মসমাজের জন্য ছাড়িতে পারি না এমন সুখ নাই বা করিতে পারি না এমন হীনকাজ নাই, এমন কি তাঁহারা সকল প্রকার স্বার্থনাশকে পরম সুখের ও গৌরবের বিষয় মনে করিবেন।

৭। শ্রমশীলতা—এই আশ্রমের ওয়ার্কারগণ শ্রমশীল ও কর্ত্তব্যপরায়ণ জীবনের আদর্শ প্রদর্শন করিবেন। এই আশ্রম অপরের শ্রমোপার্জ্জিত ও দয়াপ্রদত্ত সাহায্যে প্রতি-পালিত হইবে। সুতরাং ওয়ার্কারগণ বিনা পরিশ্রমে সেই অন্ন গ্রহণ করা পাপ মনে করিবেন।

৮। বাধ্যতা—ওয়ার্কারগণ যেমন একদিকে ঈশ্বরের হস্তে সম্পূর্ণরূপে আপনাদিগকে অর্পণ করিবেন, তেমনি অপর দিকে সাধন ও কার্য্য-প্রণালী সম্বন্ধে আশ্রমের কর্ত্তৃপক্ষের পরামর্শের অধীন থাকিয়া কার্য্য করিবেন।

৯। সহায়—যাঁহারা অনন্যকর্ম্মা হইয়া উক্ত উদ্দেশ্যত্রয়-সাধনে দেহ মন নিয়োগ করিতে প্রস্তুত নহেন, বিষয়-কর্ম্ম করিতেছেন বা করিতে ইচ্ছা আছে, অথচ যথাসাধ্য ব্রাহ্মধর্ম্ম সাধন ব্রাহ্মধর্ম্মপ্রচার ও ব্রাহ্মসমাজের সেবা করিতে ইচ্ছুক তাঁহারা ওয়ার্কারদিগের সহায় বলিয়া গণ্য হইবেন। তাঁহারা ওয়ার্কারদিগের সহিত মিলিত হইয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম-সাধন, ব্রাহ্মধর্ম্ম-প্রচার ও ব্রাহ্মসমাজের সেবা করিবেন।

১০। ওয়ার্কারগণ আপনাদের ভরণ পোষণের জন্য সর্ব্বান্তঃকরণে ঈশ্বরের উপরে নির্ভর করিবেন। স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া যিনি যে কিছু সাহায্য করেন, তাহা ঈশ্বরের দান বলিয়া গ্রহণ করিবেন। তদ্ভিন্ন ব্রাহ্মধর্ম্মসাধন, ব্রাহ্মধর্ম্মপ্রচার ও ব্রাহ্মসমাজের সেবার ব্যাঘাত না করিয়া আশ্রমের ব্যয়ের সাহায্যের উদ্দেশ্যে ও আশ্রমের কর্ত্তৃপক্ষের পরামর্শানুসারে যাহাতে কিছু উপার্জ্জন করিতে পারেন, তাহার চেষ্টা করিবেন। অভাবপক্ষে ভিক্ষা করিবেন, কিন্তু কখনই আশ্রমের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ ঋণ করিবেন না এবং এক কার্য্যের জন্য যাহা দেওয়া হয় তাহা অপর কার্য্যে ব্যয় করিবেন না।

১১। ওয়ার্কারদিগের মধ্যে যাঁহারা অবিবাহিত তাঁহারা অবিবাহিত থাকিতে পারিলেই ভাল। কিন্তু বিবাহ নিষিদ্ধ নহে। তবে বিবাহ করিতে হইলে, ওয়ার্কার বা ওয়ার্কারভাবাপন্ন পুরুষ বা নারীকেই বিবাহ করা প্রার্থনীয়।

১২। মফঃস্বলের কোনও ব্রাহ্মবন্ধু আশ্রমে অতিথি-রূপে উপস্থিত হইলে, তিনি দুইবেলা এখানে থাকিতে ও আহার করিতে পাইবেন। তৎপরে অন্য কোনও স্থানে তাঁহার থাকিবার বন্দোবস্ত করিতে হইবে। কিন্তু সমাগত বন্ধু যদি ব্রাহ্মধর্ম-সাধনার্থী হন, তাহা হইলে তিনি নিজ ব্যয়ে এখানে অবস্থিতি করিতে পারিবেন। কিন্তু অবস্থিতি কালে তাঁহাকে আশ্রমের নির্দ্দিষ্ট কাজ করিতে হইবে।

১৩। যে কেহ এই আশ্রমের ওয়ার্কার বা সহায় শ্রেণীভুক্ত হইতে ইচ্ছা করিবেন, তিনি তত্ত্বাবধারকের নিকট স্বীয় নাম ঠিকানা ও অভিপ্রায় জানাইবেন; জানাইলে যে স্থলে যেরূপ ব্যবস্থা উচিত বোধ হয়, করা যাইবে। যখন কাহাকেও ওয়ার্কার বা সহায়রূপে গ্রহণ করা স্থির হইবে, তখন তদর্থ বিশেষ উপাসনার জন্য উপাসনার দিন স্থির করিয়া তাঁহাকে উক্ত বিশেষ উপাসনাতে উপস্থিত হইবার জন্য নিমন্ত্রণ করা হইবে। উক্ত বিশেষ উপাসনাক্ষেত্রে পবিত্রস্বরূপ ঈশ্বরের সন্নিধানে তাঁহাকে ওয়ার্কার বা সহায় বলিয়া গ্রহণ করা হইবে। তৎপরে তিনি যদি ওয়ার্কার হন, তবে শ্রমে ও সাধনে প্রচারে ও সেবাতে, সুখে ও দুঃখে আয়ে ও ব্যয়ে অপর ওয়ার্কারদিগের সহিত একীভূত হইয়া যাইবেন এবং যদি সহায় হন, তবে অপর সহায়দিগের সহিত ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা ও কার্য্যসূত্রে আবদ্ধ হইবেন। যিনি ওয়ার্কার বা সহায়শ্রেণীভুক্ত হইবার অভিপ্রায় করিবেন, তিনি সে অভিপ্রায় তত্ত্বাবধায়কের গোচর করিবার পূর্ব্বে, বিশেষ প্রার্থনা ও আত্মপরীক্ষাতে কয়েকদিন যাপন করিবেন ও ঈশ্বরের আহ্বানধ্বনি শুনিতে প্রয়াসী হইবেন। যিনি সেই আহ্বানধ্বনি শুনিয়া অগ্রসর হইবেন, তিনিই দাঁড়াইতে পারিবেন, অপরের পক্ষে তাহা দুষ্কর।

১৪। যতদিন কোনও ভাবী ওয়ার্কারের আবেদন আশ্রমের কর্ত্তৃপক্ষের বিচারাধীন থাকিবে, ততদিন তাঁহাকে আশ্রমের উপাসনায় ও কার্য্যে বিশেষভাবে যোগ দিতে হইবে।

ব্রাহ্ম সাধনাশ্রম
২১০।৬ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট
কলিকাতা।

শ্রীশিবনাথ শাস্ত্রী
তত্ত্বাবধায়ক।

প্রেরিত পত্র।

(পত্র প্রেরকদিগের মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন।)

মান্যবর

শ্রীযুক্ত তত্ত্বকৌমুদী সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

বিনীত নিবেদন,

(১) সংসারে থাকিয়া ধর্ম্মসাধন আমাদের ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রধান উদ্দেশ্য; এবং বিবাহই গৃহস্থাশ্রমের প্রথম পদবিক্ষেপ।

সুতরাং বিবাহ বিষয়ে দুএকটী মনের কথা বলিতে ইচ্ছা করিয়াছি। আশা এই, এ সম্বন্ধে ব্রাহ্মগণের অভিপ্রায়, আপনার পত্রিকাতে বিবৃত হইয়া, সম্ভব হইলে, এ গুরুতর বিষয়ে, সকলের বিশ্বাসের একতা সম্পাদিত হয়। আমার ধারণার স্থূল মর্ম্মমাত্রই নিম্নে প্রদত্ত হইল। এবং প্রয়োজন মতে, সাবকাশে ও বিনীতভাবে আরও বলিবার ইচ্ছা রহিল।

(২) মানুষের আত্মা এক। তাহা কেবল সেই একমেবাদ্বিতীয়মে সমর্পিত হইলে, আত্মার শুদ্ধাচার। একাধিককে যদি সে স্পর্শ করে, তবে সে অশুচি হইল। এই জন্যই, এক সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্ ব্যতীত, কোন ব্যক্তি, সৃষ্ট বস্তু, বা গ্রন্থবিশেষের পূজা, বা তাহার প্রতি অযথা সম্মাননা, ব্রাহ্মধর্ম্মের বিরুদ্ধ ভাব বলিয়া বিশ্বাস করি।

(৩) আত্মার পক্ষে স্পর্শনীয় প্রভু যেমন এক, শরীরের পক্ষেও ঠিক্ সেইরূপ বলিয়া প্রতীতি জন্মিয়াছে। সুতরাং নরনারীর শরীর একাধিককে অবলম্বন করিলে, পবিত্র ধর্ম্মের উচ্চ আদর্শের চক্ষে, তাহা পবিত্রতাচ্যুত হইল বলিয়া ধারণা হইয়াছে।

(৪) ভূমণ্ডলের বিভিন্ন ধর্ম্মশাস্ত্রে এবিষয়ের স্পষ্টরূপ কোন বিধান আছে কিনা, অনভিজ্ঞতা নিবন্ধন তাহা নিশ্চয়রূপে বলিতে পারি না। কিন্তু বিবিধ জাতির আচার ব্যবহারের প্রতি লক্ষ্য করিয়া দেখিতে পাই, এক-স্ত্রী-এক-স্বামীর বন্দোবস্তই ধর্ম্ম জীবনের পক্ষে সঙ্গত।

(৫) এদেশের আর্য্যগণমধ্যে এই ভাব কতক পরিমাণে বিকশিত হইয়াছিল। সক্ষমের স্বার্থ-প্রাবল্যহেতু, পুরুষ একাধিকবার পত্নী গ্রহণ করিলেন বটে, কিন্তু জনসমাজের শ্রেষ্ঠতর অর্দ্ধাংশকে "সাচ্চা" রাখিবার চেষ্টা তাঁহাদেরই। এবং এ কথা নিঃশঙ্কচিত্তে বলা যাইতে পারে যে, কতক পরিমাণে তাঁহারা কৃতকার্য্যও হইয়াছিলেন। প্রাচীন কালের স্ব-ইচ্ছাচালিত, নৃশংস কিন্তু মহান্ সতীদাহের কথা ছাড়িয়া দিলেও এমন সহস্র সহস্র সাধ্বী পতিপ্রাণা হিন্দুবিধবা এখনও আছেন, যাঁহারা ধ্যানেও এক ভিন্ন দ্বিতীয় পুরুষে জানেন নাই।

(৬) আমরা সেই হিন্দুগণের পরবর্ত্তী। পবিত্রতার পথে পূর্ব্ব পিতামহগণ যতদূর অগ্রসর হইতে পারিয়াছিলেন, তাহার পর হইতে, আরও অধিকদূর অগ্রসর হওয়া, আমাদেরই পক্ষে সঙ্গত। স্ত্রীজাতিকে, অন্ততঃ শারীরিক পবিত্রতার পথে, স্থির রাখিবার উদ্যম তাঁহাদেরই। অপর অর্দ্ধাংশকে সেই অবস্থায় লইবার চেষ্টা পরবর্ত্তী আমাদিগেরই করণীয়। তবে বাল্য-বিধবা ও বাল্য-বিপত্নীকের কথা স্বতন্ত্র।

(৭) রামায়ণ মহাভারত প্রভৃতির ঐতিহাসিক মূল্য অস্বীকার করিলেও, সে সকলের বর্ণনা মধ্যে তৎকালীন আচার ব্যবহারের এই ভাব দেখা যায়। বহুপত্নীক দশরথের দৃষ্টান্ত সত্ত্বেও, তাঁহারই পুত্র রাম অলঙ্ঘ্য অনুরোধ ও অশেষ ক্লেশ অগ্রাহ্য করিয়া, কোন মতেই দ্বিতীয় পত্নী গ্রহণ করেন নাই।

(৮) বাইবেল্ গ্রন্থেও এবিষয়ে পরম রমণীয় কবিত্বপূর্ণ সঙ্কেত রহিয়াছে। পুরুষ একাকী যখন সেই মঙ্গলময়ের শুভপালনী ইচ্ছা পূর্ণ করিল না, তখন তাহারই এক অস্থি দ্বারা নারীর সৃষ্টি হইল।

(৯) বহুপত্নীক মুসলমানেরাও প্রথম বিবাহকে "সাদী", এই পবিত্র নাম প্রদান করেন। পরবর্ত্তী পত্নীগ্রহণ "নেকা", এই অশ্রেষ্ঠ নামে পরিচিত হইল। এখনও নেকা-পত্নী কোন শুভ অনুষ্ঠানের শ্রেষ্ঠ কাজে হস্তক্ষেপ করিতে পারে না।

(১০) বৈষ্ণব-ধর্ম্মের প্রারম্ভে এই পবিত্রতার প্রতি প্রবর্ত্তকগণের তীব্র দৃষ্টি ছিল। যখন পরবর্ত্তীদের দলপুষ্টির বাসনা বলবতী হইল, তখনই সেই পবিত্রতার চ্যুতি হইল।

(১১) ধর্ম্মসম্প্রদায়ের কথা দূরে থাকুক, যে কোম্ত-শিষ্যগণ স্রষ্টার অস্তিত্ব, পরকাল, ও আত্মার অমরত্ব স্বীকার করেন না, তাঁহাদেরও বিশ্বাস জীবনে একবারের অধিক বিবাহ নরনারীর পক্ষে পবিত্রতাচ্যুতি।

(১২) তবে এ কথা অবশ্যই স্বীকার্য্য যে, অচঞ্চলচিত্তে এ নীতি-পালন রক্তমাংসের পক্ষে অতীব দুঃসাধ্য। কিন্তু ধর্ম্মোদ্দেশে, লোভ মোহ প্রভৃতি রিপুগণের কোন্টী বশীকরণই বা সুসাধ্য? নিতান্ত দুঃসাধ্য বলিয়া, সে আত্মসংযম কি ধর্ম্মজীবন গঠনপক্ষে অবশ্য প্রয়োজনীয় বলিয়া স্বীকার করি না? ইতি

কলিকাতা। ৫ই আষাঢ় ১৩০০ সন

অবনত
শ্রীকেদারনাথ রায়।

ব্রাহ্মসমাজ।

শোক সংবাদ—আজ আমরা একটী গভীর শোকের সংবাদ ব্রাহ্মবন্ধুগণকে প্রদান করিতেছি। ব্রহ্মভক্ত বাবু পুণ্যদাপ্রসাদ সরকার আর ইহ জগতে নাই। গত ৬ই আষাঢ় তৃতীয় প্রহরের সময় বর্দ্ধমানে সেই বিশ্বাসী ভ্রাতা মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছেন। গত তিন বৎসর হইতে তিনি ক্ষয়কাশ রোগে ভুগিতেছিলেন। রোগমুক্ত হওয়ার জন্য বায়ু পরিবর্ত্তন, দেশী এবং ডাক্তারী চিকিৎসা ইত্যাদি সর্ব্বপ্রকার উপায় অবলম্বিত হইয়াছিল, ব্রাহ্মবন্ধুগণের পক্ষে চিকিৎসাদির বিশেষ কোন ত্রুটি হয় নাই; কিন্তু কিছুতেই কাল-রোগ হইতে তিনি আরোগ্য লাভ করিতে পারিলেন না।

শ্রদ্ধেয় ভ্রাতা পুণ্যদাপ্রসাদের জলন্ত-বিশ্বাস, কর্ত্তব্যজ্ঞান, এবং সেবাময় জীবন আদর্শ স্থানীয়। তাঁহার জীবনে ব্রাহ্মধর্ম্মের আদর্শ—জ্ঞান, ভক্তি, কর্ম্মের সামঞ্জস্য হইয়াছিল। তিনি এক দিকে যেমন ঔষধের শিশি এবং পথ্য লইয়া রোগীর দ্বারে দ্বারে ঘুরিতেন, তেমনি কবাট বন্ধ করিয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধ্যানে নিমগ্ন থাকিতেন। ঘোরতর ব্যারামের অবস্থাতেও তাঁহার মুখ বিষণ্ণ দেখা যায় নাই, কেহ তাঁহার কাতরোক্তি শোনে নাই। সর্ব্বদা প্রফুল্ল ও শান্ত মূর্ত্তি। তিনি যাঁহার বাড়ীতে দুদিন বাস করিয়াছেন, যাঁহার সহিত দুদিন মিশিয়াছেন,

তিনিই তাঁহার দেবভাবে আকৃষ্ট হইয়াছেন, এবং শতমুখে তাঁহার চরিত্র ও ভগবদ্ভক্তির প্রশংসা করিয়াছেন।

কেহ কখনও তাঁহার মুখে নিরাশার কথা শোনেন নাই। ঈশ্বরকে দেখা যায় না, পাওয়া যায় না, ইত্যাদি কথা বলিলে তিনি দুঃখিত ও বিরক্ত হইতেন। তিনি কোন বন্ধুর নিকট স্পষ্ট বলিয়াছেন "আমি নিয়তই মাকে দেখিতে পাই, মার কথা শুনি, মার সহিত আমার যোগ হইয়া গিয়াছে।" ব্যারামের সময়ও তিনি দ্বার বন্ধ করিয়া অনেকক্ষণ ধ্যান করিতেন।

ধার্ম্মিক লোকের ভার স্বয়ং পরমেশ্বর গ্রহণ করিয়া থাকেন। ভক্ত পুণ্যদার জীবনে আমরা একথার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দেখিতে পাই। আশাতীতরূপে তাঁহার চিকিৎসার জন্য শত শত টাকা নানা স্থানের ব্রাহ্মদিগের নিকট হইতে আসিয়াছে। সকলেই আগ্রহের সহিত তাঁহাকে অর্থ সাহায্য করিয়াছেন এবং তাঁহাকে সাহায্য করিয়া সকলেই নিজকে কৃতার্থ মনে করিয়াছেন।

তিনি উচ্চ অঙ্গের লেখা পড়া শিক্ষা করেন নাই; কিন্তু আধ্যাত্মিক গভীর জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। সংগীত বিদ্যায় তাঁহার অধিকার ছিল না, স্বাভাবিক স্বর ও তত মিষ্ট ছিল না, তান লয় ঠিক করিয়াও গাহিতে পারিতেন না; কিন্তু তিনি যখন ভাবে গদগদ হইয়া গান করিতেন, তখন বড়ই মধুর লাগিত, তেমন গান গাহিতে অনেকেই পারেন না। তিনি অনুরুদ্ধ হইয়া সমবেত উপাসনায় কখন কখন আচার্য্যের কার্য্য করিতেন; তাঁহার উপাসনায় উপাসকমণ্ডলীর প্রাণে এক নবভাবের সঞ্চার হইত।

জগতে পুণ্যদাপ্রসাদের শত্রু নাই। গ্রামের যে সকল লোক এক সময় ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতি বিদ্বেষ-বুদ্ধি-প্রণোদিত হইয়া পুণ্যদার সহিত বিশেষভাবে বিবাদে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, পরিশেষে তাঁহারা পুণ্যদার চরিত্রের নিকট নত হইয়াছিলেন। যাঁহারা সাধু ভক্ত শত্রুগণও মন্ত্রমুগ্ধ সর্পের ন্যায় তাঁহাদের নিকট অবনত হইয়া থাকে। পুণ্যদার জীবন ইহার সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছে।

বাস্তবিক যেদিক দিয়াই দেখা যায়, সকল বিষয়েই পুণ্যদার জীবন পূর্ণতার দিকে অধিকতর অগ্রসর হইয়াছিল। সেই উচ্চ শিক্ষাবিহীন, দরিদ্র, পল্লিগ্রামবাসী উৎপীড়িত, আমাদের দীনভ্রাতা স্বর্গে গমন করিয়াছেন, আমরা তাঁহার সেই পবিত্র স্নেহব্যঞ্জক মূর্ত্তি আর দেখিতে পাইব না; কিন্তু তিনি যে আদর্শজীবন রাখিয়া গিয়াছেন, ব্রাহ্মসমাজের যুবক-যুবতীগণ যেন তদনুসরণ করেন। বিশ্বাস, বৈরাগ্য সেবা তাঁহার জীবনের মূলমন্ত্র ছিল। এই মূলমন্ত্রসাধনে তিনি সক্ষম হইয়াছিলেন। পরমেশ্বর এই সাধন-পথে ব্রাহ্মসমাজকে দিন দিন অগ্রসর করুন।

ব্রাহ্ম-সাধনাশ্রম—অতি দূরস্থানবাসিনী একজন ব্রাহ্মমহিলা বাড়ীতে কয়েকটী বালকবালিকাকে পড়াইয়া মাসিক চারি টাকা উপার্জ্জন করিয়া থাকেন। তিনি সেই টাকা মাসে মাসে শেল্টারে প্রেরণ করিবেন বলিয়া, সংকল্প করিয়াছেন। ইতিমধ্যে প্রথম মাসের টাকা প্রেরণ করিয়াছেন। তাঁহার এই শুভ উদ্দেশ্যের জন্য আমরা তাঁহাকে বার বার ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। সম্প্রতি কোন ব্রাহ্মবন্ধু শেল্টারবাসিদিগের জন্য প্রায় ৯৲ টাকা মূল্যের আম্র কাঁটাল প্রভৃতি ফল প্রেরণ করিয়াছেন। এরূপ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া, অনেকে শেল্টারের সাহায্য করিতেছেন। নানা কারণে দাতাদিগের নাম প্রকাশিত হয় না। প্রভু পরমেশ্বর আশ্চর্য্য উপায়ে শেল্টারকে রক্ষা করিতেছেন। গত জানুয়ারী মাস হইতে এই পর্য্যন্ত, এই পাঁচ মাসে শেল্টারে ১১৮৮৷৵৫ ব্যয় হইয়াছে। পরমেশ্বরের চরণতলে প্রণত হইয়া আমরা আমাদের সাহায্য-দাতাদিগকে বারম্বার ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

জন্মদিন—কলিকাতার বাবু গোপালচন্দ্র মল্লিক তাঁহার পুত্র ও কন্যার জন্মদিন উপলক্ষে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে ২৲ টাকা দান করিয়াছেন এবং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটের কুষ্ঠাশ্রমের প্রায় ১৫০ জন কুষ্ঠরোগগ্রস্ত ব্যক্তিকে পরিতোষপূর্ব্বক ভোজন করাইয়াছেন। আমরা গোপালবাবুকে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

ব্রাহ্ম-সমিতি—বরাহনগরের বাবু শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় একটী ব্রাহ্ম-সমিতি গঠন করিতে সংকল্প করিয়াছেন। আপাততঃ মাসে একবার সমিতির অধিবেশন হইবে। তাহাতে মনোনীত কতিপয় ব্রাহ্ম নিমন্ত্রিত হইবেন। তথায় উপাসনা, আলোচনা এবং প্রীতিভোজন হইবে। এই সমিতির ব্যয়ের জন্য শশিপদ বাবু সম্প্রতি ১০০৲ টাকা দান করিয়াছেন এবং সমিতি স্থাপন উপলক্ষে সাঃ ব্রাঃ সমাজে ৫৲ ও সাধনাশ্রমে ৫৲ টাকা দান করিয়াছেন। শশিপদ বাবুর এই সাধুসংকল্পের জন্য ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

উৎসব—গত ২৪শে ও ২৫শে জুন ভবানীপুর ব্রাহ্মসমাজের উৎসব হইয়াছে। ২৪শে জুন শনিবার রাত্রে শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী আচার্য্যের কার্য্য করেন, তৎপরদিন প্রাতে শ্রীযুক্ত নবদ্বীপচন্দ্র দাস আচার্য্যের কার্য্য করেন। অপরাহ্নে বাবু হরিমোহন গোস্বামি কথকতা করেন। তৎপর বাবু যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ বক্তৃতা করেন, এবং রাত্রে বাবু কেদারনাথ রায় উপাসনা করেন। কলিকাতা হইতে যাঁহারা নিমন্ত্রিত হইয়া উৎসবে গিয়াছিলেন, ভবানীপুরের ব্রাহ্মবন্ধুগণ তাঁহাদিগকে যথোচিত আদর অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন।

বাগেরহাট হইতে বাবু হরিনাথ দাস লিখিয়াছেন।

"পরমেশ্বরের কৃপায় নিম্নলিখিত প্রণালীতে বাগেরহাট ব্রাহ্মসমাজের উৎসবের কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে। উৎসব উপলক্ষে বরিশাল হইতে বাবু মনোমোহন চক্রবর্ত্তী এবং উৎসবের শেষভাগে কলিকাতা হইতে বাবু দেবীপ্রসন্ন রায় চৌধুরী আগমন করিয়াছিলেন।

১৮ই জ্যৈষ্ঠ বুধবার অপরাহ্ন ৭ ঘটিকার সময়ে উপাসনালয়ে উৎসবের উদ্বোধন সূচক উপাসনা হয়। বাবু হরিনাথ দাস আচার্য্যের কার্য্য করেন। স্থানীয় মুন্সেফ বাবু সিতিকণ্ঠ মল্লিক "উৎসবের জন্য বিশেষ ভাবে প্রস্তুত হওয়া" সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করেন।

১৯শে জ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতিবার প্রাতে বাবু মনোমোহন চক্রবর্ত্তী আচার্য্যের কার্য্য করেন। "এই উৎসবে বাহিরের আড়ম্বর ও উচ্ছ্বাসের প্রতিদৃষ্ট না করিয়া, আত্মাতে বিশ্বাস; সত্যনিষ্ঠা প্রেম ও পবিত্রতা লাভ হইতেছে কি না সেই দিকেই দৃষ্টি রাখিতে হইবে" এই মর্ম্মে উপদেশ প্রদান করেন। অপরাহ্ন ৪ ঘটিকার পরে কীর্ত্তন ও প্রার্থনা হয়। সন্ধ্যার পরে বাবু সিতিকণ্ঠ মল্লিক মহাশয় আচার্য্যের কার্য্য করেন। এবং পিরোজপুরের বাবু আশুতোষ মিত্র মহাশয় বিশেষভাবে প্রার্থনা করেন।

২০শে জ্যৈষ্ঠ শুক্রবার প্রাতে বাবু মনোমোহন চক্রবর্ত্তী আচার্য্যের কার্য্য করেন এবং গীতার একটী শ্লোক অবলম্বন করিয়া উপদেশ দেন।

অপরাহ্ন ৫ ঘটিকার পরে উপাসনালয় হইতে নগরকীর্ত্তন বাহির হইয়া সন্ধ্যার পরে উপাসনালয়ে সমাগত হয়। অদ্যকার কীর্ত্তনে ভগবানের বিশেষ করুণা প্রকাশ পাইয়াছিল। কীর্ত্তনের পরে বাবু মনোমোহন চক্রবর্ত্তী "ধর্ম্ম ছেড়ে শান্তি কোথায়?" এই বিষয়ে সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা করেন।

২১শে জ্যৈষ্ঠ শনিবার বাবু নবীনচন্দ্র সিংহ আচার্য্যের কার্য্য করেন। অপরাহ্নে সংকীর্ত্তন ও প্রার্থনা হয়। সন্ধ্যার সময় বাবু দেবীপ্রসন্ন রায় চৌধুরী দেশের বর্ত্তমান ধর্ম্মের অবস্থা এবং আমাদের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা করেন।"

খাসিয়া মিশন—খাসিয়া মিশন সম্বন্ধে হাইকোর্টের জজ মাননীয় চন্দ্রমাধব ঘোষ মহাশয় নিম্নলিখিত মত প্রকাশ করিয়াছেন;—

"গত অক্টোবর মাসে যখন আমি শিলঙ্গে ছিলাম, সেই সময়ে খাসিয়াজাতির কল্যাণের জন্য বাবু নীলমণি চক্রবর্ত্তীর তত্ত্বাবধানাধীনে প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মপ্রচার-আশ্রম দর্শন করিতে যাই। তথায় যাহা দেখিয়াছিলাম, তাহাতে বড়ই আনন্দিত হইয়াছি। দেখিলাম তথায় খাসিয়া ভাষায় লিখিত ধর্ম্মোপদেশপূর্ণ কয়েক খানি পুস্তক এবং বাঙ্গালা সুরে খাসিয়া ভাষায় রচিত ধর্ম্মসঙ্গীতপুস্তক রহিয়াছে এবং খাসিয়া ভাষায় উপাসনাদি হইতেছে। এই মিশন অতি সাধু কার্য্য করিতেছেন। শুনিলাম সম্প্রতি চেরাপুঞ্জীতে একটী শাখাআশ্রম খোলা হইয়াছে। আমি এই মিশনের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি কামনা করি।"

আসাম গবর্ণমেণ্ট খাসিয়া মিশন সম্বন্ধে গত সেন্‌সস্ রিপোর্টে নিম্নলিখিত মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন;—

"খাসিয়া জাতির মধ্যে একটী ক্ষুদ্র ব্রাহ্মমিশন কার্য্য করিতেছে, যাহা বেশ কৃতকার্য্য হইতেছে বলিয়া শুনা যায়।"

নামকরণ—গত ১৩ই জ্যৈষ্ঠ শিলঙ্গের বাবু ব্রজেন্দ্রনাথ সেনের সপ্তম সন্তান ও তৃতীয় পুত্রের শুভ নামকরণ ব্রাহ্মধর্ম্মপদ্ধতি অনুসারে সম্পন্ন হইয়াছে। তদুপলক্ষে বাবু নীলমণি চক্রবর্ত্তী আচার্য্যের কার্য্য করেন। বালকের নাম সুধীন্দ্রকুমার রাখা হইয়াছে।

দান—আসামের অন্তর্গত নওগাঁয়ের বাবু রামদুর্লভ মজুমদার তাঁহার মাতার আদ্যশ্রাদ্ধ উপলক্ষে খাসিয়া মিশনে ৫৲ টাকা দান করিয়াছেন। আমরা দাতাকে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

ব্রাহ্মসম্মিলনী—আগামী রবিবার ২রা জুলাই শ্রীযুক্ত বাবু রাজকৃষ্ণ কর মহাশয়ের উল্টাডিঙ্গিস্থ উদ্যান-ভবনে সম্মিলনীর মাসিক অধিবেশন হইবে। প্রাতে ৮ ঘটিকার সময় উপাসনা হইবে। সম্মিলনীর সভ্যগণের উপস্থিতি একান্ত প্রার্থনীয়।

বিজ্ঞাপন।

আগামী ১৪ই জুলাই অপরাহ্ন ৬½ ঘটিকার সময় ১৩নং মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীটস্থ সিটিকলেজভবনে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অধ্যক্ষ সভার দ্বিতীয় ত্রৈমাসিক অধিবেশন হইবে।

বিবেচ্যবিষয়।

১। কার্য্যনির্ব্বাহক সভার দ্বিতীয় ত্রৈমাসিক কার্য্যবিবরণ ও আয় ব্যয়ের হিসাব।

২। বাবু বাণীকান্ত রায় চৌধুরী প্রস্তাব করিবেন;—

(ক) সমাজের বর্ত্তমান নিয়ম সকল বিচারিত ও সংশোধিত হইয়া গৃহীত হইবার বন্দোবস্ত করা হউক।

(খ) সমাজের ৪০ নিয়মের ২য়, ৩য়, ৪র্থ, প্যারা পরিবর্ত্তিত হউক।

৩। বিবিধ।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ কার্য্যালয়
২১১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট
কলিকাতা ১৫ই জুন ১৮৯৩

শ্রীগুরুচরণ মহলানবিশ
সম্পাদক।

২১১নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, ব্রাহ্ম মিশন প্রেসে শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দত্ত কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

ধর্ম্ম ও সমাজতত্ত্ব বিষয়ক পাক্ষিক পত্রিকা।

৭ম সংখ্যা। ১৬শ ভাগ। | ১লা শ্রাবণ, রবিবার, ১৮১৫ শক, ব্রাহ্ম সম্বৎ ৬৪। | বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২॥০ মফস্বলে ৩ প্রতি খণ্ডের মূল্য ৵০

সহিষ্ণু বিশ্বাস।

অপরে দেখাই পথ, নিজে পথহারা;
অপরে সাহস দিই, নিজে ভয়ে সারা;
অপরে দেখিয়া মোরে কোমর বাঁধিছে জোরে
আমি যে অতলে ডুবি না দেখি কিনারা;
আমি যে হারায়ে ফেলি মোর ধ্রুব-তারা।

নির্ভর নির্ভর বলি; যখন হুঙ্কারি
আসে বায়ু, ঘন ঘটা চৌদিক বিস্তারি
ঢাকে যবে ত্রিসংসারে, ডুবে ধরা অন্ধকারে,
কেন গো নির্ভরে প্রাণ বাঁধিতে না পারি?
কেন গো তরাসে কাঁপি, ফেলি অশ্রুবারি?

আলোরি ঈশ্বর কি গো? নন কি আঁধারে?
তবে কেন ভয়-ভীত আমি এ প্রকারে?
বিরস কেন গো প্রাণ? বদন কেন বা ম্লান?
তরাসে হারায়ে পথ নিরাশা-বিকারে
কেন গো একাকী তবে দেখি আপনারে?

জাগিলে বিশ্বাস, দেখি প্রেম আলিঙ্গনে
আলিঙ্গিত এ জীবন, সজনে নির্জ্জনে
এক সত্তা আছে ঘিরে, এক হস্ত আছে শিরে,
একেরি মঙ্গল বিধি অলক্ষ্য যতনে
শত দুর্ব্বলতা মাঝে রাখিছে এ জনে।

কোথা হতে আসে মেঘ ডুবায় বিশ্বাস?
সাহস পলায় কেন? কেন জাগে ত্রাস?
আশঙ্কা দুশ্চিন্তা ভারে ভেঙ্গে পড়ি এ প্রকারে,
শরীরের স্বাস্থ্য টুটে; পরাণে হুতাশ;
অন্তরে পশিলে শূন্য, বাহিরে আকাশ?;

একি দশা! পুনঃ দেখি পেয়ে দুঃসময়
অন্তরে রিপুর দ্বন্দ্ব জাগে গো দুর্জ্জয়,
কঠিন প্রতিজ্ঞা ডোরে, বাঁধিব সে সবে জোরে,
শ্রান্ত দেহ ক্লান্ত মন পরাভূত হয়;
হেরে যাই, ক্ষোভে দুঃখে প্রাণ বিষময়।

বুঝেছি সংগ্রাম বিনা না হয় সাধনা;
আঁধার না পেলে আলো চাহে কোন্ জনা?
যেবা সয় সেই রয়; আসে তার সুসময়;
ওই যে গর্জ্জন, উহা করিছে ঘোষণা
আসিবে কৃপার ধারা, তাহারি সূচনা।

সহিষ্ণু বিশ্বাস তবে চাহি তব দ্বারে,
হউক গর্জ্জন ধরা, ডুবাক আঁধারে,
ও চরণে মতি রাখি, আমি যেন পড়ে থাকি
অন্ধ মার্জ্জারের শিশু থাকে যে প্রকারে,
না দেখি, উদ্দেশে যেন ডাকি গো তোমারে।

সম্পাদকীয় মন্তব্য।

লাভ ও প্রদর্শন—শ্রীমদ্ভাগবতে এরূপ লিখিত আছে যে, মহর্ষি বেদব্যাস লোক-হিতার্থ বিশাল ভারত গ্রন্থ ও অষ্টাদশ পুরাণ রচনা করিয়া, অবশেষে এই চিন্তাতে নিমগ্ন হইলেন—"আমি তো লোকের শান্তি লাভের উপায় বিধানার্থ বহুশাস্ত্র রচনা করিলাম, কিন্তু আমার প্রাণে শান্তি হইল না কেন?" এই বলিয়া তিনি নির্জ্জনে বসিয়া ক্ষোভ করিতেছেন, এমন সময়ে দেবর্ষি নারদ তথায় উপস্থিত হইলেন। ব্যাসকে খিন্ন দেখিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করাতে ব্যাস আনুপূর্ব্বিক সমুদায় কারণ বর্ণন করিলেন। তখন নারদ তাঁহাকে ভক্তিতত্ত্বের অনুসন্ধান করিবার জন্য উপদেশ দিলেন। ব্যাসের মনে যে প্রশ্ন উত্থিত হইয়াছিল, তদনুরূপ প্রশ্ন আমাদের সকলেরই মনে সময়ে সময়ে উত্থিত হওয়া উচিত। মানবের মুক্তির পথ বলিয়া যে পথ নির্দ্দেশ করিতেছি, সে পথ অবলম্বন করিয়া আমরা মুক্তির অমৃত রস আস্বাদন করিতে পারিতেছি কি না? অপরের দুঃখাগ্নি যাহাতে নির্ব্বাণ হয়, তাহার জন্য ব্যগ্র হইয়াছি, কিন্তু আপনার হৃদয়ের দুঃখাগ্নি নির্ব্বাণ হইতেছে কি না? যে ঔষধে অপরের রোগ শান্তি হইবে বলিয়া আশা করিতেছি, তাহাতে নিজের রোগ শান্তির লক্ষণ দেখিতেছি কি না? এরূপ প্রশ্নের দ্বারা বারংবার আত্মপরীক্ষা করার বিশেষ প্রয়োজন। আমাদের

চঞ্চল অসার ও বহির্মুখীন চিত্ত, সর্ব্বদাই দেখাইতে, শুনাইতে ব্যগ্র হয়; লাভ অপেক্ষা প্রদর্শন বিষয়ে অধিক মনোযোগী হয়। কিন্তু এ জগতে যাঁহারা যে কোনও বিষয়ে গভীরতা ও সত্যতা লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের গতি বিপরীত দিকে দৃষ্ট হইয়াছে। তাঁহারা প্রদর্শনকে ভুলিয়া গিয়া লাভের জন্যই ব্যগ্র হইয়াছেন। বিদ্যা বিষয়ে দেখি, তাঁহারাই যথার্থ বিদ্বান হইয়াছেন, যাঁহারা লোকে কি হইলে সন্তুষ্ট হয়, এ প্রশ্ন না করিয়া এ বিষয়টার প্রকৃত-তত্ত্ব কি, এই প্রশ্নের দ্বারাই আপনাদিগকে সর্ব্বদা ব্যস্ত রাখিয়াছেন। চরিত্র সম্বন্ধেও দেখি, যাহাদের দৃষ্টি কেবল মানব-চক্ষুর উপরে, তাহারা সারবান চরিত্র লাভ করিতে পারে না। কিন্তু যাঁহারা মানবচক্ষুকে ভুলিয়া গিয়া ধর্ম্মের জন্য, সাধুতার জন্যই, আত্মশাসন ও আত্মোন্নতি বিধানে মনোযোগী, তাঁহারাই সত্য-ভূমির উপরে স্থাপিত সুদৃঢ় চরিত্র লাভ করিয়া থাকেন। জন-সমাজের, বিশেষতঃ সংবাদপত্রের ক্রীড়া-পুত্তলিকা স্বরূপ সভ্য-সমাজের এ প্রকার অবস্থা দাঁড়াইয়াছে যে, যে যত পরচ্ছন্দানু-বর্ত্তী, বিবেক-বিহীন ও অসার হইবে সেই তত লোকানুগ্রহের অংশী হইবে, আর যে যত সারবান, নিষ্ঠাবান ও বিবেকপরায়ণ হইবে, সেই তত জনসমাজে প্রতিষ্ঠা লাভে অসমর্থ হইবে। বোধ হয় ইহাও বিধাতার মঙ্গল বিধি, প্রকৃত সাধুতার ন্যায় কোমল আধ্যাত্মিক বস্তুকে তিনি অনেক সময়ে লোক চক্ষের অগোচরেই রক্ষা করিয়া থাকেন। সে যাহা হউক লাভ করি-বার প্রবৃত্তি অপেক্ষা প্রদর্শনের প্রবৃত্তিটা কোন বিভাগেই ভাল নহে। ধর্ম্মসাধন বিষয়ে ইহা অতীব নিন্দনীয় ও চরিত্রের অসারতা উৎপাদক। যতবার আমাদের চিত্ত চতুর্দ্দিকে অসার উত্তেজনার মধ্যে পড়িয়া বহির্মুখীন ও প্রদর্শনপ্রিয় হইয়া পড়িবে, ততবারই আমাদিগকে আত্মপরীক্ষা দ্বারা সেই চিত্তকে অন্তর্মুখীন করিয়া লইতে হইবে। সত্য পদার্থ লাভ করিতে পারিলে তাহা প্রদর্শনের জন্য ব্যগ্র হইতে হইবে না, তাহা আপনি আপনাকে প্রচার করিবে। জনসমাজের কোলাহলের মধ্যে ধর্ম্মসাধন করিতে গিয়া আমাদিগকে সর্ব্বদাই সংগ্রাম করিতে হইতেছে; যতবার আমরা সত্যের সন্নিধানে যাইতে চাহিতেছি, ততবারই অসারতাতে আমাদের চিত্তকে যেন বহি-র্মুখীন করিয়া দিতেছে। এই সংগ্রামে ঈশ্বর আমাদের সহায় হউন।

ব্যাধির লক্ষণ—ঈশ্বরের প্রশংসা শুনিতে ভাল লাগে, না নিজের প্রশংসা শুনিতে ভাল লাগে? আত্মচিন্তা ভাল লাগে না পরের চিন্তা ভাল লাগে? নিজের দোষ বলিতে ভাল লাগে, না পরের দোষ বলিতে ভাল লাগে? নিজের সমাজ ভাল লাগে, কি অন্য দলে বসিয়া থাকিতে ইচ্ছা হয়? তুমি ব্রাহ্ম, আপনাকে ব্রাহ্ম বলিয়া পরিচয় দিতে মনে আনন্দ ও উৎসাহ হয়, না লোকে পাছে তোমাকে ব্রাহ্ম বলিয়া জানে এই ভয়ে সর্ব্বদা ত্রাসযুক্ত? তুমি যেখানে যাও সর্ব্বাগ্রে কি ব্রাহ্মদের ও ব্রাহ্মসমাজের অনুসন্ধান করিতে ইচ্ছা হয়, না সে সকল হইতে দূরে থাকিতে ইচ্ছা হয়? তোমার পদের সম্মান রক্ষা করিতে ভাল লাগে, না তোমার ধর্ম্মসমাজের সম্মান বৃদ্ধি করিতে ভাল লাগে? ইত্যাদি প্রশ্নগুলি সম্মুখে রাখিয়া সর্ব্বদাই আত্ম-পরীক্ষা করা ভাল। এখন দেখিতেছি, অনেকে আপনাকে ব্রাহ্ম বলিয়া পরিচয় দিতে লজ্জা বোধ করিতেছেন, তাঁহারা যখন কলিকাতা সহরে বাস করেন, তখন খুব উৎসাহী ব্রাহ্ম থাকেন; কিন্তু বাহিরে গেলে আর ব্রাহ্ম বলিয়া পরিচয় দিতে সাহস হয় না। এ সহরে তিনি ব্রাহ্ম আছেন, আর এক সহরে বদলি হইলেন ত আর ব্রাহ্ম নাই, ইহার কারণ কি? যাঁহারা এরূপ করেন তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহারা বলেন, ব্রাহ্মদের চরিত্র লোক-সমাজে আদরের বস্তু না হইয়া ঘৃণার বস্তু হইয়াছে, তাই তাঁহারা ব্রাহ্ম বলিয়া পরিচয় দিতে লজ্জা বোধ করেন; কেহ কেহ বলেন, আমাদের চরিত্র ব্রাহ্ম চরিত্র নয় আর কি বলিয়া ব্রাহ্ম নামে পরিচয় দিই। কিন্তু প্রশ্ন এই, চিরদিনই ত উক্ত উভয় কারণ বিদ্যমান, তবে পূর্ব্বেই বা কেন তাঁহারা আপনাদিগকে ব্রাহ্ম বলিয়া পরিচয় দিতে এত আগ্রহান্বিত ছিলেন, আর এখনই বা কেন তাহা নাই? এ বিষয়ে চিন্তা করিলে ইহাই মনে হয়, ব্রাহ্মধর্ম্ম যে তাঁহাদের পরিত্রাণের জন্য আসিয়াছে এবং এই ধর্ম্ম গ্রহণ করাই যে গৌরবের বিষয় এ বিশ্বাস তাঁহাদের নাই। ঈশ্বর জীবকে উদ্ধারের জন্য যে এই নূতন ধর্ম্ম প্রেরণ করিয়াছেন, তাহা তাঁহারা বিশ্বাস করিতে পারেন না। এই বিশ্বাসহীনতা হইতেই তাঁহারা আপনাদিগকে ব্রাহ্ম বলিয়া পরিচয় দিতে লজ্জা বোধ করেন। যখন এই মূল ভিত্তি বিশ্বাস টলিল, তখন নামে ব্রাহ্ম থাকিলেও প্রকৃত ব্রাহ্মত্ব থাকে না; তখন পদের চিন্তাই প্রবল হয়, কাজেই ব্রাহ্মসমাজের গৌরব বৃদ্ধি অপেক্ষা নিজের পদ গৌরবই শ্রেষ্ঠ মনে হয়। এই শোচনীয় অবস্থায় নিজের সমাজের কি দলের অনুসন্ধান করা দূরে থাকুক তাহা হইতে পলাইয়া দূরে দূরে থাকিতেই ইচ্ছা হওয়া স্বাভাবিক। তখন নিজের দোষ বলিতে কি দেখিতে আর ইচ্ছা থাকে না, অন্যের দোষ বলিতে ও দেখিতেই ভাল লাগে। তখন আত্মচিন্তা অপেক্ষা পর চিন্তাই ভাল লাগে, অবশেষে মানুষ এমন স্থানে গিয়া দাঁড়ায় যে, ঈশ্বরের প্রশংসা অপেক্ষা নিজের প্রশংসা শুনিতেই মিষ্ট লাগে।

আর যদি অন্য ব্রাহ্মদিগের জীবনের দুর্গতি দেখিয়া ব্রাহ্ম বলিয়া পরিচয় দিতে লজ্জা হইতেছে এরূপ হয়; তাহা হইলেও বক্তব্য এই, তুমি নিজ চরিত্রকে কেন এইরূপ কর না, যাহাতে তোমার গুণে তাহাদেরও গৌরব বৃদ্ধি হয়। খ্রীষ্টান-দিগের মধ্যে কি অপরাধী দুষ্ক্রিয়ান্বিত লোক নাই? তথাপি খ্রীষ্টান নামের এত গৌরব কেন? বহুসংখ্যক খ্রীষ্টীয় পুরুষ ও রমণীর উৎকৃষ্ট চরিত্রের গুণে কি নহে? এস তুমি আমি; ব্যক্তিগত ভাবে ব্রাহ্মধর্ম্মকে জীবনে সাধন করি, মনুষ্যত্বের আদর্শকে জীবনে এরূপভাবে অর্জ্জন করি, যাহাতে আমাদের জীবনে প্রভু পরমেশ্বরের নাম ও তাঁহার সত্য ধর্ম্ম গৌরবান্বিত হইবে। যাহার বুদ্ধি এ পথে না গিয়া অন্য পথে যায়, তাহার ভিতরে ভয়ানক ব্যাধি প্রবেশ করিয়াছে বুঝিতে হইবে।

বিশুদ্ধ জ্ঞানই বিমল ভক্তির ভিত্তি—অনেক সময় দেখা যায়, যাঁহারা ভক্তির প্রয়োজনীয়তা অধিকতররূপে প্রতিপন্ন করিতে ইচ্ছা করেন, এবং লোকে ভক্তি-পথ অধিক পরিমাণে আশ্রয় করে এরূপ ইচ্ছা করেন, তাঁহারা অনেক সময় জ্ঞান বা বিশুদ্ধ মতকে শুষ্ক বালুকারাশি নামে অভিহিত করিয়া থাকেন, এবং ভক্তিকেও ঘোলা জল প্রভৃতি শব্দ দ্বারা বর্ণন করেন। তাঁহাদের উক্তি সকল শুনিলে মনে হয় যেন জ্ঞান বা বিশুদ্ধ মতের সহিত শুষ্কতার একটা অচ্ছেদ্য নিত্য সম্বন্ধ বর্ত্তমান রহিয়াছে। জ্ঞান বা বিশুদ্ধ মতাবলম্বীও যে সরস হইতে পারে; সে পথে চলিলেও যে লোকের পিপাসার শান্তি হইতে পারে; তাঁহাদের উক্তি শ্রবণ করিলে এরূপ বোধ হয় না। পক্ষান্তরে যে ভক্তির আবশ্যকতা তাঁহারা অধিক পরিমাণে সমর্থন ও প্রদর্শন করিতে চাহেন, তাহাকেও ঘোলা জল প্রভৃতি শব্দে অভিহিত করাতে সেই ভক্তিরও যথেষ্ট নিন্দা করা হয়। তাঁহাদের উক্তি দ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে, ভক্তি আর বিশুদ্ধ হইতে পারে না। ভক্তির সহিত ঘোলা কথাটার যেন একটা অচ্ছেদ্য নিত্য সম্বন্ধ বর্ত্তমান আছে। এইরূপ ভক্তি সমর্থনকারী এবং জ্ঞান ও বিশুদ্ধ মতের নিন্দাকারিগণ অজ্ঞাতসারে বিষম অনিষ্টের সূত্রপাত করিয়া থাকেন। তাঁহারা ভাবিয়া দেখেন না যে, তাঁহাদের উক্তি দ্বারা জ্ঞান বা ভক্তির কোন দিকে যাইতেই লোকের প্রবৃত্তি হয় না। বিশুদ্ধ জ্ঞান ও মত যদি শুষ্ক বালুকার সহিত তুলিত হয় এবং ভক্তিও যদি কেবল ঘোলা জলই হয়, তবে এই দুই দিকের কোন দিকেই লোকের যাইবার প্রবৃত্তি হইবে না। শুষ্ক বালুকাতে যে লোকের পিপাসা মিটে না, তাহা কে না জানে? কিন্তু জ্ঞান বা বিশুদ্ধ মত কি নিরবচ্ছিন্ন শুষ্ক বালুকা নামেই অভিহিত হইবার উপযুক্ত? তবে ত জ্ঞান মানবের পক্ষে নিতান্তই অপ্রয়োজনীয় বস্তু। সাধ করিয়া কে কতকগুলি শুষ্ক বালুকা গলাধঃকরণ করিতে প্রবৃত্ত হইবে? জ্ঞানের সহিত শুষ্কতার যে একটা নিত্য ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা আছে, তাহা আমরা বিশ্বাস করি না; বরং ইহাই সত্য যে প্রকৃত জ্ঞানই বিশুদ্ধ সুমিষ্ট ও পুষ্টিকর এবং তাহাই হৃদয়কে সরস, সবল ও উন্নত করে, এবং বিমল জ্ঞানই আত্মাকে চিরশান্তি দিয়া থাকে। অন্যথা লোকে কাল্পনিক ও ক্ষণিক শান্তিপ্রদ একটা অবস্থার সহিত পরিচিত হইতে পারে বটে, এবং যাহাকে ঘোলা জল নামে অভিহিত করা হয়, সেই অবিশুদ্ধ ভক্তি জলের আস্বাদন পাইতে পারে বটে, কিন্তু তাহা কথনই প্রাণের স্বাস্থ্য লাভের উপায় নহে। অস্বাস্থ্যকর পানীয় জল পান করিয়া পিপাসার হাত এড়াইয়া কোন মতে প্রাণকে সান্ত্বনা দিবার প্রবৃত্তি যাহাদের আছে, তাহারা কথনই দূরদর্শী বুদ্ধিমান নামে পরিচিত হইবার উপযুক্ত নহেন। উপযুক্ত চিকিৎসক বিকৃত পিপাসান্বিত রোগীকে কথনই তাহার প্রার্থনীয় অবিশুদ্ধ জল প্রদান করেন না। কিন্তু যাহাতে বিশুদ্ধ প্রণালীতে উপযুক্ত ঔষধ সেবনে তাহার পিপাসার নিবৃত্তি হয়, তাহারই ব্যবস্থা করিয়া থাকেন এবং তাহাই কল্যাণকর। স্বাস্থ্যলাভ ও পিপাসার প্রকৃত শান্তি সেই উপায়েই হয়। আপাততঃ শান্তি বা প্রাণের সান্ত্বনা লাভের দিকে ক্ষীণদৃষ্টি অল্প জ্ঞান লোকেরই গতি হইয়া থাকে। পিপাসার সময় তাহারা যে কোন জল পাইবে, তাহাই পান করিবে, এরূপ ভয় দেখাইয়া লাভ কি এবং তাহাতে উৎসাহ দিয়াই বা ফল কি? তাহা ত চিরদিনই হইয়া আসিতেছে। লোকে ত নানা প্রকারে ঘোলা জলই পান করিতেছে। কিন্তু তাহা কি সুবুদ্ধির কাজ হইতেছে? না তাহা দ্বারা পরিণামে স্বাস্থ্য লাভের কোন উপায় হইতেছে, বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির সেরূপ পথ অবলম্বন করা কথনই উচিত নয়, যাহা কেবলই আরামপ্রদ, কিন্তু স্বাস্থ্যকর নয়। যে কোন উপায়ে একমাত্র শান্তি লাভ বা পিপাসার নিবৃত্তিই উদ্দেশ্য হওয়া উচিত নয়। কিন্তু আত্মার প্রকৃত স্বাস্থ্য ও কল্যাণ লাভই জীবনের উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য সাধন করিবার জন্য যদি নিরন্তর শুষ্ক মরুভূমির উপর দিয়াই যাইতে হয় বা শুষ্ক বালুকা রাশি খুঁড়িয়া খুঁড়িয়াই বিশুদ্ধ জল পাইতে হয়, তাহাই কি কর্ত্তব্য নহে? এবিষয়ে চাতকের দৃষ্টান্তই আমাদের অনুকরণীয়। সে পিপাসায় প্রাণ হারাইবে, তথাপি মুখ নিচু করিয়া জলপান করিবে না। নির্ম্মল বৃষ্টিধারাতেই তাহার পরিতৃপ্তি। আমাদের উপদেষ্টাগণের সেই চেষ্টা করাই উচিত যে যাহাতে লোকের সেই বিশুদ্ধ পানীয় জলের অন্বেষণে প্রবৃত্তি হয়; তাহার পরিবর্ত্তে যদি তাঁহারা লোকে ঘোলা জল থাইবে বলিয়া ভয়-প্রদর্শন করেন, তাহাতে কি ফল? লোকে ত ঘোলাজল থাইয়া আসিতেছে এবং অসুস্থও হইতেছে। অসুস্থ হইয়া পিপাসা নিবৃত্তি করিয়া কি লাভ? ইহাই প্রার্থনীয় যে যাহাতে লোকে বিশুদ্ধ জল প্রাপ্ত হয় এবং তাহার জন্য চেষ্টা পরায়ণ হয়, তাহারই জন্য উৎসাহিত করা, পথ প্রদর্শন করা। নতুবা বিশুদ্ধ মতকে নিন্দা করিয়া তাহাকে শুষ্ক বালুকা নামে অভিহিত করিয়া কিছুই লাভ নাই। কোন উদ্দেশ্যই তাহাতে সিদ্ধ হইবে না। তাহাতে না লোকের বিশুদ্ধ মতের দিকে যাইবার জন্য প্রবৃত্তি হইবে, না ভক্তি পথ আশ্রয় করিতে (যাহাকে ঘোলা জল নামে অভিহিত করা হয়) প্রবৃত্তি হইবে। আমাদিগকে ইহাই দেখাইতে হইবে যে বিশুদ্ধ মতের সহিত শুষ্কতার কোন ঘনিষ্ঠ অচ্ছেদ্য সম্পর্ক নাই। এবং ভক্তির সহিত ও আবিলতার কোন নিত্য অচ্ছেদ্য সম্পর্ক নাই। এবং সর্ব্বদা এই ভাবেই লোককে উৎসাহিত করিতে হইবে যে বিশুদ্ধ জ্ঞানের পথেই চলিতে হইবে। তাহাতেই শান্তিপ্রদ বিমল ভক্তি লাভের সম্ভাবনা আছে, অন্যথা আপাততঃ শান্তি পাইলেও রোগের হাত হইতে উদ্ধারের উপায় নাই।

প্রচারক দল বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা—ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের জন্য বিধাতা ভারত-ক্ষেত্রের জমি প্রস্তুত করিতেছেন, এখন প্রচারক চাই। ভারতের চারিদিকে দলে দলে প্রচারক চাহিতেছে। পঞ্জাবের ভ্রাতাগণ তথায় এক ব্রাহ্ম-সাধনাশ্রম প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য আমাদিগকে অনুরোধ করিয়াছেন। এসময় উপযুক্ত বহু প্রচারকের আবশ্যক। প্রচারকের যেরূপ অভাব দেখা যাইতেছে এবং চারিদিক হইতে প্রচারকের জন্য যেরূপ চিটির উপর চিটি আসিতেছে, তাহাতে বোধ হয় অচিরেই প্রভু পরমেশ্বর এক মহাকার্য্য সাধন করিবেন। ব্রাহ্ম ব্রাহ্মিকাগণ

প্রস্তুত হউন। মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথ আপনাদিগকে কি বলিতেছেন, মনোযোগ পূর্ব্বক শ্রবণ করুন;—

"যাঁহারা অদ্যাপি ব্রাহ্মধর্ম্মের আশ্রয় না লইয়াছে, তাহাদিগকে তাঁহার আশ্রয়ে আনিতে সাধ্যানুসারে যত্নবান্ হও; যাহাতে ব্রাহ্মধর্ম্মের সত্য পৃথিবীর এক সীমা হইতে সীমান্তর পর্য্যন্ত প্রচারিত হয়, তাহাতে শরীর মন সমর্পণ কর। কেহ প্রবক্তা হইয়া, চুম্বকাকর্ষী অগ্নিময় বাক্য সকল নিঃশ্বসিত করিয়া সকলের চিত্তকে আকর্ষণ কর, কেহ বা সুনিপুণ গ্রন্থকার হইয়া ব্রাহ্মধর্ম্মের সত্য সকল সকলের মনে মুদ্রিত কর এবং কেহ বা পর্য্যটক পরিব্রাজক হইয়া ঋষিদিগের ন্যায় সামান্য জীবন যাপন করতঃ ঈশ্বরের নিমিত্তে সাংসারিক সুখ বিসর্জ্জন দিয়া, ঘরে ঘরে, দ্বারে দ্বারে, ব্রাহ্মধর্ম্মের জয় পতাকা উড্ডীন কর, ইহার কোমল ভাব সকল সকলের হৃদয়ে রোপিত কর। আমাদের ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের সময় এই আরম্ভ হইয়াছে; এই সময়ে আমরা যেন সকলের সঙ্গে যোগ দিয়া ঈশ্বরের অভিপ্রায় সিদ্ধ করিতে যত্ন করি। আমাদের এই ব্রাহ্মধর্ম্ম পৃথিবীময় ব্যাপ্ত হইবে।"

বহু বৎসর পূর্ব্বে মহর্ষি যে উপদেশ দিয়াছেন, তাহা এখনও সম্পূর্ণভাবে কার্য্যে পরিণত হয় নাই। কার্য্যক্ষেত্র বিশাল বিস্তৃত। বৌদ্ধগণ পুনরাগত হইয়া কার্য্যক্ষেত্র বিস্তৃত করিতেছেন, মুসলমানগণ জাপানে রাজত্ব বিস্তৃত করিতেছেন; ইংলণ্ডের অসভ্য দেশেও শিষ্যদল বৃদ্ধি করিতেছেন; উপধর্ম্মের সেবকগণ ব্যাঘ্র ভল্লুকের মুখে প্রাণ দিতে যাইতেছেন; দুরন্ত বর্ব্বর মানবের হস্তে প্রাণ হারাইতেছেন; আর ব্রাহ্মগণ নিজের দেশেই হীন মালন ক্ষুণ্ণ হইয়া রহিয়াছেন; সত্য ধর্ম্মের আলোক পাইয়াও তাহার জন্য জীবন মন সমর্পণ করিতে সাহসী হইতেছেন না। এ কলঙ্ক কতদিন ব্রাহ্মগণ সহিবেন?

লক্ষণ জানা এবং অবস্থালাভ—এক ব্যক্তি ব্যাকুলতা কাহাকে বলে তাহা জানিবার জন্য জিজ্ঞাসু হইলে, উত্তরদাতা তাহাকে ভাষায় কিছু না বলিয়া তাহার হাত পা ধরিয়া পুকুরের জলে নিক্ষেপ করিলেন। সে জলে পড়িয়া, অতি ব্যস্ততার সহিত উপরে আসিবার জন্য আয়োজন করিতে লাগিল। নানাপ্রকারে তাহার ব্যস্ততা প্রকাশ পাইতে লাগিল, এবং কতক্ষণ পরে উপরে উঠিল। উত্তরদাতা কহিলেন, "ব্যাকুলতার অর্থ এই।" তুমি জল হইতে উপরে আসিবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছ। ইহাই ব্যাকুলতার অবস্থা। তখন সে ব্যাকুলতা জিনিসটা কি অতি সহজেই বুঝিতে পারিল। অনেকে এইরূপ ব্যাকুলতার অবস্থা লাভ করিবার জন্য ব্যগ্র না হইয়া ব্যাকুলতা কাহাকে বলে, তাহার লক্ষণ জানিবার জন্য ব্যগ্র হয়। কিন্তু ব্যাকুলতার লক্ষণ জানাপেক্ষা ব্যাকুল হওয়া যেমন আবশ্যক, তেমনি ঈশ্বর-দর্শন কাহাকে বলে তাহার লক্ষণ জানা অপেক্ষা, ঈশ্বর-দর্শনই প্রয়োজনীয়। কাহারও জীবনে সৌভাগ্যক্রমে যদি ঈশ্বর-দর্শন লাভ হয়, তাহার কি ঈশ্বর-দর্শনের লক্ষণ জানা নাই, বলিয়া ঈশ্বরকে চিনিয়া লইবার অসুবিধা ঘটে? এ কথা কেহই স্বীকার করিবেন না। কারণ ঈশ্বর-দর্শন এমন ব্যাপার তাহা জীবনে ঘটিলে প্রাণ নিজেই তাহা বুঝিতে পারিবে। জ্যামিতির সংজ্ঞা জানা না থাকিলে কোন একটী ক্ষেত্রের নাম কি তাহা হয় ত কেহ না বলিতে পারে, কিন্তু ঈশ্বর-দর্শন কি সেরূপ ব্যাপার? ঈশ্বর-দর্শন ঘটিলে লোকের আর লক্ষণ জানিবার অপেক্ষা থাকে না। যতক্ষণ সেরূপ সন্দেহ থাকে, যতক্ষণ ভাবিয়া চিন্তিয়া মাথা চুলকাইয়া ঈশ্বর দর্শন হইয়াছে কি না, তাহা বুঝিতে হয় বা লক্ষণের সহিত মিলাইয়া লইবার অবস্থা থাকে, ততক্ষণ বুঝিতে হইবে যে, ঈশ্বর-দর্শন লাভ হয় নাই। সমুদ্র গমনার্থী কোন ব্যক্তি ষ্টীমারে আরোহণ করিয়া যদি নিদ্রিত হয় এবং তাহার জাগ্রত হইবার পূর্ব্বেই যদি ষ্টীমার সমুদ্রে উপস্থিত হয়, তবে সে ব্যক্তি জাগ্রত হইয়া কাহারও নিকট প্রশ্ন না করিয়াই বুঝিতে পারে যে ষ্টীমার সমুদ্রে উপস্থিত হইয়াছে। অথবা যে ব্যক্তি কখনও পাহাড় দেখে নাই, সে যদি রেল গাড়ীতে যাইতে যাইতে হঠাৎ কোন পাহাড়ের নিকটবর্ত্তী হয়, তখন কাহারও নিকট হইতে জানিবার পূর্ব্বেই সে বুঝিতে পারে যে যাহা দেখিতেছে তাহা পাহাড়। এইরূপ বিশেষ বিশেষ ঘটনা প্রায়ই ঘটিয়া থাকে, যাহা অতি সহজেই বুঝিতে পারা যায়, কাহারও নিকট জিজ্ঞাসার আবশ্যকতা থাকে না। ঈশ্বর-দর্শনও এরূপ ব্যাপার যে, তাহা বুঝিবার জন্য কাহারও নিকট জানিবার অপেক্ষা করিতে হয় না। ঈশ্বর-দর্শন হইলেই জীবনে পরিবর্ত্তন ঘটিবে। প্রাণে বিশেষ অবস্থা সমাগত হইবে। গঙ্গাস্নান করিলে পাপ যায়, কিন্তু গঙ্গাস্নানের পরেও যদি ভাবিয়া চিন্তিয়া বুঝিতে হয়, যে পাপ গেল কি না, তাহা হইলে গঙ্গাস্নানে পাপ যায় এ কথার যেমন কোন মূল্য থাকে না, অথবা যিশুখ্রীষ্টে বিশ্বাসী হইয়া পরিত্রাণ পাইলাম কি না তাহা ভাবিয়া চিন্তিয়া বুঝিতে হইলে, সেই কথার যেমন কোন মূল্য থাকে না, তেমনি ঈশ্বর-দর্শন হইল কিনা তাহা যদি লক্ষণের সহিত মিলাইয়া বুঝিতে হয়, বা মনে কোনরূপ সন্দেহ থাকে, তাহা হইলেও সেই দর্শনের কোন অর্থ থাকে না। ঈশ্বর-দর্শন চিন্তা করিয়া বুঝিবার বিষয় নহে, কিন্তু তাহা একটী বিশেষ অবস্থা-লাভের ব্যাপার। দর্শন-লাভ হইলে একদিকে যেমন তাহা পরিষ্কাররূপে বুঝা যাইবে, অন্য দিকে সঙ্গে সঙ্গে জীবনে অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিবে। অন্যথা ঈশ্বর-দর্শন হইয়াছে বলিয়া মনে করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিলে প্রবঞ্চিত হইতে হয়। বৃথা আত্মাভিমান ও আত্মবিস্মৃতি আসিয়া প্রাণকে অধিকার করিবার সুবিধা পায়। এরূপ কাল্পনিক বিশ্বাস যাহাদের হয়, তাহাদের প্রকৃত দর্শন-লাভের জন্যও আর আকাঙ্ক্ষা বা চেষ্টা থাকে না। সুতরাং প্রকৃত দর্শন-লাভের জন্যই ব্যস্ত হইতে হইবে; তাহার জন্য দর্শনদাতার মুখাপেক্ষী হইয়া তাঁহার করুণার উপর নির্ভরশীল হইয়াই পড়িয়া থাকিতে হইবে। যখন তিনি অনুগ্রহ করিয়া দর্শন দিবেন, তখন তাহা বুঝিতে আর বেশী সময় লাগিবে না। বেশী উপদেশেরও আবশ্যক হইবে না। প্রাণ নিজেই তাহা অনুভব করিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইবে এবং আপনাকে ধন্য জ্ঞান করিয়া কৃতার্থ হইবে।

সম্পাদকীয় ও প্রাপ্ত প্রবন্ধ।

"ধর্ম্মে শ্রুতিলব্ধ জ্ঞান"।

একজন বাঙ্গালী ভদ্রলোক আগরাতে বাস করিতেন। স্মৃতিশক্তির জন্য তাঁহার বড় প্রশংসা ছিল। বন্ধু বান্ধবে তাঁহাকে শ্রুতিধর বলিতেন। একবার বঙ্গদেশ হইতে তাঁহার কয়েকজন বন্ধু আগরাতে গিয়াছিলেন। তাঁহারা সকলে আগরার তাজমহল নামক সুপ্রসিদ্ধ সমাধিমন্দির দেখিবার জন্য অতিশয় উৎসুক হইলেন। কিন্তু সে সময়ে তাজের জীর্ণ-সংস্কার হইতেছিল। একজন ইংরাজ ইঞ্জিনিয়ার ঐ কার্য্যের ভারপ্রাপ্ত হইয়া সেখানে বাস করিতেছিলেন। আগরাবাসী ভদ্রলোকটী সমাগত বন্ধুগণ সমভিব্যাহারে তাজের দ্বারে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, যে তাজে প্রবেশের হুকুম নাই। ইঞ্জিনিয়ার সাহেব স্বয়ং দ্বারে দণ্ডায়মান। তিনি তাঁহার নিকটস্থ হইয়া সবিনয়ে ভিতরে প্রবেশের অনুমতি প্রার্থনা করিলেন, কারণ বঙ্গদেশীয় বন্ধুগণ আর অধিক দিন অবস্থিতি করিতে পারিবেন না। ইংরাজ কর্ম্মচারী অনুমতি দিলেন না। যখন তাঁহারা ফিরিয়া আসিতে উদ্যত, তখন ইংরাজ কর্ম্মচারী বলিলেন—"বাবু, তোমরা বাঙ্গালা দেশ হইতে আসিয়াছ, দার্জ্জিলিং যাইবার পথের সন্ধান বলিয়া দিতে পার?" আগরাবাসী বন্ধুটী অমনি বলিলেন;—"জানি, দার্জ্জিলিং যাইতে হইলে দুইটী পথ আছে, একটী কারাগোলা দিয়া, একটী সিলিগুড়ি দিয়া। এক এক পথে এতগুলি আড্ডা আছে" ইত্যাদি। এইরূপে কোথায় গরুর গাড়ি মিলে, তাহার ভাড়া কত, কোথায় ঘোড়া পাওয়া যায়, প্রভৃতি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সমুদায় সংবাদ দিতে আরম্ভ করিলেন। তখন ইংরাজ কর্ম্মচারী বলিলেন—বাবু তোমরা ভিতরে এস, আমি বিবরণগুলি লিখিয়া লইব।" এই সুযোগে তাঁহাদের ভিতরে প্রবেশ হইয়া গেল। তাঁহারা যখন তাজ দেখিয়া বিনির্গত হইলেন, তখন নবাগত বন্ধুগণ আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"তুমি ত দার্জ্জিলিঙ্গে কখনও যাও নাই, পথের এত খবর দিলে কিরূপে!" আগরাবাসী বন্ধু বলিলেন—"কয়েক মাস হইল একখানা গাইড্ বুক (Guide book) পড়িয়া ছিলাম, তাহা হইতে ঐসকল বিবরণ সংগ্রহ করিয়াছি।" তাঁহারা সকলে শুনিয়া অবাক্ হইয়া গেলেন।

একজন যেমন কখনও দার্জ্জিলিঙ্গ না দেখিয়াও পথের সমুদায় বিবরণ আনুপূর্ব্বিক বলিয়াছিলেন, সেরূপ ঘটনা সংসারে প্রতিদিন ঘটিতেছে। গ্রন্থকার ও মুদ্রাকরগণ কলিকাতায় বসিয়া সমগ্র জগতের ভূগোল বিবরণ প্রণয়ন করিতেছেন। তাঁহাদের কয়জন পৃথিবীর সে সকল স্থান পরিদর্শন করিয়াছেন? এইরূপে এক ব্যক্তি একখানি রেলওয়ের ম্যাপের সাহায্যে ও কতকগুলি গাইড বুকের সাহায্যে সমুদয় ভারতবর্ষের সকল প্রধান প্রধান নগরের প্রধান প্রধান দ্রষ্টব্য স্থানের বিবরণ ও অপরাপর অবশ্য জ্ঞাতব্য সংবাদ দিতে পারে; অথচ হয়ত সে নিজে হাবড়া হইতে বর্দ্ধমান পর্য্যন্তও কখনও গমন করে নাই।

ধর্ম্মরাজ্যেও দেখি সর্ব্বদা এই ব্যাপার ঘটিতেছে। পদে পদে সকলের অতিশয় পাণ্ডিত্য। রিপু-দমনের উপায় কি জিজ্ঞাসা কর, অমনি সঙ্গত সভায় দশজন সভ্য রিপু-দমনের প্রকার ও প্রণালী নির্দ্দেশ করিবার জন্য অগ্রসর হইবেন। ঈশ্বর-দর্শন কাহাকে বলে প্রশ্ন করিবামাত্র পাঁচজন ঈশ্বর-দর্শনের স্বরূপ নির্ণয় করিতে বসিবেন, গাইড বুকে যাহা পড়িয়াছেন, সাধু সঙ্গে বসিয়া যাহা শুনিয়াছেন, তাহার ব্যাখ্যা করিবেন। গাইড বুক দৃষ্টে—ধর্ম্মের ব্যাখ্যা করা এক কথা, আর ধর্ম্মরাজ্যের পথে নিজে চলিয়া অভিজ্ঞতা দ্বারা জ্ঞানলাভ করা আর এক কথা। কেবল গাইড বুক পড়িয়া দেশের বিবরণ জানিয়া রাখিয়া যেমন মন সন্তুষ্ট হয় না; তেমনি ধর্ম্মতত্ত্ব কেবল শুনিয়া রাখিলেও চিত্ত পরিতুষ্ট হয় না। পৃথিবীর কোনও মহাজনই শ্রুত কথাতে সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন নাই। আমরা কি চিরদিন পরকে রাস্তা দেখাইব, সে রাস্তাতে নিজেরা কি চলিব না? মৃত্যু দিনে মৃত্যু শয্যা শয়ন করিয়া যদি দেখি যে, চিরদিন কেবল গাইড বুক দেখিয়া পরকে পথের সমাচার দিয়াছি, নিজে বর্দ্ধমান পর্য্যন্ত ও যাই নাই, তাহা তাহা হইলে সে মৃত্যু কি ক্ষোভের মৃত্যু হইবে?

আর এক অর্থে শাস্ত্র সকলকে গাইড বুকের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। গাইড বুক প্রথমে যখন প্রণীত হইয়াছিল, তখন এরূপ ব্যক্তিদিগের দ্বারাই প্রণীত হইয়াছিল, যাঁহারা সচক্ষে ঐ সকল স্থান পরিদর্শন করিয়াছিলেন। তাঁহাদের গাইড বুক প্রণয়নের উদ্দেশ্য ও এই ছিল যে, অপরে তাঁহাদের সংকলিত বিবরণ পাঠ করিয়া সেই সকল স্থান দর্শনে ইচ্ছুক হইবে; এবং যাহারা দেখিতে যাইবে তাহারা তাঁহাদের প্রণীত গ্রন্থাবলী হইতে বিশেষ সাহায্য লাভ করিবে। শাস্ত্রকারগণ ও সাধুগণ এই জন্য শাস্ত্র রচনা করিয়াছেন, ও ধর্ম্মের উপদেশ দিয়াছেন যে, তাহা পাঠ ও শ্রবণ করিয়া সাধারণ জনসমাজে ধর্ম্মসাধনের প্রবৃত্তি বর্দ্ধিত হইবে, এবং যাহারা ঐরূপে ধর্ম্ম সাধনে প্রবৃত্ত হইবে, তদ্দ্বারা তাহাদের বিশেষ সাহায্য হইবে। কিন্তু লোকে ঘরে বসিয়া গাইড বুক পড়িয়া অপরকে যেরূপ পথের বিবরণ বলে, আমরা যদি সেই ভাবে শাস্ত্র ও সাধূপদেশের ব্যবহার করি, তাহা হইলে কি তাহার অপব্যবহার করা হয় না?

অথচ এইরূপ অপব্যবহার আমরা প্রতিদিন করিতেছি। পরকে উপদেশ দিবার প্রবৃত্তি এমনি প্রবল যে, আমরা পথ না দেখিয়াও পরকে পথের উপদেশ সর্ব্বদাই করিতেছি। এইরূপ করিয়া করিয়া অবশেষে নিজে দেখিবার প্রবৃত্তি ও আর থাকে না। ধর্ম্ম জীবনের এই বিপদ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য সর্ব্বদা সতর্ক থাকা আবশ্যক।

নির্জ্জনচিন্তা।

(জনৈক মহিলালিখিত।)

যখন মোহ নাশ হয়, তখন বাসনা-কণ্টকের তীক্ষ্ণ আঘাত উপেক্ষা করিয়া তোমার আলয়ের দিকে ছুটিয়া যাই। অমনি কে গো তুমি, আমার আলিঙ্গন কর? জীবনের সে কি মধুময় অবস্থা, হৃদয় অমৃত সাগরে ভাসিতে থাকে। চির বিরহীর শেষ মিলনে কি এত সুখ হয়? সে সুখের বর্ণনা জগতের কোন শাস্ত্রে কি লিখিত আছে? চারিদিক মধুর, কে বলে তুমি নাই? এই যে মধুর আলিঙ্গনে আবদ্ধ করিয়াছ। এ মিলনের জীবন্ত সুখ, জাগ্রত ভাবে পাইয়া কে বলিবে "তুমি নাই?"

তিনি ধন্য, তাঁহার অনুপম সত্য-জ্যোতি সমস্ত মানবের হৃদয়ে ঢালিয়া দিতেছেন। যাহারা আঁধারে পথ হারা হইয়া বিচলিত হইয়াছে, তাহাদিগকে প্রকৃত পথ দেখাইয়া দিতেছেন। যে তাঁহাকে পাইল সে তো অনন্ত আশ্বাস পাইয়াছে; অনন্ত সুখে সুখী হইয়াছে; যে তাঁহাকে পাইল না তাহার কি হইবে? হৃদয়ের মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখি, চির শান্তির আলয় কোথায়, চির প্রেম কোথায় জাগে, চির বসন্ত কোথায় বিরাজ করিতেছে?

অসময়ে সে যে চির জরার আক্রমণে দীপ্তশিরা হইয়াছে, করিবার কত ছিল কিছুই সে করিতে পারিল না; অকাল বার্দ্ধক্য তার উৎসাহ যুক্ত চক্ষু নিষ্প্রভ করিয়া দিতেছে, শত শত মরণ কীট জীবনের গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে প্রবেশ করিতেছে; সে প্রতিপদে বিঘূর্ণিত হইতেছে; তার মলিন হৃদয় ঘন মলিনতার নিবিড় আঁধারে দিন দিন আচ্ছন্ন হইতেছে। কি উদ্দেশ্যে সে অবশ জীবন, পাপভারাক্রান্ত প্রাণ লইয়া এখনও সংসারে রহিয়াছে? এরূপ জীবন কত কাল সে বহন করিবে? কিন্তু বাহ্য পদার্থ বিনষ্ট হইয়াছে তাহাতে ক্ষতি কি? পার্থিব বল দ্বারা কেহ কখন ধর্ম্ম সংগ্রামে বিজয়ী হইতে পারে না; ধর্ম্মের নব জ্যোতিতে হৃদয় গৃহ আলোকিত হউক গভীর আঁধারে প্রকৃত পথ পাইবে, আর কিছু না পার পথের কণ্টকটি দূর করিও প্রভুর প্রিয়কার্য্য হইবে।

মানুষ পাপে পড়িয়া যখন পরমেশ্বরের নিকট যায়, কেমন সভয়ে লজ্জায় ম্লান হইয়া পড়ে, মনে করে যাব না, ফিরিয়া যাই, ডুবেছি ত আরো ডুবি। কিন্তু পাপী যদি দয়াময়ের দয়ার উপর নির্ভর করে, আশার ক্ষীণ রশ্মি লইয়া মলিন প্রাণে তাঁহার সন্নিধানে যায়, তবে কি হয়,—না মরণোন্মুখ ব্যক্তি যেমন কখনও কখনও বেঁচে উঠে, ধীরে ধীরে তার প্রয়াণোন্মুখ প্রাণ ফিরে আসে, ধীরে ধীরে শরীরে বল সঞ্চার হয়, সেইরূপ পাপ মন একটু একটু করিয়া পুণ্যের বল লাভ করিতে থাকে।

করুণাময়ী জননী কি আমাদের সংসারারণ্যে ফেলে দিয়ে অন্তর্হিত হইয়াছেন? তাহা তো নয়। মানবই তাঁহাকে চায় না, তাই সংসার দুঃখের হয়। মানব পাপের গভীর কূপে পড়িয়া হাহাকার করে, অশান্তির অন্ধকারে চিরদিন ডুবিয়া থাকে। মানব যদি একবার পূর্ণ বিশ্বাসভরে জগন্মাতাকে দেখিত, তাহা হইলে শান্তি, আনন্দ, আশাপ্রাপ্ত হইত।

যদি তুমি মনে কর আমি পরের সেবা করিব। শুধু সংকল্প করিলে তো তোমার সেবাকার্য্য ভালরূপ সুসম্পন্ন হইবে না—তুমি প্রভুর সুভৃত্য হইতে পারিবে না। যদি তুমি ঈশ্বরের প্রেমে বিশ্বপ্রেমে আপনাকে নিমজ্জিত করিয়া থাক, সকলে আমার প্রেমময় পিতার সন্তান যদি এ ভাবে জগৎ সংসারকে দেখিতে পার, তবে দেখিবে তোমার উদ্দেশ্য সফল হইবে। কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হইবে, সুন্দর ফল প্রসব করিবে।

প্রকৃত গঙ্গাস্নান তাহাই যাহাতে সেই শুদ্ধ বুদ্ধে অবগাহন করিয়া হৃদয় পুণ্যপ্রবাহে স্নাত হয়, মুখশ্রী ব্রহ্মানন্দ জ্যোতিতে জ্যোতিষ্মান হইয়া যায়। সে গঙ্গাস্নানে কত কোটী কোটী পাপ বিধৌত হইয়া, প্রাণে পুণ্যের সঞ্চার হয়। ব্রহ্ম সহবাস জনিত যে আধ্যাত্মিক গঙ্গাস্নান হয়, তাহার ফল ইহকাল পরকাল, অনন্তকাল পর্য্যন্ত স্থায়ী হয়।

সংসারে থাকিয়া বিবেককে উজ্জ্বল করিতে হইবে। বুদ্ধিকে মার্জ্জিত করিব, রুচিকে উন্নত করিব, পাপকে জয় করিব, অপ্রেমের পরিবর্ত্তে প্রেম আনিব, ক্রোধের ঔষধ ক্ষমা আনিব, অনৈক্যের স্থলে একতা আনিব, অসহিষ্ণুতার পরিবর্ত্তে সহিষ্ণু হইব। এত শিক্ষা যে সংসার আমাদিগকে শিখাইতেছে, সে সংসার পরিত্যাগ করা কি কাহারও উচিত?

পাপী যখন পাপের তীব্র যাতনায় ছট ফট করিতে থাকে, তখন যদি কোন মাহেন্দ্র ক্ষণে সে একবার বিবেক কর্ণ পাতে, তবে তাহার মোহান্ধকার ভেদ হইয়া যায়, জ্ঞাননেত্র প্রস্ফুটিত হয়, সে শুনিতে পায় জগতজননী ডাকিতেছেন, তার সকল পাপভয় দূরীভূত হয়, সকল দুঃখ যন্ত্রণার অবসান হয়। চিরানন্দ চিরপ্রেম তাহার প্রাণের ভূষণ হয়।

পরমেশ্বর এমন একটী গুণ আমাদের মধ্যে দিয়াছেন যে; যদি আমি উচ্চ আশা প্রাণে ধারণ করি, তাহাতে কিছু না কিছু উন্নত হইবই হইব। অতএব নিরাশ না হইয়া যে যতটুকু পারি উচ্চ আশায় উৎফুল্ল হইব। কেন না আত্মা অমর, ক্ষুদ্রতা লইয়া থাকিলে আত্মার অধোগতি হইবে। আত্মা অনন্ত রাজ্যের যাত্রী; উচ্চাকাঙ্ক্ষা তাহার সম্বল সাধুসংকল্পের সহায় ঈশ্বর। সুতরাং তাহার ফল নিশ্চয় ফলিবে।

যদি আমি ধর্ম্মে দৃঢ় হই, তবে আমার ভয় কি? ঐ পাপ আসিতেছে ঐ দুঃখ আসিতেছে ভয় কি? ধর্ম্মবর্ম্মে যদি আত্মা আচ্ছাদিত থাকে তবে পাপ কি করিতে পারে?

এ সংসার কি ভয়ানক স্থান। ঐ পাপানল, ঐ অশান্তির প্রখর বিষ, ঐ শোকের হৃদয়ভেদকারী জ্বালা; অবিশ্বাসের তীব্র গরল, দুঃখের করাল মূর্ত্তি; মৃত্যুর ভয়াবহ ব্যাদান। এই ভয়ানক সংসারে যদি সেই দয়াময় শান্তিময় প্রেমময় দেবতাকে অবলম্বন না করি, তবে আত্মাকে চারিদিকে প্রচণ্ড উত্তাপ হইতে রক্ষা করিব কিরূপে?

কেবল বাসনা ত্যাগ করিলে ধর্ম্মজীবন লাভ করা যায় না। বাসনাকে করতলগত করিয়া যদি জগতের হিতব্রতে নিযুক্ত করা যায়, তবেই প্রকৃত ধর্ম্মজীবন হয়। কেবল বাসনা ত্যাগ করিয়া

জড়পিণ্ডের ন্যায় বসিয়া থাকিলে ধর্ম্ম হয় না। প্রথমে আপনার দুরন্ত হৃদয়কে বশীভূত কর, তবে জগতের কল্যাণ করিতে পারিবে, নিজের মনুষ্যত্ব উদ্দীপ্ত কর তবে সহস্র মানবকে আকৃষ্ট করিতে পারিবে।

মানব স্বাধীন, পশুরা বদ্ধ। পশুদিগের যে নিয়মে বদ্ধ করিয়াছেন, তাহারা সেই নিয়মেই বদ্ধ আছে। কিন্তু মানবের পক্ষে তাহা নয়, মানবকে স্বাধীন করিয়াছেন, ইচ্ছা হয় পাপের দিকে যাও, ইচ্ছা হয় পুণ্যের দিকে ফিরে এস। স্বাধীন ইচ্ছার সঙ্গে যিনি প্রবৃত্তিকে জয় করেন, তাঁরই পুরস্কার ধর্ম্মানন্দ। ধরিয়া বাঁধিয়া যে প্রেম হয় সে তো প্রেম নয়। যিনি আপনা আপনি প্রেম করেন, সেই প্রেমই আসল প্রেম। প্রকৃত প্রেমিক সরল প্রেম চাহেন। মানব স্বাধীন ইচ্ছার সঙ্গে যখন প্রেম দান করেন তখনি তিনি তাহা হাত পাতিয়া গ্রহণ করেন।

যৌবনকালে যেরূপ মনের সমস্ত শক্তি জাগ্রত হয়, তাহাতে যদি ধর্ম্মভাব প্রস্ফুটিত না হয়, তবে সে যৌবন পিশাচত্বে পরিণত হইবে। যৌবনে যেরূপ তেজ ও উৎসাহে ঈশ্বরের প্রিয় কার্য্য সাধন করা যায়, বার্দ্ধক্যের অবসন্নতায় তাহা সম্ভব নহে।

যিনি কর্ত্তব্যবান সহস্ররূপ কর্ত্তব্য মধ্যে তিনি ডুবিয়া থাকেন, কিন্তু ত্রিসন্ধ্যা দৃঢ় নিয়ম করিয়া পিতার নাম করেন—শত কার্য্যের মধ্যে এক একবার ঈশ্বরের কার্য্যে আত্মাকে ডুবাইয়া দেন, তাহাতে কর্ত্তব্যের কর্কশতার মধ্যে কত সরস ভাব উদয় হয়।

বিশ্বাস ভক্তি প্রেম ধ্যান ধারণায় যতই একনিষ্ঠতা বৃদ্ধি হইবে; ততই আশ্চর্য্যরূপ উন্নতি হইবে। দিন দিন আধ্যাত্মিক রাজ্যের অমূল্য রত্ন সকল দ্বারা হৃদয় গৃহ অপূর্ব্ব শোভায় সুশোভিত হইবে। কিন্তু সাধক যদি ইহাতে গর্ব্বিত হয়েন তবে সর্ব্বনাশ। যাঁর ধন তাঁর কাছে ফিরিয়া যায় সাধক যত উচ্চে উঠিয়াছিলেন পতন হইবে, তত নীচে। সেই দেব দেব পরম দেবের কৃপায় আমার আধ্যাত্মিক উন্নতি হইয়াছে এই বিশ্বাসে উৎসাহিত হইয়া যিনি আনন্দ করেন তারই মঙ্গল।

ঐ দেখ বজ্র আসিয়া ভক্তের মস্তক বিদীর্ণ করিয়া গেল; শত শত্রু শাণিত অস্ত্র হৃদয় বিদ্ধ করিল, পৃথিবীতে মস্তক রাখিবার স্থানটুকুও রহিল না, তথাপি কি প্রশান্ত কি গম্ভীর মুখে একই কথা। "তোমার ইচ্ছার জয় হউক।" তাঁহাকে না পাইলে তাঁহার অক্ষয়, অমর, অনন্ত, সুধা শান্তি প্রেম না পাইলে কি সাধক এত নির্ভর নিশ্চিন্ত হইতে পারেন? ধন্য সাধু ভক্তেরা। তাঁহারা ভয়ঙ্কর পরীক্ষানলে বিদগ্ধ হইয়াও প্রত্যক্ষরূপে জগতের সম্মুখে পরমেশ্বরকে দেখাইয়া গিয়াছেন। এবং কালের অক্ষয় পটে চিরদিনই দেখাইবেন।

মনে যদি কুভাব জন্মে, মনেই থাক্, যদি কুভাবের অনুযায়ী কার্য্যকর, তোমার জীবন বিষ উদ্গীরণ করিবে, যতক্ষণ সর্পবিষ উদ্গীরণ করে না, ততক্ষণ তাহা বিষ বটে। কিন্তু অপরের অনিষ্ট করিতে পারে না। যখন বিষ ঢালে তখনই সর্ব্বনাশ হয়।

বাদ্যযন্ত্রে সুনিপুণ বাদক যখন তাহাতে আঘাত করেন; কি সুন্দর স্বরলহরী উঠে—নিতান্ত কর্কশ প্রাণেও সে স্বরলহরীর আঘাত হইতে থাকে; তেমনি এ হৃদয়যন্ত্রে কবে সিদ্ধ বাদকের আবির্ভাব হইবে, যাহার এক আঘাতে হৃদয়স্থিত পুণ্য-প্রেম পবিত্রতার ধ্বনি ধ্বনিত হইয়া বিমুগ্ধ করিবে।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যনির্ব্বাহক সভার ২য় ত্রৈমাসিক কার্য্যবিবরণ।

১৮৯৩।

বিগত তিন মাস নিম্নলিখিত ভাবে কার্য্যনির্ব্বাহক সভা কার্য্য সম্পাদন করিয়াছেন।

এই সময়ে কার্য্যনির্ব্বাহক সভার ১৩টী সাধারণ অধিবেশন হইয়াছিল। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় এবারও এই তিন মাসের মধ্যে দুইটী উৎসব হইয়া গিয়াছে। প্রথমটী বাঙ্গালা বর্ষ শেষ ও নববর্ষ উপলক্ষে দ্বিতীয়টী সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের জন্মোৎসব। প্রথম উৎসব উপলক্ষে ৩০শে চৈত্র তারিখে অপরাহ্নে বাবু কৃষ্ণকুমার মিত্র মহাশয় "ব্রহ্মশক্তির পরাক্রম" বিষয়ে এক বক্তৃতা করেন। পরদিন প্রাতে সমাজমন্দিরে উপাসনা হয়। বাবু সীতানাথ দত্ত মহাশয় আচার্য্যের কার্য্য করেন। রাত্রে বাবু কৃষ্ণকুমার মিত্র মহাশয় আচার্য্যের কার্য্য করেন। ১লা বৈশাখ প্রাতে বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় উপাসনা করেন। অপরাহ্নে বাবু সীতানাথ দত্ত ও নবদ্বীপচন্দ্র দাস মহাশয় হিন্দু ও বৌদ্ধ শাস্ত্র হইতে পাঠ করেন। রাত্রে শ্রীযুক্ত লছমন প্রসাদ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রচারকপদে নিযুক্ত হন। তদুপলক্ষে যে বিশেষ উপাসনা হয় তাহাতে বাবু নবদ্বীপচন্দ্র দাস মহাশয় আচার্য্যের কার্য্য করেন।

দ্বিতীয় উৎসব উপলক্ষে ১লা জ্যৈষ্ঠ রবিবার প্রাতে উপাসনা হয়। তাহাতে বাবু নবদ্বীপচন্দ্র দাস মহাশয় আচার্য্যের কার্য্য করেন। রাত্রে বাবু শশিভূষণ বসু মহাশয় উপাসনার কার্য্য করেন। পরদিন সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের জন্মদিনে প্রাতঃকালে বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় আচার্য্যের কার্য্য করেন। অপরাহ্নে পাঠ ও আলোচনা হয়। রাত্রে উপাসনা হয়, তাহাতে বাবু নগেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় আচার্য্যের কার্য্য করেন।

১ম ত্রৈমাসিক রিপোর্টে অবগত করা হইয়াছিল, যে মফস্বল ব্রাহ্মসমাজের Trust Deed গুলি একত্র করিয়া মুদ্রিত করিবার ব্যবস্থা করা হইতেছে। ইতি মধ্যে অনেকগুলি Trust Deed পাওয়া গিয়াছে এবং তাহার অধিকাংশ ছাপা হইয়া গিয়াছে। আশা করা যায় তাহা শীঘ্র প্রকাশিত হইবে।

প্রচার—বিশেষ আনন্দের বিষয় এই যে বিগত নববর্ষের দিনে আমাদের শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধু শ্রীযুক্ত লছমন প্রসাদ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রচারকপদে অভিষিক্ত হইয়াছেন। তিনি ইতিপূর্ব্বে প্রায় ৮ বৎসর উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিতেছিলেন। বিগত বৎসর তিনি প্রবেশার্থী প্রচারক বলিয়া গৃহীত হইয়াছিলেন। তৎপরে যথাবিহিত ভাবে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রচারক রূপে গৃহীত ও অভিষিক্ত হইয়াছেন।

আমাদের প্রচারকগণ নিম্নলিখিত রূপে গত তিন মাস কার্য্য করিয়াছেন।

বাবু নবদ্বীপচন্দ্র দাস। বিগত মাঘোৎসবের সময় হইতে অনেকদিন পর্য্যন্ত তিনি অসুস্থ ছিলেন। শরীর সুস্থ হইলে কলিকাতাতে কিছুদিন থাকিয়া তৎপরে জলপাইগুড়ি ব্রাহ্মসমাজের উৎসবে যান। সেখানে কয়েকদিন থাকিয়া উপাসনা, উপদেশ, পাঠ, ব্যাখ্যা এবং আলোচনাদি করেন। একদিন রেলওয়ে ষ্টেশনে "কলির ধর্ম্ম" এই বিষয়ে বক্তৃতা করেন, এবং আর একদিন বাজারে "আর ঘুমাইও না" এই বিষয়ে প্রকাশ্য বক্তৃতা করেন।

জলপাইগুড়ি হইতে প্রত্যাগমনের সময় নাটোর এবং দিঘাপাতিয়ায় অবতরণ করেন, নাটোরে সমাজের অর্থ সংগ্রহ সম্বন্ধে কিছু কাজ করেন। দিঘাপাতিয়াতে পারিবারিক উপাসনা করেন এবং একদিন "ধর্ম্মের দুইদিক"এই বিষয়ে বক্তৃতা করেন। তথা হইতে কলিকাতায় প্রত্যাগমন করেন।

বিশেষরূপে আহূত হইয়া হুগলি জেলার অন্তর্গত দোগাছিয়া গ্রামে উৎসব করিতে যান। সেখানে কয়েক দিন থাকিয়া উপাসনা, উপদেশ, পাঠ, ব্যাখ্যা ও আলোচনাদি দ্বারা ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করেন। একদিন "কার্য্য দ্বারাই মানবের পরিচয়" এই বিষয়ে বক্তৃতা করেন। এই সময় ইঁহার নিকটবর্ত্তী ভিন্ন ভিন্ন গ্রামে কীর্ত্তন ও উপাসনাদি দ্বারা ঈশ্বরের নাম প্রচার করেন একদিন রহিমপুর নামক গ্রামে "কিরূপে পরমেশ্বরের কৃপা মানবকে পরিত্রাণ করে" এই বিষয়ে বক্তৃতা করেন।

এ স্থান হইতে একটী ব্রাহ্মবন্ধুর অনুরোধে জাঙ্গিপাড়া কৃষ্ণনগর ও মাধবপুর গ্রামে যান, সেখানে উপাসনাদি হয়, একটী বিশেষ অনুষ্ঠান উপলক্ষে উপাসনা করেন, তথা হইতে বাহিরগড়া গ্রামে যান। এখানে উপাসনাদি করেন। তথা হইতে কলিকাতায় প্রত্যাগমন করেন।

মুর্শিদাবাদ ব্রাহ্মসমাজের সাম্বৎসরিক উৎসব উপলক্ষে তথায় আহূত হইয়া যান, সেখানে কয়েক দিন থাকিয়া উপাসনা উপদেশ ও আলোচনাদি দ্বারা ধর্ম্মপ্রচার করেন, একদিন স্থানীয় টাউনহলে "পরিত্রাণের সঙ্কেত" এই বিষয়ে বক্তৃতা এবং বাজারে "মানব আপনার কার্য্যের ফল আপনিই ভোগ করে" এই বিষয়ে প্রকাশ্য বক্তৃতা করেন। এই সময়ে নশিপুর নামক স্থানে ২ দিন পারিবারিক উপাসনাদি করেন। তথা হইতে কলিকাতা ফিরিবার সময় নলহাটীতে কয়েক দিন থাকিয়া সমাজে ও পরিবারে উপাসনাদি করেন।

একবার বর্দ্ধমানে যান সেখানে পারিবারিক উপাসনাদি করেন। কলিকাতায় থাকার সময় মধ্যে মধ্যে উপাসকমণ্ডলীর সাপ্তাহিক উপাসনাকার্য্য করেন, কয়েকটী পরিবারে উপাসনাদি করেন, সাধনাশ্রমের নির্দ্দিষ্ট কাজ করেন এবং তদ্ব্যতীত দুটী উৎসবে কাজ করেন।

সহরের বাহিরেও মধ্যে মধ্যে কোন কোন স্থানে উপাসনাদি করেন। ভবানীপুর সুবরবন সমাজের উৎসবে এক বেলা উপাসনার কার্য্য করেন। সম্প্রতি নোয়াখালি গমন করিয়াছেন।

বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়—কলিকাতা সাধনাশ্রমে নিম্নলিখিত তিনটী বিষয়ে তিন দিবস বক্তৃতা;—অজ্ঞেয়তাবাদ খণ্ডন। (২) উপাসনার বিরুদ্ধে আপত্তি খণ্ডন। (৪) সাকার ও নিরাকার উপাসনা। এতদ্ভিন্ন, অজ্ঞেয়তাবাদ, ঈশ্বরদর্শন প্রভৃতি বিষয়ে তিন দিবস আলোচনা। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে, সমাজের জন্মোৎসব উপলক্ষে উপাসনা ও উপদেশ এবং একটি অনুষ্ঠানে আচার্য্যের কার্য্য করেন। ছাত্রসমাজের আলোচনায় সভাপতির কার্য্য করেন।

হাজারিবাগ—উৎসব ও অন্য সময়ে সর্ব্বশুদ্ধ পাঁচ দিবস ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনা ও উপদেশ। এক দিবস কোন রমণীর স্থানে সামাজিক উপাসনা। নিম্নলিখিত দুইটী বিষয়ে কেশব হলে দুইটী প্রকাশ্য বক্তৃতা;—(১) সেবাধর্ম্ম। (২) সৃষ্টিকৌশল। এক দিবস ব্রহ্মমন্দিরে নাম কীর্ত্তন বিষয়ে বক্তৃতা।

বংশবাটী—ব্রহ্মমন্দিরে উৎসবের উদ্বোধন। উৎসব উপলক্ষে কোন ভদ্রলোকের বাটীতে স্ত্রীলোক ও সর্ব্বসাধারণের উপযোগী উপাসনা ও উপদেশাদি। এক দিবস ধর্ম্মালোচনা। উৎসব উপলক্ষে গড়বাটীতে প্রকাশ্য বক্তৃতা। বক্তৃতার বিষয়,—'নীতিহীন ধর্ম্ম, ও ধর্ম্মহীন নীতি।'

শিবপুর। (জেলা হুগলি) জমিদার মহাশয়ের বাটীতে বক্তৃতা। (বক্তৃতার পূর্ব্বে ও পরে সংগীত ও কীর্ত্তন) এতদ্ভিন্ন ধর্ম্মবিষয়ে পুস্তক রচনা করিয়াছেন। ব্রাহ্মসমাজের সভ্য এবং অন্যান্য লোকের সহিত ধর্ম্ম ও সামাজিক বিষয়ে আলোচনা করিয়াছেন।

বাবু শশিভূষণ বসু—কলিকাতা—মন্দিরে দুই দিন সাপ্তাহিক উপাসনা ও সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের জন্মদিন উপলক্ষে একদিন আচার্য্যের কার্য্য করেন। কোন কোন পরিবারে উপাসনা করেন। পত্রিকায় ধর্ম্মবিষয়ক প্রবন্ধ লিখিয়াছেন।

বগুড়া—বৎসরের শেষ দিন ও নববর্ষ উপলক্ষে উপাসনা করেন। কোন কোন পরিবারে উপাসনা, উপদেশ প্রদান বগুড়া সমাজের উৎসবোপলক্ষে কয়েক দিন আচার্য্যের কার্য্য করেন। টমসন্ হলে "ব্যক্তিগত ও সামাজিক উন্নতি" সম্বন্ধে একটী বক্তৃতা করেন। স্কুলগৃহে "ছাত্রজীবন কিরূপে গঠিত হয়" সম্বন্ধে ছাত্রদিগের জন্য একটী বক্তৃতা করেন। আধ্যাত্মিক বিদ্যালয়ের উৎসবে "অধ্যাত্ম জীবন কিরূপে গঠিত হয়" সম্বন্ধে একটী বক্তৃতা করেন। এবং সাধারণ লোকের জন্য "ধর্ম্মজীবনের মধুরতা" এবং "চরাচর ব্রহ্মাণ্ডে পরমেশ্বরের আবির্ভাব দর্শন" এই মর্ম্মে একটী বক্তৃতা করেন।

কাকিনীয়া—উৎসব উপলক্ষে কয়েক দিন সমাজে আচার্য্যের কার্য্য করেন। কোন পরিবারে বিশেষ অনুষ্ঠান উপলক্ষে উপাসনা করেন ও উপদেশ প্রদান করেন। ধর্ম্মোন্নতি সম্বন্ধে একটী বক্তৃতা করেন।

দোগাছিয়া—সাধারণ লোকের জন্য "পরমেশ্বরকে জানিলে মানুষ মৃত্যুভয় হইতে মুক্তিলাভ করে" এই মর্ম্মে একটী বক্তৃতা করেন। জাঙ্গিপাড়াকৃষ্ণনগরে কোন পরিবারে ২ দিন উপাসনা করেন ও উপদেশ প্রদান করেন। এবং উক্ত স্থানে সামাজিক উপাসনার দিনে আচার্য্যের কার্য্য করেন। তৎপর শরীর অসুস্থ হওয়ায় এবং ভয়ানক বর্ষার জন্য কিছু দিন হইল কার্য্য করিতে পারেন নাই।

শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী—২৩শে মার্চ্চ তারিখে পঞ্জাব যাত্রা করেন; পথিমধ্যে দেওঘর, বাঁকীপুর, বারাণসী,

ফয়জাবাদ প্রভৃতি স্থানে দুই এক দিন করিয়া থাকিয়া প্রচার করেন। এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহে লক্ষ্ণৌ পৌঁছেন। এখানে দুই দিন দুইজন ব্রাহ্মবন্ধুর গৃহে উপাসনা করেন ও উপদেশ দেন। স্থানীয় রিফাইন হলে একদিন ব্রাহ্মধর্ম্ম বিষয়ে ইংরাজীতে বক্তৃতা করেন এবং Bengali Students, Association এ "যুনৈব ধর্ম্মশীলস্যাৎ" বিষয়ে বাঙ্গলা ভাষায় বক্তৃতা করেন। এখান হইতে গমনকালে হরিদ্বার হইয়া লাহোরে যান।

লাহোর—তিন দিন ব্রহ্মমন্দিরে ইংরাজী বক্তৃতা হয়,—বিষয়—"'Signs of the time." "Regulation of conduct" "Brahmo Samaj, its aim and work" আর এক দিন শিক্ষা সভা হলে "প্রকৃত শিক্ষা" বিষয়ে ইংরাজীতে বক্তৃতা হয়। দুই দিন সৎসঙ্গ সভায় আলোচনা করেন, বিষয়—"ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রমাণ" ও "শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানম্"। দুই দিন স্থানীয় ব্রাহ্মবন্ধুদিগের সহিত ধর্ম্মালোচনা করেন। এক দিন মহিলাদিগের সহিত আলোচনা করেন। মন্দিরে দুই দিন ইংরাজীতে ও দুই দিন হিন্দিতে এবং এক দিন বাঙ্গলাতে উপাসনা করেন ও উপদেশ দেন। দুইজন ব্রাহ্মবন্ধুর গৃহে দুই দিন এবং একটি ছাত্রাবাসে একদিন উপাসনা করেন ও উপদেশ দেন। স্থানীয় কয়েকজন ব্রাহ্মকে লইয়া সাধনাশ্রমের একটি সভায় দল গঠন করেন। একদিন কথকতা সভায় চৈতন্যের জীবন সংক্ষেপে বলেন।

দিল্লী—বাবু হেমচন্দ্র সেন নামক একটি বন্ধুর গৃহে শাস্ত্রীয় বচন উদ্ধৃত করিয়া উপদেশ দেন ও প্রার্থনা করেন।

আগ্রা—একজন ব্রাহ্মবন্ধুর গৃহে ২ দিন উপাসনা করেন, আর একজন স্থানীয় ডাক্তারের বাড়ীতে শাস্ত্রপাঠ, ব্যাখ্যা প্রার্থনাদি করেন। একদিন ভিক্টোরিয়া কলেজ হলে "সার্ব্বজনিক ধর্ম্ম" বিষয়ে ইংরাজীতে বক্তৃতা করেন।

ঝান্সী—তিন জন ভদ্রলোকের গৃহে শাস্ত্র পাঠ ও ব্যাখ্যা প্রার্থনাদি করেন। মারহাট্টা পাঠশালা স্কুল প্রাঙ্গণে একদিন "ভারতের ভবিষ্যৎ ধর্ম্ম" বিষয়ে ইংরাজীতে বক্তৃতা করেন।

ইন্দোর—ব্রহ্মমন্দিরে "Test of universal religion" বিষয়ে ইংরাজীতে বক্তৃতা করেন।

এলাহাবাদ—একদিন একজন ব্রাহ্মের গৃহে উপাসনা করেন। একদিন মন্দিরে সামাজিক উপাসনা করেন ও উপদেশ দেন একদিন কায়স্থ পাঠশালা হলে, ইংরাজী ভাষায় "উদার ধর্ম্ম বিষয়ে বক্তৃতা করেন।

কলিকাতা—অধিকাংশ সময় সাধনাশ্রমের উপাসনা করিয়াছেন। আশ্রমবাসীদিগের শিক্ষা ও কার্য্যের বন্দোবস্ত করিয়াছেন। একদিন সুবার্বন ব্রাহ্মসমাজের উৎসবে আচার্য্যের কার্য্য করেন। এতদ্ভিন্ন তত্ত্বকৌমুদী সম্পাদন করেন এবং মেসেঞ্জার সম্পাদনে সহায়তা করেন ও সপ্তাহে তিন দিন গীতা ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন।

শ্রীযুক্ত লছমনপ্রসাদ—প্রধানতঃ লক্ষ্ণৌ সহরে থাকিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিয়াছেন। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের জন্মোৎসব উপলক্ষে তথায় বিশেষ ভাবে উপাসনা করেন। ইতিমধ্যে প্রায় ৯০০ শত রোগীকে ঔষধ বিতরণ করিয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন তিনি এলাহাবাদ, ফতেপুর, শৈলতাপুর, ব্যারাটিয়া, মাহমাখাপুর, ভাগীপুর, প্রভৃতি স্থানে প্রচার করিয়াছেন।

এতদ্ভিন্ন বাবু কালীপ্রসন্ন বসু, ঢাকা, খানখানাপুর, তিলি, ময়মনসিংহ প্রভৃতি স্থানে ও বাবু নীলমণি চক্রবর্ত্তী খাসিয়া পাহাড়ে থাকিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিয়াছেন।

নিম্নলিখিত স্থান হইতে প্রচারক মহাশয়দিগের নিমন্ত্রণ আসিয়াছিল ;—ব্রহ্মদেশ, দোগাছিয়া, বাগেরহাট, কাকিনিয়া, বগুড়া, হাজারিবাগ, জলপাইগুড়ি, মুর্শিদাবাদ, নোয়াখালি, ও বর্দ্ধমান।

উপাসকমণ্ডলী—এই তিন মাস ইহার কার্য্য নিয়মিত ভাবে চলিয়াছে। গত বৎসর যাঁহারা আচার্য্য ও সহকারী আচার্য্য ছিলেন, তাঁহারাই এবৎসরের জন্য পুনর্নিযুক্ত হইয়াছেন। বাবু সীতানাথ দত্ত, নবদ্বীপচন্দ্র দাস, বাবু শশিভূষণ বসু পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় এই তিন মাস আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছেন। বাবু বঙ্কবিহারী বসু ও বাবু কৈলাসচন্দ্র সেন মহাশয় যথাক্রমে সম্পাদক ও সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত হইয়াছেন। প্রতিদিন সায়ংকালে ও রবিবার প্রাতে মন্দিরে উপাসনা হইয়াছে।

উপাসকমণ্ডলীর আয় ব্যয়ের হিসাব।

আয়		ব্যয়	
দানপ্রাপ্তি	৩৻৫	বেতন হিঃ খরচ	১০৲
চাঁদা আদায়	৫৭	ক্ষুদ্র ব্যয়	১৭৸/১৫
মন্দির মেরামত হিঃ প্রাপ্ত	৫৲	গ্যাসের আলো হিঃ	২১৲
অনুষ্ঠান উপলক্ষে মন্দিরের		মন্দির মেরামত হিঃ	১৬৫।৴১৭॥
আলো হিঃ প্রাপ্তি	৫৲	হাওলাত শোধ	২৫৲
হাওলাত	১০০৲		
		মোট খরচ	২৩০।/১২॥
	১৭০৻৫	হস্তেস্থিত	৩৯৶১২॥
পূর্ব্বস্থিত	১০০॥/০		———
	———		২৭০॥/৫
মোট জমা	২৭০॥/৫		

সঙ্গত-সভা—এইসময় মধ্যে সঙ্গতসভার ১৩টী অধিবেশন হয়, ১১ই এপ্রিল মঙ্গলবার সমাজমন্দিরে বর্ষশেষ উপলক্ষে উপাসনা হওয়ায় সঙ্গতসভার অধিবেশন হইতে পারে নাই। উক্ত ১৩টী অধিবেশনের প্রথম দুই অধিবেশনে কঠোপনিষৎ পাঠ ও ব্যাখ্যা হয়, পরে ১১টী অধিবেশনে নিম্নলিখিত ৪টী বিষয়ে আলোচনা হইয়াছিল :—(১) ব্রাহ্মদের গৃহ কিরূপ হওয়া উচিত ; (২) ধার্ম্মিকের লক্ষণ কি ? (৩) ব্রাহ্মসমাজে পরস্পরের প্রীতি প্রীতির যোগ হইবার উপায় কি ? (৪) আমাদের পরস্পর প্রীতির যোগ হইবার কার্য্যগত উপায়, এই চারিটী বিষয়ের প্রত্যেকটীই ২।৩ দিন করিয়া আলোচিত হয়।

ব্রাহ্মছাত্রীনিবাস—ব্রাহ্ম ছাত্রনিবাসের কার্য্য গত ৩ মাস একপ্রকার চলিয়াছে। ছাত্রীসংখ্যা পূর্ব্বাপেক্ষা কমিয়াছে, এখন ২৭।২৮ জন হইবে। ইহার আর্থিক অবস্থার উন্নতি করা বিশেষ প্রয়োজন। ছাত্রীনিবাসে অন্ততঃ ৪০টী বালিকা আসিলে ইহার কার্য্য সুচারুরূপে চলিতে পারে এরূপ আশা হয়।

আয় ব্যয়ের হিসাব।

আয়		ব্যয়	
চাঁদা আদায়	২৪॥০	খোরাকী, জলখাবার	
ছাত্রীদিগের বেতন	৭২৩৲	ও আলোর ব্যয়	৩৭১৶৴০
বৃত্তি ফিঃ জমা	৪৪॥০	বাড়ীভাড়া	২০৭৲
এককালীন দান	২৲	বৃত্তি ফিঃ খরচ	৫৪॥০
এডমিশন ফীঃ	৫৲	বিবিধ ব্যয়	৭॥৴০
হাওলাত	৯৯৲	ছাত্রীদিগের স্কুলের বেতন	৪৮৲
		কর্ম্মচারীর বেতন	২৬৭।২০
	৮৯৮৲		
পূর্ব্বকার স্থিত	৬২৶৵৫		৯৫৬।১০
		হস্তেস্থিত	৪॥৴১০
	৯৬০৶৵৫		৯৬০৶৵৫

দাতব্য বিভাগ—দাতব্য বিভাগের গত তিন মাসের কার্য্য ভালই চলিয়াছে; ১৫টী ছাত্র, ২টী ছাত্রী, ৫টী পরিবার, ১টী অন্ধ ও একটী কুষ্ঠরোগীকে অর্থ সাহায্য করা হইয়াছে। বিক্রমপুরের অন্তর্গত বজ্রযোগিনী গ্রামে ওলাউঠার অত্যন্ত প্রাদুর্ভাবের সংবাদ পাইয়া, এখান হইতে বাবু কুঞ্জবিহারী গুহকে ওলাউঠার চিকিৎসার উপযোগী এলোপ্যাথিক এবং হোমিওপ্যাথিক ঔষধ সহ তথায় পাঠান হইয়াছিল, তদ্দারা কয়েকটী রোগীর চিকিৎসা হইয়াছিল, ঈশ্বর কৃপায় ওলাউঠার প্রকোপ কমিয়াছে। ব্রাহ্মবন্ধুগণ পারিবারিক অনুষ্ঠান উপলক্ষে এই দাতব্য বিভাগে কিছু কিছু অর্থ সাহায্য করিলে অনেক উপকার হয়। আশানুরূপ অর্থাভাবে অনেক দুঃখীকে সাহায্য দানে বঞ্চিত করিতে হয়।

আয় ব্যয়ের হিসাব।

আয়		ব্যয়	
অনুষ্ঠান উপলক্ষে		মাসিক দান	৬৪॥০
দানপ্রাপ্ত	১১৲	এককালীন দান ও	
এককালীন দানপ্রাপ্তি	৬২৲	বজ্রযোগিনীর ঔষ-	
বার্ষিক দান	১৬৲	ধের মূল্য	৩৯৶৴৫
মাসিক দান	৫৶০		
			১০৪।৴৫
	৯৪৶০	হস্তেস্থিত	২৩৩।১৫
পূর্ব্বকার স্থিত	২৪৩৲		
	৩৩৭৶০		৩৩৭৶০

সাধনাশ্রম—পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী ও বাবু নবদ্বীপচন্দ্র দাস মহাশয়ের কার্য্য বিবরণ প্রচারক মহাশয়দিগের কার্য্য বিবরণের সহিত দেওয়া হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত প্রকাশ দেব—মার্চ্চ মাসের শেষ ভাগে পঞ্জাব যাত্রা করেন। একদিন লক্ষ্ণৌ রিফাইন হলে উর্দ্দূতে বক্তৃতা করেন। ভগবদাশ্রমে হিন্দিতে উপাসনা করেন ও উপদেশ দেন। হরিদ্বার—মিঃ সুন্দর দাস ভাল্লা নামক এক জন বন্ধুর গৃহে একদিন ও পঞ্জাবী আর একটি বন্ধুর গৃহে একদিন হিন্দিতে উপাসনা করেন ও উপদেশ দেন। লাহোর—ব্রহ্ম-মন্দিরে এক দিন উর্দ্দূতে উপাসনা করেন ও উপদেশ দেন। আগ্রার ভিক্টোরিয়া কলেজ হলে এবং ঝাঁন্সিতে উর্দ্দূতে ব্রাহ্মধর্ম্ম বিষয়ে বক্তৃতা করেন। ইন্দোর—তিন দিন মন্দিরে হিন্দিতে উপাসনা করেন ও উপদেশ দেন। এতদ্ভিন্ন পঞ্জাব প্রচার দলের কার্য্যের সাহায্য করেন। কলিকাতা—সাধনাশ্রমে কথনও কথনও উপাসনা করেন। এতদ্ভিন্ন ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় পত্রিকার সম্পাদনের সহায়তা করেন এবং বাঙ্গালা ধর্ম্মগ্রন্থ উর্দ্দূতে অনুবাদ করেন। পঞ্জাববাসী ব্রাহ্মধর্ম্ম অনুরাগী-দিগের সহিত চিটি পত্র লিখিবার ভার তাঁহার প্রতি অর্পিত ছিল। তাহা তিনি সম্পন্ন করিয়াছেন এবং সপ্তাহে তিনদিন হিন্দি শিক্ষা দিয়া থাকেন।

বাবু মহেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়—সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের ধনা-ধ্যক্ষের কার্য্য এবং কার্য্যালয়ের অন্যান্য কার্য্যের সহায়তা করেন ও কয়েকটি ব্রাহ্ম পরিবার পরিদর্শন করেন। সপ্তাহে পাঁচ দিন সমাজমন্দিরে সায়ংকালে উপাসনারকার্য্য করেন। মধ্যে মধ্যে আশ্রমের উপাসনায় আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন প্রতি শনিবার নিমতা ব্রাহ্মসমাজের সাপ্তাহিক উপাসনা করিয়াছেন।

বাবু গুরুদাস চক্রবর্ত্তী—ব্রাহ্মবালক বোর্ডিংএর অধ্যক্ষের কার্য্য করেন, ব্রাহ্মবালিকা স্কুলে শিক্ষকতা করেন। মধ্যে মধ্যে সাধনাশ্রমে উপাসনা করেন। এতদ্ভিন্ন তত্ত্বকৌমুদী সম্পাদনের সহায়তা করিয়াছেন।

বাবু আদিনাথ চট্টোপাধ্যায়—শারীরিক অসুস্থতা বশতঃ জল বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য লাহোরে গমন করেন। সেখানে পঞ্জাব প্রচারযাত্রীগণের সহিত যোগদান করিয়া প্রচারের সাহায্য করেন। একদিন তথাকার ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনা করেন। কলিকাতা প্রত্যাগমন করিয়া বিশেষ ভাবে ব্রাহ্ম মিশন প্রেসের তত্ত্বাবধায়কের কার্য্য করিতেছেন। মধ্যে মধ্যে কোন কোন বাড়ীতে উপাসনা করিয়াছেন। একদিন রবিবার প্রাতে মন্দিরের উপাসনায় এবং একদিন সাধানাশ্রমের উপাসনায় আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন তত্ত্ব-কৌমুদী সম্পাদনের সহায়তা করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত কাশীচন্দ্র ঘোষাল—নিয়মিত রূপে সাধনাশ্রমের কার্য্যাধ্যক্ষতা ও তত্ত্বকৌমুদী সম্পাদনের সহায়তা করিয়াছেন। কখন কখন দাসাশ্রমে গিয়া রোগীদিগকে উপদেশ দিয়াছেন ও সংগীত, প্রার্থনা করিয়াছেন এবং মাণিকতলা সমাজে মধ্যে মধ্যে উপাসনা করিয়াছেন।

এই তিন মাসের মধ্যে সাধনাশ্রমে এক দিন উৎসব হইয়াছে। শাস্ত্রী মহাশয় সপ্তাহে ৩ দিন ভগবদ্গীতা পড়াইতেছেন, নগেন্দ্র বাবু সপ্তাহে দুই দিন তত্ত্ববিদ্যা সম্বন্ধে উপদেশ দিয়া থাকেন।

আয় ব্যয়ের হিসাব।

জমা-		খরচ-	
বাড়ী ভাড়া	৫৪৲	প্রয়োজনীয় জিনিস খরিদ	
পুরাতন কাগজ বিক্রয়	৴০	ও আলো প্রভৃতির ব্যয়	৮৮৶১০

জমা-		খরচ-	
অলঙ্কার বিক্রয়	৩৫॥৶১৫	অতিথি এবং আশ্রম-	
দানপ্রাপ্তি	২৩৬৸৶০	বাসীগণের আহা-	
ভিক্ষাপ্রাপ্তি	২৮॥৶৫	রাদির ব্যয়	৩৩৩৷৵১০
আশ্রমস্থ ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি		দাতব্য	২৲
হইতে প্রাপ্তি	৬৬৷০		
			৪২৩৷৶০
	৪২১৸০	হস্তেস্থিত	৷৵৫
পূর্ব্বস্থিত	২/৫		
			৪২৩৸/৫
	৪২৩৸/৫		

ছাত্রসমাজ—এই তিন মাসের মধ্যে অধিকাংশ সময় বালকদিগের গ্রীষ্মাবকাশ জন্য ইহার কাজ বন্ধ ছিল। ছুটির পর হইতে এখনও কার্য্য আরম্ভ হয় নাই। ছুটীর পূর্ব্বে ৩রা বৈশাখ বাবু হেরম্বচন্দ্র মৈত্র মহাশয় "ধর্ম্মজীবনের দায়িত্ব" বিষয়ে বক্তৃতা করেন এবং ১০ই বৈশাখ তারিখে গ্রীষ্মের ছুটী উপলক্ষে বিদায় সূচক বিশেষ উপাসনা হয়। বাবু নবদ্বীপচন্দ্র দাস আচার্য্যের কার্য্য করেন এবং বাবু কৃষ্ণকুমার মিত্র ও কালীশঙ্কর সুকুল মহাশয় বক্তৃতা করেন।

তত্ত্ব-কৌমুদী ও ইণ্ডিয়ান মেসেঞ্জার—এই তিন মাসে বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই। যথারীতি পত্রিকা প্রকাশিত হইতেছে।

পুস্তক—রাণীনগরের বাবু কেদারনাথ সরকার "জাতিভেদ" নামক একখানি পুস্তক সমাজকে দান করিয়াছেন। বাবু কেদারনাথ রায় কৃত "শ্মশানভস্ম" ২ ভাগ ১ম সংস্করণ। বাবু নবদ্বীপচন্দ্র দাস কৃত "ব্রাহ্মধর্ম্মতত্ত্ব" ২য় সংস্করণ ও পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী কৃত "পুষ্পাঞ্জলি" ও "বক্তৃতাস্তবক" নামক পুস্তক দ্বয়ের স্বত্বাধিকার সমাজ ক্রয় করিয়াছেন।

অনুষ্ঠান—আমরা যতদূর সংবাদ পাইয়াছি, তাহাতে জানিতে পারিয়াছি যে, এই তিন মাসের মধ্যে ৭টী জাতকর্ম্ম ও নামকরণ, ৩টী শ্রাদ্ধ, ২টী বিবাহ ও ২টী দীক্ষা সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে।

সভ্য ও সহযোগী—এই তিন মাসের মধ্যে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের তিন জন সভ্য ও ১৩ জন সহযোগী নিযুক্ত হইয়াছেন।

মৃত্যু—বিশেষ দুঃখের সহিত জ্ঞাপন করিতে হইতেছে, যে আমাদের বড়বেলুনবাসী শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধু বাবু পুণ্যদাপ্রসাদ সরকার মহাশয় ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন। যত দিন শক্তি ছিল তিনি অকাতরে ব্রাহ্মসমাজের জন্য তাঁহার জন্মস্থান বড়বেলুনে ও অন্যান্য স্থানে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের জন্য খাটিয়াছেন। পুণ্যদা বাবু আপন সরল বিশ্বাস ও ভক্তিতে সকলের বিশেষ আদরণীয় ছিলেন। তাঁহার অভাবে, ব্রাহ্মসমাজ এক জন সেবক হারাইলেন। ব্রাহ্মসাধনাশ্রম তাঁহার স্ত্রী ও পুত্রের ভরণ পোষণের বন্দোবস্ত করিতেছেন। আশা করি ব্রাহ্মবন্ধুগণ এ বিষয়ে যথাযোগ্য সহায়তা করিবেন।

(ক্রমশঃ)

ব্রাহ্মসমাজ।

ব্রাহ্মসম্মিলনীর উৎসব—২৫এ জুন উল্টাডিঙ্গীতে বাবু রাজকৃষ্ণ কর মহাশয়ের বাগানে ব্রাহ্মসম্মিলনীর মাসিক উৎসব সম্পন্ন হইয়াছে। এই উৎসবে প্রায় ৫০ জন উপস্থিত হইয়াছিলেন। পূর্ব্বাহ্নে ৮ ঘটিকার সময় উপাসনা হয়, শ্রীযুক্ত বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত আচার্য্যের কার্য্য করেন, তৎপর আলোচনা হয়। শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী আলোচনার বিষয় উত্থাপন করেন, শ্রীযুক্ত বাবু হেরম্বচন্দ্র মৈত্র, কালীশঙ্কর সুকুল, বিপিনচন্দ্র পাল প্রভৃতি অনেকে স্বীয় স্বীয় মন্তব্য প্রকাশ করেন। আলোচনা সময়োপযোগী ও সুফলপ্রদ হইয়াছিল। অপরাহ্নে শ্রীযুক্ত বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় পাঠ ও প্রার্থনা করেন। তৎপর সকলে গৃহে গমন করেন। এবারের উৎসবে সকলেই উপকৃত হইয়াছেন।

সাধনাশ্রমের উৎসব—গত ১লা জুলাই সাধনাশ্রমের মাসিক উৎসব হইয়াছে। প্রাতে ৭ টার সময় পাঠ ও ব্যাখ্যা হয়। তৎপর উপাসনা হয়। শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী উপাসনা করেন। অপরাহ্নে পাঠ ব্যাখ্যা হয়। সন্ধ্যার পর পুনরায় উপাসনা হইয়া উৎসব সমাপ্ত হয়। যখন পরমেশ্বর প্রাণে উপস্থিত হন, তখনই প্রকৃত উৎসব হয়। তিনি কৃপা করুন, ব্রাহ্মগণ প্রকৃত উৎসব সম্ভোগ করিয়া কৃতার্থ হউন।

শিক্ষালয় ও ব্রাহ্মছাত্রীনিবাস—এতদিন ব্রাহ্মবালিকা শিক্ষালয় এবং ব্রাহ্মছাত্রীনিবাস দুইটী স্বতন্ত্র সব কমিটির তত্ত্বাবধানে ছিল। এখন কার্য্যের সুবিধার জন্য কার্য্যনির্ব্বাহক সভা এই দুটিকে একীভূত করিয়া একটী কমিটির কর্তৃত্বাধীন করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী উক্ত কমিটীর সম্পাদক নিযুক্ত হইয়াছেন। নূতন বন্দোবস্তে ছাত্রীনিবাস এবং স্কুলের কার্য্য সুশৃঙ্খলার সহিত সম্পন্ন হইবে বলিয়া অনেকেই আশা করিতেছেন।

প্রচার—শ্রীযুক্ত বাবু নবদ্বীপচন্দ্র দাস নোয়াখালীর বাবু হরকান্ত বসুর পুত্রের নামকরণ উপলক্ষে তথায় গমন করেন। তাঁহার সহিত বরিশাল হইতে বাবু বরদাকান্ত রায়ও গমন করেন। বালকের নাম মোহিনীকান্ত রাখা হইয়াছে। এতদুপলক্ষে হরকান্ত বাবু সাঃ ব্রাঃ সমাজে ১৲, সাধনাশ্রমে ১৲, ঢাকা ব্রাহ্মসমাজে ১৲ এবং নোয়াখালী ব্রাহ্মসমাজে ১৲ টাকা দান করিয়াছেন। নোয়াখালী অবস্থিতি কালে নবদ্বীপ বাবু, হরকান্ত বাবু ও স্থানীয় অন্যান্য বন্ধুগণের বাড়ীতে প্রতিদিন পাঠ ব্যাখ্যা ও উপাসনাদি করিয়াছেন। তৎপর বরিশালে আগমন করিয়া প্রতিদিন এক এক বাড়ীতে উপাসনা করিয়াছেন এবং ছাত্রসমাজে "কাহার নেতৃত্বে চলিব?" এ সম্বন্ধে একদিন বক্তৃতা করিয়াছেন। বাবু ললিতকুমার বসুর দুইটি কন্যার নামকরণ উপলক্ষে, আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছেন। কন্যা দুটির নাম উষাবালা ও নলিনীবালা রাখা হইয়াছে।

বাঁশবাড়িয়ায় উৎসব—বাঁশবাড়িয়া ব্রাহ্মসমাজের বার্ষিক ব্রহ্মোৎসব সম্পন্ন হইয়াছে। এতদুপলক্ষে কলিকাতা হইতে বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় এবং বাবু রেবতীমোহন সেন তথায় গমন করেন। উৎসবে উপাসনা, বক্তৃতাদি হয়। নগেন্দ্র বাবু বক্তৃতা করেন।

সাধন-গৃহ প্রতিষ্ঠা—বরিশাল হইতে বাবু মথুরানাথ দাস লিখিয়াছেন;—"বরিশাল ব্রাহ্মসমাজের প্রচারক শ্রীযুক্ত বাবু কালীমোহন দাস তাঁহার নিজ বাটীতে একখানি সাধন-গৃহ প্রস্তুত করিয়াছেন। বিগত ১১শে বৈশাখ বৃহস্পতিবার সেই গৃহ প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। তদুপলক্ষে উপাসনা, কীর্ত্তন ও প্রীতিভোজন হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত বাবু মনোমোহন চক্রবর্ত্তী প্রাতে, শ্রীযুক্ত বাবু কালীমোহন দাস মধ্যাহ্নে ও শ্রীযুক্ত বাবু ইন্দুভূষণ রায় সন্ধ্যার পরে উপাসনা করিয়াছিলেন।

কালীমোহন বাবু প্রাতে, মধ্যাহ্নে ও রাত্রিতে সর্ব্বদাই এই গৃহে বসিয়া সাধন ভজন করিয়া থাকেন। এইরূপ নির্জ্জন সাধনে দৃঢ়নিষ্ঠা সাধারণের অনুকরণীয়। আমরা ভগবানের নিকটে প্রার্থনা করি যে প্রত্যেক ব্রাহ্মের বাড়ীতে এইরূপ এক একখানি সাধন গৃহ প্রস্তুত হউক।"

খাসিয়া মিশন—পরমেশ্বরের কৃপায় দিন দিন খাসিয়া মিশনের উন্নতি হইতেছে। এক্ষণে খাসিয়া পাহাড়ে পাঁচ স্থানে পাঁচটী ব্রাহ্মসমাজ আছে। তন্মধ্যে চেরাপুঞ্জী প্রচার আশ্রমের সংশ্লিষ্ট সমাজটী নূতন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। প্রতি সপ্তাহে এই সমাজে অনেকগুলি পুরুষ ও রমণী উপস্থিত হইয়া থাকেন। গৃহটী ক্ষুদ্র বলিয়া বড়ই অসুবিধা হইতেছে, উপযুক্ত একটী সমাজমন্দির নির্ম্মিত না হইলে এই অসুবিধা দূর হইবে না। কিন্তু অর্থাভাব বশতঃ এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে পারা যাইতেছে না। আশা করা যায় যে ব্রাহ্মবন্ধুগণের সাহায্যে এই অভাব শীঘ্র দূর হইবে। বর্ষার প্রবলতা বশতঃ মৌসমাই এর ব্রাহ্মসমাজ গৃহ দুই বৎসরের মধ্যেই অতিশয় জীর্ণ হইয়া পড়িয়াছিল। তজ্জন্য বাধ্য হইয়া প্রস্তরের দেওয়াল বিশিষ্ট অপর একটী গৃহ ক্রয় করিতে হইয়াছে। তাহা ক্রয় ও সংস্কার করিতে অনেক টাকা ঋণ করিতে হইয়াছে। যাঁহাদের খাসিয়া মিশনের সঙ্গে সহানুভূতি আছে, তাঁহাদের নিকট হইতে সাহায্য প্রার্থনা করা যাইতেছে। লাইক্যানসেউ-এর সমাজগৃহ পথের ধারে নির্ম্মিত হইয়াছিল। সম্প্রতি গবর্ণমেণ্ট সেই রাস্তা বিস্তৃত করিয়াছেন। তজ্জন্য স্থানান্তরে একটী নূতন সমাজগৃহ প্রস্তুত করিতে হইয়াছে। দুইজন নূতন লোক এই সমাজে যোগ দিয়াছেন। শেলা ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য রীতিমত চলিতেছে। তথা হইতে দুই তিন জন বন্ধু লাইক্যানসেউএর সমাজের কার্য্য চালাইবার জন্য গত তিন মাস নিয়মিতরূপে প্রতি সপ্তাহে আসিয়াছেন। নানা কারণে মৌথার সমাজের অবস্থা ভাল নহে।

কয়েক দিন হইল রুসনসিং নামে একজন খাসিয়া বন্ধু প্রচার কার্য্যে জীবন উৎসর্গ করিবার উদ্দেশে খাসিয়া মিশনে যোগ দান করিয়াছেন। তিনি অতিশয় ব্যাকুল, উৎসাহী এবং কষ্টসহিষ্ণু। ব্রাহ্মধর্ম্মের সত্য স্বজাতীয়দের মধ্যে প্রচার করিবার জন্য তিনি সর্ব্বদা খাটিতেছেন এবং বাঙ্গালাভাষা শিক্ষা করিতে আরম্ভ করিয়াছেন।

আমাদের চেরাপুঞ্জীর চিকিৎসালয়ের দিকে দিন দিন লোকের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইতেছে। প্রত্যহ অনেক পুরুষ ও রমণী এইখানে ঔষধ লইবার জন্য আসিয়া থাকেন। কেহ কেহ ১০।১২ মাইল দূরবর্ত্তী স্থান হইতে আসেন। গত তিন সপ্তাহে দেড় শতের অধিক লোক ঔষধের জন্য আসিয়াছিলেন। এখন হইতে এই চিকিৎসালয়ের জন্য কলিকাতা দাসাশ্রম হইতে ঔষধ পাওয়া যাইবে।

কিছুদিন হইল খাসিয়া ভাষায় ব্রাহ্মধর্ম্ম সম্বন্ধে একখানি পুস্তিকা প্রকাশিত হইয়াছে। কলিকাতার কোনও বন্ধু অনুগ্রহ করিয়া এই পুস্তিকা প্রকাশের সকল ব্যয় ভার বহন করিয়াছেন। খাসিয়াগণ আগ্রহের সহিত ইহা গ্রহণ করিতেছে।

চেরাপুঞ্জীর অন্তর্গত নংরিম নামক গ্রামে একটী গৃহ নির্ম্মিত হইতেছে। তথায় শীঘ্র একটী ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত হইবে। সময়ে সময়ে এই স্থানে ভিন্ন ভিন্ন গৃহে ব্রাহ্মধর্ম্ম সম্বন্ধে বক্তৃতাদি করা হইয়া থাকে। তাহাতে বহুসংখ্যক পুরুষ ও রমণী উপস্থিত হইয়া থাকেন।

চেরাপুঞ্জী প্রচারআশ্রম-নির্ম্মাণ এক প্রকার শেষ হইয়াছে। কিন্তু তাহার টীনের ছাদ করিতে এবং একটী উপযুক্ত সমাজমন্দির নির্ম্মাণ করিতে এবং মৌসমাই ও চেরাপুঞ্জী সমাজগৃহের জন্য যে ঋণ হইয়াছে, তাহা পরিশোধ করিতে অনেক অর্থের আবশ্যক। ব্রাহ্মগণ এবং ব্রাহ্মসমাজের হিতাকাঙ্ক্ষিগণ কি এই শুভকার্য্যের জন্য কিঞ্চিৎ সাহায্য করিবেন না?

কলিকাতা ছাত্রসমাজের উৎসব—গত ২৪এ ও ২৫এ আষাঢ় সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে, ছাত্রসমাজের বার্ষিক উৎসব সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। প্রথম দিন, সন্ধ্যার পর শ্রীযুক্ত বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় "সেবাধর্ম্ম" বিষয়ে বক্তৃতা করিয়াছিলেন। পরদিন প্রাতে শ্রীযুক্ত বাবু কৃষ্ণকুমার মিত্র উপাসনা করিয়াছিলেন, অপরাহ্নে শাস্ত্রপাঠ ও ব্যাখ্যা হইয়াছিল এবং সায়ংকালে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী উপাসনা করিয়াছিলেন ও উপদেশ দিয়াছিলেন।

পত্রপ্রেরকগণের প্রতি—তত্ত্বকৌমুদীতে প্রকাশ করিবার জন্য আমাদের হস্তে অনেকগুলি পত্র আসিয়াছে। তত্ত্বকৌমুদীর কলেবর ক্ষুদ্র। স্বীয় স্বীয় বক্তব্য বিষয় সংক্ষেপে না লিখিলে স্থানের সংকুলন হয় না। যাহা হউক প্রকাশযোগ্য পত্রগুলি ক্রমে ক্রমে মুদ্রিত হইবে। লেখক মহাশয়গণ আমাদিগকে ক্ষমা করিবেন।

২১১নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, ব্রাহ্ম মিশন প্রেসে শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দত্ত কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

ধর্ম্ম ও সমাজতত্ত্ব বিষয়ক পাক্ষিক পত্রিকা।

৮ম সংখ্যা
১৬শ ভাগ।

১৬ই শ্রাবণ, সোমবার, ১৮১৫ শক, ব্রাহ্ম সম্বৎ ৬৪

বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২॥০
মফস্বলে ৩৲
প্রতি খণ্ডের মূল্য ৶০

একতা।

আয় ভাই কাছে কাছে দাঁড়ারে সকলে,
প্রাণে প্রাণে জাগুক শকতি;
বিবাদ বিচ্ছেদে দেখ দিন যায় চলে,
দিনে দিনে বাড়িছে দুর্গতি।

পেয়েছ যে মহামন্ত্র সাধিতে যে কাজ,
সেই মন্ত্র জাগাও হৃদয়ে;
পরিহরি অভিমান, বৃথা ভয় লাজ,
সেই মন্ত্রে যাও এক হয়ে।

দেখাও জগতে, সেই মন্ত্রের সাধনে
পাসরিতে পার হে আপনা;
সর্ব্বস্ব ভেটিতে পার প্রভুর চরণে,
ধন জন সুখের বাসনা।

একতা দৃঢ়তা বিনা কবে সৈন্যদল
রণক্ষেত্রে জিনিছে সংগ্রাম?
একতা দৃঢ়তা বিনা কবে ধর্ম্মবল
জিনিয়াছে এই ধরাধাম।

একতা দৃঢ়তা তবে কর হে সাধনা
ক্ষুদ্র ভাব রাখিয়া পশ্চাতে;
পরিহরি সুখ, স্বার্থ অসার জল্পনা,
সঁপ নিজে ব্রহ্মের কৃপাতে।

সম্পাদকীয় মন্তব্য।

একতা ও দৃঢ়তা—জগতে সর্ব্বত্র দেখিতেছি, একটা বিষয়ের প্রতি যদি দশজনের গাঢ় অনুরাগ জন্মে তাহা হইলে, তাহাদের ব্যক্তিগত বিভিন্নতা সত্ত্বেও তাহারা এক সঙ্গে কাজ করিয়া থাকে। অনেক পল্লীগ্রামে সময়ে সময়ে বারইয়ারি হয়, দশজন সমবয়স্ক বন্ধু একত্র হইয়া স্থির করে যে, সাধারণের নিকট চাঁদা দ্বারা অর্থ সংগ্রহ করিয়া একটা পূজার উৎসব করিবে; কয়েক দিন যাত্রা, গান আমোদ প্রমোদ চলিবে; গ্রামের পুরুষ রমণী বালক বৃদ্ধ সকলেরই একটা কিছু নূতন দেখিবার, শুনিবার, বলিবার, কহিবার বিষয় হইবে; গ্রাম্য জীবনের সমভাবাপন্ন ভাব কয়েক দিনের জন্য একটু তিরোহিত হইবে। দশজন যুবক এইরূপ একটা সংকল্প হৃদয়ে লইয়া দলবদ্ধ হইল। পরস্পরের উৎসাহে পরস্পর উৎসাহিত। কে নেতা কে নীত এ চিন্তাই তাহাদের অন্তরে উদিত হয় না। কিরূপে কার্য্যোদ্ধার করিতে হইবে, এই চিন্তাই সকলের অন্তরে প্রবল দেখিতে পাওয়া যায়। আশ্চর্য্যের বিষয় এই তাহাদের মধ্যে এমন এক অপূর্ব্ব ভাবের আবির্ভাব হয়, যাহাতে তাহারা অকাতরে শ্রম করে, পরস্পরের সাহায্য করে, যে যে প্রকার কার্য্যের উপযুক্ত সে সে প্রকার কার্য্যেই প্রবৃত্ত হয়; কেহ বাঁশ কাটিতেছে, কেহ তাহা বহন করিতেছে, কেহ গৃহ নির্ম্মাতার কার্য্য করিতেছে, কেহ লোক ডাকিতেছে, কেহ মাটি কাটিতেছে। কে উৎকৃষ্ট কার্য্য করিতেছে, কে নিকৃষ্ট কার্য্য করিতেছে, এ গণনাই তাহাদের থাকে না। প্রসন্নচিত্তে শ্রম করে; প্রসন্নচিত্তে পরস্পরের ত্রুটী বহন করে; প্রসন্নচিত্তে একের ভ্রম প্রমাদ অপরে সংশোধন করিয়া লয়। তাহাদের মধ্যে কি মতভেদ উপস্থিত হয় না? কোনও বিষয় লইয়া তর্ক বিতর্ক চলে না? নিশ্চয় এরূপ ঘটনা হয়। কিন্তু তাহাতে তাহাদের প্রেমের বিচ্ছেদ ঘটে না; কার্য্যের ও ব্যাঘাত হয় না। একজন অপর এক ব্যক্তিকে কর্কশ কথা বলিয়াছে, সে ব্যক্তি তৃতীয় ব্যক্তিকে গিয়া বলিল—"দেখ ভাই কাণ্ডটা দেখেছ, আমাকে কি গালাগালিটা দিল। এমন লোকের সঙ্গে কাজ করিতে নাই?" তৃতীয় ব্যক্তি বলিল—"ছেড়ে দেও, ওর মেজাজটা একটু কড়া তা ত জানাই আছে, চল চল কাজটা সারিয়া আসা যাউক।" এই বলিয়া দুই জনে কাজটা সারিতে গেল। জিজ্ঞাসা করি আমরা কি এমনি অধম হইয়াছি, যে একটা বারইয়ারির উৎসাহে মানুষকে যতটা বাঁধিতে পারে, ব্রাহ্মধর্ম্মে ও ব্রাহ্মসমাজের হিতসাধন ব্রতে কি আমাদিগকে ততটাও বাঁধিতে পারে না? ইহাতে কিছু সন্দেহ নাই যে আমরা সকলে যদি ব্রাহ্মধর্ম্মসাধন ব্রাহ্মধর্ম্মপ্রচার ও ব্রাহ্মসমাজের সেবার জন্য অন্ততঃ সেরূপ উৎসাহী ও অনুরাগী হইতাম যেরূপ একটা বারইয়ারির ব্যাপারে মানুষ হইয়া থাকে,

তাহা হইলে আমরা অশেষ প্রকার বিভিন্নতা সত্ত্বেও এক সঙ্গে থাকিয়া কাজ করিতে পারিতাম। আমাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পার্থক্য যে মহৎ বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে, সামান্য একটু সমালোচনা, বা অপমান যে সহ্য করিতে পারিতেছি না, ইহাতেই প্রমাণ, ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যরূপ মহৎ ব্যাপারটা অপেক্ষা আমাদের ক্ষুদ্র সুখ ও স্বার্থের প্রতি অধিক দৃষ্টি। অবশ্য মতগত গুরুতর পার্থক্য নিবন্ধন কোনও কোনও স্থলে একত্র কাজ করা কঠিন হইতে পারে; কিন্তু সেরূপ স্থলেও ব্রাহ্মধর্ম ও ব্রাহ্মসমাজের প্রতি প্রেম প্রবল থাকিলে, সেই পার্থক্য নিবন্ধন হৃদয়ের প্রভেদ ঘটে না। এই জন্যই বলি, মুখে আমরা ব্রাহ্মসমাজ ব্রাহ্মসমাজ বলিয়া যতই চীৎকার করি না কেন, মনে ব্রাহ্মসমাজের প্রতি প্রেম আমাদের অল্পই। কার্য্যে তাহার পরিচয় প্রতিদিন দিতেছি। 'আমরা ব্রাহ্মবন্ধুর কর্কশ কথা শুনিয়া কবে বলিতে পারিব—"আঃ ছেড়ে দেও, মানুষটার মেজাজ কড়া, চল কাজটা সারিয়া আসি?"

আবার যদি মনে করি, একাজটা প্রভু পরমেশ্বরের নির্দ্দিষ্ট কাজ; তিনি ইহার প্রেরক ও ইহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, তাহা হইলে কি লজ্জাই হয়! তাঁহার কাজে হাত দিয়া ও আপনাদের ক্ষুদ্রভাব ভুলিতে পারিতেছি না। তাঁহার প্রতি আমাদের এমনি প্রেম!

কর্ম্মযোগ—আমাদের এ কি দশা হইল, যদি নানা প্রকার কার্য্যে হাত দি, লোকে বলে "এত কাজ কাজ করিলে চলিবে কেন? ধ্যান ধারণাতে বস। কাজ কাজ করিয়া শুকাইয়া মরিও না।" আবার যদি কাজ কর্ম্ম হইতে অবসৃত হইয়া ধ্যান ধারণাতে বসি, লোকে বলে "যা, লোকগুলা কেবল আলস্যে দিন কাটায়।" এ যে সেই ঈশপ কথিত পিতা পুত্রের ঘোড়া বিক্রয়ের ন্যায় হইল, সকলকে সন্তুষ্ট করিতে গিয়া ঘোড়া বিক্রেতা কাহাকেও সন্তুষ্ট করিতে পারিল না। লোকের সন্তোষ সাধনের কথা দূরে থাক, আমাদের নিজের মনেই বোধ হয় একটা সাধনের পথ স্থির হইতেছে না। আমাদেরও মনে যেন এই ভাব প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে যে, ধ্যান ধারণা, ঈশ্বর-প্রীতি ও তাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধনের মধ্যে এক প্রকার বিরোধ আছে। যোগী অথবা প্রেমিক কখনও কর্ম্মী হইতে পারে না, এবং কর্ম্মী কখনও যোগী হইতে পারে না। অথচ একথা সত্য যে ঈশ্বরোদ্দেশে ও তাঁহারই আদেশে যে কার্য্য কৃত হয়, তাহা তপস্যা ও যোগের অঙ্গ স্বরূপ? তদ্দ্বারা প্রবৃত্তি সকলকে নিয়মিত করে, কর্ত্তব্য জ্ঞানকে উজ্জ্বল করে; হৃদয়কে বিশুদ্ধ করে, এবং আত্মাকে পরিপুষ্ট ও সুমিষ্ট করে। কর্ম্ম যখন এই সুমিষ্ট ফল উৎপন্ন না করিয়া তিক্ত ফল উৎপন্ন করিতে থাকে, তখন বুঝিতে হইবে যে, সে কর্ম্মের ভিত্তি ধর্ম্মের ভিত্তি নহে। প্রকৃত ব্রাহ্মসাধকের জীবনে গভীর ধ্যান ধারণা ও অক্লান্ত কার্য্য এই দুইএরই সমাবেশ দৃষ্ট হইয়া থাকে। আমাদিগকে ও এই আদর্শের অনুসরণ করিতে হইবে। ব্রহ্মের প্রীতি কর্ম্মের পোষক ও কর্ম্ম প্রীতির পোষক হইবে।

আত্মচিন্তা—সুখে দুঃখে বিপদে সম্পদে এবং স্তুতি নিন্দায় অবিচলিত থাকাই ধর্ম্ম জীবনের লক্ষণ। নদীর তরঙ্গে ক্ষুদ্র কাষ্ঠ খণ্ডকে উলট পালট করিয়া ভাসাইয়া লইয়া যাইতে পারে, কিন্তু সুদৃঢ় পর্ব্বতের মূল দেশে তরঙ্গকে প্রতিহত হইতে হয়। নিয়তই দেখিতেছি মানুষ সংসার কর্ত্তৃক পরিচালিত হয়। সংসারের ক্ষতি লাভ দ্বারা জীবন নিয়মিত হইয়া থাকে। যিনি সুন্দর গৃহে বাস করিতেছেন, দুবেলা নানাবিধ সুখাদ্য আহার করিতেছেন, যাঁহার অর্থের অভাব নাই এবং জীবনে আত্মীয় বিচ্ছেদ ঘটে নাই; সামাজিক ও রাজনৈতিক সম্মান ও বিলক্ষণ আছে, তিনি পরম সুখী। হঠাৎ ইহার কোনও ব্যতিক্রম ঘটিলে,—যদি টাকাগুলি চুরি যায়, কিম্বা কাহারও মৃত্যু হয় অথবা দেশের লোকে সম্মানের পরিবর্ত্তে অসম্মান করে,—তবে তাঁহার সুখের উৎস শুকাইয়া যায়। চিন্তায় চিন্তায় তাঁহার শরীর ও স্বাস্থ্য বিনাশ প্রাপ্ত হয়। সংসার যাঁহাদের সুখ শান্তি দাতা, তাঁহাদের অবস্থা নিশ্চয়ই এরূপ হইবে। সংসারের ইষ্টানিষ্টে তাঁহাদের মন সুখ দুঃখ ভোগ করিবে। আর এক শ্রেণীর লোক আছেন, তাঁহারা সংসারস্তরের ঊর্দ্ধে উঠিয়াছেন; সংসারের বাতাস তাঁহাদিগকে স্পর্শ করিতে পারে না। যে অবস্থায় সাংসারিক জীব কাঁদিয়া আকুল হয়, তাঁহারা সে অবস্থাতে পতিত হইলেও প্রশান্ত থাকেন। তাঁহারা স্বীয় কর্ত্তব্য কার্য্যে স্থির থাকিয়া সমুদায় প্রশান্ত-চিত্তে বহন করেন। তাঁহাদের দৃষ্টি সেই সত্য ও মঙ্গল স্বরূপ পরমেশ্বরের প্রতি; সংসার তাঁহাদের লক্ষ্য নহে। যেমন খোসা ফেলিয়া দিয়া সুস্বাদু আম্র ভোজন করিতে হয়, খোসা কেহ খায় না, খোসার সহিত কোনও সম্পর্কও নাই, তেমনি এই সংসার আবরণের ভিতরে সেই জগজ্জননীকে যাঁহারা লাভ করিয়াছেন অথবা তাঁহার দিকে যাঁহারা অগ্রসর হইতেছেন, তাঁহারা সুখ দুঃখের চঞ্চলতাকে সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করিয়া স্থির বস্তুকে ধারণ করেন। তাঁহাদের দৃষ্টি ভিতরের দিকে। আমরা কে কত টুকু ধর্ম্ম পথে অগ্রসর হইয়াছি, এই বিষয়ে চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারিব। উপাসনা, আলোচনা ধর্ম্মপুস্তক পাঠ বেশ চলিতেছে, লোকে দেখিয়া ভাবিতেছে "ইনি পূজনীয় ব্যক্তি, ইনি যথার্থই ঈশ্বর ভক্ত।" তিনি নিজেও হয়ত ভাবিতেছেন যে, হাঁ কিছু কিছু অগ্রসর হইতেছি বটে। কিন্তু যে দিন তাঁহার সুখের ঘরে অগ্নি লাগিল, পুত্র কিম্বা স্ত্রীটি মারা গেল, অথবা অন্য কোনও বিপদ আসিয়া পড়িল, সে দিন তিনি এমন অস্থির হইলেন যে, ঈশ্বরের নামও মুখে আনিলেন না। ইহাতেই টের পাওয়া যায়, মূল বস্তু বহু দূরে। যিনি প্রকৃত উপাসনাশীল, সংসার তাঁহার উপর কর্ত্তৃত্ব করিতে পারে না। যদি লোকে দেখিতে পায় যে, ব্রাহ্মগণ অতি তুচ্ছ কথায় রাগিয়া উঠেন, সামান্য ক্ষতিতেও তাঁহাদের মুখে বিষাদের গাঢ় কালিমা পড়ে, নিন্দাকারীকে শত্রু ভাবেন, তবে পৃথিবীর লোকে অবশ্যই বলিবে যে, "ইহারা যখন সকল বিষয়েই অপর সাধারণ লোকের মত রহিয়াছে, তখন ঈশ্বর ঈশ্বর বলিয়া কেন বেড়ায়?" বাস্তবিক ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে যে সকল সাধু মহাত্মা সংসারের অতীত স্থলে বাস করিতেছেন, তাঁহারাই

এই ধর্ম্মের আদর্শ জগৎকে দেখাইতেছেন। তুমি ব্রাহ্ম, উপাসনা মন্দিরে গমন করিতেছ, হঠাৎ আসিয়া কেহ কানে কানে বলিল "মহাশয় আপনাকে অমুক ব্যক্তি বড়ই নিন্দা করিয়াছে। আপনার বিরুদ্ধে এই এই কুৎসিত কথা বলিয়াছে।" ইহা শুনিয়া যদি তোমার প্রাণ অস্থির হইয়া উঠে, উপাসনা ক্ষেত্রে বসিয়া যদি তুমি ভগবানের দিকে না চাহিয়া সেই নিন্দাকারীর প্রতিহিংসার চিন্তাতে ব্যাপৃত হও,—তবে সাধারণ জীবন হইতে তোমার জীবনের বিশেষত্ব রহিল কোথায়? ধর্ম্মালোচনার সময় সৎসঙ্গেও যদি তুমি ব্যক্তি বিশেষকে লক্ষ্য করিয়া তীক্ষ্ণ বাণ ক্ষেপণ কর, অর্থাৎ সকল বিষয়ে সকল কার্য্যেই তুমি যদি সংসারের দাস হইলে, তবে উপাসনা করিয়া কি ফল হইল? প্রতি দিন প্রত্যেক ব্রাহ্মের এ সম্বন্ধে আত্ম-চিন্তা করা কর্ত্তব্য যে, তিনি সংসারের হস্ত হইতে কতটুকু রক্ষিত আছেন। ব্রাহ্মসমাজে যে কিছু নিন্দা, বিসম্বাদ অশান্তি দেখা যায়, তাহা এই সাংসারিক বুদ্ধি প্রবণতা হইতে উদ্ভূত। যাহারা সংসারের দাস তাহাদের মধ্যে কলহ বিবাদ বিসম্বাদ অশান্তি চিরদিনই বর্ত্তমান থাকিবে। পৃথিবী যথার্থই স্বর্গরাজ্যে পরিণত হয়, যদি সাধকগণ সংসারের হাত হইতে পরিত্রাণ লাভ করিতে পারেন। পরমেশ্বর কৃপা করুন, আমরা দিন দিন এই পথে অগ্রসর হই।

অবিরাম গতি—পর্ব্বত হইতে ধীরে ধীরে স্রোতস্বতী অবিরাম গতিতে সাগরাভিমুখে প্রবাহিত হইতেছে। তীরে শ্যামল শস্যক্ষেত্র, উপরে অনন্ত আকাশ। সন্ধ্যাসমাগমে নদীতীরে যাঁহারা গমন করেন, তাঁহারা তদানীন্তন স্রোতস্বতীর পরম রমণীয় শান্ত ও প্রফুল্ল মূর্ত্তি অবলোকন করিয়া আনন্দ রসে আপ্লুত হইয়া থাকেন। অস্তগমনোন্মুখ সূর্য্যের হেমাভকিরণ নদী বক্ষে নিপতিত হওয়ায় বারি রাশিকে স্বর্ণ জড়িত মখমলের ন্যায় দেখাইতেছে। তীরস্থ বৃক্ষ সমূহের স্থির প্রতিচ্ছায়া নির্ম্মল জলের অভ্যন্তরে মনোহর দৃষ্ট হইতেছে। চতুর্দ্দিকেই মূর্ত্তিমতী নিস্তব্ধতা। অকস্মাৎ এই নিস্তব্ধতা ভেদ করিয়া খরবেগে বায়ু প্রবাহিত হইতে লাগিল। তপস্বীর ন্যায় স্থিরো-পবিষ্ট বৃক্ষ-শ্রেণী ঝড়ের আঘাতে দুলিতে লাগিল। ভয়ানক তরঙ্গ শ্রেণী উত্থিত হইয়া ভীম গর্জ্জনে প্রবাহিত হইতে লাগিল। স্থির যোগিনী স্রোতস্বতী উন্মাদিনীর ন্যায় তাণ্ডব নৃত্য করিতে লাগিল। আবার কিয়ৎকাল পরে সে নৃত্য থামিয়া গেল। আধ্যাত্মিক জীবনেও আমরা এরূপ দেখিতে পাই। ঈশ্বর প্রীতিতে একটা অস্তস্তল বাহিনী গতি থাকে, আবার সময়ে সময়ে উচ্ছ্বাসও হয়। এক শ্রেণীর সাধকের হৃদয় ঐ স্থির অচঞ্চল স্রোতস্বতীর ন্যায় নিয়ত ভগবানের দিকে ছুটিতেছে। বাহিরে তাঁহাদের ভাবের কোনই প্রকাশ দেখা যায় না। তাঁহাদের আকাঙ্ক্ষা, ভাব, উৎসাহ উদ্দীপনা নিস্তব্ধ, স্থির স্রোতস্বতীর ন্যায়। তাহা গর্জ্জন-বিহীন, শব্দ-বিহীন, তরঙ্গ-বিহীন। আর এক শ্রেণীর সাধক বাহ্যিক ভাবের জন্যই লালায়িত। যে দিন তাঁহারা নৃত্য করিতে পারিলেন না, যে দিন উপাসনাকালে চক্ষের জল পতিত হইল না এবং ভাবা-বেশে অঙ্গ সঞ্চালন হইল না, সে দিন যেন তাঁহাদের উপাসনাই হইল না। ভাবের মাদকতা ভিন্ন যেন তাঁহাদের প্রাণ সজীব থাকে না।

আধ্যাত্মিক জীবনে এরূপ ঘটনা নিত্যই ঘটিয়া থাকে। কখন শুষ্কতা, কখন মিষ্টতা, কখন উচ্ছ্বাসের মধ্য দিয়া সাধককে যাইতে হয়। যাঁহারা ভাবের প্রয়াসী, যে দিন ভাবের অভাব হয়, সে দিন তাঁহারা শুষ্ক হন। যাঁহারা নিয়তই উপাসনার মধুরআস্বাদ পাইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা মিষ্টতার অভাব হইলে উপাসনা হইল না বলিয়া স্থির করেন। কিন্তু প্রকৃত বিশ্বাসীর হৃদয়ের অবস্থা অন্য রূপ। তিনি দেখেন, তাঁহার প্রভু নিয়তই নিকটে আছেন। মা যে দিন সন্তানকে আদর না করেন, সে দিন কি সন্তান-স্নেহ তাঁহার হ্রাস হইয়া থাকে? যখন আদর করেন, তখনই কি স্নেহ বলবান হয়? বাস্তবিক ভাবের মিষ্টতা না পাইলেও ভক্ত-হৃদয় অবসন্ন হয় না। ঐ অবিরাম বাহিনী নদীর ন্যায় তাঁহার চিত্ত নিয়তই ভগবানের দিকে ছুটিতেছে। তিনি মিষ্ট; তিক্ত, আনন্দ, নিরানন্দ কিছু বোঝেন না। এই রূপ অবিরাম বাহিনী জীবন নদী কখনও আধ্যাত্মিক অবসাদ অনুভব করে না। নিয়তই তাহাতে স্ফূর্ত্তি। তাঁহাদের চিত্ত-বিক্ষেপ হয় না। এরূপ জীবনই আদর্শ স্থানীয়।

শান্তম্—প্রাচীন ঋষিরা বলিয়াছেন "শান্তমুপাসীত" শান্ত ভাবে ঈশ্বরের উপাসনা কর। আধুনিক সাধক বৈষ্ণবগণ ও পঞ্চ সাধনের মধ্যে শান্তভাবেই প্রথম সাধন করিতে বলিয়াছেন। তাঁহারা শান্তভাব সাধনের দ্বারা স্বরূপেতে উপস্থিত হন তৎপর অন্যান্য ভাবের সাধনেতে তাঁহাকে সম্ভোগ করেন। সাধনরাজ্যে যাঁহারা চলিয়াছেন বা চলিতেছেন তাঁহারাই এইটী বেশ অনুভব করিয়াছেন যে,চিত্তের প্রশান্ততা ব্যতীত সেই শান্তম্ ঈশ্বরেতে প্রবেশ করিতে কেহ পারে না। তাই সকল শ্রেণীর সাধকগণের পক্ষেই সর্ব্ব প্রথমে চিত্তের প্রশান্ততা অভ্যাস করিতে হয়। চিত্তের স্থিরতা ভিন্ন এই মহৎ ব্যাপার জীবনে সম্পন্ন করা কখনই সম্ভবপর নয়। চিত্তের প্রশান্ততা লাভ করিতে হইলে অভ্যাস এবং বৈরাগ্যের দ্বারা চিত্তশুদ্ধির প্রয়োজন, যত অভ্যাস এবং বৈরাগ্যের দ্বারা চিত্তের শুদ্ধতা জন্মিবে, তত চিত্ত সংযত হইয়া আসিবে, তখন চিত্তের প্রশান্ততার সঙ্গে সঙ্গে ঈশ্বর-স্বরূপ আত্মার নিকট প্রকাশ হইতে থাকে। এইরূপে স্বরূপ রাজ্যে যত অগ্রসর হইবে ততই ঈশ্বরোপাসনা মধুর হইবে। যাঁহারা যত স্বরূপরাজ্যে প্রবেশ করিয়াছেন তাঁহারা তত উপাসনাতে সিদ্ধ হইয়াছেন। তাঁহাদের পক্ষে ভগবদারাধনার ন্যায় মিষ্ট দ্রব্য আর কিছু নাই। যত দিন তিনি আমাদের নিকট মধুর না হইতেছেন, ততদিন উপাসনাতে আমাদের প্রাণ ডুবিয়া যাইবে না, এবং এই কার্য্যকে শ্রেষ্ঠ কার্য্য বলিয়া বিশ্বাসও করিতে পারিব না; সুতরাং ইহা ধরিয়াও থাকিতে পারিব না। যখন তিনি মধুর হইবেন যখন চিত্ত তাঁহাতে ডুবিবে তখন এই সত্য অনুভব করিতে পারিব। তাঁহার নামে যায় শোক, যায় তাপ, যায় হৃদয়ভার। বাস্তবিকই তাঁহার নামে তখন শোক তাপ থাকে না, তখন হাজার নির্যাতন কর প্রাণের

সেই মধুময় ভাব, সেই আনন্দময় ভাব, সেই শান্তিময় ভাব আর কিছুতেই কাড়িয়া লইতে পারিবেনা। তখনই মানুষ যাহা সত্য বুঝে, প্রাণ দিয়া অথচ প্রশান্ত ভাবে সে কার্য্য সমাধান করিতে পারে। যীশু এই শান্তিময় রাজ্যে প্রবেশ করিয়াই জীবনদান করিয়াছেন, বুদ্ধ এই শান্তিময় রাজ্যে প্রবেশ করিয়া সব বিসর্জ্জন দিতে পারিয়াছিলেন, এখনও যাঁহারা আপনার প্রভুকে আদর্শ করিয়া জীবনপথে চলিতেছেন তাঁহারা এই কথা বলিতেছেন :— "আমরা যেন তাঁহাকে সম্মুখে রাখিয়া নির্য্যাতনের মধ্যেও শান্তির সহিত আপনার কাজ করিতে পারি এবং নির্যাতনকারীদিগকে প্রেম করিতে পারি। শান্তিহারা যেন না হই।

প্রার্থনা সম্বন্ধে সতর্কতা—একজন ভিক্ষুক ধনীগৃহস্থের দ্বারে ভিক্ষা করিতে আসিয়া আম চাহিল। জ্যৈষ্ঠ মাস সকলে আম খায়, গরিব বলিয়া তাহার কি আর আম খাইবার সাধ হয় না? সে আপন আকাঙ্ক্ষা ধনীর দ্বারে প্রকাশ করিল। কিন্তু বাড়ীর লোকেরা তাহাকে আম না দিয়া একমুষ্টি চাউল প্রদানের ব্যবস্থা করিল। গরিব কি করে, তাহা লইয়াই চলিয়া গেল। এই ভিক্ষুকের দশা আমাদের জীবনে নিয়ত ঘটিতেছে। উপাসনার সময় ঈশ্বরের দ্বারে আমরা কত উচ্চ উচ্চ বিষয়ের প্রার্থনা করি। কিন্তু আমাদের অপেক্ষা আমাদের অবস্থা যিনি ভাল জানেন, তিনি আমাদিগের যাহা পাওয়া উচিত তাহাই প্রদান করেন। ধনীর ভূষণ বসন দেখিয়া গরিবের তাহার প্রতি লোভ উপস্থিত হইলে, যেমন সে অবস্থার অতিরিক্ত আকাঙ্ক্ষা করিয়া শেষে ক্ষুব্ধ হয়, মনস্তাপ সহ্য করে। আমাদেরও সেই দশাই ঘটে। সাধু সজ্জনের উন্নত অবস্থা দেখিয়া মনের আবেগ সম্বরণ করিতে না পারিয়া একেবারে তাহা পাইবার জন্য প্রাণে আকাঙ্ক্ষা হয়—এবং প্রার্থনাও উপস্থিত হয়। কিন্তু তাহা পাইবার মত অবস্থা নয় বলিয়া পাই না। এই প্রকার অধিক দিন হইতে থাকিলে ক্রমে প্রার্থনার প্রতি অনাস্থা জন্মিতে থাকে। প্রার্থনা করিয়া করিয়া নিষ্ফলমনোরথ হইলে শেষে আর প্রার্থনা করিবার প্রবৃত্তি হয় না। অবিশ্বাস আসিয়া প্রাণকে আক্রমণ করে, এজন্য সর্ব্বদাই আত্ম-দৃষ্টিকে প্রবল রাখা কর্ত্তব্য। লোভ পরবশ হইয়া না চাহিয়া আবশ্যক জ্ঞানে চাওয়াই উচিত এবং সে ভাবে চাহিলেই পাওয়া যায়।

অজ্ঞানতা নিবন্ধন যেমন অবস্থার অতিরিক্ত বস্তু চাওয়া হয়। আবার ইচ্ছা করিয়াও সময় সময় তেমনি অবস্থার অতিরিক্ত বস্তু প্রার্থনা করিবার প্রবৃত্তি আমাদের মধ্যে প্রবল দেখা যায়। বিশেষতঃ যখন সজন উপাসনা হয়, তখন এইরূপ ঘটনা প্রায় ঘটিতে দেখা যায়। আরাধনা যখন হইয়া গেল, তখন ত প্রার্থনা করিতেই হইবে। কারণ নিয়ম আছে আরাধনার পরে প্রার্থনা করিতে হয়। এইরূপ অবস্থায় অনেক সময় কল্পনার সাহায্যে যাহা বাস্তবিক তেমন প্রার্থনীয় বা আবশ্যক নয় তাহাও প্রার্থনা করা হয়। যিনি উপাসনা করেন, তাঁহার সামান্য ত্রুটীটি যাহা আছে, যাহার জন্য প্রাণে সংগ্রাম হইতেছে, তিনি সেই সামান্য বিষয় প্রার্থনা করা অনেক সময় উচিত মনে করেন না। কারণ তদ্দ্বারা উপাসকগণের নিকট কিয়ৎ পরিমাণে হীন হইবার আশঙ্কা আছে। এই অবস্থায় লোকের নিকট হীন হইবার ভয়কে অতিক্রম করা সকলের পক্ষে ঘটিয়া উঠে না, এজন্য প্রার্থনার বিষয় সকল সৃষ্টি করিয়া লওয়া হয়। সুতরাং এই প্রকার সৃষ্টি করা প্রার্থনা যে সফল হইবে না, তাহা ত সহজেই বুঝিতে পারা যায়। ইহাদ্বারা একদিকে যেমন কপটতা বৃদ্ধি পায়, তেমনি যে ভয়ে লোকে এরূপ প্রার্থনা করে তাহার হস্ত হইতেও নিষ্কৃতি লাভ হয় না। কারণ লোকে তাহার জীবনের গতি অন্য রূপ দেখিয়া এবং প্রার্থনার বিষয় লাভের জন্য তেমন আগ্রহ বা চেষ্টা না দেখিয়া তাহার প্রতি হতশ্রদ্ধ হইতে থাকে। শরীরের সম্বন্ধে যেমন ক্ষুধা, আত্মার পক্ষে যদি কোন অভাব তেমনি কষ্টদায়ক না হয়, শরীরের ক্ষুধা শান্তি না হইলে যেমন ছটফট করিয়া বেড়াইতে হয়, শরীর অবশ হইয়া আসে, ক্রমে অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িতে হয়; যতক্ষণ না আহারীয় পাওয়া যায় ততক্ষণ আর কিছুতেই উদ্বেগের শান্তি হয় না; আত্মার পক্ষে অভাব বোধ সেইরূপ অশান্তিকর তীব্র যাতনাদায়ক না হইলে বাস্তবিক সরল প্রার্থনা বাহির হয় না। সেরূপ ভাবে প্রার্থনা বাহির না হইলে প্রার্থনা পূর্ণ হইবার সম্ভাবনাই বা কি? শারীরিক ব্যাধির ভাণ করিলে যেমন চিকিৎসক ঔষধের ব্যবস্থা করেন না, যদি বা করেন তাহা তাহার চৈতন্যোদয়ের উপযোগী করিয়াই করেন। আমাদের অন্তর্যামী দাতা কি তাহা করেন না? প্রার্থনা অভাব মোচনের নিমিত্ত। অভাব বোধ না থাকিলে অকারণ প্রার্থনা করিয়া কি লাভ? তখন আত্মার যাহাতে চৈতন্য আসে, অভাব যথেষ্ট আছে অথচ তাহার জ্ঞান নাই, যাহাতে এরূপ অসাড়তা নষ্ট হয়, তাহারই জন্য প্রার্থনা করা কর্ত্তব্য। প্রার্থনার সময় প্রবল ব্যাকুলতার সহিত নানা কথা উচ্চারণ করিয়া যদি কিছুকাল পরেই আমোদ প্রমোদে রত হওয়া যায়, প্রার্থনার বিষয় লাভের পূর্ব্বেই যদি তাহার জন্য প্রাণে কোন আকাঙ্ক্ষা না থাকে, এমন কি, কি প্রার্থনা করিয়া আসিলাম, তাহার স্মৃতি পর্য্যন্ত না থাকে, তাহা হইলে এমন বিকৃত ভাবাপন্ন প্রার্থনা না করা অপেক্ষা স্থিরভাবে আত্ম-দৃষ্টির সহিত নিজের অবস্থা অনুভব করিবার প্রয়াসী হওয়াই কি কর্ত্তব্য নয়? ব্যাধি অনেক প্রকারের দেখা যায়, অনেক সময় প্রার্থনাও ব্যাধির মধ্যে গণ্য হইয়া পড়ে। এ প্রকার ব্যাধির হাত হইতে রক্ষা না পাইলে কল্যাণের আশা কম। এজন্য প্রার্থনা যাহাতে সরল, স্বাভাবিক, ও অভাবের অনুরূপ হয়, সে বিষয়ে আমাদের যত্নশীল হইতে হইবে।

সম্পাদকীয় ও প্রাপ্ত প্রবন্ধ।

একতার উপায় কি?

সভ্য জগতের সর্ব্বত্রই এক ধ্বনি শ্রুত হইতেছে একতা একতা—একতা। একতা অতি মিষ্ট; একতা দেখিলে ও লাভ করিলে পরম আনন্দ। একতা ভিন্ন মানব সমাজ কোথায় থাকিত? বিষয় বাণিজ্যের উন্নতি কিরূপে হইত? মানব-

শক্তির অদ্ভুত কীর্ত্তি সকল কিরূপে প্রকাশ পাইত? বর্ত্তমান সময়ের চিন্তাশীল ব্যক্তিদিগের মধ্যে একজন বলিয়াছেন যে, অসভ্য ও বর্ব্বর অবস্থা এবং সভ্যতার মধ্যে এই প্রভেদ দেখিতে পাওয়া যায়, যে অসভ্য বর্ব্বরগণ একতার মূল্য জানে না, সভ্য জাতি সকল তাহা অবগত আছে। ইহা ত সত্য কথা, বনে যে সিংহ ব্যাঘ্র ভল্লুক প্রভৃতি হিংস্র শ্বাপদগণ বিচরণ করিতেছে, তাহারা যদি একতাসূত্রে বদ্ধ হইতে জানিত, তাহা হইলে মানবগণ কি তাহাদের উচ্ছেদ সাধনে সমর্থ হইত? জানে না, পারে না, বলিয়াই তাহারা মানব হস্তে নিধন প্রাপ্ত হইতেছে।

এই একতার মূল্য প্রাচীনকালের পণ্ডিতগণ বিশেষরূপে অনুভব করিয়াছিলেন। এ বিষয়ে তাঁহাদের যে উপদেশ তাহা এদেশের সংস্কৃতজ্ঞ ব্যক্তিদিগের নিকট সুপরিচিত।

"অল্পানামপি বস্তূনাং সংহতিঃ কার্য্যসাধিকা।
তৃণৈ র্গুণত্বমাপন্নৈ র্বধ্যন্তে মত্ত দন্তিনঃ॥"

"অতি ক্ষুদ্র বস্তু সকলকেও যদি সমবেত করা যায়, তদ্দ্বারা মহৎ কার্য্য সাধিত হইতে পারে। তৃণ অতি ক্ষুদ্র কিন্তু তাহার সমষ্টি দ্বারা কাছি প্রস্তুত করিয়া তদ্দ্বারা মত্ত হস্তীকেও আবদ্ধ করা যায়।"

কিরূপ সংক্ষেপে ও সারগর্ভ বাক্যে একতার মূল্য ব্যক্ত করা হইয়াছে! সভ্যতার উন্নতি সহকারে এই একতা প্রবৃত্তি সর্ব্বত্র বর্দ্ধিত হইতেছে। যে সকল ধর্ম্মসমাজ পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইয়া বিবাদ ও বিদ্বেষে কালাতিপাত করিতেছিলেন, তাহারাও বর্ত্তমান সময়ের একতা-প্রবৃত্তি দর্শন করিয়া আপনাদের প্রাচীন সংকীর্ণতা পরিহার পূর্ব্বক সম্মিলিত ভাবে কার্য্য করিতে উদ্যোগী হইয়াছেন। কিন্তু একদিকে যেমন মানব-হৃদয়ে স্বাভাবিক একতাপ্রবৃত্তি আছে, তেমনি অপর দিকে চিন্তা ও কার্য্যের স্বাধীনতা-প্রবৃত্তিও আছে। এই স্বাধীনতা-প্রবৃত্তি এত প্রবল, যে ইহাকে আবদ্ধ করিবার জন্য, রাজা, গুরু পুরোহিতগণের সহস্র চেষ্টা বিফল হইয়াছে। জ্ঞানরাজ্যে, বিষয় বাণিজ্যে মানবচিন্তার স্বাধীনতা নিবন্ধন যে সহস্রপ্রকার বৈচিত্র সংঘটিত হইয়াছে, তাহার উল্লেখ অনাবশ্যক। কারণ সেখানে কেহই মানবচিন্তাকে নিয়মিত করিবার প্রয়াস পায় না; সকলেই স্বাধীনভাবে চিন্তা করে ও কার্য্য করে। সুতরাং বৈচিত্র্য সংঘটিত হওয়া অনিবার্য্য ও অপরিহার্য্য। কিন্তু ধর্ম্ম-বিষয়ে মানব অপর পথ অবলম্বন করিয়াছে। জীবনের অপর-অপর বিভাগে যে চিন্তা ও কার্য্যের স্বাধীনতা অবাধে দিয়াছে, ধর্ম্মবিষয়ে সে স্বাধীনতা দিতে সমর্থ হয় নাই। ঈশ্বর-ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক, তিনি মানবের মুক্তির পথ নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন, এই মূলগত সংস্কার ও বিশ্বাস নিবন্ধন বার বার মানবের ধর্ম্ম-চিন্তাকে নিয়মিত করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। ঈশ্বরের অভিপ্রায় বেদে বা বাইবেলে বা কোরাণে লিপিবদ্ধ আছে। যাহার চিন্তা সে পথ পরিত্যাগ করে সে অপরাধী, সে পাপী। "নাস্তিকো বেদনিন্দকঃ"—যে বেদনিন্দক সেই নাস্তিক। এইরূপ শাসনের দ্বারা মানুষের স্বাধীনতাকে খর্ব্ব করিয়া একতা স্থাপনের চেষ্টা হইয়াছে, ইউরোপ প্রভৃতি দেশে এই একতা স্থাপনের উদ্দেশে রাজবিধি সকল প্রণীত হইয়াছে, বিশেষ আদালতের সৃষ্টি হইয়াছে, মানুষকে স্বাধীন-চিন্তার অপরাধে কারাগারে নিক্ষেপ করা হইয়াছে; ধন সম্পদে বঞ্চিত করা হইয়াছে, জলন্ত চিতানলে জীবন্ত দগ্ধ করা হইয়াছে। তথাপি কেহ মানব মনকে আবদ্ধ করিতে পারে নাই, চিন্তা ও কার্য্যের সম্পূর্ণ একতা স্থাপনে সমর্থ হয় নাই। অধিক কি সমুদয় খ্রীষ্টীয় সম্প্রদায়ের লোক বাইবেল গ্রন্থকে অভ্রান্ত ও ঈশ্বর-প্রণীত গ্রন্থ বলিয়া মনে করে, অথচ ইংলণ্ডের ন্যায় একটী ক্ষুদ্র দেশে প্রায় দুইশত প্রকার খ্রীষ্টীয় সম্প্রদায় আছে, ইহঁারা পরস্পরের সহিত উপাসনাতে, ধর্ম্মসাধনে, ও জনহিতকর কার্য্যে সম্মিলিত হন না। বিদেশেই বা গমন করি কেন? এই ভারতবর্ষে কত প্রকার হিন্দু সম্প্রদায় আছে, তাহা যাঁহারা জানিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা একবার পরলোকগত অক্ষয়-কুমার দত্ত মহাশয়ের প্রণীত ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায় নামক গ্রন্থের প্রতি দৃষ্টিপাত করুন। ইহারা সকলেই হিন্দু উপাসক সম্প্রদায়, সকলেই বেদকে অভ্রান্ত বলিয়া স্বীকার করেন অথচ চিন্তা ও কার্য্যে,সাধনে ও অনুষ্ঠানে কি বিচিত্রতা!! মানবমনকে নিয়মিত করিবার জন্য, চিন্তা ও কার্য্যের একতা উৎপাদনের জন্য শাস্ত্ররূপ শৃঙ্খল রচিত হইয়াছিল! কৈ, সে একতা ত স্থাপিত হইল না!

এখন প্রশ্ন এই, তবে ব্রাহ্মগণ কিরূপে আপনাদের মধ্যে একতা স্থাপন করিবেন? তাঁহারা অভ্রান্ত গুরু ও অভ্রান্ত শাস্ত্রে বিশ্বাস করেন না। মানবের চিন্তা ও কার্য্যকে নিয়মিত করিবার জন্য যে সকল রজ্জু উদ্ভাবিত হইয়াছিল, তাহাও তাঁহারা ছিন্ন করিয়াছেন, তবে আর কিরূপে পরস্পরকে আবদ্ধ রাখিবেন? কিরূপে মত ও আচরণের বিচিত্রতা নিবারণ করিবেন? ইহার উত্তরে এই বলা যাইতে পারে যে, যে একতার অর্থবিচিত্রতার অভাব তাহা স্থাপন করা ব্রাহ্মসমাজের লক্ষ্য নহে এবং সম্ভবও নহে। এইরূপ একতা স্থাপন করিতে গিয়াই পৃথিবীর মহাজনগণ ঘোর ভ্রান্তির কার্য্য করিয়াছেন, মানবসমাজের উন্নতির পথে অর্গল পাত করিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে অনেকের এই ভ্রান্তি দেখিতে পাই যে, তাঁহারা কেবল মাত্র মানবের ধর্ম্মস্পৃহাকে উদ্দীপ্ত করিয়া সন্তুষ্ট থাকিতে পারেন নাই, সেই সঙ্গে সঙ্গে এক একটী সাধনপ্রণালী ও আইন দিবার চেষ্টা করিয়াছেন। এবং সেই সকল বিধি যাহাতে মানব লঙ্ঘন না করে সে জন্য বিশেষ প্রয়াস পাইয়াছেন। মহম্মদ কেবল একেশ্বরবাদ প্রচার করিয়া ও পৌত্তলিকতার দোষকীর্ত্তন করিয়া সন্তুষ্ট হইলেন না। তিনি নিজে যে কিছু সামাজিক, নৈতিক বা আধ্যাত্মিক তত্ত্বকে সত্য বলিয়া অনুভব করিলেন, সমগ্র মানবজাতিকে চিরদিনের জন্য সেই পথে আনিবার নিমিত্ত অগ্রসর হইলেন। এবং সেই জন্যই কোরাণকে ঈশ্বর প্রদত্ত অভ্রান্ত শাস্ত্র ও আপনাকে "আখিরি প্যাগম্বর" বলিয়া ঘোষণা করিলেন। ইহার ফল এই হইল যে শতাব্দীর পর শতাব্দী চলিয়া যাইতেছে অথচ পৃথিবীর লক্ষ লক্ষ পুরুষ ও রমণীর চিত্ত তাঁহার হস্ত-খাত খালের মধ্যে পড়িয়া আছে, স্বাধীন ভাবে চিন্তা ও কার্য্য করিতে সাহস করিতেছে না। কিন্তু এত করিয়াও

কি তিনি চিন্তা ও কার্য্যের বৈচিত্র্য সম্পূর্ণরূপে নিবারণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন? মুসলমানদিগের যে সকল বিভিন্ন সম্প্রদায় তাহারাই এই উক্তির সাক্ষী।

তবে ব্রাহ্মসমাজ কিরূপ একতার প্রার্থী। বিচিত্রতার মধ্যে যে একতা তাহাই ব্রাহ্মসমাজের প্রার্থনীয়। ব্রাহ্মদিগের মধ্যে সাধনগত, শিক্ষাগত, রুচিগত, মতগত সহস্রপ্রকার বিচিত্রতা থাকিবে, অথচ সকলে একদলে বদ্ধ থাকিবেন, এক-সঙ্গে কার্য্য করিবেন ও এক উদ্দেশ্যের অনুসরণ করিবেন। ইহা কি সম্ভব? জনসমাজের পরস্পর বিচ্ছিন্ন প্রাণিপুঞ্জ যখন একত্র কার্য্য করিবার জন্য সম্মিলিত হয়, তখন তাহাদের সম্মি-লনের একটা ভিত্তি থাকে। নানা বিষয়ে পার্থক্য থাকিলেও একটা বিষয়ে মিলন থাকে:—সেই ভূমির উপরে সকলে দাঁড়ায়। যতক্ষণ সেই মিলনের স্থানে বিরোধ না ঘটে ততক্ষণ তাহারা একত্র থাকিয়া কার্য্য করে। মনে কর একটী সুরাপান নিবারণী সভা হইয়াছে—তাহাতে আস্তিক আছে,—নাস্তিক আছে, আমিষাশী আছে, নিরামিষাশী আছে, ত্রীশ্বরবাদী আছে, একেশ্বরবাদী আছে, ইঁহারা সকলে পরস্পরের পার্থক্য জানিয়াই সম্মিলিত হইয়াছেন, এবং পার্থক্য সত্বেও কার্য্য করিতেছেন। তাঁহাদের মূলমতে ও মূল-উদ্দেশ্যে একতা আছে। ব্রাহ্মসমাজকেও এইরূপ ভূমির উপরে একতার ভিত্তি স্থাপন করিতে হইবে। ব্রাহ্মসমাজের মূল মতগুলির সহিত ও ইহার মূল উদ্দেশ্যের সহিত যাঁহাদের একতা থাকিবে, তাঁহারা সকলে একত্রে বাস ও কার্য্য করিবেন। ঐ মূলমত ও মূল-উদ্দেশ্যের অতিরিক্ত যিনি যাহা সাধন ও প্রচার করুন, তাহা করিতে দিতে হইবে, ও তাহা সত্বেও তাহাদিগকে আপ-নার লোক বলিয়া স্বীকার করিয়া লইতে হইবে।

এই স্থলে কেহ কেহ প্রশ্ন করিতে পারেন। ব্রাহ্মসমাজের মূলমত ও মূল-উদ্দেশ্য বিষয়েই যদি মতান্তর উপস্থিত হয়, তাহা হইলে একতা লাভের উপায় কি? ইহার উত্তর এই আমরা বিশ্বাস করি ব্রাহ্মসমাজের মূল-মত ও মূল-উদ্দেশ্য জানিতে কাহারও বাকি নাই। যদি সে বিষয়ে কাহারও সংশয় থাকে, তবে তাহারও উপায় আছে। ব্রাহ্মদিগের অধিকাংশের মতে মূল মত ও মূল উদ্দেশ্য স্থির করিয়া লও। লইবার পর সে বিষয়ে যাঁহাদের একতা তাঁহাদের সকলকে ব্রাহ্ম বলিয়া স্বীকার কর, তাহার অতিরিক্ত যদি কেহ মানেন বা করেন তন্নিবন্ধন তাঁহাকে ব্রাহ্মনাম হইতে বঞ্চিত করিতে যাইও না। যাঁহারা ঐ অতিরিক্ত মূলমতের কিছু মানেন, এবং তন্নিবন্ধন নির্যাতন সহ্য করেন, তাঁহাদের প্রতিও পরামর্শ এই:—তোমরা আপনা-দিগের মত ও ভাব পরীক্ষা দেখ, যদি দেখ যে ব্রাহ্মধর্ম্মের মূল উদ্দেশ্যের সঙ্গে তোমাদের একতা আছে, তবে তোমরা আপনা-দিগকে ব্রাহ্ম বলিয়া জান ও ঘোষণা কর। কাহারও কথায় কর্ণপাত করিও না। কিন্তু সহস্র বাধা সত্বেও ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যকে পরিত্যাগ করিও না; ব্রাহ্মসমাজ হইতে দূরে দাঁড়াইও না একতার ব্রত সকলে গ্রহণ কর। প্রেমের প্রথম সোপান উদারতা। একত্র বাস কর, একত্র কার্য্য কর, উদার ভাবে পরস্পরের পার্থক্য বহন করিতে শিক্ষা কর, কালে প্রেম জন্মিবে।

ব্যাখ্যান রত্নাবলী।

(২৯ জুলাই (১৮৯৩) সাধনাশ্রমে বিবৃত)

"মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়।
ময়ি সর্ব্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণাইব॥"

ভগবদ্গীতা, ৭ম অধ্যায়, ৭ শ্লোক।

অর্থ—"হে ধনঞ্জয় আমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কিছু নাই। সূত্রে মণি সকল যেরূপ সন্নিবিষ্ট থাকে, এই সমুদয় জগৎ সেইরূপ আমাতে সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে।"

মণি সকল যখন সূত্রের দ্বারা একত্র বদ্ধ হইয়া মণিমালিকা প্রস্তুত করে, বা পুষ্প সকল যখন সূত্রের দ্বারা একত্র সন্নিবদ্ধ হইয়া মালারূপে পরিণত হয়, তখন আমরা তাহার অভ্যন্তরে কি দেখিতে পাই? মালাতে আবদ্ধ হইবার পূর্ব্বে মণি সকল পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন ছিল, পরস্পরের সহিত অসম্বদ্ধ ছিল, এক সূত্রের দ্বারাই তাহাদের পরস্পরের মধ্যে সম্বন্ধ স্থাপিত হইল; তাহারা এক দেহের অঙ্গরূপে পরিণত হইল। সূত্রই তাহাদের একত্ব সম্পাদনের মূলীভূত কারণ। আজ যদি সূত্র ছিন্ন হয় তৎক্ষণাৎ তাহারা পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িবে। অতএব সূত্র মালার মধ্যে সর্ব্ব প্রধান পদার্থ, সূত্র না থাকিলে, মালার মালাত্ব হয় না। অথচ যে সূত্র এত উপকারী, যে সূত্র এত প্রয়োজনীয়, যে সূত্র একত্ব সম্পাদক, সেই সূত্রকে কেহ দেখিতে পায় না, তাহা সর্ব্বদা চক্ষুর অন্তরালেই থাকে।

ঈশ্বরকে এই ব্রহ্মাণ্ডের তাবৎ বস্তুর মধ্যে সূত্র স্বরূপ বলিবার অভিপ্রায় এই যে, তাঁহার দ্বারাই ইহার একত্ব সম্পা-দিত হইয়াছে। একটু নিবিষ্টচিত্তে চিন্তা করিলেই দেখা যায় যে, এই ব্রহ্মাণ্ডের ক্ষুদ্র ও বৃহৎ তাবৎ পদার্থ এক দুশ্ছেদ্য-বন্ধনে পরস্পরের সহিত আবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। একটী তৃণ কণার সহিত জল, বায়ু, অগ্নি, চন্দ্র, সূর্য্য, পৃথিবী প্রভৃতি তাবৎ ভূত ও সমগ্র জড় জগৎ গ্রথিত হইয়া রহিয়াছে। পৃথিবী খাদ্য দিতেছে ও রস যোগাইতেছে। অগ্নি উত্তাপ দিতেছে ও বায়ুপোষণ করিতেছে, সূর্য্য বর্ণ ফলাইতেছে, এইরূপে যে কোন পদার্থের কথা চিন্তা করা যায়, দেখিতে পাই যে তাহা ব্রহ্মাণ্ডের অপরাপর পদার্থের সহিত নানা প্রকার সম্বন্ধে আবদ্ধ। অতএব দেখিতেছি এই ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত পদার্থ সূত্রহীন মালার পুষ্প সকল বা মণিগণের ন্যায় পরস্পর বিচ্ছিন্ন বা অসম্বদ্ধ নহে। কিন্তু মালার অন্তর্গত মণিগণের ন্যায় পরস্পরের সহিত আবদ্ধ ও এক দেহের অঙ্গী-ভূত। কিন্তু এই ব্রহ্মাণ্ডে মালার সূত্র কে? সে বস্তু কোথায় যাহাদ্বারা ইহারা পরস্পরের সহিত সম্বন্ধ রহিয়াছে এবং যাহাতে ইহাদের একত্ব সম্পাদিত হইয়াছে? সে বস্তু, ব্রহ্ম বস্তু। এই চিন্ময় ব্রহ্মসত্তা নয়নের অন্তরালে থাকিয়া এবং জড় ও চেত-নের মধ্যে সন্নিবিষ্ট থাকিয়া সমুদায়ের মধ্যে একত্ব রক্ষা করি-তেছে। বর্ত্তমান সময়ের একজন চিন্তাশীল পণ্ডিত বলিয়াছেন যে, এই জগৎ যে এক জ্ঞানশীল শক্তি দ্বারা শাসিত তাহার প্রমাণ এই যে ইহার ক্ষুদ্র ও মহৎ তাবৎ পদার্থ ঘনিষ্ট সম্বন্ধে

পরস্পরের সহিত সম্বন্ধ। একের শাসনাধীন না থাকিলে উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের এরূপ একতা এবং সেই লক্ষ্যসিদ্ধি বিষয়ে বিবিধ বস্তুর সাহায্য কখনই দেখিতে পাওয়া যাইত না। যখন দেখি যে পোষ্ট আফিস টেলিগ্রাফ আফিস প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন আফিসের মধ্যে এমন যোগ রহিয়াছে, যে পরস্পরের সহায়তায় একই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতেছে, তখন যেমন বুঝিতে পারি যে, তাহারা একই গবর্ণমেণ্টের অধীন, সেইরূপ ব্রহ্মাণ্ডের বস্তু সকলের মধ্যে সম্বন্ধের ঘনিষ্টতা লক্ষ্যের একতা ও সেই লক্ষ্য সাধনে পরস্পরের সহায়তা দেখিয়াই সহজেই প্রতীতি করিতে পারি যে ঐ সকল বস্তু এক শক্তি দ্বারা নিয়মিত, ও একই পরামর্শের অধীন। অতএব একথা অতীব সত্য যে; সেই চিন্ময় পুরুষই মালাস্থিত সূত্রের ন্যায় জড় ও চেতনের মধ্যে নিহিত থাকিয়া তাহাদের একত্ব সম্পাদন করিতেছেন এবং বিবিধ পদার্থকে এক উদ্দেশ্য সিদ্ধির দিকে নিয়োগ করিতেছেন। অতএব তাঁহাকে এই ব্রহ্মাণ্ড মালার পরম সূত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করিলে কিছুই অত্যুক্তি হয় না।

তাঁহার এই চির বিদ্যমানতা ও প্রত্যেক পদার্থের সহিত এই ঘনিষ্ট যোগ যখন আমরা লক্ষ্য করি, তখন আমাদের মন বিশ্রাম লাভ করে, তখন বাস্তবিক আমাদের এই জীবনকে মহাসত্তা ও মহাশক্তির ক্রোড়ে প্রতিষ্ঠিত ও তাঁহার দ্বারা সুরক্ষিত দেখিতে পাই এবং নির্ভরের ভাব স্বতই হৃদয়ে সঞ্চারিত হয়। এই মহাসত্তা সূত্রের ন্যায় নয়নের অন্তরালেই চিরদিন রহিয়াছে। মণিমালিকার মণি সকলকেই যেমন বাহিরে দেখি, সূত্রকে যেমন দেখিতে পাই না। তদ্রূপ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় সকলকেই বাহিরে দেখি, তাহাদের অন্তরালে যে মহাসত্তা বিদ্যমান তাহাকে প্রত্যক্ষ করিতে পারি না। কেবল জ্ঞাননিষ্ঠ ধীরেরাই সংশয় রহিত বুদ্ধি ও সূক্ষ্ম আত্মদৃষ্টি দ্বারা সেই পরম তত্ত্ব উপলব্ধি করিয়া থাকেন।

ধর্ম্মসমাজে নিয়মতন্ত্র প্রণালী।

(প্রাপ্ত)

এক সময় যাহা একান্ত প্রার্থনীয় বলিয়া মীমাংসিত হয়, যাহার অভাবে কার্য্য আর ভালরূপে চলিতে পারে না বলিয়া বিশ্বাস হয় এবং যে অবস্থা পাইবার জন্য নানাপ্রকারে যত্ন চেষ্টার বিশেষ প্রয়োজন হয়, অন্য সময় আবার তাহার সহিত দীর্ঘকাল অবস্থিতি করিতে করিতে দেখা যায় যে, মন আর তাহাতে পরিতৃপ্ত হয় না। আবার সেই প্রাচীন রীতি যাহা এক সময় অসহ্য ও নিতান্ত অপ্রার্থনীয় বলিয়া মনে হইয়াছিল, তাহাই পাইবার জন্য লোকের ব্যাকুলতা হইয়া থাকে। আমাদের এই উক্তির প্রমাণ স্বরূপ বলিতে হইতেছে, যাঁহারা এক সময় ব্রাহ্মসমাজ মধ্যে একতন্ত্রতার অনিষ্টকারিতা উপলব্ধি করিয়া সমাজমধ্যে সাধারণতন্ত্র ও নিয়মতন্ত্রপ্রণালীর প্রবর্ত্তন করিতে বিশেষ আগ্রহশীল ছিলেন এবং সে জন্য বিশেষ যত্নপরায়ণ ছিলেন, এই কয়েক বৎসর সেই সাধারণতন্ত্র ও নিয়মতন্ত্রপ্রণালীর মধ্যে থাকিয়া এখন আবার পূর্ব্বাবস্থা পাইবার জন্য তাঁহাদের অনেকের প্রাণে আকাঙ্ক্ষার উদয় হইতেছে। এমন কি নিয়মতন্ত্র বা সাধারণতন্ত্র অনুসারে ধর্ম্মসমাজের কার্য্য চলিতে পারে না এবং চলা উচিত নয় বলিয়াও তাঁহাদের মধ্যে সিদ্ধান্ত হইতেছে। বর্ত্তমান অবস্থায় অসন্তুষ্টি এরূপ সিদ্ধান্তের একটী কারণ হইলেও আমাদের বিচার করিয়া দেখা উচিত যে, বাস্তবিকই ধর্ম্মসমাজের কার্য্য নিয়মতন্ত্রপ্রণালীদ্বারা সুচারুরূপে চালিত হইতে পারে কিনা।

জগতে আর যতপ্রকার সভাসমিতি আছে, অধিকাংশ স্থলেই নিয়মতন্ত্র প্রণালীদ্বারা যদি কার্য্য সুসিদ্ধ হইতে পারে, ধর্ম্মসমাজের কার্য্য সে প্রণালীতে না চলিবার পক্ষে বিশেষ কি অন্তরায় আছে? রাজনীতি, শিক্ষা, জনহিতকর অনুষ্ঠান প্রভৃতি সাধারণ কার্য্য সকল সম্পাদনের জন্য জগতে কতপ্রকার সভাসমিতি আছে এবং সর্ব্বত্রই নানাপ্রকার নিয়মপ্রণালীও বর্ত্তমান রহিয়াছে। নিয়মানুসারে সেই সকল কার্য্য যদি সুনির্ব্বাহিত হইতে পারে, তাহা হইলে ধর্ম্মসমাজের কার্য্যে এমন কি আছে, যাহা সাধারণের মতে বা নিয়মে সুনির্ব্বাহিত হইতে পারে না? নিমতন্ত্রতার বিরুদ্ধে প্রধান আপত্তি এই যে, নিয়মানুসারে যাঁহারা কার্য্যের ব্যবস্থা করিবার অধিকার প্রাপ্ত হন বা আপনাপন মত জ্ঞাপন করিবার অধিকার প্রাপ্ত হন, তাঁহারা সকলেই সমান। সকলের মতেরই সমান মূল্য। যিনি ২৫ বৎসর ধর্ম্মসাধন করিয়াছেন, তাঁহার মতেরও যে মূল্য আজ যিনি সমাজের সভ্য হইলেন, তাঁহার মতের ও সেই মূল্য। ইহাদ্বারা কার্য্যের সুশৃঙ্খলা না হইয়া বিশৃঙ্খলা ঘটিয়া থাকে। বহুদিনের অভিজ্ঞতা ও অল্পকালের অভিজ্ঞতার কোন তারতম্য করা হয় না, ইহাদ্বারা সুবিচারের বিঘ্ন হয়। এই আপত্তি যদি বাস্তবিক যুক্তিযুক্তও হয়, তাহা হইলে ধর্ম্মসমাজ সম্বন্ধেও যেমন যুক্তিযুক্ত অন্য সমাজ সম্বন্ধেও তেমনি যুক্তিযুক্ত। ধর্ম্মসমাজে বহুদিন অবস্থিতি এবং সাধন ভজনাদি দ্বারা যেমন বিশেষ বিশেষ ব্যক্তি কিয়ৎপরিমাণে বিশেষত্ব লাভ করিয়া থাকেন, অপরাপর সমাজ সকলেও তাহা ঘটিয়া থাকে। তবে সে সকল স্থানে সাধারণতন্ত্রের বিরুদ্ধে আপত্তি উপস্থিত না হইয়া ধর্ম্মসমাজের বেলা এরূপ আপত্তি উপস্থিত হয় কেন? এ কথা স্বীকার্য্য যে বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির যে বিশেষত্ব আছে, তাহা সর্ব্বত্রই আদরণীয় এবং তাঁহাদিগকে সর্ব্বত্রই বিশেষ বিশেষ কার্য্যের ভার অর্পণ করা হইয়া থাকে। রাজনৈতিক সভাতে যেমন দেখা যায়, যাঁহারা বহুকাল হইতে এই ব্রতে ব্রতী এবং বিশেষ জ্ঞানবান, প্রধান প্রধান কার্য্যের ভার তাঁহাদিগের প্রতিই অর্পিত হয়; নবাগত লোকের পক্ষে সে সকল কার্য্যের ভারপ্রাপ্ত হইবার সম্ভাবনা নাই। ধর্ম্মসমাজেও তাহাই দেখা যায়। যাঁহারা সাধন ভজনাদি দ্বারা বিশেষ অগ্রসর, যাঁহারা ধর্ম্মজীবন গঠনে অপর সাধারণকে সাহায্য করিতে সমর্থ, তাঁহাদিগকেই সেই সকল কার্য্যের ভার দেওয়া হয়, ধর্ম্মসমাজে নিয়মতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত বলিয়া সকলেই যে উপদেষ্টার আসন গ্রহণ করেন তাহা নয়। সে বিষয়ে যাঁহারা সক্ষম তাঁহাদের পরামর্শ ও উপদেশ অনুসারেই কার্য্য হয়। অপরাপর স্থলে যেমন

ব্রাহ্মমিশন প্রেসের
১ম ছয় মাসের হিসাব

আয়		ব্যয়	
ছাপাই (যত টাকার		মুদ্রাঙ্কন, কাগজাদি বাবদে	
কাজ হইয়াছে)	১৯৮২৶০	যাহা অপরকে ধার দেওয়া	
১ম ত্রৈঃ ১০৮০॥৶০		হইয়াছে	২৩৩৫৸৫
২য় ত্রৈঃ ৮৮১॥০		১ম ত্রৈঃ ১৩৪৩৶১৫	
আদায়	২১৬০।/০	২য় ত্রৈঃ ৯৯২॥১০	
১ম ত্রৈঃ ১১৮৪৶৫		বেতন	১১৮৩।০
২য় ত্রৈঃ ৯৭৬৶১৫		১ম ত্রৈঃ ৬৪১৶৫	
প্রেসপ্রস্তত হিঃ	২২১৲	২য় ত্রৈঃ ৫৪২৲১৫	
১ম ত্রৈঃ ১১৩॥০		সরঞ্জামি	১৩৫।৶৭॥
২য় ত্রৈঃ ১০৭॥০		১ম ত্রৈঃ ৭৪॥০	
গৃহ প্রস্তত হিঃ	৬০৲	২য় ত্রৈঃ ৬০৸৶৭॥	
১ম ত্রৈঃ ৩০৲		বিবিধ	৫১।৶১০
২য় ত্রৈঃ ৩০৲		১ম ত্রৈঃ ৩৫৶৫	
বিবিধ	৩৬৸৶০	২য় ত্রৈঃ ১৭।/৫	
১ম ত্রৈঃ ৩৫।১০		ডাকমাশুল	১।/৫
২য় ত্রৈঃ ১॥/১০		১ম ত্রৈঃ ।৶৫	
হাওলাত জমা	১৫৬৬।/৫	২য় ত্রৈঃ ৸৶০	
১ম ত্রৈঃ ৮৩৬॥৶৫		গৃহ প্রস্তত	৫৶১০
২য় ত্রৈঃ ৭১৯॥৶০		২য় ত্রৈঃ ৫৶১০	
		সুদ	১৫১॥০
	৬০০৬॥৶৫	১ম ত্রৈঃ ৭৫৲	
গত বর্ষের স্থিত	৪৶১৫	২য় ত্রৈঃ ৭৬॥০	
	———	বাটীভাড়া	৬০৲
	৬০১০৸৶০	১ম ত্রৈঃ ৩০৲	
		২য় ত্রৈঃ ৩০৲	
		ওয়ারেণ্টিয়ার	১৯০॥
		১ম ত্রৈঃ ১০২॥০	
		২য় ত্রৈঃ ৮৮৲	
		প্রেস প্রস্তত	৬৯।৫
		১ম ত্রৈঃ ১॥৶০	
		২য় ত্রৈঃ ৬৭॥/৫	
		হাওলাত শোধ	১৮০৯৸১৫
		১ম ত্রৈঃ ৯৪৮॥৶১০	
		২য় ত্রৈঃ ৮৬১৶৫	
			৫৯৯৪।৶১৭॥
		লাইসেন্স	১২৲
			—
			৬০০৬।৶১৭॥
		স্থিত	৪।৶২॥
			———
			৬০০৸৶১০

পাঁচফুলের সাজি।

১। Marcus Aurelius.—

"Wander at random no longer Alas! You have no time left to peruse your diary to read over the Greek and Roman history, or so much as your own common-place book, which you collected to serve you when you were old. Hasten then towards the God. Do not flatten and deceive yourself. Come to your own aid while yet you may, if you have a kindness for yourself."

লক্ষ্যহীনভাবে আর বিচরণ করিও না। হায়! তোমার দৈনন্দিন লিপি পাঠ করিবার, গ্রীক এবং রোমান্ ইতিহাস পুনরায় অধ্যয়ন করিবার বা এমন কি বৃদ্ধ হইলে তোমার উপকার হইবে বলিয়া যে বহু বিষয়িণী পুস্তিকা সঙ্কলিত করিয়াছিলে, তাহাও পাঠ করিবার সময় অবশিষ্ট নাই। ত্বরায় গন্তব্য স্থানের দিকে গমন কর। আত্মশ্লাঘা করিও না এবং আত্ম-প্রতারিত হইও না। যদি আপনার প্রতি দয়া থাকে, তবে সময় থাকিতে থাকিতে আপনার সহায়তা কর।

২। Epictetus.—

"Think of God oftener than you breathe. Let discourse of God renewed daily more surely than your food."

শ্বাস প্রশ্বাস লওয়া অপেক্ষা অধিকবার ঈশ্বরের বিষয় চিন্তা করিও। প্রত্যহ আহারাপেক্ষা নিশ্চিন্তরূপে ভগবৎ প্রসঙ্গ পুনঃপুনঃ আলোচিত হইতে থাকুক।

৩। Shelley.—

Time.

Unfathomale sea, whose waves are years!
Ocean of time, whose waters of deep woe.
Are brackish with the salt of human tears!
Thou shoreless flood which in thy ebb and flow.
Claspest the limits of mortality;
And, Sick of prey yet howling on for more,
Vomitest on its inhospitable shore!
Treacherous in calm, and terrible in storm,
Who shall put forth on thee,
Unfathomable sea?

হে অতলস্পর্শ সমুদ্র, বর্ষগণ তোমার তরঙ্গ! হে কাল-জলধি, তোমার গভীর বিষাদের জলরাশি মানবাশ্রুতে লবণাক্ত! হে অকূল তরঙ্গোচ্ছ্বাস তুমি তোমার জোয়ার ভাটাতে নশ্বরত্বের সীমা সকলকে আলিঙ্গন কর, এবং বিনাশে বীতরাগ তথাচ আরও পাইবার জন্য বরণ করিয়া তোমার ধ্বংসাবশেষ সমূহ তাহার আতিথ্য বিহীন কূলে উদ্গীরণ করিয়া থাক, তুমি শান্তির সময়ে বিশ্বাসঘাতক এবং ঝটিকাকালে ভয়ানক, হে অতলস্পর্শ কালবারিধি, কে তোমাতে (জীবন-তরী ভাসাইবে) ভাসিবে?

ব্রাহ্মসমাজ।

প্রচার—শ্রীযুক্ত নবদ্বীপচন্দ্র দাস বরিশাল হইতে প্রত্যাগমনের সময় নোয়াখালীতে নিম্নলিখিত কার্য্যাদি করেন;—স্থানীয় টাউন হলে "সত্যধর্ম্ম কি?" এবং "কি উপায়ে ধর্ম্মলাভ করা যায়?" এই দুইটি বক্তৃতা করেন। স্থানীয় ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ বি, দে দুই দিনই উপস্থিত থাকিয়া আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন এবং পরিবারে পরিবারে উপাসনা উপদেশ আলোচনাদি করিয়া তথা হইতে যশোহর গমন করেন। তথায় পরিবারে উপাসনা, আলোচনা এবং বায়

লাইব্রেরিতে এক দিন "আমাদের কিসের অভাব" সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন।

গঙ্গার তীরবর্ত্তী বেলুর নামক গ্রামে গত ৩০শে জুলাই রবিবার আমাদের প্রচারক-দল গমন করিয়াছিলেন। সেখানে সংগীত সংকীর্ত্তন উপাসনা ও ব্যাখ্যা ও উপদেশাদি হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত নবদ্বীপচন্দ্র দাস উপাসনা ও শ্লোক অবলম্বনে উপদেশ দান করেন, এবং শ্রীযুক্ত শশিভূষণ বসু কিছু বলেন।

বর্ত্তমান মাসের প্রথম ভাগে সাধনাশ্রম হইতে শ্রীযুক্ত প্রকাশ দেব এবং বাবু হরিমোহন ঘোষাল মফঃস্বল গমন করিয়া নিম্নলিখিতরূপে কার্য্য করিয়াছেন :—

বর্দ্ধমান—শ্রীযুক্ত বাবু রাজগোপাল রায় নামক একজন পেন্সনপ্রাপ্ত ডেঃ মাজিষ্ট্রেটের গৃহে হরিমোহন বাবু ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ হইতে কিছু পাঠ এবং সঙ্গীত, সংকীর্ত্তন ও প্রার্থনা করেন। শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ দত্ত, শ্রীযুক্ত বাবু বিনোদবিহারী বসু মহাশয়-দিগের গৃহে উপাসনা করেন। ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে একদিন "বিল্বমঙ্গলের জীবন" সম্বন্ধে কথকতা করেন। বিল্বমঙ্গলের নবজীবন প্রাপ্তি, ভগবৎ-প্রেম ও সাধন-পথে সংগ্রাম প্রভৃতি বিষয়গুলি উজ্জ্বলরূপে বর্ণিত হইয়াছিল।

রামপুরহাট—স্থানীয় ব্রহ্মমন্দিরে শ্রীযুক্ত প্রকাশ দেব হিন্দিতে উপাসনা করেন ও উপদেশ দেন। সাপ্তাহিক উপাসনায় বাবু হরিমোহন ঘোষাল মন্দিরে উপাসনার কার্য্য করেন এবং বাইবেলের একটী উপদেশ উল্লেখ করিয়া কিছু বলেন একদিন বাবু মহেশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের গৃহে হরিমোহন বাবু উপাসনা করেন ও প্রকাশ দেব প্রার্থনা করেন।

নলহাটী—আমাদের বন্ধু শ্রীযুক্ত নীলকান্ত সিদ্ধান্ত মহাশয় এখানে রজনী বিদ্যালয় স্থাপন এবং হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা দ্বারা গরীবদিগের মধ্যে বিশেষরূপে কার্য্য করিতেছেন। এতদ্ভিন্ন কয়েকটি ব্রাহ্ম-বালিকার প্রতিপালন ও শিক্ষার ভারও গ্রহণ করিয়াছেন। নীলকান্ত বাবুর গৃহে প্রকাশ দেব হিন্দিতে উপাসনা করেন।

ভাগলপুর—শ্রীযুক্ত ব্রহ্মদে নারায়ণ মহাশয়ের গৃহে উপাসনা হয়, প্রকাশদেব জী হিন্দিতে উপাসনা করেন। স্থানীয় ব্রহ্মমন্দিরে একদিন হিন্দিতে উপাসনা হয়, প্রকাশ দেব জী উপাসনা করেন এবং উপনিষদের বচন উদ্ধৃত করিয়া উপদেশ দেন। একদিন শ্রীযুক্ত ব্রহ্মদেব নারায়ণ মহাশয়ের গৃহে আলোচনা সভা হয়। প্রকাশ দেবজী প্রার্থনা করেন। একটী প্রশ্নের উত্তরচ্ছলে স্থানীয় উকিল শ্রীযুক্ত বাবু নিবারণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও প্রকাশ দেব জী প্রভৃতি ব্রাহ্মধর্ম্ম ও তাহা সাধন সম্বন্ধে কিছু কিছু বলেন। শ্রীযুক্ত ব্রহ্মদেব নারায়ণের গৃহে হরিমোহন বাবু বিল্বমঙ্গলের জীবন বিষয়ে কথকতা করেন। ভাগলপুরস্থ বন্ধুগণ বিশেষতঃ শ্রীযুক্ত ব্রহ্মদেব নারায়ণ ইহাঁদের কার্য্যের অনেক সহায়তা করিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহা-দিগকে আন্তরিক ধন্যবাদ।

কাটিহার—রবিবার সন্ধ্যার পর সাপ্তাহিক উপাসনা হয়। বাবু হরিমোহন ঘোষাল উপাসনা করেন। ১৭ই জুলাই—অপরাহ্নে স্থানীয় ব্রহ্মমন্দিরে এক সভা হয়। প্রথমে একটি হিন্দী সঙ্গীত হইলে প্রকাশ দেব জী সংক্ষিপ্ত প্রার্থনাপূর্ব্বক হিন্দীতে "মুখে ধর্ম্মমত মানিলে হয় না, জীবনে সাধন করা চাই" এ বিষয়ে তেজস্বী ভাষায় বক্তৃতা করেন। তৎপর আর একটী হিন্দী সঙ্গীত হইলে হরিমোহন বাবু কিরূপে "এই ধর্ম্ম জীবনে সাধন করিতে হয়" এ বিষয়ে কিছু বলিয়া উপসংহার করেন। সভাতে বাঙ্গালী ও হিন্দুস্থানী প্রায় ৮০ জন লোক উপস্থিত ছিলেন। সকলেই মনোযোগের সহিত বক্তৃতাদি শ্রবণ করেন। তৎপর মন্দিরে হিন্দিতে উপাসনা হয়, প্রকাশ দেবজী আচার্য্যের কার্য্য করেন এবং প্রকৃত শান্তি কিসে পাওয়া যায় এ বিষয়ে উপদেশ দেন।

এতদ্ভিন্ন উপরোক্ত স্থান সকলে ব্রাহ্মধর্ম্মের পুস্তক বিক্রয় ও সাধনাশ্রমের জন্য দান সংগৃহীত হইয়াছে। এবং কেহ কেহ আমাদের কাগজের গ্রাহক হইয়াছেন। ইহাঁরা তথা হইতে পূর্ণিয়াতে গমন করেন। সেখানে গিয়া শ্রীযুক্ত প্রকাশ দেব জ্বররোগে আক্রান্ত হন। শ্রীযুক্ত বাবু পার্ব্বতীচরণ গুপ্তের গৃহে হরিমোহন বাবু একদিন কথকতা করেন, ও উপাসনাদি হয়। শ্রীযুক্ত প্রকাশ দেব পীড়িত হইয়াছিলেন বলিয়া, ইহারা সত্বর কলিকাতা প্রত্যাগমন করিয়াছেন।

শ্রাদ্ধ—পরলোক পুণ্যদাপ্রদাদ সরকারের আদ্যশ্রাদ্ধ গত ২২শে জুলাই ব্রহ্মমন্দিরে সম্পন্ন হইয়াছে। বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত আচার্য্যের কার্য্য করেন। বাবু কালীচন্দ্র ঘোষাল পুণ্যদা বাবুর সংক্ষিপ্ত জীবনচরিত পাঠ করেন। তাঁহার অনাথা স্ত্রী শ্রীমতী রজতবালা সরকার একটি শিশুসন্তান সহ এখন ব্রাহ্মবন্ধুগণের আশ্রয়ে আছেন। ব্রাহ্মসবন্ধুগণ তাঁহার সম্পূর্ণ ব্যয়ভার বহন করিতে প্রস্তুত রহিয়াছেন; কিন্তু তিনি সাধারণের সাহায্যে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করা অপেক্ষা শিক্ষয়িত্রী অথবা তদ্রূপ অন্য কোনও কার্য্য দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করা ভাল মনে করেন। অতএব যাহাতে তিনি উপযুক্ত রূপে শিক্ষা-লাভ করিতে পারেন, আমাদের সেই উপায় বিধান করিয়া দিতে হইবে। আশা করি সকলেই এ বিষয়ে সাহায্য করিবেন।

আমাদের শ্রদ্ধেয় বন্ধু বাবু গুণাভিরাম বড়ুয়া রায় বাহাদুরের প্রথম পুত্র জ্বররোগে পুরলীয়ানামক স্থানে মানবলীলা সংবরণ করিয়াছেন। এই বৃদ্ধ বয়সে অল্প দিনের মধ্যে বড়ুয়া মহাশয় কয়েকবার শোকের আঘাত পাইলেন। প্রথমতঃ তাঁহার কন্যা (ডাঃ নন্দকুমার রায়ের স্ত্রী) বিধবা হন, তৎপর সহধর্ম্মিণী পরলোক গমন করেন, এবার প্রথম পুত্রটি হারাইলেন। অপর লোক হইলে এরূপ নিদারুণ শোকের আঘাতে ভাঙ্গিয়া পড়িতেন; কিন্তু বড়ুয়া মহাশয়ের বিশ্বাস ও ভক্তি তাঁহাকে এই কঠোর পরীক্ষাতেও সুস্থির রাখিয়াছে। বায়ুর আঘাতে কদলী বৃক্ষই ভূপতিত হইয়া থাকে, সুদৃঢ় পর্ব্বতকে টলাইতে পারে না। গত ২২শে জুলাই পরলোক গত আত্মার কল্যাণার্থ কলিকাতায় ডাঃ মোহিনীমোহন বসুর বাটিতে উপাসনা হয়। শ্রীযুক্ত নবদ্বীপ চন্দ্র দাস আচার্য্যের কার্য্য করেন। বড়ুয়া মহাশয়ের প্রার্থনা

অতি প্রাণস্পর্শী হইয়াছিল। তাঁহার বিশ্বাস ও ভক্তিভাব দেখিয়া উপাসকগণ তৃপ্ত হইয়াছিলেন। পরমেশ্বরের প্রতি নির্ভর করিয়া কিরূপে শোকে দুঃখে অবিচলিত থাকিতে হয়, এই বৃদ্ধ সাধকের জীবন তাহার দৃষ্টান্ত স্থল। শ্রাদ্ধ উপলক্ষে তিনি ব্রাহ্মসমাজের নানা বিভাগে ৩০৲ টাকা দান করিয়াছেন।

শ্রীমান্ শ্রীরঙ্গবিহারী লালের খুল্লপিতামহের আদ্য শ্রাদ্ধ গত ২৬শে জুলাই ২১০।৫ নম্বর ভবনে সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত নবদ্বীপচন্দ্র দাস আচার্য্যের করেন। এতদুপলক্ষে শ্রীমান শ্রীরঙ্গবিহারী সাঃ ব্রাঃ সমাজে ২৲ দাতব্য বিভাগে ২৲ সাধনাশ্রমে ২৲ দাসাশ্রমে ২৲ এবং অনাথাশ্রমে ২৲ মোট ১০৲ টাকা দান করিয়াছেন।

গত ৩০শে জুলাই বেণেটোলা ২৪৫।৪নং ভবনে বাবু প্রসন্নকুমার কুণ্ডের পিতার আদ্য শ্রাদ্ধ সম্পন্ন হইয়াছে। ডাঃ জে, এন, মিত্র আচার্য্যের কার্য্য করেন। পরমেশ্বর পরলোকগত আত্মাদিগের কল্যাণ বিধান করুন।

নামকরণ—২২শে জুলাই, কলিকাতা ২১৭ নং ভবনে বাবু অধরচন্দ্র মিত্রের কন্যার নামকরণ হইয়াছে। বাবু আদিনাথ চট্টোপাধ্যায় উপাসনা করেন। বালিকার নাম সুরীতি রাখা হইয়াছে।

শিলঙ্গের বাবু মথুরানাথ নন্দীর দুইটি পুত্রের নামকরণ হইয়াছে। এতদুপলক্ষে বাবু নীলমণি চক্রবর্ত্তী আচার্য্যের কার্য্য করেন। প্রথম পুত্রের নাম হিতেন্দ্র এবং দ্বিতীয়টির নাম ক্ষীতেন্দ্র রাখা হইয়াছে। পরমেশ্বর শিশুদিগের কল্যাণবিধান করুন।

বরিশালের কার্য্যবিবরণ—বরিশাল হইতে জনৈক ব্রাহ্মবন্ধু নিম্নলিখিত কার্য্যবিবরণ প্রেরণ করিয়াছেন ;—

জাতকর্ম্ম—শ্রীযুক্ত বাবু নিবারণচন্দ্র দাস মহাশয়ের পুত্রের জাতকর্ম্মোপলক্ষে ব্রহ্মোপাসনা হয়। বাবু কালীমোহন দাস মহাশয় আচার্য্যের কার্য্য করেন। নিবারণ বাবু বরিশাল ব্রাহ্মসমাজে ১৲ টাকা দান করিয়াছেন।

বিবাহ—বরিশালনগরে পরলোকগত ডাক্তার জগৎচন্দ্র গুপ্ত মহাশয়ের ২য় পুত্র শ্রীমান্ বিনয়ভূষণ গুপ্তের সহিত কলিকাতা প্রবাসী শ্রীযুক্ত রাধিকাপ্রসাদ মৈত্রের ১মা কন্যা শ্রীমতী কুমারী ইন্দুমতীর শুভবিবাহ হইয়াছে। শ্রীযুক্ত বাবু কালীমোহন দাস আচার্য্যের কার্য্য করেন। বিবাহ ১৮৭২ সালের ৩ আইন মতে রেজেষ্টরি হইয়াছে। এতদুপলক্ষে বিনয় বাবুর মাতা বরিশাল ব্রাহ্মসমাজে ৫৲ টাকা দান করিয়াছেন।

শ্রাদ্ধ—বরিশাল নিবাসী বাবু বামনচন্দ্র গাঙ্গুলীর পরলোকগত শ্বশুর কালীমোহন রায় চৌধুরীর আদ্য শ্রাদ্ধোপলক্ষে ব্রহ্মোপাসনা হইয়াছে। বাবু দ্বিজদাস দত্ত আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছেন।

বরিশাল নিবাসী বাবু চণ্ডীচরণ গুহের পিতামহের আদ্য শ্রাদ্ধোপলক্ষে ব্রহ্মোপাসনা হইয়াছে। বাবু কালীমোহন দাস উপাসনা করিয়াছেন। এতদুপলক্ষে চণ্ডী বাবু দাসাশ্রমে ১৲ টাকা দান করিয়াছেন।

বরিশাল ব্রাহ্মসমাজের ৩২শৎ জন্মোৎসব—৯ই আষাঢ় বৃহস্পতিবার সন্ধ্যার সময় উৎসবের উদ্বোধন হয়। বাবু মনোমোহন চক্রবর্ত্তী আচার্য্যের কার্য্য করেন।

১০ই আষাঢ় শুক্রবার—বরিশাল ব্রাহ্মসমাজের জন্মদিন। প্রাতে ও সন্ধ্যাকালে উপাসনা, সঙ্গীত সঙ্কীর্ত্তন হয়। দুবেলাই বাবু কালীমোহন দাস আচার্য্যের কার্য্য করেন। মধ্যাহ্নে পাঠ, আলোচনা, সঙ্গীত, সঙ্কীর্ত্তনাদি হয়।

১১ই আষাঢ় শনিবার—প্রাতে উপাসনা, সঙ্গীত ও সংকীর্ত্তন হয়। বৈকালে "ব্রাহ্মধর্ম্ম ও ব্রাহ্মসমাজ" সম্বন্ধে বক্তৃতা হয়। বাবু মনোমোহন চক্রবর্ত্তী উপাসনা ও বক্তৃতা করেন।

দান—আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি যে, নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে নিম্নলিখিতরূপ দান করিয়াছেন :—বাবু কান্তিচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রচার বিভাগে ১৲ ও খাসিয়া প্রচার ভাণ্ডারে ১৲, বাবু রজনীকান্ত সরকার প্রচার বিভাগে ২৲, বাবু গুরুদয়াল রায় ৪৲, মিঃ এল, এন চৌধুরী সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে ৫৲, সাধনাশ্রমে ৫৲।

ভ্রমসংশোধন—নোয়াখালী হইতে বাবু রজনীকান্ত রায় লিখিয়াছেন, "গত ১লা শ্রাবণের তত্ত্বকৌমুদীতে আমার অগ্রজ শ্রীযুক্ত বাবু হরকান্ত বসুর পুত্রের নামকরণের বিবরণে ২টী ভ্রম দেখা গেল।" ১ম বালকের নাম "সোহিনীকান্ত" রাখা হইয়াছে "মোহিনীকান্ত" নহে। ২য় তিনি নামকরণ উপলক্ষে ৫৲ পাঁচ টাকা দান করিয়াছেন—ঢাকা পূর্ব্ববাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজে ১৲ টাকা, নোয়াখালী সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে ১৲ টাকা এবং কলিকাতার সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ ও আশ্রমে ৩৲ টাকা গত ২রা জুলাই রবিবার নামকরণ হইয়াছে।

পুরস্কার বিতরণ—মান্দ্রাজের ব্রাহ্মবন্ধুগণের তত্ত্বাবধানে গরিব বালক বালিকাদিগের একটী স্কুল আছে। সম্প্রতি রাজা বাশগজপতি রায় বাহাদুর স্কুলের ষষ্ঠ বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে গরিব বালক বালিকাদিগকে বস্ত্র দান করিয়াছেন। স্কুলের তত্ত্বাবধারকগণ এতৎ সংসৃষ্ট একটী বোর্ডিং খুলিবার সংকল্প করিয়াছেন। আমরা তাঁহাদের সাধুসংকল্পের জন্য ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। ব্রাহ্মদিগের তত্ত্বাবধানে বালক বালিকাদিগের জন্য বোর্ডিং স্কুল যত স্থাপিত হইবে, ততই সমাজের মঙ্গল।

২১১নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, ব্রাহ্ম মিশন প্রেসে শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দত্ত কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

ধর্ম্ম ও সমাজতত্ত্ব বিষয়ক পাক্ষিক পত্রিকা।

৯ম সংখ্যা
১৬শ ভাগ।

১লা ভাদ্র, বুধবার, ১৮১৫ শক, ব্রাহ্ম সম্বৎ ৬৪।

বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২॥০
মফস্বলে ৩
প্রতি খণ্ডের মূল্য ৵০

আত্ম-সমর্পণ।

কতই বলিনু! বাক্যে হইনু প্রাচীন,
তব দয়া ঘোষিয়া জগতে;
তবু হে বিশ্বাস কেন অতিশয় ক্ষীণ,
কেন ডরি যেতে তব পথে?

কত প্রিয় সম্বোধনে সম্বোধি তোমায়,
প্রাণ মন চরণে ঢালিয়া;
কি হবে সে মিষ্ট ভাষা, যদি অসহায়,
দেখি নিজে বিপদে পড়িয়া?

তুমি সত্য, কি হবে এ সত্য সম্বোধনে,
সত্যে যদি না হলো নির্ভর?
জীবন-সংগ্রামে শক্তি দেয় না যে ধনে,
সে ধনে না ধন ভাবে নর।

যদি হে নির্ভর মোর রহিল জগতে,
যদি আশা পার্থিব সম্বলে,
তবে কেন তব দয়া ঘুষি নানামতে,
কেন ডাকি সত্য সত্য বলে?

দেও হে বিশ্বাস-আঁখি এ মোহ আঁধারে;
করি আমি সত্যের সাধনা;
যে শক্তি পালিছে এই নিখিল সংসারে,
তারি ক্রোড়ে সঁপিহে আপনা॥

সম্পাদকীয় মন্তব্য।

বন্ধন-জাল—গুটিপোকা যখন আপনার দেহ হইতে রস বিনির্গত করিয়া আপনার কোষ নির্ম্মাণ করিতে থাকে, তখন এক বিচিত্র ব্যাপার দৃষ্ট হয়। সে ক্রমে ক্রমে আপনার রচিত কারাগারেই আবদ্ধ হয়। মানুষও সেইরূপ নিরন্তর আপনার রচিত কারাগারে আপনিই আবদ্ধ হইতেছে। মানব আপনাকে আবদ্ধ করিবার জন্ত আপনি নানাপ্রকার জাল সৃষ্টি করে। কেহ কেহ শব্দের জালে জড়িত হইয়া আবদ্ধ হয়। উপাসনা ও প্রার্থনার ভাষাকেই প্রকৃত ঈশ্বরারাধনা জ্ঞান করিয়া সেই ভাষাতেই সন্তুষ্ট থাকে, তাহাতেই আত্মতৃপ্ত হয়, এবং ভাষার অতীত আর কিছুর জন্ত তাহাদের প্রাণ ব্যাকুল হয় না। এইরূপে প্রাচীন সাধকদিগের মধ্যে অনেকে মুখে একটী নাম মাত্র বার বার উচ্চারণ করিয়া ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠ কার্য্য হইল বলিয়া মনে করেন। কেহ কেহ ভাবের জালে আবদ্ধ হন। তাঁহারা যখন ঈশ্বর চিন্তাতে বা তাঁহার গুণ কীর্ত্তন বা শ্রবণে নিযুক্ত হন, তখন তাঁহাদের হৃদয়ে এক প্রকার ভাবোদ্রেক হইতে থাকে। এই ভাব-প্রবণতা প্রকৃতিসিদ্ধ গুণ। কাহার কাহারও প্রকৃতিতে ভাবপ্রবণতা কিছু অধিক পরিমাণে দৃষ্ট হয়। এই ভাবপ্রবণ ব্যক্তিগণ যখন ভাবোচ্ছ্বাসের সুখ সম্ভোগ করিতে থাকেন, তখন তাহাকেই ধর্ম্মের চরমাবস্থা বলিয়া মনে করেন। ভাব তাঁহাদের মনের চারিদিকে একপ্রকার জাল বিস্তার করে, যাহাতে তাঁহাদের দৃষ্টি আবদ্ধ হইয়া যায়। তাঁহারা ভাবেই তৃপ্ত হইয়া সন্তোষ লাভ করেন। আবার বাহিরের ক্রিয়া কাহার কাহারও পক্ষে বন্ধন জাল স্বরূপ! তাঁহারা কতকগুলি ধর্ম্মের বাহিরের নিয়ম পালন করিতেছেন এবং তাহাকেই ধর্ম্মজ্ঞানে তৃপ্ত হইয়া আছেন। সেই বাহ্যক্রিয়া অন্তরকে স্পর্শ করিতেছে কি না, হৃদয়কে সমুন্নত করিতেছে কি না, সে বিষয়ে তাঁহাদের দৃষ্টি নাই। বাহিরের নিয়ম পালন করিয়াই তাঁহারা সন্তুষ্ট। ইহাও তাঁহাদের পক্ষে একপ্রকার জালস্বরূপ। আমরা যখনই অনবহিত হই, বাহিরের বিষয়ে ব্যাপৃত হইয়া আত্ম দৃষ্টি বিহীন হই, তখনি অজ্ঞাতসারে এই সকল জাল আমাদের চিত্তকে আবদ্ধ করে। আমরা ঘোর ভ্রান্তির মধ্যে পড়িয়া আত্মবিস্মৃত হইয়া থাকি। ঈশ্বরকে সত্যস্বরূপ বলি, দয়াময় বলি, পিতা মাতা বলি, অথচ তাঁহার প্রতি সে প্রকারে নির্ভর করিতে পারিতেছি কি না সে দিকে দৃষ্টিই থাকে না। বাহিরে একটা ধর্ম্মের ব্যাপার ও সাধন চলিতে থাকে, অথচ অন্তরে শূন্যতা—অসারতা—নির্ভরহীনতা। এই শোচনীয় অবস্থা হইতে ঈশ্বর আমাদিগকে উদ্ধার করুন।

মতদ্বৈধ—ব্রাহ্মদের মধ্যে যখন এই অল্প সময়েতেই মতের ভিন্নতা প্রযুক্ত তিন দল হইয়াছে, তখন বাহির হইতে

দেখিয়া অনেকে যে ব্রাহ্মসমাজের স্থায়িত্ব বিষয়ে সন্দেহ করিবেন ইহা কিছু আশ্চর্য্যের বিষয় নয়। ইহারই মধ্যে যখন এরূপ ঘটিল তখন কিছু দীর্ঘকাল গেলে না জানি ইহার কত শাখা প্রশাখা নির্গত হইবে এবং এই সমাজ হীনবল হইতে হইতে শেষে কাল-গর্ভে বিলীন হইয়া যাইতে পারে এরূপ আশঙ্কা হৃদয়ে উদিত হওয়া কিছুই অস্বাভাবিক নহে। কিন্তু এরূপ চিন্তা কেবল ইহার বিরোধীদিগের পক্ষেই সম্ভব। কিন্তু যাঁহারা ইহার মধ্যে বাস করিতেছেন, তাঁহাদের পক্ষে কি স্বাভাবিক? যাঁহারা বিশ্বাসী তাঁহারা ইহার এই উত্তর দিবেন—ইহা যদি আমার তোমার জিনিস হইত, তবে তোমাদের আশঙ্কার কথা শুনিয়া ভাবিতাম। ইহার এই প্রথম উদ্যমেই যেরূপ অবস্থা দেখিতেছি তাহাতে ইহার স্থায়িত্ব সম্ভব বোধ হয় না; কিন্তু ইহা ত তোমার আমার জিনিস নয়; ইহা ঈশ্বরের জীবন্ত পরিত্রাণপ্রদ বিধি। করুণাময় ঈশ্বর এবার এই জীবন্ত সাক্ষাৎ ধর্ম্ম দ্বারা জীবকে উদ্ধার করিবেন। সুতরাং ইহাতে যতই মতদ্বৈধ দেখ না কেন, যতই ইহাকে দুর্ব্বল দেখ না কেন, জগতে আপনার শক্তিতে ইহা জয়যুক্ত হইবেই হইবে। আমাদের মধ্যে যাহারা বিশ্বাসী হইয়া পড়িয়া থাকিবে তাঁহারাই পরিত্রাণ লাভ করিবে। তবে কি শুধু বাহিরের লোকেরাই নিরাশার কথা বলেন এবং ঐ আশঙ্কার চক্ষুতে দেখেন? না তাহা নহে। ব্রাহ্মসমাজের ভিতরেও এরূপ লোক আছেন, যাঁহারা ইহাকে বিশ্বাসের চক্ষে দেখিতেছেন না, তাঁহারাও অন্তর্বিরোধ দেখিয়া সময়ে সময়ে নিরাশ হইতেছেন ও এমন কি অল্প কারণে বিরক্ত হইয়া সরিয়া পড়িতেছেন। এইরূপ অল্প বিশ্বাসী ব্যক্তিগণ সম্পূর্ণরূপে ইহার সহিত একীভূত হইতে চান না। ভয়ে ভয়ে এরূপভাবে অনুষ্ঠান করেন যাহাতে প্রাচীন দলে সহজে মিলিতে পারেন। তাঁহারা ধর্ম্মকে শ্রেষ্ঠ স্থান দিতে পারেন না; পৃথিবীর সুখ সম্পদ মান সম্ভ্রমকেই শ্রেষ্ঠ স্থান দিয়া থাকেন। এরূপ দুর্ব্বল বিশ্বাসী লোক সকল সমাজেই থাকিবে; তাহা দেখিয়া ভীত হইলে চলিবে না বরং তাহা দেখিয়া অপর সকলকে সাবধান ও উৎসাহী হইতে হইবে। পৃথিবীতে যথার্থ ধর্ম্ম রক্ষা করা, বিশ্বাস অনুসারে চলা অতিশয় কঠিন ব্যাপার বলিয়া সর্ব্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে।

আমরা এই মতদ্বৈধ দেখিয়া কিছু ভীত হই না, বরং অনেক সময় আনন্দিত হই। অনেক সময় ইহারই মধ্যে জীবনীশক্তির বিদ্যমানতা দেখি। মনে হয় ইহা বিধাতার জীবন্ত বিধি, ইহাতে কোন আবর্জ্জনা আসিতে পাইবে না। মতভেদের মধ্যে চিন্তাশীলতার পরিচয় পাওয়া যায়। বিশেষ যে ধর্ম্মে কোন অভ্রান্ত মনুষ্য বা গ্রন্থ নাই সেখানে মত ও রুচিগত বৈচিত্র্য থাকাই সম্ভব। যেখানে সে বৈচিত্র্য নাই, সেখানে কিঞ্চিৎ পরিমাণে মৃতভাব আসিয়াছে বলিয়া মনে হয়, তবে ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য এবং ইহা দেখিয়া আমাদিগকে সময়ে সময়ে অতিশয় দুঃখিত হইতে হইতেছে যে, মতগত পার্থক্যনিবন্ধন অনেক স্থলে হৃদয়েরও পার্থক্য ঘটিতেছে, প্রেমের পরিবর্ত্তে অপ্রেম জন্মিতেছে; তদ্দ্বারা সমগ্র মণ্ডলির ঘননিবিষ্টতা বিনষ্ট হইয়া যাইতেছে। তাহা মানবপ্রকৃতির দুর্ব্বলতাবশতঃ, আমাদের প্রকৃত ধর্ম্মজীবনের হীনতাবশতঃ। যাঁহারা এই প্রকার দুর্ব্বলতা ও হীনতা দর্শন করিয়া বিমর্ষ ও নিরাশ হইতে-ছেন, তাঁহাদিগকে একটী কথা সর্ব্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে। তাহা এই, ব্রাহ্মধর্ম্মের ও ব্রাহ্মসমাজের যে আদর্শ, তাহা অনেক পরিমাণে এদেশের পক্ষে নূতন। এই নূতন আদর্শ অনুসারে সমাজকে গঠন করা কি দুই দিনের কার্য্য? এরূপ কার্য্যে কত ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতার প্রয়োজন! আমাদের শরীর মনের মধ্যে, আমাদের প্রকৃতির মধ্যে কত দুর্ব্বলতার বীজ নিহিত হইয়া রহিয়াছে! সে সকল কি একদিনে উন্মূলিত হইতে পারে? আমরা যেরূপ মাল মসলা, এই মাল মসলাতে কার্য্য আরম্ভ করিতে গেলেই বহুকাল বার বার বিফলপ্রযত্ন হইতে হইবে। তাহাতে নিরাশ হইলে চলিবে না। এই বিশ্বের বিধাতার নিকট সহিষ্ণুতা শিক্ষা করিতে হইবে। তিনি এই জড়রাজ্যে কদর্য্যতার ভিতর হইতে সৌন্দর্য্য আবিষ্কার করিয়া-ছেন বটে, কিন্তু তাহা কত যুগের অবিশ্রান্ত বিবর্ত্তন ক্রিয়ার ফল। আমরা কি ইচ্ছামাত্র দুর্ব্বলকে সবল করিয়া লইতে পারি?

দ্বিতীয়তঃ যতই ব্রাহ্মগণ তাঁহাদের মূলমতের উপরে দণ্ডায়-মান হইয়া অপর সকল বিষয়ে পরস্পরের প্রতি উদার হইতে পারিবেন, ততই মতভেদনিবন্ধন প্রেমের বিচ্ছেদ অপনীত হইবে। এরূপ একটী প্রতিজ্ঞা প্রত্যেক ব্রাহ্মের অন্তরেই থাকা কর্ত্তব্য, যতক্ষণ মূলমতে ঐক্য আছে, ততক্ষণ কখনই মণ্ডলী হইতে বিচ্ছিন্ন হইব না বা কাহাকেও বিচ্ছিন্ন করিবার ইচ্ছা করিব না; তাহা করিলে অপরাধী হইব। একতার প্রতি একটা দৃষ্টি ও তাহা রক্ষার জন্য আগ্রহ প্রত্যেক ব্রাহ্মের অন্তরে থাকা আবশ্যক।

উপাসনাতে বিনয়—মানুষের কাছে বিনীত থাকিতে অনেকেই শিক্ষা করেন, কিরূপে বিনয় লাভ করা যায়, বিনয় লাভ করিতে হইলে লোকের সহিত কিরূপ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য ইত্যাদি বিষয় চিন্তা করেন, এবং যথাসাধ্য কার্য্যে পরি-ণত করিতে চেষ্টা করেন; কিন্তু ঈশ্বরের নিকট গমন করিতে এবং উপাসনার বাক্য উচ্চারণ করিতে যে তদপেক্ষা অধিক বিনয়ের প্রয়োজন এ কথা যেন অনেকেই চিন্তা করেন না। জেলার মাজিষ্ট্রেটের কাছে উপস্থিত হইতে গেলে, কেমন শান্ত শিষ্ট হইতে হয়, জিহ্বাকে সংযত করিয়া কথা বলিতে হয় তাহা সকলেই জানেন। মহান্ পরমেশ্বরের মন্দির-দ্বারে যাঁহারা উপ-স্থিত হইবেন, তাঁহাদের কি তদপেক্ষা অধিকতর সম্ভ্রম ও বিনয়ের সহিত কথা বলাও উপবেশন করা উচিত নহে? উপাসনায় বলা হইতেছে "আমি ঘোর পাপী, তুমি পরিত্রাণ কর।" কিন্তু সেই কথাগুলি এমন ভাবে উচ্চারিত হইতেছে যে, যেন তিনি জোর করিয়া ঈশ্বর হইতে পরিত্রাণ লাভ করিয়া লইবেন। পাপী হইয়া পরিত্রাণের জন্য প্রার্থনা করা, মহান্ পরমেশ্বরের সমীপে এরূপ বিষয়ে কথা বলিতে কতদূর বিনয়ের আব-শ্যক, তাহা উপাসক চিন্তা করেন না। সুতরাং অনেক সময় বক্তৃতার মত কথা বলিয়া যান। নিজের দুষ্কৃতি

স্মরণ হইলেই পরমেশ্বরের নিকট যাইতে ভয় হয়, এবং তাঁহার অপার করুণা মনে হইলে, ভক্তির উদয় হয় এই ভয় এবং ভক্তিই বিনয়ের প্রতিষ্ঠাতা। যেখানে ভয় ও ভক্তি নাই, সেখানেই হৃদয় বিনীত হয় না। স্বাভাবিক উপাসনা হইলে নিশ্চয় উপাসকের হৃদয় বিনয়ে অবনত হইবে। যেখানে প্রকৃত ভাব নাই, সেখানেই অহঙ্কারমূলক উচ্চ উচ্চ কথা। কিন্তু সকল কার্য্যই সাধনসাপেক্ষ। উপাসনা যেমন নিত্য সাধনার বিষয়,তদ্রূপ সমবেত উপাসনায় কিরূপে উপাসনা করিতে হয়, কিরূপে বিনয়ের সহিত বাক্য উচ্চারণ করিতে হয়, তাহাও সাধনের বিষয়। সাধন না করিলে, হৃদয়ের সদ্‌গুণ লাভ হয় না, বাক্য সংযত হয় না। বাস্তবিক সমবেত উপাসনায় অনেক সময় অবিনয়প্রসূত বাক্য বাহির হইয়া পড়ে, তজ্জন্য বিশেষ ব্রত অবলম্বন করা কর্ত্তব্য।

শ্রী মানব প্রকৃতির একটী শ্রেষ্ঠ ভূষণ। শ্রীমান্ পুরুষ ও শ্রীমতী নারী সকলেরই শ্রদ্ধার পাত্র। কিন্তু শ্রী কেবল শরীর সম্বন্ধে নহে, আত্মা-সম্বন্ধেও একপ্রকার শ্রী আছে। নিজ দেহকে অযথারূপে প্রদর্শন করা যেমন শ্রীর নিয়মবিরুদ্ধ, সেইরূপ নিজ আভ্যন্তরীণ ভাবরাশিকে অযথারূপে প্রদর্শন করাও আধ্যাত্মিক শ্রীবিরুদ্ধ। আমাদের উপাসনা ও প্রার্থনাদিতে অনেক সময়ে শ্রী বিহীনতা প্রকাশ পাইয়া থাকে। ঈশ্বরের পবিত্র সন্নিধানে উপদেষ্টার ন্যায় উচ্চ আসনে না বসিয়া প্রার্থীর ন্যায় নিম্ন আসনে বসাই শ্রী-সঙ্গত কার্য্য। এই সত্যটী স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য।

সরল পথ—ধর্ম্মরাজ্যের যাত্রীগণ চিরদিনই সরল পথে গমন করিয়া থাকেন। কুটিল লোকেরাই কুটিল পথ অবলম্বন করে, বিরোধীদিগের মতের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া চলে, সন্ধি স্থাপন করে। যাহা অসত্য, অনিষ্টকারী, মানবাত্মার বিষস্বরূপ তাহার সহিত আবার সন্ধিবন্ধন কি? দুঃখের বিষয় এই যে, এক সময় ব্রাহ্মগণ যে সকল দূষিত রীতি নীতিকে পাপ ও কুসংস্কার বোধে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, যে সকল আচরণের ছায়া স্পর্শ করিতে কুণ্ঠিত হইতেন, যে সকল ভাব অবলম্বন করা ধর্ম্মসাধনের পক্ষে ক্ষতিজনক বলিয়া উপদেশ দিতেন, এখন অনেকেই আবার সেই সকল বিরোধী ভাব গ্রহণ করিতেছেন। প্রাচীন সমাজের সহিত সন্ধিবন্ধন করাই যেন তাঁহাদের উদ্দেশ্য। তাঁহাদের কার্য্যে যেন ইহাই প্রকাশ পায় যে, প্রাচীন সমাজের সহিত সন্ধিবন্ধন না হইলে ব্রাহ্মসমাজ টিঁকিবে না। কেহ কেহ প্রবন্ধে, বক্তৃতায় এবং আলোচনায়ও এরূপ ভাবের কথা প্রকাশ করিতেছেন। এই অবস্থায় পতিত হইয়া সরল ধর্ম্মসাধকগণ যেপথ অবলম্বন করিয়াছেন, আমাদের তাহা চিন্তাকরা কর্ত্তব্য এবং তদনুসরণ করাই ধর্ম্মসঙ্গত।

একদিন মহাত্মা মহম্মদ কাবা মন্দিরে কোরাণের বচন পাঠ করিতেছিলেন। বিরোধী কোরেশগণ তাহা শ্রবণ করিতেছিল। "অনন্তর তোমরা কি লাভ ও গরি এবং তৃতীয় মনাতকে (কোরেশদিগের পৌত্তলিক দেবতা) দেখিয়াছ?" ইত্যাদি বচন পাঠ করিয়া পরিচ্ছেদ সমাপ্ত করেন এবং যথারীতি পরমেশ্বরের নিকট মস্তক অবনত করেন। কোরেশগণ ভাবিল যে, মহম্মদ তাহাদের দেবতাকে স্বীকার করিয়া নমস্কার করিলেন। ইহা ভাবিয়া তাহারা সকলে আনন্দিত হইল। কোরেশদল সর্ব্বোপরি এক অনাদ্যনন্ত পরমেশ্বরকে বিশ্বাস করিতেন। যেমন হিন্দুগণ বলেন যে, একমাত্র সত্যস্বরূপ চিন্ময় পরব্রহ্ম হইতে সকল দেবতার সৃষ্টি হইয়াছে। অর্থাৎ নিরাকার ব্রহ্ম আছেন এ কথাও সত্য এবং তৎ-সৃষ্ট ইন্দ্র চন্দ্রাদি দেবতা আছেন,তাহাও সত্য। সাকার নিরাকার উভয়ই সত্য। কোরেশগণ ঠিক এইরূপ বিশ্বাস করিত। এক নিরাকার ঈশ্বর তাহাদের লাভ ও গরি প্রভৃতি দেবতাকে সৃষ্টি করিয়াছেন, ইহাই তাহাদের ধর্ম্মবিশ্বাস ছিল। সুতরাং মহম্মদ যখন তাহাদের লাভ গরিকে স্বীকার করিলেন, তখন তাহারা মহম্মদের নিরাকার ঈশ্বরকে স্বীকার করিবে আশ্চর্য্য কি? এই দিন হইতে কোরেশদল মহম্মদের কার্য্যের সহায়তা করিতে লাগিল। দুই দলে—সাকার নিরাকারে মিলন হইল। মক্কায় শান্তি স্থাপিত হইল। চতুর্দ্দিকের লোকে জানিল যে, বিবাদ নিষ্পত্তি হইয়া গিয়াছে। কিন্তু অল্প দিনের মধ্যেই মহম্মদ বুঝিতে পারিলেন যে, কোরেশদল তাঁহার সহিত কি ভাবে যোগদান করিতেছে, কি ভাবে তাহার দল পুষ্টি করিতেছে। তখন মহম্মদ কোরেশ দলপতিকে ডাকিয়া কহিলেন;—"আপনারা আমার সম্বন্ধে যাহা মনে করিয়াছেন, তাহা অসত্য, আমি আপনাদের দেবতাকে স্বীকার করি নাই এবং সম্মান দানও করি নাই, সম্মান দিতেও প্রস্তুত নহি, একমাত্র ঈশ্বর ভিন্ন কেহ উপাস্য নাই।" কোরেশ দলপতিগণ মহম্মদের এই উক্তি শ্রবণ করিয়া মহা ক্রুদ্ধ হইল। পুনরায় বিবাদানল প্রজ্বলিত হইল। মহাত্মা যীশু দেবমন্দিরে প্রবেশ করিয়া মন্দিরের জিনিস পত্র ভাঙ্গিয়া ছিলেন। বাস্তবিক সরল ধার্ম্মিকদিগের নিকট কোনও প্রকার অসত্য ও কুসংস্কার তিষ্ঠিতে পারে না। ব্রাহ্মগণ এক সময় এ বিষয়ে অতি সৎ দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছিলেন; কিন্তু এখন আর কুসংস্কারের প্রতি তেমন ঘৃণা নাই, বরং অনেক কুসংস্কারের সহিত সন্ধি করিতে প্রস্তুত হইতেছেন। এ অবস্থা সরলতার অবস্থা নহে, ইহা সাংসারিক বুদ্ধিমূলক; ইহাতে ধর্ম্মজীবনের অধোগতিই হইতে থাকিবে।

প্রেমসাধন—সকল ধর্ম্মশাস্ত্র, সকল মহাজন, সকল সম্প্রদায়ের লোকেই উচ্চৈঃস্বরে বলিতেছেন "প্রেম সাধন কর, প্রেমেতেই ধর্ম্ম, প্রেমেই মুক্তি।" বাস্তবিক, জগতে যেখানে অপ্রেম, অশান্তি, সেখানে ধর্ম্ম থাকে না। কিন্তু জীবনে এই মহাব্রত পালন করা বড়ই কঠিন। স্বার্থকে পদদলিত করিয়া অন্যের সুখ ও সুবিধা বিধান করা, নিজের মান মর্য্যাদার প্রতি না চাহিয়া কেবল পরকে সুখী করিবার চেষ্টা করা বড়ই গুরুতর কার্য্য। একজন লোক অভ্যাসের গুণে দুই ঘণ্টা ধ্যানে বসিতে পারে বা কর্ত্তব্যের অনুরোধে দেশহিতকর কার্য্য করিতে পারে; কিন্তু প্রাণ দিয়া ভাল বাসিতে, নিন্দকের দুর্ব্বাক্য শির পাতিয়া গ্রহণ করিতে পারা বড় কঠিন কার্য্য। প্রত্যেকের দৈনিক জীবনে নিয়ত এবিষয় পরীক্ষিত হইতেছে। সংসারের

লোকে প্রতিদিন অপরের নির্যাতন, উৎপীড়ন এবং নিন্দা সহ্য করিতেছে। নিন্দকের কথা তীক্ষ্ণ বাণের ন্যায় হৃদয় বিদ্ধ করিতেছে, লোকের অবিচার, পক্ষপাতে কত লোকে জ্বালা যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে। যে সংসারে কেবলই দোষ অনুসন্ধান, নিন্দা, বাকবিতণ্ডা, পরশ্রীকাতরতা, স্বার্থপরতা, কলহ, রক্তপাত ইত্যাদি নিরন্ত ঘটিতেছে, সেখানে সর্ব্বোপরি প্রেমকে রক্ষা করা বড়ই কঠিন।

কেহ একটি সাধুকার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। জনসমাজের হিতসাধনই তাঁহার উদ্দেশ্য, এজন্য নিজের শক্তি সামর্থ্য প্রয়োগ করিয়াছেন। কিন্তু নিন্দকের জিহ্বা তাঁহারও দুর্নাম রটনা করিতে ছাড়িতেছে না। দুর্ব্বল মানুষ নিন্দার স্রোতে কয়দিন সুদৃঢ় থাকিতে পারে? এমন ব্যক্তিরও চিত্ত অপ্রেমে উত্তেজিত হয়। বাস্তবিক এই জ্বালাময় সংসারে প্রেমের শীতল বারি দ্বারা যাঁহার হৃদয় নিয়ত বিধৌত হইতেছে, তিনি ভিন্ন কেহই শান্তিলাভ করিতে পারেন না। এ সম্বন্ধে চৈতন্যদেবের সাধু দৃষ্টান্ত সকলেরই অনুকরণীয়। রামচন্দ্র পুরী মহা নিন্দক ছিল। সে নীলাচলে যেখানে সেখানে বেড়াইত এবং নিজে ভিক্ষা করিয়া খাইত; কিন্তু কোন বৈরাগী কত খায়, কিরূপে বাস করে, তাহারও সন্ধান লইত। এ সময় চৈতন্য নীলাচলে ছিলেন। সে বিশেষভাবে "চৈতন্যের অবস্থিতি, রীতি, নীতি, ভিক্ষা, শয়ন, আচরণ সম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপ সন্ধান লইতে লাগিল। তখন চৈতন্যের জন্য চারি পণ কাড়ির প্রসাদ আসিত, তাহা চারি জনে খাইতেন। রামচন্দ্র বলিয়া বেড়াইতে লাগিল যে, "চৈতন্য মিষ্টান্ন খায়, মিষ্টান্ন সেবনে সন্ন্যাসীর জিহ্বার দোষ জন্মে। চৈতন্যের চাল চলন বিলাসীর মত।" চৈতন্যের বাসস্থানে রামচন্দ্র প্রতিদিন যাইত। চৈতন্য তাহার নিন্দা-বাক্য শুনিয়াও কিছুমাত্র বিচলিত হইতেন না। পূর্ব্ববৎ তাহাকে আদর সম্মান করিতেন।

একদিন রামচন্দ্র প্রাতঃকালে চৈতন্যের ঘরে কতকগুলি পিপীলিকা দেখিয়া বলিয়া উঠিলেন "রাত্রিতে এখানে মিষ্টান্ন আসিয়াছিল, তাহাতে এত পিপড়া বেড়াইতেছে। হায় বিরক্ত সন্ন্যাসীদিগের একি ইন্দ্রিয় লালসা।" চৈতন্য মিষ্টান্ন ভোজন করিতেন না তিনি সামান্য প্রসাদ ভক্ষণ করিতেন। কিন্তু রামচন্দ্র পুরীর ঐ মিথ্যাবাদে তিনি বিরক্ত হওয়া দূরে থাকুক বরং গোবিন্দকে ডাকিয়া কহিলেন "আমার জন্য অদ্য হইতে অল্প প্রসাদ আনিবে।" একথা ভক্তমণ্ডলীতে রাষ্ট্র হইলে সকলে মহা দুঃখিত হইলেন। চৈতন্য অৰ্দ্ধাশনে দিন দিন শুকাইয়া যাইতে লাগিলেন।

ভক্তগণ সকলে মিলিত লইয়া চৈতন্যকে কহিলেন "রামচন্দ্র পুরী অত্যন্ত নিন্দক, তার কথায় অন্ন পরিত্যাগ করিয়া আপনি শরীর ক্ষীণ করিতেছেন কেন? নিন্দকের কথায় আত্মবিনাশ করা কি ধার্ম্মিকের কর্ত্তব্য?" চৈতন্য ধীরভাবে উত্তর করি-লেন; "তোমরা পুরীর কেন নিন্দা করিতেছ, উনি ত সত্য কথাই বলিয়াছেন, বাস্তবিক জিহ্বার বিলাসিতা সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম নহে। ভাল খাইয়া ভাল পরিয়া যতিধর্ম্ম রক্ষা করা যায়না। রামচন্দ্র পুরী মঙ্গলের জন্যই আমাকে সংযত হইতে বলিয়াছেন। তোমরা তাঁহার কথা অন্যভাবে গ্রহণ করিতেছ কেন?" চৈতন্যের উদারতা এবং প্রেম দেখিয়া ভক্তগণ বিস্মিত হইলেন।

রামচন্দ্র পুরীর ন্যায় নিন্দক লোকের সংখ্যা বর্ত্তমান সময়ে বিরল নহে; কিন্তু চৈতন্যের ন্যায় তেমন প্রেমের দৃষ্টান্ত দেখা যায় না। চৈতন্য শরীর ধ্বংসকারী বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়াছিলেন, সেই অবস্থাতেও তিনি নিন্দকের দৃষ্টি হইতে রক্ষা পান নাই। ইহা দ্বারা প্রমাণ হইতেছে যে সকল সময়েই নিন্দকের দল বিদ্যমান থাকে। কিন্তু নিন্দাকারীর নিন্দাবাক্য উপদেশ রূপে গ্রহণ করাতেই ধর্ম্মের মাহাত্ম্য প্রকাশ পায়। আমাদের মধ্যে যাঁহারা চৈতন্যের ন্যায় উক্ত প্রকারে অযথা নিন্দাগ্রস্ত হইয়াছেন, অথবা হইতেছেন, তাঁহারা নিন্দাকারীর প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিয়া থাকেন, এবিষয়ে সকলেরই আত্মচিন্তা করা কর্ত্তব্য। আমাদের মধ্যে যাঁহারা প্রতীচ্য ভাবাপন্ন, সম্ভবতঃ তাঁহারা ঐরূপ নিন্দাকারীকে এই বলিয়া তাড়াইয়া দিবেন যে "আমার আহার বিহার প্রভৃতি সম্বন্ধে তোমার মন্তব্য প্রকাশ করিবার কি অধিকার আছে? তুমি নিজে সাবধান হও।" যাঁহারা প্রাচ্যভাবাপন্ন তাঁহারা অবশ্য নিন্দকের কথায় কর্ণপাত করিবেন না, চক্ষু উন্মীলন করিবেন না; কিন্তু মনে মনে ভাবিবেন, লোকটা অনেক নিম্নস্তরে বাস করিতেছে। যতিধর্ম্মের সম্বন্ধে নিতান্ত অনভিজ্ঞ, আধ্যাত্মি-কতার ভাব গ্রহণ করিতে পারে, এমনও শক্তি নাই। এই দুই দিকে দুই প্রকার ভাব। একদিকে নিন্দককে নীতিশিক্ষা দেওয়ার ইচ্ছা, অপর দিকে অহংকারের ভাব। কিন্তু প্রকৃত প্রেম হইতে ইহারা উভয়ে বঞ্চিত। প্রাচ্য ভাবাপন্নই হউন, আর প্রতীচ্য ভাবাপন্নই হউন, যিনি শত্রুকে আলিঙ্গন করিতে পারেন, নিন্দকের উক্তি উপদেশের ন্যায় গ্রহণ করিতে পারেন, এমন বিনীত, শান্ত এবং প্রেমিকই আদর্শ স্থানীয়।

ব্রাহ্মসমাজে এই প্রেমের ভাব জাগ্রত করিবার জন্য বিশেষ সাধন আবশ্যক। ব্রাহ্মসমাজে নিন্দক উৎপীড়নকারীর সংখ্যা অনেক; কিন্তু তাহাদিগকে ভালবাসিতে পারেন, এরূপ ব্যক্তি কয় জন আছেন? সামান্য দোষের কথা উল্লেখ করিলে যাহারা অগ্নিমূর্ত্তি ধারণ করে, তাঁহাদের কথা বলিতেছি না। কিন্তু যাঁহারা প্রেমসাধন করিতে প্রয়াসী, ঈশ্বর-দর্শনার্থী তাঁহা-দের নিকট সকলেই সাধু দৃষ্টান্তের আশা করেন। পরমেশ্বর কৃপা করুন, ব্রাহ্মগণ শত্রুকে প্রেম করিতে, নিন্দকের বাক্য উপদেশ স্বরূপ গ্রহণ করিতে যত্নবান্ হউন।

উদারতা—বাজীকরদিগের হাতে একখণ্ড অস্থি থাকে, তাহার স্পর্শে যেন এক বস্তুকে অন্য বস্তুতে পরিণত করিতে পারে, এমনভাবেই তাহারা সেই অস্থি খণ্ডের ব্যবহার করে। তাহারা কৌশল প্রদর্শনকালে সেই অস্থিখণ্ড এক একটী পদার্থে স্পর্শ করায় আর অমনি তাহা অন্য পদার্থে পরিণত হয়। বাজীকরেরা যেমন লোক চক্ষুকে ভ্রান্ত করিবার মানসে অস্থিখণ্ডের ব্যবহার করিয়া থাকে। সমাজ মধ্যেও এক শ্রেণীর লোক দেখিতে পাওয়া যায় যাঁহারা উদারতার ন্যায় সুন্দর শব্দটীকেও সেই ভাবে ব্যব-

হার করিয়া থাকেন। তাঁহাদের কথায় ভাবে বোধ হয়, উদারতা শব্দের এমন একটী আশ্চর্য্য শক্তি আছে যাহার প্রভাবে দোষ, দুর্ব্বলতা, কুসংস্কারপ্রিয়তা প্রভৃতি সকলই যেন সুন্দর হইয়া যায়। এক ব্যক্তি এক সময়ে জাতিভেদ প্রথার বিশেষ বিপক্ষ ছিলেন, সময় ও অবস্থার পরিবর্ত্তনে তাঁহার মনের পরিবর্ত্তন হইল। তিনি ক্রমে জাতিভেদের সমর্থন আরম্ভ করিলেন এবং কার্য্যেও তাহার পোষকতা করিতে লাগিলেন। যদি তুমি তাহার প্রতিবাদ কর অমনি তোমাকে তিনি অনুদার বলিয়া সম্ভাষণ করিবেন এবং উদারতার সুমহান্ আশ্রয় গ্রহণ করিবেন। এক সময়ে যিনি কোন কুসংস্কারের অতিশয় বিরোধী ছিলেন এখন অবস্থায় পড়িয়া তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করা প্রয়োজন হইল আর কার্য্যেও তাহার পরিচয় পাওয়া গেল, তুমি তাঁহাকে সেই কুসংস্কারের প্রতিকূলে তোমার মত জ্ঞাপন কর, অমনি দেখিবে তাঁহার মুখ হইতে উদারতা নামক মহাস্ত্র নিঃসৃত হইয়া আসিবে। প্রয়োজনবশতঃ কাহারও পাপের সহিত ঘনিষ্ঠতা ঘটিয়াছে, শাসন করিতে যাও অমনি তুমি অনুদারতার সংকীর্ণ সীমায় আবদ্ধ হইয়া রহিয়াছ বলিয়া অভিযুক্ত হইবে। ব্রাহ্মগণ যে সকল পৌত্তলিক অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়াকে এক সময় অপরাধের ও ক্ষতির কারণ বলিয়া মনে করিতেন, মনের পরিবর্ত্তন বা অন্য কোন প্রয়োজনে এখন সেই সকল অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার আবশ্যক হইয়াছে, তাহার প্রতিকূলে কিছু বলিতে যাও তুমি অনুদার হইবে। এইরূপে উদারতারূপ ঐন্দ্রজালিক অস্ত্রের সাহায্যে অনেক দোষ দুর্ব্বলতা ও কুসংস্কারকে প্রশ্রয় দিবার পথ যেন দিন দিন প্রশস্ত হইতেছে। উদারতা শব্দের যে এমন একটী আশ্চর্য্য গুণ আছে, তাহার দেহ যে রাক্ষসের মায়িক শরীরের ন্যায় যত ইচ্ছা বড় হইতে পারে বা যত ইচ্ছা ক্ষুদ্র হইতে পারে এরূপ জ্ঞান কিন্তু সকলের নাই। যদি বাস্তবিকই উদারতাশব্দের এমন কোনগুণ থাকিত যে,যাহার স্পর্শেই দোষ গুণে, দুর্ব্বলতা সবলতায়, কুসংস্কার সুসংস্কারে পরিণত হইতে পারিত, তাহা হইলে উদারতা জিনিসটী বড়ই মারাত্মক এবং অতিশয় ভয়ের কারণ হইত এবং অনুদার উপাধি লাভ যতই নিন্দনীয় হউক না কেন তাহাই প্রার্থনীয় হইত। কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয় এই যে উদারতা শব্দের এমন ভীষণ শক্তি নাই। তাহার স্পর্শেই দোষ গুণে পরিণত হয় না।

উদারতা শব্দের অর্থ ব্যাখ্যা যদিও অসাময়িক, কারণ তাহার ব্যাখ্যা বহুবার হইয়াছে, তথাপি যখন লোকে তাহার অর্থের নানারূপ বিপর্য্যয় ঘটাইতেছে তখন তাহার আলোচনায় লাভ ভিন্ন ক্ষতি নাই। উদারতাসম্বন্ধে ভাবিতে গেলেই দেখা যায়, ইহা স্থিতিস্থাপক রবারের মত বস্তু নয় যে,যত ইচ্ছা টানিয়া বড় করা যায় বা যত ইচ্ছা চাপ দিয়া ছোট করা যায়। ইহার বাস্তবিক একটী নির্দ্দিষ্ট আয়তন আছে, যত চেষ্টা করনা কেন ইহা আপনার অবয়ব কখনই পরিত্যাগ করে না। ইহা সত্য ও কল্যাণকে অতিক্রম করিয়া বিন্দু পরিমাণেও আপনার সীমা বৃদ্ধি করে না। সম্পূর্ণরূপে সত্য ও কল্যাণই ইহার অবয়ব। ইহা সর্ব্বদাই সত্যকে আশ্রয় করে, সত্যেরই অনুসরণ করে। সত্যেই ইহার মূল দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং যাহা কিছু অসত্য, যাহা কিছু দুষ্ট, যাহা কিছু অকল্যাণকর, উদারতার সহিত তাহার কোন সম্পর্ক নাই। সত্যাসত্যের বিচার শূন্য হইয়া কিছু গ্রহণ বা পরিত্যাগ কখনই উদারতা নয়। বিচারবিহীন ভাবে প্রয়োজনীয় হইলেই বা ভাল লাগিলেই যে কোন মত গ্রহণ বা পরিত্যাগ, কখনই উদারতা নয়। উদারতা বিন্দু পরিমাণেও অসত্যের সংস্রব সহ্য করিতে পারে না। ইহা শিশুর ক্রীড়ার কর্দ্দমও নয় যে ইচ্ছানুরূপ ইহাকে পরিবর্ত্তিত করিতে পারা যায়। ইহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ অতি সুদৃঢ়, তাহার ব্যতিক্রম করা আর সত্যের অপলাপ করা একই কথা। ব্যাখ্যার বলে বা বুদ্ধিচাতুর্য্যে সত্যকে অসত্য এবং অসত্যকে সত্যবৎ প্রতীয়মান করা যাইতে পারে, কিন্তু তাহা উদারতা নামের নিকট দিয়াও যায় না। তাহা চিরদিন পরিহার্য্য চিরদিনই পরিত্যাজ্য। উদারতার প্রকৃত তাৎপর্য্য সত্যকে নিরাপত্তিতে আদর করা, লাভ ক্ষতি গণনাবিহীন হইয়া সত্যকে আশ্রয় করা। সে সত্য যে দেশ যে কাল যে লোকের নিকট হইতেই সমাগত হউক না কেন, তাহা ছোট, বড়, নিকৃষ্ট, উৎকৃষ্ট পদস্থ অপদস্থ যে কোন ব্যক্তিরই আবিষ্কৃত হউক না কেন। সত্য, এই জ্ঞান জন্মিলেই গ্রহণীয় এবং মনের এরূপ প্রশস্ত জ্ঞানই উদারতা। কোন বিষয়ের প্রতিবাদ না করা, মনোমালিন্য বা অন্য কোন আশঙ্কায় কোন মতে সায় দিয়া যাওয়া নিরীহ প্রকৃতির কার্য্য হইতে পারে এবং লোকরঞ্জনের উপায়স্বরূপ হইতে পারে; কিন্তু তাহা উদারতার সীমাদেশ স্পর্শ করিবারও যোগ্য নহে। সে ব্যক্তি উদারতা শব্দ মুখে বার বার উচ্চারণ করিলেও তাহার মহত্ব ও মাধুর্য্য অনুভব করিতে অসমর্থ। উদারতা চিত্তকে প্রশস্ত করে, সত্যের জন্য ব্যাকুল করে এবং নিয়ত সত্যের অনুসরণে ব্যস্ত করে।

সম্পাদকীয় ও প্রাপ্ত প্রবন্ধ।

ধর্ম্ম-কঞ্চুক।

চীনদেশীয় সাধু কংফুচ সর্ব্বদা বলিতেন,—"তাহা তুমি উপদেশ করিও না যাহা তুমি নিজে আচরণ কর না। যদিও বা উপদেশ কর তাহা হইলে ত্বরায় তদনুরূপ আচরণ কর।" তাঁহার এ প্রকার বলিবার অভিপ্রায় এই, মানুষ যদি নিজ উপদেশের অনুরূপ আচরণ না করে, তাহা হইলে তাহার চরিত্র অন্তঃসারবিহীন, সত্যতাবিহীন ও মেরুদণ্ডবিহীন হইয়া পড়ে। জগতে এরূপ বহুসংখ্যক লোক দেখিতে পাওয়া যায় যাহারা সর্ব্বদা উচ্চ উচ্চ কথা মুখে বলিতেছে অথচ তাহাদের কার্য্য তদনুযায়ী নহে। এই সকল লোক মানব সমাজে অতিশয় ঘৃণিত। ইহাদিগকে ধর্ম্ম-কঞ্চুকধারী বা প্রচলিত ইংরাজীতে হামবাগ বলে। এরূপ ব্যক্তি অপেক্ষা তাহারা শ্রেষ্ঠ যাহারা উচ্চকথাও বলেনা—উচ্চকাজেও লিপ্ত নহে; ধর্ম্মকঞ্চুকে আপনাদিগকে আবৃত করিয়া অসাধুতাচরণ করে না। সকল প্রকার অপরাধের মধ্যে ধর্ম্ম-কঞ্চুক ধারণের অপরাধ অতি গুরুতর।

কিন্তু লোকে কি ইচ্ছা করিয়া ধর্ম্ম-কঞ্চুক ধরিয়া থাকে? অনেকস্থলে এরূপ হয় বটে। স্বার্থপর ও কুক্রিয়াপর ব্যক্তিরা দেখিয়াছে যে ধর্ম্মের প্রতি জনসমাজের প্রগাঢ় আস্থা; এমন কি ধর্ম্মের বহিরাবরণের প্রতিও লোকের অতিশয় সম্ভ্রম। ইহা দেখিয়া লোকচক্ষে ধূলি দিবার জন্য তাহারা ধর্ম্মের বহিরাবরণ ধারণ করে ও তদ্দ্বারা আপনাদের দুরভিসন্ধি পূর্ণ করিয়া লয়। এইরূপে কত শত শঠ, প্রবঞ্চক ও দুষ্ক্রিয়ান্বিত লোক সন্ন্যাসী ও সাধু সাজিয়া এদেশে ভ্রমণ করিতেছে। তাহারা দেখিয়াছে যে সন্ন্যাসী ও সাধুদিগের প্রতি এদেশের লোকের প্রগাঢ় আস্থা এবং ঐ আচরণে আবৃত থাকিলে অনায়াসে সর্ব্বত্র গতায়াত করিতে পারা যায়, সকলের সম্মানিত হইয়া থাকা যায়, অথচ যথেচ্ছ সুখ ভোগ করা যায়। ইহা দেখিয়া তাহারা ধর্ম্মের আচরণকে, আত্ম-রক্ষার উপায় স্বরূপ গ্রহণ করিয়াছে। এই ব্যাপারটা এতদূর প্রবল হইয়াছে যে উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের পুলিস সর্ব্বদা সতর্ক। যেখানে একদল নূতন সন্ন্যাসী ও সাধু আসিয়া বসে, সেই খানেই বিশেষ পুলিস নিযুক্ত হয় এবং চুরি বা ডাকাতির জন্য যে সকল ওয়ারেণ্ট আছে, তাহারা তন্ন তন্ন করিয়া অন্বেষণ করিতে থাকে।

আমরা এক ধর্ম্ম-কঞ্চুকধারীর কথা জানি। সে ব্যক্তি এক সময়ে সকল প্রকার সমাজ-সংস্কারের প্রতি অনুরাগ জানাইত এবং মুখে সর্ব্বদা উদার সত্য সকল প্রচার করিত। অনেক লোকে তাহার বাক্‌পটুতার গুণে আকৃষ্ট হইত। কিন্তু লোকটার গুপ্ত চরিত্র কখনই ভাল ছিল না। মধ্যে মধ্যে তাহার অখ্যাতি শুনা যাইত। কখনও শুনা গেল কোনও ভদ্রলোকের বাড়ীতে অভদ্র ব্যবহার করাতে প্রহার খাইয়াছে। কখনও জনশ্রুতি হইল কোনও শরণাগতা নিরাশ্রয়া বিধবাকে বিপথে নীত করিয়াছে ইত্যাদি। অবশেষে সকল শ্রেণীর লোকে তাহার প্রতি অতিশয় বিরক্ত হইয়া উঠিল। সে দেখিল যে বিষয় কার্য্যে অপর দশজন বিষয়ীর ন্যায় থাকিয়া অবাধে নিজ দুরভিসন্ধি চরিতার্থ করিবার সুবিধা হয় না। অবশেষে স্থির করিল যে ধর্ম্মের পরিচ্ছদ ধারণ করিতে হইবে, তাহা হইলে অবাধে স্বীয় প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিতে পারিবে। আর এমন সুবিধাই বা ভারতবর্ষ ভিন্ন অপর কোন্ দেশে পাইবে। এখানে সকল শ্রেণীর, সকল ভাবের, সকল রুচির পুণ্যাত্মা ও পাপাচারীর জন্য ধর্ম্ম আছে। এক তান্ত্রিক সাধনের নামে কি দুষ্ক্রিয়াই না আচরিত হইতেছে। সেই সুচতুর ব্যক্তি অবশেষে তন্ত্রের শরণাপন্ন হইল। গৈরিক বসনে আপনাকে আবৃত করিয়া ভস্মে আবৃত হইয়া চিম্‌টা ও ত্রিশূল হস্তে কিয়দ্দিবস ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিল। লোকে দেখিল একজন ইংরাজী শিক্ষিত কৃতী লোক, যে বিষয় কর্ম্ম করিয়া অনেক অর্থ উপার্জ্জন করিত, সে এখন বৈরাগ্যের বেশ ধারণ করিয়াছে। এ ব্যক্তি নিশ্চয় কিছু পাইয়াছে। এই ভ্রান্ত সংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া সকলে তাহার প্রতি সম্ভ্রম প্রদর্শন করিতে লাগিল। ক্রমে দেখা গেল, কতকগুলি ভৈরবী জুটাইয়াছে। ঐ সকল স্ত্রীলোকের সহিত সর্ব্বসমক্ষে নির্লজ্জ আচরণ করে এবং নির্লজ্জতার মাত্রা যত অধিক হয় ততই অজ্ঞ ও ধর্ম্মান্ধ লোকে তাহাকে সাধক বলিয়া সম্ভ্রম করে। এইরূপে তাহার চিরপোষিত দুষ্প্রবৃত্তির চরিতার্থতা অবাধে চলিতে লাগিল।

অবশ্য ইহা ধর্ম্ম-কঞ্চুক ধারণের উৎকট দৃষ্টান্ত। কিন্তু ধর্ম্মকে এরূপে নিজ দুষ্প্রবৃত্তির আচ্ছাদনের উপায় স্বরূপ না করিয়াও লোকে অনেক সময়ে ধর্ম্ম-কঞ্চুক ধারণ করিয়া থাকে। মুখে উচ্চ উচ্চ কথা বলিবার অভ্যাস হইয়া যায়, কিন্তু কার্য্যতঃ তদনুরূপ আচরণ করিবার প্রবৃত্তি থাকে না। এই সকল ব্যক্তি যে লোক-প্রবঞ্চনার উদ্দেশেই উচ্চ কথা কহিয়া থাকেন, তাহা নহে। কিন্তু অভ্যাস বশতঃ ঐরূপ হইয়া থাকে। এক সময়ে তাঁহারা সেই সকল সত্যে সমগ্র হৃদয়ের সহিত বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছিলেন; এক সময়ে ঐ সকল বিষয় তাঁহাদের সাধনের লক্ষ্যস্থলে ছিল; এক সময়ে তাঁহারা সরল ও ঐকান্তিকভাবে ঐ সকল সত্যের অভিমুখে অগ্রসর হইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু কালসহকারে হৃদয় মনের দুর্ব্বলতা বশতঃ বার বার সাধন-ভ্রষ্ট ও পরাভূত হইয়া অন্তরের ব্যাকুলতা ক্রমে নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইয়াছে; নিরাশাতে হৃদয়ের উৎসাহকে মন্দীভূত করিয়াছে; ক্রমে আত্মদৃষ্টির অভ্যাস চলিয়া গিয়াছে। এখন মুখে উচ্চ উচ্চ কথাগুলির অভ্যাস আছে কিন্তু জীবনের মধ্যে কোনও সংগ্রাম নাই; জীবনকে আলস্য ও জড়তাতে ঘিরিয়াছে। এ অবস্থাও অতিশয় শোচনীয়।

ধর্ম্ম-কঞ্চুক হইতে রক্ষা পাইবার জন্য সত্যতা সাধনের দিকে দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। যাহা মুখে প্রার্থনা করিতেছি তাহা জীবনে সাধন করিব, এবং যাহা জীবনে সাধন করিবার চেষ্টা করিব না, তাহা মুখে প্রার্থনাও করিব না, এরূপ প্রতিজ্ঞারূঢ় হইয়া প্রার্থনা করিলেও অনেক উপকার দর্শিতে পারে। মনে কর আমরা একদিন আমাদের সম্মিলনী সভাতে প্রার্থনা করিলাম—"হে প্রভো আমাদের মধ্যে শান্তি স্থাপন কর।" এ প্রার্থনার যদি কোনও অর্থ থাকে, তবে সে অর্থ এই, আমরা আত্মবিরোধ ও অশান্তিনিবন্ধন ক্লেশ অনুভব করিতেছি এবং শান্তিকে স্পৃহণীয় মনে করিতেছি। ইহাই যদি সত্য হয় তবে আমাদের পরবর্ত্তী আচরণে তদনুরূপ লক্ষণ সকল লক্ষিত হওয়া উচিত, অর্থাৎ ইহা দেখা চাই যে আমরা স্বতঃপরতঃ শান্তি স্থাপনের জন্য চেষ্টা করিতেছি। নতুবা প্রার্থনার গুরুত্ব ও দায়িত্ব থাকে না। ঈশ্বর-চরণে নিবেদিত প্রার্থনা এক একটী প্রতিজ্ঞা-বাক্যের ন্যায়। তুমি মুখ ফুটিয়া যে প্রার্থনা করিলে, তদ্দ্বারা শপথপূর্ব্বক ঈশ্বর-সন্নিধানে এই কথা বলিলে যে তুমি তদনুরূপ আচরণ করিবে। যদি না কর তবে তুমি অপরাধী ও ধর্ম্ম-কঞ্চুকধারী। কয়জনে প্রার্থনাকে এরূপ গুরুতরভাবে লইয়া থাকেন? দৈনিক প্রার্থনারূপ দ্বার দিয়া অনেক সময়ে আমাদের জীবনে অসত্যতা ও অসারতা প্রবিষ্ট হইয়া থাকে। উপাসক মাত্রেরই এবিষয়ে সজাগ দৃষ্টি থাকা আবশ্যক।

জাতীয়তা।

(প্রাপ্ত)

বায়ুর গতির যেমন স্থিরতা নাই কখনও প্রবল, কখনও দুর্ব্বল। অদ্য পূর্ব্ব হইতে কল্য হয়ত উত্তর দিক হইতে, আবার পরের দিন হয়ত দক্ষিণ দিক হইতে প্রবাহিত হইয়া থাকে। মানব মনেতেও এইরূপ চঞ্চলতা সর্ব্বদাই বর্ত্তমান রহিয়াছে। ২ বৎসর পূর্ব্বে মনের যেরূপ গতি ছিল, যে সকল বিষয় প্রিয় ছিল আজ হয়ত তাহার বিপরীত ভাব দৃষ্ট হইতেছে। নূতন বিষয়, নূতন চিন্তা আসিয়া মনকে অধিকার করিয়াছে। মনের এই অস্থিরতা, এই নিয়তপরিবর্ত্তনশীলতাকে দমন করিবার জন্যই সাধক সাধনায় প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন—এই নিমিত্তই ধর্ম্মসাধন অতি আয়াস-সাধ্য। মনের প্রকৃতিতে স্বভাবতঃ যে অস্থিরতা আছে, তাহাকে নিরন্তর পরিবর্দ্ধিত হইতে না দিয়া শান্ত ও সমাহিত ভাবে অবস্থিত রাখিতে সচেষ্ট হওয়াই প্রার্থনীয়। মনের যথেচ্ছগতিকে বাধা না দিলে সে কখনও সত্য ধারণও গ্রহণের উপযুক্ত হয় না।

কিন্তু ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে সময়ে সময়ে সে চেষ্টার অত্যন্ত অভাব লক্ষিত হয়। যে সকল বিষয় সুমীমাংসিত হইয়াছে, যে সকল অনিষ্টকর বিষয়ের অনিষ্টকারিতাসম্বন্ধে একবার উপযুক্ত সিদ্ধান্ত হইয়া গিয়াছে, দেখাযায় আবার সেই সকল বিষয়ও লোকের প্রিয় হইতেছে। সুমীমাংসিত বিষয়ের ও পুনর্মীমাংসা করিবার জন্য আন্দোলন, আলোচনা চলিতেছে। এইরূপ অস্থিরতা যেমন ধর্ম্মসাধনের বিঘ্নকারী তেমনি মানসিক দৌর্ব্বল্যের পরিচায়ক। এজন্য পুরাতন হইলেও আজ একটী বিষয়ের আলোচনা করা যাইতেছে।

ব্রাহ্মধর্ম্ম যে প্রকৃতি লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাহা দ্বারা ইহাতে যে উদারতা, সর্ব্বজনীনতা, চিরবিদ্যমান থাকিবে তাহাতে সন্দেহ করিবার কোনই হেতু নাই। দেশ বা কাল ইহাকে আবদ্ধ করিবে না। কোন জাতি বা সম্প্রদায় ইহার বিশেষ আদরণীয় ও উপেক্ষণীয় হইবে না। ইহা যেমন সত্য গ্রহণ সম্বন্ধে উদার, ধর্ম্মতত্ত্ব গ্রহণ করিতে যেমন দেশ, কাল বা জাতির প্রতি ইহার কোন বিশেষ পক্ষপাতিত্ব থাকিবে না, তেমনি সামাজিক আচার ব্যবহার, গার্হস্থ্য রীতিনীতি সম্বন্ধেও কোন দেশ, জাতি সম্প্রদায় বা কালে ইহা আবদ্ধ থাকিবে না। ব্রাহ্মধর্ম্মের এই প্রকৃতির বিপর্য্যয় ঘটাইতে যাঁহারা ইচ্ছা করেন তাঁহারা অতি সুবিজ্ঞ হইলেও, ইহার বান্ধব হইলেও, ইহার প্রকৃতি অনুভব করিতে এবং কল্যাণ সাধন করিতে কখনও উপযুক্ত পাত্র নহেন। যাঁহারা ব্রাহ্মধর্ম্মের এই মূল প্রকৃতির পরিবর্ত্তন করিতে প্রয়াসী হইবেন, তাঁহারা সজ্জন ও জ্ঞানী হইতে পারেন, কিন্তু তাঁহারা ব্রাহ্মধর্ম্মের মহৎ লক্ষ্য ধারণে যেমন অক্ষম, ইহার সেবা করিতেও তেমনি অসমর্থ। জাতীয়তা বা সাম্প্রদায়িকতা ইহার লক্ষণ হইতে পারে না। কোন বিশেষ জাতির আচার ব্যবহার বা জ্ঞান গরিমায় ইহা আবদ্ধ থাকিবে না। ধর্ম্মমত ও সত্য গ্রহণসম্বন্ধে যেমন যাহা কল্যাণকর তাহাই ব্রাহ্মধর্ম্মাবলম্বীর অবলম্বনীয়, আদরণীয়, তেমনি আচার ব্যবহার, রীতি নীতি ও যাহা জ্ঞান বিজ্ঞানের অনুমোদিত, যাহা মানব মাত্রেরই কল্যাণকর, তাহাই ব্রাহ্মের অবলম্বনীয়, তাহাই আদরণীয়। তাহা কোন্ দেশের কোন্ জাতির বা কোন্ সম্প্রদায়ের সে বিচার করিবার অবসর ব্রাহ্মের নাই। কারণ তাঁহার অবলম্বিত ধর্ম্মের প্রকৃতিই সেরূপ নয়। এজন্য ইহা যেমন সর্ব্বত্র প্রচারিত হইবে, আপনার জ্ঞান, বিশ্বাস যেমন চারিদিকে ছড়াইবে, তেমনি সামাজিক পারিবারিক সর্ব্বপ্রকার কল্যাণকর আচার ব্যবহারও সর্ব্বত্র হইতে শিক্ষা গ্রহণ করিবে।

জাতীয়তা শব্দ এক অর্থে ব্রাহ্মের অভিধান হইতে উঠিয়া যাইবে। সে অর্থ এই, যাহাতে লোককে অপরের সদ্‌গুণ দর্শনে ও তাহার অনুসরণে অন্ধ করে ও অনিচ্ছুক করে। আপন দেশের যাহা ভাল, তাহার প্রতি অত্যধিক অনুরাগ প্রদর্শিত হউক, তাহাতে লাভ ভিন্ন ক্ষতি নাই। কিন্তু জাতি বিশেষ বা দেশ বিশেষের প্রতি অন্ধ-প্রেম মানবের কল্যাণের পথকে অবরুদ্ধ করে। এইরূপ অন্ধপ্রেম মানবকে অকারণ আত্মম্ভরী ও আত্মপ্রশংসাপ্রিয় এবং অপরের প্রতি উদাসীন ও বিদ্বেষপরায়ণ করে। ইহা দ্বারা লোকের দৃষ্টি অতি সংকীর্ণ সীমায় আবদ্ধ হয়। জ্ঞানোন্নতির সরল ও সহজ পথ ইহা দ্বারা অবরুদ্ধ হইয়া যায়। এজন্য স্বজাতিপ্রেম অতি কল্যাণকর ও অতি স্পৃহনীয় হইয়াও উন্নতির বিষম বিরোধী হয়। স্বজাতি-প্রেম যেমন মানবের অশেষ কল্যাণ সাধন করিয়াছে, তেমনি জাতীয়তারূপ অন্ধতায় লোককে অপরের প্রতি শুধু উদাসীন করিয়াছে এমন নয় কিন্তু নিত্য বিবাদ, বিদ্বেষ, অপ্রেমের বশীভূত করিয়া মানবকে বিপথগামী করিয়াছে ও করিতেছে। অনুচিত স্বজাতি-প্রেম বা অন্ধ-জাতীয়তা আজ উঠিয়া যাউক রাজ্যের প্রধান ভার ও গলগ্রহস্বরূপ যুদ্ধ-ব্যবসায়ী সৈনিকগণের অধিকাংশকে এখনই বিদায় দেওয়া যাইতে পারিবে। এক শ্রেণীর লোক যে মানুষবধের নিত্য নূতন কৌশল আবিষ্কার করিবার জন্য ব্যস্ত রহিয়াছে, তাহাদের জ্ঞান শক্তি এ বিষয়ে নিয়োগ করিবার কোন প্রয়োজন হইবে না। তাঁহাদের শক্তি দেশের অন্যবিধ কত কল্যাণকর বিষয়ে নিযুক্ত হইয়া এখনই কত হিতসাধন করিতে সমর্থ হইবে। জাতীয়তা যেমন লোককে যুদ্ধপ্রিয় করে, তেমনি সাহিত্য, বিজ্ঞান, ধর্ম্ম, নীতি প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার কল্যাণকর বিষয়ে পরদ্বেষপরায়ণ করিয়া লোককে অতি সংকীর্ণ, অতি সামান্য স্থানে আবদ্ধ করিয়া থাকে। ইহা যেমন জ্ঞান ধর্ম্মের পরিপন্থি, তেমনি বিষয় বাণিজ্যেরও বিষম প্রতিবন্ধক।

বর্ত্তমান সময়ের জ্ঞানিগণ ইহা সম্যকরূপে অনুভব করিয়া যেমন একদিকে অবাধ বাণিজ্য-প্রণালীর সমর্থন করিতেছেন তেমনি যুদ্ধ বিগ্রহ যাহাতে না ঘটে, যাহাতে রাজনীতিক্ষেত্রে এক কল্যাণকর একতা স্থাপিত হইয়া, মানব সাধারণের মধ্যে বান্ধবতা ও নৈকট্যাদি পরিবর্দ্ধিত হইয়া সকল মানব এক সাধারণ জাতিতে পরিণত হইতে পারে, তাহারই জন্য আয়োজন করিতেছেন। দিন দিন লোকের একতার দিকে গতি হইতেছে। এ সময় ব্রাহ্মসমাজ উদার ও অতি মহৎ ধর্ম্ম পাইয়াও কি সংকীর্ণ জাতীয়তায় আবদ্ধ হইতে পারেন। যাঁহারা

যেরূপ ইচ্ছা করেন তাঁহারা বর্ত্তমান সময়ের উচ্চতর জ্ঞান ও ধর্ম্মের অনুপযোগী হইয়া নিতান্ত সংকীর্ণতা এবং উন্নতির বিষম প্রতিবন্ধকতারই সমাদর করিবেন। তাঁহারা পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্মের উদার ও মহৎ ভাব পরিগ্রহ করিতে না পারিয়া উহার সুমহান্ ফল নিজজীবনে ত ভোগ করিতে পারিবেনই না, অপরের পক্ষেও বিষম কণ্টকস্বরূপ হইবেন। যাঁহারা জাতীয়তা রূপ সংকীর্ণ সীমায় আপনাদিগকে আবদ্ধ করিতেছেন, তাঁহারা ব্রাহ্মধর্ম্মের মূল প্রকৃতিই বিস্মৃত হইতেছেন। উহার মূলে কুঠারাঘাত করিতেছেন। ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাস আমাদিগকে যাহা শিক্ষা প্রদান করিতেছে, তাহা বিস্মৃত হওয়া এবং তাহার প্রতি দৃষ্টিহীন হওয়া অতি অমঙ্গলের হইবে। সুতরাং জাতীয়তাবাদিগণ বা জাতীয়তাপ্রিয়গণ আপনাদের ক্ষণিক পরিতুষ্টি বা রুচির চরিতার্থতার জন্য ইহার কল্যাণকর মহৎ আদর্শকে হীন না করেন ইহাই প্রার্থনীয়।

প্রেরিত পত্র।

(পত্রপ্রেরকের মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন।)

শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত তত্ত্বকৌমুদী সম্পাদক মহাশয়

সমীপেষু—

মহাশয়,

আপনার পত্রিকার সাহায্যে একটী গুরুতর বিষয়ে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যনির্ব্বাহক সভা, অধ্যক্ষ সভা ও সাধারণ সভার সভ্যদিগের এবং মন্দিরের ট্রাষ্টীগণের মনোযোগ আকর্ষণ করিতে অনুমতি প্রাপ্ত হইলে বিশেষ অনুগৃহীত হইব। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ-উপাসনা-মন্দিরের ট্রাষ্টডীডের ৫ম পৃষ্ঠাতে মন্দিরের ব্যবহার সম্বন্ধে নিম্নলিখিতরূপ নিয়ম লিখিত আছে;—"এই মন্দির, যিনি এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকর্ত্তা ও রক্ষাকর্ত্তা সেই চিরন্তন ও অপরিবর্ত্তনীয় মহান্ ঈশ্বরের পূজা ও অর্চ্চনার জন্য ব্যবহৃত হইবে; কিন্তু এরূপ কোন নামে তাঁহার পূজা ও অর্চ্চনা হইতে পারিবে না যাহা কোনও লোক কর্ত্তৃক এক কিম্বা অধিক 'বিশেষ প্রাণীর' প্রতি ব্যবহৃত হইয়াছে।" (for the worship and adoration of the Eternal and Immutable Being who is the Author and Preserver of the universe, *but not under or by any name, designation or title used or applied to any particular being or beings by any man whatsoever.*) মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় ব্রাহ্মসমাজের ট্রাষ্টডীডেও ঠিক এইরূপ নিয়মই করিয়াছিলেন। প্রভেদ এই যে সেখানে "কোনও লোক কর্ত্তৃক" এই স্থলে "কোনও লোক অথবা দল কর্ত্তৃক" "(by any man or set of men whatsoever)" লিখা আছে। এখানে এ কথা বলা প্রয়োজন যে, "বিশেষ প্রাণী" (particular being or beings) এই বাক্যে পরব্রহ্ম ছাড়া দেবদেবী মহাপুরুষ প্রভৃতি সকল প্রকার প্রাণীকেই বুঝাইতেছে, শুধু মানুষ কি পশুকে বুঝাইতেছে না। কারণ, এস্থলে Being শব্দে পরব্রহ্মকে বুঝায় বলিয়া বড় অক্ষরে লিখিত হইয়াছে, কিন্তু শেষে যে being শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহা ছোট অক্ষরে লিখিত এবং তাহার পূর্ব্বে "বিশেষ" এই বিশেষণটী দেওয়া আছে, ইহাতে এই বুঝা যায় যে, তাহা পরব্রহ্ম নহে, পরব্রহ্ম হইতে ভিন্ন, কিন্তু লোক কর্ত্তৃক পরব্রহ্মের স্থানে অধিষ্ঠিত হইতে পারে। এই বিধিটী অতি স্পষ্ট ভাষাতে লিখিত হইয়াছে। বিশেষ উদ্দেশ্য না থাকিলে এরূপ বিধি করা হইত না। আর বিশেষ বিবেচনার পর এবং ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি রাখিয়াই যে এ বিধি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। এই সকল ট্রাষ্টডীডে বিশেষ উদারতা দৃষ্ট হয়। যাহা সকল সময়ের জন্য প্রয়োজনীয় নহে, যাহা ভবিষ্যতে পরিবর্ত্তন করা দরকার এরূপ বিষয় কখনও ইহাতে সন্নিবিষ্ট হয় না, কারণ এ সকল নিয়ম বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎকালের জন্যই করা হয়। আমরা কি এখন ইহার কোন অংশ পরিবর্ত্তন করা দরকার বোধ করিতেছি? ইহাতে কি এরূপ কিছু আছে, যাহা আমাদের উন্নতির ব্যাঘাত করে? কখনই নহে। কেহ যে একথা বলিতে পারেন সে বিষয়ে আমাদের গভীর সন্দেহ আছে। কিন্তু দেখা যাইতেছে যে, এই নিয়মটী সর্ব্বদা ভঙ্গ করা হইতেছে। ট্রাষ্টডীডের কোন নিয়ম ভঙ্গ হইতে দেওয়া কোন মতেই উচিত নহে। ট্রাষ্টডীডের নিয়ম যে ভঙ্গ হইতেছে তাহা আমরা প্রমাণ করিতেছি।

অনেকেই "হরি" নাম ব্যবহারে কোন দোষ দেখেন না এবং "হরি" নাম ব্যবহার করিতে ভালবাসেন। এই হেতু আমরা দেখাইতে ইচ্ছা করি, "হরিনাম" ব্যবহারে অনিষ্ট আছে এবং "হরিনাম" ব্যবহার করাতে ট্রাষ্টডীডের নিয়ম ভঙ্গ করা হইতেছে।

অনেকে বলিয়া থাকেন, "হরি" কোনও বিশেষ দেবতার নাম নহে, উহা পরব্রহ্মেরই নাম। সর্ব্ব প্রথম আমাদের একটী কথা বলা প্রয়োজন যে, আমরা জানি ব্রাহ্মেরা "হরি"নাম দ্বারা পরব্রহ্মকেই বুঝাইয়া থাকেন। কিন্তু বিচার্য্য বিষয় এই যে, অন্য লোকে "হরি"নামে পরব্রহ্মকে বুঝে না, কোনও বিশেষ দেবতা বুঝে। ইহা সর্ব্বজনবিদিত যে অন্যদেশে যেরূপই হউক, বঙ্গদেশে "হরিনামে" হিন্দুগণ বিশেষ দেবতাকেই লক্ষ্য করিয়া থাকেন। "হরি"নাম তাঁহাদের নিকট নিরাকার অনন্ত স্বরূপ পরব্রহ্ম প্রতিপাদক নহে। হিন্দুগণ "হরি" মূর্ত্তি গঠন করিয়া পূজা করেন। যদিও সাধারণতঃ ঘটেতে হরিকে প্রতিষ্ঠা করিয়া পূজা করা হয়, তথাপি "হরি" সাকার হস্ত পদ বিশিষ্ট দেবতা এবং বিশেষ বিশেষ সময়ে মূর্ত্তিও গঠন করা হয়। এ কথা বলা প্রয়োজন বোধ হইতেছে যে, সাধারণতঃ যে সকল দেবতার মূর্ত্তি গঠন করা হয়,* সময় সময় তাহাদিগকেও ঘটে প্রতিষ্ঠিত করিয়া পূজা করা হয়। মূর্ত্তি গঠন করিবার সুবিধা না হইলেই ঘটে পূজা হইয়া থাকে। হরির পূজা সর্ব্বদা হয় বলিয়া লোকে সাধারণতঃ মূর্ত্তি গঠন করিতে পারে না। বিশেষ বিশেষ সময়েই মূর্ত্তি গঠন করে। কোনও স্থলে "হরি"* বিগ্রহ রূপে নিয়মিত গৃহে পূজিত হয়। আমরা এরূপ স্থলও জানি এমন কি হিন্দু-মহিলাগণ পর্য্যন্ত "হরি" ও নিরাকার ব্রহ্মে

প্রভেদ করেন। তাঁহাদের নিরাকার ব্রহ্মের ভাব আছে এবং সে ভাব প্রকাশ করিতে হইলে তাঁহারা "ঈশ্বর", "জগদীশ" "পরমেশ্বর" ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করেন। সকলেই জানেন "হরি," "বিষ্ণু," "শিব," "দুর্গা," "কালী," "জগদ্ধাত্রী" প্রভৃতি দেবদেবীগণ "ঈশ্বর" হইতে ভিন্ন। সকল হিন্দুই জানেন "ঈশ্বরের" মূর্ত্তি হয় না। তাঁহারা "ঈশ্বরের" মূর্ত্তি গঠন করিয়া পূজা করেন না, ঈশ্বরের সম্মুখে "লুট" দেন না, বলি দেন না। কিন্তু হরি সম্বন্ধে এই সমস্তই হয়। এক শ্রেণী "হরি" বলিতে "বিষ্ণু" অথবা "নারায়ণ" বুঝেন, অন্য শ্রেণী "কৃষ্ণ" বুঝেন; কিন্তু সকলেই সীমাবদ্ধ দেবতা বুঝেন। "হরি" শব্দের ধাতু-প্রত্যয়গত অর্থ কি পুরাকালের গ্রন্থাদিতে উহা কি অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহা দেখিবার আমাদের কোন প্রয়োজন নাই। ইহা নিশ্চয় সত্য যে, এখন এক শ্রেণীর লোকে "হরি"নাম কোনও বিশেষ সীমাবদ্ধ দেবতা সম্বন্ধে ব্যবহার করিতেছে। যে কোন সাধারণ লোকের নিকট জিজ্ঞাসা করিলেই জানা যাইবে "হরি" বলিতে তাহারা কোনও বিশেষ দেবতাকে বুঝে। ইহার বিরুদ্ধে কেহ কিছু বলিতে পারেন না। ইহা নিশ্চয় সত্য। অতএব হরি'নাম পরব্রহ্মে আরোপ করিলে তাঁহাকে এরূপ একটী নামে পূজা করা হয় যাহা কোনও একশ্রেণীর লোককর্ত্তৃক কোনও বিশেষ দেবতা সম্বন্ধে ব্যবহৃত হইতেছে। সুতরাং আমরা স্পষ্টরূপে অনুভব করিতেছি যে আরাধনা, প্রার্থনা সংগীত ইত্যাদিতে পরব্রহ্মকে "হরি"নামে পূজা করিলে উপাসনা মন্দিরের ট্রাষ্টডীডের বিরুদ্ধ কার্য্য করা হয়। কেবল সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ মন্দির সম্বন্ধে কেন (আমরা যতদূর জানি) সমস্ত মন্দির সম্বন্ধেই এই বিধি আছে। তাই মন্দিরে হরিনাম ব্যবহারে সকল স্থানেই অন্যায় করা হয়।

অনেক স্থলে ইহা দেখা গিয়াছে যে যখন ব্রাহ্মগণ "হরি" সংকীর্ত্তন করিয়াছেন তখন দলে দলে লোক তাহাতে যোগ দিয়াছে এবং সে স্থলে নমস্কার করিয়াছে, এমন কি অনেক সময় বাতাসা ইত্যাদি লুট দিয়াছে। কিন্তু তাঁহারাই যখন অন্য নামে সংকীর্ত্তন করিয়াছেন, তখন সকলে চলিয়া গিয়াছে। ইহাতেই দেখা যায় "হরি" নাম গ্রহণ সত্য প্রচার সম্বন্ধে কি অনিষ্ট করে। অনেক বৃদ্ধ হিন্দু মনে করিতেছে যে ব্রাহ্মেরা দিন দিন হিন্দু হইতেছে শীঘ্রই হিন্দু হইয়া যাইবে। কেন না ব্রাহ্মগণ এতদিন পরে হরিনাম মাহাত্ম্য বুঝিয়া হরিনাম গ্রহণ করিতেছেন; অনেকে হিন্দু ক্রিয়াকাণ্ডও গ্রহণ করিতেছেন অনেক যুবককে তাঁহারা এ সকল কথা বলিয়া ভুলাইতে সক্ষম হইতেছেন। যুবকেরা সহজেই এসকল কথায় বিশ্বাস করিতেছে।

আর একটী কথা সকলেই জানেন আমাদের মধ্যে এরূপ এক শ্রেণীর ব্রাহ্ম আছেন, যাঁহারা যে সকল স্থানে 'হরি' প্রভৃতি দেব দেবীর নামে সংকীর্ত্তন ও উপাসনাদি হয়, তাহাতে যোগ দেন না অথবা যোগ দিতে ভাল বাসেন না। হইতে পারে তাঁহারা এক সীমান্তে যাইয়া উপস্থিত হইয়াছেন। কিন্তু সমস্ত ব্রাহ্ম এক সাধারণ উপাসনাতে যোগ দেন ইহা কি প্রয়োজনীয় নহে? আমাদের উপাসনা ও সংগীতাদি কি এরূপ হওয়া উচিত নহে যে সকলেই তাহাতে যোগ দিতে পারে? তাহাই যদি হয় তবে এ বিষয়ে দৃষ্টি না করিলে কি বিশেষ অনিষ্ট হয় না? সকলে যাহাতে মিলিত ভাবে উপাসনাদি করিয়া উপকৃত হইতে পারে সেদিকে দৃষ্টি রাখা বিশেষ কর্ত্তব্য। কাযেই এই শ্রেণীর মতের প্রতি সম্মান রাখিয়া কার্য্য করা উচিত। কেহ কেহ বলিতে পারেন এই শ্রেণী অপর শ্রেণীর মতে চলে না কেন? কিন্তু ইহা সহজেই বুঝা যায় যে তাহা হইতে পারে না। এক শ্রেণী "হরি" প্রভৃতি দেব দেবীর নাম ব্যবহৃত হইলে সেই উপাসনা সংগীতাদিতে যোগ দিতে পারেন না—যোগ দেওয়া অন্যায় মনে করেন। আর অপর শ্রেণী হরি প্রভৃতি নাম ব্যবহার করিতে ভাল বাসেন এ সকল নাম তাঁহাদের অনেক সাহায্য করে। কিন্তু তাঁহারা এরূপ বলিতে পারেন না যে এ সকল নাম ব্যবহৃত না হইলে তাঁহাদের ধর্ম্মজীবন চলিতে পারে না অথবা এ সকল নাম যে সব উপাসনা ও সংকীর্ত্তনে ব্যবহৃত না হয়, তাহাতে যোগ দিতে পারেন না কিম্বা যোগ দিলেও তাহাতে সমগ্র হৃদয়ের সঙ্গে যোগ দিতে পারেন না। কাজেই দেখা যায় কোন শ্রেণীর উপর মিলন নির্ভর করিতেছে। বাস্তবিক বিশ্বজনীন উদার আরাধনা সংকীর্ত্তন তাহাই, যাহাতে সকলেই যোগ দিতে পারে—যাহাতে কাহারও কোন আপত্তির কারণ বিদ্যমান না থাকে। কেহ কেহ ইহাকে যথেষ্ট মনে না করিতে পারেন ইহার সঙ্গে আরও কিছু যোগ করিতে ইচ্ছা করিতে পারেন। কিন্তু ইহার কোন অংশের বিরুদ্ধে আপত্তি করিতে পারেন না। বিশেষত্ব তাঁহারা নিজে নিজে সাধন করিবেন। সাধারণের নিকট সেরূপ করিতে গেলে চলিবে না। আমাদের উপাসনা সংগীতাদিতে এই নিয়ম রক্ষিত না হইলে যে অচিরে আর এক বিবাদ উপস্থিত হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। কিছুদিন হইতে অনেকের হিন্দুয়ানীর দিকে যেরূপ প্রবল গতি দেখা যাইতেছে তাহাতে শীঘ্রই ইহার প্রতিক্রিয়া হইবে। অনেকেই এখন ইহা ভয়ের সঙ্গে অবলোকন করিতেছেন, কিন্তু বিরুদ্ধে আন্দোলন করিবার সময় উপস্থিত হয় নাই মনে করিতেছেন। কিন্তু তাঁহারাও বেশী দিন অপেক্ষা করিতে পারিতেছেন না। কাজেই আমাদের পূর্ব্ব হইতে সতর্ক হওয়া উচিত। এই হেতু, যে সকল ভাব বা ভাষা আপত্তিজনক তাহা আমাদের উপাসনাদিতে সর্ব্বথা বর্জ্জন করা দরকার। এবং সেই জন্য আমাদের সংগীত পুস্তকের কোন কোন গানের অংশবিশেষ পরিবর্ত্তন হওয়াও দরকার। অতএব সমস্ত ব্রাহ্মভ্রাতাদের নিকট বিনীত প্রার্থনা তাঁহারা উপাসনা সংগীতাদির সময় যেন এরূপ ভাষা ও ভাব রক্ষা করেন, যাহাতে কাহারও কোন আপত্তি না হইতে পারে—যাহাতে সকল দলের লোকই যোগ দিতে পারে। আর আমাদের কার্য্যনির্ব্বাহক ও অধ্যক্ষ সভার সভ্য ও ট্রাষ্টিমহোদয়গণের নিকট বিনীত প্রার্থনা এই যে যাহাতে মন্দিরে 'হরি' প্রভৃতি দেব দেবীর নামে পরব্রহ্মের পূজা হইয়া ট্রাষ্টডীডের নিয়ম ভঙ্গ না হয়, তাঁহারা যেন সে দিকে দৃষ্টি রাখেন এবং ব্রহ্মসংগীত পুস্তকস্থিত সংগীতগুলির আপত্তিজনক অংশসকল

পরিবর্ত্তন করিয়া দেন। সত্যসংরক্ষণ জন্ত আমরা এই দুইটী প্রার্থনা করিতেছি।

উপসংহারে শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় ১৮৭৫ সনের অক্টোবর মাসের "সমদর্শীতে" "ভক্তিভাব ও ভক্তিভাষা" নামে যে একটী প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন, তাহা হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি—

"আর একটী প্রথা আমাদের মধ্যে প্রচলিত হইতেছে তাহারও প্রতিবাদ করা আবশ্যক বোধ হইতেছে। ধর্ম্মসাধন ও ধর্ম্মানুষ্ঠান সম্বন্ধে এ দেশীয় ও অপর দেশীয় প্রাচীন ধর্ম্ম সম্প্রদায়গণ যে সকল শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন, তাহাও আমাদিগের মধ্যে অনেকে ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। জগতের লোকে সে শব্দগুলি ব্যবহার করিলে এক প্রকার অর্থ বুঝিয়া থাকে, আমরা সেই শব্দগুলি অপর প্রকার অর্থে ব্যবহার করিয়া থাকি। ইহাতে বর্ত্তমানে নিরর্থক লোকের বিদ্রূপ ও উপহাসভাজন হইতে হয়, ভবিষ্যতেও নানাপ্রকার বিতণ্ডার কারণ হইয়া থাকে। অতএব ধর্ম্ম প্রবর্ত্তক ও প্রচারকদিগের ভাষা সম্বন্ধে নিতান্ত সতর্ক হওয়া একান্ত কর্ত্তব্য।

বগুড়া
৬ই জুন। ১৮৯৩
অনুগত
জনৈক সভ্য।

মাননীয় শ্রীযুক্ত তত্ত্বকৌমুদী সম্পাদক মহাশয়
সমীপেষু।

সবিনয় নিবেদন,

মহাশয় গত ১৬ জ্যৈষ্ঠের তত্ত্বকৌমুদীর সম্পাদকীয় স্তম্ভে আপনি "জীবে দয়া" বিষয়ে যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন সে সম্বন্ধে আমার কিছু বক্তব্য আছে, অনুগ্রহ পূর্ব্বক তত্ত্বকৌমুদীতে প্রকাশ করিলে বাধিত হইব।

আপনার প্রথম কথা এই "সাধক ভগবানের সন্নিকটে উপস্থিত হইলে তাঁহার সৃষ্ট জীবদিগকে প্রাণের সহিত আলিঙ্গন না দিয়া থাকিতে পারেন না, তখন তিনি সর্ব্বজীবে সেই প্রাণরূপী, চৈতন্যরূপী পরব্রহ্মকে দর্শন করিয়া আত্মপর গণনা বিস্মৃত হইয়া যান। তখন বনের বৃক্ষলতা পর্য্যন্ত তাঁহার আপনার হইয়া যায়………………কিন্তু একটী গুরুতর প্রশ্ন এই যে, যাঁহারা জগৎসংসারের মধ্যে ব্রহ্মস্ফূর্ত্তি উপলব্ধি করিয়া সকলকে আপনার করিবার জন্ত সাধন অবলম্বন করিয়াছেন, তাঁহারা প্রাণীবধ করিতে পারেন কিনা?" আপনার এ প্রশ্নের আপনি উত্তর দিয়াছেন, তাহা সদুত্তর কিনা জানি না, তবে এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে আপনার কথা মানিয়া চলিতে গেলে কেবল মৎস্য মাংস কেন অপর কোন দ্রব্য আহারও মানুষের অদৃষ্টে ঘটিয়া উঠে না; কারণ, সকলেতেই ব্রহ্ম রহিয়াছেন, প্রাণী জগতে যেমন তাঁহার প্রকাশ উদ্ভিদ জগতেও তেমনি তাঁহারই প্রকাশ। সুতরাং ব্রহ্মপ্রকাশ বলিয়া যদি মাংসাদি আহার বর্জ্জনীয় হয়, তবে আর মানুষের আহারের জন্ত রহিল কি? তাই বলিতেছিলাম আপনার কথা মানিয়া চলিতে গেলে মানুষের ভাগ্যে আহার আদবেই ঘটিয়া উঠে না।

আপনার দ্বিতীয় কথা "একদিকে বিশ্বপ্রেম অপরদিকে জীবের প্রাণনাশ এই দুইয়ের সামঞ্জস্য কোথায়?" প্রাণনাশ ও অপ্রেম কি অপরিহার্য্য কার্য্য কারণ সূত্রে আবদ্ধ, যেখানে প্রাণনাশ দেখিব সেখানেই কি ভাবিতে হইবে তাহার মূলে অপ্রেম আছে? জলপ্লাবন দাবানল প্রভৃতি এক একটী নৈসর্গিক ঘটনাতে কত লক্ষ লক্ষ নির্দোষ প্রাণীর জীবন নাশ হয়। এই সকল দৈব-ঘটনাতে ত একমাত্র ঈশ্বরেরই হাতে ভূরি ভূরি প্রাণী নষ্ট হয়, তাই বলিয়া কি বলিতে হইবে যে এইগুলি ঈশ্বরের অপ্রেমের পরিচায়ক? কখনই না। এই সব আপাত দৃশ্যমান অমঙ্গল ঘটনার পশ্চাতে প্রেমময়ের মঙ্গল উদ্দেশ্য লুক্কায়িত। প্রেম, অপ্রেম কাজে নয়, উদ্দেশ্যে। বৃথা আমোদের জন্ত প্রাণীবধ অপ্রেমমূলক ও দূষণীয় সন্দেহ নাই। কিন্তু উচ্চতর উদ্দেশ্য (যথা মানবজাতির সভ্যতার উন্নতি ও স্বাস্থ্যরক্ষা) সিদ্ধির জন্ত জীব হত্যায় দোষ কি? কে বলিল তাহারা তাহাদের প্রাণ দিয়া আমাদের প্রাণ বাঁচাইবার জন্ত সৃষ্ট হয় নাই? আহারার্থ প্রাণীনাশ- প্রকৃত প্রকৃত পক্ষে নির্দ্দয়তা নয়। গৃহে বিড়াল কুকুর পুষিয়া পর্য্যাপ্ত পরিমাণে আহার না দেওয়া, গরু ঘোড়া রাখিয়া অনাহারে, অর্দ্ধাহারে দিবারাত্র খাটাইয়া লওয়াই প্রকৃত নির্দ্দয়তা। পূর্ব্বোক্ত প্রাণী-হত্যার সঙ্গে বিশ্বপ্রেমের সামঞ্জস্য থাকিতে পারে, কিন্তু শেষোক্ত জঘন্য ব্যবহারের সঙ্গে কস্মিন্‌কালেও থাকিতে পারে না। আপনি বিশ্বপ্রেমবাদী ব্রাহ্মের পক্ষে আহারার্থে জীবহত্যা গর্হিত কাজ বলিয়া ইঙ্গিত করিয়াছেন তাই এত কথা লিখিলাম।

কলিকাতা,
২৮শে জ্যৈষ্ঠ ১৩০০
অনুগত
শ্রীপ্রতুলচন্দ্র সোম।

মান্যবর শ্রীযুক্ত "তত্ত্বকৌমুদী" সম্পাদক মহাশয়
সমীপেষু।

সবিনয় নিবেদন,

নিম্নলিখিত পত্রখানি অনুগ্রহ পূর্ব্বক তত্ত্বকৌমুদীতে প্রকাশ করিয়া বাধিত করিবেন।

মান্যবর শ্রীযুক্ত "ধর্ম্মতত্ত্ব" সম্পাদক মহাশয়
সমীপেষু।

সবিনয় নিবেদন,

গত ১লা চৈত্র তারিখের ধর্ম্মতত্ত্বে কোন্নগর ব্রাহ্মসমাজের সাম্বৎসরিক উৎসব উপলক্ষে যাহা লিখিত হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে আমার কয়েকটী কথা বলা আবশ্যক বোধ হইয়াছে। অতএব এই পত্রখানা আগামী বারের ধর্ম্মতত্ত্বে প্রকাশ করিয়া বাধিত করিবেন।

১ম। আমি কোন্নগর ব্রাহ্মসমাজের পরিচালক নহি, কিন্তু উহার সম্পাদক এবং সভ্যদিগের আদেশ অনুসারে কার্য্য করিয়া থাকি।

২য়। "কোন্নগর সমাজ বিরোধীসমাজের অঙ্গীভূত নহে" এই কথা আমি বলিয়াছি লিখিয়াছেন, কিন্তু আমি এরূপ বাক্য প্রয়োগ করি নাই। আমি বলিয়াছিলাম যে "কোন্নগর সমাজ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অঙ্গীভূত নহে" এবং সাধারণ সমাজের

সহিত ঘনিষ্টতর সম্বন্ধ থাকিলেও কোন্নগর সমাজ উক্ত সমাজের অন্ধ অনুসরণকারী নহে।" সকল সমাজেরই দোষ গুণ সম্বন্ধে ইহার মত দিবার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা আছে এবং সাধারণ সমাজের আচার্য্য ভিন্ন অন্য কাহাকেও আচার্য্য নিযুক্ত করিবার স্বাধীনতা আছে। এই সকল কারণে আমি বলিয়াছিলাম যে কোন্নগর সমাজ Neutral চিরকালই আছে এবং তাহার কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই।" তবে এ কথা সত্য যে কোন্নগর সমাজ-মন্দিরের ট্রাষ্টীদিগের আচার্য্যকে পদচ্যুত করিবার সম্পূর্ণ ক্ষমতা আছে এবং ভবিষ্যতে কোন কারণে উক্ত ট্রাষ্টীপদ শূন্য হইলে তাহা পূরণের ভার সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যনির্ব্বাহক সভার হস্তে ন্যস্ত আছে।

৩য়। এস্থলে ইহাও বলা নিতান্ত আবশ্যক যে "বিরোধী সমাজ" অর্থে যদি কোচবিহার বিবাহের বিরুদ্ধে মতদাতা বুঝায় তবে কোন্নগর ব্রাহ্মসমাজ "বিরোধী সমাজ"; কারণ উক্ত বিবাহের সময় এই সমাজ প্রকাশ্যভাবে উহার বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেন এবং সে মতের কোন পরিবর্ত্তন আজিও ঘটে নাই। আর যদি "বিরোধী সমাজ" অর্থে নববিধানবিরোধী বুঝায় তবে কোন্নগর সমাজ "বিরোধী সমাজ"; কারণ নববিধানের মত সকলের যখন প্রথম সূত্রপাত হয় তখন হইতেই কোন্নগর সমাজ উহার বিরোধী এবং নববিধানের প্রশ্রয় দিতে কোন্নগর সমাজ কখনও প্রস্তুত নহেন।

৪র্থ। গত মাঘোৎসবের সময় এক দিবস শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বাবু প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয় সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে আচার্য্যের কার্য্য করায় কোন্নগর সমাজের সভ্যগণ স্থির করেন যে, সকল সমাজের স্বাতন্ত্র্য ও বিশেষত্ব ছাড়িয়া দিয়া সাধারণ ভাবে ও সাধারণ মতের উপর নির্ভর করিয়া পরস্পরের মধ্যে যত মিলিত হইতে পারা যায় ততই ভাল, এবং সেই জন্যই এবার নববিধানের প্রচারকদিগকে কোন্নগর সমাজের বার্ষিক উৎসবে উপাসনা করিবার জন্য আহ্বান করেন।

পরিশেষে নিতান্ত ব্যথিত হৃদয়ে নিবেদন করিতে বাধ্য হইতেছি যে আমার পরমারাধ্য পিতৃদেবকে অসম্ভ্রমের সহিত উল্লেখ করা হইয়াছে। ইহা কতদূর উদার, ন্যায়সঙ্গত ও ভদ্রোচিত হইয়াছে, আপনারা বিবেচনা করিলেই বুঝিতে পারিবেন। অধিক বলা বাহুল্য।

বশম্বদ
শ্রীসত্যপ্রিয় দেব।

ব্রাহ্মসমাজ।

ব্রাহ্ম-যুবকদিগের সান্ধ্য-সম্মিলন — শ্রীযুক্ত বাবু পার্ব্বতীনাথ দত্ত মহাশয় ব্রাহ্ম-যুবকদিগের জন্য গত ৪ঠা আগষ্ট শুক্রবার ৪৫নং বেনেটোলা লেনে এক সান্ধ্য-সমিতির আয়োজন করেন। শ্রীযুক্ত বাবু কৃষ্ণকুমার মিত্র যুবকদিগকে উপদেশ প্রদান করেন এবং বাবু উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী ও পার্ব্বতী বাবু কোন কোনও পুস্তক হইতে পাঠ করেন। মধ্যে মধ্যে সঙ্গীত হইয়াছিল। এইরূপ আমোদ মিশ্রিত নীতিশিক্ষার উপায় যুবকগণের চরিত্রগঠনের পক্ষে বিশেষ উপযোগী।

উৎসব—গত ৫।৬ই আগষ্ট শিবপুর ব্রাহ্মসমাজের বার্ষিক উৎসব সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। এতদুপলক্ষে কলিকাতা হইতে বাবু নবদ্বীপচন্দ্র দাস ও বাবু আদিনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি তথায় গমন করেন। ৫ই শনিবার অপরাহ্নে স্থানীয় ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ড্রইং হলে নবদ্বীপ বাবু "ছাত্র-জীবনে নীতি শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা" সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। বক্তৃতার স্থলে প্রায় ১০০ শত ছাত্র উপস্থিত হইয়া মনোযোগের সহিত বক্তৃতা শ্রবণ করিয়াছিলেন। পরদিন প্রাতে উপাসনালয়ে আদিনাথ বাবু উপাসনা করেন। অপরাহ্নে কলেজের ছাত্রাবাসে নবদ্বীপ বাবু শাস্ত্র পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন এবং সঙ্গীত সংকীর্ত্তন হইয়া উৎসব পরিসমাপ্ত হয়।

নির্জ্জন-সাধন—গত বৎসর আমাদের কয়েকজন প্রচারক মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের বোলপুরস্থ শান্তিনিকেতনে গিয়া এক মাস কাল বাস করেন। এবার সাধনাশ্রম হইতে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী, বাবু নবদ্বীপচন্দ্র দাস প্রভৃতি তথায় কিছুদিন বাস করিবেন বলিয়া গমন করিয়াছেন। যাঁহারা শান্তিনিকেতনে গিয়াছেন, তাঁহারাই জানেন তথাকার প্রকৃতির নিস্তব্ধতা এবং দূরপ্রসারিত প্রান্তরের গাম্ভীর্য্য ও নির্জ্জনতা সাধকের প্রাণে কেমন নবভাবের সঞ্চার করে। মহর্ষি শান্তিনিকেতন স্থাপন করিয়া ব্রাহ্মগণের মহোপকার সাধন করিয়াছেন।

দান—শিলঙের বাবু মথুরানাথ নন্দী তাঁহার পুত্রদ্বয়ের নামকরণ উপলক্ষে খাসিয়া মিশনে ২৲ টাকা দান করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত বাবু জগদীশচন্দ্র বসু তাঁহার পরলোকগত পিতার বার্ষিক শ্রাদ্ধোপলক্ষে দাসাশ্রমে একশত টাকা দান করিয়াছেন।

গত পূর্ব্ব রবিবার হইতে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের ব্রহ্ম-বিদ্যালয়ের কার্য্য পুনরারব্ধ হইয়াছে এবং ইহার দ্বাদশ বার্ষিক পরীক্ষার পাঠ্য পুস্তকের তালিকা "মেসেঞ্জার" পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে, অধ্যয়নার্থিগণ দেখিয়া লইবেন।

বিগত ৩১এ জুলাই সোমবার ১১০ নং কর্ণওয়ালীস ষ্ট্রীট ভবনে বাবু প্রবোধচন্দ্র মহলানবিসের প্রথম পুত্রের জাতকর্ম্ম সম্পন্ন হইয়াছে, বাবু নবদ্বীপচন্দ্র দাস আচার্য্যের কার্য্য করেন।

নূতন ব্রাহ্মসমাজ—অল্পদিন হইল বাবু নীলমণি চক্রবর্ত্তীর উদ্যোগে চেরাপুঞ্জীর অন্তর্গত নংরিম নামক স্থানে একটী ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত হইয়াছে। অনেক খাসিয়া পুরুষ ও রমণী সেই সমাজে উপস্থিত হইয়া থাকেন।

নূতন সমাজমন্দির—খাসিয়া পাহাড়স্থ মৌসমাই ব্রাহ্মসমাজের নূতন গৃহ প্রতিষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। পুরাতন গৃহ জীর্ণ হওয়াতে একটী পাতরের পুরাতন ঘর ক্রয় করিয়া মেরামত করিয়া লওয়া হইয়াছে।

দীক্ষা—উ নিঙ্গোরায় এবং উ হিজ্রোমুনি নামক দুইজন উৎসাহী খাসিয়া যুবক সম্প্রতি ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছেন। এই দীক্ষাকার্য্যে বাবু নীলমণি চক্রবর্ত্তী আচার্য্যের কার্য্য করেন। লাইক্যানসেট ব্রাহ্মসমাজে এই কার্য্য সম্পন্ন হয়। আনন্দের বিষয় এই যে ইহাঁরা উভয়েই আপন আপন পরিবারের মধ্যে ব্রাহ্মধর্ম্মকে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন এবং কিয়ৎ পরিমাণে কৃতকার্য্যও হইয়াছেন। দুইজন নূতন লোক উক্ত সমাজে যোগ দিয়াছেন। ইহাঁদের মধ্যে একজন এই গ্রামের সর্দ্দার, বয়স প্রায় ৫৫ বৎসর। এই ব্যক্তি পূর্ব্বে অত্যন্ত মদ্যপান করিতেন। তাহাতে তাঁহার পক্ষাঘাত রোগ জন্মে। দেড় বৎসর হইল ইনি মদ ত্যাগ

করিয়াছেন এবং সেই হইতে তাঁহার মনে পূর্ব্বকৃত দুষ্কার্য্যের জন্য অত্যন্ত অনুতাপের উদয় হইয়াছে। ভাল ভাবে জীবন যাপন করিবার জন্য তাঁহার হৃদয়ে গভীর আকাঙ্ক্ষা হইয়াছে। পরমেশ্বর তাঁহাকে শান্তিদান করুন!

প্রচার—বাবু নীলমণি চক্রবর্ত্তী এক খাসিয়া বন্ধু সমভিব্যাহারে ওয়ুলিং নামক এক স্থানে প্রচার করিতে গিয়াছিলেন। তথায় দুই দিন থাকিয়া বক্তৃতা ও আলোচনাদি দ্বারা ব্রাহ্মধর্ম্ম ব্যাখ্যা করেন। অনেক পুরুষ ও রমণী আগ্রহের সহিত ব্যাখ্যা শুনিয়াছিলেন। এবং কতকগুলি খাসিয়া পুস্তক বিক্রীত হইয়াছিল।

হরিসেনা—কয়েক বৎসর গত হইল তালতলাতে "হরিসেনা" নামে একটি ধর্ম্ম-সাধনমণ্ডলী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইহার উদ্দেশ্য অতি সুন্দর, আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে এই মণ্ডলীর উন্নতি কামনা করি। ইহার অনুষ্ঠানপত্র নিম্নে প্রকাশিত হইল।

উপাসনালয়—এই জগতের স্রষ্টা পাতা ও নিয়ন্তা জীবন্ত পরমেশ্বরের উপাসনা না করিলে নরনারী কখনই সুখশান্তি লাভ করিতে পারে না। কিন্তু বর্ত্তমানকালে এই উপাসনার প্রতি সকলেরই কেমন একটা শিথিল ভাব দেখা যাইতেছে। যাহাতে গৃহে গৃহে ঈশ্বরোপাসনা প্রচলিত হয়, তদ্বিষয়ে যথাসাধ্য সাহায্য করিবার জন্যই বিগত ১২৯১ সনের ১১ই ফাল্গুন তারিখে এই হরিসেনামণ্ডলী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সম্প্রতি তালতলা ২৯।১ নং নেবুতলীপুকুর ইষ্ট লেনস্থ শ্রীযুক্ত বাবু দীননাথ কুমার মহাশয়ের ভবনে প্রতি রবিবার সন্ধ্যা ৬॥টার সময় উক্ত সেনাদলের সামাজিক উপাসনা হইয়া থাকে। সর্ব্বসাধারণকে এই উপাসনায় যোগ দিবার জন্য সাদরে নিমন্ত্রণ করা যাইতেছে। যদি কেহ ইচ্ছা করেন, তিনি এই সেনাদলকে স্বীয় গৃহে লইয়া গিয়া হরিসংকীর্ত্তনাদি শ্রবণ করিতে পারেন। গৃহে লইয়া যাইতে কিছুমাত্র ব্যয় হইবে না।

নীতি-বিদ্যালয়—যাহাতে বালকগণের চরিত্র পবিত্র ও ধর্ম্মানুমোদিত হয়, তাহার জন্য হরিসেনাদল উপরোক্ত স্থানে একটী নীতি-বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন। প্রতি রবিবার প্রাতে ৬॥টার সময় উক্ত বিদ্যালয়ের কার্য্য আরম্ভ হয়। যাঁহারা আপনাদিগের পরিবারস্থ বালকদিগকে সচ্চরিত্র ও নীতিপরায়ণ করিতে ইচ্ছা করেন, অথচ আপনাদিগের সময়াভাবে তাহাদিগকে যথোচিত শিক্ষা দিতে পারেন না, তাঁহারা যদি অনুগ্রহ পূর্ব্বক বালকদিগকে উক্ত বিদ্যালয়ে প্রেরণ করেন, তাহা হইলে সেনাদল বিশেষ আহ্লাদিত হইবেন। বলা বাহুল্য যে, ইহাতেও কিছুই ব্যয় হইবে না।

ধর্ম্ম-পুস্তকালয়—হরিসেনাদল আপনাদের উপরোক্ত কার্য্যালয়ে একটী ক্ষুদ্র ধর্ম্ম-পুস্তকালয় সংস্থাপন করিয়াছেন। ইহাতে সকল জাতীয় ধর্ম্মপুস্তক সংগৃহীত হইতেছে। তত্ত্ববোধিনী, ধর্ম্মতত্ত্ব এবং তত্ত্বকৌমুদী নামক তিনখানি ধর্ম্মপত্রিকা ইহাতে নিয়মিত ভাবে আসিয়া থাকে। যিনি ইচ্ছা করিবেন তিনি প্রতিদিন প্রাতে ৬॥টার সময় আসিয়া বিনামূল্যে পুস্তক ও পত্রিকা পাঠ করিতে পারিবেন। উক্ত সময়ে কাহারও অসুবিধা হইলে তাঁহার জন্য বিশেষ বন্দোবস্ত করা হইবে। পুস্তক বা পত্রিকাদি গৃহে লইয়া যাইবার নিয়ম নাই।

সেনার প্রয়োজন—হরিসেনাদলে সেনার প্রয়োজন আছে। যিনি দেশের দুর্গতি-মোচন জন্য ভগবানের কার্য্য করিতে হরিসেনাদলে প্রবেশ করিবেন, মণ্ডলী তাঁহাকেই সমাদরে গ্রহণ করিবেন।

ভিক্ষা—বলা বাহুল্য যে সেনাদলের সমস্ত কার্য্যই সাধারণের নিকট অর্থ ভিক্ষা করিয়া সম্পন্ন হইয়া থাকে। যদি কেহ ইচ্ছা করেন, তিনি এই দলকে অর্থের দ্বারা সাহায্য করিতে পারেন।

নিবেদন—যাঁহারা হরিসেনাদলের সহিত মিলিত হইতে অথবা ইহাকে অর্থ সাহায্য করিতে ইচ্ছা করিবেন, তাঁহারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক হরিসেনা উপাসনালয়ের ঠিকানায় কার্য্যাধ্যক্ষের নামে পত্র লিখিবেন।

দানপ্রাপ্তি স্বীকার।

চেরাপুঞ্জী প্রচার আশ্রম ও ব্রাহ্মসমাজের সাহায্যার্থ পূর্ব্ব প্রাপ্তিস্বীকারের পর যে অর্থ পাওয়া গিয়াছে, কৃতজ্ঞতার সহিত নিম্নে তাহার প্রাপ্তিস্বীকার করা গেল। বাবু শিবনাথ দত্ত শিলং ১৲, রামচন্দ্র দত্ত ঐ ২৲ রমণকৃষ্ণ দত্ত ঐ ১৲ রামগতি দাস ঐ ১৲, শ্রীমতী প্রিয়ম্বদা সেন ঐ ১॥০ বাবু ঈশ্বরচন্দ্র মজুমদার ঐ ১৲, রামলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ঐ ১৲, দীননাথ দাস ঐ ৩৲, বিপিনবিহারী মজুমদার ঐ ২৲, নবগোপাল দত্ত ঐ ২৲, ভারতচন্দ্র দেব ঐ ১৲, কে, সি, চট্টোপাধ্যায় ঐ ২৲, সত্যেন্দ্রকুমার বসু ঐ ১৲, সহানুভূতিকারী ঐ ২৲, ডাঃ পি, সি রায় কলিকাতা ২৲, বাবু হেরম্বচন্দ্র মৈত্র ঐ ৫৲, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ঐ ১৲, রামদুর্লভ মজুমদার নওগাঁ ৫৲, সাধুচরণ রায় কটক ৫৲, মিঃ কে এন রায় (সি এস) ৭৲, জনৈক ব্রাহ্মমহিলা আলিপুর ২॥০, বাবু বিপিনবিহারী রায় মাণিকদহ ১৫৲, বরদানাথ হালদার ভবানীপুর ৫৲, শ্রীমতী জগৎলক্ষ্মী ঘোষ কলিকাতা ১৲, বাবু বলরাম সেন শিলং ২৲, সুরতচন্দ্র সিংহ বর্ম্মা ১৲, হেমচন্দ্র কাঞ্জলি ১৲, কান্তিচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বক্সর ১৲, নবকিশোর সেন শ্রীহট্ট ২৲, অতুলচন্দ্র ঘোষ ঐ ১০৲, লক্ষ্মীনারায়ণ চৌধুরী নাগপুর ৫৲, কেদারনাথ কুলভী বাঁকুড়া ২৲, একজন বন্ধু ১৲, একটী ক্ষুদ্র বালক ৶১০, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দান ২৸০—মোট ৯৭৸৵১০, পূর্ব্বকার প্রাপ্তি স্বীকার—২৯০/০ সর্ব্বসমষ্টি ৩৮৭৸৶১০

বিজ্ঞাপন।

ভিক্ষা প্রার্থনা।

আসাম প্রদেশের অন্তর্গত তেজপুর সহরে অনেক দিন হইতে একটী ব্রাহ্মসমাজ আছে। কিন্তু অর্থাভাবে এপর্য্যন্ত একখানি উপাসনা মন্দির নির্ম্মিত হইতে পারে নাই। তজ্জন্য সভ্যদিগকে ভিন্ন ভিন্ন বাসায় সামাজিক উপাসনাদি কার্য্যের জন্য সময় সময় অনেক অসুবিধা ভোগ করিতে হইয়াছে। সমাজের একখানি নিজের গৃহ প্রস্তুত না হইলে এই অসুবিধা কিছুতেই দূর হইবে না। কিন্তু একখানা ছোট রকমের টিনের ঘর করিতে হইলেও ন্যূনকল্পে এক হাজার টাকার প্রয়োজন। এখানে সভ্যদিগের মধ্যে চাঁদা এবং সাধারণের নিকট ভিক্ষা করায় আজ পর্য্যন্ত প্রায় সাড়ে তিনশত টাকা স্বাক্ষরিত হইয়াছে, আর অধিক পাইবার আশা নাই। অপর স্থানের ব্রাহ্মবন্ধু এবং ব্রাহ্মসমাজের হিতাকাঙ্ক্ষী মহোদয়গণের সাহায্য ভিন্ন এই অভাব দূর হইবার আর উপায় নাই। তাই আমরা সকলের সহানুভূতি প্রার্থনা করিতেছি, দয়া করিয়া সকলেই কিছু কিছু অর্থ সাহায্য করিয়া আমাদিগের উল্লিখিত অভাবটী দূর করিয়া এই বনাকীর্ণ দরিদ্র দেশে ভগবানের নাম প্রচারের সহায় হউন এই আশা। যিনি যাহা দিবেন তাহা আমাদিগের অথবা তত্ত্বকৌমুদীর সম্পাদকের নিকট পাঠাইলেই হইবে ইতি—

নিবেদক
শ্রীলক্ষ্মীকান্ত বরকাকতি,
শ্রীগুরুনাথ দত্ত,
শ্রীজয়কালী দত্ত এম, বি, এল

তেজপুর ব্রাহ্মসমাজ, আসাম
৩১শে জুলাই ১৮৯৩

২১১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, ব্রাহ্মমিশন প্রেসে শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দত্ত কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও ২রা ভাদ্র প্রকাশিত।

তত্ত্ব-কৌমুদী

ধর্ম্ম ও সমাজতত্ত্ব বিষয়ক পাক্ষিক পত্রিকা।

১০ম সংখ্যা
১৬শ ভাগ

১৬ই ভাদ্র, বৃহস্পতিবার, ১৮১৫ শক, ব্রাহ্ম সম্বৎ ৬৪।

বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২॥০
মফস্বলে ৩৲
প্রতি খণ্ডের মূল্য ৵০

চিরসঙ্গী।

যথায় তথায় রই, ভুলি বা জাগ্রত হই,
প্রভু জানি তোমা বই দীনে কেহ রাখে না;
জীবনের অন্ধকারে, ডুবি পাপ তাপ ভারে
তোমা বিনা সে দুস্তরে আর কেহ দেখে না।

চঞ্চল হৃদয় মোর, বিষয়-বিপ্লব ঘোর,
তোমারে যদি হে ভুলি বিচিত্র তা নয় হে,
আপনা ভাবি একাকী, নিরাশে মগন থাকি,
তখনো করুণা তব দূরে নাহি রয় হে।

আছ তুমি কাছে কাছে, এ মূঢ় ভুলিয়া আছে,
তুমি রাখ; অবিশ্বাসী ভয়ে সারা হইছে;
দেখিলে বাঁচিয়া যায়, নাহি দেখে সে কৃপায়,
থাকিতে সুখের পথ দুঃখ ডেকে লইছে।

এ ঘোর মোহের ঠুলি, কৃপা করি দেও খুলি,
সতত নিকটে দেখি অশনে বা শয়নে;
তোমারি আলোকে চলি, তোমারি আদেশে বলি,
জীবন্ত ধর্ম্মের জ্যোতি দেখি প্রভু নয়নে।

সম্পাদকীয় মন্তব্য।

নৈকট্য সাধন—অবতারবাদ ও অভ্রান্ত শাস্ত্রবাদে ঈশ্বরকে মানব-হৃদয় হইতে দূরে ফেলিয়া দেয়। ঈশ্বর ভূভার হরণের জন্য ও মানবের উদ্ধারের নিমিত্ত অবতীর্ণ হইয়াছিলেন এবং স্বয়ং মানবকে মুক্তির পথ প্রদর্শন করিয়াছিলেন। কিন্তু সমুদায় অতীতের কথা। এখন যদি তুমি তাঁহার লীলার বিষয়ে কিছু জানিতে চাও, তাহা হইলে অতীতের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে হইবে; মৃত ভাষা অধিগত করিতে হইবে; পুরোহিত ও ধর্ম্মশাস্ত্র-ব্যাখ্যাকর্ত্তাদিগের সাহায্যে সেই মৃত ভাষার দুর্ব্বোধ উক্তি সকলের তাৎপর্য্য গ্রহণ করিতে হইবে; তদ্ভিন্ন তুমি ঈশ্বরের করুণার পরিচয় পাইবে না; মুক্তিপ্রদ ধর্ম্ম লাভ করিতে পাইবে না। এই মতাবলম্বী ব্যক্তিদিগের কথায় ভাবে এই প্রকার বোধ হয় যেন তাঁহারা মনে করেন, যে পুরাকালে মানব মন পাপে এতদূর কলঙ্কিত হয় নাই, মানব-হৃদয় এতদূর ভ্রষ্ট ও পতিত হয় নাই, সুতরাং সে সময়ে ঈশ্বর মানব-সংসারে অবতীর্ণ হইতে পারিয়াছিলেন; এক্ষণে আর সে দিন নাই। মানব এক্ষণে এতদূর মলিন ও ভ্রষ্টাচারী যে ঈশ্বর এক্ষণে মানব-সঙ্গ ত্যাগ করিয়াছেন এবং দূরে বাস করিতেছেন। এক্ষণে যদি তাঁহার ইচ্ছা ও আদেশ জানিবার ইচ্ছা হয়, তবে বেদ, বাইবেল, বা কোরাণের পৃষ্ঠা উদ্ঘাটন কর। সেইখানে তাঁহার বিধি ও নিষেধ অবগত হও। অবতারবাদের ন্যায় বিজ্ঞানের বর্ত্তমান মতেও ঈশ্বরকে দূরে নিক্ষেপ করিয়াছে। ঈশ্বর এক বৃহৎ কার্য্য-কারণ-শৃঙ্খলের পশ্চাতে রহিয়াছেন। অন্ধশক্তির দ্বারা এবং সেই শক্তির নিয়ামক কতকগুলি নিয়মের দ্বারা জগৎ চলিতেছে; ইহার উপরে তাঁহার সাক্ষাৎ হস্ত নাই। এই সকল সুপ্রতিষ্ঠিত নিয়মকে তিনি পরিবর্ত্তিত করিবেন না; সুতরাং তাঁহার নিকট প্রার্থনা করা নিরর্থক; তাহাতে কোনও প্রকার লাভ নাই। স্তুতি বন্দনারই বা প্রয়োজন কি? যাঁহাতে পরিবর্ত্তন নাই, প্রসন্নতা অপ্রসন্নতার সম্বন্ধ নাই, তাঁহার স্তুতি বন্দনাতে বৃথা সময় নষ্ট না করিয়া তাঁহার প্রতিষ্ঠিত নিয়মাবলী মনোযোগপূর্ব্বক আলোচনা কর, এবং তন্মধ্য হইতে আপনাকে রক্ষা করিবার উপায় উদ্ভাবন কর। ব্রাহ্মধর্ম্ম এরূপ দূরস্থ ঈশ্বরে তৃপ্ত নহেন। ব্রাহ্মধর্ম্ম তাঁহাকে হৃদয়ের নিকটস্থ ও জীবন্ত পুরুষরূপে প্রতীতি করিবার জন্য উপদেশ দিতেছেন। তিনি যে কেবল অতীত কালেই আপনার করুণার সাক্ষ্য দিয়াছেন এরূপ নহে; কিন্তু প্রতিদিন আমাদের প্রত্যেকের জীবনে করুণার সাক্ষ্য দিতেছেন। কেবল প্রাচীন কালের সাধুদিগের কর্ণে আদেশ বাণী প্রচার করিয়াছিলেন তাহা নহে এখনও প্রত্যেক সরল ও পবিত্র আত্মাতে আদেশবাণী প্রচার করিতেছেন; প্রত্যেকের বিবেকে থাকিয়া কর্ত্তব্যের উপদেশ করিতেছেন। দৈনিক জীবনে এই নৈকট্য সাধন করা ব্রাহ্মধর্ম্মের মহোপদেশ।

ব্রহ্মণি স্থিত :—প্রাচীন শাস্ত্রে এই একটী বাক্য আছে "ব্রহ্মবিৎ ব্রহ্মণি স্থিতঃ";—ব্রহ্মকে যিনি প্রকৃতরূপে জানিয়াছেন

তিনি ব্রহ্মে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। ব্রহ্মে প্রতিষ্ঠিত শব্দের অর্থ কি? ব্রহ্মে সেরূপ ব্যক্তির চিত্ত দৃঢ়রূপে আবদ্ধ। পদ্ম যেমন মৃণালের দ্বারা মূলের সহিত দৃঢ়রূপে আবদ্ধ সেইরূপ সেই প্রকৃত জ্ঞানী ও বিশ্বাসীর চিত্ত ব্রহ্মে সুদৃঢ়রূপে আবদ্ধ। পদ্মটী যখন জলের উপরে ভাসিতেছে, তখন চক্ষে দেখিলে বোধ হয় না যে তাহার তলে মৃণাল আছে; বা তাহা কোনও পদার্থের সহিত দৃঢ়রূপে বদ্ধ রহিয়াছে। বরং যখন বায়ুভরে জলরাশি আন্দোলিত হইতেছে বা স্রোতের বেগে কল্লোলিত হইতেছে, তখন দেখিতেছি পদ্মটী একবার এদিকে একবার ওদিকে নীত হইতেছে, একস্থানে স্থির থাকিতেছে না, যেন মূলে কোনও বন্ধন নাই। কিন্তু অপেক্ষা কর বায়ু থামিয়া গেল; স্রোত মন্দীভূত হইল; জল প্রশান্ত আকার ধারণ করিল; তখন দেখ যেখানকার পদ্ম সেইখানে দাঁড়াইয়াছে; আপনার মূলকে আশ্রয় করিয়াই আছে। ব্রহ্মে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিও এইরূপে সর্ব্বপ্রকার বিপদ ও প্রলোভনের মধ্যেও তাঁহাতেই প্রতিষ্ঠিত থাকেন।

যাঁহার চিত্ত ব্রহ্মে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তিনি নিরাপদ স্থানকে অধিকার করিয়াছেন। জীবনের বাহিরের আন্দোলনে তাঁহাকে স্বস্থান-চ্যুত করিতে পারে না। বাহিরে দেখিতে তাঁহার ইন্দ্রিয় সকল ও মন বাহিরে ঘুরিতেছে কিন্তু তাঁহার অন্তরাত্মা এক প্রশান্ত ও নিস্তব্ধ স্থানে বাস করিতেছে; যেখানে বাহিরের বিক্ষোভের কারণ সকল গমন করিতে পারিতেছে না। যোগযুক্ত ব্যক্তিরাই এই স্থানকে অধিকার করিয়া থাকেন। জ্ঞানযোগ অথবা কর্ম্মযোগ উভয় বিধ যোগের দ্বারাই ঐ যোগযুক্ত অবস্থা লাভ হইয়া থাকে। যাঁহারা জ্ঞানযোগী তাঁহারা বিমল তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা ইহা সুন্দররূপে প্রতীতি করিয়াছেন, যে সমুদায় অধ্রুবের মধ্যে সেই ব্রহ্ম বস্তুই ধ্রুব। ইহা জানিয়া তাঁহারা সেই ধ্রুব পদার্থেই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন; এবং বাহিরের বিষয় সকলকে পরিবর্ত্তনশীল ও ক্ষণভঙ্গুর জানিয়া তদ্দ্বারা আর বিচলিত হন না। কর্ম্মযোগিগণ আর এক পথ দিয়া ঐ স্থলেই উপনীত হইয়া থাকেন। তাঁহারা কর্ত্তব্যের উপরে প্রতিষ্ঠিত হইয়া ফলাফল কামনা ত্যাগ করেন; এবং বাহিরের সুখ দুঃখের দ্বারা আর আপনাদের চিত্তকে বিচলিত হইতে দেন না। জয় পরাজয়ের দিকে তাঁহাদের দৃষ্টিই থাকে না। স্বীয় স্বীয় জীবনের কর্ত্তব্য সমাধা করিয়াই তাঁহারা নিশ্চিন্ত মনে বাস করেন। লোকের অনুরাগ বিরাগের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন না। এরূপ কর্ম্মযোগের অবস্থা অতীব স্পৃহণীয়। জ্ঞানযোগী ও কর্ম্মযোগী উভয়েই ব্রহ্মে প্রতিষ্ঠিত।

নির্জ্জনবাস—

একাকী চিন্তয়েন্নিত্যং বিবিক্তে হিতমাত্মনঃ।
একাকী চিন্তয়ানোহিপরং শ্রেয়োহধিগচ্ছতি।

২৫৮ শ্লোক ৪র্থ অধ্যায় মনু।

অর্থাৎ "নির্জ্জন প্রদেশে একাকী অবস্থান করত সর্ব্বদা আপনার হিত চিন্তা করিবে। নির্জ্জন চিন্তা দ্বারা পরম শ্রেয় লাভ হইয়া থাকে। নিয়ত লোক কোলাহলের মধ্যে বাস করিলে মানুষ আত্ম-বিস্মৃত হইয়া যায়। আমি কে, কোথা হইতে আসিয়াছি, কোথায় যাইব, কাহাকে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছি ইত্যাদি প্রশ্ন মনে উদয় হয় না। কেবল বাহ্য বিষয় লইয়া মন ব্যস্ত থাকে। বিশেষ ভাবে আত্ম-চিন্তা পরায়ণ না হইলে ব্রহ্মজিজ্ঞাসা প্রাণে উদয় হয় না। যাঁহার জীবন বহির্মুখী, যিনি কেবল বাহিরের কথা বার্ত্তা, আলোচনা, আন্দোলনে মগ্ন থাকেন, তিনি আত্মার অভ্যন্তরে কিরূপে প্রবেশ করিবেন? জন কোলাহলময় স্থান বাজার বিশেষ। হাট বাজারে গেলে যেমন মনের চঞ্চলতা উপস্থিত হয়, কোন বিষয়ে দৃঢ় অভিনিবেশ হয় না, কোলাহলময় সংসার ও তদ্রূপ। এই জন্যই পূর্ব্বতন ব্রহ্মর্ষিগণ নির্জ্জন সাধনের প্রয়োজনীয়তা বারংবার নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন।

ব্রাহ্মধর্ম্ম সজন ও নির্জ্জন উভয় বিধ সাধন-প্রণালী অবলম্বন করিতে উপদেশ দেন। নিরবচ্ছিন্ন নির্জ্জনতা প্রার্থনীয় নহে এবং কেবল সজনতা ও আত্মার অনুকূল নহে। কিন্তু মতে যাহাই থাকুক, কার্য্যতঃ ব্রাহ্মগণ অতি অল্পক্ষণই নির্জ্জনবাস করিয়া থাকেন। যাঁহারা বিষয় কর্ম্ম করিতেছেন, তাঁহারা রাত্রিদিন কোলাহলের মধ্যে বাস করেন, যাঁহারা বিষয় কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহাদের ও নির্জ্জন সাধনের সুবিধা ঘটিয়া উঠে না। নির্জ্জন সাধন ভিন্ন ধর্ম্ম জীবন গঠিত হয় না। ধর্ম্ম জীবন কেন, যিনিই সংসারে কোন বিশেষ কাজ করিতে প্রবৃত্ত হইবেন, তাহাকেই নির্জ্জন-বাস করিতে হইবে।

যাঁহারা ধর্ম্ম-সাধন করিতেছেন, নির্জ্জনবাস তাঁহাদের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয়। মহাত্মা মহম্মদ হরা পর্ব্বতের গহ্বরে তপস্যা করিতেন; যীশু ও নির্জ্জনে ধ্যান করিয়া সিদ্ধ হইয়াছিলেন। এদেশীয় ঋষিগণ নির্জ্জনতা এরূপ ভাল বাসিতেন যে, তাঁহারা লোকালয় পরিত্যাগ করিয়া গিরিমূলে চিরদিনের জন্য বাসগৃহ নির্ম্মাণ করিতেন। বাস্তবিক নির্জ্জনবাস, নির্জ্জন সাধন ভিন্ন ধর্ম্ম জীবন লাভ করা অসম্ভব। এজন্য প্রত্যেকের দৈনিক জীবনে কিয়ৎকাল নির্জ্জন-বাসের ব্যবস্থা করা আবশ্যক। যাঁহারা কার্য্যে সর্ব্বদা ব্যাপৃত তাহাদেরও মধ্যে মধ্যে নির্জ্জন-বাসের ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য। নিরবচ্ছিন্ন লোক-কোলাহলে, বিশেষতঃ নগরে বাস করিলে চিত্তবিক্ষেপ উপস্থিত হয়। প্রাণের স্থৈর্য্য এবং শান্তভাব বিনষ্ট হইয়া যায়, ক্রমে উপাসনার প্রতি মন বীতশ্রদ্ধ হয়।

নির্জ্জন বাস ও গভীর চিন্তা ব্যতীত অদ্যাপি জগতে কোনও মহৎ তত্ত্ব আবিষ্কৃত হয় নাই। এমন কি রাজনীতিজ্ঞ পুরুষগণ যে সকল কঠিন ও জটিল রাজনৈতিক প্রশ্ন লইয়া ব্যস্ত রহিয়াছেন এবং সে সম্বন্ধে যে সকল নূতন তত্ত্ব আবিষ্কার করিতেছেন, তাহাও নির্জ্জন বাস ও গভীর চিন্তার ফল। যে সকল উৎকৃষ্ট প্রণালীতে ইংরাজ-গবর্ণমেন্ট এদেশে কার্য্য চালাইতেছেন, যথা পোষ্ট আপীসের কার্য্য প্রণালী, বিচার প্রণালী ইত্যাদি সে সকল প্রণালী কি সহজে উদ্ভাবিত হইয়াছে? পরম্পরাক্রমে কত প্রতিভাশালী ব্যক্তি নির্জ্জনে দ্বার রুদ্ধ করিয়া সেই সকল বিষয়ে চিন্তা করিয়াছেন এবং এক একটী প্রণালী উদ্ভাবন করিয়াছেন। আমাদের দেশে এক সময়ে নির্জ্জন বাস ও গভীর অনুশীলনের প্রণালী ছিল, এক্ষণে তাহা তিরোহিত হইয়াছে। এক্ষণে কাহাকেও

নির্জ্জনে গভীররূপে কোনও তত্ত্বের আলোচনা করিতে দেখা যায় না। সকল কার্য্যই হাটের মধ্যে চলিতেছে। এমন কি ব্রাহ্মধর্ম্মপ্রচার ও ব্রাহ্মসমাজ গঠনরূপ গুরুতর কার্য্য ও ব্রাহ্মগণ নিতান্ত চিন্তাবিহীন ভাবে হাটের মধ্যে বসিয়া করিতেছেন। নির্জ্জনে দ্বাররুদ্ধ করিয়া দিনের পর দিন ব্রাহ্মধর্ম্মের গভীর তত্ত্ব সকলের আলোচনাতে প্রবৃত্ত আছেন, ব্রাহ্মদিগের মধ্যে এরূপ ব্যক্তি অধিক মিলিবে না। নির্জ্জন চিন্তা ও সাধনাভাবে আমাদের কার্য্য সারবান হয় না। অতএব প্রত্যেক পরিবারে ও প্রত্যেক দিনে যাহাতে কিয়ৎকাল নির্জ্জনতা সম্ভোগের ব্যবস্থা থাকে তাহা প্রার্থনীয়। যাঁহাদিগকে কার্য্যানুরোধে কোলাহলের মধ্যে থাকিতে হয়, তাহাদেরও মধ্যে মধ্যে নির্জ্জন বাস ভাল।

ব্রাহ্মধর্ম্ম ও ব্রাহ্মসমাজ—আমরা অনেকবার বলিয়াছি যে ব্রাহ্মধর্ম্ম জীবনের আদর্শ এবং ব্রাহ্মসমাজ সেই আদর্শ সাধনের ক্ষেত্র। যদি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষগণ কেবলমাত্র এই কথা বলিয়া দেন যে বি, এ, পরীক্ষা দিতে হইলে, সাহিত্যে এই প্রকার বিদ্যা চাই, অঙ্কে এইরূপ পারদর্শিতা চাই, মনোবিজ্ঞানে এ প্রকার দক্ষতা চাই; ইত্যাদি। কিন্তু তদ্বিষয়ে আশানুরূপ পারদর্শিতা লাভের সহায় স্বরূপ গ্রন্থাবলী যদি নির্দ্দেশ না করেন, তাহা হইলে পারদর্শিতা লাভের বিষয়ে সকলের সমান রূপ উন্নতি দৃষ্ট হয় না। এই জন্য গ্রন্থাবলী নির্দ্দেশ করা আবশ্যক হয়। কিন্তু গ্রন্থাবলী নির্দ্দেশ করিলেও সকল কার্য্য শেষ হয় না। যদি অধ্যাপনা কার্য্যের জন্য কলেজ না থাকে, এবং শিক্ষাকার্য্যে পারদর্শী ও সুদক্ষ অধ্যাপকদিগকে নিযুক্ত করা না যায়, তাহা হইলে কি বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্দ্দিষ্ট শিক্ষার আদর্শ কার্য্যে সাধন হইতে পারে? বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রদর্শিত বিদ্যার আদর্শকে কার্য্যে সাধন করিবার জন্যই, নানা কলেজের সৃষ্টি। এই সকল কলেজ প্রতিনিয়ত সেই আদর্শকে চক্ষের সমক্ষে রাখিয়া সাধন করিতেছেন। সর্ব্বদা আপনাদের ছাত্রদিগকে পরীক্ষা করিয়া দেখিতেছেন কতদূর সে আদর্শের দিকে অগ্রসর হইতেছে। এই দৃষ্টান্ত অবলম্বন করিয়া চিন্তা করিলে আমরা ব্রাহ্মধর্ম্ম ও ব্রাহ্মসমাজের সম্বন্ধের প্রকৃতি যেন কিয়ৎ পরিমাণে অনুভব করিতে পারি। ব্রাহ্মধর্ম্ম আমাদের সমক্ষে ধর্ম্মজীবনের একটী আদর্শ ধরিয়াছেন। সেই আদর্শকে ব্যক্তিগত জীবনে এবং সামাজিক জীবনে সাধন করিতে হইবে। ব্রাহ্মসমাজ সেই সাধনক্ষেত্র। এখানে আমরা সকলে সমবেত ভাবে পরস্পরের সাহায্যে সেই আদর্শকে জীবনে সাধন করিতেছি। ব্রাহ্মধর্ম্ম আমাদের ব্যক্তিগত জীবন ও সামাজিক জীবনকে সম্পূর্ণ নূতন ভিত্তির উপরে স্থাপন করিতে চাহিতেছেন। দেশের লোকের বদ্ধমূল সংস্কার এই যে ঐ নূতন ভিত্তির উপরে সমাজকে স্থাপন করিলে, সমাজের দুর্গতির সীমা থাকিবে না। মানুষ যে ভাবের মধ্যে বর্দ্ধিত হয়, যে সকল সামাজিক ব্যবস্থা শৈশব অবধি দেখিয়া থাকে, তাহাদের চিন্তা স্বভাবতঃই সেই পথে চলিয়া থাকে। তদ্বিরুদ্ধ কোনও প্রকার ব্যবস্থা যে হইতে পারে, এবং তদ্দ্বারা সমাজের যে কুশল হইতে পারে, ইহা তাহাদের মনেই আসে না। সুতরাং কোনও নূতন সামাজিক তত্ত্ব প্রচারিত হইলে তাহারা সন্ত্রস্ত হয়, এবং সেই নূতন তত্ত্বাবলম্বীদিগকে সমাজের ঘোর শত্রু বলিয়া গণনা করে। সর্ব্ব দেশে ও সর্ব্ব কালে এই নিয়ম লক্ষিত হইয়াছে। ভারতে এই নিয়মের ব্যতিক্রম কেন ঘটিবে? এ দেশের প্রাচীনতা-প্রিয় জাতি সকল যে ব্রাহ্মধর্ম্মের নূতন আদর্শকে সন্দেহ ও ভীতির চক্ষে দেখিবেন তাহাতে বিচিত্র কি? কিন্তু আমাদিগকে নিরন্তর আলোচনা করিতে হইবে, পরীক্ষা দ্বারা দেখিতে হইবে, আমরা ব্রাহ্মসমাজরূপ সাধনক্ষেত্রে ব্রাহ্মধর্ম্মের আদর্শ কতদূর কার্য্যে পরিণত করিতে পারিতেছি। আমাদের কার্য্য কলাপকে কতদূর ধর্ম্মবিশ্বাসের অনুগত করিতে পারিতেছি। বিশ্বাস ও তদনুগত জীবন, ইহাতেই ব্রাহ্মসমাজের প্রাণ ইহা আমাদিগকে সর্ব্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে।

পারিবারিক জীবনে ব্রাহ্মধর্ম্মের কার্য্য—ব্রাহ্মধর্ম্ম জীবনের যে নূতন আদর্শ আনয়ন করিয়াছেন; তাহার প্রভাব আমরা ইতিমধ্যেই নানা বিভাগে দর্শন করিতেছি। ইহা ব্যক্তিগত জীবনে নীতি ও সদনুষ্ঠানের ভাব বর্দ্ধিত করিয়াছে; ইহা সর্ব্বসাধারণ্যে বিদিত। তাহার আর বিশেষ উল্লেখের প্রয়োজন নাই। সামাজিক জীবনে বাল্যবিবাহ রহিত করা, বিধবাবিবাহ প্রচলিত করা, বহুবিবাহ নিবারণ করা, অসবর্ণ বিবাহ প্রচলিত করা প্রভৃতি অনেক প্রকার সংস্কারকে প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন, তাহাও সকলে অবগত আছেন। এবং ইহা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না যে এই সকলই ব্রাহ্মসমাজের প্রতি লোকের বিরাগ-বুদ্ধি জন্মিবার প্রধান কারণ। ব্রাহ্মসমাজ এই সকল সমাজ-সংস্কারের কার্য্যে হস্তার্পণ করিয়াছেন বলিয়াই লোকে ইহার প্রতি এত খড়্গহস্ত হইয়াছেন। কিন্তু সমাজ-সংক্রান্ত কতকগুলি কুরীতির উন্মূলন ও কতকগুলি উৎকৃষ্ট রীতির প্রচলন করিয়াই ব্রাহ্মগণ নিশ্চিন্ত হইতে পারিতেছেন না। তাঁহাদের হস্তে অতীব গুরুতর কার্য্যের ভার ন্যস্ত হইয়া রহিয়াছে। পারিবারিক জীবনে ব্রাহ্মধর্ম্মকে প্রতিষ্ঠিত না করিতে পারিলে তাঁহাদের অবলম্বিত সত্য সকল বদ্ধমূল হইবে না। তাঁহারা এতদিনের পরিশ্রম ও যত্নের দ্বারা যাহা কিছু করিতেছেন, তাহা কালে বিলুপ্ত হইয়া যাইবে। যতদিন ব্রাহ্মপুরুষগণ একা একা ধর্ম্মের সংগ্রাম করিতেছিলেন, ততদিন তাঁহাদের মনে ভবিষ্যতের চিন্তা উদিত হয় নাই। তাঁহারা তখন কেবল এই চিন্তা করিয়াছেন, কিরূপে বিশ্বাসানুসারে অনুষ্ঠান করিব, কিরূপে জীবনের সঙ্গিনীকে এই ধর্ম্মের আলোকে আনিব,—কিরূপে প্রাচীন সমাজের নির্যাতন সহ্য করিয়া স্থির থাকিব। কিন্তু এক্ষণে তাঁহাদিগকে আর এক প্রকার চিন্তাতে নিযুক্ত হইতে হইতেছে। এখন তাঁহাদের অনেকেরই গৃহ পুত্র কন্যাতে পূর্ণ হইয়াছে। ব্রাহ্ম গৃহস্থের গৃহে পুত্র কন্যার সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। চতুর্দ্দশ বৎসর পূর্ব্বে বালক বালিকা সম্মিলনের দিন সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরের বেদীর উত্তর পার্শ্বের স্থানও ভাল করিয়া পূর্ণ হইত না, এক্ষণে তাহারা মন্দিরের অর্দ্ধেক স্থান পূর্ণ করিয়া ফেলে। এই সংখ্যা বর্দ্ধিত হওয়ার

সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মগণের দায়িত্ব ও চিন্তা বাড়িয়া যাইতেছে। এখন ভবিষ্যতের প্রতি দৃষ্টি পড়িতেছে। ইহাদিগকে কিরূপে শিক্ষা দিলে, পরিবার মধ্যে ব্রাহ্মধর্ম্ম স্থান প্রাপ্ত হইতে পারে? এই চিন্তা আমাদের সকলের অন্তরে প্রবল হওয়া নিতান্ত আবশ্যক; কারণ যাহারা আমাদের ক্রোড়ে জন্মিয়াছে, আমাদের ক্রোড়ে প্রতিপালিত হইয়াছে, আমাদের শিক্ষা ও শক্তির সম্পূর্ণ অধীন থাকিয়াছে, আমরা যদি তাহাদেরই অন্তরে ধর্ম্মাগ্নি সঞ্চারিত করিতে না পারিলাম, তাহাদিগকে সুশিক্ষিত ও সমুন্নত করিতে না পারিলাম, তখন কোন্ সাহসে বাহিরের লোককে ডাকি, কোন্ সাহসে অপরকে ধর্ম্মাগ্নি দিবার ইচ্ছা করি। যে ব্যক্তি ধন উপার্জ্জন করিতে জানে, কিন্তু ধন রক্ষা করিতে জানে না, সে যেমন সময়ে দারিদ্র্য ভোগ করে, সেইরূপ যে ধর্ম্মসমাজ লোক ডাকিবার জন্য ব্যগ্র; কিন্তু যাহারা হস্তে আছে, তাহাদের রক্ষা ও উন্নতি সাধনের জন্য সচেষ্ট নহে, তাহাদিগকেও অধিক দিন বৃদ্ধি পাইতে হয় না; তাহারা ত্বরায় নানা প্রকার পাপ ও অত্যাচারের আলয় হইয়া উঠে।

ব্রাহ্ম-বালকদিগের নীতি—আমরা দেখিয়া দুঃখিত হইতেছি, অনেক ব্রাহ্ম গৃহস্থের গৃহে বালকগণ আশানুরূপ শিক্ষা পাইতেছে না। কোনও কোনও স্থলে পিতা মাতা পুত্র কন্যাদিগকে ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য ও গতিবিধি হইতে দূরে রাখিতেছেন; এখানকার কার্য্যে তাহাদিগকে মনোযোগী করিতেছেন না; এখানকার পুস্তক পত্রিকাদি পড়িতে দিতেছেন না; এখানকার উপাসনা ও উৎসবাদিতে যোগ দিতে দিতেছেন না; অপর দিকে ব্রাহ্মসমাজ-বিদ্বেষী হিন্দুভাবাপন্ন বালকবালিকাদিগের সহিত বা খ্রীষ্টভাবাপন্ন ফিরিঙ্গী শিশুদিগের সহিত মেশা বন্ধ করিতে পারিতেছেন না, শিক্ষার অনুরোধে সেইরূপ বিদ্যালয়ে পাঠাইতেছেন। ফল এই হইতেছে, তাঁহাদের বালক-বালিকাগণ ব্রাহ্মসমাজের প্রতি অনুরাগহীন এবং কোনও কোনও স্থলে ব্রাহ্ম-বিদ্বেষী হইয়া বর্দ্ধিত হইতেছে। কোনও কোনও গৃহে বালকগণ এরূপ দুষ্ক্রিয়ান্বিত হইয়া উঠিতেছে যে, স্মরণ করিলে কর্ণদ্বয় আবরণ করিতে হয়। অনেক গৃহে বালকগণ শিক্ষা বিষয়ে দেশের উন্নতির সঙ্গে চলিতে পারিতেছে না; অশিক্ষিত ও অজ্ঞ থাকিয়া যাইতেছে। এক্ষণে ব্রাহ্মগণ চিন্তা করুন, এই সকল বালক যখন বয়ঃপ্রাপ্ত হইবে, তখন ইহাদিগকে লইয়া কিরূপ সমাজ গঠিত হইবে। ব্রাহ্মেরা নিজেরাই সেই সকল যুবককে নিজ নিজ কন্যা দিতে চাহিবেন কি না? আর ঘরে ঘরে উচ্ছৃঙ্খল যুবক থাকিলে, তাঁহারা বালিকাদিগের নীতি পরিশুদ্ধ রাখিয়া চলিতে পারিবেন কি না? বিশেষতঃ তাঁহারা বাল্যবিবাহ ও রমণীর অবরোধ প্রথা তুলিয়া দিতেছেন, তাঁহারা কি নিজ সমাজের বালক বালিকাদিগকে সর্ব্বদা দূরে দূরে রক্ষা করিতে পারিবেন? তাহা কি সম্ভব? তবে তাঁহাদের জন্য কি প্রকার ভবিষ্যৎ অপেক্ষা করিতেছে? আর কতদিন তাঁহারা এ সকল বিষয়ে উদাসীন থাকিবেন? দেশের যে প্রকার অবস্থা দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে ব্রাহ্ম-বালকদিগের শিক্ষার বিষয়ে আমাদের মধ্যে অন্ততঃ কয়েক ব্যক্তি যদি বিশেষ মনোযোগী না হন, এবং সেই কার্য্যে জীবন সমর্পণ না করেন, তাহা হইলে ভবিষ্যতে বড় বিপদ দেখা যাইতেছে। যদি সম্ভব হয় সহরের বাহিরে কোনও স্বাস্থ্যকর স্থানে ব্রাহ্ম-বালকদিগের জন্য একটী বোর্ডিং স্থাপন কর। সেখানে উৎকৃষ্ট জ্ঞান শিক্ষা এবং ধর্ম্ম ও নীতি শিক্ষা দিবার বন্দোবস্ত কর। প্রত্যেক ব্রাহ্ম-পরিবারকে সেখানে স্বীয় বালকদিগকে রাখিতে বাধ্য কর। সাবধান থাক, জ্ঞান শিক্ষা বিষয়েও যেন তাহারা উৎকৃষ্ট স্থান অধিকার করিতে পারে। ব্রাহ্মধর্ম্মের আদর্শ তাহাদের অন্তরে উত্তমরূপে মুদ্রিত করিবার চেষ্টা কর। অথবা অন্য কোনও উপায় যদি আলোচনার দ্বারা উৎকৃষ্টতর বলিয়া বোধ হয় তাহা অবলম্বন কর। বর্ত্তমান শিথিলভাবে বালকগণকে বর্দ্ধিত হইতে দিলে আমাদের কল্যাণ নাই।

সম্পাদকীয় ও প্রাপ্ত প্রবন্ধ।

স্বানুভূতি, সৎশাস্ত্র ও সদ্‌গুরু।

একজন প্রসিদ্ধ ইংরাজ লেখক উপহাসচ্ছলে বলিয়াছেন যে শিশুরা যেরূপ কখনও কখনও স্বীয় জনকের স্কন্ধের উপরে চড়িয়া বলিয়া থাকে—"বাবা! আমি মাথাতে তোমা অপেক্ষা বড়" সেইরূপ আমরাও অনেক সময়ে আমাদের পূর্ব্বপুরুষদিগের স্কন্ধে বসিয়া বলিয়া থাকি—আমরা তোমাদের অপেক্ষা বড়। এই উপহাসোক্তির মধ্যে কিছু সত্য নিহিত আছে। জগতের বর্ত্তমান উন্নতি যে ভূতকালের উন্নতির উপরে স্থাপিত তাহা আমরা অনেক সময়ে ভুলিয়া যাই।

মানব-জ্ঞানের সকল বিভাগেই দৃষ্ট হয় যে, বর্ত্তমান অতীতের উপরেই প্রতিষ্ঠিত। যদি কেহ অদ্য জগতের সুখ সম্পদ বৃদ্ধির কোনও নূতন উপায় উদ্ভাবন করিতে প্রবৃত্ত হন, তাহা হইলে তাঁহাকে ভূতকালে যে কিছু উপায় উদ্ভাবিত হইয়াছে তাহার আলোচনা করিতে হয় ও তন্মধ্যে যাহা কিছু উৎকৃষ্ট আছে, তাহাকে স্বীয় পরামর্শের মধ্যে গ্রহণ করিতে হয়। একজন একটা নূতন প্রকারের লোহার কল প্রস্তুত করিতে যাইতেছেন। তাঁহাকে আলোচনা দ্বারা দেখিতে হইবে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত লৌহের কি পরিমাণ উৎকৃষ্টতা হইয়াছে, সেই লৌহকে কতদূর কাজে লাগান যাইতে পারে? অথবা যতদূর উন্নতি হইয়াছে, তাহার উপরে আরও কতটা উন্নতি করিয়া লওয়া যাইতে পারে ইত্যাদি। তাহা না করিয়া সে ব্যক্তি যদি বলেন, ভূতকালে যাহা কিছু হইয়াছে, তাহার সহিত আমার সম্বন্ধ নাই; আমি বিশ্বামিত্রের সৃষ্টির ন্যায় সম্পূর্ণ নূতন জগত রচনা করিব; আমি খান হইতে লৌহ তুলিব, গালাইব, খাদ বাহির করিব, ইস্পাত করিব ইত্যাদি, তবে সকলেই এরূপ ব্যক্তিকে বাতুল বলিয়া বিদ্রূপ করে। যে কার্য্য লোকে শত শত বৎসর ধরিয়া করিয়া তুলিয়াছে, তাহাতে তুমি সময় নষ্ট কর কেন? বিজ্ঞান বিষয়েও এইরূপ। কোনও বিজ্ঞানবিদ্ পণ্ডিত যদি অতীতের প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া যতদূর বিজ্ঞানের তত্ত্ব আবিষ্কার হইয়াছে, তাহা লক্ষ্য না করিয়া নিজে গোড়া

চ আরম্ভ করিতে যান, তবে সকলেই তাঁহাকে বাতুল বলিয়া ও উপহাস করে। বিজ্ঞান সম্বন্ধে দিন দিন যে উন্নতি হইতেছে তাহাও অতীতের উপরে প্রতিষ্ঠিত।

মানব জীবনের বা মানব সমাজের কোনও বিভাগেই দেখা যায় না যে অতীতকে সম্পূর্ণ বিস্মৃত হইয়া কোনও উন্নতি দাঁড়াইতেছে। বরং ইহা বলিতে হয় যে, কোনও ব্যক্তি বা কোনও সম্প্রদায় যদি অতীতকে অগ্রাহ্য করিয়া চলে তবে তাহাকে শাস্তি ভোগ করিতে হয়। একজন প্রসিদ্ধ মার্কিন পণ্ডিত বলিয়াছেন,—"সত্য এমন বস্তু, যদি অনবধানতা বশতঃ পথে ফেলিয়া যাও, তবে পুনরায় কুড়াইয়া লইবার জন্য পিছাইয়া আসিতে হয়।" ইহার অর্থ এই, আজ যদি অতীতের কোনও মহাসত্যের প্রতি উপেক্ষা করিয়া চলিয়া যাও, কিছুদিন পরে আবার সমাজের পশ্চাদ্দিকে গতি দেখিতে পাইবে—এই শাস্তি। কোনও বিষয়েই যদি অতীতকে অগ্রাহ্য করিয়া চলা কর্ত্তব্য না হয় তবে ধর্ম্ম-জ্ঞান বিষয়ে কেন কর্ত্তব্য হইবে? জগদীশ্বর কি কেবল বর্ত্তমান সময়েই মানব-হৃদয়ে সত্য সকল উদ্ভাসিত করিতেছেন? এ বিষয়ে দুই শ্রেণীর লোকে দুই অতিরিক্ত সীমায় গমন করিয়া থাকেন। এক শ্রেণী অতীতকালে উদ্ভাসিত সত্য সকলের প্রতি এত জোর দেন যে তাহার সহিত তুলনায়, বর্ত্তমানে ব্যক্তিগত জীবনে উদ্ভাসিত সত্য সকলকে অতি হীন বোধে উপেক্ষা করিয়া থাকেন:—অপর শ্রেণী ব্যক্তিগত জীবনে উদ্ভাসিত সত্যকে এত শ্রেষ্ঠ স্থান দেন যে অতীতে উদ্ভাসিত সত্য সকলকে অবজ্ঞার চক্ষে দেখিয়া থাকেন। এই দুই প্রকার ভ্রমের দুই প্রকার ফল। অতীতের উপরে অতিরিক্ত জোর দিলে, অতীতেই আবদ্ধ থাকিলে, অতীতের আলোকের অনুরোধে নিজ আলোক নির্ব্বাণ করিলে, উন্নতির দ্বার বদ্ধ হইয়া যায়। সেরূপ সমাজ উন্নতিবিহীন গতিবিহীন ও উদ্যমবিহীন হইয়া থাকে। আবার অতীতকে সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করিয়া চলিলে মানব নানাপ্রকার ভ্রমের মধ্যে পতিত হয়। বিশেষতঃ ঈশ্বর-বিশ্বাসী প্রত্যেক ব্যক্তিই ইহা স্বীকার করিয়া থাকেন ঈশ্বরই ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক। তিনিই যুগে যুগে মানব-হৃদয়ে সত্যকে প্রকাশ করিয়াছেন। সময়ে সময়ে মানব-অন্তরে যে সকল সত্য প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা (মানবীয় দুর্ব্বলতা ও ভ্রমের দ্বারা জড়িত হইয়া) প্রাচীন শাস্ত্র সকলে নিবদ্ধ রহিয়াছে। অতএব প্রাচীন শাস্ত্র সকলকে অতীতের প্রকাশিত সত্য সকলের খনিস্বরূপ মনে করিলেও হয়। সত্যনিষ্ঠ ব্যক্তি আপনার ধর্ম্ম জীবন গঠন করিবার সময়ে এ সকলকে একেবারে উপেক্ষা করিতে পারেন না। অতীতকে সমাদর করিতে হইলে ইহাদিগকেও মনোযোগ পূর্ব্বক দেখিতে হয়।

এক্ষণে উপায় কি? যদি অতীতের প্রতি অতিরিক্ত ঝোঁক নিষিদ্ধ, যদি নিজের আলোককেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভাবিয়া অপর সকল আলোককে উপেক্ষা করা ও নিষিদ্ধ, তবে কর্ত্তব্য কি? এই স্থলে যোগবাশিষ্ঠের একটী বচন স্মরণ হয়, তাহা এই:—"স্বানুভূতেঃ সুশাস্ত্রস্য গুরোশ্চৈবৈকবাক্যতা।"

অর্থাৎ স্বানুভূতি, সুশাস্ত্র ও সদ্‌গুরু এই তিনের একবাক্যতা অন্বেষণ করিতে হইবে। এখানে স্বানুভূতি অর্থাৎ ব্যক্তিগত বিবেক সর্ব্বাগ্রে ও সর্ব্ব প্রধান। তাহাই ভিত্তি। স্বানুভূতিকে প্রথমে সুশাস্ত্রের সহিত তুলনা করিতে হইবে; তৎপরে সদ্‌গুরু অর্থাৎ জীবন্ত সাধক ও সাধুদিগের মধ্যে কাহারও সহিত যদি ঘনিষ্ঠ আধ্যাত্মিক সম্বন্ধ থাকে, তবে তাঁহার প্রদর্শিত আলোকের সহিত তুলনা করিতে হইবে। যদি শাস্ত্রে ও সাধু বচনে স্বানুভূতি-লব্ধ সত্যের সায় পাওয়া যায়, তাহা হইলে বড় সুখের বিষয়। অবশ্য একথা বলিলে ইহা ও বলা হইল যে শাস্ত্র ও গুরুবাক্য যদি স্বানুভূতির বিরোধী হয়, তাহা হইলে স্বানুভূতি-প্রদর্শিত পথ অবলম্বনীয়। তথাপি পূর্ব্বোক্ত উপদেশের তাৎপর্য্য এই সত্য-নির্ণয়েচ্ছু ব্যক্তিকে সুশাস্ত্র ও সদ্‌গুরুর উপদেশের প্রতি একটা শ্রদ্ধাপূর্ণ ভাব রক্ষা করিতে হইবে। তদ্ভিন্ন তিনি সত্য-নির্ণয়ে সমর্থ হইবেন না।

সদ্‌গুরু শব্দের অর্থ কি? গুরু শব্দটী বিদ্যালাভে সচরাচর ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বিদ্যালাভ বিষয়ে গুরু দুই প্রকার কার্য্য করিয়া থাকেন। প্রথম নিজ জ্ঞান-স্পৃহার সংস্পর্শে শিষ্যদিগের অন্তরে জ্ঞানস্পৃহা উদ্দীপ্ত করেন; দ্বিতীয়তঃ জ্ঞানলাভের প্রণালী নির্দ্দেশ করেন। সংগীত বিদ্যার দৃষ্টান্তের দ্বারা অর্থটী বিশদ করা যাইতে পারে। একজন সংগীত রসাভিজ্ঞ ও সংগীতবিদ্যা-পারদর্শী ওস্তাদ্ বা গুরু আছেন। কতকগুলি যুবক তাঁহার নিকটে সংগীত শিক্ষা করিতেছেন। ইহাঁরা ঐ ওস্তাদের নিকট দুই ভাবে উপকৃত হইতে পারেন। প্রথমতঃ তাঁহার সংগীতানুরাগ দ্বারা ইহাঁদের মনে সংগীতানুরাগ জন্মিতে পারে; দ্বিতীয়তঃ ওস্তাদ নিজে গাইয়া নানাপ্রকার রাগরাগিণীর লক্ষণ ও প্রণালী দেখাইয়া দিতে পারেন। শিষ্যেরা "ইমন" আলাপ করিতেছে ঠিক হইতেছে না, গুরু একটু গাইয়া দেখাইয়া দিলেন। ধর্ম্মজগতেও আমরা সাধনপথে অগ্রসর ব্যক্তিদিগের নিকট উক্ত উভয় প্রকার উপকার লাভ করিতে পারি। আমরা তাঁহাদের বিশ্বাস, বৈরাগ্য, সেবার অগ্নির সংস্পর্শে সেই অগ্নি লাভ করিতে পারি; দ্বিতীয়তঃ অনেক প্রশ্নে তাঁহাদের অভিজ্ঞতার সাহায্য পাইতে পারি। যাঁহারা নিজ জীবনের আলোক দ্বারা আমাদের ব্যক্তিগত জীবনের আলোককে আরও উজ্জ্বল করিয়া দেন তাঁহারাই আমাদের ধর্ম্মপথের প্রকৃত বন্ধু, তাঁহাদিগকে ধর্ম্মপথের বন্ধু বল, সহায় বল, শিক্ষক বল, গুরু বল বিষয়টা একই।

এই গুরুবাদ সম্বন্ধেও আমরা দুই শ্রেণীর লোককে দুই অতিরিক্ত সীমাতে যাইতে দেখিতেছি। এক শ্রেণী গুরুর চরণে ব্যক্তিত্ব ও মনুষ্যত্ব বিক্রয় করিয়া ক্ষুদ্র হইয়া যাইতেছেন; অপর শ্রেণী সাধক ও সাধুদিগের প্রতি সমুচিত আদরের অভাবে অহমিকার হস্তে পতিত হইয়া ধর্ম্মকে হারাইতেছেন। গুরুবাদের যে অনিষ্ট ফল এদেশে ফলিয়াছে তাহা স্মরণ করিলেও হৃদয় দুঃখে ম্লান হয়! মানুষগুলি মনুষ্যত্ব বিহীন হইয়া শিশুর মত হইয়া গিয়াছে; চিন্তা ও বিচার শক্তিকে জলাঞ্জলি দিয়া জড়প্রায় হইয়া পড়িয়াছে; পাপকে বাধা দিবার সাধ্য আর তাহাদের নাই! মনুষ্যকে এরূপ মনুষ্যত্ব হীন অবস্থাতে যাহারা পরিণত করে তাহারা মানবের বন্ধু নহে,

পরম শত্রু। সুতরাং গুরু এই শব্দ উচ্চারণ মাত্র বহু সংখ্যক ভুক্ত-ভোগী লোকের দারুণ ঘৃণা ও আতঙ্ক উপস্থিত হওয়া কিছুই বিচিত্র নহে। আমরা শব্দের জন্য কলহ করিতেছি না। গুরু শব্দ রুচি-সঙ্গত না হয় "সাধুপদেশ" বল বা অন্য শব্দের সৃষ্টি কর।" ভিতরকার কথাটা এই, ধর্ম্মজীবনে অগ্রসর ব্যক্তিদিগের উপদেশের প্রতি শ্রদ্ধা পূর্ব্বক কর্ণপাত করিতে হইবে এবং স্বানুভূতির আলোককে তাঁহাদের আলোকের সহিত মিলাইতে হইবে; তবে সত্য-নির্ণয়ের পক্ষে সহায়তা হইবে।

অতীতের প্রতি ও সাধুজনের প্রতি শ্রদ্ধাপূর্ণ ভাব থাকিলে তাঁহাদের গুণাবলী আমাদের হৃদয়ে কার্য্য করিতে পারে। অপরের যে কিছু সদ্‌গুণ আছে, বিনয়ী ব্যক্তি তাহা দেখিতে পায়। অহঙ্কারীর নিজ অহঙ্কার তাহার দৃষ্টিকে আবরণ করে। অনেক অমূল্য বস্তু তাহার চক্ষের নিকটে থাকে অথচ সে দেখিতে পায় না। ব্রাহ্মসমাজ এই সাধুভক্তিকে এদেশের লোকের মনে উদ্দীপ্ত করিবার চেষ্টা করিতেছেন। যীশু, বুদ্ধ, মহম্মদ প্রভৃতির প্রতি লোকের যে শ্রদ্ধা বাড়িতেছে, তাহার মূলে কি ব্রাহ্মসমাজের চেষ্টা নহে? প্রাচীন হিন্দুশাস্ত্রের প্রতি লোকের যে শ্রদ্ধা বাড়িয়াছে, তাহার মূলেও কি ব্রাহ্মসমাজের ও তত্ত্ববোধিনী সভার চেষ্টা নহে? অতএব সাধুভক্তি ভগ্ন না করিয়া রক্ষা করাই ব্রাহ্মসমাজের চেষ্টা। কেবল ভঙ্গ করা ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য নহে, গঠন করাই ইহার প্রধান কার্য্য। ইহা সকল দেশের সকল সাধুতাকে পরিপোষণ করিবে; সকল কালের সকল সাধুর সহিত হৃদয়ের যোগ স্থাপন করিবে। এই মহালক্ষ্য জগতের পক্ষে নূতন এবং ইহা ব্রাহ্মসমাজের মহা কর্ত্তব্য।

জীবন-সংগ্রাম ও পাপ পুণ্যের জন্মভূমি।

আমরা এই জগতে তিন প্রকারের পদার্থ দেখিতে পাই। এক জড়, দ্বিতীয় ইতরপ্রাণী, তৃতীয় মানব। এই তিন প্রকারের পদার্থেরই এক একটা বিশেষত্ব আছে। জড়ের বিশেষত্বকে জড়তা, সাধারণ প্রাণিগণের বিশেষত্বকে স্থূলচৈতন্য,এবং মানবের বিশেষত্বকে সূক্ষ্মচৈতন্য নামে অভিহিত করিতে পারা যায়। জড় সৃষ্টি প্রকরণের নিম্ন সোপানে প্রতিষ্ঠিত, স্থূলচৈতন্য তাহার মধ্যসোপানে বিরাজিত, এবং সূক্ষ্মচৈতন্য তাহার শীর্ষস্থলে সুশোভিত। জড় জড় শক্তির অধীন, স্থূলচৈতন্য প্রাণশক্তি দ্বারা পরিচালিত, এবং সূক্ষ্মচৈতন্যের রাজ্যে আধ্যাত্মিক শক্তি প্রতিষ্ঠিত।

সূক্ষ্মচৈতন্য মানবের বিশেষত্ব হইলেও, সে এই ত্রিবিধ উপকরণেই গঠিত হইয়াছে। জড়শক্তি, প্রাণশক্তি এবং আত্মশক্তি এই শক্তিত্রয়ের কার্য্যফলেরই নাম মানব-জীবন বা মানব-চরিত্র। এই বিভিন্ন ও কিয়ৎপরিমাণে পরস্পর-বিরোধী শক্তিত্রয়ের সমাবেশ হইতেই মানবচরিত্রের অদ্ভুত বিচিত্রতার উৎপত্তি হইয়াছে। এই ত্রিবিধ পদার্থ ও ত্রিবিধ শক্তি দ্বারা গঠিত বলিয়াই আমরা একই কালে আপনাদিগকে বদ্ধ এবং মুক্ত, মলিন এবং নির্ম্মল, পরাধীন এবং স্বাধীন জীবরূপে অবগত হইতেছি।

এই জড় দেহ জড় নিয়মের অধীন; মাধ্যাকর্ষণী শক্তি, রসায়নশক্তি, তড়িৎশক্তি প্রভৃতি জড়শক্তি এই দেহপিঞ্জরকে প্রতিনিয়ত ভাঙ্গিতেছে ও গড়িতেছে। এই প্রাণ মন জীবনিয়মের অধীন, ইন্দ্রিয়শক্তি এবং ইন্দ্রিয়জ সুখ দুঃখাদির আসক্তি বিরক্তি প্রভৃতি বাসনাকুলের দ্বারা ইহারা পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হইতেছে। এই দেহ মনের অতীত আত্মা আধ্যাত্মিক শক্তি সঞ্চারের দ্বারা উদ্বোধিত ও বিকসিত হইতেছে।

এই শক্তিত্রয় বিভিন্ন এবং কিয়ৎপরিমাণে পরস্পর বিরোধী হইলেও মানবজীবনে সর্ব্বদা পরস্পরের সঙ্গে অতি ঘনিষ্ঠভাবে সম্বদ্ধ থাকিয়া আপন আপন কার্য্য সাধন করিয়া থাকে। আমাদিগের জড়দেহ কেবল জড়শক্তির অধীন নহে, কিন্তু প্রাণশক্তিরও অধীন। কেবল তাহাই নহে, ইহার উপরে প্রাণশক্তির যতটা প্রভুত্ব আছে, কেবলমাত্র জড়শক্তির সেরূপ কোনওই আধিপত্য নাই। কেবল রসায়নের নিয়মের দ্বারাই এই জড়দেহযন্ত্র নিয়ন্ত্রিত হয় না; প্রাণশক্তির সাহায্য ব্যতিরেকে রসায়নশক্তি এই জড়দেহের উপরে কার্য্য করিতে গিয়া অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে। এই জন্যই সর্ব্বপ্রকারের প্রকৃষ্ট চিকিৎসা প্রণালীতে রোগীর প্রকৃতিভেদে, একই জাতীয় রোগে, বিভিন্ন ঔষধ প্রযুক্ত হইয়া থাকে। আমাদিগের প্রকৃতিতে এই জড় দেহের জড়শক্তি সতত প্রাণশক্তিকে অবলম্বন করিয়াই বাস করিতেছে। এমন কি চেষ্টা করিলে,অতি সহজেই এই প্রাণশক্তি দেহস্থিত জড়শক্তিকে সম্পূর্ণরূপে স্বাধিকারচ্যুত করিয়া রাখিতে পারে। বিষয় বিশেষে গভীর ভাবে মনোনিবেশ করিলে, অতি সহজেই এই দেহকে ক্ষুৎপিপাসা এবং শীতোষ্ণের অতীত করিয়া তুলিতে পারা যায়। ভারতের যোগিগণের জীবনবৃত্তান্তে ইহার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত প্রাপ্ত হওয়া যায়। এরূপ শ্রুত হওয়া যায়, ইউরোপের মধ্যযুগে একজন খৃষ্টীয় তপস্বী ঈশার মৃত্যুযাতনা আপনার জীবনে উপলব্ধি করিবার চেষ্টায় গভীর ধ্যাননিমগ্ন হইয়াছিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে ক্রমে ঈশার দেহের যে যে স্থলে লৌহবিদ্ধ হইয়াছিল বলিয়া জনশ্রুতি আছে,এই ধ্যাননিমগ্ন তাপসের শরীরের সেই সেই স্থান বিদীর্ণ হইয়া রক্তস্রোত প্রবাহিত হইতে আরম্ভ করিয়াছিল। কেবল এইরূপ যোগধ্যানেই যে মানবের জীবশক্তি তাহার দেহের জড়শক্তিকে পরাস্ত করিয়া থাকে, তাহা নহে। অন্যান্য অবস্থাধীনে অন্যান্য প্রণালীতে এবং এই জীবশক্তি জড়শক্তির উপরে নিয়োজিত হইয়া তাহাকে আপনার অধিকারচ্যুত করিয়া রাখে। কাম ক্রোধ রিপু অত্যধিক মাত্রায় উত্তেজিত হইলে যে মানবের জড়জ্ঞান প্রায়ই লুপ্ত হইয়া যায়, ইহা কে না জানে? অত্যধিক মানসিক উত্তেজনাতে আমরা প্রায়শঃই তো জড়শক্তিকে অবলীলাক্রমে অতিক্রম করিতেছি। যেমন জীবশক্তি জড়শক্তির নিয়ামক রূপে মানবপ্রকৃতিতে নিহিত রহিয়াছে, তেমনি আত্মশক্তি এই দেহস্থ জড়শক্তি ও এই অন্তরস্থ প্রাণশক্তি উভয়েরই নিয়ামক এবং প্রভু হইয়া উভয়েরই উপরে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে।

মানব প্রকৃতিতে এই ত্রিবিধ শক্তির সমাবেশ হইতে যেমন

মানব চরিত্রের বিচিত্রতার উৎপত্তি হইয়াছে, তেমনি এই শক্তিত্রয়ের পরস্পর বিরুদ্ধ ভাব ও কার্য্য হইতেই মানব জীবনের সর্ব্ব প্রকারের নৈতিক সংগ্রামেরও সৃষ্টি হইয়াছে। এই মহাযুদ্ধে নিক্ষিপ্ত ভীষণ আগ্নেয়াস্ত্র সমূহের দ্বারা উদ্গীরিত ধূমরাশিই মোহরূপে তাহার প্রাণকে আচ্ছন্ন করিতেছে; এই সকল অস্ত্র-প্রক্ষিপ্ত বাণ সকলই শোক দুঃখ প্রভৃতি রূপে মানবের কোমল মর্ম্মস্থলকে দিবানিশি বিদ্ধ করিতেছে। এই সংগ্রামের সমাপ্তি না হইলে মানব কদাপি শাশ্বতী শান্তি ও নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ উপভোগ করিতে সক্ষম হয় না।

এই সংগ্রামক্ষেত্রেই পাপ পুণ্যেরও জন্ম হইয়া থাকে। নতুবা বিধাতা পুরুষ অন্য কোনও রূপে বা অন্য কোনও প্রণালীতে মানবকে সাক্ষাৎভাবে পাপ পুণ্য প্রদান করেন নাই। যেমন জলের ধর্ম্মই শৈত্য, অগ্নির ধর্ম্মই উত্তাপ, তেমনি মানব প্রকৃতির এই অপরিহার্য্য শক্তি-সংঘর্ষণের ধর্ম্মই পাপ পুণ্যের প্রতিষ্ঠা। যতদিন এই সংগ্রাম, ততদিন মানবের পাপ ও পুণ্য-বোধ, সুখ এবং দুঃখবোধ, থাকিবেই থাকিবে। এই সংগ্রাম যতদিন না আরম্ভ হয়, অর্থাৎ মানব যতদিন কেবল মাত্র জড় নিয়ম বা জীব নিয়মেরই অধীন থাকে, ততদিন পর্য্যন্ত তাহার অন্তরে পাপ পুণ্যের জ্ঞান প্রকাশ পায় না। অপোগণ্ড শিশু, যে কেবল জড় শক্তি এবং নিম্নতর জীবশক্তি দ্বারাই জীবিত থাকে এবং আপনার ইন্দ্রিয় চালনা করে, তাহার তো কোনওই পাপ পুণ্য বোধ নাই। ক্রমে জীবশক্তির বিকাশে যখন তাহার অন্তরে বিভিন্ন বাসনা জাগ্রত হইতে আরম্ভ করে, এবং এই সকল বাসনার মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা উপস্থিত হইয়া যখন মানব-জীবনে এক মহাসংগ্রামের সূত্রপাত করে, তখন হইতেই তাহার অন্তরে ভাল মন্দ এবং তৎসঙ্গে সঙ্গে পাপ পুণ্য বোধেরও সঞ্চার হইয়া থাকে। অতি শৈশবে মানব প্রকৃতিতে এক শক্তিরই প্রাধান্য থাকে, অপর শক্তি তখন সেই এক শক্তিরই বশে বাস করে, তখনও মানবের জীবনে শক্তিদ্বন্দ্ব উপস্থিত হয় না, অতএব সে কালে মানবের পাপও নাই পুণ্যও নাই; কর্ত্তব্যও নাই অকর্ত্তব্যও নাই; কর্ত্তৃত্বও নাই, কর্ম্মও নাই, কর্ম্মফল সংযোগও নাই। মানব প্রকৃতির বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে ইহারা ক্রমে তাহা হইতেই উৎপন্ন হইয়া থাকে। যেমন অতি শৈশবে জীবনের প্রত্যূষ-কালে মানবের পাপ পুণ্য থাকে না; তেমনি জীবনের পরিণতিতে, যদি সৌভাগ্যক্রমে এই শক্তি দ্বন্দ্ব নিবৃত্ত হইয়া যায়, শৈশবে যেমন এক শক্তির অনন্য-প্রতিযোগী প্রভুত্ব মানবের উপরে প্রতিষ্ঠিত হইয়া একই প্রণালীতে নির্ব্বিরোধে শিশু জীবনকে পরিচালিত করে, পরিণত বয়সে যদি সেইরূপ এক শক্তিরই অনন্য-প্রতিযোগী প্রভুশক্তি মানবচরিত্রে বদ্ধমূল হইয়া গিয়া, মানবের জীবনকে নির্ব্বিরোধে একই পথে পরিচালিত করিতে সক্ষম হয়, তবে তখনও আর এই পরম সৌভাগ্যশালী ব্যক্তির পক্ষে পাপ পুণ্যের সংগ্রাম থাকে না। জীবন-প্রভাতে যেমন মানব-প্রকৃতি নিহিত সমুদায় শক্তি জড়শক্তি এবং নিম্নতর জীবশক্তির সম্পূর্ণ বশে থাকে, জীবন-মুক্তিতেও তেমনি আমাদিগের প্রকৃতিগত শক্তি সমূহ এক সূক্ষ্ম চৈতন্য শক্তির সম্পূর্ণ বশীভূত হইয়া থাকে, এবং এই জন্যই মুক্তজীব "পুণ্য পাপে বিধূয় পরম সাম্যমুপৈতি।"

এই সূক্ষ্ম চৈতন্যশক্তির আবির্ভাব ব্যতিরেকে মানবহৃদয়ে প্রকৃত পাপবোধ জন্মিতে পারে না। আমরা সচরাচর যাহাকে পাপ পুণ্য নামে অভিহিত করি, অনেক সময়ই তাহা কেবলমাত্র লৌকিক নিয়মও তাহার ব্যতিক্রমের নামান্তর মাত্র। কিন্তু আত্মশক্তি জাগ্রত হইলে তাহার সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব্ব জীবনের পাপ পুণ্যের সংজ্ঞা পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। তখন পাপ ও পুণ্য বাহিরের কার্য্যক্ষেত্র হইতে স্থানান্তরিত হইয়া অন্তরের চিন্তাও ভাবের ক্ষেত্রে গিয়া প্রতিষ্ঠিত হয়। পূর্ব্বে, যখন মানুষ কেবল জড় ও জীবনশক্তির অধীন ছিল, তখন যাহা পাপ ছিল না, এমন কি তখন যাহা পুণ্য ছিল, এখন তাহা মহাপাপে পরিণত হইয়া উঠে। যতদিন না আত্মশক্তির স্ফূর্ত্তি হয়, ততদিন জীবন-শক্তিকে যথোচিত ভাবে রক্ষা করা, যথাবিধি আহার, নিদ্রা ইত্যাদি, পুণ্যকর্ম্ম বলিয়া পরিগণিত। ততদিন জীবন ক্ষয় ও স্বাস্থ্যভঙ্গ; মহাপাপ। কিন্তু আত্মশক্তি জাগ্রত হইলে, আধ্যাত্মিক কল্যাণের জন্য যদি প্রয়োজন হয়, আপনার জীবনশক্তিকে ক্ষয় করা, অনিদ্রায় অনশনে শরীরকে সংযত ও ক্লিষ্ট করা, মহা পুণ্যকার্য্য হইয়া উঠে, তাহা না করিলে পাপ হয়। যাহারা যে নিয়মের অধীন থাকে, সেই নিয়মের দ্বারাই তাহাদের পাপ পুণ্য নির্দ্ধারিত হয়। যাহারা জড়নিয়মের বা কেবল জীবন-নিয়মের অধীন তাহাদের পাপ পুণ্য ঐ নিয়মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে। যাঁহারা ঈশ্বরের কৃপায় আধ্যাত্মিক রাজ্যের প্রজাস্বত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন, অন্য তুলাদণ্ডে তাঁহাদের পাপ পুণ্যের পরিমাপ হয়। কেবল জীবন-শক্তির অধীন যাঁহারা, সমাজের বিধান মান্য করিয়া সংসারের ধন মান আয়োজন করা, জীবনের সুখ-স্বচ্ছন্দতা ভোগ করা তাঁহাদের ধর্ম্ম হইতে পারে, কিন্তু পরমেশ্বরের অধ্যাত্ম-রাজ্যের প্রজা যাঁহারা হইয়াছেন, তাঁহাদিগের পক্ষে বিষয়-ত্যাগ ও বৈরাগ্যই ধর্ম্ম, ইহার ব্যতিক্রম অধর্ম্ম। ব্রাহ্মবন্ধু এখন নির্দ্ধারণ করুন, তিনি কেবল জীবন রাজ্যেই বাস করিবেন, না পরব্রহ্মের অধ্যাত্মরাজ্যে তাঁহার দাস হইবার জন্য ব্রাহ্মসমাজে আসিয়াছেন।

পাঁচ ফুলের সাজি।

1. Socrates—

"Intimacy with the good leads to the practice of virtue, whereas the companionship of the wicked destroys it."

সাধুগণের সহিত ঘনিষ্ঠতা আমাদিগকে ধর্ম্মসাধনে লইয়া যায়, আর দুষ্টের সহবাস তাহা নষ্ট করে।

2. S. T. Coleridge.

"O fair is Love's first hope gentile mind!
As Eve's first star through fleecy cloudletpeeping"

ক্ষুদ্র ঘনরাশির মধ্য হইতে উঁকি ঝুঁকি মারিয়া দেখিবার.

সবে মাত্র সন্ধ্যার প্রথম তারকাটী যেমন দেখায় প্রেমের প্রথম আশা তেমনি মৃদু অন্তরের পক্ষে সুন্দর।

"For what is freedom, but the unfettered use
Of all the powers which God for use had given?
But chiefly this, him first, him last to view
Through meaner powers and secondary things
Effulgent, as through clouds that veil his blaze."

কারণ, ব্যবহারার্থে ঈশ্বর যে সমুদায় শক্তি দিয়াছেন, স্বাধীনতা তাহারই স্বাধীন ব্যবহার ব্যতীত আর কি? কিন্তু প্রধানতঃ এই যে, তাঁহার জ্যোতি আবরণকারী মেঘমালাস্বরূপ নিকৃষ্টতর শক্তি এবং বস্তু সমূহের মধ্য দিয়া সর্ব্বপ্রথম এবং সর্ব্বশেষ রূপে তাঁহাকে নিরীক্ষণ করা।

৩। চাণক্য—

"মুহূর্ত্তমপি জীবেচ্চ নরঃ শুক্লেন কর্ম্মণা।
ন কল্পমপি কষ্টেন লোকদ্বয়-বিরোধিনা॥"

নির্ম্মল (পুণ্য) কর্ম্ম সাধন করিয়া এক মুহূর্ত্ত বাঁচিলেও জীবন সার্থক হয়; ইহপরকাল বিনষ্ট করিয়া যুগান্তকাল জীবন ধারণ করিলেও ফল নাই।

৪। যোগবাশিষ্ট—

"ন দৈবংনচ কর্ম্মাণি ন ধনানি ন বান্ধবাঃ।
শরণং ভবভীতানাং স্বপ্রযত্নাদৃতে নৃণাং॥"

(তত্ত্বজ্ঞান বিষয়ে) যত্ন না করিলে, কি দৈব কর্ম্ম, কি ধন কি বন্ধু, কোন বস্তুই ভব-ভয়-ভীত মানবকে রক্ষা করিতে পারে না।

৫। তলবকারোপনিষৎ—

"যদ্বাচানভ্যুদিতং যেন বাগভ্যুদ্যতে।
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে।"

বাক্য যাঁহাকে প্রকাশ করিতে পারে না, যাঁহাদ্বারা বাক্য নিয়োজিত হয়, তাঁহাকেই তুমি ব্রহ্ম বলিয়া জান; লোকে যে পরিচ্ছিন্ন বস্তু উপাসনা করে, তাহা কখন ব্রহ্ম নহে।

"যন্মনসা ন মনুতে যেনাহুর্ম্মনোমতম্।
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে॥"

ব্রহ্মজ্ঞানিগণ বলেন, লোকে মনের দ্বারা যাঁহাকে মনন করিতে পারে না, যিনি মনকে জানিতেছেন, তাঁহাকেই ব্রহ্ম বলিয়া জান; লোকে যে কিছু পরিমিত পদার্থের উপাসনা করে, তাহা কখন ব্রহ্ম নহে।

6. The Koran.

"God loveth not corrupt doing"

ঈশ্বর অসদাচার ভাল বাসেন না।

"God is gracious unto His servants."

ঈশ্বর তাঁহার সেবকগণের প্রতি সদয়।

"Know that God is mighty and wise."

জানিও যে ঈশ্বর শক্তিমান এবং জ্ঞানবান।

"God loveth those who repent,
and loveth those who are clean."

যাঁহারা অনুতাপ করেন, ঈশ্বর তাঁহাদিগকে ভাল বাসেন, এবং যাঁহারা নির্ম্মল তাঁহাদিগকে ভাল বাসেন।

7. St. Matthew—

"Blessed are they which are persecuted for righteousness' sake: for their's is the kingdom of heaven."

"Blessed are ye, when men shall revile you, and persecute you, and shall say all manner of evil against you falsely, for my sake."

Rejoice and be exceeding glad: for great is your reward in heaven; for so persecuted they the prophets which were before you."

যাঁহারা ধর্ম্মের জন্য উৎপীড়িত হন তাঁহারাই ধন্য, কারণ স্বর্গরাজ্য তাঁহাদেরই।

(তখনই) তোমরা ধন্য, যখন মনুষ্যগণ ধর্ম্মের জন্য, তোমাদিগকে গালি দিবে, নির্য্যাতন করিবে, এবং মিথ্যাপূর্ব্বক তোমাদের বিরুদ্ধে যথেচ্ছ অপবাদ দিবে।

উল্লাস কর, এবং নিরতিশয় আনন্দিত হও, কারণ স্বর্গে তোমাদের পুরস্কার মহৎ। কারণ এই রূপেই তোমাদের পূর্ব্ববর্ত্তী মহাজনগণকে নিপীড়িত করিয়াছিল।

প্রেরিত পত্র।

(পত্রপ্রেরকের মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন কিম্বা কাপি ফেরত দিতে বাধ্য নহেন।)

মান্যবর শ্রীযুক্ত তত্ত্বকৌমুদী সম্পাদক মহাশয়
সমীপেষু।

মহাশয়,

গত ১লা ভাদ্রের তত্ত্বকৌমুদীতে "জনৈক সভ্য" স্বাক্ষরিত "হরিনামের অনিষ্টকারিতা" সম্বন্ধে এক পত্র এবং "শ্রীপ্রতুলচন্দ্র সোম" স্বাক্ষরিত "আহারার্থে প্রাণিনাশ প্রকৃতপক্ষে নির্দ্দয়তা নয়" সম্বন্ধে এক পত্র, এই দুই পত্র প্রকাশিত হইয়াছে। এই উভয় পত্রের মতামত সম্বন্ধে আমার কিঞ্চিৎ বক্তব্য আছে, তাহা নিম্নে লিখিতেছি, অনুগ্রহ করিয়া তত্ত্বকৌমুদীতে প্রকাশ করিয়া বাধিত করিবেন। আমার বক্তব্য বিষয় আমি অতি সংক্ষেপেই জানাইব।

১ম পত্র সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে,—"হরি" শব্দ উচ্চারণ করিলেই যে সাকার হরিকেই বুঝিতে হইবে আমাদের এরূপ বোধ হয় না। রাম, কৃষ্ণ, কালী প্রভৃতির ন্যায় হরি কোন অবতার নহেন। তবে পত্রপ্রেরকের আপত্তি এই যে, "সাকার বাদিগণ অনেক সময় হরির মূর্ত্তি গঠন করিয়া থাকেন।" কিন্তু সাকার-বাদিগণ মূর্ত্তি গঠন করিলেই বা হরিকে অবতার বলিলেই যদি নিরাকার হরির পূজা বর্জ্জন করা যায়, তাহা হইলে নিরাকার পূজার জন্য কোন নামই থাকিতে পারে না।

অবতার-বাদিগণ এবং পৌত্তলিকগণ নিরাকার হরির ন্যায় অন্যান্য নামের কিরূপ ব্যবহার করিয়াছেন এবং করিতেছেন তাহা একবার দেখা যাউক।

১। "দিল্লীশ্বরোবা জগদীশ্বরোবা" এস্থলে অবতারব দিগণ দিল্লীশ্বরকে ঈশ্বর বলিয়াছেন।

২। মহাকবি কালিদাস রঘুবংশের প্রথমেই জগৎপিতা শব্দের অর্থ হরপার্ব্বতী এবং পরমেশ্বর শব্দের অর্থ পার্ব্বতীনাথ করিয়াছেন।

৩। নর্ম্মদা নদীর ধারে ওঁকারনাথ নামক এক বিখ্যাত তীর্থস্থান আছে, সেখানে এক মন্দিরে এক প্রস্তরের মহাদেব আছেন, তাঁহার নাম ওঁকারজী বা ওঁকারেশ্বর।

আর অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই, যে তিনটী দৃষ্টান্ত দেওয়া গেল তাহাতেই প্রমাণ হইতেছে যে, "হরি" শব্দের যে গতি "ঈশ্বর"—"পরমেশ্বর"—"জগৎপিতা" এবং "ওঁ" শব্দেরও সেই গতি, তবে কি নিরাকার হরিকে কেবল মনেই রাখিতে হইবে? মুখ ফুটিয়া কিছুই বলা যাইবে না? আর এক কথা পৌত্তলিকগণ সাকার ভাবে কল্পনা করিলেই বা অবতার বলিলেই যদি নিরাকার হরি সাকার হইয়া যান, তবে মনেই বা রাখিব কিরূপে? সাকারবাদিগণ রাগরাগিণীর ও সাকার মূর্ত্তি কল্পনা করিতে ছাড়েন নাই। তাহাতেই কি রাগরাগিণীও সাকার হইয়া গেল?

২য় পত্র সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে,—পত্রপ্রেরক বলিয়াছেন, "বৃথা আমোদের জন্য প্রাণিবধ অপ্রেম মূলক ও দূষণীয় সন্দেহ নাই।" এক্ষণে আমার বক্তব্য এই যে, যখন ঈশ্বর আমাদিগকে আহারার্থে বহুপ্রকার দ্রব্য দিয়াছেন এবং তাহা আহার করিয়া আমরা বেশ হৃষ্ট-পুষ্ট শরীরে সংসারযাত্রানির্ব্বাহ করিতে সক্ষম হইতেছি, এরূপ স্থলে সাধারণ ভাবে "আহারার্থে প্রাণিবধ" কার্য্যকে কি "বৃথা আমোদজনক কার্য্য" বলা উচিত নয়? আমাদের বিবেচনায় আহারার্থে সাধারণভাবে প্রাণিবধ, বৃথা আমোদজনক কার্য্যের মধ্যেই গণ্য; তবে এরূপ বিশেষ স্থল থাকিতে পারে, যে সময় প্রাণিবধ না করিলে প্রাণ-ধারণ করা বড় কঠিন হইয়া পড়ে, অথবা কোন বিশেষ আবশ্যকীয় কার্য্য সিদ্ধি হয় না। তদ্রূপ স্থলে প্রাণীবিশেষের মঙ্গলার্থে প্রাণী-বিশেষ বধ করিলে ক্ষতি নাই।

প্রাণিবধকালে যেমন প্রাণিগণ কষ্ট অনুভব করে, উদ্ভিদগণ অবশ্য তাহা করে না, অন্ততঃ আমরা উদ্ভিদগণের কষ্ট বুঝিতে এবং বিশ্বাস করিতে পারি না, সুতরাং উদ্ভিদ ভক্ষণ প্রকৃত পক্ষে নির্দ্দয়তা নহে।

ঈশ্বরের সৃষ্ট জীব ঈশ্বরাদেশে বা দৈব ঘটনাতে মারা পড়িলে প্রেমময়ের মঙ্গল উদ্দেশ্য অবশ্য তাহার পশ্চাতে থাকে, ইহা আমরা বুঝিতে পারি; কিন্তু আহারার্থে অনেক প্রকার পদার্থ থাকিতে মনুষ্য দ্বারা অকারণ প্রাণিবধের পশ্চাতে কোন মঙ্গল উদ্দেশ্য আমরা বুঝিতে পারি না। হস্তী, ঘোটক, মহিষ প্রভৃতি জন্তুগণ উদ্ভিদ আহার করিয়াই শক্তি সঞ্চয় করে। কেহ কেহ বলেন, সিংহ, ব্যাঘ্র প্রভৃতির শরীরে বেশী শক্তি থাকে, কিন্তু সিংহ, ব্যাঘ্র প্রভৃতিরা অন্যান্য মাংসের ন্যায় নরমাংসও ভক্ষণ করে, তবে কি নরমাংস ভক্ষণ, অন্যান্য মাংস ভক্ষণ, মৎস্য ভক্ষণ এবং উদ্ভিদ ভক্ষণ সবই সমান? যদি সমান না হয়, তবে অকারণ বা অতি সামান্য কারণে জীবগণকে কষ্ট দেওয়া কখনই উচিত নহে এবং উদ্ভিদের সহিত মৎস্যের এবং মৎস্যের সহিত অন্যান্য উচ্চ শ্রেণীর জীবের তুলনাও হইতে পারে না। কারণ যদি উদ্ভিদ আহার করিলেই মৎস্য আহার করা উচিত হয় এবং মৎস্য আহার করিলেই অন্যান্য উচ্চশ্রেণীর জীবের মাংস ভক্ষণ করা উচিত হয়, তবে নরমাংস ভোজনেই বা দোষ কি? পত্রপ্রেরক বলিয়াছেন, "ব্রহ্ম-প্রকাশ বলিয়া যদি মাংসাদি আহার বর্জ্জনীয় হয়, তবে আর মানুষের আহারের জন্য রহিল কি?" যদি পত্রপ্রেরকের কথা ঠিক হয়, তবে একজন অসভ্য নরমাংসাশী বলিতে পারে যে, "যদি ব্রহ্মপ্রকাশ বলিয়া নর-মাংসই বর্জ্জনীয় হয়, তবে আর মানুষের আহারের জন্য রহিল কি?

নশিপুর,
মুর্শিদাবাদ,
৯ই ভাদ্র ১৩০০।

অনুগত
শ্রীজগন্নাথপ্রসাদ গুপ্ত।

শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত তত্ত্বকৌমুদী সম্পাদক মহাশয়
সমীপেষু

মহাশয়,

সাধারণ লোকদিগের মধ্যে যাহাতে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার হয় তাহার প্রতি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের দৃষ্টিপতিত হইয়াছে দেখিয়া, আমরা অত্যন্ত আহ্লাদিত হইয়াছি। সাধারণ লোকেরা সত্য-ব্রাহ্মধর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবে না, সত্যধর্ম্ম শিক্ষিতদিগের, এইরূপ ভ্রান্তসংস্কার যদি কাহারও থাকে, তাঁহাদিগের বিবেচনা করা উচিত যে সত্যের পথ সরল, না মিথ্যা কল্পনার পথ সরল, সত্যের ধারণা সহজ, না মিথ্যার ধারণা সহজ, অবশ্যই মিথ্যা কল্পনার পথ জটিল, তাহা হইলে নিশ্চয়ই ব্রাহ্মধর্ম্ম শিক্ষিতের, অশিক্ষিতের, পণ্ডিতের, মূর্খের, ধনবানের, দরিদ্রের, রাজার, ভিক্ষুকের। পৃথিবীর সমস্ত নরনারীদিগেরই ব্রাহ্মধর্ম্মে অধিকার আছে,সকল সন্তানেরাই পিতার ধনে সমাংশভাগী হইয়া থাকে। পরম কারুণিক পরম পিতার ন্যায়বিধানে ঐ নিয়মের কখনই ব্যতিক্রম হইতে পারে না। জ্যেষ্ঠ যদি বুদ্ধিহীন অশিক্ষিত কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে পৈতৃক ধনে বঞ্চিত করেন তাহা হইলে তাঁহাকে যেরূপ ভ্রাতি বঞ্চনা রূপ মহাপাতকে লিপ্ত হইতে হয়, সেইরূপ শিক্ষিত ব্যক্তিগণ যদি অশিক্ষিতদিগকে তাঁহাদিগের উপলব্ধ সত্য সকল প্রদান না করেন, তাহা হইলে ধর্ম্মধনে বঞ্চনারূপ সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর পাপে পতিত হইতে হইবে. অতএব শিক্ষিত ভ্রাতাদিগের সর্ব্বপ্রযত্নে অশিক্ষিতদিগের মধ্যে সত্যধর্ম্ম প্রচার করা কর্ত্তব্য, সম্প্রতি ব্রাহ্ম সাধারণের যে সাধারণ লোকের প্রতি দৃষ্টি পড়িয়াছে, তাঁহারা অশিক্ষিতদিগের মধ্যে ধর্ম্মপ্রচার করিতে উদ্যত হইয়াছেন, ইহাতে নিরতিশয় আনন্দিত হইয়া জানাইতেছি—বরাহনগরে অনেক শ্রমজীবী লোকের বাস, এই শ্রমজীবীদিগের উন্নতির জন্য বরাহনগর-নিবাসী বাবু শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় বহুদিন হইতে কার্য্য করিয়া আসিতেছেন। ইহাদিগের মধ্যে যাহাতে ধর্ম্মভাব জাগরিত হয়, তিনি সে বিষয়েও বিশেষ চেষ্টা করিয়া

থণ্ডন এ দেশের লোকের বহুদিনের বিশ্বাস যে সাধারণ লোকেরা কখনই নিরাকার পরমেশ্বরের উপাসনা করিতে সমর্থ হয় না। কিন্তু বরাহনগরের শ্রমজীবীরা ঐ কথার যথার্থতা খণ্ডন করিয়াছে। তাহারা নিয়মিতরূপে সমাজে উপস্থিত হইয়া ভক্তি-পূর্ব্বক উপাসনায় যোগ দিত। আপনারা উৎসাহী হইয়া নিজগৃহে ধর্ম্মোপদেশের নিমিত্ত সভা আহ্বান করিত। মাঘোৎসবের সময়ে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে বরাহনগর শ্রমজীবীদিগের বৎসর বৎসর যে উৎসব হইত বরাহনগর হইতে পঞ্চাশ ষাট জন শ্রমজীবী দলবদ্ধ হইয়া ভক্তিভরে ব্রহ্ম সংকীর্ত্তন করিতে করিতে ব্রহ্মমন্দিরে উপস্থিত হইত, তাহা অনেকেই জানেন এবং কলিকাতা হইতেও ব্রাহ্মবন্ধুগণ সময়ে সময়ে বরাহনগরে আসিয়া শ্রমজীবীদিগের ধর্ম্মোৎসাহ দেখিয়া আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন ও সময়ে সময়ে শ্রমজীবীদিগের বাটীতে উপস্থিত হইয়া উপদেশ প্রদান করিয়াছেন; এই সকলের দ্বারা কি প্রমাণিত হইতেছে না যে অশিক্ষিতেরাও নিরাকার পরমেশ্বরের উপাসনা করিতে সমর্থ; সাধারণ লোকে নিরাকারের উপাসনা করিতে পারে, এই সত্য এদেশে প্রথম ব্রাহ্মসমাজ প্রচার করিয়াছেন। কিন্তু যুক্তি ভিন্ন কার্য্যতঃ অন্য কোথাও ইহার সত্যতা সপ্রমাণ হয় নাই। দুঃখের বিষয় বর্ত্তমান সময়ে শশিপদ বাবুর শারীরিক অসুস্থতা হেতু চেষ্টার শৈথিল্যে ও উপযুক্ত প্রচারকের অভাবে ইহাদিগের আর সেরূপ উৎসাহ দেখা যায় না; কিন্তু এখানে একটি সুন্দর কার্য্যক্ষেত্র বিস্তৃত রহিয়াছে। কার্য্য করিলে নিশ্চয়ই সুফল ফলিবে, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের ধর্ম্ম প্রচারকেরা নানা স্থানে ধর্ম্ম প্রচারার্থ গমন করিতেছেন, যদি মধ্যে মধ্যে তাঁহারা ও ব্রাহ্মসমাজের সভ্যগণ বরাহনগরে আসিয়া ধর্ম্ম প্রচার করেন, যদি শ্রমজীবীদিগের গৃহে গৃহে উপস্থিত হইয়া তাহাদিগকে ধর্ম্মোপদেশ দান করেন, তাহা হইলে নিরুৎসাহ শ্রমজীবীরা উৎসাহিত হইয়া ধর্ম্মের দিকে আকৃষ্ট হইবে তাঁহারাও কর্ত্তব্যপালন করিয়া কৃতার্থ হইবেন। আশা করি ধর্ম্ম প্রচারকগণ আমাদের কথা উপেক্ষা করিবেন না।

কাশীপুর } নিবেদক শ্রীপঞ্চানন শিরোরত্ন

শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত তত্ত্বকৌমুদী সম্পাদক মহাশয়
শ্রদ্ধাস্পদেষু।

গত ১৬ই আষাঢ়ের তত্ত্বকৌমুদীতে শ্রীযুক্ত কেদারনাথ রায় মহাশয় একাধিক বিবাহের বিরুদ্ধে একখানি দৃঢ় প্রতিবাদ-সূচক পত্র লিখিয়াছেন। আমি নিতান্ত কর্ত্তব্যের অনুরোধে এ সম্বন্ধে দু একটি কথা না লিখিয়া থাকিতে পারিলাম না। অনুগ্রহ পূর্ব্বক পত্রখানি প্রকাশ করিয়া বাধিত করিবেন।

একাধিক বিবাহের বিরুদ্ধে দু চারিটি কথা বলা কিম্বা লেখনী চালনা করা কিছুই কঠিন নহে; কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, যখন পরীক্ষা উপস্থিত হয়, যখন পত্নী বা পতি পর-লোকে গমন করেন, তখন আর পূর্ব্ববৎ দৃঢ়তা থাকে না। পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞা বা আদর্শ হইতে বিচ্যুত হইয়া অনেকেই পুনরায় বিবাহিত অথবা বিবাহের জন্য আকাঙ্ক্ষিত হইয়া থাকেন। এক সময় যাঁহাদের মুখে "উচ্চ ব্রহ্মচর্য্য, পূর্ণাবয়ব প্রেম, আদর্শ দাম্পত্য ও নিত্যকালের বিবাহ" ইত্যাদি কথা শ্রবণ করিয়া বন্ধুগণ মুগ্ধ হইতেন, পত্নী বিয়োগের পর আবার তাঁহাদের বিপরীত ভাব দেখিয়া দুঃখিত হইতেছেন। অতএব যাঁহারা বিপত্নীক অথবা বিধবা এবং বৈতরণীর পারে উপস্থিত, তাঁহাদের এ সকল তত্ত্বের আলোচনা করিলেই শোভা পায়। নতুবা যে সময় পড়িয়াছে, তাহাতে নীরব থাকিয়া কার্য্য দ্বারা স্বীয় স্বীয় মত প্রচার করাই যুক্তিযুক্ত।

এখন রায় মহাশয়ের যুক্তি কয়টির সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিতে চেষ্টা করি। তিনি প্রথমেই বলিয়াছেন, মানবাত্মা যেমন এক পরমেশ্বরে সংযুক্ত হইলেই শুদ্ধতা প্রাপ্ত হয়, তেমন মানব শরীরও কি পত্নী কি পতি অবলম্বন করিলেই পবিত্র থাকে ইত্যাদি। এরূপ উপমা নিতান্তই অসঙ্গত। ঈশ্বর পূর্ণ নিত্য, সর্ব্বত্র বর্ত্তমান এবং চিন্ময়, তাঁহার সহিত মানবাত্মার নিত্য কালের সম্বন্ধ। তিনি আত্মার মূলাধার, কর্ত্তা, আশ্রয়দাতা রূপে নিয়ত বর্ত্তমান। পরমেশ্বরের সহিত মানবাত্মার আকাশেরও ব্যবধান নাই, এত ঘনিষ্ঠ যোগ। শরীরে শরীরে—জড় বস্তুতে জড় বস্তুতে কি এইরূপে ঘনিষ্ঠ যোগ সম্ভবে? মানবাত্মা অনন্তকাল ঈশ্বরের সন্নিধানে বাস করিবে, শরীর দুদিনের জন্য। নশ্বর দেহকে কি দম্পতিগণ অনন্তকাল চিন্তা করিবেন? ইহাই কি বিবাহের আদর্শ? মিলন হয় আত্মায় আত্মায়, শরীরের সহিত মিলন হয় না। যদি কেহ বলেন, দম্পতির আত্মিক যোগই অনন্তকাল স্থায়ী, উভয়ে প্রেমে একীভূত হইয়া অবিচ্ছেদ যোগে অমর জীবন যাপন করিবে। ইহাও মানব জীবনের সম্পূর্ণ আদর্শ বলিয়া অনুমিত হয় না। প্রথমতঃ পরমাত্মার সহিত মানবাত্মার যে সম্বন্ধ, সেইরূপ সম্বন্ধ কোন মানবের সহিত হইতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ মানবপ্রেম মনুষ্য বিশেষের প্রতি কেন্দ্রীভূত না হইয়া মানব সাধারণের প্রতি বিস্তৃত হওয়াই আদর্শ। প্রেমিক শাক্যসিংহ গোপাকে যেমন ভাল বাসিতেন, দরিদ্র কৃষক রমণীকেও তেমনি প্রেমের চক্ষে দেখিতেন। এমন কি এড্‌উইন আরনল্ডের কাব্যে লিখিত হইয়াছে যে, শাক্য সিংহ গৃহত্যাগের অব্যবহিত পূর্ব্বে স্ত্রীকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন যে, "I loved thee most Because I loved so well all living souls"

"আমি ব্রহ্মাণ্ডস্থ সমস্ত জীবকে এত ভাল বাসিয়াছি বলিয়াই তোমাকে অত্যন্ত ভাল বাসিয়াছি।" এতদুপলক্ষে কোন গ্রন্থকার বলেন যে, "জগতের সমস্ত জীবকে যে ভাল না বাসে তাহার ভালবাসা ভালবাসা নহে, তাহাই মোহ। বুদ্ধদেবের ভালবাসা প্রকৃত ভালবাসা, মোহ নহে। মোহ ব্যক্তিবিশেষ কি বিষয়বিশেষের ক্ষুদ্র পরিসরের মধ্যে নিবদ্ধ থাকে, ভালবাসা জগন্ময় ছড়াইয়া পড়ে।"

যিনি দুই প্রেম বাহু প্রসারণ করিয়া নরনারীকে আলিঙ্গন করেন। তাঁহার প্রেম কোনও এক স্থানে সীমাবদ্ধ থাকিতে

পারে না। প্রেমে সংকীর্ণতা নাই। যথার্থ ঈশ্বর-প্রেমিক সাধু নিজের পিতা মাতা স্ত্রী পুত্রদিগকে যেমন ভাল বাসেন, অন্যান্যকেও তেমনি প্রীতির চক্ষে দেখেন। তাঁহার পবিত্র প্রেমের চক্ষে ভিন্নতা ও পার্থক্যবোধ স্বার্থপরতা বলিয়া পরিগণিত হয়। অতএব রায় মহাশয়ের মতে "একমেবাদ্বিতীয়ং" সাধনের ন্যায় পত্নী কিম্বা পতিতে একমেবাদ্বিতীয়ং সাধন বিশ্বজনীন আদর্শ প্রেম সঙ্গত নহে।

কিন্তু শরীর সম্বন্ধে অন্যবিধ নিয়ম। বহুবিবাহ স্বভাববিরুদ্ধ কার্য্য। বহুজনের প্রতি বিশুদ্ধ প্রেমে আত্মা পরিতুষ্ট হয়। কিন্তু বহুবিবাহ দ্বারা হৃদয় মনের অধোগতি হয়। কিন্তু একের অভাবে দ্বিতীয় বার বিবাহেতে উক্ত দোষ স্পর্শে না। তবে যাঁহারা মৃত পতি কিম্বা পত্নীর স্মৃতি-চিহ্ন হৃদয়ে ধারণ করিয়া তাঁহার ধ্যানে নিমগ্ন থাকিবেন, তাঁহার নিকট বিবাহ প্রলোভন স্বরূপ।

রায় মহাশয় ৫ম প্যারাতে লিখিয়াছেন, এদেশের হিন্দুসমাজ তাঁহাদের শ্রেষ্ঠতর অর্দ্ধাংশকে "সাচ্চা" রাখিবার জন্য "বিধবার বিবাহ দেন নাই এবং "সহস্র সহস্র হিন্দু বিধবা এখনও আছেন, যাঁহারা ধ্যানেও এক ভিন্ন দ্বিতীয় পুরুষ জানেন নাই।" কোন্ সভ্যদেশে পতিপরায়ণা নারী নাই? হিন্দুসমাজ বলপূর্ব্বক বিধবাদিগকে অবিবাহিত রাখেন। এরূপে যাহাদের বাহ্য সতীত্ব রক্ষা হয়, প্রকৃত সতীত্ব তাহাদের অনেক দূরে অবস্থিত। কারাবাসিগণ কোনও দুষ্কার্য্যই করিতে পারে না। দুরন্ত কয়েদীগুলি প্রহরীর ভয়ে ও নির্য্যাতনে মেষের মত শান্ত থাকে, এজন্য কি কেহ তাহাদিগকে সাধু বলিবেন; এবং তাহাদের মৃদু স্বভাবের প্রশংসা করিবেন? নির্য্যাতনপ্রাপ্ত, কারাবাসিনী শত সহস্র সতী বিধবা অপেক্ষা একটি স্বাধীন সতী নারীর মূল্য অধিক নহে কি? সতীত্বের প্রসঙ্গ হইলে অনেকেই এতদ্দেশীয় সতীদিগকে লক্ষ্য করিয়া থাকেন। তাঁহাদের মতে পৃথিবীর অপর দেশে কেহ সতী নারী নাই। সতীর পাদস্পর্শে সকল দেশের ভূমিই পবিত্রীকৃত হইয়াছে। তবে পার্থক্য এই যে,এদেশে জাতিভেদ, অবরোধ প্রথা,অস্বাভাবিক ব্রহ্মচর্য্য ইত্যাদি সামাজিক শাসন দ্বারা বিধবাদিগকে যেরূপ সংযত রাখিতে চেষ্টা করা হইতেছে, অপর দেশে এরূপ চেষ্টা হয় না। কিন্তু সেখানে স্বাভাবিক সতীগণ সতীত্বের উজ্জ্বল আলোক বিকীর্ণ করিয়া জগতকে আলোকিত করিতেছেন।

৬ষ্ঠ প্যারাতে যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহার স্থূলমর্ম্ম এই, হিন্দুজাতি যেমন অর্দ্ধাংশকে সাচ্চা রাখিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, ব্রাহ্মসমাজ তেমন অপর অর্দ্ধাংশকে (অর্থাৎ পুরুষদিগকে) সাচ্চা রাখিবেন। কিন্তু কথা এই যে, যে উপায়ে হিন্দুজাতি স্ত্রীজাতিকে 'সাচ্চা' রাখিয়াছিলেন, ব্রাহ্মসমাজ যদি সে উপায়ে পুরুষদিগকে "সাচ্চা" রাখিতে ইচ্ছা করেন, তবে সমাজ-শাসনের ভার কাহার প্রতি অর্পিত থাকিবে? রায় মহাশয় বাল্যবিধবা এবং বাল্য বিপত্নীকদিগকে এই নিয়ম হইতে বাদ দিয়াছেন। ব্রাহ্মসমাজে "বাল্যবিধবা এবং বাল্য-বিপত্নীক" কিরূপ, তাহার টিকা করিলে ভাল হইত।

তৎপর তিনি সপ্তম প্যারাতে ঐতিহাসিক প্রমাণ প্রদর্শন করিয়াছেন। লিখিয়াছেন যে, রামায়ণ মহাভারত প্রভৃতির ঐতিহাসিক মূল্য অস্বীকার করিলেও সে সকলের বর্ণনার মধ্যে তৎকালীন অপর ব্যবহারের এই ভাব দেখা যায়। "রামচন্দ্র একটি বিবাহ করিয়াছিলেন, ইহা উল্লেখ করিয়া এক পত্নী গ্রহণের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন। সাধারণতঃ ধর্ম্মশাস্ত্র প্রণেতা এবং ধর্ম্মোপদেষ্টাদিগের চরিত্রই জনসমাজ কর্ত্তৃক অবলম্বিত হইয়া থাকে। যে ভগবদগীতার ন্যায় মোক্ষ-তত্ত্ব পূর্ণ শাস্ত্র পৃথিবীতে আর নাই বলিয়া হিন্দুগণ এবং হিন্দুসমাজের দিকে গতিপ্রাপ্ত ব্রাহ্মগণও বলিয়া থাকেন, সেই গীতা যাঁহার মুখ দিয়া বাহির হইয়াছে, তাঁহার ষোড়শ শত স্ত্রী ছিল। মহাভারতকার-ব্যাসের স্ত্রীজাতি সম্বন্ধে ব্যবহার ও তাঁহার বংশলীলা সকলেই অবগত আছেন। হিন্দু শাস্ত্রের আদেশ এই যে, পুত্রোৎপাদনের জন্য বিবাহ করিতে হইবে। একটিতে হয় ত ভালই, নতুবা দুটি, না হয় তিনটি, এরূপে যত ইচ্ছা করিতে পার। বংশ রক্ষা না হইলে স্বর্গ লাভ হয় না।

রায় মহাশয় মুসলমান ও বৈষ্ণব সমাজের কথাও উল্লেখ করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে, তাঁহারাও এক বিবাহের পক্ষপাতী ছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, এ সম্বন্ধে রায় মহাশয়ের উক্তি ভিন্ন আর কোনও প্রমাণই পাওয়া যায় না। মুসলমান ধর্ম্ম প্রবর্ত্তক মহম্মদ স্বয়ং সর্ব্বপ্রথমে খাদিজা নাম্নী এক বিধবার পাণিগ্রহণ করেন। তৎপর সন্তানবতী বিধবা ও কুমারী প্রভৃতি কয়েকটি বিবাহ করেন। মুসলমান সমাজের খলিফা ও ধার্ম্মিকা রমণীগণও একাধিক বিবাহ করিয়াছেন। এরূপ স্থলে কিরূপে বলা যাইতে পারে যে, মুসলমান ধর্ম্মসমাজ একাধিক বিবাহকে ঘৃণার চক্ষে দেখেন।

তৎপর বৈষ্ণব সমাজের কথা। বিবাহের উচ্চ আদর্শের বিষয় বলিতে গিয়া বৈষ্ণব সমাজের কথা উল্লেখ না করিলেই ভাল হইত। চৈতন্যের সমসাময়িক বৈষ্ণবগণ এক প্রকার সন্ন্যাসী বৈষ্ণব ছিলেন। চৈতন্য স্ত্রীলোকের মুখ দর্শন করিতেন না; কিন্তু চৈতন্যের পরেই বৈষ্ণব সমাজে সেবাদাসী রাখার নিয়ম প্রবর্ত্তিত হয়। কেহ কেহ মনে করেন যে, বৈষ্ণব সমাজে যে এই কুপ্রথা প্রবেশ করিয়াছে, নিত্যানন্দের অসাবধানতাই ইহার মূল কারণ। তিনিই সর্ব্বপ্রথমে চৈতন্যধর্ম্মের আদর্শকে ম্লান করেন।

উপসংহারে রায় মহাশয় লিখিয়াছেন, "অচঞ্চল চিত্তে এ নীতি পালন রক্ত মাংসের পক্ষে অতীব দুঃসাধ্য; কিন্তু ধর্ম্মোদ্দেশে, লোভ, মোহ প্রভৃতি রিপুগণের কোন্টী বশীকরণইবা সুসাধ্য?" বাস্তবিক ধর্ম্মসাধন করিতে ইন্দ্রিয়-সংযম নিতান্তই আবশ্যক। ইন্দ্রিয় সমূহ সংযত না হইলে ধর্ম্মমন্দিরের দ্বারেও কেহ উপস্থিত হইতে পারিবেন না। কিন্তু বিবাহই যদি ইন্দ্রিয় সংযমের অন্তরায় হয়, তবে কাহারও বিবাহ করাই উচিত নয়। এরূপ হইলে প্রাচীনকালের সন্ন্যাস ধর্ম্মই ধর্ম্মসাধনার্থিগণের অবলম্বনীয়। রায় মহাশয় সর্ব্বশেষে লিখিয়াছেন—"নিতান্ত দুঃসাধ্য বলিয়া, সে আত্মসংযম কি ধর্ম্মজীবন গঠনপক্ষে অবশ্য প্রয়োজনীয় বলিয়া স্বীকার করি না? দ্বিতীয়বার বিবাহের সময়ই কি কেবল আত্মসংযমের কথা উপস্থিত করিতে হইবে, প্রথমবারের সময় কি সকলেই সিদ্ধ পুরুষ থাকেন? তখন কি আত্মসংযমের কথা বলিয়া বিবাহে বাধা দেওয়া উচিত নয়? রায় মহাশয়ের যুক্তি অনুসারে শুদ্ধ আত্মসংযমের অনুরোধে কাহারও বিবাহ করা উচিত নয়।

এখন আমার নিজের দু একটি কথা লিখিয়া পত্র শেষ করিব। বিবাহিত কি অবিবাহিত সকলের পক্ষেই ইন্দ্রিয় সংযম অত্যাবশ্যকীয়। বিবাহিত কি অবিবাহিত জীবনে পার্থক্য এই, একজনের অসংযমের ফল বাহিরে প্রকাশ পায়, অপরের অসংযমের ফল কেহ দেখিতে পায় না; কিন্তু হৃদয়ের অভ্যন্তর দেশ, পাপের বিষে জর্জ্জরিত হইয়া যায়। সেই অবস্থাতেও লোকে তাহাকে ব্রহ্মচারী বলিয়া থাকে।

ফল কথা এই, বিবাহে বাধা দেওয়া কর্ত্তব্য নহে, যাহাতে বিবাহিত জীবনেও ইন্দ্রিয় সংযম করিতে পারা যায়, সেরূপ আলোচনা, উপদেশ এবং দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করাই উপদেষ্টার কর্ত্তব্য কর্ম্ম। বিবাহের সহিত ঐন্দ্রিয়িক সম্বন্ধের যতই হ্রাস হইবে, ততই মানব-হৃদয়ে দেবত্ব সঞ্চারিত হইবে।

কলিকাতা। কাশীচন্দ্র ঘোষাল।

পত্রপ্রেরকদিগের প্রতি।

অনেকগুলি প্রেরিতপত্র অনেক দিন হইতে আমাদের হস্তে রহিয়াছে। স্থানাভাব বশতঃ সে সমুদায় মুদ্রিত হইতে পারে নাই। অথচ পত্রপ্রেরকগণ মনে করিতেছেন যে তাঁহাদের পত্র বুঝি ঘৃণাপূর্ব্বক উপেক্ষিত হইল। তবে এ কথাও বলা আবশ্যক যে সকল পত্রই যে সকল সময়ে প্রকাশের উপযুক্ত হয় তাহা নহে। আমরা বিগতবারে ও বর্ত্তমানবারে স্থান সমাবেশ করিয়া অনেকগুলি পত্র মুদ্রিত করিলাম। তথাপি অনেকগুলি অবশিষ্ট রহিল, তাহার সংক্ষেপে উল্লেখ করা যাইতেছে :—

শ্রীযুক্ত বাবু গোপালচন্দ্র সেন বরিশাল "আমরা কি চাই" নামে একটী দীর্ঘ প্রবন্ধ প্রেরণ করিয়াছেন। এ খানি বহুদিন আমাদের হস্তে পড়িয়া রহিয়াছে। পত্রখানিতে লেখক ব্রাহ্ম-সমাজের অনেকগুলি দোষের উল্লেখ করিয়াছেন। ব্রাহ্মসমাজের ত্রুটীবিষয়ে তত্ত্বকৌমুদীতে স্বতঃপরতঃ এত উল্লেখ করা হইয়াছে যে ব্রাহ্মসমাজের ত্রুটীর কথা শুনিতে শুনিতে ইহার পাঠকগণ ক্লান্ত, আর ভাল লাগে না। এক জন যদি বসিয়া বসিয়া ক্রমাগত বলিতে থাকে, "আমি অধম" "আমি অধম" "আমি অধম" শেষে লোকে বিরক্ত হইয়া বলে—আরে বাপু! অধম হোস্ অধম আছিস্, এত বলে আর কি হবে।" তত্ত্বকৌমুদীর পাঠকদিগের যেন সেই দশা ঘটিয়াছে। তাঁহারা বিরক্ত হইয়া বলিতেছেন,—"আরে বাপু! ব্রাহ্মসমাজের ত্রুটীর কথা আর শুনিতে ভাল লাগে না।" সুতরাং সেন মহাশয়ের পত্র মুদ্রিত করিতে পারা যায় নাই।

শ্রীযুক্ত বাবু গগনচন্দ্র হোম—ইনি এক সুদীর্ঘ পত্রে এই দুঃখ করিয়াছেন যে, ব্রাহ্মসমাজের যুবক দলের প্রতি প্রবীণ-দিগের স্নেহ নাই। ব্রাহ্ম ব্রাহ্মকে দেখে না; ব্রাহ্ম ব্রাহ্মকে সাহায্য করিতে ইচ্ছুক নহে ইত্যাদি। ব্রাহ্মদিগের হৃদয়-বিহীনতা দেখিয়া গগন বাবু এত বিরক্ত হইয়াছেন যে, তাঁহার ভাষা অতি তীব্র হইয়াছে। ভাষার এই তীব্রতার জন্য এবং পূর্ব্বোক্ত কারণে এ পত্রখানিও মুদ্রিত করিতে পারা গেল না।

শ্রীযুক্ত বাবু দ্বারকানাথ সরকার—বিগত ১লা জ্যৈষ্ঠের তত্ত্বকৌমুদীতে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের জন্মোৎসব উপলক্ষে 'আত্ম-পরীক্ষা' নামে যে প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহার প্রতিবাদ করিয়া পত্রখানি লিখিত হইয়াছে। উক্ত বিষয়ে একখানি সুদীর্ঘ পত্র অগ্রে প্রকাশিত হওয়াতে এখানি প্রকাশ করা আবশ্যক বোধ হয় নাই। ইহাতে নূতন কথা এই বলা হইয়াছে যে তত্ত্বকৌমুদীর সম্পাদক এক সময়ে সাধারণতন্ত্র প্রণালীর এত গুণ কীর্ত্তন করিয়া এক্ষণে তাহার অপবাদ করিতে প্রবৃত্ত হওয়াতে লোকে বলিতেছে, তাঁহার মনে গুরু-গিরির ভাব আসিয়াছে। এ সম্বন্ধে বক্তব্য, সম্পাদক এখনও সাধারণতন্ত্র-প্রণালীর গুণ কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। তাঁহার বিশ্বাস মানব-সমাজকে শাসন করিবার জন্য অদ্যাবধি যত প্রণালী উদ্ভাবিত হইয়াছে, তন্মধ্যে সাধারণতন্ত্রপ্রণালী সর্ব্বোৎকৃষ্ট, কিন্তু তাহা বলিয়া তিনি ইহাকে একটা উপাস্য দেবতা মনে করেন না। শাসনপ্রণালী অপেক্ষা ধর্ম্মজীবনের দিকে অধিক দৃষ্টি দেওয়া আবশ্যক মনে করেন।

জনৈক বন্ধু (ঢাকা)—পত্রখানি অতিশয় দীর্ঘ। পত্র-প্রেরকগণ অনুগ্রহ পূর্ব্বক পত্রের দীর্ঘতার দিকে দৃষ্টি রাখিবেন।

ব্রাহ্মসমাজ।

সৈয়দপুর হইতে একজন ব্রাহ্মবন্ধু লিখিয়াছেন।

"গত ১২ই ভাদ্র সৈয়দপুর ব্রাহ্মসমাজের নূতন মন্দিরের প্রতিষ্ঠা কার্য্যোপলক্ষে উৎসব হইয়া গিয়াছে। প্রাতে শ্রীযুক্ত বাবু আশুতোষ বসু মহাশয় সময়োপযোগী প্রার্থনা করিয়া উৎসবের উদ্বোধন করেন। বৈকালে নগর সংকীর্ত্তন করিতে করিতে সমাজে প্রত্যাগমনান্তর শ্রীযুক্ত বাবু নবদ্বীপ চন্দ্র দাস প্রচারক মহাশয় মন্দিরের প্রতিষ্ঠা পত্র পাঠ করেন। সম্পাদক সৈয়দপুর ব্রাহ্মসমাজের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস পাঠ করেন এবং শ্রীযুক্ত রাজা গোবিন্দলাল রায় বাহাদুর ও অন্যান্য মহোদয়গণ যাঁহারা এই সমাজ নির্ম্মাণ জন্য সাহায্য প্রদান করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে অন্তরের সহিত ধন্যবাদ প্রদান করেন। বাবু আদিনাথ চট্টোপাধ্যায়, বাবু বঙ্কবিহারী বসু, বাবু হরনাথ দাস, বাবু গিরিশচন্দ্র কাঞ্জিলাল এবং অন্যান্য বন্ধুগণ উপস্থিত হইয়া উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত বাবু নবদ্বীপচন্দ্র দাস প্রচারক মহাশয় উপাসনা করেন এবং হৃদয়গ্রাহী প্রার্থনা ও উপদেশ প্রদান করতঃ উৎসবের কার্য্য শেষ করেন।

প্রচার—শান্তিনিকেতনে অবস্থিতিকালে শ্রীযুক্ত প্রকাশ দেব এবং শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন বসু একদিন বোলপুরে বক্তৃতা করেন। বক্তৃতার পূর্ব্বে ও পরে সঙ্গীত ও সংকীর্ত্তন হয়। অন্য একদিন বাবু কাশীচন্দ্র ঘোষাল "নিত্যানন্দের প্রেম প্রচার" সম্বন্ধে কথকতা করেন, উভয় দিনই স্থানীয় অনেকে উপস্থিত হইয়াছিলেন।

বিবাহ—গত ১১ই ভাদ্র শনিবার দিনাজপুর নগরে একটী অসবর্ণ বিধবা-বিবাহ হইয়া গিয়াছে। পাত্র ময়মনসিংহ নিবাসী শ্রীযুক্ত বঙ্কবিহারী দাস। পাত্রী দিনাজপুর বালিকা-বিদ্যালয়ের পণ্ডিত বাবু ত্রৈলোক্যনাথ বিশ্বাসের ভগিনী শ্রীমতী জ্ঞানদাসুন্দরী। এই বিবাহ ১৮৭২ সালের ৩ আইনানুসারে রেজিষ্টারি করা হইয়াছে। বাবু নবদ্বীপচন্দ্র দাস বিবাহে আচার্য্যের কার্য্য করেন এবং বাবু ভুবনমোহন কর মহাশয় বর কন্যাকে সময়োপযোগী উপদেশ দেন। বিবাহ সভায় স্থানীয় অনেকে উপস্থিত ছিলেন। বঙ্ক বাবু এই অনুষ্ঠান উপলক্ষে নিম্নলিখিত রূপ দান করিয়াছেন। সাঃ ব্রাঃ সমাজ ৫৲, জলপাইগুড়ি ব্রাহ্ম-সমাজ ১৲, দিনাজপুর ব্রাহ্মসমাজ ২৲, রংপুর ব্রাহ্মসমাজ ২৲, ব্রাহ্মসাধনাশ্রম ১৲, দাসাশ্রম ১৲, অনাথাশ্রম ১৲, ব্রাহ্ম-ছাত্রী-নিবাস ১৲, খাসিয়া মিশন ১৲, গরিবদিগের ক্ষুদ্র ভগিনী সম্প্রদায় ১৲; মোট ১৬৲।

শ্রাদ্ধ—টাঙ্গাইল উপবিভাগের করটীয়া ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক বাবু হরনাথ ঘোষ মহাশয়ের পরলোকগতা সহধর্ম্মিণীর শ্রাদ্ধোপলক্ষে গত ৮ই ভাদ্র বিশেষ উপাসনাদি হইয়াছে। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় আচার্য্যের কার্য্য করেন। হরনাথ বাবু প্রার্থনা করেন। ঈশ্বর তাঁহার কন্যাকে শান্তিতে রাখুন এবং পৃথিবীতে তাঁহার স্বামী ও সন্তানদিগকে সান্ত্বনা দান করুন। ইঁহার জীবনে বেশ ধর্ম্ম ভাব ছিল। তিনি যে ৩টী পুত্র ও একটী কন্যাকে পৃথিবীতে রাখিয়া গিয়াছেন, তাহারা মায়ের এই ধর্ম্ম ভাবের অধিকারী হউক। হরনাথ বাবু আপনার সহধর্ম্মিণীর আত্মার তৃপ্তির জন্য তাঁহার নামে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের হস্তে ১০০৲ টাকা স্থায়ীফণ্ডে দান করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন এবং এখন সাঃ ব্রাঃ সমাজে ৩৲ দাতব্য বিভাগে ২৲ এবং সাধন-আশ্রমে ৫৲ টাকা দানকরিয়াছেন।

বিগত ১৩ই ভাদ্র সোমবার পরলোকগত নবীন চন্দ্র রায় মহাশয়ের সাম্বৎসরিক শ্রাদ্ধোপলক্ষে প্রাতে ব্রাহ্ম সাধনাশ্রমে তাঁহার পরিবারস্থ আত্মীয় স্বজন বিশেষ ভাবে ব্রহ্মোপাসনা করিয়াছিলেন। তাঁহার বন্ধু পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছিলেন।

২১১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, ব্রাহ্ম-মিশন প্রেসে শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দত্ত কর্ত্তৃক ১৬ই ভাদ্র মুদ্রিত ও ১৭ই ভাদ্র প্রকাশিত।

ও সমাজতত্ত্ব বিষয়ক পাক্ষিক পত্রিকা।

১১শ সংখ্যা। ১৬শ ভাগ।

১লা আশ্বিন, শনিবার, ১৮১৫ শক, ব্রাহ্ম সম্বৎ ৬৪

বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২॥
মফস্বলে ৩
প্রতি খণ্ডের মূল্য ৵১০

এ ঘোর শৃঙ্খল।

কে বাঁধিল চিতে মোর এ ঘোর শৃঙ্খলে?
কত ভাবি এবার উঠিব,
এবার শাসিয়া মনে প্রতিজ্ঞার বলে;
নব ভাবে জীবন গড়িব!

সুদৃঢ় সংকল্প কত বাঁধি দৃঢ় করি,
কত যুক্তি, কতই মন্ত্রণা;
হায়রে জীবন-নীর ধীরে আয় সরি,
একে একে মিলায় কল্পনা।

চেয়ে দেখি পড়ে আছি সেই পুরাতনে,
সে ম্লানতা, সেই সে জড়তা,
সেই অধোদিকে নীর বহিছে সঘনে,
সেই—সেই—সেই দুর্ব্বলতা।

কে বাঁধিল চিতে মোর এঘোর শৃঙ্খলে?
কে রচিল এ বিষম জাল?
কেন মনোরথ-শত যায়গো বিফলে?
ওঠা পড়া রবে কতকাল?

কৃপা-হস্ত দেও প্রভু, দাঁড়াই সাহসে,
হুহুঙ্কারি ছিঁড়িয়া শৃঙ্খল;
ডুবাই তাপিত চিত তব প্রেম-রসে,
তব বলে হই হে সবল।

সম্পাদকীয় মন্তব্য।

ব্রাহ্মধর্ম্ম সার—একজন ব্রাহ্ম একদিন অপর একজন ব্রাহ্মকে বলিতেছেন—"দেখ কোনও লোক যদি স্রোতের জলে নামিয়া সেই জলে মাথা ডুবাইয়া পাদুখানি মাটী হইতে তোলে, তাহা হইলে তাহার কি দশা হয়? উত্তর—"সে স্রোতের বেগে নীত হয়।" প্রশ্ন—"কিন্তু যে ব্যক্তি কঠিন মৃত্তিকাতে শক্ত করিয়া পা দুখানি রাখিয়া মাথা ডুবায়, তাহাকে কি স্রোতে ভাসাইয়া লইয়া যাইতে পারে?" উত্তর—"না, তাহাকে স্বস্থান-চ্যুত করিতে পারে না।" তখন প্রথম ব্যক্তি বলিলেন—"ইহা স্মরণ রাখিও, তোমরা যে নানাপ্রকার চিন্তা ও ধর্ম্মভাবের স্রোতে নামিবে, যদি নিজেদের পায়ের জমি ঠিক না রাখ স্রোতে ভাসিয়া যাইবে। অপর ধর্ম্মের প্রতি প্রেম বল, সদ্ভাব বল, উদারতা বল, সব নিজের জমি ঠিক রাখিয়া।" দ্বিতীয় ব্যক্তি প্রশ্ন করিলেন—"সে জমি কি? উত্তর—"একমাত্র সত্য-স্বরূপ পরমেশ্বরকে সাক্ষাৎভাবে আত্মাতে প্রতিষ্ঠিত দেখা এবং তাঁহাকে সর্ব্বোচ্চ স্থান দিয়া তাঁহার মঙ্গল ইচ্ছার অনুবর্ত্তী হওয়া। আমরা কি পৌত্তলিককে বলিতে পারি, আমি যাহা ধরিয়াছি তাহা আমার পক্ষে সত্য, তুমি যাহা ধরিয়াছ, তাহা তোমার পক্ষে সত্য। ঐ পুতুল পূজিয়াই তোমার মুক্তি। ইহা বলিলে মিথ্যা বলা হইবে। মুক্তি আবার কি? তাঁহাকে সাক্ষাৎভাবে আত্মাতে পাওয়ার নামই মুক্তি। তাহা পুতুল পূজিয়া কিরূপে হইবে? যাহাই কর, যতই ঘুরিয়া বেড়াও, যতই ছুটাছুটি কর, যতই ইহার বাড়ী, তাহার বাড়ী অন্ন চাখিয়া বেড়াও না কেন, ইহা ভিন্ন মুক্তি নাই। ঋষিরা বলিয়াছেন—"তমাত্মস্থং যেঽনুপশ্যন্তি ধীরাস্তেষাং শান্তিঃ শাশ্বতী নেতরেষাং" তাঁহাকে যাঁহারা আত্মস্থ করিয়া দেখিয়াছেন তাঁহাদেরই মুক্তি, মুক্তি অন্যের জন্য নহে। পা রাখিবার এই জমিটুকু হারাইলে চলিবে না। ঈশ্বর আত্মাতে প্রতিষ্ঠিত এই যেমন ব্রাহ্মধর্ম্মের একটা সার কথা, তেমনি তাঁহাকে জীবনে সর্ব্বোচ্চ স্থান দিতে হইবে, ইহাও দ্বিতীয় সারকথা। ঈশ্বরের উপাসক কি পরিমিত দেবতার নিকটে মস্তক অবনত করিতে পারেন? তাহা হইলে কি ঈশ্বরকে সর্ব্বোচ্চ স্থান হইতে অপসৃত করা হয়না? একজন বিদেশবাসী লোকের বিষয়ে এরূপ শুনা গিয়াছে যে, সেব্যক্তি বয়স্যদিগের ভয়ে স্বদেশাগত স্বীয় বৃদ্ধ পিতাকে গৃহের প্রাচীন ভৃত্য বলিয়া পরিচয় দিয়াছিল। ইহা যেরূপ ব্যবহার, যিনি ঈশ্বরকে জানিয়াছেন ও তাঁহার উপাসনা কর্ত্তব্য বলিয়া অনুভব করিয়াছেন, তাঁহার পক্ষে লোকভয়ে পৌত্তলিকতাচরণ করাও সেইরূপ ব্যবহার। সে পৌত্তলিকতা দ্বারা এই কথা বলে "আমি যে ঈশ্বর ঈশ্বর করি আপনারা শুনিয়াছেন, সেটা কিছু নহে সেটা বাক্যের খেলা মাত্র, আপনারা যেরূপ আদেশ করিতেছেন তাহাই করিব।" এরূপ আচরণ কি ঈশ্বর সম্বন্ধে অপরাধ ও পাপ নহে? সে উদারতা, উদারতা

নহে, তাহা মৃত্যুর পূর্ব্ব লক্ষণ, যাহাতে সত্যস্বরূপের উপাসনা ও পৌত্তলিকতাচরণের মধ্যে প্রভেদ দেখে না।

ধর্ম্মের আসল ও নকল—ঢাকা সহরে একবার কয়েকজন ভদ্রলোক একটী রঙ্গভূমি করিয়া অভিনয় করিতে ইচ্ছুক হইলেন। তাঁহাদের নাট্যোল্লিখিত পুরুষদিগের মধ্যে মহাপুরুষ মহম্মদ একজন ছিলেন। অভিনয়ের দিন বহুসংখ্যক মুসলমান সভাস্থলে উপস্থিত। অভিনয় চলিতেছে, অবশেষে একজন মহম্মদ সাজিয়া রঙ্গস্থলে উপস্থিত হইলেন। যেই এই বাক্য উচ্চারণ "হজরত মহম্মদ এলেন"—অমনি সিংহগর্জ্জনে হুঙ্কার দিয়া মুসলমানগণ মার মার করিয়া উঠিল। "কি এত বড় আস্পর্দ্ধা ঈশ্বরের প্রেরিত পুরুষের আবার নকল।" তুমুল দাঙ্গা উপস্থিত হইল, মুসলমানদিগকে শান্ত করাই দুষ্কর। অভিনেতাগণ তৎক্ষণাৎ অভিনয় বন্ধ করিয়া দিলেন; করযোড়ে ক্ষমা প্রার্থনা ও অনুনয় বিনয় করিতে লাগিলেন, তবে তাহারা শান্ত হইল। প্রশ্ন করি, মুসলমানগণ এত উত্তেজিত হইল কেন? ইহা কি স্বাভাবিক নয়? যে জিনিষটাকে প্রাণ দিয়া সত্য মনে কর, যাহার স্মরণে চিত্তকে উদ্দীপ্ত করে, তোমার মন প্রাণ অগ্নিময় হয়, তোমার আপাদ মস্তক নিষ্ঠা ও শ্রদ্ধাতে পূর্ণ হয়, তুমি কি তাহার নকল দেখিতে পার? রঙ্গভূমিতে বারাঙ্গনাদিগের মধ্যে একজন যদি আচার্য্য সাজিয়া আসে, ও যদি ব্রাহ্মদিগের উপাসনার নকল করে, তাহা হইলে কোন ব্রাহ্ম আছেন, যাঁহার হৃদয়ে ব্যথা লাগে না? তখন ব্রাহ্মগণ কি গবর্ণমেণ্টের নিকট আবেদন করিয়া সেরূপ অভিনয় বন্ধ করিয়া দেন না? অথবা মনে কর, কোনও রঙ্গভূমিতে যদি ঈশ্বর সাজিয়া কেহ আসে ও বলে,—"এই বিশ্বের সৃষ্টিকর্ত্তা ঈশ্বর আসিলেন," তাহা হইলে সেই রঙ্গভূমির অধিকাংশ লোক বিরক্ত হইয়া সে স্থান পরিত্যাগ করে কি না? গোঁড়া মুসলমানদিগের ন্যায় প্রহার করিতে উদ্যত না হও, পলায়ন কর কি না? তবে দেখ প্রাণের সহিত যাঁহাকে শ্রদ্ধা করিতেছ তাহার নকল প্রাণে সহ্য হয় না। কোন প্রেমিক বা প্রেমিকা এরূপ আছেন, যিনি আপনার প্রেমের নকল বসিয়া দেখিতে পারেন?

ইহা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে ধর্ম্মের পবিত্রতা ও আধ্যাত্মিকতা যাঁহারা একবার হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন, তাঁহারা কি ধর্ম্মের নামে বীভৎস আচরণকে বসিয়া দেখিতে পারেন, অথবা তাহার প্রশ্রয় দিতে পারেন? আধ্যাত্মিক ধর্ম্মের আস্বাদন যাঁহারা পাইয়াছেন, তাঁহারা কি একজন তান্ত্রিকের কদাচার দেখিয়া প্রীতিলাভ করিতে পারেন? বরং ইহাই কি স্বাভাবিক নহে, যে ধর্ম্মের ঐরূপ অপব্যবহার দেখিলে তাঁহাদের চিত্ত শোকে দুঃখে ম্লান হইয়া পড়ে? আমরা ইতিবৃত্তে যে সকল ধর্ম্মসংস্কারকদের বিবরণ পাঠ করি, যাঁহারা ধর্ম্মের জন্য লোকের হস্তে নিপীড়িত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের সকলেরই হৃদয় ধর্ম্মের ম্লানতা দেখিয়া শোকে নিমগ্ন হইয়াছিল। মহাত্মা যীশুর অপর একটী নাম ছিল "man of sorrows" শোকার্ত্ত মনুষ্য। অর্থাৎ তাঁহার মুখ চিরাবসাদে ম্লান থাকিত। বাইবেল গ্রন্থে তাঁহার যে জীবনচরিত লিখিত হইয়াছে, তাহাতে একস্থানে তাঁহার অশ্রুপাতের কথা দেখা যায়, কিন্তু তিনি যে কখনও হাস্য করিয়াছিলেন তাহার কোন নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায় না। এইরূপ আরও অনেক সাধুজনকে সর্ব্বদা দুঃখিত দেখা গিয়াছে। এ দুঃখ কি তাঁহাদের নিজের পাপের জন্য না জগতের পাপ তাপের জন্য? জগতে ধর্ম্মের দুর্গতি দেখিয়াই তাঁহারা সর্ব্বদা দুঃখিত থাকিতেন? মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় তাঁহার গ্রন্থে লিখিয়া রাখিয়াছেন যে এদেশীয় ধর্ম্মের দুরবস্থা দেখিয়া তিনি দুঃখিত হইয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, তাহার সংস্কারে প্রাণ মন সমর্পণ করিবেন। ধর্ম্মের বিকৃত ভাব দেখিয়া সাধুদিগের চিত্তে এতই দুঃখ হয়। তখন যে ব্যক্তি একবার ধর্ম্মের পবিত্রতায় ও আধ্যাত্মিকতার আস্বাদন পাইয়াছেন, তিনি কিরূপে ধর্ম্মের নামে অধর্ম্মের আচরণ দেখিয়া আনন্দিত হইতে পারেন, তাহা আমাদের বুদ্ধির অগম্য।

বল্মীক মিব পুত্তিকাঃ—প্রাচীন শাস্ত্রে উপদেশ আছে:—

"ধর্ম্মংশনৈঃ সঞ্চিনুয়াৎ বল্মীকমিব পুত্তিকাঃ"।

অর্থ—পুত্তিকারা যে প্রকার ধীরে ধীরে বল্মীক নির্ম্মাণ করে সেই রূপ ধর্ম্মকে শনৈঃ শনৈঃ সঞ্চয় করিবে। ধর্ম্ম শব্দে এখানে চরিত্রকে মনে করিতে হইবে। পুত্তিকাদিগের বল্মীক নির্ম্মাণের ন্যায় চরিত্র-সংগঠন কার্য্য ও কাল ও সহিষ্ণুতা সাপেক্ষ। মানব চরিত্র অতি ধীরে ধীরে গঠিত হইয়া থাকে। হৃদয় পরিবর্ত্তন এক দিনে ঘটিতে পারে। সাধুজনের একটী উক্তিতে একজন পাপাসক্ত ব্যক্তির মুখ পাপের দিক হইতে পুণ্যের দিকে ফিরিতে পারে। কিন্তু সেই পরিবর্ত্তিত হৃদয়কে চিরদিন পুণ্যের পথে প্রতিষ্ঠিত রাখা, সমুদায় প্রাচীন অভ্যাসকে পরিবর্ত্তিত করিয়া প্রত্যেক চিন্তা ও কার্য্যকে পরিশুদ্ধ করিয়া তোলা, তাহা পুত্তিকাদিগের বল্মীক নির্ম্মাণের ন্যায় শ্রম ও অধ্যবসায় সাপেক্ষ। দিনের পর দিন যাইতেছে কিছু কিছু জ্ঞান সঞ্চিত হইতেছে, হৃদয় মনের শক্তি বিকাশ হইতেছে, হস্তদ্বয় একটীর পর আর একটী সৎকার্য্যে নিযুক্ত হইতেছে, হৃদয়ের সাধুভাব বর্দ্ধিত হইতেছে, ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস ও নির্ভর বর্দ্ধিত হইতেছে। মানব চরিত্র এইরূপে গঠিত হয়। কেবল তাহা নহে। পুত্তিকারা যখন বল্মীক নির্ম্মাণ করে বা গৃহ নির্ম্মাতা যখন অট্টালিকা নির্ম্মাণ করে, তখন দেখিতে পাই যে, নির্ম্মাণোপযোগী স্থান একবার স্থিরীকৃত হইলে, এবং নির্ম্মাণোপযোগী সামগ্রী একবার সংগৃহীত হইলে, তাহাদের কার্য্য অবাধে চলিতে থাকে। কোনও আকস্মিক দৈব দুর্ব্বিপাক উপস্থিত না হইলে, তাহাদের কার্য্যের ক্রটী ঘটেনা। কিন্তু চরিত্র-গঠনরূপ কার্য্যে প্রতি পদেই সংগ্রাম। তাহার প্রত্যেক উপকরণ গুরুতর সংগ্রামের পর লাভ করিতে হয়; দারিদ্র্যের সহিত সংগ্রাম, রোগ শোকাদির সহিত সংগ্রাম, প্রতিকূল ঘটনা সকলের সহিত সংগ্রাম, চতুর্দ্দিকের লোকের জড়তা ও বিরুদ্ধভাবের সহিত সংগ্রাম, এইরূপ সংগ্রাম নিরন্তর চলিতে থাকে। ইহার উপরে আবার প্রাচীন অভ্যাস প্রচ্ছন্নভাবে নবীনকে নিরন্তর বাধা দিতে থাকে। সুতরাং চরিত্র গঠন কার্য্যে

যাঁহারা ব্রতী হন তাঁহাদিগকে পুস্তিকাদিগের অপেক্ষাও ধৈর্য্যশীল হইতে হয়। ইহা দেখিয়াই উপনিষদকার মহর্ষি বলিয়াছেন "নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ;" এই পরমাত্মা বলহীন ব্যক্তির লভ্য নহেন। চরিত্র গঠন দুর্ব্বলচেতা ব্যক্তির কর্ম্ম নহে। আত্ম-শাসন ও আত্ম-সংযমের দ্বারাই সুধীগণ এই মহৎ বিষয়ে কৃতকার্য্য হইয়া থাকেন।

বহির্ম্মুখীন সাধন—মনোহর স্বর সংযোগে সংগীত কীর্ত্তন এবং সুললিত ভাষায় ধর্ম্মব্যাখ্যা উপাসনাদি হইতেছে, ভাবোচ্ছ্বাসে সকলের হৃদয়ই বিগলিত, এই অবস্থার ভিতরে আসিয়া অনেক কঠিন প্রাণও বিগলিত হয়; শুষ্ক হৃদয়ে প্রেমের ধারা প্রবাহিত হইতে থাকে। কিন্তু যেই সেই মনোমুগ্ধকারী সংগীত ও বীণাধ্বনি নীরব হইল, উপাসনান্তে সকলে স্ব স্ব স্থানে গমন করিলেন, তখন প্রাণ পূর্ব্ববৎ শুষ্কতার অনলে দগ্ধ হইতে লাগিল। এতদ্বারা ইহাই প্রমাণ হয় যে, সংগীত ও বক্তৃতার মনোমুগ্ধকারী শক্তিতেই কিয়ৎকালের জন্ম প্রাণে উচ্ছ্বাস হইয়া থাকে। বিবিধ সুললিত রাগরাগিণী-যুক্ত সংগীত ও উদ্দীপনা পূর্ণ বক্তৃতা শ্রবণ করিলে, সকলের প্রাণেই আনন্দের সঞ্চার হয়। আবার সেই সংগীত ও বক্তৃতা যদি ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় হয়, তবে ধর্ম্মপথের যাত্রীগণ যে তাহাতে যোগদান করিয়া সরসতা লাভ করিবেন, তাহার সন্দেহ কি আছে? কিন্তু পরীক্ষায় দেখা গিয়াছে, এইরূপ সময় সময় দশজনের সহিত মিলিত হইয়া, সংগীত ও সংকীর্ত্তনের দ্বারা প্রাণে যে ভাব সঞ্চারিত হয়, তাহা অতি অস্থায়ী। এরূপ উপায়ে পরমেশ্বরের সহিত আত্মার সাক্ষাৎ যোগ স্থাপিত হয় না। এমন কি সময় সময় কীর্ত্তন ও বক্তৃতার দ্বারা অপকারও হইয়া থাকে। প্রাণ এমনি বহির্ম্মুখী হইয়া পড়ে যে, তাহাকে গৃহে লইয়া যাওয়া কঠিন হয়।

পরমেশ্বরের সহিত মানবাত্মার যোগই উপাসনা। শান্ত সমাহিত না হইলে আত্মোপলব্ধি হয় না, আত্মোপলব্ধি না হইলে আত্মা ও পরমাত্মার যোগ অনুভূত হইতে পারে না। মৃদঙ্গ করতালের ধ্বনিতে সাধকের প্রাণ নৃত্য করিয়া উঠিল, বাহিরেও নৃত্য আরম্ভ হইল; আমি কে, পরমেশ্বরের স্বরূপ কি, জগত কি বস্তু এ সকল আধ্যাত্মিক তত্ত্ব ভুলিয়া গিয়া কিয়ৎপরিমাণে শারীরিক উত্তেজনা এবং কিয়ৎপরিমাণে সঙ্গগুণে মন উত্তেজিত হইল। তখন প্রাণের ভিতর দৃষ্টি করিলে, তিনি দেখিতে পাইবেন, যাঁহাকে পাইবার জন্ম কীর্ত্তন, নৃত্য, অশ্রুজলপাত হইতেছে, সেই চিন্ময় দেবতা প্রাণের মধ্যে নাই, প্রাণ শূন্য শ্মশানবৎ। তখন সাধক বুঝিতে পারেন, নৃত্য কীর্ত্তন সকলই বিফল। যাঁহার জন্ম এত আয়োজন, কার্য্য কালে যদি তাঁহাকে ভুলিয়া যাই, তবে ওপথে না যাওয়াই ভাল।

বাস্তবিক সমবেত উপাসনা, কীর্ত্তন, বক্তৃতা, শ্রবণ, এক অবস্থাতে সাধনের সহায়, অপর দিকে আত্ম দৃষ্টি বিহীনের পক্ষে এই সকল উপায় আত্মাকে ঈশ্বর হইতে বিচ্যুত করিয়া দিয়া সাধকের প্রাণকে শূন্য করিয়া ফেলে। এ সকল উপায় দীর্ঘকালের অবলম্বনীয় না হইলেও সময় সময় উপকারক, ইহাতে সাধকের ঈশ্বর লাভের ইচ্ছাকে জাগ্রত করিয়া দেয়। কিন্তু তাঁহাকে লাভ করিতে হইলে প্রাণের গভীরতম প্রদেশে প্রবেশ করিতে হইবে! নির্জ্জনে আত্মচিন্তা, পাঠ, ধ্যান ইত্যাদি দ্বারা প্রাণ যেমন অন্তর্ম্মুখীন হইবে, কীর্ত্তনে যোগদান করিয়া কোলাহলে প্রমত্ত হইয়া তেমন ফললাভ করিতে কেহ সমর্থ হইবেন না।

বর্ত্তমান সময়ে উচ্চ কীর্ত্তন, নৃত্য, অশ্রুপাত ইত্যাদি সরস উপাসনার লক্ষণ বলিয়া অনেক স্থলে বর্ণিত হইয়া থাকে। কিন্তু পরীক্ষায় সময় দেখা গিয়াছে, যাঁহারা জীবনে কেবল ঐরূপ সরস উপাসনা ভোগ করিয়া আসিতেছেন, তাঁহারা সামান্য সামান্য প্রলোভনের হস্তে আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ নহেন। অতএব বাহিরের আয়োজনের দিকে মনোযোগ প্রদান না করিয়া অন্তর রাজ্যে প্রবেশ করিতে হইবে। অন্তরে প্রবিষ্ট না হইলে চিন্ময় পরমাত্মার সহিত ঘনিষ্ট যোগ অসম্ভব।

স্বার্থনাশেই ধর্ম্মের শক্তি—দান প্রেমের অনুরূপ। যাঁহার প্রতি যতটুকু প্রেম, তাঁহাকে ততটুকু দান করা যায়। ভৃত্যকে একখানা সামান্য বস্ত্র দিয়াই প্রচুর দেওয়া হইল মনে করা যায়; স্বদেশের উপকারের জন্ম কিঞ্চিৎ অর্থ দান করিয়াই পরিতুষ্ট হওয়া যায়।

ধর্ম্মরাজ্য সম্বন্ধেও এইরূপ নিয়ম। যাঁহার প্রেম যতটুকু, তাঁহার দান ততটুকু। ঈশ্বর ও ধর্ম্মের প্রতি যাঁহাদের হৃদয়ের প্রেম নাই তাঁহারা আমোদ প্রমোদে ধন ও শক্তি ক্ষয় করেন কিন্তু ধর্ম্মোদ্দেশে কিছুমাত্র স্বার্থ হানি করিতে প্রস্তুত নহেন। আবার অন্য অন্য ব্যক্তি ধর্ম্মসমাজকে একটুকু ভালচক্ষে দেখেন—এবং অন্যের উপকারার্থ অনুগ্রহ স্বরূপ কিঞ্চিৎ অর্থ দানও করিয়া থাকেন। কিন্তু যিনি যথার্থ ঈশ্বর-বিশ্বাসী, যাঁহার হৃদয়ের সমগ্র প্রীতি ঈশ্বরের প্রতি অর্পিত হইয়াছে, তাঁহার ভাব অন্যরূপ। ধর্ম্মের জন্য অর্থ দান করাত তুচ্ছ—ইহাত তাঁহার ধর্ম্মজীবনের সূচনাতেই হয়। যে দিন ঈশ্বর করুণার বায়ু তাঁহার প্রাণে লাগিয়াছে, সেই দিন দরিদ্রতাকে জীবনের ভূষণ করিয়াছেন। ধন, জন, জীবন যৌবন যথাসর্ব্বস্ব প্রভুর চরণে দিয়াই তৃপ্তি। উপদেশে, বল প্রয়োগে কখনও দান হয় না—যাহার প্রাণ যায়, সে পৃথিবীর নিষেধ না মানিয়া পতঙ্গের ন্যায় আপনার জীবন যৌবন ধন জন সকল প্রভুর প্রেমানলে আহুতি দিতে পারে। ইহা কি স্বপ্ন—বুদ্ধ, চৈতন্য, যীশু কি ইহার সাক্ষী নহেন। কত বিশ্বাসী, সাধুর জীবনে এই আত্মোৎসর্গের জীবন্ত দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায়। বিশ্বাসী জীবনের কথা পুণ্যকথা। আজ একটী বিশ্বাসী জীবনের কথা বলিয়া আমাদের বক্তব্য শেষ করিব।

সম্রাট থিওডিয়াসের সময়, এণ্টনিকাস্ নামক একজন রাজবংশীয় সম্ভ্রান্ত পুরুষ রোমনগরে বাস করিতেন। তিনি ধনগৌরবে রাজ্যের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। তিনি ইউক্রিসিয়া নাম্নী একটী উচ্চ বংশীয়া মহিলার পাণিগ্রহণ করেন। এই দম্পতি অতি ধর্ম্মপরায়ণ ছিলেন। অল্পদিন পরে ইঁহাদের একটী কন্যা জন্মগ্রহণ করে, তাহার ও নাম

ইউফ্রিসিয়া রাখা হয়। তৎপর ইহারা উভয়ের জীবন ধর্ম্মের পরিচর্য্যায় সমর্পণ করিবেন বলিয়া সংকল্প করিলেন। এক বৎসরের মধ্যে এণ্টনিয়াসের মৃত্যু হয়। ইউফ্রিসিয়ার বয়স তখন অধিক হয় নাই। রূপে গুণে, কুলে ও ঐশ্বর্য্যে তিনি রোমে শ্রেষ্ঠ স্থানীয়া ছিলেন। অনেক সম্ভ্রান্ত রাজপুরুষ তাঁহার পুনর্ব্বিবাহের প্রস্তাব করিয়া বিরক্ত করিতে লাগিল। তিনি রোম পরিত্যাগ করিয়া মিসর দেশে চলিয়া গেলেন। তাঁহার অল্প বয়স্কা কন্যা সঙ্গে ছিল। মিসর দেশে তাঁহার বিস্তৃত জমিদারী ছিল। তাঁহারা কোন ধর্ম্মাশ্রমের নিকট যাইয়া বাস করিতে লাগিলেন। সেই ধর্ম্মাশ্রমে তিনি আপন কন্যাকে লইয়া সর্ব্বদা যাতায়াত করিতেন। কিয়ৎকাল পরে ইউফ্রিসিয়া সেই আশ্রমের তত্ত্বাবধায়িকাকে আপনার সমুদায় সম্পত্তি দানের প্রস্তাব করিলেন। তত্ত্বাবধায়িকা বলিলেন "আমরা এই পৃথিবীর ধন দিয়া কি করিব, আমরা স্বর্গের ধন ভিক্ষা করি।" ইউফ্রিসিয়া ধনের সৎব্যবহার করিতে না পারিয়া বড় দুঃখিত হইলেন। অনেক অনুনয় বিনয়ের পর সেই তত্ত্বাবধায়িকা বলিলেন—"উপাসনা গৃহের আলোর জন্য কিঞ্চিৎ দান করিতে পার।" ইহা শুনিয়া তিনি কৃতার্থ হইলেন।

একদিন ধর্ম্মাশ্রম হইতে ফিরিয়া আসিয়া কন্যা মাতাকে বলিল—"মা, আমার জীবন ধর্ম্মের পরিচর্য্যায়, ঈশ্বর সেবায় অর্পণ করিব—আর বিবাহ করিব না।" মাতা একমাত্র কন্যার এই কথা শুনিয়া দুঃখিত না হইয়া আনন্দে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। তাঁহার অন্ধের যষ্টি একমাত্র কন্যাকে ধর্ম্মাশ্রমে তত্ত্বাবধায়িকার হস্তে অর্পণ করিয়া এই বলিয়া শেষ উপদেশ দিলেন—"ঈশ্বরকে ভয় করিয়া চলিও, আশ্রমবাসীদের বাধ্য থাকিও—আর তুমি যে রাজবংশ হইতে উৎপন্ন, এবং অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারিণী তাহা কখনও মনে রাখিও না।" অল্পদিন পরে জননীর মৃত্যু হইলে রোমের সম্রাট বালিকার অভিভাবক হইলেন; সম্রাট কুমারীকে লইয়া যাইবার জন্য দূত প্রেরণ করিলেন এবং একজন উচ্চবংশীয় পুরুষের সঙ্গে তাঁহার বিবাহ স্থির করিলেন। রাজা বার বার অনুরোধ করিয়া পাঠাইলেন, "তুমি আসিয়া পৈত্রিক অতুল সম্পত্তির অধিকারিণী হও ও বিবাহ করিয়া সুখী হও। ইউফ্রিসিয়া লিখিয়া পাঠাইলেন, "সকল সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া দরিদ্রদিগকে দান করুন। আমি ঈশ্বরের কার্য্যে জীবন অর্পণ করিয়াছি—আমি আর বিবাহ করিব না। আপনি ও রাণী উভয়ে আমার জন্য প্রার্থনা করিবেন—যেন আমি প্রভুর উপযুক্ত দাসী হইতে পারি।" এই পত্র পাইয়া রাজা ও সভাস্থ সকল লোক অশ্রুপাত করিতে লাগিলেন ও পত্রানুযায়ী কার্য্য করিলেন।

ইউফ্রিসিয়া প্রভুর চরণে কি দিয়াছিলেন? প্রথম ধন দানের জন্য আকাঙ্ক্ষা। ধন তুচ্ছ—কেহ তাঁহার ধনকে গ্রহণ করিল না। দ্বিতীয় দান আত্মজীবন সমর্পণ। তাঁহার আর কি প্রিয় ছিল? একমাত্র কন্যা—তাঁহাকেও আনন্দের সহিত ঈশ্বরের সেবায় দিয়াছিলেন। মহাত্মা যীশু মানব-হৃদয়ে এই স্বার্থনাশের ভাব উদ্দীপ্ত করিতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই জগতে জয়যুক্ত হইয়াছেন।

ব্রাহ্ম বালক বালিকা—আমরা ব্রাহ্ম বালকদিগের নীতি সম্বন্ধে গতবারে কিছু বলিয়াছিলাম। দেখিয়া সুখী হইয়াছি যে, সে দিকে ব্রাহ্মবন্ধুদিগের কাহারও কাহারও দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে। তাঁহারা অনুভব করিতেছেন যে, এ বিষয়ে ত্বরায় একটা উপায় বিধান করা কর্ত্তব্য। সুখের বিষয়, কয়েক বৎসর হইতে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্যগণের দৃষ্টি এ বিষয়ে আকৃষ্ট হইয়াছে। কার্য্যনির্ব্বাহক সভা কয়েক বৎসর হইতে ব্রাহ্ম বালিকাদিগের শিক্ষার্থে একটী বিদ্যালয় ও একটী বোর্ডিং স্থাপন করিয়া চালাইয়া আসিতেছেন। এবং বিগত বর্ষের প্রারম্ভ হইতে উক্ত সমাজের কতিপয় সভ্যের প্রযত্নে ব্রাহ্ম বালকদিগের জন্য একটী বোর্ডিং স্থাপিত হইয়া চলিয়া আসিতেছে। এক প্রকার বলিতে গেলে কার্য্যের ভিত্তি স্থাপিত হইয়াছে। এক্ষণে ব্রাহ্মবন্ধুগণ মনে করিলে এইগুলির বিশেষ উন্নতি সাধন করিতে পারেন। আপাততঃ একটী কারণে উক্ত বিদ্যালয় ও বোর্ডিংগুলির দ্বারা সর্ব্বশ্রেণীর ব্রাহ্মগণের সমান উপকার হইতেছে না। বালিকা বোর্ডিংএ মাসিক ৯॥০ টাকা ও বালক বোর্ডিংএ ১২৲ টাকা ফী ধার্য্য করা হইয়াছে। ইহাতেও ব্যয় সংকুলান হইতেছে না। সহরে বোর্ডিংগুলি রাখিয়া ইহা অপেক্ষা কম ফী লইয়া কোন মতেই কার্য্য চালাইবার উপায় নাই। অথচ প্রত্যেক কন্যার জন্য সর্ব্বশুদ্ধ মাসিক ১৪।১৫ টাকা ব্যয় করিতে পারেন, বা প্রত্যেক বালকের জন্য মাসিক ১৮।১৯ টাকা দিতে পারেন এরূপ ব্রাহ্ম-গৃহস্থেরই বা সংখ্যা কত। ব্রাহ্মদিগের অধিকাংশই দরিদ্র; সামান্যরূপ আয়ের দ্বারা কোনও প্রকারে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন। অথচ প্রতি ব্রাহ্মগৃহেই পুত্র কন্যার সংখ্যা দিন দিন বর্দ্ধিত হইতেছে। ইহাদের জ্ঞানশিক্ষার, সর্ব্বোপরি ধর্ম্ম ও নীতিশিক্ষার, সদুপায় বিধান করা সমাজের পক্ষে নিতান্ত কর্ত্তব্য। এই জন্যই সমাজবদ্ধ হইয়া বাস করা। মানুষ একা একা সকল কাজ করিয়া উঠিতে পারে না, একাএকা সকলদিকে মনোযোগী হইতে পারে না এই জন্যই সমাজ। যাহা তোমার আমার পক্ষে করা কষ্টসাধ্য তাহা দশজনের সমবেত শক্তির দ্বারা করা অপেক্ষাকৃত সহজ। এই জন্য বিদ্যালয়াদি স্থাপন। ঈশ্বর-কৃপায় যাঁহাদের অবস্থা অপেক্ষাকৃত ভাল, তাঁহাদের এরূপ কার্য্যে সহায়তা করা অতীব কর্ত্তব্য। কৃতজ্ঞতার সহিত আমরা স্বীকার করিতেছি যে, ব্রাহ্মবন্ধুদিগের অনেকে সহায়তা করাতেই কার্য্যগুলি এখনও চলিয়াছে। কিন্তু তাহাদের বর্ত্তমান অবস্থাতে আমাদের সন্তুষ্ট থাকা কর্ত্তব্য নয়। যাহাতে এই সকল উপায়ে আমাদের ভাবী বংশীয়দিগের শিক্ষার বাস্তবিক উন্নতি হয়, এবং যাহাতে তাহাদের মনে ধর্ম্মাগ্নি প্রজ্বলিত হয়, সে বিষয়ে সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

কেহ কেহ অনুভব করিতেছেন, যে বোর্ডিংগুলি সহর হইতে বাহির করিয়া লইয়া যাওয়া কর্ত্তব্য। তাহাতে বিবিধ উপকার লাভের সম্ভাবনা—প্রথমতঃ সহরের বাহিরে গেলে অল্প ব্যয়ে খরচ পত্র চালাইতে পারা যায়, সুতরাং ছাত্র ছাত্রীদিগের ফী কমাইয়া দিয়া সর্ব্বশ্রেণীর ব্রাহ্মগণের উপকার সাধন করা যাইতে পারে। দ্বিতীয়তঃ সহরের

বাহিরে থাকিলে বালক বালিকার স্বাস্থ্য অপেক্ষাকৃত ভাল থাকিতে পারে। তাহারা প্রকৃতি মাতার অধিকতর নিকটে থাকিতে পারে, দৌড়িবার ও খেলিবার জন্ম বিস্তীর্ণ মাঠ পাইতে পারে, দৈহিক শ্রমসাধ্য কার্য্যের অভ্যাস করিতে পারে। সহরে এই সকলের অনেক ব্যাঘাত হইতেছে। তৃতীয়তঃ সহরে মানুষের জীবনের মধ্যে কৃত্রিমতা ও স্বার্থপরতা অনেক পরিমাণে প্রবিষ্ট হইয়া থাকে। এখানে জীবনের বাহ্য হাব ভাবের দিকে মানুষের অধিক দৃষ্টি পড়ে; সুতরাং সহরের ন্যায় স্থান হৃদয়ের কোমল ও সরল গুণাবলীর বিকাশের পক্ষে অনুকূল নহে। ব্রাহ্মগণের অধিকাংশের সাংসারিক অবস্থা যেরূপ হীন, তাহাতে তাহাদের সন্তানগণকে সহরের বাবুগিরিতে বর্দ্ধিত করিলে ভবিষ্যতে ঘোর অনর্থ উপস্থিত হইবে। জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করা অতীব ব্যয়সাধ্য হইয়া উঠিবে। সুতরাং ব্রাহ্ম যুবকগণ আর বিবাহ করিতে সাহসী হইবে না। বহুসংখ্যক যুবক যুবতী অবিবাহিত থাকিয়া যাইবে; অথচ তাহাদের অভ্যাসপ্রাপ্ত সামগ্রী যোগাইতে পিতা মাতার মহা ভারবোধ হইতে থাকিবে। তৎপরে চিন্তা করিতে হইবে, অবিবাহিত কন্যাদিগের ভরণ পোষণের উপায় বিধান করিয়া যাওয়া কত জন ব্রাহ্মগৃহস্থের সাধ্যায়ত্ত। ভবিষ্যতের এই সকল অনর্থ পরিহার করিবার জন্য ব্রাহ্ম বালক বালিকাদিগকে যথাসাধ্য দৈহিক শ্রমে, স্বল্প ব্যয়ে, অভ্যস্ত করা ভাল। প্রকৃতিমাতার যত নিকটে রাখিতে পারা যায় ততই ভাল। বিস্তীর্ণ মাঠ, সুসজ্জিত উদ্যান ও সুনীল আকাশের মধ্যে বর্দ্ধিত হইলে তাহাদের দৈহিক ও আধ্যাত্মিক সর্ব্ববিধ কল্যাণ হইবার সম্ভাবনা।

অপর দিকে সহরে বাসের সপক্ষেও বলিবার আছে। ব্রাহ্ম-সমাজের যত প্রধান প্রধান কার্য্য বড় বড় সহরে। যত কিছু সভাসমিতি সমুদয় সহরে। যদি বালক বালিকাকে এই সকল হইতে দূরে রাখা যায়, তাহা হইলে, সমাজ হইতে তাহারা যে শিক্ষালাভ করিতে পারিত তাহার ব্যাঘাত হইবে; সমবিশ্বাসী দিগের সংস্পর্শজনিত যে লাভ হইতে পারিত তাহা আর হইবে না। দ্বিতীয়তঃ বোর্ডিংগুলি সহরে থাকাতে সকলের চক্ষের উপরে রহিয়াছে, ভাল মন্দ যাহা ঘটিতেছে, তৎক্ষণাৎ লোকের চক্ষে পড়িতেছে, এবং যেখানে সংশোধন আবশ্যক সংশোধন করা যাইতেছে। তদ্ভিন্ন যখনি কোনও প্রকার বিশেষ সাহায্য আবশ্যক হইতেছে তখনি স্থানীয় ব্রাহ্ম-মণ্ডলীর সহায়তা পাওয়া যাইতেছে। দূরে গেলে উক্ত উভয় সুবিধা পাওয়া যাইবে না। এইরূপে উভয় দিকেই ভাবিবার আছে। যাহা হউক ত্বরায় এই বিষয়ে ব্রাহ্মদিগের একটী পরামর্শ সভা (conference) হওয়া আবশ্যক। আগামী মাঘোৎসব হইতে যাহাতে এগুলির বিশেষ উন্নতি করিতে পারা যায় এখন হইতে তাহার আয়োজন করা কর্ত্তব্য।

সম্পাদকীয় ও প্রাপ্ত প্রবন্ধ।

অভ্যাস-শৃঙ্খল।

অভ্যাসের শক্তি যদি কেহ জানিতে চান তবে তাঁহাকে আর অধিক দূরে যাইতে হইবে না। মানবের গতিক্রিয়ার প্রতি লক্ষ্য করিলেই দেখিতে পাইবেন। কতবার পড়িয়া, কত আঘাত পাইয়া, কত ব্যথা পাইয়া একটী শিশুকে হাটিতে শিখিতে হয়, তাহা আমরা সকলে অবগত আছি। বালক যখন নিজ পিতার প্রাঙ্গণে পাদচারণা করিতে আরম্ভ করে, তখন তাহাকে কত সন্তর্পণে, কত সাবধানে চলিতে হয়। প্রত্যেক পদবিক্ষেপে পড়িবার ভয়ে টল টল করিতে থাকে। দেখিলেই বোধ হয় সেই পাদচারণা কার্য্যে তাহাকে সমুদায় মনটা দিতে হইতেছে। কিন্তু একবার চিন্তা করিয়া দেখ, অভ্যাসের গুণে সেই কার্য্যই কালে কিরূপ স্বাভাবিক ও অনায়াস-সাধ্য হইয়া যায়। কেবল তাহা নহে তাহা কিরূপ প্রীতিপ্রদ হইয়া থাকে।

অভ্যাসের গুণ এই যে, ইহাতে কার্য্যজনিত শ্রমের অল্পতা করে অথচ কার্য্যপ্রবৃত্তিকে বর্দ্ধিত করে। ইহার উপরে যদি তৎ তৎ কার্য্যের সঙ্গে সুখের যোগ থাকে, যদি তদ্দ্বারা কোন দৈহিক বা মানসিক আনন্দ লাভ করা যায়, তাহা হইলে অভ্যাসগুণে সেই কার্য্য-প্রবৃত্তি চিত্তে অতিশয় প্রবল হয়। এক জন যদি প্রাতঃসঞ্চরণের নিয়ম করেন, তাহা হইলে দেখা যায়, প্রতিদিন প্রাতঃকাল হইবামাত্রই তাঁহার মনে বহির্গমনের প্রবৃত্তি স্বভাবতঃ প্রবল হয়। প্রাতঃকালের বিশুদ্ধ বায়ু সেবনের যে সুখ, সেই সুখের স্মৃতি অজ্ঞাতসারে তাঁহার চিত্তকে আকৃষ্ট করিতে থাকে। যদি পল্লীর মধ্যস্থলে একখানি বায়ুসেবিত, সুখকর-আসনবিশিষ্ট, পুষ্পোদ্যান-মধ্যস্থিত ও সাধারণের ব্যবহারোপযোগী গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া রাখ, দেখিবে সায়ংকালে একটী দুইটী করিয়া পল্লীর লোক প্রতিদিন সেখানে আসিয়া বসিতেছে। ইহার কারণ কি? সেই স্থানটীর সুখকরতাই তাহার লোভনীয়তার কারণ। নিত্য সেই সুখ ভোগ করিয়া লোকের তাহা অভ্যাসপ্রাপ্ত হইয়া যায়। নিত্যই সেই সুখের স্মৃতি লোকের মনকে অজ্ঞাতসারে আকৃষ্ট করে। এই যে গুপ্ত সুখ-লালসা ইহা মানব মনে অতি নিগূঢ়ভাবে কার্য্য করে। যে ব্যক্তির অন্তরে ইহা প্রবিষ্ট হইয়া থাকে সেই ব্যক্তি অনেক সময়ে ইহাকে লক্ষ্য করিতে পারে না; সে এক অন্ধ প্রকৃতির বশীভূত হইয়া কার্য্য করে। এই কারণেই পণ্ডিতগণ ইহাকে মোহ শব্দে অভিহিত করিয়াছেন এবং ইহাকে সকল পাপের নিদান বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বস্তুতঃ সূক্ষ্মরূপে বিবেচনা করিয়া দেখিলে দৃষ্ট হইবে যে মোহ হইতেই সমুদায় পাপের উৎপত্তি হয়। লোকে এই সুখ-লালসা দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া যখন কোনও নিষিদ্ধ সুখের দিকে ধাবিত হয় তখন আত্ম-সংবরণে অসমর্থ হইলেই পাপে পতিত হয়।

সকল পাপের মূলেই এই সুখলালসা দৃষ্ট হইবে। এরূপ ঘটনা অনেকবার ঘটিয়াছে এবং প্রতিদিন ঘটিতেছে, যে শত শত মানব কোনও কার্য্যবিশেষের অনিষ্টকারিতা অনুভব

করিয়াও তাহার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারিতেছে না। বার বার অনুতাপ করিতেছে, বার বার প্রতিজ্ঞা করিতেছে, বার বার নিষ্কৃতিলাভের উপায় চিন্তা করিতেছে, অথচ পতঙ্গ যেমন অনন্ত অনল মধ্যে পতিত হয়, সেইরূপ বার বার সেই পাপাগ্নির মধ্যে পতিত হইতেছে। এক ব্যক্তি অতিশয় সুরাসক্ত; এই সুরাসক্তি নিবন্ধন তাহার গৃহে শান্তি নাই; শরীরে স্বাস্থ্য নাই; লোকসমাজে সম্ভ্রম নাই; ইহারই জন্য সে সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছে; পরিবার পরিজনকে পথের ভিক্ষুক করিয়াছে; বালক বালিকাদিগকে শিক্ষাবিহীন রাখিয়াছে; তাহাকে একদিন অনুকূল মুহূর্ত্তে ধরা গেল, ও তাহার অবস্থা তাহার নিকট উজ্জ্বল ভাষাতে চিত্রিত করা গেল। শুনিতে শুনিতে তাহার চক্ষে জল পড়িতে লাগিল; সে অকৃত্রিম ভাবেই অনুতাপিত হইল; আর সুরাপান করিবে না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিল। সকলে মনে করিলাম লোকটা বুঝি এইবার হইতে শুধরাইয়া গেল। কিন্তু কি পরিতাপের বিষয়! কয়েক দিন পরে শুনি সে পুনরায় পুরাতন বন্ধুদিগের সহিত সম্মিলিত হইয়াছে এবং আবার সুরাপঙ্কে পড়িয়াছে। সেই উন্মাদিনী সুরার মূর্ত্তি সে আবার যখন দর্শন করিল তখন আর সে আপনাকে রক্ষা করিতে পারিল না। নিবিষ্টচিত্তে ইহার মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া দেখিলে কি দেখা যায়? আমরা দেখিতে পাই প্রচ্ছন্ন সুখলালসাই তাহার পতনের হেতু। সুরাপান করিলে একপ্রকার স্নায়বীয় উত্তেজনা হইয়া থাকে, তাহা সুখপ্রদ। এই উত্তেজনার স্মৃতি সুরাপায়ীর মনে পড়িয়া থাকে। যখনি সে সুরার মূর্ত্তি দর্শন করে, তখনি সেই স্মৃতি অন্তরে জাগিয়া উঠে এবং সেই দিকে চিত্তের প্রবল আকর্ষণ হয়। এই প্রলোভনের মুহূর্ত্তে আত্ম-সংযমের শক্তির অভাবে, মানুষ পতিত হইয়া যায়। কোনও প্রকার পাপ অভ্যাসপ্রাপ্ত হইলে এই দশা ঘটিয়া থাকে যে তাহাকে বাধা দিবার শক্তি হ্রাস হইয়া যায়।

কলিকাতায় কোনও ভবনে কয়েক জন উৎসাহী ও ধর্ম্মানুরাগী যুবক বাস করিতেন। সেই ভবনেই একটী ঘরে একজন অধিক বয়স্ক ব্যক্তি ছিলেন। ঐ বর্ষীয়ান ব্যক্তি আচারে ব্যবহারে অতিশয় ভদ্র ছিলেন এবং ঐ যুবক দলকে স্নেহ করিতেন। কিন্তু তিনি দুষ্ক্রিয়ান্বিত ছিলেন। তাহার বৃদ্ধ বয়সে ঐরূপ আচরণ দেখিয়া যুবকগণ অতিশয় দুঃখিত হইতেন একদিন যুবকগণ পরামর্শ করিয়া সেই বয়োবৃদ্ধকে কিঞ্চি নীতির উপদেশ দেওয়া আবশ্যক বলিয়া স্থির করিলেন। যুবকদিগের মধ্যে একজন অপর সকলের মুখ-পাত্র স্বরূপ হইয়া এক দিন একান্তে সেই বয়োবৃদ্ধকে অনেক অনুযোগ করিলেন এবং তাঁহার চরিত্রের সংশোধনের জন্য অনুরোধ করিলেন। যুবকগণ আশঙ্কা করিয়াছিলেন, যুবকদিগের মুখে প্রতিবাদ শুনিয়া তিনি চটিয়া যাইবেন এবং তাঁহাদিগকে অনেক তিরস্কার করিবেন। কিন্তু ঐ বর্ষীয়ান ব্যক্তি তাহার কিছুই করিলেন না। তিনি অতিশয় বিনয়ের সহিত আপনার অপরাধ স্বীকার করিয়া বলিলেন "তোমরা যাহা বলিতেছ তাহা সকলি সত্য, আমি ও কতবার মনে করি এসকল পথ পরিত্যাগ করিব কিন্তু পারি কৈ?" "পারি কৈ"—এই ভয়ানক কথা। মানুষের মন যতক্ষণ জয়ের আশা থাকে, যতক্ষণ সে মনে করে যে তাহার শত্রু তাহাকে চিরবন্দী করিয়া রাখিতে পারিবেনা, সে ঈশ্বর-কৃপাতে আপনার প্রবৃত্তি কুলকে সংযত করিয়া ধর্ম্মের ভূমিতে উঠিবেই উঠিবে, ততক্ষণ তাহার কোমরে বল থাকে, মনে উৎসাহ থাকে, হৃদয়ে সাহস থাকে; কিন্তু বার বার সংগ্রামে পরাস্ত হইয়া যখন নিরাশা হৃদয়ে আসিয়া প্রবিষ্ট হইতে থাকে, তখন মানুষের কোমর ভাঙ্গিয়া যায়। আর সে উঠিতে পারে না। পশুশালায় লৌহ-পিঞ্জর-বদ্ধ ব্যাঘ্র যেমন প্রথম প্রথম আপনার বন্দিদশার কঠোরতা অনুভব করিতে সমর্থ না হইয়া লৌহময় গরাদের উপরে আঘাত করিতে থাকে, সম্মুখে মানুষ দেখিলেই আক্রমণ করিবার জন্য উল্লম্ফন করিতে থাকে, কিন্তু কালে যখন জানিতে পারে যে, সে ঘোর কারাগার হইতে নিষ্কৃতি লাভের প্রয়াস পাওয়াই বৃথা, তখন যেমন হতবীর্য্য, ভগ্নোদ্যম, জড়-ভাবাপন্ন হইয়া আপনার ভাগ্যের হস্তে আপনাকে ছাড়িয়া দেয়, তেমনি হায় এ জগতে কত পাপী প্রথম প্রথম পাপ কারাগার হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিবার জন্য কত প্রয়াস পায়, কিন্তু অবশেষে পাপ হইতে নিষ্কৃতি লাভের প্রয়াস বিফল জানিয়া আপনাকে ভাগ্যের হস্তে অর্পণ করে এবং এই সর্ব্বনেশে "পারি কৈ" বলিয়া পাপের সহিত সন্ধি বন্ধন করে।

অবশেষে এই অভ্যাস একটা শৃঙ্খলের ন্যায় হইয়া প্রকৃতিকে দৃঢ়রূপে আবদ্ধ করে। ইচ্ছাশক্তিকে বিশেষ সবল না করিলে এই অভ্যাস-শৃঙ্খল হইতে নিষ্কৃতি লাভ করা দুষ্কর। ইচ্ছা-শক্তির সবলতা ইচ্ছা করিলেই পাওয়া যায় না। যেমন বিষের দ্বারা বিষের চিকিৎসা করিতে হয়, তেমনি অভ্যাসের দ্বারা অভ্যাসের ব্যাধি দূর হয়। তোমার প্রকৃতি তোমার নিয়মাধীন হইতে চহিতেছে না; তুমি তাহার আপত্তি শুনিও না; নিজ প্রকৃতিকে তাহার রুচির অনুরূপ কার্য্যে নিযুক্ত থাকিতে দিও না। প্রকৃতি যাহা চাহে তাহাই যদি সর্ব্বদা যোগান যায়, তাহা হইলে প্রকৃতি আদুরে হইয়া পড়ে। তখন আর তাহাকে নিয়মিত করিবার উপায় থাকে না। এজন্য প্রকৃতিকে বাধ্য করিয়া যাহা কর্ত্তব্য তাহার আচরণে প্রবৃত্ত করা উচিত। প্রথমে সে সকল কার্য্য ক্লেশকর হইবে, কিন্তু অবশেষে অভ্যাসের গুণে প্রীতিকর হইবে। আপনাকে সংযত করিতে করিতে সংযম অভ্যাস প্রাপ্ত হইবে। তখন অভ্যাসের দ্বারা অভ্যাসকে জয় করা যাইবে।

ধর্ম্ম ও নীতি।

(প্রাপ্ত)

এক কথায় বলিতে গেলে ধর্ম্মের বাহ্য বিকাশের নামই নীতি। কিন্তু জগতে ধর্ম্মহীন নীতি ও আছে। নাস্তিকগণ—ঈশ্বরের অভক্তগণও সেই নীতি অবলম্বন করিয়া থাকে। কিন্তু তাহা পদ্ম-পত্র-স্থিত জলবৎ অতি চঞ্চল, অস্থায়ী, অস্তিত্ব শূন্য। ধর্ম্মই নীতির প্রাণ। যে হৃদয়ে ধর্ম্মের গভীরতা নাই, সেখানে

নীতি ম্লানীভূত। পরীক্ষার দিনে, প্রলোভনের দিনে সেখানে ধর্ম্মের চিহ্ন কেহ দেখিতে পায়না।

এই পৌত্তলিকতা, অবতারবাদ এবং জাতিভেদ প্রপীড়িত দেশে লোকে ধর্ম্মের বাহ্যানুষ্ঠানের দিকে যেমন মনোযোগ প্রদান করে, নীতির দিকে তেমন নহে।

"পরিহাস" * * "প্রাণ-সংশয় ও সমস্ত বিত্তের নাশ সম্ভাবনায় মিথ্যা কথা বলিবে। কেহ মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান করিলে লোকে তাহাকে নিন্দা করে, সে অন্যায়, কারণ অনেক স্থলে মিথ্যা সাক্ষ্যে বরং ধর্ম্ম আছে।" (মহাভারত দ্বাশীতিতম অধ্যায়)। শ্রীমদ্ভাগবত্ অষ্টম স্কন্ধে, অষ্টাদশ অধ্যায়ে এরূপ লিখিত আছে, "স্ত্রীবশী-করণ কালে, হাস্য পরিহাসে, বিবাহে বরের গুণানুকীর্ত্তনে, জীবিকাবর্ত্ত রক্ষার নিমিত্ত, প্রাণ-সংকটে, গোব্রাহ্মণের হিত-সাধন জন্য এবং কাহারও প্রাণ হিংসা উপস্থিত হইলে, মিথ্যাকথন দোষাবহ নহে।" পুনশ্চ মহাভারতে ৩৪ অধ্যায়ে লিখিত আছে, ব্যাস বলিতেছেন,—"যে ব্যক্তি আপৎকালে গুরুর নিমিত্ত ব্রাহ্মণ ব্যতিরেকে অন্য জাতির ধন হরণ করে, তাহাকে চৌর্য্য দোষে দূষিত হইতে হয় না"

এরূপ উপদেশ কি নীতির মূলচ্ছেদকর নহে? যাঁহারা এই উপদেশানুসারে স্বীয় স্বীয় জীবন পরিচালন করেন, তাঁহারা কি সত্য পথ যাত্রী? সত্যই ধর্ম্ম,সেই সত্যের অপলাপ করিলে কি ধর্ম্মরক্ষা হয়? কিন্তু পুরাণশাস্ত্রকার বলিতেছেন, "মিথ্যা কথা বলিলে ধর্ম্ম নষ্ট হয় না। যদি দেবে, দ্বিজে ভক্তি থাকে, শাস্ত্রানুযায়ী ক্রিয়াদি অনুষ্ঠিত হয়, তবে মিথ্যা কথা বলিলে, চুরি করিলে, সুরাপান করিলেও পতিত হইবে না। অবশ্য এসকল কুক্রিয়ার বিরুদ্ধেও অনেক উপদেশ আছে; কিন্তু যেমন এক কলসী দুগ্ধে বিন্দু মাত্র গোমূত্র নিক্ষিপ্ত হইলে সমুদয় দুগ্ধ নষ্ট হইয়া যায়, তদ্রূপ দু একটী ঈদৃশ উপদেশে শাস্ত্রের সঞ্জীবতা বিনাশ প্রাপ্ত হয়।

আধ্যাত্মিকতার উচ্চ তত্ত্ব, প্রাণায়াম যোগ, তপস্যার গভীর উপদেশ, সকল তত্ত্ব বিফল হইয়া যায়, যদি ধর্ম্মশাস্ত্র নীতিহীনতার প্রশ্রয় দেয় এবং পাপ কার্য্যকে পুণ্য কার্য্য বলিয়া কীর্ত্তন করে। নীতিহীনতা মহাপাপ, যিনি জ্ঞাত ও অজ্ঞাত ভাবে যে সকল পাপে লিপ্ত রহিয়াছেন, তাঁহার হৃদয়ে ব্রহ্মজ্ঞান কি রূপে স্ফূর্ত্তি পাইবে? সত্যের দ্বারা হৃদয় পাবত্রীকৃত না হইলে সেই সত্য স্বরূপকে কেহ কি চিন্তা করিতে পারেন? ধর্ম্ম পরিশুদ্ধ অনাবিল, স্ফটিকবৎ। তাহাতে পাপের কলঙ্ক কালিমা প্রবেশ করিলে তাহা ধর্ম্ম নামে উক্ত হইতে পারেনা।

যে দেশের ঋষিগণ পৃথিবীতে সর্ব্ব প্রথম ব্রহ্মতত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছেন, যে দেশের ব্রহ্মতত্ত্ব-সাধক অদ্যাবধি জগৎরূপ ব্রহ্মমন্দিরে আচার্য্যের স্থলাভিষিক্ত হইয়া রহিয়াছেন, যে দেশের উপাসকগণ সর্ব্ব প্রথম, রজনীর অন্ধকার অবসানে উষার নবীন আলোক প্রকাশের ন্যায় এক মাত্র সত্য ধর্ম্ম আত্মা ও পরমাত্মার সম্বন্ধ জনিত স্বর্গীয় আলোক প্রকাশ করেন, "একমেবাদ্বিতীয়ং" "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" ইত্যাদি কথা সভ্যতার শৈশব কালে যাঁহারা ঘোষণা করিয়াছেন, পৃথিবীর সমুদয় নরনারী আধ্যাত্মিক বিষয়ে, ব্রহ্মজ্ঞান সম্বন্ধে যাঁহাদের নিকট ঋণী, তাঁহাদের দেশে,—ব্রহ্মর্ষি মহর্ষি গণের নৈমিষারণ্য ক্ষেত্রে—পৌত্তলিকা ও অবতার-বাদ প্রবেশ করিয়াই সর্ব্বনাশ করিয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে এদেশে নর-পূজা, অস্বাভাবিক সাধন, ধর্ম্মের বাহ্য অনুষ্ঠান ইত্যাদি আবর্জ্জনা রাশির অভ্যন্তরে ভারতীয় প্রাচীন ব্রহ্মজ্ঞান লুক্কায়িত হইয়া গিয়াছে।

হিন্দু ধর্ম্মকে পুনরায় জাগ্রত করিবার জন্য সম্প্রতি এদেশে একদল উৎসাহী লোক দণ্ডায়মান হইয়াছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, তাঁহারা জাতীয় গৌরব স্বরূপ উপনিষদোক্ত বিশুদ্ধ ব্রহ্মজ্ঞান প্রচার না করিয়া তন্ত্র ও পুরাণোক্ত কাল্পনিক ধর্ম্মমত প্রচার করিতেছেন। অধিকতর দুঃখের বিষয় এই যে, কোন কোন ব্রাহ্মভ্রাতাও জাতীয়ভাব রক্ষা করিতে গিয়া অজ্ঞাতসারে পুনরুত্থানকারীগণের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার ভ্রমে পতিত হইয়া আত্ম-বিস্মৃত হইতেছেন।

তন্ত্র ও পুরাণোক্ত ধর্ম্মের দোষ এই যে, তাহাতে সাধকের বাহ্য অনুষ্ঠানের দিকে যেরূপ মতি হয়, নীতি এবং আধ্যাত্মিকতার দিকে তেমন মনোযোগ থাকে না। আদর্শের দোষেই এরূপ হইয়া থাকে। উপাস্য দেবতার অনুরূপই সাধকের চরিত্র গঠিত হয়। উপাস্য দেবতা সত্যের অপলাপ করেন, সুরাপান করেন, অপরাপর অসাধু আচরণ করেন। সাধকও তেমনিই চরিত্র লাভ করেন। তন্ত্রোক্ত দেবতা মাদক দ্রব্যে পরিতুষ্ট, সুতরাং সাধকগণ ও সুরা গঞ্জিকার সেবক হন। খৃষ্টান মিশনারীদিগের কথায় গবর্ণমেণ্ট সুরা ও গঞ্জিকা বিক্রয় বন্ধ করিলে তন্ত্রোক্ত সাধন অসম্পূর্ণ থাকিবে। এদেশের সন্ন্যাসী বৈষ্ণব এবং যোগিগণ অনেকেই সাধনের সময় মাদক দ্রব্য ব্যবহার করেন।

একদিকে অবতারবাদ, পৌত্তলিকতা এবং জাতিভেদ প্রথা প্রভৃতি যেমন নীতি-হীনতার কারণ, অপর দিকে জন্মান্তরীণ কর্ম্মফল স্বীকার করা এবং তজ্জন্য নৈতিক সংগ্রামে নিশ্চেষ্ট থাকাও বিনাশের দিকে গমনের প্রশস্ত পথ। অন্যায় কার্য্য অনুষ্ঠিত হইলে সকলে মিলিয়া কর্ম্মকর্ত্তাকে এই বলিয়া প্রবোধ দিয়া থাকেন যে, "পূর্ব্বজন্মকৃত কর্ম্মের ফলে এরূপ ঘটিয়াছে, বিধাতার লিপি কে খণ্ডন করিবে? মানুষ পাপ করিবে কি পুণ্য করিবে, কিরূপে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিবে ইত্যাদি। শারীরিক ও আধ্যাত্মিক সকল কথা বিধাতা পুরুষ একদিন লিখিয়া রাখিয়াছেন, তদনুযায়ী নিয়ত কার্য্যাদি সম্পাদিত হইতেছে। কাহার সাধ্য, সেই বিধাতার বিধি অতিক্রম করে? মানুষের স্বাধীনতা নাই, মানুষ অবস্থার দাস, বুদ্ধি কর্ম্মেরই অনুসরণ করে। সকলে পূর্ব্বজন্মকৃত কর্ম্মফল ইহ জীবনে ভোগ করিতেছে। কেহ ইচ্ছা করিয়া পাপ কিম্বা পুণ্যকর্ম্ম করিতে পারে না। পূর্ব্বজন্মের তপস্যা বা পাপাচরণের ফলে ইহ জীবনে সুখ বা দুঃখভোগ হইতেছে।" সুতরাং নীতিহীনতা এবং পাপের প্রতি তেমন ঘৃণা হয় না। ঈশ্বরের বিধিদ্বারাই যখন পাপকার্য্য অনুষ্ঠিত হইতেছে, তখন পাপীর দোষ কি?

নীতি এবং ধর্ম্ম যে অচ্ছেদ্য যোগে সংবদ্ধ, পাপাচরণ এবং ঈশ্বর দর্শন যে দুই বিভিন্ন এবং বিপরীতপথগামী,সাধারণ হিন্দুশাস্ত্র এ বিষয়ে সূক্ষ্ম মীমাংসায় উপনীত হয় নাই। এ দেশের

সাধকগণ ধর্ম্মলাভের জন্ম যেরূপ ব্যগ্রতা প্রকাশ করেন, নৈতিক উন্নতির জন্ম তেমন আকাঙ্ক্ষা নাই। ইহার ফল এই হইয়াছে যে, নীতিহীন ধর্ম্ম অপ্রতিহতপ্রভাবে এদেশে রাজত্ব করিতেছে। পঞ্জাবের বিখ্যাত যোগী হরিদাস চল্লিশ দিন ভূগর্ভে প্রোথিত অবস্থায় ছিলেন, তৎপরে সেখান হইতে উঠিয়া একটি পতিতা রমণী সহ প্রস্থান করেন। বর্ত্তমান সময়ে একজন উচ্চ শিক্ষিত হিন্দু, বিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তকে এই যোগীর যোগক্রিয়ার যশোকীর্ত্তন করিয়াছেন। বাস্তবিক যে দেশের ধর্ম্ম নীতিবিহীন হইয়া বিকৃত মূর্ত্তি ধারণ করে, সে দেশের আদর্শ যে এরূপ কুৎসিত হইবে, তাহাতে সন্দেহ কি আছে?

সুরাপান নৈতিক হীনতার চরম লক্ষণ। এমন পাপ নাই, যাহা সুরাপায়ীকে স্পর্শ করিতে না পারে। সুরাপানে যাবতীয় পশুভাব উত্তেজিত হয়, সুতরাং সুরাপায়ী নিরত পাপ ও প্রলোভনে নিমগ্ন থাকে। হিন্দুর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তন্ত্র "মহানির্ব্বাণ" ঈদৃশ উত্তেজক পদার্থ সেবন করিয়া চিত্তের মত্ততা আনয়ন করতঃ ঈশ্বরাধনার ব্যবস্থা দিয়াছেন। কেবল সুরার ব্যবস্থা প্রদান করিয়া মহানির্ব্বাণকার ক্ষান্ত হন নাই, তৎসঙ্গে আরও নারকীয় ভোগের ব্যবস্থা দিয়াছেন। সাধারণতঃ তাহা পঞ্চ"ম"-কারের সাধন বলিয়া উল্লিখিত হইয়া থাকে। সুরাপান সম্বন্ধে মহানির্ব্বাণ বলিতেছেন;—

সুরা দ্রবময়ী তারা জীবনিস্তারকারিণী।
জননী ভোগমোক্ষাণাং নাশিনী বিপদারুজাং। ১৫০
দাহিনী পাপ সংঘানাং পাবিনী জগতাং প্রিয়ে।
সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদা জ্ঞানবুদ্ধিবিদ্যাবিবর্দ্ধিনী। ১০৬
মুক্তৈর্মুমুক্ষুভিঃ সিদ্ধৈঃ সাধকৈঃ ক্ষিতি পালকৈঃ।
সেব্যতে সর্ব্বদা দেবৈরাদ্যে স্বাভীষ্টসিদ্ধয়ে। ১০৭
সম্যাগ্বিধিবিধানেন সুসমাহিতচেতসা।
পিবন্তি মদিরাং মর্ত্ত্যা অমর্ত্ত্যা এবতে ক্ষিতৌ। ১০৮
একাদশ উল্লাস।

ইহার অর্থ এই, সুরা, দ্রবময়ী সাক্ষাৎ জীবনিস্তারকারিণী তারা স্বরূপা, ইহা ভোগ ও মোক্ষের জননী এবং রোগ ও বিপদ সমূহের নাশকারিণী। হে প্রিয়ে! ইহা দ্বারা পাপসমূহ দগ্ধ হয় এবং ইহার প্রভাবে মনুষ্যের জ্ঞান, বুদ্ধি, বিদ্যা এই সমস্তই বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। হে আদ্যে! (অন্য কথা কি) মুক্ত, মুমুর্ষু, সিদ্ধ, সাধক, নৃপতি, ও দেবগণ পর্য্যন্ত আপন আপন অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য ইহার সেবা করিয়া থাকেন।

মহানির্ব্বাণকার মূর্ত্তিমান পাপ সুরা রাক্ষসকে ধর্ম্মের ভূষণে ভূষিত করিয়া এবং তাহার কপালে পবিত্রতার কৃত্রিম ফোটা দিয়া সাধকের নিকট উপস্থিত করিয়াছেন। এ দেশের সহস্র সহস্র পুরুষ রমণী ধর্ম্মসাধন করিতে গিয়া সুরাকে আলিঙ্গন করিয়া থাকে এবং ইহার কালকূট বিষে জর্জ্জরিত হইয়া অচিরে মনুষ্যত্ব বিনাশ করে; তান্ত্রিক গুরু স্বহস্তে শিষ্যের মুখে এই বিষ পাত্র তুলিয়া দেয়, শিষ্য অমৃত জ্ঞানে পান করে। যে সকল কুলকামিনীগণ হিন্দুগৃহের দেবী স্বরূপা, তাঁহারাও ইষ্টদেবতার প্ররোচনায় অনেক সময় এই কালকূট পান করিয়া থাকে।

ব্রাহ্মগণ চিরদিন এই মহাতত্ত্ব ঘোষণা করিয়া আসিতেছেন যে, নীতি এবং ধর্ম্ম একই সূত্রে গ্রথিত। নীতিহীন ধর্ম্ম প্রাণ হীন দেহের ন্যায় অকর্ম্মণ্য। যদি দেখা যায়, কেহ অবিশ্রান্ত সাধন করিতেছেন, দিন রাত্রি ভাবস্রোত প্রবাহিত হইতেছে, তবে যেমন সকলেই সুখী হইবেন, তেমন তিনি যদি সেই ভাবস্রোতের মধ্যে থাকিয়া জ্ঞাত ও অজ্ঞাতসারে সত্যের অপলাপ করেন এবং কথা বার্ত্তায় সামঞ্জস্য রক্ষা না করেন, এবং নীতি হীনতায় প্রশ্রয় দেন তবে সকলেই ততোধিক দুঃখিত হইবেন। নীতিহীনতায় এ দেশ রসাতলে গিয়াছে। এখন ব্রাহ্মদিগকে বিশেষ ভাবে সতর্ক হইতে হইবে, যেন তাঁহাদের মধ্যে নীতিবিহীন ধর্ম্ম প্রবেশ লাভ না করিতে পারে।

প্রেরিত পত্র।

(পত্র প্রেরক দিগের মতামতের জন্য সম্পাদকদায়ী নহেন, কিম্বা কাহার ও পত্র ফেরত দিতে তিনি বাধ্য নহেন)

মান্যবর

শ্রীযুক্ত তত্ত্বকৌমুদী সম্পাদক মহাশয়

সমীপেষু।

মহাশয়

গত ১৬ই ভাদ্রের তত্ত্বকৌমুদীতে শ্রীযুক্ত বাবু জগন্নাথ প্রসাদ গুপ্ত মহাশয় যে পত্র খানা লিখিয়াছেন, তাহার এক অংশ সম্বন্ধে দুই একটী কথা লেখা দরকার বোধ হইতেছে; অনুগ্রহ পূর্ব্বক তত্ত্বকৌমুদীতে প্রকাশ করিয়া বাধিত করিবেন।

তাঁহার প্রথম কথা:—"হরি শব্দ উচ্চারণ করিলেই যে সাকার বুঝিতে হইবে এরূপ নহে।" ১লা ভাদ্রের তত্ত্ব-কৌমুদীতে যে এরূপ কোন কথা আছে তাহা দেখি না। আমরাও একথা বলি না। পত্রে বরং এরূপ কথা আছে যে, ব্রাহ্মগণ "হরি" শব্দে নিরাকার ব্রহ্মকেই বুঝিয়া থাকেন। তবে কথা এই যে, "হরি" বলিলে হিন্দুগণ সাকার সীমাবিশিষ্ট কোন দেবতাকে বুঝিয়া থাকেন। এবিষয়ে "হরি" "কালী" "দুর্গা" "কৃষ্ণে" কোন প্রভেদ নাই।

তাঁহার দ্বিতীয় কথা, "হরিনাম ছাড়িলে নিরাকার পূজার জন্য কোন নামই থাকিতে পারে না" এবিষয়ে কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন। যিনি একথা বলিতে পারেন তাঁহার "ব্রাহ্মধর্ম্ম" যে কিরূপ বুঝি না।

তাঁহার তৃতীয় কথা, "হরি শব্দের যে গতি ঈশ্বর প্রভৃতি শব্দের ও সেই গতি" ইহা প্রমাণের জন্য তিনটী উদাহরণ দিয়াছেন। প্রথম উদাহরণ যে তিনি কিরূপে উল্লেখ করিতে পারিলেন বুঝি না। তিনি কি ইহা জানেন না যে, ঐ বাক্যে দিল্লীশ্বরকে জগদীশ্বর বলা হয় নাই, দিল্লীশ্বরকে ঈশ্বর রূপে পূজাও করা হয় নাই? এবং জগদীশ্বর শব্দে কেহ কখনও দিল্লীশ্বর বুঝে নাই বুঝে না এবং বুঝিবে না।

(২) কালিদাস পুস্তকের এক স্থানে কি ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহা দেখার বিশেষ প্রয়োজন নাই। হিন্দুগণ অনেক সময় তাঁহাদের কোন বিশেষ দেবতাকেও সর্ব্বোপরি কর্ত্তা অসীম, মহান, পরমেশ্বরের স্থান প্রদান করিয়া থাকেন। এমন

কোন শ্রেণী নাই যাহারা পরমেশ্বর শব্দ বলিতে পার্ব্বতী-নাথকে বুঝে অথবা উক্ত নামে পার্ব্বতীনাথ কি কোন সীমা বিশিষ্ট দেবদেবীকে পূজা করে।

৩য়। "ওঁ" এবং "ওঁকারনাথ" অথবা "ওঁকারজি" সম্পূর্ণ ভিন্ন। কোন মতেই এক নহে। আর শুধু "ওঁ" নামও ব্যবহার হয় না, অন্য নামের সহিতই ব্যবহার হয়। সাধারণ ভাবে এসম্বন্ধে এই বক্তব্য যে, যদি নিতান্তই প্রমাণিত হয় যে ঐ সব নাম দেব দেবীতে ব্যবহার হয়, তবে তাহাতে হরি নামের সপক্ষে কিছু প্রমাণ হইল না। তখন এই প্রমাণ হয়, ইহাদের ব্যবহারও অন্যায়। এসকল নাম ছাড়িলেও অনেক নাম আছে।

৪র্থ কথা,—"এ সকল নাম ছাড়িলে নিরাকার হরিকে মনে রাখিতে হইবে, মুখ ফুটিয়া কিছু বলা যাইবে না।" এ বিষয়ে অতিরিক্ত কিছু বলা সম্পূর্ণ নিষ্প্রয়োজন।

৫ম কথা,—"পৌত্তলিকগণ সাকার ভাবে কল্পনা করিলেই যদি নিরাকার হরি সাকার হইয়া যান, তবে মনেই বা রাখিব কিরূপে?" পূর্ব্ব পত্রে ত এরূপ কোন কথা পাইলাম না, তিনি একথা কোথা হইতে আনিলেন বুঝিতে পারিলাম না। ব্রাহ্মসমাজে বোধ হয় এরূপ কেহ নাই যে বলিবে, নিরাকার হরি সাকার হইয়া যাইতে পারেন। প্রধান কথা এই যে, লোকে শব্দের অর্থ যুক্তি তর্ক করিয়া বুঝে না। কাযেই হরি প্রভৃতি দেব দেবীর নাম ব্যবহার করিলে লোকে তাহাদের পূজিত দেব দেবীকেই বুঝিবে সুতরাং তাহা সত্য প্রচার সম্বন্ধে মহা বিঘ্নকর।

পূর্ব্ব পত্র-প্রেরক একটী কথা বলেন নাই। অনেকে বলিয়া থাকেন, হরিনাম ভিন্ন ভক্তি হয় না; এসম্বন্ধে বেশী কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন। শুধু এই বলিলেই হইবে যে, ভক্তি কোন নামের উপর নির্ভর করে না। প্রকৃত ঈশ্বর দর্শনের উপরেই নির্ভর করে। যে সকল সম্প্রদায় হরিনাম ব্যবহার করে না, তাঁহাদের মধ্যে অনেক ভক্ত আছেন। ভক্তিভাজন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও ঢাকার শ্রীযুক্ত কালীনারায়ণ রায় মহাশয়গণের ভক্তি যে কাহারও অপেক্ষা কম একথা বোধ হয় কেহ বলিতে সাহস করিবেন না। ব্রাহ্মধর্ম্ম বিশ্বজনীন ধর্ম্ম, ইহাতে নানা জাতি ও নানা সম্প্রদায়ের লোক আসিবে কাযেই সকলের পক্ষে হরিনাম গ্রহণ সম্ভবপর হইবে না। তাঁহাদের কি আর ভক্তি হইবে না?

হরি প্রভৃতি দেব দেবীর নাম ব্যবহারের অনিষ্টকারিতা সম্বন্ধে অনেক বলিবার আছে, দরকার হইলে ভবিষ্যতে বলিব। এবিষয়ে ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাস যে শিক্ষা দিতেছেন, সে দিকে লক্ষ্য করা সকলেরই কর্ত্তব্য। আমাদের বিশ্বাস—"জনৈক সভ্য" যে পত্র খানা লিখিয়াছেন তাহা যেরূপ সুযুক্তি পূর্ণ তাহাতে উহার বিরুদ্ধে কেহ কিছু বলিতে পারিবেন না। উহার বিরুদ্ধে যাহা কিছু বলিবার আছে তাহা শুনিবার জন্য আমরা উৎসুক রহিলাম।

ময়মনসিংহ
৮।৯।৯৩

বিনয়াবনত
শ্রীচন্দ্রমোহন বিশ্বাস।

শ্রদ্ধাস্পদ
শ্রীযুক্ত তত্ত্বকৌমুদী সম্পাদক মহাশয়
সমীপেষু।

আমার নিম্নলিখিত পত্রখানা আপনার পত্রিকায় আগামী বারে প্রকাশ করিয়া বাধিত করিবেন।

আপনার ১৬ই ভাদ্রের পত্রিকায় "স্বানুভূতি, সৎশাস্ত্র ও সদ্গুরু" নামক প্রবন্ধে "কোনও বিষয়েই যদি অতীতকে অগ্রাহ্য করিয়া চলা কর্ত্তব্য না হয়, তবে ধর্ম্ম-জ্ঞান বিষয়ে কেন কর্ত্তব্য হইবে?" লিখিত আছে অর্থাৎ জড়বস্তু ও তৎসম্বন্ধীয় জ্ঞানকে আধ্যাত্মিক বস্তু ও তৎসম্বন্ধীয় জ্ঞানের সহিত এক ভূমিতে তুলনা করা এবং দৃষ্টান্তে উভয় বিষয়ে এক রকম সাধনার প্রয়োজন বুঝাইতে চেষ্টা করায় একটী গুরুতর ভ্রম ঘটিয়াছে। তাহার কারণ এই,—ঈশ্বর নানা রকম জড়বস্তু সৃষ্টি করিয়া জগতে রাখিয়া দিয়াছেন। সুতরাং শিক্ষক মহাশয়েরা জড়বস্তু সম্বন্ধীয় জ্ঞান ঐ জড়বস্তু ছাত্রের সম্মুখে ধরিয়া শিক্ষা দিতে পারেন এবং ছাত্রগণও ঐ বস্তুর সহিত শিক্ষকের উপদেশ মিলাইয়া উহা প্রকৃত কি না তাহা বুঝিতে পারে। এই ভাবে আমাদের জড়জ্ঞান জন্মিয়া থাকে। এই জন্য জড়জ্ঞান গুরুর সাহায্যেই আমরা শিখিতে পারি। কিন্তু আধ্যাত্মিক জগতে এই নিয়মের অন্যথা দেখিতে পাওয়া যায়। আধ্যাত্মিক জগতে আত্মা নিজে দর্শক, ঈশ্বর বস্তু। এখানে তিনি নিজে দেখান অর্থাৎ নিজে কৃপা করিয়া উপাসকের আত্মাতে প্রকাশিত হন। ইহাতে উপাসকের নিজের একমাত্র ব্যাকুল ইচ্ছা এবং ব্রহ্মের কৃপার প্রয়োজন। কোনও মনুষ্যের এরূপ শক্তি নাই, শিষ্যকে ঈশ্বর দর্শন করাইতে পারেন। সুতরাং এখানে ঈশ্বরকে দেখান সম্বন্ধে মনুষ্যগুরুর কার্য্য কিছুই নাই এবং গুরু যে ঈশ্বর সম্বন্ধে যে সকল উপদেশ দেন তাহা সত্য কি না তাহা মিলাইয়া লইতে ছাত্রের উপায় নাই। এই জন্য উপদেষ্টার উপদেশে আমাদের ঈশ্বর জ্ঞান হয় না। যদি আধ্যাত্মিক জগতে জড়জগতের ন্যায় কতকগুলি বস্তু পূর্ব্বে ঈশ্বর সৃষ্টি করিয়া রাখিতেন তবে মনুষ্য-গুরু ঐগুলি লইয়া শিক্ষা দিতে পারিতেন। কিন্তু এ রাজ্যে দর্শক আত্মা ও বস্তু ঈশ্বর ভিন্ন অন্য কিছুই নাই। ঈশ্বর যখন আত্মাতে কৃপা করিয়া নিজে প্রকাশিত হন তখনই আত্মা তাঁহা অনুভব করিতে পারে নচেৎ নহে। তবে আধ্যাত্মিক জগতে কি কি উপায়ে ঈশ্বর দর্শন হইতে পারে তাহার পথমাত্র আমরা বলিয়া দিতে পারি। ঐ পথে চলিলে ঈশ্বর দর্শন নাও হইতে পারে, ব্রহ্ম কৃপার সম্পূর্ণ প্রয়োজন। ইহা দ্বারাই দেখা যাইতেছে, জড়জগতে আমরা নিজে বস্তুকে ধরিয়া সাক্ষাৎভাবে শিক্ষা দিতে পারি। আর আধ্যাত্মিক জগতের পথমাত্র বলিয়া দিতে পারি। সুতরাং এই দুই পথ এবং তাহার সাধন পথ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। কেহ কেহ আত্মার এক একটী গুণকে বস্তু মনে করেন কিন্তু তাহা ভুল। আপনার ও মনের বিশ্বাস সম্ভবতঃ আমারই ন্যায়। কিন্তু প্রবন্ধটী অন্যরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

আশা করি আগামীতে এই ভ্রম সংশোধন করিয়া বাধিত করিবেন।

পটুয়াটুলী ঢাকা
২৩এ ভাদ্র

অনুগত
শ্রীকৈলাসচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

তামাকের অপকারিতা।

[তত্ত্ববোধিনী হইতে উদ্ধৃত]

খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে আমেরিকা আবিষ্কৃত হইয়াছিল। এ কথা বোধ হয় অনেকেই অবগত আছেন। একদিকে যেমন সেই নবাবিষ্কৃত দেশে যুরোপীয়াদি নানা জাতীয় লোক দলে দলে উপনিবেশ স্থাপন পূর্ব্বক আপন আপন অবস্থা উন্নত করিতে লাগিলেন, অন্যদিকে তদ্রূপ বাণিজ্যের উপযোগী বিবিধ পদার্থ—যাহা হয় ত সভ্যজন সমীপে চিরদিন অপরিচিত থাকিত, তাহাও তথা হইতে দিগদিগন্তরে প্রেরিত হইয়া বাণিজ্য বিভাগেরও অসাধারণ উন্নতি সাধন করিতে লাগিল। অন্যান্য দ্রব্যের কথায় প্রয়োজন নাই, আমাদের আলোচ্য বিষয় যে তামাক, যাহা বর্ত্তমান সময়ে কি সভ্য কি অসভ্য ভদ্রাভদ্র সকল শ্রেণীর অধিকাংশ নরনারীরই আদরের সামগ্রী হইয়া দাঁড়াইয়াছে, আমেরিকা আবিষ্কৃত না হইলে সেই তামাকের ব্যবহার কেহ জানিতে পারিতেন না। এই তামাক কোন এক দেশ বিশেষের বনজাত উদ্ভিদ কি না, ইহা নিশ্চয় করিয়া বলা বড়ই কঠিন; সুতরাং ইহার জন্মস্থান লইয়া মতভেদ হওয়া অসম্ভব নহে। বস্তুতঃ, এই উদ্ভিদ যে স্থানেই জাত হউক না কেন, ইহার নামকরণ ও ব্যবহার যেন আমেরিকা অঞ্চল হইতেই হইয়াছিল, ইহা বিশ্বাস করিবার কারণও অনেক আছে।

১৪৯২ খৃঃ অব্দে কলম্বস্ যখন প্রথমবার আমেরিকায় গমন করেন, সেই সময় যে সকল ব্যক্তি তাঁহার সঙ্গী ছিলেন তাঁহারাই কিউবা উপদ্বীপে বনজাত তামাক ও তত্রত্য অসভ্য অধিবাসীদিগকে তাহার ধূমপান করিতে প্রথম দর্শন করেন। তৎপরে কলম্বসের ঐ দেশে দ্বিতীয়বার গমনকালে রামনন্ পেইন নামে জনৈক ফরাসী তাঁহার সঙ্গে গিয়াছিলেন। তিনিও আমেরিকার অসভ্য অধিবাসিগণকে নাসিকায় তামাকের নস্য গ্রহণ করিতে প্রথম দেখিতে পান। ১৫০২ খৃঃ অব্দে স্পেনবাসী লোকে দক্ষিণ আমেরিকার উপকূলবাসীদিগকে তামাকের পাতা খাইতে প্রথম দর্শন করেন। ফ্রান্সীস্কোফারণাণ্ডীজ নামে একজন চিকিৎসক স্পেনের রাজা দ্বিতীয় ফিলিপের আদেশে আমেরিকার অন্তর্গত মেকসীকো প্রদেশের উৎপন্ন দ্রব্যাদি নির্ণয় করিবার জন্য ১৫৫৮ খৃঃ অব্দে তথায় গমন করিয়া সর্ব্বপ্রথমে যুরোপে তামাকের গাছ আনয়ন করেন। সেই প্রদেশে এই উদ্ভিদ্ [Tobacco] নামে পরিচিত। ১৮৩৫ খৃঃ অব্দে [Ovadea] যে ইতিবৃত্ত প্রণয়ন করেন তৎপাঠেও জানা যায় যে, সেন্ডোমিনগোয়ের অধিবাসিগণ ইংরাজী [Y] বর্ণের মত কাষ্ঠের একপ্রকার যন্ত্র প্রস্তুত করিয়া তাহার যোগে ধূমসেবন করিত এবং ঐ যন্ত্রের নামও আবার তাহারা [Tobacco] বলিত। যে প্রণালীতে তাহারা তামাকের ধূম গ্রহণ করিত তাহা অতি কৌতুক-জনক। কেন না, উপরোক্ত [Y] আকৃতি বিশিষ্ট যন্ত্রের নিম্ন ভাগস্থ আধারে তামাক রাখিয়া তাহার দুইটী ডানার উপরিভাগের দুই প্রান্তভাগ নাসিকার দুই ছিদ্রে প্রবিষ্ট করিয়া নিশ্বাসযোগে টানিয়া টানিয়া ধূমপান করিত। ফ্রান্সদেশবাসী জন্ নাইকট্ নামে একজন পোর্ত্তুগিজ রাজদূত ১৫৬০ খৃঃ অব্দে আমেরিকা হইতে তামাকের বীজ স্বদেশে প্রেরণ করেন। সেই নাইকটের নাম হইতেই যুরোপের সর্ব্বত্র এই উদ্ভিদের নাম [Nicotina Tobaccum] হইয়াছে। ইহার প্রায় একশত বৎসর অন্তে অর্থাৎ সপ্তদশ শতাব্দীতে সর বালটর র‍্যালে [Sir Walter Raleigh] আমেরিকা হইতে ইংলণ্ডে তামাক আনয়ন করেন। * আমেরিকায় ইংরেজজাতির প্রথম অধিকৃত স্থানের নাম বর্জিনিয়া। ঐ স্থানের প্রথম শাসনকর্ত্তা [Ralph Lane] ও [Sir Francis Drake] তামাক খাইবার যন্ত্র আনিয়া র‍্যালেকে উপহার প্রদান করেন। সে যন্ত্র মৃণ্ময় ছিল, র‍্যালে মহোদয় তদ্দৃষ্টে রৌপ্য যন্ত্র প্রস্তুত করিয়া লইয়াছিলেন।

যদিও স্পেনবাসীরা প্রথমতঃ যুরোপে তামাক আনয়ন করেন বটে; কিন্তু তথাপি সে দেশের লোকে প্রথমে তামাক ব্যবহার করেন নাই, ইংরেজ জাতিই যুরোপে তামাক সেবন শিক্ষার দীক্ষা গুরু। [Ralph Lane] আমেরিকার অসভ্য লোকদিগের আদর্শে তামাক খাইতে শিক্ষা করিয়া তথা হইতে স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন এবং তাঁহারই দৃষ্টান্ত অবলম্বনে র‍্যালে তামাক খাইতে আরম্ভ করেন। তৎপরে ইহার অনুকরণ করিয়া রাজ্ঞী এলিজেবেতের সভার অন্যান্য অমাত্যবর্গও তামাক খাইতে অভ্যাস করেন। ইংরেজ জাতির মধ্যে অনেকে তামাক খাইতে লাগিলেন বটে; কিন্তু ইংলণ্ডের ক্ষেত্রে তাহার অপবিত্র বীজ অনেক কাল পর্য্যন্ত বপন করিতে দেওয়া হয় নাই। দ্বিতীয় চারলসের সময় হইতে এতকাল পর্য্যন্ত ইংলণ্ডে তামাকের চাস নিষিদ্ধ ছিল, কেবল ইদানীন্তন অর্থাৎ ১৮৮৬ খৃঃ অব্দ হইতে পরীক্ষা স্বরূপে তথায় তাহার চাস হইতেছে। এদিকে ইংরেজ জাতির দেখা দেখি যুরোপের অন্যান্য স্থানের অধিবাসিগণ ক্রমান্বয়ে তামাক খাইতে শিক্ষা করিতে লাগিলেন। বলিতে কি, সপ্তদশ শতাব্দীতে এই কুশিক্ষার স্রোতে অন্যান্য দেশও ভাসিতে আরম্ভ করিল। বস্তুতঃ তামাকের যেন কি এক অলৌকিক মোহিনী শক্তি আছে, চিরদিনই লোকে দেখা দেখি উহার পদতলে মস্তক অবনত করিয়া শিষ্য হইয়া পড়ে। উহার মন্ত্রে একবার মুগ্ধ হইলে তাহা হইতে নিষ্কৃতি লাভ অতি সৌভাগ্যের কথা।

তামাক স্বাস্থ্য ও নীতিবিরোধী পদার্থ, এই জন্য উহার ব্যবহার লইয়া প্রথম প্রথম যুরোপ অঞ্চলে তুমুল বিবাদ বিসম্বাদ আরম্ভ হয় এবং উহার ব্যবহার নিবারণ করিবার জন্য নানা প্রকার রাজশাসন ও ধর্ম্মশাসনও প্রচারিত হইয়াছিল।

* Pareira Page 567.

কোন কোন স্থলে প্রাণদণ্ডের আদেশ ও ভয় প্রদর্শন করিতে ত্রুটি করে নাই।

এখন অন্যান্য দেশ ছাড়িয়া একবার ভারতবর্ষের দিকে দৃষ্টি করিয়া দেখা যাউক, ভারতবর্ষ তামাকের জন্ম স্থান কিম্বা ইংরেজ জাতির ন্যায় বিদেশস্থ হইয়া ইহা নিজ অধিকার বিস্তারে ভারতবর্ষবাসীদিগকে আয়ত্ত করিয়াছে। আমরা অনুসন্ধানে যতদূর জানিতে পারিয়াছি, তাহাতে তামাক ভারতের বনজাত উদ্ভিদ বলিয়া বিশেষ কোন পরিচয় পাইতেছি না। আমেরিকায় ও য়ুরোপ অঞ্চলে যাহাকে [Tobaco] বলে, সেই একই উদ্ভিদের আসিয়ারও স্থানে স্থানে অর্থাৎ পারস্য রাজ্যে যেরূপ তুম্বাকি বা তোম্বাক ভারতেও তদ্রূপ তামাক বা তামাকু শব্দে পরিগণিত হওয়া অসম্ভব বলিয়া বোধ হয় না। মহাত্মা এল্‌ফিনস্টন সাহেব উত্তম কথাই বলিয়াছেন যে, আমেরিকাদেশে এই উদ্ভিদ যে শব্দে পরিচিত, অন্যান্য দেশের লোকেও যখন সেই একই ধাতু ব্যবহারে ইহার পরিচয় দিয়া থাকেন, তখন আমেরিকা হইতেই যে, ইহার নামকরণ প্রথম হইয়াছিল, ইহা আশ্চর্য্য বা অসম্ভব নহে। তামাক ভারতবর্ষের বনজাত উদ্ভিদ হইলে অতি প্রাচীন কাল হইতে এ দেশের জনসমাজে ব্যবহৃত হউক বা না হউক, ভোলা মহেশের নিকট অপরিচিত থাকিত না। কেন না, তিনি ত ভাঙ্গ ধুতুরা লইয়াই লীলা খেলা করিয়াছেন, তাঁহার তন্ত্রে মন্ত্রে তামাকের গন্ধও নাই। গাঁজা মদ ও আফিং যে কোন মাদক দ্রব্যই কেন লোকে ব্যবহার না করুক, তামাক ৫ সকলেরই অগ্রগামী। এমত অবস্থায় শঙ্কর ইহার সন্ধান পাইলে কখনই ছাড়িতেন না, নিতান্ত পক্ষে তাঁহার ঝুলিতে দুই এক ছিলিম তামাকের সন্ধানও পাওয়া যাইত। এদেশীয় লোকের মধ্যে যাঁহারা নিদানাদি শাস্ত্রের ব্যবস্থামতে চিকিৎসা করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগের মধ্যে প্রবীণ ও সুপণ্ডিত অনেককে জিজ্ঞাসা করিয়া জানা গিয়াছে যে, নিদানাদি গ্রন্থে তামাকের কোন উল্লেখ নাই। মহাত্মা ভাবমিশ্র বহুতর চিকিৎসা শাস্ত্র মন্থন করিয়া "ভাবপ্রকাশ" নামে যে উৎকৃষ্ট চিকিৎসাতত্ত্বের গ্রন্থ প্রচার করেন, উক্ত গ্রন্থেও তামাকের কোন প্রমাণ নাই।

(ক্রমশঃ)

ব্রাহ্মসমাজ।

দুর্ভিক্ষ—নানা স্থান হইতে অন্নকষ্টের সংবাদ শ্রুত হওয়া যাইতেছে। স্থানীয় ব্রাহ্মগণ এসম্বন্ধে যথার্থ সংবাদ প্রদান করিলে আমরা বাধিত হইব। যে সকল স্থানে প্রকৃত পক্ষে দুর্ভিক্ষ হইয়াছে, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যনির্ব্বাহক সভা তাহার প্রকৃত বিবরণ জানিতে পারিলে চাঁদা সংগ্রহ করিয়া সেই সকল স্থানে চাউল বিতরণের জন্য লোক পাঠাইতে পারেন। আমরা পূর্ব্ব বঙ্গের অন্নকষ্ট প্রপীড়িত স্থানের তত্ত্ব জানিবার জন্য বিশেষ ব্যগ্র থাকিলাম।

শান্তি নিকেতনে বাস—ইতিপূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছে যে, সাধনাশ্রম হইতে কয়েকজন সাধক মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের শান্তি নিকেতনে নির্জ্জন বাসের জন্য গমন করিয়াছেন। ইঁহারা তথায় কয়েক দিন বাস করিয়া আশ্রমে পুনরাগমন করিয়াছেন। শান্তি নিকেতনের দূরপ্রসারিত প্রান্তর, গাম্ভীর্য্যপূর্ণ আশ্রম এবং প্রকৃতির শান্তিপ্রদ দৃশ্য সাধনের বিশেষ অনুকূল। যাঁহারা নাগরিক কোলাহলে দিবানিশি ব্যতিব্যস্ত হইতেছেন, আত্ম চিন্তা করিবার যাঁহাদের অবসর নাই, কাক সমাকুল বট-বৃক্ষের ন্যায় কোলাহলময় স্থান যাহাদের শয়ন মন্দির বা বিশ্রামভবন। এক কথায় বাজার যাঁহাদের বাসস্থান, বাজার যাঁহাদের সাধন স্থান, তাঁহাদের পক্ষে সেইরূপ নির্জ্জন গাম্ভীর্য্যপূর্ণ দেশে মধ্যে মধ্যে গমন করা নিতান্ত কর্ত্তব্য। মহর্ষি এই আশ্রম স্থাপন করিয়া নির্জ্জন সাধনার্থী ব্রাহ্মদিগের বিশেষ উপকার সাধন করিয়াছেন। আমাদের পরিচারকগণ যতদিন শান্তি নিকেতনে ছিলেন, মহর্ষির ব্যয়েই তাঁহাদের আহারাদি নির্ব্বাহ হইয়াছে। শান্তি নিকেতনের তত্ত্বাবধায়ক বাবু অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় ইঁহাদের প্রতি বিশেষ ভদ্রতা এবং যত্ন প্রদর্শন করিয়াছেন। আশ্রমধারী পণ্ডিত মহাশয়ও সৌজন্য ও শিষ্টতা দ্বারা বিশেষ আপ্যায়িত করিয়াছেন। বাস্তবিক সাধনার্থীদিগের জন্য শান্তি নিকেতনে অতি সুন্দর বন্দোবস্ত আছে।

প্রচার—ধুবড়ী ব্রাহ্মসমাজের বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে শ্রীযুক্ত নবদ্বীপচন্দ্র দাস তথায় গমন করেন। গত ১২ই ভাদ্র হইতে চারি দিবস উৎসব হয়। স্থানীয় ব্রহ্মমন্দিরে ছাত্রসমাজের এক অধিবেশন হয়, তাহাতে নবদ্বীপ বাবু ছাত্রজীবন সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। উৎসবান্তে তিনি তথায় যে কয়দিন অবস্থিতি করিয়াছিলেন, প্রতিদিন বাসায় বাসায় উপাসনাদি করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত বাবু শশিভূষণ বসু কুমিল্লা ব্রাহ্মসমাজের উৎসব উপলক্ষে গমন করেন। ১৩ই হইতে ১৫ই আগষ্ট পর্য্যন্ত তথায় উৎসব হয়, উপাসনায় শশী বাবু আচার্য্যের কার্য্য করেন। তিনি এক সপ্তাহের অধিক কাল তথায় অবস্থিতি করিয়া কোন কোন পরিবারে উপাসনা করেন, ছাত্রদিগের সহিত আলোচনা করেন এবং টাউন হলে "জীবন্ত শক্তির লক্ষণ" এবং "জাতীয় চরিত্রের অবনতি ও উন্নতি" সম্বন্ধে দুইটি বক্তৃতা করেন। স্থানীয় সমাজ গৃহে ছাত্রবৃন্দের জন্য "Solemn Warnings" সম্বন্ধে ইংরাজি বক্তৃতা ও ভিক্টোরিয়া স্কুল গৃহে "ছাত্র জীবনের কর্ত্তব্য ও দায়িত্ব" বিষয়ে বাঙ্গালা বক্তৃতা করেন।

আত্মীয় সভা—কয়েক জন ব্রাহ্মবন্ধুর উদ্যোগে আত্মীয় সভা নামে একটি সভা স্থাপিত হইয়াছে। দরিদ্র ব্রাহ্মগণের উপকার এবং নিজেদের মধ্যে প্রীতি স্থাপন করাই এই সভার উদ্দেশ্য। পরমেশ্বর উদ্যোগ কর্ত্তাদিগকে আশীর্ব্বাদ করুন।

দান—আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত জানাইতেছি যে বালক বালিকাদিগের রবিবাসরীয় নীতি বিদ্যালয়ের সাহায্যার্থ বরিশাল হইতে শ্রীযুক্তা মুক্তকেশী দত্ত ৫৲ টাকা প্রেরণ করিয়াছেন ও বালক বালিকাদের আমোদ বিধানার্থ মাননীয় জষ্টিস চন্দ্রমাধব ঘোষ মহাশয়ের পুত্র শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র ঘোষ ২০৲ টাকা দান করিয়াছেন।

রামমোহন রায়ের স্মরণার্থ সভা—আগামী ২৭এ সেপ্টেম্বর প্রত্যেক ব্রাহ্মের বিশেষ স্মরণীয় দিন। ঐ দিন ভারত-গৌরব-রবি ঈশ্বর-প্রেমিক মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় ব্রিষ্টল নগরে ইহলোক লীলা সংবরণ করেন। তাঁহার জীবন-কাহিনী আলোচনা, এবং তাঁহার পরলোকগত আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের জন্ম ব্রাহ্মগণ প্রতি বৎসর ২৭এ সেপ্টেম্বর তারিখে সভা করিয়া থাকেন। এবার কলিকাতা সিটি কলেজ গৃহে সভা হইবে। নানাধর্ম্মাবলম্বী বিখ্যাত বক্তাগণ বক্তৃতা করিবেন এবং রাজার স্বরচিত সংগীতাদি গীত হইবে। আমরা আশাকরি, কলিকাতার ন্যায় মফঃস্বলের প্রত্যেক সমাজের সভ্যগণ প্রতিবৎসরে উক্তমহাত্মার স্মরণার্থ সভা করিবেন এবং যাহাতে এতদুপলক্ষে কোন প্রকার স্থায়ী শুভানুষ্ঠান হয়, তাহার চেষ্টা করিবেন।

সাধন-আশ্রমে উৎসব—গত ১লা সেপ্টেম্বর সাধনাশ্রমের মাসিক উৎসব সম্পন্ন হইয়াছে। ঐ দিন শ্রীযুক্ত বাবু জয়শঙ্কর রায় ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যে জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন। ইনি অবিবাহিত প্রৌঢ়। কুমিল্লা বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষকতা কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। সেই কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া গত মাঘোৎসবের পর হইতে সাধনাশ্রমে যোগ দিয়াছেন। ইনি আপাততঃ সঙ্কল্পাধীন পারচারক রূপে গৃহীত হইলেন। পরমেশ্বর ইঁহার সাধু সঙ্কল্পের সহায় হউন।

শ্রীযুক্ত নবদ্বীপচন্দ্র দাস, এবং শ্রীযুক্ত প্রকাশ দেব ও শ্রীযুক্ত হরিমোহন ঘোষাল ছোটনাগপুর অঞ্চলে প্রচারার্থ গমন করিয়াছেন।

টাঙ্গাইল ব্রহ্মোপাসনালয় নির্ম্মাণার্থ সাহায্য প্রার্থনা-পত্র।

সবিনয় নিবেদন

ময়মনসিংহ জেলার মধ্যে টাঙ্গাইল একটী প্রসিদ্ধ স্থান। ৭।৮ বৎসর গত হইল এখানে একটী ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপিত হইয়াছে। কিন্তু উপাসনালয়ের অভাবে বহু অসুবিধা ভোগ করিতে হইয়াছিল, করটিয়ার সদাশয় জমীদার মাননীয় হাফেজ মহম্মদ আলি খাঁ সাহেব উপাসনালয় নির্ম্মাণের জন্য ৪৫০ শত টাকা দান করিয়া আমাদিগকে কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ করিয়াছেন। কিন্তু দুই সহস্র টাকার কমে একটী পাকা গৃহ নির্ম্মাণ করা সম্ভব নহে—এই অবিশ্বাসের যুগে ধর্ম্ম ও নীতির মাহাত্ম্য সংস্থাপন দেখিয়া যাঁহারা পুলকিত হন, এমন প্রত্যেক সজ্জনের নিকট আমরা উপাসনালয় নির্ম্মাণের জন্য অর্থ ভিক্ষা করিতেছি। আশা করি ধর্ম্মপরায়ণ নরনারীগণ এই মহৎ কার্য্যের জন্য আমাদিগকে অর্থদান করিতে কখনও বিমুখ হইবেন না। যিনি যাহা দান করিবেন, তাহা কৃতজ্ঞতার সহিত গ্রহণ করা যাইবে।

নিবেদক,

শ্রীহরনাথ ঘোষ, ডাক্তার, করটিয়া, টাঙ্গাইল।
শ্রীকৃষ্ণকুমার মিত্র, সঞ্জীবনী সম্পাদক, কলিকাতা।
শ্রীপ্রসন্নকুমার বসু, সঞ্জীবনী সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, ঐ।
শ্রীমথুরানাথ গুহ, স্কুল সব ইনস্পেক্টর, টাঙ্গাইল ব্রাহ্মসমাজ-সম্পাদক।
শ্রীযতীন্দ্রচন্দ্র গুহ, বি, এ, শিক্ষক টাঙ্গাইল স্কুল, মন্দির কমিটি সম্পাদক।

অর্থাদি প্রার্থনাকারীদের মধ্যে কোন একজনের নিকট পাঠাইতে পারেন।

ব্রাহ্মবালকদিগের শিক্ষা।

কোন একজন সদাশয় বন্ধুর সাহায্যে আত্মীয় সভা কতিপয় দরিদ্র ব্রাহ্মবালকের শিক্ষার ভার গ্রহণ করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন। বালকগণকে কলিকাতাস্থ কোনও এণ্ট্রেন্স স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দেওয়া হইবে। ব্রাহ্মসমাজের সকল বিভাগের ব্রাহ্ম-বালকই সভার সাহায্য প্রাপ্ত হইতে পারিবে। প্রার্থীদিগকে নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নিকট লিখিত আবেদন পাঠাইতে হইবে।

ব্রাহ্মবালিকাগণের শিক্ষা।

আত্মীয় সভা মফঃস্বলস্থ কয়েকটী দরিদ্র বালিকার শিক্ষার ব্যয়ভার আংশিক অথবা সম্পূর্ণরূপে বহন করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন। বালিকাদিগকে কালকাতা অথবা তন্নিকটস্থ বোর্ডিং স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দেওয়া হইবে। ব্রাহ্মসমাজের সকল বিভাগের বালিকাগণই সভার সাহায্য প্রাপ্ত হইতে পারিবে। বালিকাগণের কর্ত্তৃপক্ষগণ নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নিকট আবেদন করিবেন। ইতি।

১০।৩ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট কলিকাতা। } শ্রীসূর্য্যকুমার চট্টোপাধ্যায় সম্পাদক—আত্মীয় সভা।

বিজ্ঞাপন।

আগামী ১২ই অক্টোবর অপরাহ্ন ৬ ঘটিকার সময় ১৩ নং মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীটস্থ সিটি কলেজ ভবনে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অধ্যক্ষ সভার তৃতীয় ত্রৈমাসিক অধিবেশন হইবে।

বিবেচ্য বিষয়।

১। কার্য্যনির্ব্বাহক সভার তৃতীয় ত্রৈমাসিক কার্য্যবিবরণ ও আয় ব্যয়ের হিসাব।

২। বাবু বাণীকান্ত রায় চৌধুরী প্রস্তাব করিবেন:—ব্রাহ্ম ছাত্রীনিবাস সব কমিটীর সম্পাদক বাবু গুরুচরণ মহলানবিশ মহাশয়কে উক্ত সব কমিটীর সম্পাদক-পদ হইতে অবসৃত করিবার কারণ অনুসন্ধান করিবার নিমিত্ত একটি কমিশন নিযুক্ত হউক।

৩। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের পুস্তক বক্তৃতা ও উপদেশাদি মধ্যে হরিনাম ব্যবহার সম্বন্ধে ময়মনসিংহের বাবু বরদাকান্ত বসু মহাশয়ের একখানি পত্র সম্বন্ধে বিচার।

৪। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রচারক পুনর্নিয়োগের নিয়ম সম্বন্ধে বিচার।

৫। বিবিধ।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ অফিস ২১১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১৭ই সেপ্টেম্বর ১৮৯৩ } শ্রীগুরুচরণ মহলানবিশ সম্পাদক সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ

২১১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, ব্রাহ্ম মিশন যন্ত্রে শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দত্ত কর্তৃক মুদ্রিত ও ৩রা আশ্বিন প্রকাশিত।

তত্ত্ব কৌমুদী

ধর্ম্ম ও সমাজতত্ত্ব বিষয়ক পাক্ষিক পত্রিকা।

১২শ সংখ্যা।
১৬শ ভাগ।

১৬ই আশ্বিন, রবিবার, ১৮১৫ শক, ব্রাহ্ম সম্বৎ ৬৪

বাংসরিক অগ্রিম মূল্য ২॥•
মফস্বলে ৩
প্রতি খণ্ডের মূল্য ৵•

সেবা-ব্রত।

মন কেন চাও রে মিষ্টতা ?
কেন এত স্ব-সুখ-পরতা ?
এই ত বিধির লেখা, জীবনে চলিবে একা,
কেন তবে চাও রে মিত্রতা ?
অন্বেষণ কেন বথা তথা ?

কেন তুমি জলৌকার মত,
ধরি ধরি করিছ নিয়ত ?
যা কিছু ধরিতে চাও, ধরিবারে নাহি পাও,
বার বার হও আশা-হত
তবু কেন উৎসুক সতত ?

সুখে কেন এতই লালসা ?
কেন সেবা কর না ভরসা ?
পর সুখে সুখী হয়ে, নিজে যাও পাসরিয়ে
রহিবে না তোমার এ দশা.;
প্রাণে পাবে প্রেমের বরষা।

মর্ত্তে সেবা, উপরে ঈশ্বর,
এ দুটী ত নিত্য সহচর ;
সুখ-তৃষ্ণা ফেলি পাছে, বল বুদ্ধি যাহা আছে,
সেবা-ব্রতে রাখ নিরন্তর ;
পাবে সুখ জুড়াবে অন্তর।

ওহে প্রভু, ওহে বিশ্বপতি !
নাহি সুখ চাহিতে শকতি,
নীরস সরস হই, যথায় তথায় রই,
সেবা-ব্রতে থাক্ সদা মতি ;
তব পদে এই হে মিনতি।

সম্পাদকীয় মন্তব্য।

সামাজিক শাসন-প্রণালী—জনসমাজের কার্য্য দুই প্রকারে চলে, এক কোন এক প্রতিভাশালী নেতার অধীনে, দ্বিতীয় দশজনের সম্মিলিত জ্ঞান ও সম্মিলিত শক্তির অধীনে। প্রাচীন কালে প্রথমোক্ত বন্দোবস্তই ছিল। আদিম বর্ব্বর অবস্থায় যখনি অন্তর্বৈর ও বহির্বৈরে জাতি সকল সর্ব্বদা উত্যক্ত উপদ্রুত ও উৎকণ্ঠিত হইয়া থাকিত, তখন যে ব্যক্তি প্রতিভা ও বুদ্ধির প্রাখর্য্যে তাহাদের মধ্যে অগ্রণী হইত, তাহাদিগকে বিপৎকালে বিপদুদ্ধারের উপায় বলিয়া দিতে পারিত, স্বদল-রক্ষার নানা প্রকার কৌশল উদ্ভাবন করিতে পারিত, লোকে স্বভাবতঃই সেই প্রতিভাশালী ব্যক্তির অনুগত হইত। আত্ম-রক্ষার জন্ত তাহাকে আশ্রয় করিয়া থাকিত। এখনও আরবদেশে ও মধ্য আসিয়াতে এমন সকল যাযাবর জাতি রহিয়াছে, যাহারা এক একজন প্রতিভাশালী নেতার অধীনে বাস করিতেছে। আদিমকালে এই সকল প্রতিভাশালী নেতাকে কেহ সভা করিয়া মনোনীত করিত না। স্বীয় প্রতিভার গুণে ঐ সকল ব্যক্তি এক এক দলের উপরে স্বীয় অধিকার স্থাপন করিতেন। রণজিৎ সিংহ যে সমগ্র পঞ্জাবের অধীশ্বর হইয়াছিলেন, তাহা কি শিক রাজাদিগের সভাতে মনোনীত হইয়া? শিবজী যে মহারাষ্ট্রীয় শক্তিকে ত্রাসের বস্তু করিয়া তুলিয়াছিলেন, তাহা কি কোন সভার ভোট অনুসারে? তাহা নহে, সাহসে উদ্যোগে ও প্রতিভাতে যে সর্ব্বাগ্রগণ্য হইয়াছে সেই অপরদিগকে স্বীয় পদানত করিয়া লইয়াছে। উচ্ছৃঙ্খল ও নিয়ম-প্রণালী-বিহীন সমাজের এই অবস্থা অবশ্যম্ভাবী। বর্ত্তমান কালের সভ্য ও নিয়মানুগত সমাজে আর এক প্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। এখন যে প্রতিভার আদর বিলুপ্ত হইয়াছে, বা গুণিগণের গুণের প্রতি অনুরাগ নাই, তাহা নহে। "গুণৈঃহি সর্ব্বত্র পদং নিধীয়তে"—বিধাতা গুণকে এরূপ শক্তি দিয়াছেন, যদ্দারা ইহা সকলেরই হৃদয়কে আকৃষ্ট করে ও সর্ব্বত্র স্বীয় অধিকার স্থাপন করে; এখনও প্রতিভাশালী ও গুণী ব্যক্তিগণ প্রাধান্য লাভ করিয়া থাকেন। তাঁহাদিগকেই সকল সভ্যসমাজের অগ্রগণ্য শ্রেণীতে দেখিতে পাওয়া যায়। তবে প্রাচীন কালের সহিত এখনকার প্রথম প্রভেদ এই,—সেকালে অধিকাংশ লোক ক্ষুদ্র থাকিত, সুতরাং তাহাদের মধ্যে একজনের মস্তক উচ্চে উঠিলে তাহাকে অতিশয় মহৎ দেখাইত; বর্ত্তমান সময়ে শিক্ষাগুণে অনেকে উচ্চতা লাভ করাতে সেইরূপ প্রতিভাশালী ব্যক্তিদিগকে তত বড় দেখায় না। প্রাচীন গ্রীসদেশীয় রাজ-

নীতি-বিশারদ থেমিষ্টক্লিস বা পেরিক্লিস, কিংবা রোমীয় রাজনীতিবেত্তা কেটোর নাম যে ইতিহাসের আকাশে উজ্জ্বল তারকার ন্যায় জলিতেছে, তাহার কারণ এই অন্ধকারের মধ্যে সেই এক একটী আলোক ছিল। বর্ত্তমান সময়ের গ্লাডষ্টোন রাজনীতি বিষয়ে সেই প্রাচীন রাজনীতিজ্ঞদিগের অপেক্ষা কোন অংশেই ন্যূন নহেন, তবে তাঁহার চতুষ্পার্শ্বে আরও ক্ষুদ্র ও মহৎ অনেক তারকা জলিতেছে বলিয়া তাঁহার জ্যোতি সে প্রকার দীপ্তিশালী বোধ হইতেছে না। দ্বিতীয় প্রভেদ এই,—গ্লাডষ্টোনকে অপর দশ জনকে সঙ্গে লইয়া কাজ করিতে হইতেছে। তাঁহার কার্য্য ঐ দশজনের চিন্তা ও কার্য্যের দ্বারা নিয়মিত হইতেছে। জনসমাজের এই দুই প্রকারে কার্য্য করিবার রীতি আছে। যাহারা দশজনে মিলিয়া কাজ করিতে অসমর্থ; দশজনে একত্র বসিতে গেলেই বিবাদ কলহে তাহাদের দিন পর্য্যবসিত হয়, এবং ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে, তাহারা তদ্দ্বারাই প্রমাণ করে যে নিয়মতন্ত্রপ্রণালী তাহাদের জন্য নহে। কোন এক প্রতিভা-শালী নেতার অধীনে থাকা তাহাদের পক্ষে শ্রেয়; তাহা হইলে তাহাদিগের দ্বারা কার্য্য হইতে পারে। কোন গৃহে যদি একদল বিবাদ ও কলহকারী দুরন্ত বালক থাকে, তবে সেখানে একজন জবরদস্ত কর্ত্তা না থাকিলে, ঐ বালকদিগের দ্বারা কোনও কার্য্য হয় না। ব্রাহ্মগণ পরস্পরের সহিত বিবাদ করিয়া কি এই প্রমাণ করিতেছেন, নিয়মতন্ত্র প্রণালী তাঁহাদিগের জন্য নহে; শিশু-দিগের জন্য যে শাসনপ্রণালী ব্যবহৃত হয়, তাঁহাদিগের জন্য ও সেইরূপ প্রণালীর প্রয়োজন?

ঘোষের গঙ্গা—একজন ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারককে একজন শিক্ষিত ব্যক্তি একদিন জিজ্ঞাসা করিলেন—"ব্রাহ্মধর্ম্ম ও নব-বিধানের মধ্যে প্রভেদ কি?" ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারক উত্তর করিলেন, "আপনি এই তিনটী সত্যের প্রতি প্রণিধান করুন"—

১। একমাত্র নিরাকার, পূর্ণপরাৎপর পরমেশ্বরই মানবের উপাস্য।

২। মহম্মদ ঈশ্বর-প্রেরিত মহাজন ও অভ্রান্ত পথ-প্রদর্শক।

৩। মহম্মদ-প্রণীত কোরাণ অভ্রান্ত ও সর্ব্বথা অবলম্বনীয়। এই সত্যত্রয়কে যাঁহারা অবলম্বন করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে আপনি ব্রাহ্ম বলেন কি না?

উত্তর। না তাহারা ত মুসলমান।

প্রশ্ন। আচ্ছা আর তিনটী সত্যের প্রতি প্রণিধান করুন।

১। একমাত্র নিরাকার পূর্ণ পরাৎপর পরমেশ্বরই মানবের উপাস্য।

২। কেশবচন্দ্র সেন ঈশ্বর প্রেরিত মহাজন ও অভ্রান্ত পথ প্রদর্শক।

৩। কেশবচন্দ্র সেন প্রণীত নবসংহিতা প্রভৃতি অভ্রান্ত ও সর্ব্বথা অবলম্বনীয়।

উপরি উল্লিখিত সত্যত্রয় যাঁহারা অবলম্বন করিয়াছেন তাঁহাদের সঙ্গে পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তিদিগের প্রভেদ কি?

উত্তর। প্রভেদ এই মাত্র মহম্মদের পরিবর্ত্তে কেশবচন্দ্র সেনকে বসাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

প্রশ্ন। তবে মহম্মদের ধর্ম্মকে ব্রাহ্মধর্ম্ম কেন বলিবেন না? যদি মহম্মদে আবদ্ধ বলিয়া তাহাকে উদার ব্রাহ্মধর্ম্ম না বলেন, তবে কেশবচন্দ্রে আবদ্ধ ধর্ম্মকে উদার ব্রাহ্মধর্ম্ম কেন বলিবেন? পূর্ব্বোল্লিখিত সত্যত্রয়কে যে ভাবে দেওয়া হইয়াছে, বোধ হয় নববিধানী বন্ধুদিগের মধ্যে অতি অল্প লোকেই সে ভাবে মানিয়া থাকেন। যাহা হউক পূর্ব্বোক্ত কথোপকথনটী উদ্ধৃত করিবার অভিপ্রায় এই, সাধুভক্তি অতি স্পৃহণীয় বস্তু হইলেও কোনও সাধুবিশেষে ধর্ম্মকে যখন আবদ্ধ করা যায় তখন আর তাহা ব্রাহ্মধর্ম্ম থাকে না, ইহাই প্রদর্শন করা। কলিকাতার দক্ষিণে রাজপুর হরিনাভি প্রভৃতি জনপদ সকলের সন্নিকট দিয়া এক সময়ে গঙ্গা বহমানা ছিল। কালক্রমে নদী সে পথ পরিত্যাগ করিয়া অপর পথে প্রবাহিত হইয়াছে। কিন্তু গঙ্গার প্রতি লোকের এমনি ভক্তি যে তাহারা মজা গঙ্গার প্রাচীন খাতে পুষ্করিণী খনন করিয়া তাহার জলকে গঙ্গাজল বলিয়া সেবা করিতেছে। যে সকল ধনী লোক ঐ সকল পুষ্করিণী খনন করিয়াছেন, তাঁহাদের নামে ঐ সকল পুষ্করিণী প্রসিদ্ধ হইয়াছে যথা:—অমুক ঘোষের গঙ্গা, অমুক বসুর গঙ্গা ইত্যাদি। যেমন গঙ্গা না মজিলে আর ঘোষের গঙ্গা বা বসুর গঙ্গা হইতে পারে না, সেইরূপ ধর্ম্ম সংকীর্ণ ও বিকৃত না হইলে ব্যক্তি-বিশেষে আবদ্ধ হয় না। এই সকল সংকীর্ণ ক্ষেত্র হইতে ধর্ম্মকে উদ্ধার করা ব্রাহ্মসমাজের মহান উদ্দেশ্য।

ধর্ম্ম উপদেশে ও জীবনে—একবার একখানি জাহাজ সমুদ্রগর্ভে যাইতে যাইতে ঘোরতর বাত্যার মধ্যে পতিত হইয়াছিল। সেই জাহাজে অপরাপর আরোহীদিগের মধ্যে একজন বিশপ অর্থাৎ প্রধান ধর্ম্মাচার্য্য ছিলেন। তিনি নিত্য জাহাজের লোকদিগকে লইয়া উপাসনা করিতেন, এবং ধর্ম্ম ধর্ম্ম ঈশ্বর ঈশ্বর করিয়া সকলকে বিরক্ত করিয়া তুলিয়াছিলেন। ঝড়ের প্রকোপ যখন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, তখন আরোহিগণ স্বভাবতঃ অস্থির হইয়া পড়িল। কেহ কাঁদিতেছে, কেহ প্রার্থনা করিতেছে, কেহ হা হতোস্মি করিতেছে, নারীগণ ক্ষণে ক্ষণে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িতেছেন। এইরূপে ক্ষণকালের মধ্যে ভীষণ দৃশ্য উপস্থিত হইল। এদিকে জাহাজ মত্তের মত দুলিতেছে; অবিলম্বেই সাগর গর্ভে যায়। কাপ্তেন ধীরচিত্তে স্বীয় কর্ত্তব্য সাধনে মনোযোগী আছেন এবং জাহাজখানি রক্ষা করিবার জন্য প্রাণপণে প্রয়াস পাইতেছেন। বিশপটী সক-লের অপেক্ষা ত্রস্ত ও ব্যস্ত। তিনি ছুটাছুটী করিতেছেন, একবার নীচে যাইতেছেন একবার উপরে আসিতেছেন। আরোহীদিগের ত্রাসকে আরও দশগুণ বৃদ্ধি করিতেছেন। অব-শেষে ঝড় যখন অতিশয় বাড়িয়া উঠিল, তখন তিনি ত্রস্তে ব্যস্তে কাপ্তেনের নিকটে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,"কাপ্তেন! কাপ্তেন! জাহাজের অবস্থা কিরূপ দেখিতেছ?" কাপ্তেন ধীরভাবে উত্তর করিলেন,—আর কি? আপনি সকলকে প্রস্তুত করুন, আমরা সকলে সত্বরে প্রভু পরমেশ্বরের পবিত্র সন্নিধানে উপস্থিত হইব।" শুনিয়া বিশপের প্রাণ উড়িয়া গেল; তিনি বলিয়া উঠিলেন, "এমনি কি হবে, বোধ হয় তাহা হবে না।"—বিনি ঈশ্বর

ঈশ্বর করিয়া লোককে জ্বালাতন করিয়া তুলিয়াছিলেন; বিপদকালে তাঁহার মুখে ঈশ্বরের নাম আসিল না, কিন্তু এক-জন জাহাজের কাপ্তেন, বিষয়ী লোক, তাঁহার মুখে সর্ব্বাগ্রে ঈশ্বরের নাম প্রকাশ পাইল। জগতে দেখা যায় অধিক ধর্ম্ম ধর্ম্ম যাহারা করে সময়ে সময়ে তাহাদের এই প্রকার শাস্তি হইয়া থাকে; তাহারা ধর্ম্মের প্রতি আস্থা হীন হইয়া যায়। উপদেশে অনেক সময়ে উপদেষ্টার সর্ব্বনাশ করিয়া থাকে।

যাহারা সর্ব্বদা ধর্ম্ম ধর্ম্ম করে, তাহারা যে অনেক সময়ে ধর্ম্ম হইতে বিচ্ছিন্ন হয়, ইহার নিদর্শন মানব সমাজে ভূরি ভূরি পাওয়া গিয়াছে। কত দূর হইতে, কত নিষ্ঠার সহিত, কত ব্যয় ভূষণ করিয়া লোকে কাশী গয়া প্রভৃতি তীর্থ স্থানে আসিয়া থাকে। কিন্তু ঐসকল ধর্ম্মক্ষেত্রে যাহারা সর্ব্বদা বাস করিতেছে, সেখানকার ধর্ম্ম কার্য্যের ভার যাহাদিগের প্রতি ন্যস্ত রহিয়াছে, সেই কাশীর পাণ্ডা ও গয়ার গয়ালিদিগের বিষয় একবার স্মরণ করিলেই ইহার প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাহাদিগকে দেখিলে ধর্ম্মের প্রতি অনাস্থা জন্মিয়া যায়। ধর্ম্মকে তাহারা একটা জীবিকার উপায় স্বরূপ জানে, ইহার অতিরিক্ত ধর্ম্মের সহিত তাহাদের কোনও সম্পর্ক নাই। প্রসিদ্ধ মার্টিন লুথার রোম-নগরে গিয়াই ক্যাথলিক ধর্ম্মের অসারতা দর্শন করিয়াছিলেন। ধর্ম্মের প্রধান ক্ষেত্রে তিনি ধর্ম্মের যেরূপ অবমাননা দেখিয়া-ছিলেন এরূপ আর কুত্রাপি দেখেন নাই। দৈনিক জীবনে ধর্ম্ম সাধনের নিয়ম থাকার প্রয়োজন, অথচ সর্ব্বদা সাবধান থাকিতে হয়, ধর্ম্মের বাহিরের মূর্ত্তির সহিত পরিচয় হইয়া পাছে তাহার আভ্যন্তরিক প্রাণের প্রতি উদাসীন হইয়া যাই।

জীবন পরিবর্ত্তন—ধর্ম্মসাধন ও ধর্ম্ম প্রচারের উদ্দেশ্য জীবন পরিবর্ত্তন। কি উপায়ে মানবের হৃদয় পরিবর্ত্তিত হয়—কি করিলে মানবের চিত্ত পাপের দিক হইতে ফিরিয়া ঈশ্বরের দিকে যায়? ধর্ম্মের কথা অনেকে বলিতে পারেন, অনেক লোক ঈশ্বর-প্রয়াসী, ধর্ম্মসাধনে অনেক সময় ক্ষেপণ করিতে পারেন, কিন্তু তাঁহাদের হৃদয় পাপের দিকে সংসারের দিকেই থাকিতে পারে। মানবের হৃদয় যখন সংসার হইতে ঈশ্বরের দিকে ফিরে, তখন তাহার কতকগুলি বিশেষ চিহ্ন প্রকাশ পায়। নদীতে জোয়ার আসিয়াছে কিনা তাহা যেমন নদী বক্ষস্থিত কাষ্ঠ, পত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলা যায়, সেইরূপ মানব জীবনের গতি ঈশ্বরের দিকে ফিরিয়াছে কিনা, তাহা মানবের জীবনের ঘটনা সমূহের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই বলা যাইতে পারে। যে জীবনে যথার্থ পরিবর্ত্তন হইয়াছে, সেই জীবনের প্রথম লক্ষণ দীনতা। আত্ম সমর্থনের ভাব আর তাঁহার জীবনে দেখিতে পাওয়া যায় না। অন্যের নিন্দা তিরস্কার সর্ব্বদা মস্তক পাতিয়া বহন করিতেছেন। দীনতা তাঁহার ভূষণ। দ্বিতীয় লক্ষণ, স্বার্থ-নাশ। ধর্ম্মের জন্য ছাড়িতে পারি না এমন স্বার্থ ও সুখ নাই। যাঁহার মুখ ঈশ্বরের দিকে ফিরিয়াছে, তাঁহার ঈশ্বরের জন্য, ধর্ম্মের জন্য অদেয় আর কি আছে?

জীবনের এই পরিবর্ত্তন লাভ করিবার জন্য সকল ধর্ম্ম সাধনার্থীই ইচ্ছুক। এই হৃদয় পরিবর্ত্তন কি উপায়ে হয়? নদীতে জোয়ার হয় চন্দ্রের আকর্ষণে। যখন সমুদ্রের জল চন্দ্রের আকর্ষণে স্ফীত হয়, তখন নদীতে জোয়ার হয়। নদী ও সমুদ্র ইচ্ছা করিয়া পৃথিবীতে এই জোয়ার উৎপন্ন করিতে পারে না। তবে কি পৃথিবীর ও সমুদ্রের কিছুই করণীয় নাই? আছে পৃথিবী চন্দ্রের নিম্নে আপন বক্ষ বিস্তার করিয়া অবস্থান করিতে পারে; কিন্তু জল ঊর্দ্ধে তুলিবার, নদীর স্রোত ঊর্দ্ধ দিকে প্রবাহিত করিবার শক্তি চন্দ্রেতে আছে।

মানব হৃদয়ের পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে ও এই নিয়ম। সেই দয়ার চন্দ্রের শক্তিতেই মানবের হৃদয়ের স্রোতঃ পরিবর্ত্তিত হয়; নিজে ইচ্ছা করিয়া হৃদয়ে এক বিন্দু পরিবর্ত্তনও আনিতে পারে না; কিন্তু মানবকে এই টুকু করিতে হইবে, সেই প্রেম চন্দ্রের নিম্নে আপন হৃদয়কে আনিয়া রাখিতে হইবে; পরিবর্ত্তন তাঁহার কৃপায় হইবে।

সকল ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের ইতিবৃত্তেই নবজীবনপ্রাপ্ত ব্যক্তি-দিগের বিবরণ পাঠ করা যায়। তবে এ সম্বন্ধে খ্রীষ্ট ধর্ম্মের ইতিবৃত্ত যেমন আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য ঘটনাতে পরিপূর্ণ এরূপ প্রায় অন্যত্র দৃষ্ট হয় না। সেণ্টপলের হৃদয় পরিবর্ত্তনের বিবরণ সকলেই অবগত আছেন। বৈষ্ণব ধর্ম্মে জগাই মাধাইএর উদ্ধার অল্প আশ্চর্য্যকর নহে। মুসলমান ধর্ম্মে ওমরের নবজীবন লাভ একটী বিস্ময়কর ঘটনা। ওমর একজন মহম্মদের প্রধান শত্রু ছিলেন। তিনি কাবা মন্দিরে সমবেত কোরেশ বংশীয় আত্মীয় স্বজনগণের সমক্ষে দেবতা-দিগের নামে শপথ পূর্ব্বক এই প্রতিজ্ঞা করিয়া বহির্গত হইয়া-ছিলেন, যে মহম্মদের মস্তক স্কন্ধ হইতে বিচ্ছিন্ন না করিয়া উপবেশন করিবেন না বা প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন না। তদনুসারে তিনি সশস্ত্র হইয়া স্বীয় ভগিনীর গৃহে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার ভগিনী ও ভগিনীপতি তৎ-পূর্ব্বেই মহম্মদের ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। তাঁহারা অনেক প্রকারে ওমরকে সান্ত্বনা করিবার প্রয়াস পাইলেন, কিন্তু সেই সিংহের ন্যায় বলশালী বীর কিছুতেই শান্তমূর্ত্তি ধারণ করিলেন না। তিনি স্বীয় ভগিনী ও ভগিনীপতিকে গুরুতর-রূপে প্রহার করিলেন। ভগিনীকে যখন প্রহার করেন, তখন তাঁহার ভগিনী তাঁহাকে বলিলেন—"ভাই আমরা এসলাম ধর্ম্মাবলম্বী হইয়াছি, হজরত মহম্মদকে ঈশ্বর-প্রেরিত বলিয়া স্বীকার করিয়াছি, আমাদিগকে খড়্গ দ্বারা খণ্ড খণ্ড করিলেও ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিব না।" মহম্মদের জীবনচরিত লেখক বলিয়াছেন—"ধর্ম্মেতে ভগিনীর দৃঢ়তা দেখিয়া ওমর বিস্ময়-সাগরে মগ্ন হইলেন ও আপন কার্য্যের জন্য অনুতাপ করিতে লাগিলেন।" তৎপরে স্বীয় ভগিনী ও ভগিনীপতি ও অপর বিশ্বাসিগণের মুখে কোরাণের কয়েকটী সুরা শ্রবণ করিয়া তাঁহার হৃদয় একেবারে পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। তিনি যেমন বিরোধী ছিলেন তেমনি মহম্মদের অনুগত হইয়া পড়িলেন।

কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে দুইটী কারণে ব্রাহ্মধর্ম্মের দ্বারা লোকের হৃদয়ে প্রবল অনুতাপের উদয় হওয়া কঠিন। প্রথম ব্রাহ্মগণ অনন্ত নরকে বিশ্বাস করেন না, সুতরাং তাঁহা-দের অন্তরে পাপের অনিষ্টকারিতা বোধ তত তীব্র হইবার

কথা নহে। দ্বিতীয়তঃ ব্রাহ্মগণ বিশ্বাস করিয়া থাকেন, যে সকলেরই পরিত্রাণ হইবে। ঈশ্বরের রাজ্যে কেহই বর্জ্জিত হইবে না। এই মতও পাপ-বোধের তীব্রতাকে মন্দীভূত করে। কিন্তু চিন্তা করিলেই দেখা যাইবে যে ভয়, অপেক্ষা প্রেম মানব অন্তরে অধিক কার্য্য করিয়া থাকে। ভয় সকল প্রকৃতির উপরে কার্য্য করে না। কিন্তু প্রেম সকল প্রকৃতির উপরে কার্য্য করিয়া থাকে। শাস্তির ভয় অপেক্ষা ঈশ্বর-প্রীতির দ্বারা মানব-হৃদয়ের অধিক পরিবর্ত্তন ঘটিতে পারে। আর ইহা জানিলেই বা কি যে এক সময়ে অবশ্য মুক্তি হইবে। তাহা বলিয়া কি কোনও প্রকৃতির হৃদয় পাপকে স্পৃহণীয় বোধ করিতে পারে? রোগী যদি জানে দশদিন পরে রোগ নিশ্চয় যাইবে, চিকিৎসকগণ যদি সে বিষয়ে তাহাকে নিশ্চয়রূপে বলিয়া থাকেন তাহা হইলে কি সে রোগ যন্ত্রণাকে স্পৃহণীয় মনে করিতে পারে? সে কি বলে "আচ্ছা থাক্ থাক্ এই রোগ যাতনা আমার দেহে থাক্, সেইরূপ পাপের কালিমাময় মূর্ত্তি যে দেখিয়াছে সে কি পাপ পুষিয়া রাখিতে চাহে। অতএব ইহা নিশ্চিত যে পাপীর নিকটে ঈশ্বরের উদার প্রেমের মহিমা ভাল করিয়া ধরিতে পারিলে, তাহার হৃদয় পরিবর্ত্তিত হইবেই হইবে।

অনন্তের আহ্বান—অনন্ত নিয়ত মানবকে মধুরস্বরে ডাকিতেছেন। সমুদ্রস্থ পোতারোহী ব্যক্তি যখন অনিমেষ-নয়নে চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করেন, তখন দেখেন আকাশ, সাগরের বেলাভূমির ন্যায় দণ্ডায়মান। উত্তাল তরঙ্গরাজি যেন চতুর্দ্দিকে আকাশের সহিত যুদ্ধ করিতেছে। চক্ষুর দৃষ্টি সীমাবদ্ধ। যেখানে কিছু নাই, সেখানেও একটা কিছু সাকার মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করে। কিন্তু অন্তশ্চক্ষু যখন এই অদূরস্থিত কল্পনাময় যবনিকা ভেদ করে, তখন প্রাণ এক অনাদ্যনন্ত অসীম সত্তা-সাগরে ডুবিয়া যায়। আকাশরূপী অনন্ত তখন সময় বুঝিয়া মানব প্রাণকে মধুর আহ্বানে আকর্ষণ করিতে থাকে। সান্ত জড়রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া ঐ অনন্তের রাজ্যে প্রবেশ করিবার জন্য আকাশ গম্ভীর ধ্বনিতে আহ্বান করে। আবার যখন প্রেমে হৃদয় প্লাবিত হয়, যখন প্রীতিভাজনকে দেখিয়া দেখিয়া আশা তৃপ্তি হয় না, প্রাণ পূর্ণ হয় না, দর্শনে বিমুখতা জন্মে না, তখনও ঐ অনন্তের ক্রিয়া। সান্ত প্রেম, পরিমিত ভোগ মানব প্রাণকে তৃপ্তি দান করিতে পারে না। মানব হৃদয় অতি ক্ষুদ্র বটে; কিন্তু প্রেমসুধা যতই কেন ঢাল না, ভাণ্ডার চিরদিন অপূর্ণ থাকিবে। প্রীতিভাজনকে দেখিয়া দেখিয়া, দেখার সাধ মিটে না। অনন্তকাল দেখিতে, ভাল বাসিতে ইচ্ছা হয়। এখানেও হৃদয় অনন্তমুখীন হইয়া রহিয়াছে। সান্ত প্রেমে, সান্ত ভোগে মানব হৃদয় পরিতৃপ্ত নহে। প্রেমরূপী অনন্ত চিরকাল মানবকে তাঁহার দিকে আকর্ষণ করিতেছেন,তাঁহার ডাকে আকৃষ্ট না হইয়া সান্তভাব লইয়া কেহই সন্তুষ্ট থাকিতে পারে না। তাই মানবহৃদয় অনন্ত প্রেমের জন্য পাগল। এইরূপে এক মহাসত্তা জ্ঞান, পুণ্য, আনন্দ প্রভৃতির অভ্যন্তরেবাস করিয়া জ্ঞাত অজ্ঞাতসারে মানব হৃদয়কে তাঁহার দিকে আকর্ষণ করিতেছেন। বিশ্বাসী অবিশ্বাসী, পণ্ডিত মূর্খ, সভ্য অসভ্য সকলেই সেই অনন্তের আকর্ষণে আকৃষ্ট এবং তাঁহার দিকে গমনোন্মুখ। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, "প্রথম বয়সে আমার নিকট এই নক্ষত্রখচিত অনন্ত আকাশ, অনন্ত দেবের পরিচয় দেয়। একদিন শুভক্ষণে এই অগণ্য নক্ষত্রপূর্ণ অনন্ত আকাশ আমার নয়নপথে প্রদীপ্ত হইল। তাহার আশ্চর্য্য ভাবে একেবারে আমার সমুদয় মন, সমুদয় আত্মা আকৃষ্ট হইল। অমনি বুদ্ধি আসিয়া সিদ্ধান্ত করিল যে, ইহা কখনও পরিমিত হস্তের রচনা নহে। সেই মুহূর্ত্তে অনন্তের ভাব হৃদয়ে প্রতিভাত হইল।" * * "আমার এই বিশ্বাস ছিল যে, ঈশ্বরই শালগ্রাম শিলা, ঈশ্বরই দশভুজা দুর্গা, ঈশ্বরই চতুর্ভুজা সিদ্ধেশ্বরী; কিন্তু শুভক্ষণে যেমন এই অনন্ত আকাশের উপরে আমার নয়নযুগল উন্মীলিত হইল, অমনি আমার জ্ঞান উন্মীলিত হইয়া পৌত্তলিক ভাবকে ক্ষণকালের মধ্যে তিরোহিত করিয়া দিল। অমনি জানিলাম, অনন্ত আকাশের অগণ্য নক্ষত্র পরিমিত হস্তের কার্য্য নহে, অনন্ত পুরুষেরই এই অনন্ত রচনা। প্রথম উপদেশ অনন্ত আকাশ হইতে পাইলাম।"

অসীম জড় ও চৈতন্যকে পরাভূত করিয়া অনন্তের আহ্বান-ধ্বনি সর্ব্বত্রই উত্থিত হইতেছে, যিনি তাহা শ্রবণ করিয়া তদনুসরণ করেন, তিনিই অমৃতময় রাজ্যে উপস্থিত হন। মহর্ষি যেমন অনন্তের আহ্বান শ্রবণ করিয়াছিলেন, তদ্রূপ অনেকেই সজ্ঞানে ঐ মধুরধ্বনি শ্রবণ করেন, কিন্তু মহর্ষির ন্যায় সেই অনন্তের অনুসরণ কয় জনে করিয়া থাকেন? বিরাম নাই, বিশ্রাম নাই এক অবারিত অনাহত শব্দ উত্থিত হইতেছে তাই ব্রাহ্মকবি গাহিয়াছেন;—

"বার বার প্রেমভরে—ডাকিছ গো মা,
প্রেম বাহু প্রসারিয়ে—ডাকিছ গো মা,
স্নেহে বিগলিত হয়ে—ডাকিছ গো মা,
আয় আয় আয় বলে—ডাকিছ গো মা,
অপরাধ ক্ষমা করে—ডাকিছ গো মা,
হাসিমুখে প্রেমভরে—ডাকিছ গো মা,
জীবের দশা মলিন দেখে—ডাকিছ গো মা।"

ধন্য সেই অনন্ত পথের যাত্রী, যিনি মাতার ডাক শুনিয়া মাতার অঞ্চল ধরিয়া অনন্ত পথে গমন করেন।

রামমোহন রায়—আর কতদিন আমরা রামমোহন রায়ের স্মৃতিচিহ্ন স্থাপন বিষয়ে উদাসীন থাকিব? তাঁহার ন্যায় স্বদেশবৎসল ব্যক্তি কয়জন জন্মিয়াছেন? তাঁহার ন্যায় স্বদেশের জন্য এত পরিশ্রম বা কে করিয়াছেন? আমরা তাঁহার স্মৃতিচিহ্ন অদ্যাপি স্থাপন করিতে পারিলাম না, ইহা এদেশের লোকের পক্ষে বিশেষতঃ বাঙ্গালিদিগের পক্ষে বড় নিন্দার কথা। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ একবার বলিয়াছিলেন, ব্রাহ্মসমাজই তাঁহার সর্ব্বপ্রধান কীর্ত্তি-স্তম্ভ। এ কথা সত্য তাহার আর সন্দেহ কি? চৈতন্য নানক, কবীর প্রভৃতি মহাত্মাগণের কি কির্ত্তি-স্তম্ভ আছে? তাঁহারা সহস্র সহস্র

নরনারীর চিত্তে বাস করিতেন, ইহাই তাঁহাদের কীর্ত্তি-স্তম্ভ রামমোহন রায়ও সেই প্রকার মানব-চিত্তে বাস করিবেন, তাঁহার আবার স্বতন্ত্র স্মৃতিচিহ্ন কি? কিন্তু জাতীয় শিক্ষা ও জাতীয় গুণাবলীর বিকাশের দিকে দৃষ্টি করিলে, স্বদেশোপকারী মহাজনগণের কোনও প্রকার স্মৃতিচিহ্ন রাখিবার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করা যায়। মহাজনদিগের স্মৃতিচিহ্ন দ্বারা দেশকে পূর্ণ করার ন্যায় জাতীয় প্রতিভা ও জাতীয় গুণাবলীর বিকাশের উৎকৃষ্ট উপায় অতি অল্পই আছে। কেবল রামমোহন রায় কেন, জ্ঞানে ধর্ম্মে ও পরোপকারে যে কেহ শ্রেষ্ঠ পদবী অধিকার করেন, তাঁহারই স্মৃতিচিহ্ন স্থাপন করা কর্ত্তব্য। কিন্তু কি দুর্ভাগ্যের বিষয়! দেশের কি দুর্দ্দশা! হরে, নরে, পরাণে সকলেরই স্মৃতিচিহ্ন স্থাপিত হয়, কিন্তু বর্ত্তমান যুগের সর্ব্বপ্রধান ব্যক্তি যিনি তাঁহার স্মৃতিচিহ্ন স্থাপন করিতে কেহই উদ্যোগী নহে। এক সময়েই ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র ও পণ্ডিতবর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মৃত্যু হইয়াছে, একদিনে তাঁহাদের উভয়ের স্মরণার্থ সভা আহূত হইয়াছিল, কোন দিন হয়ত শুনিব ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্রের একটী উৎকৃষ্ট প্রতিমূর্ত্তি বিলাত হইতে নির্ম্মিত হইয়া আসিয়াছে; ব্রিটিস ইণ্ডিয়ান এসোসিএসনের হলে তাহা খোলা হইবে; কিন্তু বিদ্যাসাগরের প্রতিমূর্ত্তির কথা আর শুনা যাইবে না। ইহার কারণ এই, ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্রের স্মৃতিচিহ্ন স্থাপন বিষয়ে জমিদারগণ উৎসাহী। তিনি তাঁহাদেরই লোক ছিলেন। সুতরাং সেটা শীঘ্র হইবার আশা আছে। বিদ্যাসাগর দরিদ্রের বন্ধু ছিলেন; দরিদ্রগণ তাঁহার প্রতিমূর্ত্তি স্থাপন করিয়া উঠিতে পারিবে না। যাহা হউক রামমোহন রায়ের স্মৃতিচিহ্ন স্থাপন করা বাঙ্গালি মাত্রেরই কর্ত্তব্য; বিশেষ ব্রাহ্মদিগের। রামমোহন রায় সহরের প্রান্তে যে গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিয়াছিলেন, সে ভবন অদ্যাপি বিদ্যমান রহিয়াছে, সে ভবন তাঁহার বংশধরদিগের হস্ত হইতে অন্য হস্তে গিয়াছে। এক্ষণে সেই বাটীতে সুকিয়া ষ্ট্রীটের থানা রহিয়াছে। একটু চেষ্টা করিলে টাকা তুলিয়া ঐ বাড়ীটী ক্রয় করিয়া তাঁহার স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ রাখা যাইতে পারে। তাহাতে তাঁহার নামে একটী লাইব্রেরী স্থাপন করা যাইতে পারে। তাঁহার প্রতিমূর্ত্তি তাহার মধ্যে রাখা যাইতে পারে। আমাদের মধ্যে কয়েক ব্যক্তি যদি প্রতিজ্ঞারূঢ় হইয়া এবিষয়ে লাগেন, তাহা হইলে কৃতকার্য্য হইতে পারেন। বিগত ২৭ সেপ্টেম্বর সিটীকলেজ ভবনে রাজার স্মরণার্থ সভা হইয়াছিল, প্রতি বৎসর এইরূপ সভা হইবে। কিন্তু তাঁহার একটা স্মৃতিচিহ্ন স্থাপন বিষয়ে সকলের মনোযোগী হওয়া উচিত।

বিশ্বাসীর বাধ্যতা।

বিশ্বাসিগণ আপন জীবনে এক প্রকার বাধ্যতা অনুভব করেন, যে বিষয়ে চিন্তা করিলে চমৎকৃত হইতে হয়। মহাপুরুষ মহম্মদের জীবন চরিতে দেখিতে পাওয়া যায় যে, তিনি যখন প্রকাশ্যে ধর্ম্ম প্রচার আরম্ভ করিলেন, তখন তাঁহার স্বজাতীয় কোরেশ বংশীয় ব্যক্তিগণ তাঁহার বিরোধী হইয়া উঠিলেন এবং তাঁহার ও তাঁহার শিষ্য দলের প্রতি বিবিধ প্রকার নির্য্যাতন আরম্ভ করিলেন। কয়েকজন কোরেশ দলপতি সমবেত হইয়া একদিন মহম্মদের খুল্লপিতা আবুতালেবের নিকট গমন করিয়া বলিলেন:—"তোমার এই ভ্রাতুষ্পুত্র মহম্মদ পৈতৃক ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া এক অদ্ভুত নূতন ধর্ম্ম আবিষ্কার করিয়াছে। সে আমাদের দেবতাদিগের নিন্দা করে, ও লোক সকলকে বিপথগামী করিতেছে; এতদ্ভিন্ন সে আমাদিগকে পথভ্রান্ত-ধর্ম্মদ্রোহী বলিয়া থাকে। আমরা প্রথমতঃ এজন্য তোমার নিকটে উপস্থিত হইয়াছি, যে তুমি তাহাকে উপদেশ দিবে পুনর্ব্বার যেন সে আমাদিগকে ও আমাদের ঠাকুর সকলকে এরূপ অনুচিত কথা না বলে। অতঃপর সে যদি তোমার উপদেশে নিবৃত্ত না হয় তবে আমরা যে উপায়ে হৌক তাহাকে নিবারণ করিতে সচেষ্ট হইব।" শান্তি-প্রিয় আবুতালেব কোরেশ দলপতিদিগের এই বৈর-নির্য্যাতন-স্পৃহা-সূচক বচন শ্রবণ করিয়া স্পষ্টই অনুভব করিলেন যে, আত্মীয় স্বজনগণের মধ্যে ঘোর বৈরানল প্রজ্বলিত হইল। মহম্মদ তাঁহার অবলম্বিত পথ হইতে নিবৃত্ত না হইলে এ বৈরানল নির্ব্বাণ করিবার উপায়ান্তর নাই। এবং ইহাও বুঝিতে পারিলেন যে, মহম্মদকে শত্রুকুলের হস্তে নিদারুণ শাস্তি ভোগ করিতে হইবে। ইহা অনুভব করিয়া আবুতালেব মহম্মদকে স্বীয় সন্নিধানে ডাকিলেন এবং ব্যগ্রতার সহিত তাঁহার অবলম্বিত পথ হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইবার জন্য অনুরোধ করিতে লাগিলেন। কোরেশগণ তাঁহাকে যাহা বলিয়াছিল, তাহা জ্ঞাপন করিলেন, এবং আশঙ্কিত বিপদ প্রদর্শন করিতে ত্রুটী করিলেন না। কিন্তু মহম্মদ ভীত হইবার পাত্র ছিলেন না। বিশ্বাসবলে তাঁহার হৃদয় সবল ছিল। তিনি উত্তর করিলেন:—"তাত, মোহম্মদের প্রাণ যে ঈশ্বরের শক্তিপূর্ণ হস্তে বিধৃত হইয়া রহিয়াছে, তাঁহার নামে আমি বলিতেছি, যদি কোরেশগণ সূর্য্যকে আনয়ন করিয়া আমার দক্ষিণ হস্তে ও চন্দ্রকে বাম হস্তে স্থাপন করে এবং এই অলৌকিকতা প্রদর্শন করিয়া আমাকে বলে যে তুমি কার্য্য হইতে নিবৃত্ত থাক, তাহা হইলেও আমি অবশ্য প্রয়াস পাইব, হয় এসলাম ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত করিব, না হয়, প্রাণ দিব।" শুনিয়া আবুতালেব স্তব্ধ হইয়া গেলেন। বুঝিলেন মহম্মদ নিবৃত্ত হইবেন না।

জিজ্ঞাসা করি মহম্মদ যে বাধ্যতা জ্ঞানের বশবর্ত্তী হইয়া প্রচার কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন সে বাধ্যতা কোথা হইতে আসিল? সকল মহাজনের জীবনেই এই প্রকার বাধ্যতা দেখিতে পাওয়া যায়। মহাত্মা যীশু তাঁহার মৃত্যুর কিছুদিন পূর্ব্ব হইতে সর্ব্বদাই ভাবে ও সংকেতে বলিতেন যে, তরায় তাঁহাকে শত্রুহস্তে নিধন প্রাপ্ত হইতে হইবে। অথচ সেই পথেই অগ্রসর হইতে লাগিলেন যাহাতে শত্রু হস্তে নিধন প্রাপ্ত হওয়া অবশ্যম্ভাবী। এ বাধ্যতা কোথা হইতে আসিল? তিনি কি মনে করিলে মৃত্যুকে পরিহার করিতে পারিতেন না? প্রচলিত ধর্ম্মের প্রতিবাদ করিয়া গোঁড়া ধর্ম্মযাজকদিগের শত্রুতার অগ্নি প্রজ্বলিত না করিয়া কি থাকিতে পারিতেন না? তিনি কি

মনে করিলে স্বাজারেথ নগরের সূত্রধরের কারখানাতে সুখে সচ্ছন্দে দিন যাপন করিতে পারিতেন না? কে তাঁহাকে এ পথে আসিতে বাধ্য করিল? আর সে বাধ্যতা বা এত প্রবল কি প্রকারে হইল, যাহাতে মৃত্যুভয়ও ভয় বলিয়া গণ্য হইল না? সকল মহাজনের জীবনে এই একই প্রশ্ন। চৈতন্য যে সময়ে হরিনাম প্রচারের জন্য বহির্গত হইলেন, সে সময়ে সেই নবদ্বীপ নগরেই কত পণ্ডিত ছিলেন, যাঁহারা সচ্ছন্দচিত্তে নিজ গৃহে বসিয়া ছাত্রবৃন্দের পাঠনা কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। চৈতন্যও যৌবনের প্রারম্ভে ঐরূপ পাঠনা কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি মনে করিলেন কি জীবনের অবশিষ্ট কাল পায়ের উপরে পা দিয়া ছাত্র পড়াইয়া শেষ করিতে পারিতেন না? সে পথ থাকিতে কে তাঁহাকে নূতন পথ অবলম্বন করিতে বাধ্য করিল, যে পথে গিয়া তিনি লোকের উপহাস বিদ্রূপ ও নির্য্যাতনের পাত্র হইলেন? এ বাধ্যতা কোথা হইতে আসিল? মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের বিষয় স্মরণ কর। তিনি যে সময়ে বিষয় কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া কলিকাতা সহরে আসিয়া বাস করিলেন, তখন হঠাৎ ধনী হইবার দিন ছিল। তাঁহার অব্যবহিত পূর্ব্বে ও তৎকালে, রামদুলাল সরকার, বিশ্বনাথ-মতিলাল, মতিলাল শীল, ও রামকমল সেন প্রভৃতি অনেকে সামান্য সামান্য অবস্থা হইতে অল্প দিনের মধ্যে প্রচুর ধনশালী হইয়া উঠিতেছিলেন। রামমোহন রায় মনে করিলে কি সেই পথ অবলম্বন করিতে পারিতেন না? তাঁহার ন্যায় ধন মান সঞ্চয় করিবার সুবিধা কাহার ছিল? তিনি যদি বিষয় কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া না আসিতেন তাহা হইলে কি অচিরকালের মধ্যে ধনিদিগের মধ্যে সর্ব্বাগ্রগণ্য ব্যক্তি হইতে পারিতেন না? হিন্দুসমাজের দলপতি ও সর্ব্বোচ্চপদস্থ ব্যক্তি হইয়া কি জীবনের অবশিষ্ট কাল থাকিতে পারিতেন না? কে তাঁহাকে সে পথ পরিত্যাগ করিয়া ধর্ম্ম ও সমাজ সংস্কাররূপ দুরূহ কার্য্যে আত্ম-সমর্পণ করিবার জন্য বাধ্য করিল? তিনি কি তাঁহার কার্য্যের ফলাফল বিষয়ে অজ্ঞ ছিলেন? তিনি কি জানিতেন না যে এই পথে গমন করিলে তিনি স্বদেশ বাসিদিগের দ্বারা নিগৃহীত হইবেন? তাহা তিনি পরিষ্কাররূপে জানিতেন, পরিষ্কাররূপে নিজ গ্রন্থে লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন, যে তাঁহার বিবেক তাঁহাকে যে পথে অগ্রসর হইতে বাধ্য করিয়াছে সে পথে অগ্রসর হইয়া তিনি আত্মীয় স্বজন কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়াছেন এবং বিবিধ প্রকারে লোকের নির্য্যাতন সহ্য করিয়াছেন; কিন্তু তথাপি তিনি দুঃখিত নহেন।"

এ বাধ্যতা কোথা হইতে আসিল? প্রত্যেক নিঃস্বার্থ, পরপ্রেমিক ও বিশ্বাসী হৃদয়ে এই বাধ্যতা অনুভূত হইয়া থাকে। মলিন ও কলুষিত হৃদয়ে এই বাধ্যতা অনুভূত হয় না। চিত্ত যত কলুষিত হয়, ততই বিবেকের বাধ্য করিবার শক্তি হ্রাস হইয়া যায়। আর যতই চিত্ত নির্ম্মল ও স্বার্থশূন্য হয় ততই তাহা ধর্ম্ম নিয়মের অনুগত হয়। আমরা কি স্বীয় স্বীয় জীবনে এই বাধ্যতা অনুভব করি না? ব্রাহ্মগণ কোন্ বলে স্বীয় স্বীয় স্থানে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন? আজ যদি তাঁহারা তাঁহাদের হৃদয়স্থিত বিশ্বাসকে গোপন করেন, যদি আজ প্রাচীন সমাজের নিকট মস্তক অবনত করিয়া বলেন—"যে তাঁহারা এতদিন যাহা অবলম্বন করিয়াছিলেন তাহা ভ্রান্তি, তাহা হইলে তাঁহারা কল্যই লোকের প্রিয় ও আদরণীয় হইতে পারেন। কিন্তু তাহা না করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মকে আশ্রয় করাতে তাঁহারা প্রতিদিন কত প্রকার লোকের নির্য্যাতন সহ্য করিতেছেন। এ সমুদায় এক দিনে নিবারিত হইতে পারে, অথচ কে তাঁহাদিগকে এই নির্য্যাতন সহ্য করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মের আশ্রয়ে থাকিতে বাধ্য করিতেছে?

সত্য, ন্যায়, প্রীতি, পবিত্রতা প্রভৃতি সমুদয় মঙ্গল ভাবেই মানব-হৃদয়ের উপরে এক প্রকার বাধ্যতা আছে। হৃদয় স্বভাবতঃই এই সকলের অনুগত হয়, যদি স্বার্থপ্রবৃত্তি বা অপর কোনও কলুষিত ভাব আসিয়া তাহাকে কলুষিত না করে। এই জন্যই ব্রাহ্মকবি গাইয়াছেন;—

সহজেই ধায় নদী সিন্ধুপানে
কুসুম করে গন্ধদান;
মন সহজে সদা চাহে তোমারে,
তোমাতেই অনুরাগী, মোহ যদি না ফেলে আঁধারে।"

বাস্তবিক নদীর গতি যেমন স্বভাবতঃ নিম্নাভিমুখে যায়, কুসুমের গন্ধ যেমন স্বভাবতঃ চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত হয় তেমনি নির্ম্মল মন স্বভাবতঃ ঈশ্বরেচ্ছার অনুগত হইয়া থাকে। কিন্তু চিত্তের এই নির্ম্মলতা লাভ করাই দুষ্কর।

যেমন সাধারণ ভাবে সত্য, ন্যায়, প্রেম ও পবিত্রতার এক প্রকার বাধ্যতা আছে। প্রকৃতিবিশেষে, কার্য্যবিশেষের সেই প্রকার বাধ্যতা দৃষ্ট হয়। কোন্ কার্য্যে কোন্ ব্যক্তির হৃদয় মনের অনুরাগ জন্মিবে তাহা কেহ বলিতে পারে না। ঈশ্বর কোন্ দিকে কাহাকে প্রেরণ করেন তাহা কে বলিতে পারে? তাঁহার প্রেরণা যখন হৃদয়ে আসিয়া উপস্থিত হয় তখন মানুষকে পরাধীন করিয়া ফেলে। সেণ্টপল বারবার বলিয়াছেন, "আমি বন্দী, আমার স্বাধীনতা নাই, আমি প্রচার না করিয়া থাকিতে পারি না।" এই পরাধীন ভাব মানবের আধ্যাত্মিক প্রকৃতির এক নিগূঢ় তত্ত্ব। যদি কাহারও হস্ত পদ রজ্জু দ্বারা দৃঢ়রূপে বদ্ধ থাকে, তবে সে ব্যক্তি দৌড়িতে পারে না কেন বলিয়া অনুযোগ করা যেমন বৃথা, তেমনি ঈশ্বরানুপ্রাণিত ব্যক্তিগণের কার্য্য কলাপের প্রতিবাদ করাও বৃথা। তাঁহারাও অনুভব করিয়া থাকেন যে, তাঁহাদের স্বাধীনতা নাই। গুটিপোকার পক্ষে গুটি না বুনিয়া থাকা যেরূপ অসম্ভব, তাঁহাদের পক্ষে ঈশ্বরাদিষ্ট পথে না চলাও সেইরূপ অসম্ভব। ঈশ্বরানুপ্রাণিত ব্যক্তিদিগের এই লক্ষণ দেখিয়া জগৎ স্তব্ধ হইয়া গিয়াছে, ও ব্রহ্মশক্তির গুরুত্ব ও প্রভাব অনুভব করিয়াছে।

পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য ধর্ম্মভাব।

(ইণ্ডিয়ান মেসেঞ্জারের বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে উপাসনা কালে শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী কর্ত্তৃক প্রদত্ত উপদেশের সারাংশ)

অদ্য আমাদের প্রিয় পত্রিকা ইণ্ডিয়ান মেসেঞ্জারের বার্ষিক উৎসবের দিন। অদ্য প্রাতে আমেরিকা হইতে সমাগত এক-

খানি পত্রিকা হস্তে করিয়া একটী চিন্তা হৃদয়ে উদিত হইতেছিল। সে চিন্তাটী এই :—কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ঐ পত্রিকা খানি যখন প্রথম বাহির হয়, তখন এক খণ্ড কাগজ মুদ্রিত হইত এবং দেখিলেই বোধ হইত, কাগজখানি অধিক দিনস্থায়ীহইবে না। যাঁহারা কাগজ খানি বাহির করিয়াছিলেন, তাঁহারা ও ভয়ে ভয়ে বাহির করিয়াছিলেন। উদার ধর্ম্মভাব লোকে পছন্দ করিবে কিনা তাঁহাদের মনে এই আশঙ্কা ছিল। কিন্তু দেখিতে পাইলাম যতই বৎসরের পর বৎসর যাইতে লাগিল, ততই তাঁহাদের কাগজের উন্নতি হইতে লাগিল। এক দিকে কাগজের কলেবর বৃদ্ধি হইতে লাগিল; অপর দিকে তাহার অন্তর্ভূত বিষয় সকলেরও বিশেষ উৎকর্ষ লক্ষিত হইতে লাগিল। এবারে সে কাগজখানির আরও উন্নতি হইয়াছে। কাগজখানি হস্তে পড়িলেই আনন্দ হয়। কাগজখানি হাতে করিয়া ভাবিতে লাগিলাম, কার্য্য সম্বন্ধে পূর্ব্ব ও পশ্চিমে কত প্রভেদ। পাশ্চাত্য দেশ সকলের সদনুষ্ঠানের গতি যেন নদীর গতির ন্যায়। নদী সকল গিরিশৃঙ্গ হইতে যখন নিঃসৃত হয়, তখন তাহাদের আয়তন অতি সংকীর্ণ থাকে। প্রস্তর রাশির মধ্য দিয়া ঝির্ ঝির্ করিয়া একটী জলধারা নামিতেছে। একটী শৃগাল বা একটী কুকুর মনে করিলেই তাহাকে পান করিয়া যাইতে পারে। তখন সে নির্ঝরিণীকে দেখিলে বোধ হয় না যে কখনও তাহার এত বল বিক্রম হইবে, যে তাহা সুবিশাল পদ্মার ন্যায় ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া গ্রাম জনপদ প্রভৃতি উন্মূলিত করিয়া ধাবিত হইবে। কিন্তু নদী যতই সমতলে অবতীর্ণ হইতে থাকে, ততই শাখানদী সকলের সহিত সম্মিলিত হইয়া বিশাল আকার ধারণ করে; তখন মহা মহা তরণী সকল তাহার বেগকে অতিক্রম করিয়া পারে উত্তীর্ণ হইতে পারে না। পাশ্চাত্য শুভানুষ্ঠানের প্রকৃতি এইরূপ। আজ দুই চারিটী লোক লইয়া একটী শুভকার্য্যের সূত্রপাত হইতেছে। অপেক্ষা কর কিছু দিন না যাইতে যাইতে দেখিতে পাইবে, কত শত শত লোক তাহাতে যোগ দিয়াছেন, এবং তাঁহাদের কার্য্যক্ষেত্র কতদূর ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। জানি না আপনারা সকলে শুনিয়াছেন কি না ইংলণ্ডে ভদ্রমহিলাদিগের একটী সভা আছে। হাঁসপাতালের রোগীদিগকে ফুল উপহার দেওয়া ঐ সভার উদ্দেশ্য। সভার সভ্যগণ স্থানে স্থানে এক একটী ঘর ভাড়া করিয়া রাখিয়াছেন। সেই ঘরে সপ্তাহে দুই দিন বা তিন দিন প্রাতে মহিলা সভ্যগণ পালা করিয়া সমবেত হন। গরিব লোকদিগকে ফুল যোগাইবার জন্য দাদন দেওয়া থাকে। যে দিন সভাগৃহ খোলা হয়, সে দিন চতুর্দ্দিক হইতে ভার ভার ফুল আসিতে থাকে; এবং মহিলা সভ্যগণ সেই সকল তোড়া বটন করিয়া হাঁসপাতালে প্রেরণ করিতে থাকেন। কয়েক ঘণ্টা এই কার্য্যে যাপন করিয়া সকলে স্বীয় স্বীয় ভবনে প্রতিনিবৃত্ত হন। এই সভা বহু বৎসর জীবিত রহিয়াছে এবং বৎসর বৎসর তাহার উন্নতি হইতেছে। প্রথম প্রথম দুই একটী হাঁসপাতালে ফুল প্রেরণ করা হইত, এক্ষণে বহুসংখ্যক হাঁসপাতালে প্রেরণ করা হয়। সে দিন আর একটী অদ্ভুত সভার বিবরণ পাঠ করিয়াছি। সে দেশের পল্লীগ্রামস্থ একখানি সংবাদপত্রের সম্পাদক এই সভা স্থাপন করিয়াছেন। তিন বৎসর হইতে ৭।৮ বৎসর বয়সের বালক বালিকা ইহার সভ্য। অর্থাৎ যাহারা কোন প্রকারে আপনার নাম স্বাক্ষর করিতে পারে, তাহারা ইহার সভ্য। প্রত্যেক নূতন সভ্যের নিকটে একখানি ছাপা পোষ্টকার্ড প্রেরিত হয়, তাহাতে স্থূল স্থূল কয়েকটী প্রতিজ্ঞা থাকে তাহাতে স্বাক্ষর করিয়া ফেরত পাঠাইলেই সভ্য হওয়া যায়। সভ্যদিগকে অপরাপর কার্য্যের মধ্যে একটী কাজ এই করিতে হয় যে, খ্রীষ্টের জন্মোৎসবের পূর্ব্বে পুরাতন খেলানা সকল সংগ্রহ করিয়া ডাকযোগে সম্পাদকের নিকট প্রেরণ করিতে হয়। তিনি ঐ সকল পুরাতন খেলানাকে একটু রঙ্ চঙ্ দিয়া নূতন করিয়া গরীবদিগের কুটীরে কুটীরে শিশুদিগকে বিতরণ করেন। পুরাতন খেলানা সংগ্রহ করা শিশু সভ্যদিগের একটী মহা উৎসাহকর কার্য্য। অনেক শিশু সভ্য সম্বৎসর ধরিয়া পুরাতন খেলানা সংগ্রহ করিয়া রাখে। খ্রীষ্ট মাসের পূর্ব্বে পিতা মাতার দ্বারা বাক্সবন্দী করিয়া সম্পাদকের নিকট ডাকে প্রেরণ করে। সংবাদপত্রে পড়িলাম এই সভার দিন দিন এত উন্নতি হইতেছে যে বিগত বৎসর প্রায় ১৫। ১৬ হাজার খেলানা সংগ্রহ হইয়াছিল। সে দেশের সকল প্রকার শুভানুষ্ঠানের ভাব এই প্রকার।

আমাদের দেশে ঠিক ইহার বিপরীত অবস্থা। আমাদের দেশে অনেক শুভানুষ্ঠান মহোৎসাহে আরম্ভ হয়, কিন্তু নির্ব্বাণোন্মুখ দীপশিখার ন্যায় পরিণামে ম্লান ভাব ধারণ করে। লোকের উৎসাহ ও অনুরাগ বৃদ্ধি পাওয়া দূরে থাক্ মন্দীভূত হইয়া যায়। কাজটা মরা মরা হইয়া চলিতে থাকে। ইহার কারণ কি? প্রধান কারণ এই, আমাদের দায়িত্ব জ্ঞান অতি অনুজ্জ্বল। কর্ত্তব্য বোধে যাহাতে হস্তার্পণ করি, তাহা সুচারুরূপে নির্ব্বাহ করিতে যে আমরা বাধ্য, তাহা আমরা অনুভব করি না। যে কার্য্যের ভার গ্রহণ করা যায়, তাহা অতি অসম্পূর্ণ রূপেই সম্পাদন করিয়া থাকি। দ্বিতীয়তঃ এই সকল সদনুষ্ঠানকে আমরা ধর্ম্ম বলিয়া মনে করিতে পারি না। আমরা মনে করি, হাঁসপাতালে রোগীদিগকে ফুল প্রেরণ করা, গরিবের ছেলেদিগকে খেলানা বিতরণ করা ইহাতে আবার ধর্ম্ম কি আছে? হাঁ যদি একজন উদয়াস্ত ধ্যানে বসিয়া থাকিতে পারে বা কুম্ভক করিতে পারে, বা তিন ঘণ্টা ঈশ্বর ঈশ্বর করিয়া চেঁচাইতে পারে, তাহারই ধর্ম্ম হয়। ভিতরে এই প্রভেদটী লুকাইয়া রহিয়াছে। সে দেশের লোকে মনে করে, মানবের রোগ শয্যার ন্যায় কষ্টকর অবস্থা কি আছে। দিনের পর দিন রাত্রির পর রাত্রি এক ভাবেই যাইতেছে, সেই রোগযন্ত্রণা, সেই ঔষধ সেবন, সেই চিকিৎসকের মূর্ত্তি, সমুদায়ই হৃদয়কে বিষণ্ণ ও মলিন করিতে থাকে। এরূপ ব্যক্তির হস্তে একটী ফুলের তোড়া যদি যায়, তাহার মলিন মুখে কি একটু প্রসন্নতার উদয় হয় না? সেই পুষ্পগুচ্ছ তাহাকে প্রকৃতির সুস্থতা, সজীবতা ও প্রসন্নতা স্মরণ করাইয়া দেয়। তাহার যন্ত্রণাময় নরকবাসের মধ্যে স্বর্গের সুরভিময় নিঃশ্বাস আনিয়া দেয়। এই আনন্দটুকু উৎপাদন করা কি ধর্ম্ম নয়? সেইরূপ আমরা সকলেই জানি খেলানার প্রতি শিশুদিগের কিরূপ আগ্রহ। একটী সুন্দর খেলানা পাইলে তাহাদের প্রাণে কি আনন্দই হয়। এই আনন্দ কি কেবল ধনির

সন্তানের প্রাণেই হয়, দরিদ্রের সন্তানের প্রাণে কি হয় না? কিন্তু হায় কত দরিদ্রের কুটীরে কত সহস্র সহস্র শিশু রহিয়াছে যাহারা বৎসরের মধ্যে একটীও খেলানার মুখ দেখিতে পায় না। তাহারা শৈশব-সুলভ অজ্ঞতাবশতঃ স্বীয় পিতা মাতার অবস্থা না জানিয়া কত সময় কাঁদিয়া জননীর অঞ্চল ধরে—"মা খেলানা দেও"। এবং হয়ত খেলানার পরিবর্ত্তে জননীর হস্তের প্রহার পাইয়া ক্রন্দন করিতে থাকে, না হয়, মাতা ও সন্তান উভয়ের চক্ষে জলধারা বহিতে থাকে। এই সকল দারিদ্রের গৃহে বৎসরান্তে যে দিন কতকগুলি সুন্দর খেলানা উপস্থিত হয়, তখন কল্পনা করিয়া দেখ সেখানে কি আনন্দধ্বনিই উঠিয়া থাকে। মাতা ও সন্তানের প্রাণে কি অপূর্ব্ব সুখের সঞ্চার হয়। দরিদ্রদিগকে এতটুকু সুখ দিবার জন্য যাঁহারা শ্রম করা আবশ্যক বোধ করিয়াছেন তাঁহারা কি ধর্ম্মকার্য্য করিতেছেন না? আমরা সদনুষ্ঠান সকলকে ধর্ম্মকার্য্য বলিয়া মনে করিতে পারিতেছি না বলিয়াই তাহাতে মন প্রাণ দিয়া লাগিতে পারি না। এ বিষয়ে ব্রাহ্মেরাও প্রাচীন প্রাচ্যভাবকে অতিক্রম করিতে পারিতেছেন না। একজন পরোপকারার্থে কোনও কার্য্য করুন, ঈশ্বরের শুভ ইচ্ছা জানিয়া তাহাতে প্রাণ মন সমর্পণ করুন, বিশুদ্ধ ঈশ্বর-প্রীতি তাঁহার চালক হউক, সবই হউক, তথাপি ব্রাহ্মদিগের অনেকের মুখে শুনা যাইবে,—"উনি কাজ কাজ করেন, কাজে কি হইবে ধর্ম্ম চাই।" ধর্ম্ম যেন মানবজীবন হইতে একটা স্বতন্ত্র বস্তু। সে ব্যক্তি যে দিন কাজ কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া এক কোণে বসিয়া কুম্ভক করিতে আরম্ভ করিবেন সে দিন ঐ ব্রাহ্মগণ বলিবেন হাঁ এত দিনের পর ধর্ম্ম গজাইতেছে। এইরূপে পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য উভয় দেশের ধর্ম্মভাবগত মতের পার্থক্য থাকাতেই কার্য্যগত প্রভেদ দৃষ্ট হইতেছে। আমরা ব্রাহ্ম, আমাদের জীবনে পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য উভয় ভাব সম্মিলিত হইবে। আমরা প্রাচ্য ধ্যান ও পাশ্চাত্য কর্ম্ম উভয়ই জীবনে সাধন করিব। জ্ঞানে ও ধ্যানে ও তপস্যাতে যেমন আগ্রহ থাকিবে, ঈশ্বরের প্রিয়কার্য্য সাধনে ও তেমনি অনুরাগ হইবে। ঈশ্বর আমাদিগকে এই পূর্ণ ধর্ম্মভাব প্রদান করুন।

রাজা রামমোহন রায়ের স্মরণার্থ সভা।

গত ২৭ শে সেপ্টেম্বর সিটিকলেজ গৃহে এক আশ্চর্য্য দৃশ্য দেখিয়াছি। অনেক দিন হইতে এমন দৃশ্য নয়ন পথে পতিত হয় নাই। অদ্য রাজা রামমোহন রায়ের মৃত্যু দিন। ৬০ বৎসর পূর্ব্বে এই দিনে মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় সুদূর ব্রিষ্টল নগরে মানবলীলা সংবরণ করেন। আজ তাঁহার স্বদেশ বাসী হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান, ব্রাহ্ম সকলে তাঁহাকে স্মরণ করিবার জন্য সম্মিলিত।

অদ্য সিটিকলেজ গৃহে সভা হইবে বলিয়া সামান্য ভাবে বিজ্ঞাপন প্রচারিত হয়। অধিক লোক সমাগত হইবার জন্য জাকাল বিজ্ঞাপন কিম্বা কোনও প্রকারের আয়োজন করা হয় নাই। প্রতি বৎসর যেমন সামান্য ভাবে উদ্যোগ হইয়া থাকে, এবার ও সেইরূপ হইয়াছিল। সিটিকলেজের ত্রিতল গৃহে সভাধিবেশনের স্থান হয়। সভাপতির দক্ষিণভাগে মহিলাগণের বসিবার আসন এবং অন্যান্য দিকে পুরুষগণের স্থান নির্দ্দিষ্ট হয়। অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকার সময় সভারম্ভ হইবার কথা। দুইটার সময় হইতে লোক যাইতে আরম্ভ করে। চারিটার সময় হল লোকে পরিপূর্ণ হইয়া গেল। ৪॥ টার সময় এত লোক হইল যে, সভা স্থলে দাঁড়াইবার একটুক স্থানও রহিল না। কলেজের নিম্নে, প্রাঙ্গনে এবং উঠিবার সিঁড়িতে লোকে লোকারণ্য হইয়া গেল। লোকের উৎসাহ প্রফুল্লভাব এবং আগ্রহ দেখিয়া প্রাণ আনন্দে পরিপূর্ণ হইল। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী, শ্রীযুক্ত বাবু আনন্দমোহন বসু, বাবু কৃষ্ণকুমার মিত্র এবং বাবু হেরম্বচন্দ্র মৈত্র প্রভৃতি উদ্যোগ কর্ত্তাগণ নীচে আসিয়া দাঁড়াইয়া লোক স্রোত দেখিতে লাগিলেন এবং কি উপায়ে অদ্যকার কার্য্য সকলের সন্তোষজনকরূপে নির্ব্বাহ হইতে পারে, তৎসম্বন্ধে পরামর্শ করিতে লাগিলেন। ক্রমশঃ লোক স্রোত বৃদ্ধি হইতে দেখিয়া তাঁহারা স্থির করিলেন যে, কলেজ প্রাঙ্গনে আর একটি সভা করিয়া বক্তৃতাদি করিবেন।

এই পরামর্শ স্থির হইলে ছাত্র, শিক্ষক এবং অন্যান্য ভদ্রলোকগণ নিজ হস্তে কলেজ গৃহ হইতে বেঞ্চ আনিয়া প্রাঙ্গনে স্থাপন করিতে লাগিলেন। যাঁহারা বক্তৃতা শুনিতে আসিয়াছেন, তাঁহারাই স্বহস্তে বেঞ্চ আনিয়া অন্যকে বসিতে দিতেছেন, ইহা বড়ই সুখকর দৃশ্য। সকলের হৃদয়ে যেন উৎসাহ ও আনন্দের তাড়িত স্রোত বহিতেছে। অতি অল্প সময় মধ্যে নব সভার আয়োজন শেষ হইল। অনেকে বেঞ্চে বসিলেন, অনেকে চতুর্দ্দিকে দাঁড়াইয়া রহিলেন। উপরে এবং নীচে প্রায় দুই হাজার লোকের সমাগম হইয়াছিল। দুই স্থানে একই সময় দুই বৃহৎ সভার কার্য্য হইতে লাগিল। উপরে মাননীয় ডাঃ গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সুবিখ্যাত বক্তা শ্রীযুক্ত বাবু কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় অগ্নিময়ী ভাষায় বক্তৃতা আরম্ভ করিলেন। বক্তৃতার ভাষা, ভাব এবং উচ্ছ্বাসে শ্রোতাগণ মুগ্ধ হইয়াছিল। তাড়িত সঞ্চারের ন্যায় মুহূর্ত্তের জন্য সকলের হৃদয়ের অবসন্নতা দূরীভূত হইয়াছিল। মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের শিক্ষা সম্বন্ধীয় অপরিসীমজ্ঞান ও প্রতিভার বিষয় বক্তা জ্বলন্ত ভাষায় বর্ণনা করেন। কালিচরণ বাবু গুণগ্রাহী, সাধুগণের মর্য্যাদা রক্ষাকারী, অপক্ষপাতী এবং প্রতিভান্বিত বক্তা। একাধারে এসমস্ত গুণের সমাবেশ অতি অল্প লোকের মধ্যেই দেখা যায়। এজন্যই কালীচরণ বাবুর বক্তৃতা কামানের গোলার মত সকলের হৃদয়কে ভেদ করে।

কালীচরণ বাবুর বক্তৃতার পর শ্রীযুক্ত বাবু মনোরঞ্জন গুহ এবং তৎপর শ্রীযুক্ত বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বক্তৃতা প্রদান করেন। নগেন্দ্র বাবুর বক্তৃতায় সভাপতি এতদূর আকৃষ্ট হইয়াছিলেন যে, তিনি বিশেষ ভাবে বক্তার গুণানুবাদ না করিয়া থাকিতে পারেন নাই। ঐ সভাতে শ্রীযুক্ত বাবু সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং হিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর মধুময়কণ্ঠে রাজার স্বরচিত সংগীত করিয়াছিলেন।

নীচে কলেজ প্রাঙ্গনের সভায় শ্রীযুক্ত বাবু জানকীনা

ঘোষালের প্রস্তাবে শ্রীযুক্ত বাবু আনন্দমোহন বসু সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। শ্রীযুক্ত বাবু হেরম্বচন্দ্র মৈত্র, শ্রীযুক্ত বাবু কৃষ্ণকুমার মিত্র এবং শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী বক্তৃতা করেন। যদিচ বক্তৃতা করিবার জন্য ইঁহারা কেহই প্রস্তুত ছিলেন না; তথাপি ইঁহাদের সকলেরই বক্তৃতা অতি হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। প্রথমতঃ শ্রীযুক্ত হেরম্বচন্দ্র মৈত্র অতি ওজস্বিনী ইংরাজি ভাষায় রামমোহন রায়ের চরিত্রের মাহাত্ম্য বর্ণনা করেন। তৎপর কৃষ্ণবাবু বাঙ্গালাতে কিছু বলেন, অবশেষে শাস্ত্রী মহাশয় বক্তৃতা করেন। সভাপতি মিঃ বসু প্রথমতঃ সভা আরম্ভসূচক অতি হৃদয়গ্রাহী মন্তব্য প্রকাশ করেন, তৎপরে বক্তাগণের বক্তৃতা শেষ হইলে, তিনি অনন্ত ভাষায় সংক্ষেপে বক্তৃতা করেন। সভাস্থ সকলে অতি নিবিষ্ট-চিত্তে বক্তৃতা শ্রবণ করিয়াছিলেন। রাত্রি হইলে এই স্থলের বক্তৃতা বন্ধ হয়। এখানে আলোর কোনও বন্দোবস্ত ছিল না। উপরে আলোকময় গৃহে তখনও বক্তৃতা চলিতে থাকে।

এবার লোকের আগ্রহ এবং উৎসাহ দেখিয়া আমরা আশ্বস্ত হইয়াছি। মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় বর্ত্তমান শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ পুরুষ। তাঁহার জীবনে সকল গুণের সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যায়। তিনি সামঞ্জস্যভূত উন্নতি সাধনের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। তিনি ঈশ্বর-প্রেমিক ছিলেন। পরমেশ্বরের প্রতি তাঁহার গভীর অনুরাগ ছিল। তিনিই এদেশে ব্রহ্মোপাসনার বীজ বপন করেন। তিনি একদিকে যেমন ধার্ম্মিক, ধর্ম্মসংস্কারক ছিলেন, অপর দিকে অদ্বিতীয় রাজনৈতিক এবং সমাজ-সংস্কারক ছিলেন। তাঁহার প্রেম কেবল এ দেশে আবদ্ধ ছিল না। তিনি পৃথিবীর সমস্ত জাতিকে আপনার মত ভাল বাসিতেন। অপর দিকে ব্রহ্ম বিদ্যালাভের জন্য সংস্কৃত, হিব্রু, লাটিন পারসি, আরবি প্রভৃতি ভাষায় পাণ্ডিত্য লাভ করিয়াছিলেন। একাধারে বিদ্যা বুদ্ধি ধর্ম্ম জ্ঞান বিশ্বপ্রেম, রাজনীতি সমাজনীতি প্রভৃতি যাবতীয় গুণ সন্নিবেশিত হইয়াছিল। সকল বিষয়ে এরূপ অপূর্ব্ব সমন্বয় বর্ত্তমান সময়ে কয় জনের জীবনে ঘটিয়াছে? এসকল কারণেই তিনি ঊনবিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ পুরুষ। তিনি যে আদর্শ সাধন করিবার জন্য প্রাণপণে লাগিয়াছিলেন, পরমেশ্বর করুন, এদেশের লোক যেন সেই আদর্শ সাধন করিতে সমর্থ হয়। সত্য রক্ষা, স্বাধীনতা স্ত্রীজাতির প্রতি প্রেম, বিশ্বজনীন ধর্ম্ম-সাধন, জ্ঞানালোচনা, শিক্ষানুরাগ প্রভৃতি বিষয়গুলির পূর্ণতা সাধনই তাঁহার জীবনের ব্রত ছিল। এদেশের লোক যতই তাঁহার উচ্চ আদর্শের দিকে গমন করিবে, ততই দেশের মঙ্গল। এজন্যই রামমোহন রায়ের স্মরণার্থ সভায় আগ্রহ, উৎসাহ এবং সকলকে ঐকান্তিক যত্নের সহিত যোগদান করিতে দেখিলে প্রাণ আনন্দে পরিপূর্ণ হয়। এবং আশা হয় যে, দেশবাসিগণ এক দিন না এক দিন রামমোহন রায়ের আদর্শ অনুসারে জীবন গঠন করিয়া ভারতমাতার দুঃখ দূর করিতে সমর্থ হইবে।

প্রেরিত পত্র।

(পত্র প্রেরকদিগের মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন, কিম্বা কাহারও পত্র ফেরত দিতে বাধ্য নহেন)

বাণীবনে ব্রাহ্মপল্লি স্থাপন।

বহুসংখ্যক ব্রাহ্মগণের বাসগৃহ নির্ম্মাণ করিয়া একস্থানে বাস ও ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার এবং বিবিধ উপায়ে হিতকর কার্য্য ও জনসাধারণের সেবা করা এই ব্রাহ্মপল্লি স্থাপনের উদ্দেশ্য।

নানা কারণে ব্রাহ্মসমাজের অধিকাংশ লোকেরই আর্থিক অবস্থা অতিশয় ভাল নয়। পৈতৃক বাড়ী পরিত্যাগ করিয়া অনেকেই নগরে বাস করিতে বাধ্য হইয়াছেন। বলা বাহুল্য নগরে বাস করা বহু ব্যয়সাপেক্ষ। অধিকাংশ ব্রাহ্মগণই প্রচুর অর্থাভাবে গৃহ নির্ম্মাণ করিতে সমর্থ হইতেছেন না। ভাড়াটিয়া বাড়ীতে, অতি সঙ্কীর্ণ স্থানে, পরিবারস্থ অনেক লোক একত্রে অতি ক্লেশে কালযাপন করিতেছেন। তাহাতে অনেকের স্বাস্থ্যও নষ্ট হইয়া যাইতেছে। পুরুষানুক্রমে এরূপে ভাড়াটিয়া বাড়ীতে বাস করা কি বিষম কষ্টজনক তাহা ভুক্তভোগী ব্যক্তিমাত্রেই অবগত আছেন। উপার্জ্জনশীল ব্যক্তির অভাব হইলে পরিবারস্থ সকলে অকূল সাগরে ভাসিতে থাকেন। তখন অনন্যোপায় হইয়া লজ্জা পরিত্যাগপূর্ব্বক ভিক্ষার্থে ব্রাহ্মসমাজের দ্বারে উপস্থিত হওয়া ভিন্ন তাহাদের আর গত্যন্তর নাই। এই শ্রেণীর নিরুপায় ব্রাহ্মদিগকে অর্থ সাহায্য করিবার জন্য খৃষ্টান সমাজের ন্যায় ব্রাহ্মসমাজে অনাথনিবাস কিম্বা আমস্‌হাউস (Alms house) ইত্যাদি কিছুই নাই। বাস্তবিক এই শ্রেণীর ব্রাহ্মগণের পুরুষানুক্রমে জীবনযাত্রা-নির্ব্বাহ করা বড়ই কষ্টজনক এবং বিড়ম্বনাময়। এই দুরবস্থা দূর করণের একমাত্র উপায় এই যে, মফঃস্বলে কোনও উর্ব্বরস্থানে ভূমি ক্রয় করিয়া প্রত্যেকের বাড়ী নির্ম্মাণ করা। তাহাতে একদিকে গৃহহীন ব্রাহ্মগণ যেমন গৃহ পাইবেন তদ্রূপ স্বীয় ভূমি-জাত শস্যাদি দ্বারা এবং সুলভ মূল্যে ক্রীত অন্যান্য আহার্য্য বস্তু দ্বারা অতি সহজেই জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারিবেন।

কলিকাতাই ব্রাহ্মসমাজের কেন্দ্রস্থল সুতরাং কলিকাতার নিকটবর্ত্তী কোন স্থানে এইরূপ ব্রাহ্মপল্লি সংস্থাপিত হইলে সাধন ভজনের ও জ্ঞানালোচনায় কলিকাতার সহিত নিরন্তর তাহাদের যোগ থাকিবে। গঙ্গাতীরস্থ অধিকাংশ স্থানই ম্যালেরিয়া গ্রস্ত। জমীর মূল্যও অধিক আহার্য্য দ্রব্যাদিও দুর্মূল্য। এই জন্য ও অন্যান্য নানা কারণে আমরা ব্রাহ্মপল্লি স্থাপনের জন্য এই বাণীবন গ্রামকে মনোনীত করিয়াছি।

এস্থান উলুবেড়ে মহকুমার উত্তর পশ্চিম কোণে তিন মাইল দূরে অবস্থিত। উলুবেড়ে হইতে আমতা অভিমুখে যে খাল গিয়াছে তাহার ধারেই এই গ্রাম। বারমাস খাল দিয়া উলুবেড়ে হইতে নৌকাতে যাতায়াত করা যায়। কলিকাতা হইতে উলুবেড়ে জাহাজে দুই ঘণ্টার পথ। উলুবেড়ে হইতে বাণীবন নৌকা কিম্বা পদব্রজে এক ঘণ্টার রাস্তা। শীঘ্রই এই স্থান দিয়া মেদিনীপুর অভিমুখে রেল যাইবে, তাহা হইলে কলিকাতা গমনাগমনের আরও সুবিধা হইবে। এখন জাহাজ ও নৌকায় যাতায়াতে ।৶ মাত্র ব্যয় হয়।

এখানে জমীদারের অধীনে জোত-স্বত্ব প্রতি বিঘা ১০, ১৫, ২০৲ টাকায় বিক্রয় হয়। খরচ পত্র বাদে ন্যূনপক্ষে প্রতি বিঘা জমিতে ৬৲ টাকা আয় হয়। এখানে ম্যালেরিয়া নাই, সকলের স্বাস্থ্যই ভাল থাকে।

ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার,—এখানে যাঁহারা বাস করিবেন, তাঁহারা যেমন সাংসারিক বিবিধপ্রকার সুবিধা প্রাপ্ত হইবেন, তেমন তাঁহাদিগকে ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যে বিশেষ উৎসাহশীল হইতে হইবে। এখানে যাঁহারা বাড়ী ঘর করিবেন, তাঁহারা দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হইবেন। পরিচারক এবং সহায়। যাঁহারা অনন্যকর্ম্মা হইয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার এবং জনসমাজের সেবা করিবেন তাঁহারা পরিচারক বলিয়া গণ্য হইবেন। যাঁহারা বিষয়কর্ম্ম করিয়া অর্থ ও সামর্থ্য দ্বারা এই উদ্দেশ্য সাধনের সহায়তা করিবেন, তাঁহারা সহায় রূপে গণ্য হইবেন। সহায়-দিগের প্রদত্ত সাহায্য, পুস্তক বিক্রয়ের আয় এবং স্বতঃপ্রবৃত্ত দান দ্বারা পরিচারকগণের ভরণপোষণ চলিবে। তাঁহারা কোনও প্রকার বিষয় কর্ম্মে লিপ্ত হইবেন না।

বর্ত্তমান সময়ে এতদঞ্চলের স্থানে স্থানে ব্রাহ্মধর্ম্মের জ্যোতিঃ বিকীর্ণ হইতেছে। আমরাগড়িগ্রামে নববিধান সমাজের ব্রাহ্মগণ এক প্রচারক্ষেত্র স্থাপন করিয়াছেন, খালোড় গ্রামে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্যগণ এক ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করিয়াছেন। সকল গ্রামেই ব্রাহ্মধর্ম্মের কথা শুনিতে লোকে আগ্রহ প্রকাশ করিয়া থাকে। এ অবস্থায় নিয়ত গ্রামে গ্রামে ভ্রমণ করিয়া সঙ্গীত, সঙ্কীর্ত্তন, কথকতা, আলোচনা এবং বক্তৃতা ও ব্যাখ্যাদি দ্বারা প্রচার করিলে বিশেষ ফলোদয় হইবার সম্ভাবনা।

এ অঞ্চলের অনেক গ্রামেই বড় বড় স্কুল আছে। বাণীবন ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থানে স্কুল নাই। এ গ্রামের অধিকাংশ লোকই গরিব, নিরক্ষর এবং নৈতিকাংশে অতি হীনাবস্থাপন্ন। অতএব এখানে সর্ব্বপ্রথম একটী স্কুল স্থাপন করিয়া শিক্ষা বিস্তারের উপায় বিধান না করিলে এই গ্রামে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারিত হইবে না। অতএব সম্প্রতি বাণীবনের উন্নতির জন্য নিম্নলিখিত উপায় অবলম্বিত হইবে; স্কুল স্থাপন, রোগীর চিকিৎসা, নীতিবিদ্যালয় এবং সঙ্গতমণ্ডলী স্থাপন।

উদ্দেশ্য সাধন করিবার জন্য আমরা নিয়ত চেষ্টা করিতেছি; জানি না, আমাদের ক্ষুদ্র চেষ্টায় কি ফল প্রসূত হইবে। অল্পদিন হইল অত্রস্থানে একটী মাইনর স্কুল স্থাপন করা হইয়াছে। একজন ব্রাহ্মযুবক স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া হেড্‌মাষ্টারের কার্য্য করিতেছেন। এখানে বাড়ী করিবার জন্য আপাততঃ কিছু জমি খরিদ করা হইয়াছে,সেখানে সম্ভবতঃ তিনটী ব্রাহ্মপরিবার বাড়ী নির্ম্মাণ ও কৃষিকার্য্যাদি করিবেন। উপযুক্ত লোকের অভাবে এ পর্য্যন্ত প্রচার কার্য্য আরম্ভ হয় নাই। আমরা ব্রাহ্মবন্ধুদিগের সমীপে সানুনয় নিবেদন করিতেছি যে, তাঁহারা আমাদের এই উদ্দেশ্য সাধনে সহায়তা করিয়া চরিতার্থ করুন। যাঁহারা এই উদ্দেশ্যের সহিত যুক্ত হইয়া পরিচারক কিম্বা সহায়রূপে এখানে বাড়ী করিতে ইচ্ছুক হইবেন, তাঁহারা আমার নিকট পত্রাদি লিখিলে বিস্তৃত বিবরণ জানিতে পারিবেন। এই ব্রাহ্মপল্লি কলিকাতা সাধনাশ্রমের অঙ্গীভূতরূপে তাঁহাদের সহিত যোগ রক্ষা করিয়া প্রস্তাবিত লক্ষ্যের সাধন করিবেন।

বাণীবন
ব্রাহ্মপল্লি
২০শে সেপ্টেম্বর, ১৮৯৩।

নিবেদক
শ্রীএককড়ি সিংহ রায়
কলিকাতা সাধনাশ্রমের অনৈক সহায়

মান্যবর

শ্রীযুক্ত তত্ত্ব-কৌমুদী সম্পাদক মহাশয়
সমীপেষু।

মহাশয়,

গত ১লা আশ্বিনের তত্ত্ব-কৌমুদীতে শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্র মোহন বিশ্বাস মহাশয় আমার পত্রের একাংশ সম্বন্ধে যে যে কথা বলিয়াছিলেন তৎসম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক হওয়াতে লিখিতেছি; অনুগ্রহ পূর্ব্বক তত্ত্ব-কৌমুদীতে প্রকাশ করিয়া বাধিত করিবেন।

ব্রাহ্মগণ "হরি" শব্দে নিরাকার ব্রহ্মকেই বুঝিয়া থাকেন। ইহা সকলেই জানে, কিন্তু ১লা ভাদ্রের তত্ত্ব-কৌমুদীতে পত্র প্রেরকের অভিপ্রায় এইরূপ যে "ব্রাহ্মগণের এইরূপ বুঝা উচিত নহে।" তাহা যদি না হয় তবে তিনি ব্রাহ্মসমাজ হইতে "হরি" শব্দ দূর করিতে ইচ্ছুক কেন?

কথার দিকে দৃষ্টি না করিয়া, কথার ভাবের দিকেই দৃষ্টি করা কর্ত্তব্য।

আমি লিখিয়াছিলাম "সাকারবাদিগণ মূর্ত্তি গঠন করিলেই বা অবতার বলিলেই যদি নিরাকার হরির পূজা বর্জ্জন করা যায়, তাহা হইলে নিরাকার পূজার জন্য কোন নাম থাকিতে পারে না।" একথার অর্থ এবং ভাব ইহা কখন নহে যে, কেবল "হরি নাম ছাড়িলে নিরাকার পূজার জন্য কোন নামই থাকিতে পারে না" এইরূপে কথার অন্যরূপ ভাব গঠন করিয়া পত্র প্রেরক বলিয়াছেন যে "যিনি একথা বলিতে পারেন তাঁহার "ব্রাহ্মধর্ম্ম" যে কিরূপ বুঝি না।"

এই উক্তিতে প্রকাশ পায় যে, পত্র প্রেরকের "ব্রাহ্মধর্ম্মের ভাব অতি উজ্জ্বল!"

আমার অন্যান্য কথার কোন যুক্তিসঙ্গত উত্তর না দিয়া কেবল আলগা কথা বলা হইয়াছে।

এক স্থলে পত্র প্রেরক বলিয়াছেন "এসকল নাম ছাড়িলেও অনেক নাম আছে।" কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, একটী নামেরও উল্লেখ নাই।

"পৌত্তলিকগণের অতি আদরের সামগ্রী তাঁহাদের অনেকের নিত্যপাঠ্য "বিষ্ণু সহস্র নাম" প্রভৃতি পুস্তক একবার পাঠ করিলেই বুঝিতে পারা যায় যে "তাঁহারা পৌত্তলিক ভাবে এবং সাকার ও সীমাবদ্ধ ভাবে কোন নাম ব্যবহার করিতে ছাড়েন নাই।"

ঔঁ অদ্বৈত, সত্যরূপ, জ্ঞানরূপ, শিব, অনন্ত, ব্রহ্ম, ওঁ, বিশ্বনাথ, জগন্নাথ, বিশ্বম্ভর, হরি, পরব্রহ্ম, ঈশ্বর, জগদীশ, পরমেশ্বর, মহেশ্বর, জগৎপিতা প্রভৃতি পুংলিঙ্গ শব্দ এবং

আদ্যাশক্তি, জগন্মাতা, জগদ্ধাত্রী প্রভৃতি স্ত্রীলিঙ্গ শব্দও তাঁহারা ছাড়েন নাই। পত্র প্রেরক অনুগ্রহ পূর্ব্বক "তাঁহার কথিত অনেক নাম প্রকাশ করিবেন।" আমরা জানিতে চাহি কোন্ নাম সীমাবদ্ধ মূর্ত্তির প্রতি পৌত্তলিকগণ ব্যবহার করেন নাই।

পত্র প্রেরক যে কথা বলিবেন তাহা ভাল যুক্তি দিয়া বুঝাইয়া দিবেন। "ব্রাহ্মধর্ম্ম বিশ্বজনীন ধর্ম্ম, ইহাতে নানা জাতি ও নানা-সম্প্রদায়ের লোক আসিবে, তাহা ত বুঝিলাম, কিন্তু তাঁহারা নিরাকার হরি যদি না বলিতে পান, তবে কি কি নাম করিবেন? পত্র প্রেরকের মতে ত "অনেক আছে।" পত্র প্রেরক যাহা সুযুক্তি পূর্ণ বুঝিয়াছেন, তাহা সকলের পক্ষে সুযুক্তি পূর্ণ হওয়ার পক্ষে বিশেষ প্রমাণের আবশ্যক এবং সেই সকল সুযুক্তিপূর্ণ উজ্জ্বলপ্রমাণ জানিতে আমরা উৎসুক রহিলাম।

বিশ্বনাথ, জগদ্ধাত্রী প্রভৃতি শব্দ বলিলেই পৌত্তলিক গণ হাসিতে পারেন এবং বলিতে পারেন যে "কাশির মন্দিরের বিশ্বনাথ এবং যে মূর্ত্তির তাঁহারা বৎসর বৎসর পূজা করেন সেই জগদ্ধাত্রী মূর্ত্তি ইত্যাদি" কিন্তু এরূপ স্থলে ব্রাহ্মগণের কি বলা উচিত নহে যে "বিশ্বনাথ সমস্ত বিশ্ব ব্যাপিয়া আছেন, আমরা তোমাদের মন্দিরের প্রস্তরের মূর্ত্তির উদ্দেশে এ শব্দ ব্যবহার করিতেছিনা। বিশ্বনাথ, হরি, জগদ্ধাত্রী বলিলে তোমরা যে সীমাবদ্ধ ভাব বুঝিয়া থাক, আমাদের হৃদয়ে সেরূপ ভাব নাই ইত্যাদি।

নশিপুর, মুর্শিদাবাদ, ১০ই আশ্বিন ১৩০০ } অনুগত
শ্রীজগন্নাথ প্রসাদ গুপ্ত।

ব্রাহ্মসমাজ।

দুর্ভিক্ষ—পূর্ব্ববঙ্গে যথার্থ ই দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইয়াছে। সাহায্য দানের জন্য কার্য্যনির্ব্বাহক সভা উদ্যোগী হইয়া সম্প্রতি ১০৫৲ একশত পাঁচ টাকা পাঠাইয়াছেন। দিন দিনই দুর্ভিক্ষের প্রকোপ বৃদ্ধি হইতেছে। অচিরে চতুর্দ্দিক হইতে প্রভূতপরিমাণে সাহায্য প্রাপ্ত না হইলে অন্নাভাবে অনেক নরনারীর মৃত্যুমুখে পতিত হওয়ার সম্ভাবনা। আমরা সাধুনর অনুরোধ করিতেছি, যে দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িতদিগকে সাহায্য দান করিতে সকলে মুক্তহস্ত হউন। সহৃদয় ব্যক্তিগণ প্রতিবারে যেরূপে দুর্ভিক্ষের সাহায্য করিয়া আসিতেছেন, এবারও সেইরূপ সাহায্য করিবেন, আমাদের এরূপ আশা আছে। পরমেশ্বরের সেবকগণ কি ক্ষুধার্ত্তকে অন্নদান না করিয়া, নিশ্চিত মনে কালযাপন করিতে পারেন? সাঃ ব্রাঃ সমাজের সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু গুরুচরণ মহলানবিশ মহাশয়ের নামে ২১১ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট কলিকাতা এই ঠিকানায় সাহায্য প্রেরণ করিবেন।

"মেসেঞ্জার" পত্রিকার জন্মোৎসব—গত ২৭শে সেপ্টেম্বর সন্ধ্যা ৭॥ ঘটিকার সময় মেসেঞ্জার পত্রিকার ১০ম জন্মদিন উপলক্ষে বিশেষ উপাসনা হইয়াছিল। মেসেঞ্জারের স্থানীয় গ্রাহকগণ এবং সাহায্যকারী অন্যান্য অনেকে নিমন্ত্রিত হইয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী বেদী গ্রহণ করেন। তাঁহার প্রদত্ত উপদেশ অতি সারগর্ভ, হৃদয়গ্রাহী এবং সাময়িক ভাবাত্মক হইয়াছিল। তিনি সহজ ভাষায় সংক্ষেপে অতি সার কথা বলিয়াছিলেন। উপদেশটি প্রবন্ধাকারে অন্যত্র মুদ্রিত হইল। উপাসনার পর মেসেঞ্জারের সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু হেরম্বচন্দ্র মৈত্র পত্রিকার আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধে সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করেন। তৎপরে ম্যানেজার বার্ষিক হিসাব পাঠ করেন। তাহাতে দেখা যায় যে, মেসেঞ্জারের গ্রাহকগণের শতকরা ৩০ জন মূল্য বাকী রাখেন। কিন্তু সকলের নিকট হইতে নিয়মিত সময়ে সম্পূর্ণ মূল্য আদায় হইলেও গ্রাহক সংখ্যা বৃদ্ধি না হইলে ব্যয় সংকুলন হইবে না। বর্ত্তমান সময়ে অনেক ব্যয় হ্রাস করিয়া কোনরূপে ব্যয় সংকুলন হইতেছে। অতএব আমারা ব্রাহ্মগণের নিকট নিবেদন করিতেছি যে, যাঁহাদের নিকট মেসেঞ্জারের মূল্য বাকী আছে, তাঁহারা আপনাপন দেয় টাকা অতি শীঘ্র প্রেরণ করেন এবং মেসেঞ্জারের গ্রাহক বৃদ্ধির জন্য সচেষ্ট হউন। একটুকু চেষ্টা করিলেই সকলে অতি শীঘ্র গ্রাহকসংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া দিতে পারেন।

মৃত্যু সংবাদ—আমরা গভীর দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতেছি, বোম্বে প্রার্থনাসমাজের সভ্য নারায়ণ মহাদেব পরমানন্দ মহাশয় গত ১৩ই সেপ্টেম্বর মানবলীলা সংবরণ করিয়াছেন। কর্ত্তব্য পরায়ণতা, শ্রমশীলতা এবং স্বদেশ বৎসলতার সহিত ধার্ম্মিকতা মিশ্রিত হইয়া তাঁহার পবিত্র চরিত্রকে আরও সুশোভিত করিয়াছিল। তাঁহার বিয়োগে বোম্বে প্রার্থনা সমাজ একটি উজ্জ্বল রত্ন হারাইলেন। তাঁহার সংক্ষিপ্ত জীবন চরিত সময়ান্তরে প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল। পরমেশ্বর তাঁহার স্বর্গগত আত্মাকে শান্তি প্রদান করুন।

রামমোহন রায়ের স্মরণার্থ সভা—২৭শে তারিখের স্মরণার্থ সভার কার্য্যবিবরণ প্রবন্ধাকারে সম্পাদকীয় স্তম্ভে প্রকাশিত হইল। এবার রামমোহন রায়ের গুণাবলীতে যুবকগণ এরূপ আকৃষ্ট হইয়াছেন যে, ২৮শে তারিখে সিটি কলেজের বি, এ ক্লাশের ছাত্রগণ পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর মুখে রাজার চরিত্রকাহিনী শুনিবার জন্য ইচ্ছা করেন। কলেজের প্রিন্সিপালের অনুরোধে শাস্ত্রী মহাশয় ঐদিন ছাত্রদিগের নিকট রামমোহন রায়ের সম্বন্ধে ইংরাজিতে বক্তৃতা করেন। সময় সময় ছাত্রদিগকে এরূপে সদুপদেশ পূর্ণ উপদেশ দিবার জন্য ছাত্রগণ শাস্ত্রী মহাশয়কে অনুরোধ করিয়াছেন।

বিবাহ—ভোবানীপুরস্থ শ্রীযুক্ত বাবু অভয়াচরণ বসুর পুত্র শ্রীমান্ জ্ঞানেন্দ্রনাথ বসুর সহিত লাহোরের শ্রীযুক্ত বাবু রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রথমা কন্যা শ্রীমতী সত্যপ্রিয়া বন্দ্যোপাধ্যায়ের শুভবিবাহ গত ১৯শে সেপ্টেম্বর সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় আচার্য্যের কার্য্য করেন। বিবাহ উপলক্ষে রামবাবু নিম্নলিখিত রূপ দান করিয়াছেন। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রচার বিভাগ ৫৲ সাধনাশ্রম ২৲ বালিকা বোর্ডিং ২৲ দাসাশ্রম ২৲ দাতব্য বিভাগ ৩৲ মোট ১৪৲ টাকা।

গত ২৯শে সেপ্টেম্বর তারিখে সাধনাশ্রমে আর একটি বিবাহ হইয়াছে। পাত্র ময়মনসিংহ নিবাসী বাবু হরানন্দ গুপ্ত, পাত্রী কলিকাতা নিবাসী পরলোক গত গোবিন্দচন্দ্র রক্ষিতের প্রথমা কন্যা শ্রীমতী লক্ষ্মীমণি রক্ষিত। এ বিবাহে শ্রীযুক্ত বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত আচার্য্যের কার্য্য করেন। উক্ত বিবাহটি তিন আইন অনুসারে রেজেষ্টরী হইয়াছে। আমরা নবদম্পতিদিগকে আশীর্ব্বাদ করিতেছি এবং প্রার্থনা করিতেছি ঈশ্বর তাঁহাদিগকে ধর্ম্মপথে রক্ষা করুন।

ব্রাহ্ম-ছাত্রীনিবাসের বার্ষিক উৎসব—গত ৩০শে সেপ্টেম্বর শনিবার এবং ১লা অক্টোবর রবিবার দুই দিন ছাত্রী নিবাসের বার্ষিক উৎসব হইয়াছে। প্রথম দিন ছাত্রীনিবাসের প্রায় ৩৫টি ছাত্রীকে আলিপুর পশুবাটিকা দেখাইবার জন্ম লইয়া যাওয়া হয়। লেডি সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট শ্রীমতী লাবণ্যপ্রভা বসু এবং ছাত্রীনিবাসের সম্পাদক পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী ও সঙ্গীত অধ্যাপক বাবু উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী প্রভৃতি ইহাঁদের সহিত গমন করেন।

তৎপর দিন রবিবার অপরাহ্ন ৫ ঘটিকার সময় বিশেষ উপাসনা হয়, পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী উপাসনা করেন এবং উপদেশ দেন।

শাস্ত্রী মহাশয় প্রতিদিন অতি প্রত্যুষে ছাত্রীনিবাসের সকলকে লইয়া উপাসনা করেন। প্রথমতঃ কোন গ্রন্থ হইতে কিছু পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন, তৎপর প্রার্থনা করেন। মেয়েরা গান করেন। ইহাতে ছাত্রীগণের প্রভূত উপকার হইতেছে।

রামমোহন রায় ক্লব—গত ৩০শে সেপ্টেম্বর শনিবার পূর্ব্বাহ্ন ৮॥ ঘটিকার সময় বেনেটোলা লেনস্থ সিটিকলেজের দ্বিতীয় তলে শ্রীযুক্ত বাবু উমেশচন্দ্র দত্তের উদ্যোগে "রামমোহন রায় ক্লব" নামে একটি সভা স্থাপিত হইয়াছে। সভার উদ্দেশ্য ও কার্য্যবিবরণ সময়ে প্রকাশিত হইবে। পরমেশ্বর এই সভাকে স্থায়ী করুন।

সম্পাদকের নিবেদন—গত ২৭শে সেপ্টেম্বর মফঃস্বলে যে যে স্থানে মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের স্মরণার্থ সভা হইয়াছে, সেই সেই স্থানবাসিগণ অনুগ্রহপূর্ব্বক সভার কার্য্য বিবরণ প্রেরণ করিয়া বাধিত করিবেন। কার্য্য বিবরণ সংক্ষিপ্ত হওয়া প্রার্থনীয়।

বিজ্ঞাপন।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অধ্যক্ষ সভার সভ্য নির্ব্বাচন সম্বন্ধীয় প্রবাস্থ নিয়মের দ্বিতীয় নিয়মানুসারে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্যদিগকে জানান যাইতেছে যে, যাঁহারা আগামী বৎসরের (১৮৯৪ সনের) জন্য অধ্যক্ষ সভার সভ্য মনোনীত হইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা আগামী ২০এ নবেম্বর তারিখের মধ্যে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যালয়ে আপনাদের নাম ধামাদি প্রেরণ করিবেন। এই তারিখের পরে আর কাহারও নাম গৃহীত হইবে না। প্রার্থিগণের আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্ম হওয়া আবশ্যক।

২১১নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট,
২৯এ সেপ্টেম্বর ১৮৯৩
সাঃ ব্রাঃ সমাজ কার্য্যালয়।

শ্রীগুরুচরণ মহলানবিশ
সম্পাদক সাঃ ব্রাঃ সমাজ।

আগামী ১২ই অক্টোবর অপরাহ্ন ৬ ঘটিকার সময় ১৩ নং মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীটস্থ সিটিকলেজ ভবনে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অধ্যক্ষ সভার তৃতীয় ত্রৈমাসিক অধিবেশন হইবে।

বিবেচ্য বিষয়।

১। কার্য্যনির্ব্বাহক সভার তৃতীয় ত্রৈমাসিক কার্য্যবিবরণ ও আয় ব্যয়ের হিসাব।

২। বাবু বাণীকান্ত রায় চৌধুরী প্রস্তাব করিবেন—ব্রাহ্ম-ছাত্রীনিবাস সব কমিটীর সম্পাদক বাবু গুরুচরণ মহলানবিশ মহাশয়কে উক্ত সব কমিটীর সম্পাদক-পদ হইতে অবসৃত করিবার কারণ অনুসন্ধান করিবার নিমিত্ত একটি কমিশন নিযুক্ত হউক।

৩। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের পুস্তক, বক্তৃতা ও উপদেশাদি মধ্যে হরিনাম ব্যবহার সম্বন্ধে ময়মনসিংহের বাবু বরদাকান্ত বসু মহাশয়ের একখানি পত্র সম্বন্ধে বিচার।

৪। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রচারক পুনর্নিয়োগের নিয়ম সম্বন্ধে বিচার।

৫। বিবিধ।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ অফিস
২১১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট,
কলিকাতা ১৭ই সেপ্টেম্বর ১৮৯৩

শ্রীগুরুচরণ মহলানবিশ
সম্পাদক সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ

২১১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, ব্রাহ্ম মিশন যন্ত্রে শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দত্ত কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও ১৮ই আশ্বিন প্রকাশিত।

ধর্ম্ম ও সমাজতত্ত্ব বিষয়ক পাক্ষিক পত্রিকা।

১৩শ সংখ্যা।
১৬শ ভাগ।

১লা কার্ত্তিক, মঙ্গলবার, ১৮১৫ শক, ব্রাহ্ম সম্বৎ ৬৪

বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২॥•
মফস্বলে ৩
প্রতি খণ্ডের মূল্য ⁄১০

সেবা-স্তুতি।

সুখ সুখ করি; সুখ চিরদিন রয় না;
সম্পদের হাসি ক্ষণকাল;
সে হাসি-সম্ভোগ-সুখ সব ভাগ্যে হয় না;
সকলি ত গ্রাস করে কাল।

মিষ্টতার লোভে মন নানা পথে ফিরে
পান করে তিক্ততা গরল;
সম্পদ চাহিতে ডুবে বিপদের নীরে;
শান্তি-আশে জ্বালিছে অনল।

এ সুখ-আলেয়া পথ ভুলায় আঁধারে,
আলো ঢালি নিরাশ-নয়নে;
যত যাই পথ নাই; কর্দ্দম পাথারে
ডুবে পদ, আঁধার নয়নে।

এই ত বিধির বিধি, সুখ যেবা চায়
নহে সুখ তাহার কারণে;
ভুলায় তাহারে সুখ মরীচিকা-প্রায়,
দুখানলে পোড়ায় জীবনে।

যাক্ সুখ, যাক্ শান্তি, যাক্ গো মিষ্টতা;
থাক তুমি সেবা! মোর প্রাণে;
ছাড়ে যদি ধন, মান, প্রণয়, মিত্রতা,
তুমি মোরে রেখ শান্তি-দানে।

ব্রহ্ম কন্যা তুমি সেবা, তুমি ব্রহ্ম-বাণী,
ধীর স্থির তুমি ভব-নীরে;
নর-কার্য্য-সিংহাসনে একমাত্র রাণী;
তব বোঝা সদা নরশিরে।

সম্পাদকীয় মন্তব্য।

সেবা-সাধন—কোনও পদার্থে রঙ্ করিতে হইলে, রঙ্ওয়ালারা সর্ব্বপ্রথমে তাহাতে একটা পাংশুবর্ণ রঙ্ লাগাইয়া জমি প্রস্তুত করিয়া থাকে। ইহাকে তাহারা আস্তর বলিয়া থাকে। অগ্রে এই আস্তর না দিলে, সে পদার্থে ভাল করিয়া রঙ্ ফলে না। মানব চরিত্রেও সেইরূপ কর্ত্তব্য-পরায়ণতার রঙ্ না লাগাইলে তাহাতে সাধন ভজনের রঙ্ ফলে না। কর্ত্তব্যপরায়ণতাকেই আমরা সেবা নাম দিতেছি; কারণ ধর্ম্মের চক্ষে সমুদায় কর্ত্তব্য কার্য্যই ঈশ্বর-সেবা। পূর্ণস্বরূপ পরমেশ্বরের এমন কি অভাব আছে যাহা মানব তুমি পূরণ করিতে পার? আর তিনি তোমার স্তুতিবাদেরই বা অপেক্ষা কি রাখেন? তবে তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধনে যদি আপনাকে নিয়োগ করিতে পার, তিনি হৃদয়ে থাকিয়া যে কর্ত্তব্য কার্য্যের উপদেশ করেন, তাহা যদি সমুচিতরূপে সম্পাদন করিতে পার, তাহা হইলে তাঁহার উৎকৃষ্ট সেবা হয়। পবিত্র এবং বিশ্বাসী চিত্তের লক্ষণ এই যে, তাহা এই সেবাকে একটী ব্রত বলিয়া অনুভব করিয়া থাকে। এই সেবা-ব্রত ব্রাহ্মধর্ম্ম সাধনের একটী প্রধান ভিত্তি। যাহাতে সেবা-ব্রত নাই, কর্ত্তব্য-পরায়ণতা নাই, তাহার ভজন সাধনে আমাদের আস্থা হয় না। সে যদি কীর্ত্তনে নাচিয়া উন্মত্ত প্রায় হয়, যদি উপাসনাকালে কাঁদিয়া গড়াগড়ি যায়, যদি উচ্চ ধর্ম্মের কথা বলিয়া গগন ফাটায়, কিছুতেই আমাদের আস্থা জন্মে না। বৃক্ষকে যেমন মানুষ ফলের দ্বারা বিচার করে, আমরা সেইরূপ ধর্ম্ম-জীবনকে ফলের দ্বারা বিচার করি। কর্ত্তব্য-পরায়ণতাবিহীন লোকের ধর্ম্মোন্মাদকে চাবুকের দ্বারা আরোগ্য করিতে ইচ্ছা করে। ব্রাহ্মদিগকে সেবা-বিহীন ধর্ম্মভাবে রত হইতে দেখিলে আমরা অধোগতি বলিয়া মনে করি।

আমাদের একজন পরলোকগত শ্রদ্ধাভাজন বন্ধু সর্ব্বদা এই বলিয়া ক্ষোভ করিতেন, যে "নাচিবার ব্রাহ্ম পাই, কাঁদিবার ব্রাহ্ম পাই, সুদীর্ঘ সুদীর্ঘ প্রার্থনা করিবার ব্রাহ্ম পাই, কিন্তু ধীর ও দৃঢ়ভাবে স্বীয় কর্ত্তব্য সাধন করিবার জন্য অতি অল্প সংখ্যক ব্রাহ্মই পাই। এরূপ ব্রাহ্ম অতি অল্পই দেখি, যাঁহার হস্তে কোনও গুরুতর কার্য্যের ভার দিয়া নিশ্চিন্ত মনে থাকিতে পারি যে তাঁহার সাধ্যে যতটা আছে, তিনি করিতে ত্রুটী করিতেছেন না, সে কার্য্য সমুচিতরূপে সম্পাদিত হইতেছে।" এই কর্ত্তব্য-পরায়ণতার শিথিলতা ও দায়িত্ব জ্ঞানের অল্পতা নিবন্ধন ব্রাহ্মদিগের দ্বারা কোনও কার্য্য সকল সুচারুরূপে নির্ব্বাহিত

হইতেছে না। ইহা কি সামান্য ক্ষোভের কথা! যাহাদিগের নৈতিক অবস্থা এই, তাহারা আর ভজন সাধন কি করিবে। কর্ত্তব্য-পরায়ণতাবিহীন ধর্ম্মভাব থাকা অপেক্ষা না থাকাতে ক্ষতি কি?

সর্ব্বদা ঈশ্বরের নাম কর—সাধুরা বলেন "সর্ব্বদা ঈশ্বরের নাম কর" "অবিশ্রান্ত প্রার্থনা কর" "সমুদয় কার্য্যারম্ভের পূর্ব্বে ঈশ্বরকে স্মরণ কর" তাঁহাদের এরূপ বলিবার অভিপ্রায় কি? তাঁহারা আপনাদের জীবনে ইহা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, যে পাপ ত দূরের কথা, যখনই অন্য কথায় মন দিয়াছেন, বা বৃথা আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন তখনই যে তাহাতে কোন ফল হয় নাই তাহা নহে তাহাতে চিত্তের মধ্যে একপ্রকার চাঞ্চল্য উপস্থিত হওয়ায় বরং কুফল ফলিয়াছে। এমন উত্তম জীবন এমন উত্তম বাক্‌শক্তি পাইয়া যে আপন রসনায় ঈশ্বরের নাম না করে, তাহার জীবন অতি অসার। আবার অন্যদিকে দেখিয়াছি পবিত্র ঈশ্বরের নাম করাতে জীবন পবিত্র হইয়াছে, উজ্জ্বল হইয়াছে, সরস হইয়াছে, মহত্ব বাড়িয়াছে। যখনই কেহ প্রার্থনা পূর্ব্বক কোন কাজে প্রবৃত্ত হন, হৃদয়ে অসাধারণ বল ও উৎসাহ লাভ করেন, যখনই ঈশ্বরকে স্মরণ পূর্ব্বক কোন কাজে প্রবৃত্ত হন, অমনি আর তাহাতে অন্যায় হইবার আশঙ্কা থাকে না। একদিকে ঈশ্বর স্মরণ দ্বারা আপনাকে নিরাপদ মনে করিয়াছেন অন্যদিকে আবার দেখিয়াছেন, এই ঈশ্বর বিস্মৃতিতেই সমুদয় পাপ উৎপন্ন হইতেছে। ইহা জীবনে প্রত্যক্ষ করিয়াই তাঁহারা সকলকে এই উপদেশ দিয়াছেন। বালক কালে আমরাও সর্ব্বদাই দেখিয়াছি, যখনই বাড়ী হইতে বাহির হইতাম বা কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতাম তখন পিতা মাতা জ্যেষ্ঠতাত পিতৃস্বসা প্রভৃতি বার বার ঈশ্বরের নাম করিতেন এবং আমাদিগকে ঈশ্বরের নাম লইয়া যাত্রা করিতে বলিতেন। ব্রাহ্মসমাজে যখন প্রথম প্রথম আমরা আসিয়াছিলাম, এই ভাব আমাদের মধ্যে খুব উজ্জ্বল ছিল। প্রার্থনা করিয়া ও ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিয়া সমুদয় কাজে প্রবৃত্ত হইয়াছি। পথে ঘাটে যখনই মন একটুকু হাল্‌কা হইত বা বাজে কথায় প্রবৃত্ত হইতাম, অমনি প্রার্থনা করিতাম। এই ভাব কমিয়া যাওয়াতে এখন দেখিতে পাই অনেক সময় ব্রাহ্মেরা বৃথা কথায় কাটাইতেছেন, অনেক সময় বিশেষতঃ তর্কের সময় আত্মহারা হইয়া যাহা বলা উচিত নয় বা অসঙ্গত তাহাও বলিতেছেন। বলিতে কি একরূপ ন্যায়ের পথ বা সত্যের পথ হইতে কিছু কিছু সরিয়া পড়িতেছেন। এখন পুনরায় আমাদিগকে সর্ব্বদা প্রার্থনাপূর্ব্বক কাজ করিতে হইবে। যখনই দেখিব যে চিত্ত বহির্ম্মুখীন হইতেছে বাজে কথায় মাতিতেছে, তখনই চিত্তকে স্থির করিয়া প্রার্থনা দ্বারা আত্মাকে শুদ্ধ করিতে হইবে এবং ঈশ্বরের প্রশংসা কীর্ত্তনে নিযুক্ত হইতে হইবে। বিশেষ সভা সমিতিতে এই প্রকার ভাবে কাজ না হইলে অনেক সময় ধর্ম্মের নামে কলঙ্ক আসিবে। ব্রাহ্মবন্ধুদিগকে বিনীত অনুরোধ কোন্ প্রকার কথায় জীবন অতিবাহিত করিতেছেন সে দিকে যেন সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখেন। ঈশ্বরকে ভুলিয়া সৎকার্য্য করিলেও তাহা পণ্ড। তাঁহারই জন্য সব। তাঁহাকে সর্ব্বদা স্মরণ রাখিয়া সব করিতে হইবে। কখন মৃত্যু উপস্থিত হইবে কে জানে? যেন মৃত্যু সময় প্রভুকে ভুলিয়া মরিতে না হয় এই জন্য সাধুরা বলিয়াছেন, সর্ব্বদা ঈশ্বরের নাম কর, অবিশ্রান্ত প্রার্থনা কর, ঈশ্বরকে স্মরণে রাখ।

"অবিশ্রান্ত প্রার্থনা কর" এ কথার তাৎপর্য্য এরূপ নহে যে, সর্ব্ব কর্ম্ম বিবর্জ্জিত হইয়া কেবল দিনরাত্রি প্রার্থনাই করিতে হইবে। সংসারের নানা কার্য্যে ব্যাপৃত থাকার অবস্থাতে তাহা সম্ভবও নহে। কিন্তু ইহা সম্ভব, যাহা কর, যেখানে যাও, ঈশ্বরের দিকে মুখ থাকিবে। মনে কর এক ব্যক্তি এক স্থান হইতে আর এক স্থানে যাইবে বলিয়া বহির্গত হইয়াছে। সে পথে নানা বিষয় চিন্তা করিতে করিতে ও অপর একজন বন্ধুর সহিত কথোপকথন করিতে করিতে যাইতেছে। সে কি প্রতি পাদবিক্ষেপে স্মরণ করে আমি অমুক স্থানে যাইতেছি? তাহা করে না, অথচ তাহার সমুদয় পাদবিক্ষেপের সমষ্টির গতি সেই স্থানের অভিমুখেই থাকে। সেইরূপ তুমি প্রত্যেক কার্য্য করিবার সময়ে ঈশ্বরকে স্মরণ না রাখিতে পার, অন্ততঃ এইটুক দেখ যে তোমার সমগ্র কার্য্যের সমষ্টির গতি ঈশ্বরাভিমুখে রহিয়াছে কি না। অথবা মনে কর এক ব্যক্তি গৃহে পত্নীর অতি গুরুতর পীড়া দেখিয়া কর্ম্মস্থানে গিয়াছে। সে শীঘ্র শীঘ্র কর্ম্মস্থান হইতে বিদায় লইয়া গৃহে আসিতেছে, পথে বাজারে গিয়া কিছু দ্রব্য সামগ্রী ক্রয় করিতেছে। কর্ম্মস্থানে হিসাবে জমাখরচ কাটিবার সময়, বা বাজারে দ্রব্য সামগ্রীর মূল্য স্থির করিবার সময় পত্নীকে মনে না থাকুক, কিন্তু একথা কি বলা যায় না যে, তাহার মন বাড়ীতে পড়িয়া রহিয়াছে। তেমনি আমরা যে যে কাজ করি, মন যেন ঈশ্বর চরণে পড়িয়া থাকে।

ব্রাহ্ম-সাহিত্য পাঠে ব্রাহ্মদিগের উদাসীনতা—ব্রাহ্ম প্রতিদিন যেমন অন্ততঃ একবার পূর্ণাঙ্গ উপাসনা করিবেন, তেমন প্রতিদিনই তাঁহার ব্রাহ্মধর্ম্ম সম্বন্ধীয় কোনও পুস্তক অধ্যয়ন করা কর্ত্তব্য। যাঁহারা অভ্রান্ত শাস্ত্রে বিশ্বাস করেন, তাঁহারা নিয়ত শাস্ত্রের বচনাদি পাঠ করিয়া থাকেন। তাঁহারা ধর্ম্মশাস্ত্র পাঠ করাকে পুণ্যকার্য্য বলিয়া বিশ্বাস করেন। ব্রাহ্মগণ কোনও অভ্রান্ত শাস্ত্রে বিশ্বাস করেন না; কিন্তু ব্রাহ্মধর্ম্ম সম্বন্ধীয় পুস্তকাদি এবং অন্যান্য ধর্ম্মের মধ্যে যে সকল প্রকৃত সত্য বাক্য রহিয়াছে, গভীর শ্রদ্ধার সহিত তাহা পাঠ করা বাঞ্ছনীয়। প্রতিদিন উপাসনার পূর্ব্বে কিম্বা পরে পাঠের নিয়ম করিলে, উপাসনার সহিত পাঠ ও নিত্য অভ্যাস হইয়া যায়। অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে, ব্রাহ্মদিগের মধ্যে অনেকেই ব্রাহ্মধর্ম্ম সম্বন্ধীয় গ্রন্থ ও পত্রিকাদি পাঠ করিতে উদাসীন। এমন কি তত্ত্বকৌমুদী মেসেঞ্জার প্রভৃতি কাগজও অনেকে একবার পাতা উল্টাইয়া দেখেন না। আমরা স্বচক্ষে দেখিয়াছি, মফঃস্বলস্থ কোনও ধনী শিক্ষিত ব্রাহ্ম মেসেঞ্জার গ্রহণ করেন; কিন্তু বাড়ীর বালকেরা তাহা

খুলিয়া পাঠ না করিলে, পত্রিকা খানি আর খোলা হয় না। কলিকাতার অনেকেই তত্ত্বকৌমুদী পড়েন না। ব্রাহ্মদিগের পত্রিকা যদি ব্রাহ্মগণ পাঠ না করেন, তবে কে পাঠ করিবে? আমরা যতদূর জানিয়াছি, তাহাতে বোধ হয় পাঠ না করিবার কারণ আলস্য এবং উদাসীনতা। সাহিত্যের চর্চা এক সময়ে ব্রাহ্মদিগের মধ্যে অতিশয় প্রবল ছিল। কিন্তু এক্ষণে ব্রাহ্মগণকে সাহিত্যচর্চা বিষয়ে উদাসীন দেখা যাইতেছে। ইহার ফল এই হইতেছে, তাঁহারা সাহিত্য জগত হইতে পিছাইয়া পড়িতেছেন। আশা করি এবিষয়ে সকলের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইবে

সম্পাদকীয় ও প্রাপ্ত প্রবন্ধ

যোগচক্ষু।

যুধিষ্ঠিরকে বকরূপী ধর্ম্ম অনেক গুলি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন, তাহার একটী প্রশ্ন এই, "আশ্চর্য্য কি?" যুধিষ্ঠির উত্তর করিলেন, "মানুষ নিয়ত অপরের মৃত্যু ঘটনা দেখিতেছে, তথাচ নিজের মৃত্যু সম্বন্ধে চিন্তা করে না। সংসারের বিনাশশীলতা এবং নশ্বরতা দেখিয়া স্বীয় মৃত্যুর বিষয় চিন্তা না করাই আশ্চর্য্যের বিষয়।" কিন্তু ইহা অপেক্ষাও আশ্চর্য্যের বিষয় আছে। মানুষ নিয়ত ব্রহ্ম সত্তার মধ্যে অবস্থিতি করিতেছে, ব্রহ্ম আকাশে আত্মা পক্ষী বিচরণ করিতেছে, ব্রহ্ম সমুদ্রে মীনের ন্যায় মানব সন্তান ডুবিয়া রহিয়াছে, তথাচ পরস্পর বলিতেছে "ঈশ্বর কোথায়, ঈশ্বর কোথায়?" সূর্য্য চতুর্দ্দিক আলোকিত করিয়া মধ্যাহ্ন গগনে প্রকাশিত, তাহার প্রখর কিরণে পৃথিবী আলোকিত, এ সময় যদি কেহ জিজ্ঞাসা করে যে, "সূর্য্য কোথায়? আলোক কোথায়? সূর্য্য কিরণ কিরূপ বস্তু?" তবে যেমন সকলেই হাস্য করিবেন, তেমন সাধারণ জনগণের ঈশ্বরানুসন্ধানের কথা শুনিয়া ব্রহ্মবিদগণ আশ্চর্য্যান্বিত হন।

কলওয়ে সাহেব কর্ত্তৃক সংকলিত গ্রন্থে নিম্নলিখিত উদাহরণটী প্রাপ্ত হওয়া যায়। "একদা কোন নদীর মৎস্যসমূহ একত্রিত হইয়া পরস্পর আলোচনা করিতেছিল যে "সকলেই বলে যে, জল হইতে আমরা সৃষ্ট এবং রক্ষিত হইতেছি, কিন্তু জল কি বস্তু আমরা কখনও দেখিতে পাইলাম না। তখন তাহাদের মধ্য হইতে অপেক্ষাকৃত সুবোধ কএকটী মৎস্য বলিল, "আমরা শুনিয়াছি যে সমুদ্রের মধ্যে এক অতি বুদ্ধিমান ও পণ্ডিত মৎস্য বাস করেন, তিনি সমুদয় বিষয় জানেন, চল আমরা তাঁহার নিকট যাই এবং আমাদিগকে জল দেখাইতে বা জল কিরূপ, তাহা আমাদিগকে বুঝাইয়া দিতে, তাঁহাকে অনুরোধ করি।" এই কথা শুনিয়া তাহাদিগের মধ্যে অনেকেই সেই বিজ্ঞ মৎস্যের নিকট গিয়া উপস্থিত হইল। সে তাহাদিগের আবেদন শ্রবণ করিয়া এইরূপ উত্তর করিল।

হে প্রশ্ন মীমাংসার্থিগণ "তোমরা পরমেশ্বরের মধ্যে বাস করিতেছ অথচ তাঁহাকে জান না।

"তোমরা নদীর কূলে বসিয়া আছ অথচ একবিন্দু জলের জন্য তৃষ্ণায় মরিতেছ।" বাস্তবিক আমাদের এই প্রকারই দশা।

সাধারণ লোকের দৃষ্টি অতি স্থূল। সাধারণ লোকে যাহাকে জল বলে, সূক্ষ্মদর্শী বৈজ্ঞানিক তাহাতে গ্যাসদ্বয়ের মিলন দেখিয়া থাকেন। সাধারণ লোক বলে, "আকাশটা পৃথিবীর চন্দ্রাতপ", বৈজ্ঞানিক বলেন, "উহা কোনও বস্তু নহে"; নির্ব্বোধ মানব মরুভূমিতে মৃগতৃষ্ণিকা দেখিয়া তাহা জল বলিয়া পান করিতে চায়, বৈজ্ঞানিক বলেন, "ওখানে যাইও না, উহা জল নয়।" সাধারণে পৃথিবীকে থালার মত দেখে, বৈজ্ঞানিক গোল দেখেন। সেইরূপ স্থূলবুদ্ধি লোকে দেখে, গাছ পাথর, চন্দ্র, সূর্য্য, ঘর, বাড়ী, সংসার ইত্যাদি জড় বস্তু। ব্রাহ্ম বৈজ্ঞানিক দেখেন, ইহার মধ্যে চৈতন্যরূপী দেবতা। জড়ে তাহার চক্ষুকে আবরণ করিতে পারে না। ব্রাহ্ম বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টি জড়স্তর ভেদ করিয়া চৈতন্য রাজ্যে উপস্থিত হয়। বিষ্ণুপুরাণ প্রণেতা এক স্থানে ঈশ্বরকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন যে "তুমি জ্ঞানাত্মা, এই মূর্ত্তরূপ দৃষ্ট হইতেছে, ইহা তোমার জ্ঞানময় রূপ কিন্তু অজ্ঞেরা জগৎকে ভূতময় দেখিতেছে। অবুদ্ধিগণ জ্ঞান স্বরূপ এই অখিল জগৎকে অর্থ রূপে (স্থূল রূপে) অবলোকন করতঃ মোহ সংপ্লবে (সংসার সাগরে) ভ্রমণ করিতেছে, হে পরমেশ্বর! যাঁহারা জ্ঞানবিৎ শুদ্ধচেতা, তাঁহারা অখিল জগৎকে তোমার জ্ঞানাত্মকরূপ বলিয়া দেখেন।"

মুষা পরমেশ্বরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "প্রভো, আমি তোমাকে কোথায় পাইব?" পরমেশ্বর উত্তর করিলেন, "জানিও যখনই তুমি অনুসন্ধান করিয়াছ, তখনই তুমি আমাকে পাইয়াছ।" একজন আরবীয় লোককে কেহ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "তুমি কিরূপে জান যে, পরমেশ্বর আছেন?" সে ব্যক্তি উত্তর করিয়াছিল, "প্রাতঃকালকে দেখিবার জন্য কি আলোর আবশ্যক হয়?"

বাস্তবিক মানব যে আলোক দ্বারা তাঁহাকে দেখিতে চায়, সেই আলোকই তিনি। মানব সন্তান তাঁহাতেই বাস করে, তাহাতেই বিশ্রাম, তাহাতেই শয়ন, ভ্রমণ, অশন বসন, তাহাতেই ক্রীড়া কৌতুক আমোদ প্রমোদ করে, অথচ তাঁহাকে চিনে না। কেহ যদি দুপ্রহর বেলায় লণ্ঠন জ্বালিয়া সূর্য্যের কিরণ দেখিবার জন্য গৃহের বাহির হয় এবং উচ্চৈঃস্বরে বলিতে থাকে "ওগো বলতো কোন্ স্থানে সূর্য্যের কিরণ পতিত হইয়াছে, আমি এই লণ্ঠনের আলোর সাহায্যে তাহা দর্শন করিব," তবে যেমন সকলেই তাহাকে উন্মত্ত বলিয়া স্থির করিবেন, তদ্রূপ সাধারণ মানব সন্তান ভ্রান্ত পথে গমন করিয়া কেবলই উন্মত্ততার পরিচয় প্রদান করে।

দৃষ্টিশক্তি সকলেরই কি এক প্রকার? বুদ্ধ, ঈষা, মুষা যে চক্ষে দর্শন করিতেন, সাধারণ মানবও সেই চক্ষেই দর্শন করে; কিন্তু তাঁহাদের সূক্ষ্ম দৃষ্টিশক্তি বৈজ্ঞানিকের ন্যায় স্থূলভেদ করিয়া চৈতন্য রাজ্যে যাইতে পারে না। সাধারণের দৃষ্টি স্থূলে জড় জগতেই আবদ্ধ থাকে। জড় এবং চৈতন্যের মধ্যস্থলে যবনিকা

রহিয়াছে, এই যবনিকা যিনি উত্তোলন করিতে সমর্থ হইয়াছেন তিনিই চৈতন্ত রাজ্য দর্শন করিয়াছেন। এই যবনিকার নাম মোহ। মোহহীন না হইলে কেহই চৈতন্তের সাক্ষাৎ লাভ করিতে সমর্থ হন না। মোহ আবরণ উন্মোচিত না হইলে চৈতন্ত রাজ্যের দ্বার উদ্ঘাটিত হয় না। এই জন্ত গীতাকার বলিয়াছেন;—

যা নিশা সর্ব্বভূতানাং তস্যাং জাগর্ত্তি সংযমী।
যস্যাং জাগ্রতি ভূতানি সা নিশা পশ্যতো মুনেঃ॥
২য়—৬৯ শ্লোক।

অর্থাৎ "অজ্ঞানাচ্ছন্ন সর্ব্বভূতের পক্ষে যাহা নিশা স্বরূপ, তাহাতে ব্রহ্মর্ষি ব্যক্তি প্রবুদ্ধ থাকেন, যাহাতে অন্যান্ত সকলে প্রবুদ্ধ থাকে, তাহা তত্ত্বদর্শী মুনির পক্ষে নিশা স্বরূপ।" স্থূল কথায় বলিতে গেলে সাধারণ মানবের যখন রাত্রি, মুনির তখন দিন, মুনির যখন দিন তখন সাধারণের রাত্রি। সাধারণের প্রকৃত দর্শন হয় না বলিয়াই এরূপ হইয়া থাকে। ঋষিগণের প্রকৃত দর্শন হইয়া থাকে; এই জন্তই তাঁহারা প্রকৃতিতে চৈতন্তের দর্শন প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। সত্যের সাক্ষাৎকার একবার প্রাপ্ত হইলেই মানব যোগচক্ষু প্রাপ্ত হয়। তখন সাধক জড়ে ও চেতনে সেই এক পরম চৈতন্যের শক্তির প্রকাশ দর্শন করিতে থাকেন। সেই একই সত্তার আলিঙ্গনে সমুদয় সুরক্ষিত। যোগ-চক্ষে এই পরমাশ্রয়কে না দেখিলে হৃদয়ে প্রকৃত বিশ্বাস ও নির্ভরের সঞ্চার হয় না। নির্ভর ভিন্ন ধর্ম্মও নাই। এই কারণে এই যোগচক্ষু লাভ করিবার জন্য সকলেরই সাধন পরায়ণ হওয়া কর্ত্তব্য।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যনির্ব্বাহক সভার ৩য় ত্রৈমাসিক কার্য্যবিবরণ।

১৮৯৩।

বিগত তিন মাসে কার্য্যনির্ব্বাহক সভার ১৪টী সাধারণ অধিবেশন হইয়াছিল। কার্য্যনির্ব্বাহক সভার ৬টী অধিবেশনে বিশেষভাবে ধর্ম্মবিষয়ে আলোচনা হয়। একদিনের আলোচনায় স্থির হয় যে কার্য্যনির্ব্বাহক সভার অধিবেশনের নির্দ্দিষ্ট সময়ের আধ ঘণ্টা পূর্ব্বে অর্থাৎ ৭ ঘটিকার সময় সকলে সমবেত হইয়া ৮ ঘটিকা পর্য্যন্ত ধ্যান, প্রার্থনা সঙ্গীতাদিতে যাপন করিবেন। তদনুসারে বর্ত্তমান সময়ে কার্য্য চলিতেছে। এবং তাহা দ্বারা উপকারও হইতেছে।

চিকাগো মহামেলায় পৃথিবীস্থ সকল ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিগণের একটী মহাসম্মিলন হইয়া গিয়াছে। তাহার সঙ্গে সহানুভূতি জ্ঞাপন করিয়া কার্য্যনির্ব্বাহক সভা টেলিগ্রাম করিয়াছিলেন।

প্রচারকগণের নিয়োগ ও শিক্ষা সম্বন্ধীয় নিয়মানুসারে বর্ত্তমান বর্ষে তাঁহাদিগকে পুনর্নিয়োগ করা উচিত ছিল। কার্য্যনির্ব্বাহক সভা এ বিষয়ের গুরুত্বানুভব করিয়া এবং নিয়মের অর্থ সম্বন্ধে অধ্যক্ষসভার অভিপ্রায় অবগত হওয়া আবশ্যক মনে করিয়া বিশেষ কিছু করিতে পারেন নাই। এবং এবিষয়ের মীমাংসার্থ অধ্যক্ষসভায় প্রস্তাব উপস্থিত করিতেছেন।

খাসিয়া মিসন—দিন দিন এই মিসনের উন্নতি হইতেছে। চিরাপুঞ্জিতে একটী প্রচারভবন প্রস্তুত হইয়াছে এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে একটী সমাজ স্থাপিত হইয়াছে। গৃহ নির্ম্মাণের জন্য নানা স্থানের সহৃদয় বন্ধুগণের নিকট হইতে প্রায় চারিশত টাকা পাওয়া গিয়াছে, কিন্তু এখনও ইহার জন্ত ঋণ আছে। মৌসমাই সমাজের জন্য একটী প্রস্তরের দেওয়ালযুক্ত ঘর ক্রয় করা হইয়াছে। এই গৃহ নির্ম্মাণের জন্যও ঋণ করিতে হইয়াছে। বাবু নীলমণি চক্রবর্ত্তীর উপরেই এই মিসনের কার্য্য ভার অর্পিত আছে। তিনি আপনার কার্য্যের সাহায্যার্থ একজন খাসিয়া বন্ধুকে সহকারী রূপে গ্রহণ করিয়াছেন আর একজন বাঙ্গালি সহকারীও গ্রহণ করিবার কথা চলিতেছে।

দুর্ভিক্ষ—পূর্ব্ববাঙ্গালায় বিশেষতঃ ঢাকার অন্তর্গত অনেক স্থানে অতিরিক্ত জলপ্লাবন হওয়ায় লোকের বিশেষরূপ অন্নকষ্ট উপস্থিত হইয়াছে এই অন্নকষ্ট নিবারণের জন্য ঢাকার ব্রাহ্মগণ একটী সভা স্থাপন করিয়া কষ্টপ্রশমনের চেষ্টা করিতেছেন। কার্য্যনির্ব্বাহক সভা তাঁহাদের সহিত একযোগে কার্য্য করিতে ইচ্ছা করিয়া সম্প্রতি ১০০ একশত টাকা তাঁহাদের নিকট পাঠাইয়াছেন। আবশ্যক হইলে এখান হইতে লোক প্রেরণের জন্যও প্রস্তুত আছেন। এজন্য সমাজের পত্রিকাতে অর্থ সাহায্য প্রার্থনা পত্র প্রকাশের ব্যবস্থা করিয়াছেন।

প্রচার—এই সময় মধ্যে নিম্নলিখিত স্থান হইতে প্রচারকগণের নিমন্ত্রণ আসিয়াছিল। কুমিল্লা, দিনাজপুর, সৈদপুর, বর্দ্ধমান, চাইবাসা, ধুবড়ি, ঢাকা, শিবপুর, বেলুড়। আমাদের প্রচারকগণ নিম্নলিখিতরূপে গত তিন মাস কার্য্য করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত নবদ্বীপচন্দ্র দাস—

নোয়াখালি—এখানে প্রায় সপ্তাহ কাল থাকিয়া সমাজে ও পরিবারে উপাসনা উপদেশ এবং পাঠ ব্যাখ্যাদি দ্বারা ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিয়াছেন। একদিন একটী বিশেষ অনুষ্ঠান উপলক্ষে উপাসনা করেন ও উপদেশ দেন এবং আলোচনা করেন।

বরিশাল—এখানে প্রায় ৫।৬ দিন থাকিয়া সমাজে এবং পরিবারে উপাসনা উপদেশ এবং পাঠ ব্যাখ্যা দ্বারা ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করেন। বিশেষ অনুষ্ঠান উপলক্ষে উপাসনাদি করেন। ছাত্রসমাজে "কাহার নেতৃত্বে চলিব" এই বিষয়ে বক্তৃতা করেন এবং আলোচনা করেন।

খুলনা—এখানে ৩।৪দিন থাকিয়া পরিবারে উপাসনা এবং পাঠ ব্যাখ্যাদ্বারা ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করেন, স্থানীয় টাউনহলে "সত্য ধর্ম্ম কি?" এবং "ধর্ম্ম কি উপায়ে লাভ করা যায়?" এই দুই বিষয়ে বক্তৃতা করেন এবং আলোচনা করেন।

যশোহর—এখানে ৩।৪দিন থাকিয়া সমাজে এবং পরিবারে উপাসনা উপদেশ ও পাঠ ব্যাখ্যা দ্বারা ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করেন।

স্থানীয় বার লাইব্রেরিতে "আমাদের কিসের অভাব ? এই বিষয়ে বক্তৃতা করেন, একটী পল্লিতে একজন বন্ধুর গৃহে বিশেষ উপাসনা করেন এবং উপদেশ প্রদান করেন।

শিবপুর—প্রার্থনাসমাজের উৎসবে উপাসনা উপদেশ এবং পাঠ ব্যাখ্যাদি করেন এবং ছাত্র জীবনে নীতি শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন।

শ্রীরামপুর—সমাজে উপাসনা করেন এবং উপদেশ প্রদান করেন।

বেলুড়গ্রামে—উপাসনা করেন এবং উপদেশ প্রদান করেন।

দিনাজপুর—সমাজে ও পরিবারে উপাসনা করেন; উপদেশ প্রদান করেন, ও একটী বিশেষ অনুষ্ঠান উপলক্ষে উপাসনাদি করেন।

সৈয়দপুর—মন্দির প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে সমাজে উপাসনা করেন এবং উপদেশ প্রদান করেন ও বিশেষ রূপে তথাকার বন্ধুদের সঙ্গে আলোচনা করেন।

ধুবড়ী—সমাজের বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে তথায় সমাজে এবং পরিবারে উপাসনা করেন, পাঠ ব্যাখ্যা এবং উপদেশ দ্বারা ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করেন, বিশেষ রূপে আলোচনা করেন, ছাত্রসমাজে "ছাত্রজীবনের অত্যাবশ্যকীয় কয়েকটী বিষয়" এই বিষয়ে বক্তৃতা করেন। আর একদিন "জীবন্ত ধর্ম্ম" বিষয়ে বক্তৃতা করেন।

চাইবাসা—এখানে প্রায় ৯।১০ দিন থাকিয়া উৎসবে উপাসনা পাঠ ব্যাখ্যা এবং উপাসনাদি দ্বারা ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করেন।

পুরুলিয়া—উপাসনা পাঠ ব্যাখ্যা এবং একদিন টাউন হলে "প্রকৃত মনুষ্য জীবন সংগঠন" এবিষয়ে বক্তৃতা করেন।

আসেনসোল—এখানে উপাসনা পাঠ ব্যাখ্যা এবং উপদেশ দ্বারা ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করেন।

বাঁকুড়া—সম্প্রতি এখানে অবস্থিতি পূর্ব্বক উপাসনা উপদেশাদি দ্বারা ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিতেছেন।

কলিকাতায়—অবস্থিতি কালে ব্রাহ্ম সাধনাশ্রমে এবং পরিবারে উপাসনাদি করিয়াছেন। বিশেষ ২ অনুষ্ঠান উপলক্ষে উপাসনাদি করিয়াছেন। পরিবার ও ছাত্রাবাস পরিদর্শন করিয়াছেন। তত্ত্বকৌমুদীতে মধ্যে মধ্যে লিখিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন সমাজের অন্যান্য কার্য্য যথাসাধ্য করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়—বংশবাটী ছাত্র সভায় সভাপতি রূপে নিম্ন লিখিত ২টি বিষয়ে দুই দিবস বক্তৃতা করেন। ১। "রক্ষণশীলতা" ২। "ইয়োরোপের নিকট আমরা কি শিক্ষা করিতে পারি।"

তেলিনীপাড়া—জমীদার মহাশয়দের বাটীতে উপাসনা ও বক্তৃতা করেন।

ঢাকা—পূর্ব্ববাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজমন্দিরে উপাসনা ও উপদেশ। ছাত্র সমাজের উৎসব উপলক্ষে, পূর্ব্ববাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজমন্দিরে উপাসনা ও উপদেশ এবং ছাত্রসমাজের উৎসব উপলক্ষে "নিম্নলিখিত ২টি বিষয়ে বক্তৃতা ১। "নীতি শিক্ষা ও চরিত্র সংগঠন।" ২। "ধর্ম্মমতের বিরোধ ও সামঞ্জস্য।" পূর্ব্ববাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজে স্বর্গীয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মহত্ব বিষয়ে বক্তৃতা।

কলিকাতা। একটী শ্রাদ্ধ উপলক্ষে উপাসনা। ছাত্রসমাজে প্রশ্নোত্তর। সিটিকলেজে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের স্মরণার্থ সভায় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মহত্ব বিষয়ে বক্তৃতা। পরিচারকাশ্রমে তিন দিবস ধর্ম্মালোচনা এবং একদিবস "সাকার ও নিরাকার উপাসনা" বিষয়ে বক্তৃতা ও আলোচনা। কোন ছাত্রাবাসে প্রার্থনা ও আলোচনা। কোন ব্রাহ্মপরিবারে জন্মদিন উপলক্ষে উপাসনা। ছাত্রসমাজে "সেবাধর্ম্ম" বিষয়ে প্রকাশ্য বক্তৃতা ব্রহ্মবিদ্যালয় ও ছাত্রসমাজে সৃষ্টিকৌশল বিষয়ে প্রকাশ্য বক্তৃতা। একটি ব্রাহ্মবিবাহে আচার্য্যের কার্য্য। রাজা রামমোহন রায়ের স্মরণার্থ সভায় "রাজা রামমোহন রায় হিন্দু নারীর জন্য কি করিয়াছেন ?" এই বিষয়ে বক্তৃতা।

কলিকাতা ও মফস্বলে এবং অন্যান্য লোকের সহিত আলোচনা ও ধর্ম্মবিষয়ক পুস্তকরচনাতেও অনেক সময় অতিবাহিত হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত শশিভূষণ বসু। কলিকাতা—কোন কোন পরিবারে, বন্ধুদিগের সহিত ও নিমতা ব্রাহ্মসমাজে মধ্যে মধ্যে উপাসনা করেন।

কুমিল্লা—এখানে উৎসবে আচার্য্যের কার্য্য করেন। কোন কোন পরিবারে উপাসনা ও উপদেশাদি প্রদান করেন, ব্রাহ্মবন্ধু ও ছাত্রদিগের সহিত ধর্ম্মালোচনা করেন। স্থানীয় টাউন হলে "জীবন্ত শক্তির লক্ষণ" ও "জাতীয় চরিত্রের অবনতি ও উন্নতি" সম্বন্ধে এবং ছাত্রদিগের জন্য সমাজগৃহে ইংরেজিতে "Solemn warnings" এবং ইংরাজি স্কুল গৃহে "ছাত্রজীবনের দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য" সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন।

পত্রিকায় ধর্ম্ম বিষয়ে প্রবন্ধ লিখেন এবং "The Principles of Brahmoism and the order of divine Service in the Brahmo Samaj. নামক একখানি পুস্তক প্রণয়ন করিতেছেন। এবং অন্য একখানি পুস্তক প্রণয়নে রত আছেন। প্রচারক মহাশয়দিগের বাৎসরিক অবসর গ্রহণের নিয়মানুসারে কিছু দিন বিশ্রাম করেন।

পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী—মন্দিরে রবিবাসরীয় উপাসনার অধিকাংশ সময় আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছেন এবং সাধনাশ্রমের তত্ত্বাবধারকতাও দৈনিক উপাসনায় অধিকাংশ সময় আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছেন। ব্রাহ্মবালিকা বোর্ডিং ও শিক্ষালয়ের সম্পাদকীয় কার্য্য নিয়মিতরূপে নির্ব্বাহ করিয়াছেন, ছাত্রসমাজে উপাসনা বক্তৃতা আলোচনাদি করিয়াছেন। কোন কোন ব্রাহ্মপরিবারে অনুষ্ঠানে আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন তত্ত্বকৌমুদী সম্পাদন করিয়াছেন এবং মেসেঞ্জার সম্পাদনের সহায়তা করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত লক্ষ্মণ প্রসাদ—এই তিন মাস কাল মধ্যে যতদিন লক্ষ্ণৌয়ে ছিলেন তথায় দৈনিক ও সাপ্তাহিক উপাসনাদি করিয়াছেন। প্রত্যহ প্রাতে দরিদ্রদিগকে হোমিওপ্যাথি ঔষধ বিতরণ করিয়াছেন। রোগীর সংখ্যা প্রায় ১৫০০ হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত প্রকাশ্য রাজপথে বক্তৃতা ও ধর্ম্মালোচনা করিয়াছেন। কোয়েটা ব্রাহ্মসমাজের সাম্বৎসরিক উৎসবে আহূত হইয়া তথায় যাইবার কালে এবং তথা হইতে প্রত্যাগমন কালে লাহোর, রক্ষ সকর প্রভৃতি স্থানে অবস্থিতি করিয়া উপাসনা, বক্তৃতা, ও ধর্ম্মালোচনা করিয়াছেন। ইহাতে তাঁহার একমাস কালের অধিক অতিবাহিত হয়। তিনি এই সকল স্থানে ধর্ম্ম প্রচার এবং কোন কোন সর্দ্দার ও শিক্ষিত ভদ্রলোকদিগের সহিত ধর্ম্মালোচনা করিয়া বিশেষ উপকৃত ও উৎসাহিত হইয়াছেন।

বক্তৃতা ও উপদেশের বিষয়	স্থান
Terms of divine love.	লাহোর ব্রহ্মমন্দির।
To be divine is the real aim of life	রক্ষ ভজনমণ্ডলী মণ্ডপ
The object of life	কোয়েটা।
Terms of enjoying the utsob	ঐ
Materials of holy life	ঐ
The practical feature of our religion	ঐ
What we mean by conversion	ঐ
The open enemies of God	ঐ
Life here and here-after	ঐ
A good old way	ঐ
Our duties	ঐ
Home and its teachings	রক্ষ
The basis of religion is to be with God	সকর
The materials of happy life	সকর
The human life	লাহোর
The duties of educated Indian	ঐ

পাথের এবং তাঁহার লক্ষ্ণৌ দাতব্য চিকিৎসালয়ের সাহায্য হেতু নিম্নলিখিত এককালীন দান জন্য দাতাদিগকে তিনি সর্ব্বান্তঃকরণে ধন্যবাদ দিতেছেন।

সর্দ্দার দয়াল সিং লাহোর—৬০৲
কোয়েটা ব্রাহ্মসমাজ —৮০৲
দেওয়ান নেভালরাও সকর—১০৲

লক্ষ্ণৌ হাইদ্রাবাদে দাতব্য চিকিৎসালয়টি হইয়া তাঁহার প্রচার কার্য্যের অনেক সুবিধা ও উন্নতি হইয়াছে। স্থানীয় বন্ধুগণ একটি শাখা চিকিৎসালয় খুলিবার জন্য অনুরোধ করিতেছেন, কিন্তু সহকারী অভাবে আপাততঃ তাহা সম্ভব পর নহে। দুইটি যুবক তাঁহার চিকিৎসালয়ে বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন। সে জন্য তাঁহাদিগের নিকট তিনি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছেন।

এতদ্ভিন্ন বাবু কালীপ্রসন্ন বসু নিম্নলিখিত রূপে কার্য্য করিয়াছেন। তিনি কিছুকাল ত্রিপুরাগ্রামে স্থানীয় উপাসকদিগকে লইয়া মাঝে মাঝে উপাসনা করিয়াছেন, ও রবিবার উপাসনার সময় উপদেশ দিয়াছেন। কিছুকাল ঢাকায় থাকিয়া কয়েকটী উপাসক লইয়া ভজনালয়ের এক প্রকোষ্ঠে তিন দিবস উপাসনা করেন, রবিবার প্রাতে ভজনালয়ে উপাসনা করেন। তৎপর কলিকাতা আগমন করেন। কলিকাতায় অবস্থিতি কালে দুই দিন সাধনাশ্রমের ও এক দিন প্রাতে ভজনালয়ের উপাসনা কার্য্য করিয়াছিলেন। সাধনাশ্রমের উপাসনালয়ে একদিবস সায়াহ্নে কোন মহিলার মাতৃশ্রাদ্ধ উপলক্ষে উপাসনা করেন। দুইটী বন্ধুর অনুরোধে একদিবস ইডেন উদ্যানে উপাসনা করেন। কোন এক শনিবার সায়াহ্নে বাবু বিপিন বিহারী রায় মহাশয়ের বাসায় উপাসনা করেন। ছাত্র সমাজের উৎসবে পাঠ ব্যাখ্যা ও বেলুড় গ্রামে ধর্ম্ম-প্রচারের সহায়তা করেন। এক দিন ভবানীপুরে মনোরঞ্জন গুহের বাসায় পারিবারিক উপাসনা করেন। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অঙ্গীভূত রঙ্গপুর ব্রাহ্মসমাজের বিলডিং ফণ্ডের জন্য কয়েক টাকা দান সংগ্রহ করেন। ধর্ম্ম বিষয়ক একটী দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখিতে নিযুক্ত আছেন। কলিকাতা হইতে বোলপুর গমন কালে বর্দ্ধমানে কামিনীকান্ত গুপ্তের বাটীতে উপাসনা করেন। বোলপুরে উপস্থিত হওয়ার পর বন্ধু মণ্ডলীতে একদিন উপাসনা করেন। বোলপুর গ্রামে ধর্ম্ম বিষয়ক একটী বক্তৃতা করেন। নলহাটীতে বাবু নীলকান্ত সিদ্ধান্তের বাড়ীতে উপাসনা করেন। রামপুরহাটে বাবু মহেশচন্দ্র ঘোষের বাসায় উপাসনা করেন। রবিবার দুই বেলা সমাজে উপাসনা করেন। সায়াহ্নে উপাসনায় উপদেশ দেন এবং অপরাহ্নে আলোচনা করেন। বাজারে সঙ্গীত প্রার্থনা করেন, তৎপর মন্দিরে আসিয়া সঙ্গীত ও প্রার্থনা বক্তৃতা করেন। রামপুরহাট হইতে কলিকাতায় ফিরিয়া কোন একটী বন্ধুর জন্ম দিনোপলক্ষে উপাসনা করেন।

এবং বাবু নীলমণি চক্রবর্ত্তী প্রধানতঃ চেরাপুঞ্জিতে থাকিয়া কার্য্য করিয়াছেন। মধ্যে মধ্যে খাসিয়া পাহাড়ের অন্যান্য স্থানে ধর্ম্মপ্রচার করিয়াছেন। তাহার কার্য্যের বিশেষ বিবরণ পাওয়া যায় নাই।

সাধনাশ্রম।

পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী এবং বাবু নবদ্বীপচন্দ্র দাসের কার্য্য-বিবরণ প্রচারকগণের কার্য্যবিবরণের সহিত দেওয়া হইয়াছে। অন্যান্য পরিচারকগণের কার্য্য বিবরণ এইরূপ।

শ্রীযুক্ত প্রকাশদেব—ইনি রামপুরহাট ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনা করেন ও উপদেশ দেন এবং কোন ব্রাহ্মের গৃহে প্রার্থনা করেন ও নলহাটিতে উপাসনা করেন। ভাগলপুরে কোনও পরিবারে উপাসনা করেন এবং উপনিষদের শ্লোক উল্লেখ করিয়া উপদেশ দেন। একদিন আলোচনা সভাতে প্রার্থনা ও আলোচনাদি করেন। কলিকাতা ওয়েলিংটন স্কোয়ারে প্রকাশ্য বক্তৃতা করেন। শান্তিনিকেতনে অবস্থিতি কালে বোলপুরে একদিন বক্তৃতা করেন। এক্ষণে তিনি প্রচারার্থে ছোটনাগপুর অঞ্চলে গমন করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত আদিনাথ চট্টোপাধ্যায় সাধনাশ্রমের দৈনিক উপাসনায় কখন কখন আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছেন, কোন কোন

বাসায় এবং মন্দিরে রবিবার প্রাতঃকালে মধ্যে মধ্যে উপাসনা করিয়াছেন। কয়েকটী পারিবারিক অনুষ্ঠানে উপাসনা করিয়াছেন। এবং ব্রাহ্ম বালিকা শিক্ষালয়ে ২ সপ্তাহ বাবু (জয়শঙ্কর রায় মহাশয়ের অনুপস্থিতিতে) শিক্ষা প্রদান করিয়াছেন। ইনি নিয়মিতরূপে ব্রাহ্মমিশন প্রেসের তত্ত্বাবধায়কতা করিয়াছেন এবং তত্ত্বকৌমুদী পরিচালনের সহায়তা করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়—সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের ধনাধ্যক্ষের কার্য্য ও কার্য্যালয়ের অন্যান্য কার্য্যের সহায়তা করেন ও কয়েকটি ব্রাহ্ম পরিবার পরিদর্শন করেন। রবিবার প্রাতে কয়েক দিন সমাজ মন্দিরে উপাসনার কার্য্য করেন। মধ্যে মধ্যে আশ্রমের উপাসনায় আচার্য্যের কার্য্য করেন। এবং প্রতি দিন সায়ংকালে সমাজ মন্দিরে উপাসনা করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন প্রতি শনিবার নিমতা ব্রাহ্মসমাজে সাপ্তাহিক উপাসনা করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত গুরুদাস চক্রবর্ত্তী—ব্রাহ্ম ছাত্রনিবাসের তত্ত্বাবধায়কতা এবং বালিকা শিক্ষালয়ের শিক্ষকতা কার্য্য নিয়মিত রূপে সম্পাদন করিয়াছেন। সময় সময় সাধনাশ্রমের দৈনিক উপাসনায় আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছেন ও কোন কোন বাসায় উপাসনা করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন তত্ত্বকৌমুদী সম্পাদনের সহায়তা করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত কাশীচন্দ্র ঘোষাল—সাধনাশ্রমের কার্য্যাধ্যক্ষতা ও ব্রাহ্ম ছাত্রীনিবাস ও বালিকা শিক্ষালয়ের হিসাবাদি কার্য্যে নিয়মিত রূপে সহায়তা করিয়াছেন এবং শান্তিনিকেতনে অবস্থিতি কালে বোলপুরে এক দিন নিত্যানন্দের প্রেম প্রচার সম্বন্ধে কথকতা করেন ও ওয়েলিংটন স্কোয়ারে এক দিন বক্তৃতা করেন। কখন কখন সাধনাশ্রমের দৈনিক উপাসনায় আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছেন এবং তত্ত্বকৌমুদী সম্পাদনের সহায়তা করিয়াছেন।

সাধনাশ্রমে এই সময় মধ্যে ৩টী মাসিক উৎসব হইয়াছে ১লা সেপ্টেম্বরের উৎসবে বাবু জয়শঙ্কর রায় সংকল্পাধীন সেবক রূপে গৃহীত হইয়াছেন। আগষ্ট মাসে আশ্রমবাসীগণের অধিকাংশ বোলপুরে নির্জ্জন সাধন আলোচনাদিতে যাপন করিয়াছেন।

আয় ব্যয়ের হিসাব।

আয়		ব্যয়	
বাটীভাড়া	৪৪৲	প্রচারার্থে পাথেয়, ডাকমাশুল ও অন্যান্য ক্ষুদ্র ব্যয়	৬৬।/১০
পুস্তক বিক্রয়ের আয়	৬৲	আশ্রমবাসিগণের আহার ও অন্যান্য বাবতে ব্যয়	৪১৯৸৶১০
আতিথিফণ্ডের দানপ্রাপ্তি	১৲	আতিথিগণের জন্য ব্যয়	১৩৸/০
আশ্রমবাসিগণের নিকট হইতে প্রাপ্তি	১৮১৲		৪৯৯৸৶০
জিনিস বিক্রয়	২০৷৹	স্থিত	৶১০
দান প্রাপ্তি	১০০৸৶১০	মোট	৫০০৲১০
ভিক্ষা প্রাপ্তি	১৪৬৶১৫		
	৪৯৯৷৶৫		
পূর্ব্বস্থিত	৷৶৫		
মোট	৫০০৲১০		

পুস্তক প্রচার—আমাদিগের প্রচারক বাবু শশিভূষণ বসু মহাশয় কৃত ব্রাহ্মধর্ম্ম সূত্র নামক পুস্তকের ১৫০০ খণ্ড এবং সেই পুস্তকের সত্ত্বাধিকার ২০ টাকা মূল্যে সমাজকে বিক্রয় করিয়াছেন। উত্তরবঙ্গ রেলওয়ের রাণীনগর ষ্টেশনের বাবু কেদারনাথ সরকার মহাশয় তাঁহার কৃত "আলোক" নামক পুস্তকের ৭৭৫ খণ্ড পুস্তক সাধারণ ব্রাহ্মসমাজকে দান করিয়াছেন। আমরা এই দান জন্য দাতাকে ধন্যবাদ দিতেছি।

সঙ্গত সভা—এই তিন মাসে সঙ্গত সভার ১৩টী অধিবেশন হইয়াছিল, তাহাতে প্রথম দুইমাস ইমিটেসন অব ক্রাইষ্ট নামক পুস্তক পাঠ ও ব্যাখ্যা ও আলোচনা হয় এবং ৩য় মাসে ব্রাহ্ম বালক বালিকাদের শিক্ষা সম্বন্ধে নানা প্রকার আলোচনা হইয়াছিল।

দাতব্য বিভাগ—গত তিন মাস কাল দাতব্য বিভাগের কার্য্য প্রায় পূর্ব্ববৎই চলিয়াছে। এই তিন মাস মধ্যে ১৫টী, ছাত্র, ২টী ছাত্রী ৫টী পরিবার, ১টী অন্ধ এবং একটী কুষ্ঠ রোগীকে অর্থ সাহায্য করা হইয়াছে। অর্থাভাবে কয়েক জনকে সাহায্য করিতে পারা যায় নাই।

আয় ব্যয়ের হিসাব।

জমা		খরচ	
বার্ষিক চাঁদা আদায়	১১।০	মাসিক দান	৮০৷০
মাসিক	১৫৷০	এক কালীন	১৫৷৶০
অনুষ্ঠান উপলক্ষে	২২৲		৯৬৶০
এক কালীনদানপ্রাপ্তি	১১৷০	হস্তে স্থিত	২০৭৸০
বিবিধ হিঃ	১০/৫		
	৭০৷/৫		৩০৩৸৶০
পূর্ব্বকার স্থিত	২৩৩৷১৫		
		মোট	৩০৩৸৶
মোট	৩০৩৸৶		

ছাত্রসমাজ—বিগত জুলাই মাসে ছাত্র সমাজের নূতন বৎসর আরম্ভ হয় এবং কর্ম্মচারিগণের হস্তে কার্য্যভার ন্যস্ত হয়। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী সভাপতি, শ্রীযুক্ত বাবু কৃষ্ণকুমার মিত্র সহকারী সভাপতি, শ্রীযুক্ত শ্রীচরণ চক্রবর্ত্তী সম্পাদক ও শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ বসু ও সুধারচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত হইয়া কার্য্য চালাইতেছেন। কর্ম্মচারিগণ ব্যতীত অন্যান্য বৎসরের ন্যায় ছাত্রসমাজ আপনাদের মধ্য হইতে ১০ জন সভ্য লইয়া একটী কার্য্যনির্ব্বাহক সভা নিযুক্ত করেন। বিগত তিনমাস মধ্যে ছাত্রসমাজের সাধারণ সভার একটী ও কার্য্যনির্ব্বাহক সভার তিনটী অধিবেশন হইয়াছে।

বক্তা	বিষয়	স্থান	সময়
বাবু মনোরঞ্জন গুহ	মানবাত্মারতৃপ্তিপ্রশ্ন	উপাসনা মন্দির	১০ই জুলাই
,, কৃষ্ণকুমার মিত্র	বিদ্যাসাগরেরসমাজসংস্কার	ঐ	২২এ জুলাই;

,,কালীশঙ্কর সুকুল	ধর্ম্মেরনামে অধর্ম্ম	ঐ	৫ই আগষ্ট
,,কৃষ্ণকুমার মিত্র	শক্তিসঞ্চার	ঐ	২২এ আগষ্ট
,,কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়	ঈশ্বরেরপূজা,	জেনারেল এসেম্ব্লি	১৯এ আগষ্ট
,, নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	ঈশ্বরের অস্তিত্ব,	উপাসনা মন্দির	৯ই সেপ্টেম্বর
পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী	জীবনের মধ্যপথ	ঐ	২৩এ সেপ্টেম্বর

বিগত ১৯ শে জুলাই অপরাহ্ন ৭॥ ঘটিকার সময় একটি আলোচনা সভা হয়, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

বিগত ২রা সেপ্টেম্বর অপরাহ্ন ৭॥ ঘটিকার সময় উপাসনা মন্দিরে ছাত্রসমাজের বিশেষ উপাসনা হয়। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় উপাসনা করেন ও উপদেশ দেন।

নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ছাত্রসমাজের সম্পাদককে সঙ্গে লইয়া মিরজাফরের গলিস্থ ১নং ছাত্রনিবাসে গমন করেন। তথায় উপাসনার পর কিছুকাল সংকীর্ত্তন হয় এবং অবশেষে ধর্ম্মবিষয়ক আলোচনা হয়।

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয় সম্পাদককে সঙ্গে লইয়া ৭ই আগষ্ট মিরজাফরের গলির ১নং বাটী, ১৭ই আগষ্ট শ্যামাচরণ দের ষ্ট্রীটের ১০নং বাটী ২৪ শে আগষ্ট বৈঠকখানার ১১৯ নং বাটী, ৩১ শে আগষ্ট বৈঠকখানার ১২৭ নং বাটী পরিদর্শন করিয়াছেন এবং ছাত্রদিগের জ্ঞাতব্য বিষয়ে ছাত্রদের সঙ্গে কথোপকথন করেন।

বিগত ১৬ই সেপ্টেম্বর অপরাহ্ন ৭ ঘটিকার সময় সায়ংসমিতি হয়। প্রায় ৩০০ লোক উপস্থিত হইয়াছিলেন। ছাত্র ও ছাত্রীগণ অনেক সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক ও মহিলা উপস্থিত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে ৪।৫ জন ইংরেজ পুরুষ ও রমণী ছিলেন।

ছাত্রসমাজের ৯টী সভ্যকে লইয়া একটী শুশ্রূষা বিভাগ গঠিত হইয়াছে।

বৃন্দাবন মল্লিকের গলির ৬নং বাসায় ছাত্রসমাজের অনেক সভ্য ও ফকিরচাঁদ মিত্রের ষ্ট্রীটের ১২নং বাসায় আর একটী সভ্য পীড়িতাবস্থায় সম্পাদককে শুশ্রূষা করিবার লোকের বন্দোবস্ত করিবার জন্য লিখিয়া পাঠান, সম্পাদক শুশ্রূষা বিভাগের সভ্যগণের কতিপয় সভ্যকে প্রেরণ করিয়া তাঁহাদের শুশ্রূষার বন্দোবস্ত করেন। ডাক্তার সুন্দরীমোহন দাস এই দুই স্থানেই বিনা ভিজিটে চিকিৎসা করিয়াছেন।

বর্ত্তমান সময়ে ছাত্রসমাজের সভ্য সংখ্যা ২৪৩। সভ্য সংখ্যা ক্রমশই বর্দ্ধিত হইতেছে।

এই তিন মাসে নিয়মিত চাঁদা ও সায়ংসমিতির ব্যয় নির্ব্বাহার্থে এককালীন দান লইয়া আয় ৭০৲ টাকা আয় হইয়াছে; ব্যয় ও প্রায় এরূপই হইয়াছে। এই আয় হইতে পূর্ব্ব বৎসরের কিঞ্চিৎ ধারও শোধ হইয়াছে।

রবি বাসরীয় নীতি বিদ্যালয়

রবি বাসরীয় নীতি বিদ্যালয়—ইহার কার্য্য রীতিমত চলিতেছে। এক্ষণে ছাত্র ও ছাত্রী সংখ্যা ১৩২। বালক ও বালিকার সংখ্যা সমান। এই তিন মাসের মধ্যে নিম্নলিখিত এককালীন দান পাওয়া গিয়াছে। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র ঘোষ ২০৲ শ্রীযুক্ত মুক্তকেশী দত্ত ৫৲ শ্রীযুক্ত পার্ব্বতীচরণ দাস ৫৲ শ্রীযুক্ত পার্ব্বতীনাথ দত্ত ৫৲ এই সকল দানের জন্য আমরা দাতাগণকে ধন্যবাদ অর্পণ করিতেছি।

উপাসক মণ্ডলী

উপাসক মণ্ডলী—মন্দিরে নিয়মিত রূপে প্রাতে ও সন্ধ্যার সময় উপাসনা হইয়াছে। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী, বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত ও কৃষ্ণকুমার মিত্র উপাসনার কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন। শাস্ত্রী মহাশয় মণ্ডলীর বর্ত্তমান অবস্থার উন্নতির মানসে মণ্ডলীর সম্পাদককে এক পত্র লেখেন, সেই পত্র উপাসক মণ্ডলীর এক বিশেষ অধিবেশনে বিচারার্থ উপস্থিত করাতে উপস্থিত সভ্য মহোদয়গণ মণ্ডলীর অবস্থা অনুসন্ধানের জন্য একটী কমিটি নিযুক্ত করিয়াছেন। সেই কমিটি কিসে উপাসক মণ্ডলীর উন্নতি সংসাধিত হয় তাহার আলোচনা করিতেছেন। মণ্ডলীর আয় ব্যয়ের হিসাব নিম্নে প্রদত্ত হইল।

উপাসকমণ্ডলীর আয় ব্যয়ের হিসাব।

আয়—		ব্যয়—	
দান প্রাপ্তি	২৲	বেতন হিঃ খরচ	২৫৸০
চাঁদা আদায়	১৩০৸৶১৫	ক্ষুদ্র ব্যয়	১৮৸৵৫
গ্যাস হিঃ ছাত্রসমাজ		গ্যাসের আলো হিঃ	২৬৲
হইতে প্রাপ্ত	৫৲	মন্দির মেরামত হিঃ	১৭/১০
		হাওলাত শোধ	৭৭৲
	১৩৭৸৶১৫		
পূর্ব্বাস্থিত	৩১৶১২॥		১৬৪৶১৫
		-হস্তেস্থিত	৪।৹/১
মোট	১৬৯৶৭॥		
			১৬৯৶৭॥

ব্রহ্মবিদ্যালয়

ব্রহ্মবিদ্যালয়—বিগত জুলাই মাসে এই বিদ্যালয়ের বার্ষিক পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে ও তৎপর নববর্ষ (দ্বাদশ বর্ষ) আরম্ভ হইয়াছে। বিগত বৎসর বিদ্যালয়ের কার্য্য সন্তোষকররূপে চলে নাই। চারিটী শ্রেণীর মধ্যে ইংরেজি সিনিয়ার ও বাঙ্গালা জুনিয়ার, কেবল এই দুটী শ্রেণীর কার্য্য নিয়মিতরূপে চলিয়াছিল। নিয়মিতরূপে কার্য্য করিতে পারেন এরূপ শিক্ষকের অভাবই এই বিশৃঙ্খলার কারণ। পরীক্ষাকালে কেবল তিন জন ছাত্র সমগ্র সিনিয়ার কোর্সের এবং একজন ছাত্র কেবল 'নিউটেষ্টেমেন্টের' পরীক্ষা দিয়াছেন, এতদ্ব্যতীত মফস্বলের একটী ছাত্র বাঙ্গালা জুনিয়ার কোর্সের পরীক্ষা দিয়াছেন। পূর্ব্ববর্ত্তী কোন বৎসরে পরীক্ষার্থীর সংখ্যা এত অল্প হয় নাই। গত বৎসর কোর্স বিশেষ কঠিন হইয়াছিল, বোধ হয় ইহাই এরূপ অল্পতার প্রধান কারণ। ডাক্তার প্রসন্নকুমার রায় ধর্ম্মবিজ্ঞান, পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী 'ভগবদ্গীতা' বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত 'নিউটেষ্টেমেন্ট' ও বাবু অবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বাঙ্গালা জুনিয়ার কোর্সের পরীক্ষা গ্রহণ করিয়াছেন। নববর্ষের কোর্স বিশেষ সহজ করা হইয়াছে। ইংরেজি ধর্ম্মবিজ্ঞান, বাঙ্গালা ধর্ম্মবিজ্ঞান, হিন্দুশাস্ত্রের 'ভগবদ্গীতা' ও খ্রীষ্টান শাস্ত্রের 'নিউটেষ্টেমেন্ট' এই চারি বিষয়ে চারিটী স্বতন্ত্র কোর্স গঠিত হইয়াছে। শিক্ষার্থিগণ এই চারি কোর্সের মধ্যে কোন একটী বা তদধিক কোর্স অধ্যয়ন করিতে পারিবেন।

বাবু সীতানাথ দত্ত ইংরেজি ধর্ম্মবিজ্ঞান ও 'ভগবদ্গীতা' এবং বাবু অবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বাঙ্গালী ধর্ম্মবিজ্ঞান অধ্যাপনার ভার লইয়াছেন। এই তিনটী শ্রেণীর কার্য্য নিয়মিতরূপে চলিতেছে। নিয়মিত শিক্ষকের অভাবে 'নিউটেষ্টেমেণ্টের' শ্রেণী এখনও খোলা হয় নাই।

ব্রাহ্ম ছাত্রীনিবাস ও ব্রাহ্ম বালিকা শিক্ষালয়—

গত জুলাই মাসে ব্রাহ্মছাত্রীনিবাস ও শিক্ষালয় কার্য্যনির্ব্বাহক সভার নির্দ্ধারণ অনুসারে একত্রিত করিয়া এক সব কমিটির কর্ত্তৃত্বাধীনে আনা হইয়াছে। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী উক্ত কমিটির সম্পাদক নিযুক্ত হইয়াছেন। জুলাই মাস হইতে একজন শিক্ষক ও একজন শিক্ষয়িত্রী নূতন নিযুক্ত হইয়াছেন। স্কুলের বর্ত্তমান ছাত্র ও ছাত্রীসংখ্যা ৮৩। তন্মধ্যে ১৮টী ছাত্র অবশিষ্ট ছাত্রী। বোর্ডিংএর ছাত্রীসংখ্যা বর্ত্তমানে ২৭; তন্মধ্যে ২১টী শিক্ষালয়ে পাঠ করে আর ৪টী বেথুন বিদ্যালয়ে পাঠ করে। বোর্ডিং বাবদে খরচ আদায়ের অতিরিক্ত হয় না। শিক্ষালয়ের খরচ নিয়মিত বেতন ও চাঁদাবাবদে যত আদায় হয় তাহা অপেক্ষা বেশী হইতেছে। ব্রাহ্ম সাধারণের আর্থিক সহানুভূতি ব্যতীত এরূপ শিক্ষালয় চালান কঠিন। বিশেষ দুঃখের বিষয় এই যে, যে সমস্ত বিধবা এই শিক্ষালয়ে বালিকাদিগকে শিক্ষা দেওয়ার ইচ্ছা আছে, অর্থাভাবে তাহা দিতে পারা যাইতেছে না। এদিকে সহৃদয় ব্রাহ্মমহোদয়গণের দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়া নিতান্ত প্রয়োজন।

গত তিন মাসের আয় ব্যয়ের হিসাব।

আয়		ব্যয়	
বেতন আদায়	১৪০৫॥৶১৫	খোরাকি জলখাবার ও আলো	৩৮১৸৶৫
বোর্ডিং ফি ৯৫৫৸/১৫		কর্ম্মচারী ও চাকরের বেতন	৫৫৩।১৫
স্কুল ফি ৪৪৯৸৶		শিক্ষক ও শিক্ষয়িত্রী	৪৭৭॥০
	১৪০৫॥৶১৫	চাকর	৭৫৸১৫
চাঁদা ও এককালীন দান	৪৫৫॥৶		৩৫৩ ১৫
কর্জ্জজমা	২৫০৲	ধোপা	৪৫।১৫
	২১১১।৶১৫	গাড়ী হিসাবে খরচ	২৩২৸/৫
পূর্ব্বস্থিত	৭৶	বাড়ীভাড়া	২৭৮৲
		গাড়ী খরিদ ও গাড়ী ভাড়া বাবদে কর্জ্জ-শোধ	২৫০৲
		বিবিধ খরচ	৮৩৸৶৫
			১৮২৫।/৫
		হস্তেস্থিত	২৯৩৶১০
সমষ্টি	২১১৮॥১৫	সমষ্টি	২১১৮॥১৫

ইণ্ডিয়ান মেসেঞ্জার ও তত্ত্ব-কৌমুদী—ইণ্ডিয়ান মেসেঞ্জার সম্পাদন সাহায্যের জন্ম একটী সব কমিটি গঠিত হইয়াছে। কমিটির সভ্যগণ সম্পাদক মহাশয়কে বিশেষভাবে সাহায্য করিতেছেন। সম্প্রতি মেসেঞ্জারের ১০ম বার্ষিক জন্মোৎসব হইয়া গিয়াছে। উপাসনা পূর্ব্বক কার্য্যারম্ভ হয় তৎপর ইহার উন্নতিকল্পে নানা প্রকার আলোচনা হইয়াছিল। দিন দিন মেসেঞ্জারের আর্থিক অবস্থার উন্নতি হইতেছে। তত্ত্বকৌমুদী সম্বন্ধে বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই। উভয় পত্রিকাই নিয়মিতরূপে প্রকাশিত হইতেছে।

ব্রাহ্ম মিশন প্রেস—সমাজ কার্য্যালয় হইতে পূর্ব্বে ব্রাহ্ম মিশন প্রেসের জন্য যে টাকা ঋণ দেওয়া হয়, তদ্ব্যতীত এই তিন মাসে ২৫০০ টাকা প্রেসকে ঋণ দেওয়া হইয়াছে। এই টাকা দ্বারা অন্যান্যের নিকট প্রেসের যে ঋণ ছিল তাহা পরিশোধ করা হইয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে প্রেসের দেনা, (বাজার দেনা হাওলাত ও কর্জ্জ দরুন) প্রায় ৫৬০০ টাকা। পাওনা ৬১৩৭৸/৭॥ আছে। প্রেসের তিন মাসের আয় ব্যয়ের হিসাব নিম্নে দেওয়া গেল :—

আয়		ব্যয়	
ছাপাই হিঃ (যত টাকার কাজ হইয়াছে)	১২৬৮৶০	মুদ্রাঙ্কন, কাগজ প্রভৃতি খাতে ধার দেওয়া হইয়াছে	১৯৪৪৸/৭॥
আদায় (মুদ্রাঙ্কন কাগজ প্রভৃতি বাবতে বাকী আদায়)	১৫৯১/৫	বেতন হিঃ	৬৪৯৸৶১৫
প্রেসপ্রস্তুত হিঃ	১৪২।৶১০	সরঞ্জামি	৮১/১৭॥
কাগজ বিক্রয় হিঃ	৩৮২।০	বিবিধ	৯॥২॥
গৃহপ্রস্তুত হিঃ	৩০৲	ডাকমাশুল	১৶০
প্যাকিং হিঃ	২॥/১০	কাগজ খরিদ	৩৬৬৸/১৫
কর্জ্জ জমা	২৫০০৲	প্রেস প্রস্তুত	১৪৪৸
হাওলাত জমা	১০০৪/০	সুদ	৬৯৲
		বাটী ভাড়া	৩০৲
		ওয়ারাণ্টিয়ার	১২৬৲
		ছাড়	১।০
	৬৯২০॥৫	কর্জ্জ শোধ	২৫০০৲
গত ত্রৈমাসিকের স্থিত	৪।৶২॥	হাওলাত শোধ	৯৮৫॥৶১৫
			৬৯১০৲১৭॥
		স্থিত	১৪৸/১০
মোট	৬৯২৪৸৶৭॥	মোট	৬৯২৪৸৶৭॥

আয় ব্যয়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

ইণ্ডিয়ান মেসেঞ্জার।

আয়-		ব্যয়-	
মূল্যপ্রাপ্তি	৪৩০/০	কর্ম্মচারীর বেতন	১০৯৲
বিজ্ঞাপন	৪৭৲	মুদ্রাঙ্কন	৯০৲
নগদ বিক্রয়	॥৶১০	কাগজ	৮৮৶১০
ডাকমাশুল ফেরৎ জমা	৭।০	কমিশন	৮।০
বিবিধ হিঃ	২॥৶০	ডাকমাশুল	৯৯৶০
		বিবিধ	২৪।৫
	৪৮৭॥/১০		৪১৮৸১৫
গত ত্রৈমাসিকের স্থিত	৩৮০৸০	হাওলাত ও সপেন্সস্	৩২৩।৶০
			৭৪২৶১৫
		স্থিত	১২৬৶১৫
মোট	৮৬৮।/১০	মোট	৮৬৮।/১০

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ।

আয়

সভ্য ও সহযোগিগণের চাঁদা আদায়		৩০৭৻১০
বার্ষিক	১৯০৸৶১৫	
মাসিক	১১৬৻১৫	
	৩০৭৻১০	
প্রচারার্থ দানপ্রাপ্ত		৩৬৯।৵০
বার্ষিক	৭৩॥০	
মাসিক	১৮২৲	
এককালীন	১১৩৸৵০	
	৩৬৯।৵০	
প্রচারক গৃহ		১১৭॥/১৫
	৭২॥০	
কাঠের গৃহ হিঃ ফেরত	৪৫/১৫	
	১১৭॥/১৫	
সুদ		১৯৩॥
জন্ম রেজেষ্টরি ফি		৸
পাথের		২৮৲
বিবিধ		১৩৯৲
সিটিকলেজ বৃত্তি		৭৯॥০
ব্রাহ্মসমাজ লাইব্রেরী		॥০
খাসিয়া মিশন		৯।০
দুর্গাময়ী ফণ্ড		১০৲
সুজাতা বৃত্তি		৪৪৲
সম্পাদক কলিকাতা উপাসক মণ্ডলী		
হাওলাত আদায়		৭৫৲
বিল্ডিং ফণ্ড		
সম্পাদকের নিকট হইতে ফেরত		৯৭।৵১০
স্থায়ী প্রচার ফণ্ড		২৯॥০
তত্ত্ব-কৌমুদী		১৮০৸৵৫
ইণ্ডিয়ান মেসেঞ্জার		১২৬৵১৫
		১৮০৭৶১৫
হাওলাত ও সস্‌পেন্স		২১৭৬৵০
		৩৯৮৩॥/১৫
বিগত ত্রৈমাসিকের স্থিত		১৫৭২।০
সমাজ ফণ্ড	৭৯৫।০	
মেসেঞ্জার	৩৮০৸০	
তত্ত্ব-কৌমুদী	২৩৩৻১০	
পুস্তক	১৬৩৶১০	
	১৫৭২।০	
মোট		৫৫৫৫৸/১৫

ব্যয়

প্রচার		৫৪৬।০
কর্ম্মচারীর বেতন		১২০৲
কমিশন		৭৶০
ডাকমাশুল		৫।১০
প্রচার গৃহ		৫৸/১০
বিবিধ		৩০৫/০
(উৎসব কার্য্যালয়ের আসবাব চিকাগোতে, তারে সংবাদ, বার্ষিক কার্য্যবিবরণ প্রভৃতিতে ব্যয়)		
সুদ		১৫৲
পাথের		২৮৲
ট্রাষ্টডীড্ মুদ্রাঙ্কন		৩৷৵০
সিটি কলেজ বৃত্তি		৮২॥০
সৌদামিনী বৃত্তি		১০৲
সুজাতা বৃত্তি		৪৪৲
দুর্ভিক্ষ		১০৫॥/০
খাসিয়া মিশন		২৫৶১০
বাগআঁচড়া মিশন		৫।৵০
কলিকাতা উপাসক-মণ্ডলী		১৪৵০
ব্রাহ্মমিশন প্রেস		২৫০০৲
		৩৮২২৸১০
হাওলাত ও সস্‌পেন্স		১২৬৯৸৫
		৫০৯২॥১৫
হস্তোস্থিত		৪৬৩।/০
সমাজ ফণ্ড	১৫৬।০	
মেসেঞ্জার	১২৬৵১৫	
তত্ত্ব-কৌমুদী	১৮০৸৵৫	
	৪৬৩।/০	
মোট		৫৫৫৫৸/১৫

তত্ত্ব-কৌমুদী

আয়		ব্যয়	
মূল্যপ্রাপ্তি	২৮৪॥৶১০	কর্ম্মচারীর বেতন	১২৮৲
নগদ বিক্রয়	২॥০	মুদ্রাঙ্কন	৫৪৲
ডাকমাশুল	৶০	কাগজ	১০০॥/১০
		কমিশন	৮৸/১০
	২৮৭।৵১০	ডাকমাশুল	৩৭॥/০
গতত্রৈমাসিকের স্থিত	২৩৩৻১০	বিবিধ	১০॥৻৫
			৩৩৯: ৫
		স্থিত	১৮০৸৵৫
মোট	৫২০৶০	মোট	৫২০।৶০

পুস্তকের ফণ্ড ;

আয়		ব্যয়	
নগদ বিক্রয়	২০৮।৶০	অপরের পুস্তক বিক্রয়ের মূল্য শোধ	১৩॥৶০
ঐ অপরের	৩৬৵১০	পুস্তক ক্রয়	৬৪৫৲
বাকী মূল্য আদায়	৫২।৵১০	কর্ম্মচারীর বেতন	৬২৲
ডাকমাশুল	৬৵১০	মুদ্রাঙ্কন	৫৪॥০
কমিশন	২।৶০	ডাকমাশুল	৭॥৶৫
বিবিধ	।/১০	পুস্তক বাঁধাই	৫০৲
	৩০৫৸৶০	কমিশন	১৮৻১৫
হাওলাত ও সসপেন্স	৪৩৮/৫	কাগজ	৫০॥/১০
সমাজ হিঃ হইতে হাওলাতের অংশ ফেরত	১৩৪/৫	বিবিধ	১॥৶৫
মেসেঞ্জার হিঃ হইতে ঐ ঐ ঐ	৩০০৲	হাওলাত ও সস্‌পেন্স	৪৲
	৪৩৪/৫		
গচ্ছিত	৪৲		
	৪৩৮/৫		
	৭৪৪ ৻৫		
গত ত্রৈমাসিকের স্থিত	১৬৩৶১০		
মোট	৯০৭৶১৫	মোট	৯০৭৶১৫

ব্রাহ্মসমাজ।

রাজা রামমোহন রায়ের স্মরণার্থ সভা।

গত ২৭শে সেপ্টেম্বর অপরাহ্ন ৬॥ টার সময় নিলফামারিস্থ ব্রাহ্মসমাজ গৃহে রাজা রামমোহন রায়ের মৃত্যুদিন উপলক্ষে একটী সভা হয়। সভায় স্থানীয় প্রথম মুনসেফ মাননীয় শ্রীযুক্ত বাবু উমানাথ ঘোষাল মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। বাবু রজনীকান্ত সরকার বি, এল ও বাবু বিশ্বেশ্বর গুপ্ত রাজার সৎগুণাবলী আলোচনা করিয়া দুইটী সুদীর্ঘ প্রবন্ধ পাঠ করেন। তৎপর অন্যান্য দুই একজনেও রাজার মহত্ত্বের বিষয় কিছু কিছু বলেন। সর্ব্বশেষে সভাপতি মহাশয় রাজার জীবনের অধ্যায়িকা অবলম্বন করিয়া একটী বক্তৃতা করার পর ৯॥ টার সময় সভা ভঙ্গ হয়।

বিগত ২৭শে সেপ্টেম্বর অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকার সময়ে কাকিনীয়া ছাত্রসমাজ গৃহে একটী সভা হয়; অনেক ভদ্রলোক এবং ছাত্র উপস্থিত ছিলেন। অত্রস্থ ইংরেজী স্কুলের হেড মাষ্টার উক্ত মহাত্মার জীবনী সম্বন্ধে একটী বক্তৃতা করেন।

বিগত ২৭শে সেপ্টেম্বর বুধবার অপরাহ্ণ ৬॥ ঘটিকার সময়ে বরিশাল ব্রজমোহন কলেজ গৃহে মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের স্মরণার্থ এক সভার অধিবেশ হইয়াছিল। স্থানীয় মুন্সেফ বাবু নীতিকণ্ঠ মল্লিক মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। বাবু অশ্বিনীকুমার দত্ত এম্ এ, বি এল, বাবু সত্যানন্দ দাস বি, এ, ও বাবু মনোমোহন চক্রবর্ত্তী রাজার জীবন ও কার্য্য সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়াছিলেন।

বহরমপুর কলেজে ছাত্রদের উদ্যোগে রামমোহন রায়ের মৃত্যু দিবস উপলক্ষে গত বুধবারে বিরাট সভা হইয়া গিয়াছে। সন্ধ্যা ৭ টার সময় এত লোক হইয়াছিল যে, অনেক কষ্টে অনেকে দাঁড়াইতে স্থান পাইয়াছিলেন। সভাপতি বাবু দীননাথ গাঙ্গুলী। বক্তা বাবু ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, গৌরবল্লভ সেন, মাধবচন্দ্র তর্কসিদ্ধান্ত, নফরচন্দ্র রায়।

বিগত ২৭শে সেপ্টেম্বর বুধবার রাত্রে কাঁথি হাই স্কুল গৃহে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট উকীল বাবু উপেন্দ্রনারায়ণ মজুমদার এম্ এ, বি, এল, ও মুন্সেফীর সেরেস্তাদার বাবু তারকচন্দ্র ঘোষ কর্ত্তৃক "মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের স্মরণার্থ সভা" আহুত হইয়াছিল। হেড মাষ্টার বাবু তারকগোপাল ঘোষ বি, এ, কর্ত্তৃক "মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের জীবনের মহত্ব" হৃদয়গ্রাহী রূপে বিবৃত হইয়াছিল। স্থানীয় সিনিয়ার মুন্সেফ শ্রীযুক্ত বাবু হরকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল, সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া এবং স্থানীয় অপরাপর অনেক ভদ্রমণ্ডলী সভায় যোগ দান করিয়া রাজার মহত্বের প্রতি আপনাদিগের হৃদয়ের শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। বক্তৃতা প্রায় ২ ঘণ্টা ব্যাপী হইয়াছিল।

বিগত ২৭শে সেপ্টেম্বর বুধবার মহেশতলা উচ্চ শ্রেণী বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ সমবেত হইয়া রাজা রামমোহন রায়ের মৃত্যুদিন উপলক্ষে এক সভা করেন। সভাস্থলে প্রধান শিক্ষক এবং হেড পণ্ডিত মহাশয় উপস্থিত ছিলেন। সুযোগ্য শিক্ষক বাবু রাজেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

মহাত্মা রামমোহন রায়ের মৃত্যুদিন উপলক্ষে বিগত ২৭শে সেপ্টেম্বর বুধবার রাঁচি ব্রাহ্মসমাজ ভবনে, উক্ত মহাত্মার মহত্ব অনুধ্যান ও গুণাবলী আলোচনা জন্য, প্রায় ২০ জন ভদ্রলোক, ও ১৬টী স্কুলের ছাত্র সমবেত হইয়াছিলেন। বাবু রাজকুমার দাস, এম, এ, গবর্ণমেণ্ট স্কুলের ২য় শিক্ষক মহাশয় রাজার গুণাবলী আলোচনা করিয়াছিলেন।

গত ২৭শে সেপ্টেম্বর ময়মনসিংহে সূর্য্যকান্ত হলে কতিপয় গণ্যমান্য লোকের উদ্যোগে মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের স্মরণার্থ এক সভা হইয়াছিল। সভায় সহরের সম্ভ্রান্ত অনেক লোক উপস্থিত ছিলেন। মিউনিসিপাল চেয়ারম্যান, উকীল বাবু শ্যামাচরণ রায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। তিনি বিষয়টীর গাম্ভীর্য্য গম্ভীর ভাবে বুঝাইয়া দিলে সঙ্গীতের পর সিটিস্কুলের একজন শিক্ষক কবিতা পাঠ করেন। তৎপরে বাবু অক্ষয়কুমার মজুমদার এম এ, বি এল, মহাত্মার জীবন-বিষদভাষায় সুশৃঙ্খলার সহিত বিবৃত করেন। বাবু শ্রীনাথ চন্দ, বাবু অমরচন্দ্র দত্ত ও পণ্ডিত উমেশচন্দ্র বিদ্যারত্ন কিছু কিছু বলিয়া ছিলেন। রাজা রামমোহন রায় সম্বন্ধে এখানে তদ্রূপ সভা এই প্রথম। এ সভায় বিভিন্ন শ্রেণীর লোক যোগ দেওয়ায় আমরা সন্তুষ্ট হইয়াছি।

লাহোর, বোম্বাই এবং মান্দ্রাজস্থ ব্রাহ্মসমাজ রাজা রামমোহন রায়ের ষষ্টিতম মৃত্যুৎসব করিয়াছিলেন। ২৪ পরগণার অন্তর্গত মজিলপুর গ্রামে রাজার মৃত্যুদিনে এক সভার অধিবেশন হইয়াছিল।

সঞ্জীবনী।

বিগত ২৭ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যা ৭॥ ঘটিকার সময়ে মেদিনীপুর পাবলিক লাইব্রেরিস্থ বেলীহল গৃহে মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের স্মরণার্থ একটী সভা আহুত হইয়াছিল। স্থানীয় কলেজের শিক্ষক বাবু অভয়চরণ বসু সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সর্ব্ব প্রথমে "কোথা আছ, দেখ এসে মহামতি রামমোহন। তোমার জন্মভূমি ভারতভূমি হয়েছে কি সুশোভন" এই সুন্দর সঙ্গীত গীত হইবার পরে, সভাপতি মহাশয় রাজার জীবনী সম্বন্ধে একটী মন্তব্য প্রকাশ করেন। রাজা রামমোহন রায় যে কেবল ব্রাহ্মদিগেরই স্মরণীয় তাহা নহে, কিন্তু সমুদয় বাঙ্গালি জাতি তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ, ইহা সভাপতি মহাশয় সুন্দররূপে বিবৃত করেন। তৎপরে বক্তা বাবু হীরালাল বন্দ্যোপাধ্যায় রাজার জীবনী অতি সুন্দররূপে বর্ণনা করেন। বক্তা, রাজার অসাধারণ অধ্যবসায় ও পরিশ্রমশীলতা, তাঁহার প্রবল জ্ঞানতৃষ্ণা এবং বিশ্বজনীন প্রেম ও উদারতা, প্রভৃতি মহৎ গুণাবলি, সভাস্থ, সমুদয় ভদ্র মহোদয়দিগকে অতি সুন্দররূপে হৃদয়ঙ্গম করাইয়া দেন। বক্তৃতা সমাপ্ত হইলে, সভাস্থ ভদ্রমহোদয়গণের মধ্য হইতে কেহ কেহ কিছু বলেন। পরিশেষে রাজার স্বরচিত একটী সঙ্গীত গীত হইবার পর সভা ভঙ্গ হয়। সভাস্থলে, কতিপয় গণ্য মান্য ভদ্র মহোদয়ের সমাবেশ হইয়াছিল এবং সভাস্থ সকলেই ইহাতে সুখানুভূতি প্রকাশ করিয়াছিলেন।

বর্দ্ধমান মিউনিসিপালিটির টাউন হলে এক সভা আহুত হয়। স্থানীয় ব্রাহ্মগণের আহ্বান অনুসারে কলিকাতা হইতে বাবু বিপিনচন্দ্র পাল তথায় গমন করিয়া বক্তৃতা প্রদান করেন।

ঝান্সী প্রার্থনা সমাজে এক সভা হয়, সমাজের সম্পাদক মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় সম্বন্ধে প্রবন্ধ পাঠ করেন।

খসিয়া পাহাড়ে এক সভা হয়, বাবু নীলমণি চক্রবর্ত্তী বক্তৃতা প্রদান করেন।

শ্রাদ্ধ—জলপাইগুড়ির ষ্টেশন মাষ্টার আমাদের বন্ধু বাবু নিমচান্দ দে পরলোকে গমন করিয়াছেন। যদিও হিন্দু সমাজে ছিলেন ; কিন্তু নিমচাঁদ বাবু ব্রাহ্মধর্ম্ম এবং ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে ইহাঁর প্রাণের ঐকান্তিক যোগ ছিল। স্থানীয় ব্রাহ্মসমাজের তিনি সম্পাদক ছিলেন। ব্রাহ্মঅতিথিদিগকে তিনি সমাদরের সহিত আপন গৃহে স্থান প্রদান করিয়া আপ্যায়িত করিতেন। স্বীয় কার্য্য দক্ষতা, সচ্চরিত্রতা, এবং ন্যায় পরায়ণতার গুণে রেলওয়ে কর্ত্তৃপক্ষীয়দিগের নিকট বিশেষ প্রশংসা এবং সম্মান লাভ করিয়াছিলেন। ইহার সহৃদয়তা, এবং দয়াশীলতা অনেকেরই অনুকরণের যোগ্য। কয়েকটি, দরিদ্র বালকের এবং ইহাঁর একটি দূর সম্পর্কীয় আত্মীয় পরিবারের ভরণপোষণের সম্পূর্ণ ভার ইনি স্বয়ং গ্রহণ করিয়াছিলেন। তদ্ভিন্ন ৩।৪ জন আফিসের অল্প বেতনের কেরাণী ইহাঁর বাসায় প্রত্যহ আহারাদি করিতেন। সরলতা, চরিত্রের পবিত্রতা, এবং দয়া ও ন্যায় পরায়ণতার গুণে জলপাইগুড়ির ছোট বড় সকল প্রকার লোকের সঙ্গেই ইহাঁর সৌহার্দ্য ছিল। সহরের সাহেব বাঙ্গালী সকলেই ইহাঁকে ভাল বাসিতেন—শ্রদ্ধা করিতেন। ইহাঁর আত্মার কল্যাণার্থ জলপাইগুড়ির ব্রাহ্মবন্ধুগণ সমবেত হইয়া একদিন উপাসনাদি করিয়াছিলেন। পরমেশ্বর ইহাঁর শোক সন্তপ্ত পরিবারে শান্তি দান করুন।

কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করা যাইতেছে বিক্রমপুরের দুর্ভিক্ষ নিবারণার্থে নিম্নলিখিত রূপ দান প্রাপ্ত হইয়াছি।

দাসাশ্রমের দ্বারা আদায়	১৮৲
শ্রীমতী রুক্মিণী মহলানবিশ, কলিকাতা	
বাবু হরচন্দ্র চৌধুরী, শেরপুর	১০৲
„ মোহিনীকুমার দাস, বগুড়া হইতে	১৬৲
„ উমেশচন্দ্র দত্ত, কলিকাতা	
একটী ভদ্রমহিলা	

দুর্ভিক্ষ-নিবারণের জন্য সাহায্য প্রার্থনা।

পূর্ব্ববাঙ্গালার ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বিশেষতঃ ঢাকা জিলার অন্তঃপাতী বিক্রমপুরে ভয়ানক অন্নকষ্ট উপস্থিত হইয়াছে। ইতিপূর্ব্বে প্রবল বন্যায় গরিব লোকদিগের এবং গোবৎসাদির যে ভয়ানক কষ্ট উপস্থিত হইয়াছিল তাহা স্মরণ হইলেও হৃদয় বিদীর্ণ হয়। যাহাদের ঘরে ধান ছিল তাহারাও জলের জন্য ধান ভানিতে অক্ষম হইয়া অনাহারে দিন কাটাইয়াছে। যাহাদের কিছু ছিল না তাহাদের কষ্ট সহজেই বুঝিতে পারা যায়। সম্প্রতি প্রায় ২৬।২৭ শত লোক দিনান্তে এক বেলাও আহার পায় না। বিক্রমপুরের কয়েকজন ধনী আপনাপন গ্রামের লোকদিগের সাহায্য করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন এবং গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে অনেক পরিমাণে সাহায্য করিতেছেন ; কিন্তু এ সকল সাহায্যে সমস্ত বিক্রমপুরের দুর্ভিক্ষপীড়িত লোকের অভাব ঘুচিতেছে না।

পূর্ব্ববাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজ ওয়ার্কিং কমিটী নামে একটি কমিটী স্থাপন করিয়া বিক্রমপুরে সাহায্য করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছেন। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যনির্ব্বাহক সভা এই সংবাদ পাইয়া উক্ত কমিটীর নিকট আপাততঃ ১০০৲ এক শত টাকা প্রেরণ করিয়াছেন। কিন্তু শীঘ্র শীঘ্র টাকা পাঠাইতে না পারিলে অনেক লোকের মৃত্যু হওয়া অসম্ভব নহে। এ সকল স্থানে উপযুক্তরূপে সাহায্য করিতে হইলে বহু অর্থের প্রয়োজন। এখনও কার্ত্তিক ও অগ্রহায়ণ এই দুই মাস কাল সাহায্য করিতে হইবে। কার্য্যনির্ব্বাহক সভা একমাত্র জগদীশ্বরের কৃপা ও সহৃদয় দাতাদিগের সাহায্যের উপর নির্ভর করিয়া এই গুরুতর কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। এইরূপ দুর্ভিক্ষের দ্বারা জগদীশ্বরের কি মঙ্গল অভিপ্রায় সুসম্পন্ন হয়, তাহা আমরা স্পষ্টরূপে বুঝিতে পারি না। কিন্তু একটি কথা বুঝিতে পারা যায় যে অনাহারে ক্লিষ্ট ভ্রাতা ভগিনীদিগের আর্ত্তনাদে আমাদের হৃদয় বিগলিত হয় কি না এবং আমাদের অন্ন হইতে একমুষ্টি অন্ন দিয়া ক্ষুধার্ত্ত ভ্রাতা ভগিনীদিগের ক্ষুধা নিবৃত্তি করিতে চেষ্টা করি কি না, তাহা তিনি এই সকল ঘটনা দ্বারা আমাদিগকে দেখাইয়া দেন। যাঁহারা সুখ স্বচ্ছন্দে দিন যাপন করিতেছেন, তাঁহারা সকলে যদি এবিষয়ে মনোযোগী হন তাহা হইলে অনায়াসে অনেক দুঃখীর দুঃখ মোচন হইতে পারে। পূর্ব্ব পূর্ব্ব দুর্ভিক্ষ উপলক্ষে দেশহিতৈষী দাতাগণ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের দুর্ভিক্ষ ফণ্ডে অর্থাদি দান করিয়া যেমন অনেক বিপন্নের বিপদ-উদ্ধার ও মুমূর্ষুর প্রাণ-রক্ষার সহায়তা করিয়াছেন আশা করি এবারেও সেইরূপ করিবেন।

যিনি যাহা দিতে ইচ্ছা করেন অনুগ্রহ পূর্ব্বক সত্বর নিম্ন স্বাক্ষরকারীর ঠিকানায় পাঠাইলে আন্তরিক কৃতজ্ঞতার সহিত গৃহীত হইবে। আমাদের নিকট টাকা আসিলে আমরা দুর্ভিক্ষপীড়িত স্থানে তাহা পাঠাইয়া দিব। পূর্ব্ব বঙ্গের অন্যান্য স্থানেও দুর্ভিক্ষ হইয়াছে। কিন্তু বিক্রমপুরের লোকের কষ্ট বেশী পরিমাণে হইয়াছে বলিয়া আমরা সেস্থানেই এখন সাহায্য করিতে সংকল্প করিয়াছি। টাকা অধিক আসিলে আমরা অন্যান্য স্থানেও টাকা পাঠাইতে চেষ্টা করিব। যাহাতে দুর্ভিক্ষফণ্ডের টাকা কোনও রূপে অযথা ব্যয় বা অপব্যয় না হয় সে বিষয়ে আমরা বিশেষ দৃষ্টি রাখিব। নিবেদন ইতি

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ কার্য্যালয়
২১১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট
কলিকাতা।
২৪এ আশ্বিন ১৩০০

নিবেদক
মহালানবিশ
সম্পাদক, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ

বিজ্ঞাপন।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অধ্যক্ষ সভার সভ্য নির্ব্বাচন সম্বন্ধীয় অবান্তর নিয়মের দ্বিতীয় নিয়মানুসারে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্যদিগকে জানান যাইতেছে যে, যাঁহারা আগামী বৎসরের (১৮৯৪ সনের) জন্য অধ্যক্ষ সভার সভ্য মনোনীত হইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা আগামী ২০এ নবেম্বর তারিখের মধ্যে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যালয়ে আপনাদের নাম ধামাদি প্রেরণ করিবেন। এই তারিখের পরে আর কাহারও নাম গৃহীত হইবে না। প্রার্থিগণের আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্ম হওয়া আবশ্যক।

২১১নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট,
২৯এ সেপ্টেম্বর ১৮৯৩
সাঃ ব্রাঃ সমাজ কার্য্যালয়।

শ্রীগুরুচরণ মহলানবিশ
সম্পাদক সাঃ ব্রাঃ সমাজ।

২১১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, ব্রাহ্ম মিশন যন্ত্রে শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দত্ত কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও ১লা কার্ত্তিক প্রকাশিত।

ধর্ম্ম ও সমাজতত্ত্ব বিষয়ক পাক্ষিক পত্রিকা।

১৩শ সংখ্যা
১৬শ ভাগ।

১৬ই কার্ত্তিক, মঙ্গলবার, ১৮১৫ শক, ব্রাহ্ম সম্বৎ ৬৪।

বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২॥
মফস্বলে ৩
প্রতি খণ্ডের মূল্য ৵০

কাছে থাক।

কোন পথে যাই ভগবান?
গভীর আঁধার ঠেলি, ইচ্ছা তব পথে চলি,
শত বাধা বিঘ্ন আসি দাঁড়ায় সম্মুখে,
ভীষণ পাষাণ দেয় চাপাইয়া বুকে!
বসে পড়ি, হয়ে ম্রিয়মান,
কোন পথে যাই ভগবান?

চারিদিক্ গভীর আঁধার;—
বিপন্ন দেখিয়া মোরে, শত মায়া-মূর্ত্তি ধরে,
শত প্রলোভন লয়ে, অরাতি নিচয়,
হুকারি গ্রাসিছে মোর সমগ্র হৃদয়!
গতি, পিতা কি হবে আমার?
চারিদিক্ গভীর আঁধার।

এস পিতা, তুমি এস কাছে;—
এ আঁধার দূর করি, ক্ষুদ্র দুই বাহু ধরি,
লয়ে যাও তবালোকে তোমারি সুপথে!
ছুটে যাই মহোল্লাসে পূর্ণ মনরথে,
তুমি বিনা আর কেবা আছে?
এস পিতা, তুমি এস কাছে।

হও মম জীবন-সম্বল;
তব শক্তি-স্পর্শ লাগি, উৎসাহে উঠুক জাগি,
অবসন্ন দীন হীন ক্ষুদ্র মোর প্রাণ;
ক্ষুদ্র তৃণ হয়ে যাক্ দুর্জ্জয় পাষাণ
দূরে যাক্ পাপ কোলাহল!
হও মম জীবন-সম্বল।

সম্পাদকীয় মন্তব্য।

আত্ম-মন্দির—বিশ্বাসী মুসলমানগণ মক্কা নগরস্থ কাবা মন্দিরকে অতিশয় ভক্তির চক্ষে দেখিয়া থাকেন। তাঁহারা মনে করেন যে স্বর্গে ঐ আকারের কবি প্রস্তর নির্ম্মিত একটী মন্দির আছে, তাহারই অনুসারে কাবা মন্দির বিনির্ম্মিত হইয়াছে। বর্ষে বর্ষে বহুসংখ্যক যাত্রী মক্কাস্থ কাবামন্দিরে ঈশ্বর-দর্শন-লালসাতে সমাগত হইয়া থাকে। একবার একজন যাত্রী, অপরাপর যাত্রী সমভিব্যাহারে মক্কা নগরে উপস্থিত হইল। সে আশা করিল যে কাবামন্দিরে তাহার ঈশ্বর-দর্শন হইবে। কিন্তু সেই জনকোলাহল, ও বিষয় বাণিজ্যের আড়ম্বরের মধ্যে সে কাবামন্দিরে বিশেষভাবে ঈশ্বরকে দেখিতে পাইল না। যখন সে দুঃখিত অন্তরে মন্দির প্রদক্ষিণ করিতেছে, তখন যেন ভিতর হইতে দৈববাণী হইল, তুমি নিজ গৃহে প্রতিনিবৃত্ত হও, সেখানে তোমার দেবমন্দির দেখিতে পাইবে। সে ব্যক্তি স্বীয় ভবনে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া দেখিল যে ঈশ্বর সেখানে বিরাজিত রহিয়াছেন। পারস্য ভাষাতে লিখিত একখানি গ্রন্থে এই উপদেশটী প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই উপদেশের মধ্যে গভীর তাৎপর্য্য নিহিত আছে। উপদেশটী এই:—যে ব্যক্তি নিজ ভবনে ঈশ্বরকে দেখিতে না পাইয়া দূরদেশে তাঁহাকে দেখিতে গিয়াছে, তাহার জন্য ঈশ্বর কোনও স্থানেই নাই। আর যে অগ্রে তাঁহাকে গৃহে দেখিতে পায় সে তাঁহাকে দূরেও দেখিতে পায়। আত্ম-মন্দিরে, প্রকৃতি-রাজ্যে ও মানব-ইতিবৃত্তে এই ত্রিবিধ স্থানে আমরা সচরাচর ঈশ্বরকে দর্শন করিয়া থাকি। কিন্তু অগ্রে তাঁহাকে আত্ম-মন্দিরে দেখিলেই তাঁহাকে প্রকৃতিরাজ্যে ও মানব-ইতিবৃত্তে দেখিতে পাওয়া যায়। যে ব্যক্তি আত্ম-মন্দিরে তাঁহাকে দেখে না, সে তাঁহাকে কোথাও দেখিতে পায় না। আমরা যে জড়রাজ্যে ও মানব-ইতিবৃত্তে তাঁহার লীলা দর্শন করিব তৎপূর্ব্বে ত তাঁহার সহিত পরিচয় চাই, বিনা পরিচয়ে কাহার লীলা দেখিব? আত্মমন্দিরেই সেই পরিচয় অগ্রে হয়। গো মেষ ত প্রকৃতির শোভা দেখিয়া থাকে, তাহারা তন্মধ্যে অনন্তের আভাস দেখে না কেন? কারণ এই, তাহাদের অন্তরে অনন্তের পরিচয় নাই। এই কারণেই ঋষিগণ তাঁহাকে আত্মমন্দিরে দেখিবার জন্য বার বার উপদেশ দিয়াছেন।

কৃচ্ছ্র-সাধন—ঈশ্বরের প্রসন্নতা লাভ করিবার উদ্দেশে কৃচ্ছ্র সাধনের রীতি অনেক ধর্ম্মেই দেখিতে পাওয়া যায়। শরীর ও মনকে নিদারুণ নিগ্রহ করিলে তবে দেবতা প্রসন্ন হইয়া থাকেন। এই সংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া এদেশে ও

অপরাপর দেশে তপস্বিগণ অতি কঠোর সাধনা করিয়াছেন। আমাদের দেশে পুরাণে ও লৌকিক প্রবাদে কত কঠোর তপস্যার বিবরণ শুনিতে পাওয়া যায়। যাহা শুনিলে স্তম্ভিত হইয়া থাকিতে হয় যে মানব কি প্রকারে নিজ শরীর মনকে এতদূর নিগ্রহ করিতে পারে। অদ্যাপি এই ধর্ম্মপ্রবণ দেশে কত কৃচ্ছ্র-সাধন দেখা যাইতেছে। কত লোক ঊর্দ্ধবাহু হইয়া রহিয়াছেন, কত লোক পঞ্চতপা হইতেছেন, কত লোক শঙ্কাল নির্ম্মিত শয্যাতে শয়ন করিয়া রহিয়াছেন। কেবল যে এ দেশেই এ প্রকার তপস্যার প্রাচুর্য্য দৃষ্ট হইয়াছে তাহা নহে, যে ইউরোপ খণ্ড আজ সুখ সমৃদ্ধি, ও বিষয় বাণিজ্যের বিস্তারের জন্য প্রসিদ্ধ, যেখানে বিষয় সুখ পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়াছে বলিয়া মনে করা যাইতে পারে, সেই ইউরোপ খণ্ডেও এক সময়ে তপস্বিগণ কঠোর তপস্যা করিয়াছেন। খ্রীষ্টীয় সন্ন্যাসিগণ বৌদ্ধ যতিদিগের ন্যায় মরুপ্রান্তে ও গিরিগহ্বরে বাস করিয়া দুরন্ত তপস্যা করিয়াছেন, যাহা শ্রবণ করিলে চিত্ত চমকিত হয়। বর্ত্তমান সময়ে লোকে কৃচ্ছ্র সাধনের প্রয়োজনীয়তা তত অনুভব করেন না। দেহকে বা হৃদয়কে নিগ্রহ করিলে যে ঈশ্বর প্রসন্ন হন, এ বিশ্বাস আর দেখিতে পাওয়া যায় না। যাঁহারা কৃচ্ছ্র সাধনের পক্ষ, তাঁহাদের ভাবের মধ্যে প্রবেশ করিলে, দেখা যায় যে তাঁহারা দুই কারণে এই প্রকার পথ অবলম্বন করিয়া থাকেন। প্রথমতঃ তাঁহারা বিশ্বাস করেন যে কামনার বিষয় হইতে চিত্তকে দূরে না লইলে, কামনার অগ্নি কথনই নির্ব্বাণ হয় না। শাস্ত্রে কহিয়াছেন,—

"ন জাতু কামঃ কামানমুপভোগেন শাম্যতি ;
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে।"

অর্থাৎ কামনার বিষয়ের উপভোগ দ্বারা কামনা কথনই নিবৃত্ত হয় না বরং অগ্নিতে ঘৃত দিলে যেমন তাহা আরও বৰ্দ্ধিত হয় সেইরূপ হইয়া থাকে। অতএব তাঁহাদের উপদেশ এই, যদি কামনাকে নিবৃত্তি করিতে চাও, তবে চিত্তকে বলপূর্ব্বক কামনার বিষয় হইতে বিচ্ছিন্ন কর। কৃচ্ছ্র সাধনের দ্বিতীয় যুক্তি এই যে ধন চাহিতেছ, তাহার জন্য যে তোমার প্রকৃত ব্যাকুলতা আছে, কিরূপে বুঝিব? যদি দেখি সেজন্য প্রাণ মন সমর্পণ করিয়াছ ;—দুষ্কর তপস্যা করিতেছ, তাহা হইলে বুঝিতে পারি যে তুমি তাহার প্রার্থী বটে। তপস্যার দ্বারা ব্যাকুলতারই পরিচয় হয়। ঈশ্বর এরূপ ব্যাকুলতা দেখিলেই প্রসন্ন হন। এই উভয় প্রকার যুক্তির মধ্যে যে কিয়ৎ পরিমাণে সত্য নাই, তাহা কে বলিবে? আমরা কি জীবনে সময়ে সময়ে অনুভব করি নাই, যে আমাদের চিত্ত যথন সুখাসক্তিতে নিতান্ত নিমগ্ন হয়, এবং আমরা যথন তাহা লক্ষ্য করি, তথন হয়ত বলপূর্ব্বক মনকে সেই সুখ হইতে বিচ্ছিন্ন করা আবশ্যক হয়। তথন অনিয়ন্ত্রিত সুখস্পৃহাকে নিয়ন্ত্রিত করিতে পারিলে, আমাদের আত্মশক্তি বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। এরূপ জিতাত্মা পুরুষদিগকে সুখস্পৃহা আর জীবনের লক্ষ্য ও কর্ত্তব্য পথ হইতে বিচ্যুত করিতে পারে না। এই কারণে সাধনের প্রারম্ভে অনেক সাধক সুখস্পৃহাকে দমন করিবার আশয়ে যে সুখ নিষিদ্ধ নহে তাহাকেও অনেক সময়ে বর্জ্জন করিয়া থাকেন। তাহা কেবল মনকে স্বীয় বশে আনিবার চেষ্টা মাত্র। এইরূপ দুষ্কর তপস্যার দ্বারা মানবের হৃদয় নিহিত ব্যাকুলতার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই কারণে লোকের ধর্ম্ম সাধনের পথে কিঞ্চিৎ পরীক্ষা ও ক্লেশ থাকে, তাহা অপ্রার্থনীয় নহে। এই জন্যই প্রাচীন কালের জ্ঞানিগণ শিক্ষার্থী শিষ্যদিগকে কঠিনরূপে পরীক্ষা করিয়া তবে গ্রহণ করিতেন। যাহারা দুঃখ ক্লেশ বহন করিয়া থাকিত, তাহারা জ্ঞানলাভের উপযুক্ত বলিয়া গৃহীত হইত। অতএব কৃচ্ছ্র সাধন দ্বারা ব্যাকুলতাই প্রকাশ পায়, তাহাতে সন্দেহ কি? আমরা শরীর মনের অকারণ নিগ্রহরূপ কৃচ্ছ্র সাধনের পক্ষপাতী না হইলেও আত্মার সংযম শক্তি বর্দ্ধিত করিবার নিমিত্ত কোনও কোনও স্থলে নির্দ্দোষ সুখকেও বর্জ্জন করা আবশ্যক বোধ করি। আত্মার সংযম শক্তি একবার বর্দ্ধিত হইলে আর এরূপ সাধনের প্রয়োজন থাকে না। তথন সুখ ভোগই কর, পরিহারই কর, কিছুতেই আত্মার স্বাধীনতা ও কর্ত্তৃত্ব শক্তি বিলুপ্ত হয় না।

শ্রবণ ও সাধন—সত্য শ্রবণ করিয়াছি অনেক, কিন্তু সাধন করিয়াছি অতি অল্প। আমাদের মধ্যে কত ব্যক্তিকে ক্ষোভের সহিত এরূপ কথা বলিতে হয়! বিদ্যাভ্যাস করিতে আরম্ভ করা অবধি অদ্য পর্য্যন্ত যত উপদেশ শ্রবণ করিয়াছি তাহা যদি ব্রীহি যবাদির ন্যায় রাশীকৃত করিতে পারা যাইত তাহা হইলে বোধ হয় হিমালয়কেও অতিক্রম করিত। প্রতিদিন প্রাতে কর্ণদ্বয় ও চক্ষুদ্বয় উন্মুক্ত করিয়া উত্থিত হইতেছি, জলস্রোতের ন্যায় কতদিক দিয়া কত উপদেশের স্রোত চক্ষু কর্ণে প্রবিষ্ট হইতেছে; রাজপথে কয়েক ব্যক্তি পরস্পর বাদানুবাদ করিতে করিতে যাইতেছে, কর্ণ পাতিয়া শুনি এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে হিত কথা বলিতেছে, ধর্ম্ম বা নীতির নিয়মানুসারে উপদেশ দিতেছে; এইরূপ ধর্ম্ম ও নীতির উপদেশ যথা তথা আমাদের চক্ষুদ্বয় ও কর্ণদ্বয়কে আক্রমণ করিতেছে। কিন্তু বাহির হইতে চক্ষুদ্বয়কে আকর্ষণ করিয়া যদি ভিতরে প্রবেশ করি, যদি আত্মানুসন্ধান ও আত্ম-বিচারে প্রবৃত্ত হই, তাহা হইলে কি দেখিতে পাই? দেখি ঐ সকল সত্যের অতি অল্প অংশই প্রকৃতভাবে জীবনে সাধন হইয়াছে। শ্রুত সত্যকে জীবনে পরিণত করার নাম সাধন। যদি এক ব্যক্তি কেবল সমুদায় রাগ রাগিণীর স্বরলিপি মুখস্থ করিয়া রাখে, তদ্দ্বারা সে গায়ক বলিয়া সম্মানিত হইতে পারে না। যতক্ষণ স্বরলিপি-বদ্ধ রাগ রাগিণী কণ্ঠে ফলিত না হয়, ততক্ষণ সে ব্যক্তি গায়ক বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না। সেইরূপ যে ব্যক্তি কেবল ধর্ম্ম ও নীতির উচ্চ উচ্চ কথা লোকমুখে শুনিয়া রাখিয়াছে বা শাস্ত্রে পড়িয়া রাখিয়াছে, কিন্তু জীবন তদনুযায়ী করিতে পারে নাই, সেও ধার্ম্মিক বলিয়া পরিচিত হইতে পারে না। কাগজের স্বরলিপিকে কণ্ঠে আনা যেমন সংগীতের সাধন, সাধু মুখের বা গ্রন্থের সত্যকে সেইরূপ জীবনে আনা ধর্ম্ম জীবনের সাধন। এইরূপ সাধন পরায়ণ ব্যক্তিই সত্যের মহিমা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন;

অপরে পারে না। জগতের ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক মহাজনদিগের জীবনের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে দেখিতে পাই, তাঁহারা এক একজনে এক একটী পুরাতন সত্য জীবনে সাধন করিয়া সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। ঈশ্বর পিতা এ কথার ন্যায় প্রাচীন কথা কি ছিল? য়িহুদী জাতির মধ্যে তৎপূর্ব্বে কত ভক্ত ও প্রেমিকের মুখ দিয়া ঐ সত্য নির্গত হইয়াছে। কত শত শত লোকে শুনিয়াছে, উপেক্ষা করিয়াছে; যীশু তাহা সাধনের বস্তু বলিয়া অবলম্বন করিলেন এবং সাধনের গুণে তাহাতে সিদ্ধি লাভ করিলেন। এইরূপে ঈশ্বর মহান ও মানব তাঁহার দাস, এই প্রাচীন সত্যকে সাধনের দ্বারা মহম্মদ আয়ত্ত করিয়াছিলেন। আমাদের এক একবার মনে হয়, আজ পর্য্যন্ত যে সকল উচ্চ উচ্চ কথা শুনিয়াছি ও শিখিয়াছি, তাহা যদি ভুলিয়া যাইতে পারি, তাহা হইলে যেন ভাল হয়। আবার এক একটী করিয়া সত্য সাধনের দ্বারা আয়ত্ত করি। তাহা হইলে ধর্ম্ম জীবনের বাস্তবিক উন্নতি হইতে পারে। একটী বিদ্যালয়ের কোন শ্রেণীতে যে সকল বালক পাঠ করিত, তাহাদের মধ্যে একটী বালকের মেধাশক্তি কিঞ্চিৎ অল্প ছিল। কোনও বিষয়ের মর্ম্ম গ্রহ করিতে, তাহার অপেক্ষাকৃত অধিক বিলম্ব হইত। এজন্য শিক্ষক তাহার প্রতি মধ্যে মধ্যে অতিশয় বিরক্ত হইতেন। কিন্তু ঐ বালকের একটী গুণ এই ছিল যে সে একটী বিষয় পাকা করিয়া না বুঝিয়া অন্য বিষয়ে মনোনিবেশ করিতে পারিত না। যাহা বুঝিত তাহা পাকা করিয়াই বুঝিত। শিক্ষকের বিরাগভাজন হইলেও সে না বুঝিয়া বুঝিয়াছি বলিত না, কিংবা অন্য বিষয়ে মন দিত না। কিন্তু সেই শ্রেণীর অনেক বালক শিক্ষকের ভয়ে ও নিজেদের অসহিষ্ণুতা বশতঃ একটা বিষয় ভাল করিয়া না বুঝিয়াও অন্য বিষয়ে ধাবিত হইত। চরমে এই দাঁড়াইল যে ঐ প্রথমোক্ত বালকটীই সকলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া পারগণিত হইল। সে যেটুকু শিখিল, তাহাতে পরিপক্ব ব্যুৎপত্তি জন্মিল। ধর্ম্ম সাধন সম্বন্ধেও এইরূপ। বহুসংখ্যক অসার ও অসহিষ্ণু লোক এরূপ আছে, যাহারা কেবল সত্য শুনিয়াই সন্তুষ্ট, পাকারূপে সাধনের দ্বারা আয়ত্ত করিতে ইচ্ছুক নহে; আবার কতকগুলি লোক এরূপ আছে, যাহারা একটী বিষয় সাধন না করিয়া বিষয়ান্তরে চিত্ত নিবেশ করিতে পারে না। একটী অগ্রে ভাল করিয়া সাধন করি পরে, আর একটী দেখিব, এই তাঁহাদের মনের ভাব। এই প্রকার ভাব ধর্ম্ম সাধনের অনুকূল।

শক্তির দায়িত্ব—পুত্তিকারা বল্মীক নির্ম্মাণ করে, মধুমক্ষিকারা মধুর চক্র নির্ম্মাণ করে, তাহাদের প্রত্যেক মুহূর্ত্তের কার্য্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যায় যে প্রত্যেকে স্বীয় স্বীয় কার্য্যে মনোযোগী, যাহার যেটুকু করিবার আছে সে সেটুকু সুচারুরূপে ও সর্ব্বাঙ্গ-সম্পন্নরূপে করিতেছে। প্রত্যেকে আপনার অংশটুকু সুন্দররূপে করে বলিয়াই, সমগ্র বস্তুটী সুন্দর হয়। মানব-সমাজের উন্নতিরও ঐ নিয়ম। আমাদের প্রত্যেকের যে অংশটুকু করিবার আছে যদি আমরা তাহা সুন্দররূপে করি তাহা হইলে সমগ্র সমাজের উন্নতি সুন্দররূপেই সাধিত হইতে পারে। বহু বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে কার্য্য করা বা বহুসংখ্যক লোকের উপকার করা সকলের ভাগ্যে ঘটে না; সেরূপ প্রতিভা লইয়া সকলে জন্মগ্রহণ করে না, এবং সুযোগও সকলে পায় না। কিন্তু এরূপ সামান্য মানব কেহ নাই, এরূপ হীনাবস্থাপন্ন কেহ নাই যাহার জীবনের একটু ক্ষেত্র নাই এবং সেই ক্ষেত্রে কিছু করিবার নাই। এক বিন্দু জলের মধ্যে যে অগণ্য কীটাণু বাস করে, তাহাদেরও প্রত্যেকের জীবনের ক্ষেত্র আছে, কার্য্য আছে। অতএব তুমি যতই সামান্য ও হীনাবস্থাপন্ন হও না, তোমার নিজ জীবনে প্রতিদিনের কর্ত্তব্য অনেক কাজ আছে। বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র পাইলে না বলিয়া ক্ষোভে সময় ক্ষয় না করিয়া যদি তুমি এই প্রতিজ্ঞারূঢ় হও যে তোমার জীবনক্ষেত্রে যতটুকু কর্ত্তব্যভার তোমার উপরে পড়িয়াছে সেইটুকু তুমি সুচারুরূপে সম্পাদন করিবে, তাহা হইলে নিজ বিবেকের ও ঈশ্বরের প্রসন্নতা লাভ করিতে পার এবং ক্রমে তোমার সেই কার্য্য সমগ্র মানবসমাজের উন্নতির অঙ্গ স্বরূপ হইতে পারে। লোকে দেখুক আর না দেখুক আমার জীবনটুকু আমি সুন্দররূপেই গঠন করিব, এরূপ প্রতিজ্ঞা মনুষ্যোচিত। আর যাঁহারা এই পৃথিবীতে মনুষ্যত্ব লাভ করিয়াছেন, সারবান জীবন প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহারা সকলে এইরূপ প্রতিজ্ঞার সহিত কার্য্য করিয়াছেন। এ উপদেশ অতি প্রাচীন উপদেশ। ঈশ্বর আমাদের দেহ মনে যে কিছু শক্তি সামর্থ্য দিয়াছেন তাহা কৃপণের ধনের ন্যায় পুতিয়া রাখিবার জন্য দেন নাই। সে সকলের নিয়োগেরদ্বারা নিজের ও অন্যের কল্যাণ সাধনের জন্যই দিয়াছেন। এই সকল শক্তি যে আমরা লাভ করিয়াছি তাহার সঙ্গে সঙ্গে এক প্রকার দায়িত্বও আছে। আমরা সে সকলকে সমুচিতরূপে ব্যবহার করিবার জন্য দায়ী, তাঁহার অভীষ্ট পথে নিয়োগ করিবার জন্য দায়ী। এই দায়িত্ব জ্ঞান সর্ব্বদা প্রবল থাকা উচিত। সুপ্রসিদ্ধ থিওডোর পার্কার মৃত্যুর প্রাক্কালে এই বলিয়া ক্ষোভ করিলেন—ঈশ্বর আমাকে প্রভূত শক্তি দিয়াছিলেন, তাহার অর্দ্ধেকও ব্যবহার করা হইল না।" অথচ পার্কার অল্প কালের মধ্যে যে সকল কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন সে বিষয়ে চিন্তা করিলে আমরা আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া যাই। তিনি একজন কৃষকের সন্তান। উত্তমরূপ শিক্ষা লাভ করিবার সুযোগ তাঁহার ভাগ্যে ঘটে নাই। অল্প বয়সেই তাঁহাকে শিক্ষা সাঙ্গ করিয়া অর্থোপার্জ্জনের চেষ্টাতে রত হইতে হইয়াছিল। অথচ নিজেরই শ্রম ও অধ্যবসায়ের গুণে কি জ্ঞানে, কি প্রেমে, কি মানব-সেবাতে, সকল বিষয়ে আদর্শস্থানীয় হইয়াছিলেন। এই দায়িত্ব জ্ঞানই তাঁহাকে উন্নতির অভিমুখে লইয়া গিয়াছিল। আমাদের অন্তরে এই দায়িত্ব জ্ঞান অল্প বলিয়া আমাদের চরিত্রের সেরূপ উন্নতি দৃষ্ট হয় না। ব্রাহ্মধর্ম্ম এ দেশকে নবজীবন প্রদান করিবেন, ব্রাহ্মগণ শ্রম, অধ্যবসায় উদ্যোগ প্রভৃতির দৃষ্টান্ত এদেশবাসীদিগকে প্রদর্শন করিবেন। কিন্তু অনেক স্থলে দেখিতেছি ব্রাহ্ম যুবকগণও বৃক-তাড়িত মেষযূথের ন্যায় অসহায় ও নিরুপায় হইয়া বেড়াইতেছেন; প্রতিজ্ঞা সহকারে নিজ নিজ দেহ মনের শক্তিকে নিজের ও অপরের অবস্থার উন্নতির জন্য নিয়োগ করিতে পারিতেছেন না।

দেশের সর্ব্বত্রই সকল শ্রেণীর মধ্যেই দরিদ্রতা ও অন্ন কষ্ট দিন দিন বর্দ্ধিত হইতেছে। বর্ষে বর্ষে দলে দলে অর্দ্ধ শিক্ষিত যুবকদল বিদ্যালয় হইতে বহির্গত হইয়া কর্ম্মপ্রার্থী হইতেছে। কিন্তু এত লোকে অন্ন পাইতে পারে এরূপ চাকুরী কোথায়? কাজেই দরিদ্রতা দিন দিন বাড়িতেছে। কিন্তু সকল সম্পদের খনি স্বরূপ বিস্তীর্ণ ভূমি পড়িয়া রহিয়াছে; মানবের বুদ্ধি, শ্রম ও মানবের শক্তিকে নিয়োগ করিলে, ইহা হইতেই একটা উপায় বিনির্গত হইতে পারে। দুঃখের বিষয় ব্রাহ্ম যুবকগণের মধ্যেও সে প্রকার উদ্যোগ দৃষ্ট হইতেছে না, তাহারাও পথভ্রান্ত মেষযূথের ন্যায় কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া ছুটিয়া বেড়াইতেছে। এই সকল যুবককে কাজের লোক করিয়া তুলিতে পারে, ব্রাহ্মদিগের মধ্যে এরূপ কৃতী লোক দেখা না দিলে এ দুর্গতি ঘুচিবে না।

ব্রাহ্মগণের দরিদ্রতা—দরিদ্রতার কথা বলিলেই অনেক ব্রাহ্ম পরিবারের দুরবস্থার কথা স্মরণ হয়। এই দরিদ্রতা দিন দিন বাড়িতেছে। তাহার একটী প্রধান কারণ এই, ব্রাহ্মগণের অধিকাংশই বড় বড় সহরে বাস করিতেছেন। মফঃস্বলে বিরোধী ব্যক্তিদিগের মধ্যে বাস করাতে অনেক অসুবিধা বলিয়া, নিরন্তর লোকের উপহাস, বিদ্রূপ ও নির্য্যাতন সহ্য করিতে হয় বলিয়া, ব্রাহ্ম পরিবার সকল সহরেও প্রধান প্রধান নগরে থাকিতে ভাল বাসেন। কারণ বড় বড় নগরে লোক অনেকটা স্বাধীন; প্রত্যেকে আপনার ইচ্ছানুরূপ চলিতে বলিতে পারে; এক জনের জীবন অপর দশ জনের জীবনের সহিত তত আবদ্ধ নয়। কিন্তু সহরে বাস করাতে আর একটী অনর্থ উপস্থিত হইতেছে; সকলের জীবন নাগরিক জীবন হইয়া যাইতেছে। সহরে থাকিতে গেলেই পাচক বা পাচিকা ও দাস দাসী রাখিতে হয়, বাহির হইতে গেলেই ভদ্র পোষাক পরিতে হয়, দ্বারে জিনিস পত্র বিক্রয় করিতে আসিলেই দুই একটা ক্রয় করিতে হয়, এইরূপে, এটা ওটা করিয়া ব্যয় বাড়িয়া যাইতেছে। ওদিকে প্রকৃতি মাতার স্নিগ্ধ সহবাস হইতে দূরে থাকাতে দেহের বল, মনের শক্তি সমুচিত বিকাশ পাইতেছে না। বড় বড় সহর মানবহৃদয়ের কোমল গুণাবলী বিকাশের অনুকূল স্থান নহে। বড় সহরে লোকে স্বার্থপর হয়। তোমার দ্বারেই যাঁহার ঘর তাঁহার সহিত হয়ত তোমার দশ বৎসরের মধ্যে আলাপ হয় নাই। এক তালাতে মানুষ মরিয়াছে তিন তালাতে নৃত্যগীত চলিতেছে; কেহ কাহারও সংবাদ লয় না। কেহ কাহারও সুখ দুঃখের অংশ লইতে চায় না। পল্লীগ্রামে থাকিতে গেলেই দশ জনের সহিত সম্বন্ধ হইতে হয়। অল্প পরিসর স্থানে প্রত্যেকেই অপর সকলকে জানে; একজনের একটু বিপদ ঘটিলেই দশজনে সংবাদ পায় এবং পরস্পরের সহমর্ত্তা করিবার জন্য অগ্রসর হইয়া থাকে। আমাদের বোধ হয়, মফঃস্বলে কোনও একটা স্বাস্থ্যকর স্থান দেখিয়া যদি একটী ব্রাহ্ম উপনিবেশ স্থাপন করা যায়, তাহা হইলে বর্ত্তমান অবস্থার অনেক উন্নতি হইতে পারে। সেই উপনিবেশস্থ ব্যক্তিগণ কৃষি বাণিজ্য প্রভৃতিতে মনোযোগী হইবেন; দৈহিক শ্রমের দ্বারা স্বীয় স্বীয় অবস্থার উন্নতি করিবেন এবং সেই সঙ্গে জ্ঞানোন্নতি, বিদ্যাচর্চ্চা, ধর্ম্ম ও নীতি শিক্ষার ও উপায় থাকিবে। এরূপ আদর্শ উপনিবেশ স্থাপন করিয়া ব্রাহ্মগণ যদি এদেশবাসীদিগকে পথ দেখাইতে পারেন, তাহা হইলে একটা কাজ হয়। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে "মান্দ্রাজ ইউরেশীয়ান এসোসিএশন" নামক সভার যত্নে তত্রত্য ইউরেশীয়ানগণের জন্য মহীসুর রাজ্যে একটা উপনিবেশ স্থাপিত হইয়াছে। আমাদের বোধ হয় এরূপ উপনিবেশ স্থাপন বিষয়ে গবর্ণমেণ্টও অনেক সাহায্য করিতে পারেন। ব্রাহ্মদিগের দারিদ্র্য নিবারণের একটা কোনও উপায় ত্বরায় না করিলে, অচিরকালের মধ্যে ব্রাহ্ম সমাজ বিশেষ দুর্গতি প্রাপ্ত হইবে।

সম্পাদকীয় ও প্রাপ্ত প্রবন্ধ।

তৃপ্তি।

মানব প্রাণ সর্ব্বদাই তৃপ্তির জন্য ব্যস্ত। আহার বিহার প্রভৃতি দৈহিক ক্রিয়া হইতে গুরুতর কর্ত্তব্য পালন পর্য্যন্ত সকল কার্য্যেই মানব তৃপ্তি পাইতে ইচ্ছা করে। যে কার্য্যে তৃপ্ত পাইবার আশা নাই সে কার্য্যে লোকে নিতান্ত পীড়াপীড়ি না হইলে সহজে যাইতে চাহে না। মানবপ্রকৃতিতে যেমন এই তৃপ্তি পাইবার জন্য প্রবল আকাঙ্ক্ষা বিদ্যমান, বিধাতার বিধানও সেইরূপ দেখা যায়। মানব আহার করিবে, কোনরূপে শরীরের পুষ্টিকর কতকগুলি আহার্য্য সৃষ্টি করিলেই হইত; কিন্তু তাহার সঙ্গেও সুস্বাদ সুগন্ধি ইত্যাদি বিদ্যমান রাখিয়া মানবকে কেমন তৃপ্তিপ্রদান করিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। কর্ত্তব্যের অনুরোধে তুমি কঠোর পরিশ্রম করিতেছ, শরীর অবসন্ন হইতেছে—গাত্র ঘর্ম্মাক্ত হইতেছে; কিন্তু তাহার সঙ্গে সঙ্গেই অন্তরে আশ্চর্য্য শান্তি লাভ হইতেছে। এইরূপ প্রত্যেক কার্য্যেই মানব যখন প্রকৃষ্ট পদ্ধতি অনুসারে কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া থাকে, তখনই তাহার সঙ্গে অপূর্ব্ব তৃপ্তি লাভ করে। আহার বিহার প্রভৃতি দৈহিক ক্রিয়া কাণ্ডের মধ্যে যেমন কার্য্য করিবার সঙ্গে সঙ্গেই তৃপ্তি প্রদানের ব্যবস্থা আছে। ধর্ম্ম সাধনের মধ্যেও তাহার অভাব দেখা যায় না। সরল ভাবে প্রকৃত পদ্ধতি অনুসারে সাধন ভজনে প্রবৃত্ত হইলে, সেই সাধন ভজনের সঙ্গে সঙ্গে সাধক অপূর্ব্ব তৃপ্তিও পাইয়া থাকেন। এরূপ তৃপ্তিলাভ না হইলে সাধকের পক্ষে ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতার সহিত সাধনভজনে নিযুক্ত থাকা সকল সময় সম্ভব হইত না। কিন্তু আহার বিহার প্রভৃতি নিত্য প্রয়োজনীয় কার্য্য ও অপরাপর গুরুতর কর্ত্তব্য কার্য্য অনুষ্ঠানের সঙ্গে সঙ্গে এইরূপ তৃপ্তিলাভের ব্যবস্থা নিয়ত বর্ত্তমান থাকিলেও—তৃপ্তিলাভ মানবজীবনের উদ্দেশ্য নহে। জীবনের উদ্দেশ্য কল্যাণ লাভ ও স্বাস্থ্যলাভ। তাহা পাইবার জন্য মানবকে অধিকাংশ সময় যে কঠোর পরিশ্রম, দৃঢ় নিষ্ঠা ও প্রবল ত্যাগ স্বীকারেরর মধ্য দিয়া যাইতে হয় তাহার পুরস্কার এবং সৎকর্ম্মে নিয়ত নিযুক্ত রাখিবার পক্ষে

ইহা একটী অপূর্ব্ব কৌশল। বিধাতার আশ্চর্য্য দান। সুতরাং আমরা যদি এই তৃপ্তি লাভকেই জীবনের উদ্দেশ্য বলিয়া স্থির করি, তাহাতে আমাদের অত্যন্ত ভ্রান্তি হইবে। তাহাতে আমাদের কল্যাণলাভ অপেক্ষা আরাম ও শান্তির জন্য ব্যস্ততা প্রবল হইবে। এবং যে কোন কার্য্য দ্বারা প্রাণে পরিতৃপ্ত পাইতে পারি, আমরা তাহারই অন্বেষণে অধিকতর ব্যস্ত হইব। তদ্দ্বারা আমরা কেবলই সুখপ্রিয়, কোমলভাবাপন্ন হইয়া গুরুতর কর্ত্তব্যের পথে চলিতে অক্ষম হইব।

সদনুষ্ঠান ও ধর্ম্মসাধন প্রভৃতি কার্য্যের সঙ্গে সঙ্গে নিয়ত তৃপ্তিলাভ হয় বলিয়া, লোকের এরূপ সংস্কার বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে যে এই তৃপ্তি পাওয়াই বুঝি আমাদের লক্ষ্য এবং এই নিমিত্তই দেখা যায় যখন উপাসনাদিতে মানব আর তেমন তৃপ্তি পায় না, তখন অতি সহজেই উপাসনাদির প্রতি দোষারোপ করিয়া, ইহা দ্বারা জীবনের কোনও সুফল লাভের আশা নাই মনে করিয়া উপাসনা করিতে ক্ষান্ত হয়। কিন্তু একটু স্থির চিত্তে ভাবিয়া দেখিলেই বুঝা যায় যে আমরা সকল সময় তৃপ্তি পাইবার উপযুক্ত বা অধিকারী থাকি না। সুস্থ ও প্রকৃতিস্থ অবস্থায় না থাকিলে কখনই কেহ তৃপ্তি পাইতে পারে না। এজন্যই দেখা যায়, যে সুমিষ্ট বস্তু ভোগে এক সময় কত তৃপ্তি পাওয়া যায়, তাহাই পীড়ার সময় বিষম অতৃপ্তির কারণ হয়। যে দুগ্ধ সুস্থাবস্থায় উপাদেয় জ্ঞানে লোকে আগ্রহের সহিত পান করিয়া থাকে, তাহাই আবার সময় বিশেষে বিষম অতৃপ্তির কারণ হয় এবং লোকে অতিশয় বিরক্তির সহিত তাহা পান করিয়া থাকে। আবার ইহাও দেখা যায় মানুষ প্রবল বিকারের সময় যখন তৃপ্তি পাইবার আশায় জলপান করিতে অত্যন্ত ইচ্ছা করে তখন চিকিৎসক তাহাকে জল দিতে নিষেধ করেন। কারণ সে জল তাহার ক্ষণিক তৃপ্তির কারণ হইলেও পরিশেষে বিশেষ কষ্টদায়ক হইয়া থাকে। যখন কাহারও শরীর অগ্নিতে দগ্ধ হয় তখন সে গাত্রে সহজেই জল প্রদানের জন্য ব্যস্ত হয় এবং যদিও সেই জল ক্ষণকালের জন্য যন্ত্রণার শান্তি করে; কিন্তু পরক্ষণেই তাহা বিষম যাতনার কারণ এবং অকল্যাণকর হয়। সুতরাং সকল সময় সকল বস্তুতেই যে তৃপ্তি পাওয়া যাইবে এবং তাহা যে কল্যাণকর হইবে এমন নয়।

লোকে এখন ভাল উপাসনা হইল কি না তৃপ্তি দ্বারা তাহার বিচার করিয়া থাকে। কিন্তু সকল সময় তৃপ্তি লাভ দ্বারা ভাল উপাসনা হইয়াছে বলিয়া মনে করা বিষম ভ্রম। যখন প্রাণের অবস্থা সুস্থ থাকে, তখন ঈশ্বরের নাম কীর্ত্তন মননাদি তৃপ্তির কারণ হইবে। কিন্তু যদি কেহ গুরুতর পাপানুষ্ঠান করিয়া আসে তখনও যদি সে উপাসনা করিয়া তৃপ্তিলাভ করে, তবে সে উপাসনা কখনই প্রকৃত উপাসনা নহে এবং তাহা কখনও আত্মার কল্যাণকর নহে। তখন যদি তাহার প্রকৃত উপাসনা হয় এবং সে আত্মাপরাধ স্মরণ করিতে করিতে নিজ কুৎসিত ছবির সহিত প্রাণে প্রকাশিত সুন্দর ছবির তুলনা করিতে থাকে, তাহা হইলে তাহার প্রাণে নিশ্চয় প্রবল অনুতাপ উপস্থিত হইবে। এবং তাহা দ্বারাই তাহার কল্যাণ হইবে। এই অবস্থায়ও যাহারা তৃপ্তির জন্য ব্যস্ত হয় তাহারা নিতান্তই দুরাকাঙ্ক্ষ; তাহাদের আশা কখনই পূর্ণ হইবার নহে। কিন্তু লোকে এমনই তৃপ্তির জন্য ব্যস্ত যে এরূপ রুগ্নাবস্থায়ও যে কোন প্রকারে তৃপ্তি পাইবার চেষ্টা করে; এবং ভাবোদ্দীপক নানাপ্রকার বাক্য ও সংগীতাদির সাহায্যে প্রাণের ব্যাধির যাতনা চাপা দিয়া রাখিয়া কোন প্রকারে আত্মবিস্মৃত হইয়া তৃপ্তির সহিত সময় কাটাইতে যায়। এরূপ অবস্থাকে চিকিৎসকগণ বিকারের লক্ষণ বলিয়াই নির্দ্দেশ করেন এবং পরম বৈদ্য পরমেশ্বরও তাহার কল্যাণের জন্য তখন তাহার প্রাণে তৃপ্তি না দিয়া অশান্তির প্রবল অনল জ্বালিয়া দিয়া থাকেন। অনুতাপের বিষম জ্বালায় ছটফট করিয়া সময় কাটানই তাহার পক্ষে তখন আবশ্যক।

সুতরাং তৃপ্তি যদি পাইবার আশা থাকে তাহা হইলে প্রাণকে সর্ব্বদা সুস্থ রাখিতে হইবে। অন্যথা ক্ষণিক তৃপ্তি পাইলেও তাহা কখনই কল্যাণকর হইবে না। ঈশ্বরের শান্তিপ্রদ পবিত্র নাম মানবপ্রাণে শান্তি দিয়া থাকে ইহা চিরপ্রসিদ্ধ। কিন্তু যদি সে নাম লইয়া, তাঁহার গুণানুকীর্ত্তন করিয়াও তৃপ্তি না পাওয়া যায়, তাহা দ্বারা ইহা প্রমাণিত হয় না যে তাঁহার নামে তৃপ্তি পাওয়া যায় না বা উপাসনা দ্বারা আরাম লাভ হয় না। তখন অন্য কারণ অনুমান করাই উচিত। সুস্থ শরীরে চন্দন লেপন করিলে শরীর স্নিগ্ধ হইবে ইহাই নিয়ম। যদি তাহা না হয়, তবে সহজেই বুঝিতে হইবে শরীরে কোন ব্যাধি উপস্থিত হইয়াছে এবং সেই কারণেই স্নিগ্ধকারী চন্দন লেপন করিয়াও তুমি তৃপ্তি পাইতেছ না। এইরূপ যদি দেখ উপাসনায় তৃপ্তি হয় না, ঈশ্বরের নাম লইলে প্রাণে শান্তি আসে না, তাহা হইলে তোমার পক্ষে সর্ব্বাগ্রে অনুসন্ধান করা উচিত প্রাণে কোন ব্যাধি জন্মিয়াছে কি না। তাহা না করিয়া যদি তুমি উপাসনার প্রতি দোষারোপ কর বা ঈশ্বরের নামের শক্তিতে সন্দিহান হও, তদ্দ্বারা তোমার অজ্ঞানতারই পরিচয় পাওয়া যাইবে, এবং সেরূপ সংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া চলিলে তোমার তৃপ্তিলাভও ঘটিবে না, প্রাণের কল্যাণ লাভও হইবে না।

ধর্ম্মে সাম্প্রদায়িকতা ও উদারতা।

সাম্প্রদায়িকতা শব্দটী ব্রাহ্মদিগের চক্ষে অতিশয় ঘৃণিত হইয়াছে। ইহাতে সংকীর্ণতা, অনুদারতা, অপ্রেম, অন্ধতা প্রভৃতি সমুদায় প্রকাশ করে। কাহারও কাহারও মনে এই সাম্প্রদায়িকতার ভয় এত অধিক যে তাঁহারা সেই কারণে বিপরীত দিকে অতিরিক্ত সীমাতে যাইতেছেন; পাছে লোকে সাম্প্রদায়িক বলে এই আশঙ্কাতে সত্যে অসত্যে প্রভেদ রাখার আবশ্যক বোধ করিতেছেন না। গণ্ডী শব্দটী এই শ্রেণীর ব্যক্তিদিগের পক্ষে একটী মহা ত্রাসের বস্তু হইয়াছে। অপর দিকে দেখিতেছি যে কতকগুলি ব্রাহ্ম ব্রাহ্মধর্ম্মকে এত সংকীর্ণ ও সীমাবদ্ধ ভাবে দেখিতেছেন, যে আপন আপন অবলম্বিত প্রণালীর ব্যতিক্রম সহ্য করিতে পারিতেছেন না, সেরূপ ব্যতিক্রমকারীদিগকে অব্রাহ্ম বলিয়া বর্জ্জন বা নিগ্রহ করিতে

চাহিতেছেন। এই কারণে বোধ হইতেছে যে কাহাকে সাম্প্রদায়িকতা বলে ও উদারতারই বা অর্থ কি তাহা ধীরচিত্তে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিলে উপকার দর্শিতে পারে।

সাম্প্রদায়িকতা শব্দটী সম্প্রদায় শব্দ হইতে উৎপন্ন। প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থে সম্প্রদায় শব্দে গুরু ও শিষ্য পরম্পরা বুঝায়—অর্থাৎ কোনও বিশেষ ধর্ম্মমত বা সাধনপ্রণালী গুরুশিষ্য পরম্পরাক্রমে যে দলের মধ্যে নামিয়া আসে, সেই দলকে সম্প্রদায় বলে। অতএব এক একটী সম্প্রদায় কতকগুলি নবপ্রচারিত সত্যের সংরক্ষক, পোষক ও সাধক। চিন্তা করিলেই দৃষ্ট হইবে, সত্যবিশেষের সংরক্ষণ ও পোষণের জন্য এরূপ সম্প্রদায় গঠিত হওয়া অনিবার্য্য ও বিধাতার বিধান। তরু-বীজের রক্ষণ ও পোষণের সঙ্গে ইহার তুলনা হইতে পারে। বিধাতা অধিকাংশ তরুর বীজকে একটী কোষের মধ্যে নিহিত করিয়াছেন। আম্রের কেসুরটী কেমন কঠিন আবরণে আবৃত হইয়া থাকে? সে আবরণটী না থাকিলে বীজটী অকালে বিনষ্ট হইয়া যাইত। সেইরূপ কোনও সত্য যখন জগতে অবতীর্ণ হয়; তখন তাহাকে কতিপয় হৃদয় প্রেমদ্বারা দৃঢ়রূপে ধারণ করে, একাগ্রতার সহিত সাধন করে, উৎসাহের সহিত প্রচার করে, এইরূপে তাহা বলশালী হইয়া জগতকে অধিকার করে। এরূপে সত্যকে ধারণ ও সাধন না করিলে কোনও সত্যই জগতে স্থানপ্রাপ্ত হইত না। বর্ত্তমান সভ্যজগতের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যায় যে এই প্রণালীতেই সত্য সকল সংরক্ষিত ও প্রচারিত হইতেছে। প্রথমে অল্পসংখ্যক ব্যক্তির মধ্যে ধারণ ও পোষণ, শেষে জগতে ঘোষণ। এইরূপে দাসত্ব প্রথা উঠিয়া গিয়াছে, বাণিজ্যের স্বাধীনতা বিস্তার হইয়াছে, সুরাপান নিবারিত হইতেছে। জগতের ধর্ম্মসম্প্রদায় সকলও এই বিধাতা-নির্দ্দিষ্ট পথের অনুসরণ করিয়াছে। সাধুমুখ দিয়া কোনও নূতন সত্য অবতীর্ণ হইলেই প্রেমিক-হৃদয় দিয়া সম্প্রদায় গঠিত হইয়াছে ও সেই সত্যকে ধারণ করিয়াছে। যত দিন সেই সকল সত্য সম্পূর্ণরূপে জগতকে অধিকার না করিবে ততদিন ঐ সকল সম্প্রদায়ের জীবনের উদ্দেশ্য বিদ্যমান থাকিবে ও তাহারা জীবিত থাকিবেই থাকিবে।

এক্ষণে চিন্তা করা উচিত ব্রাহ্মধর্ম্মের আকারে যে সকল সত্য এতদ্দেশে প্রচারিত হইতেছে, তাহার সংরক্ষণ ও পোষণের জন্য সম্প্রদায় গঠিত হওয়া স্বাভাবিক, অনিবার্য্য ও প্রয়োজনীয় কি না? বিশেষ ইহা স্মরণ রাখিতে হইবে এই সকল সত্য কেবল জ্ঞানগত সত্য নহে, তাহা সাধনের বিষয়। যদি কেবল জ্ঞানগত সত্য হইত, তাহা হইলে তাহার জন্য সম্প্রদায় বন্ধনের প্রয়োজন হইত না। প্রতিদিন বিজ্ঞানের কত নূতন নূতন সত্য আবিষ্কৃত হইতেছে, যাহার জন্য কোন সম্প্রদায় গঠন করা আবশ্যক বোধ হইতেছে না। আবিষ্কার কর্ত্তাগণ পুস্তকাকারে মুদ্রিত করিয়া পণ্ডিত মণ্ডলীর গোচরার্থ প্রচার করিতেছেন, তাহাতেই সেই সকল সত্য সর্ব্বত্র প্রচারিত হইয়া যাইতেছে। কিন্তু ধর্ম্মজীবন সম্বন্ধীয় সত্য সকল সেরূপ নহে, তাহা সাধনসাপেক্ষ। এই সাধন অপরের সাহায্য-সাপেক্ষ সুতরাং এই সকল সত্য সাধনের জন্য সম্প্রদায় বন্ধন অপরিহার্য্য।

সম্প্রদায় বন্ধন যদি স্বাভাবিক ও প্রয়োজনীয় হইল তবে সম্প্রদায় সম্প্রদায়, গণ্ডী গণ্ডী করিয়া চীৎকার কর কেন? সম্প্রদায় কেন গঠন হইতেছে এই বলিয়া দুঃখ না করিয়া বরং এই বলিয়া দুঃখ কর এই সম্প্রদায়ের ঘননিবিষ্টতা, দৃঢ়তা, একাগ্রতা কেন এরূপ হইতেছে না, যদ্দ্বারা ব্রাহ্মধর্ম্মের সত্য সকল সমুচিত রূপে সংরক্ষিত, পোষিত ও সাধিত হইতে পারে? ব্রাহ্মদল নামে একটী দল কেন হইতেছে, ইহা বলিয়া দুঃখ না করিয়া বরং আমরা এই ভাবিয়া দুঃখিত হইতেছি যে এই দলের বিশ্বাস, নিষ্ঠা ও একাগ্রচিত্ততা কেন এত বর্দ্ধিত হইতেছে না যাহাতে এই দলটী একটী কামানের গোলার ন্যায় দৃঢ়বদ্ধ হয়। এক্ষণে বিবেচনা করা কর্ত্তব্য যে দল সৃষ্টি হওয়া যখন স্বাভাবিক ও বিধাতার বিধি, তখন সেই দলের প্রতি প্রত্যেক ব্যক্তির বিশেষ প্রেমও স্বাভাবিক কি না? এ জগতে চিন্তা, ভাব, ও কার্য্যগত একতার উপরে সচরাচর প্রীতির ভিত্তি স্থাপিত হয়। অতএব এক সম্প্রদায়স্থ ব্যক্তিগণের পরস্পরের প্রতি বিশেষ প্রীতিমান হওয়া স্বাভাবিক কি না? বিশেষতঃ আর একটী বিষয় চিন্তা করিলে স্বসম্প্রদায়স্থ ব্যক্তিগণের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দিবার কারণ দৃষ্ট হয়। যে সত্য পালনের জন্য তুমি নিগ্রহ সহ্য করিতেছ, সেই সত্য পালনের জন্য যদি অন্য কাহাকেও নিগৃহীত হইতে দেখ, তাহা হইলে তোমার হৃদয় কি সহজে তাহার সাহায্যার্থ অগ্রসর হয় না—যদি না হয় তবে তোমার দায়িত্ব জ্ঞান অদ্যাপি ফোটে নাই।

যদি স্বসম্প্রদায়ের প্রতি বিশেষ প্রীতিও স্বাভাবিক হইল—তবে সাম্প্রদায়িকতা এত ঘৃণিত হইল কেন? তবে সাম্প্রদায়িকতা কাহাকে বলে? স্বসম্প্রদায়ের প্রীতিকে সাম্প্রদায়িকতা বলে না, কিন্তু সেই প্রীতির বিকারকে সাম্প্রদায়িকতা বলে। যেমন দাম্পত্য প্রেমের বিকার ঈর্ষ্যা তেমনি স্বসম্প্রদায়ের প্রতি প্রীতির বিকার সাম্প্রদায়িকতা। একজন রমণী যদি নিজ পতিকে প্রাণ মনের সহিত ভাল বাসে তাহাতে নিন্দার কি আছে? কিন্তু যদি সেই প্রেমের অর্থ এই হয় যে সে নারী আর কোনও পুরুষের কোনও সদ্‌গুণ দেখিতে পায় না, বা পতি অন্য কোনও রমণীর সহিত হাসিয়া কথা কহিলেই ঈর্ষ্যা করে, তাহা হইলেই বলিতে হয় তাহার প্রেম বিকৃত ও এক ব্যাধি বিশেষ। সেইরূপ নিজ সম্প্রদায়ের প্রতি প্রেমের অর্থ যদি এই হয় যে অপর সম্প্রদায়ের মধ্যে যাহা উৎকৃষ্ট ও অনুকরণের যোগ্য আছে, তাহার প্রতি অন্ধ, অথবা স্বসম্প্রদায়ের কেহ অপর সম্প্রদায়ের লোকের সহিত আত্মীয়তা করিলেই ঈর্ষ্যান্বিত হইব, ও তাহার প্রতি চক্ষু রাঙ্গাইব, তাহা হইলেই মনে করিতে হইবে যে তাহা সাম্প্রদায়িকতা, তাহা চিত্তের একটী ব্যাধি। নতুবা স্বসম্প্রদায়ের প্রতি প্রীতিমান ও স্বাবলম্বিত সত্যের প্রতি নিষ্ঠাবান হইলেই কাহাকেও সাম্প্রদায়িকতা দোষে দোষী করা যায় না।

সাম্প্রদায়িকতা কি তাহা বুঝিতে পারিলে উদারতা কি তাহাও বুঝিতে পারা যায়। উদারতা অনেক প্রকারের আছে, এক প্রকার উদারতা আছে, তাহা উদাসীনতা সম্ভূত। আমি সকল ধর্ম্মের প্রতি উদাসীন সুতরাং আমি সকল ধর্ম্মাবলম্বীকেই

উদারভাবে গ্রহণ করিতে পারি। আমেরিকা দেশে "নৈতিক উন্নতি সভা" নামে একটী সভা হইয়াছে, তাহাতে আস্তিক নাস্তিক উভয়কেই গ্রহণ করা হয়, কারণ তাঁহারা ধর্ম্মবিশ্বাসের প্রতি উদাসীন। ধর্ম্মবিশ্বাস যাহাদের অন্তরে প্রবল, এবং ধর্ম্মসাধন ও ধর্ম্মপ্রচারার্থই যাঁহাদের চেষ্টা তাঁহাদের উদারতা এইরূপ উদাসীনতা সম্ভূত উদারতা নহে। দ্বিতীয়তঃ এক প্রকার উদারতা আছে তাহা লোকরঞ্জন প্রবৃত্তি-সম্ভূত। হিন্দুর নিকটে তাহার মনের মত কথাটী বলিলে, তাহার প্রশংসা পাওয়া যায়, মুসলমানের নিকট তাহার বিশ্বাসের অনুরূপ কথা গুলি বলিলে—সে প্রীত হয় অতএব তাহাই কর। ব্রাহ্মধর্ম্মে ত এমন কথা অনেক রহিয়াছে, যাহার সহিত কাহারও বিরোধ নাই, সেইরূপ কথাগুলি বল না কেন, তাহা সর্ব্ববাদিসম্মত হইবে—সকলকেই প্রীত রাখা যাইবে। এ উদারতাও আমাদের প্রার্থনীয় নহে। লোকরঞ্জন আমাদের উদ্দেশ্য নহে সত্যের অনুসরণ উদ্দেশ্য। তৃতীয়তঃ এক প্রকার উদারতা আছে যাহা ঈশ্বরের ও ধর্ম্মের জ্ঞানসম্ভূত। ধর্ম্মের মহৎ ও উচ্চভাব হৃদয়ে ধারণ করিলে, মানুষ আর ইহা মনে করিতে পারে না, যে ঈশ্বরের অনুপ্রাণনশক্তি কেবল এক দেশে বা এক জাতি মধ্যে বা এক ব্যক্তি মধ্যে বদ্ধ হইতে পারে। তিনি নানা ভাবে ও নানা স্থানে লীলা করিয়াছেন ও সর্ব্বদা করিতেছেন। স্বীয় মণ্ডলীর মধ্যে তাঁহার প্রকাশ দেখিয়া যেরূপ আনন্দিত হইব, অন্যত্র তাহার যে কিছু লীলা দর্শন করিব, তাহাতেও আনন্দিত হইব। এইরূপে বিস্তীর্ণ মানব-হৃদয়ে ঈশ্বরের লীলা দর্শন হইতেও উদারতার উৎপত্তি হয়। চতুর্থতঃ এক প্রকার উদারতা আছে তাহা প্রেমসম্ভূত। যেখানে সরলতা ও সাধুতা সেই খানেই হৃদয়ের অনুরাগ ও ভক্তি শ্রদ্ধা তাহাতে সম্প্রদায়ের বিচার নাই।

শেষোক্ত দুই প্রকার উদারতাই ধর্ম্মের অনুগত ইহাই আমাদের প্রার্থনীয়। যাঁহারা গণ্ডী গণ্ডী ধ্বনি তুলিয়া ব্রাহ্ম-সমাজকেও একটা বন্ধনরজ্জু বলিয়া অনুভব করিতেছেন তাঁহাদের জানা উচিত যে ইহা বিধাতার বিধি এবং অপরিহার্য্য। এ আকারে ভগ্ন কর আকারান্তরে ফুটিবেই ফুটিবে। তবে যদি ধর্ম্মবিশ্বাস ও ধর্ম্মভাব মানব অন্তর হইতে বিলুপ্ত করিতে পার, অথবা সন্ন্যাসের ধর্ম্মকে প্রবর্ত্তিত করিতে পার, তাহা হইলে সম্প্রদায় বন্ধন হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পার, নতুবা নহে।

ব্রাহ্ম পর্য্যটকের পত্র।

আমাদের একজন ব্রাহ্মবন্ধু কতিপয় হিন্দু তীর্থস্থান পর্য্যটন করিতে যাইয়া চিত্রকূটে যাহা দর্শন করিয়াছেন, তাহার বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল। ইহা দেখিলে ঐ সকল তীর্থবাসী সাধুদিগের ভাব অনেক অবগত হওয়া যাইতে পারে।

চিত্রকূট।

উত্তর পশ্চিম প্রদেশের অন্তর্গত বান্দা জেলার করই নামক একটী উপজেলা আছে, চিত্রকূট সেই করইর অধীন। এলাহাবাদ হইতে জব্বলপুর পর্য্যন্ত ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেল্ওয়ের যে লাইন গিয়াছে, সেই লাইনের মধ্যবর্ত্তী মাণিকপুর নামক একটী ষ্টেশন হইতে আবার একটী লাইন ঝান্সী পর্য্যন্ত গিয়াছে, করই সেই লাইনের অন্তর্গত একটী ষ্টেশন। করই হইতে চিত্রকূট ৪ মাইল দূরে অবস্থিত।

চিত্রকূট অতি প্রাচীন স্থান। এই স্থান অতি নির্জ্জন ও রমণীয় বলিয়া প্রাচীন কাল হইতে অনেক সাধু পুরুষ এখানে একান্তচিত্তে, আপনাপন ইষ্টদেবতার সেবাতে নিযুক্ত থাকিতেন; সেই জন্য এই স্থান তপভূমি বলিয়া প্রসিদ্ধ। রামায়ণে বর্ণনা আছে রামচন্দ্র পিতৃসত্য পালন জন্য বন ভ্রমণ কালে এই স্থানে কিছুদিন অবস্থিতি করিয়াছিলেন। ধর্ম্মাত্মা হিন্দুগণ এই স্থান পুণ্যক্ষেত্র বলিয়া অনেক ক্লেশ স্বীকার পূর্ব্বক দেখিতে গিয়া থাকেন। স্থানটী অত্যন্ত রমণীয়, প্রায় চতুর্দ্দিকে পাহাড়। ইহার মধ্যে মধ্য-স্থলের একটী পাহাড়ের পাদদেশ দিয়া একটী ক্ষুদ্র নদী প্রবাহিত হইতেছে, স্থানীয় অধিবাসিগণ এই নদীকে গঙ্গা বলিয়া অভিহিত করেন। এই নদীর অপর পারে একটী ক্ষুদ্র পাহাড়ের উপর চিত্রকূট সহর অবস্থিত। এই চিত্রকূটে ছোট বড় প্রায় ৫০।৬০টী দেবালয় আছে, প্রায় সকল দেবালয়েই রাম-সীতার মূর্ত্তি। এই সকল দেবালয়ের মহান্তগণ শ্রী সম্প্রদায়ের বৈষ্ণব, মহাত্মা রামানুজাচার্য্য এই বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক। এখানে এই বৈষ্ণব সম্প্রদায় সাধারণতঃ দুই ভাগে বিভক্ত। ১ম আচারী; ২য় সাধারণী এই বৈষ্ণবগণ প্রধানতঃ সাধু তুলসী দাস কৃত রামায়ণকে বিশেষভাবে মান্য করিয়া থাকেন।

১ম আচারীগণ। ইঁহারা দেবালয়ে বাস করেন ও রামসীতার মূর্ত্তি পূজা করেন। এই আচারিগণের মধ্যে আবার দুই শ্রেণী, ১ম গৃহী, ২য় বৈরাগী। গৃহিগণ স্ত্রী পুত্র পরিবার লইয়া, ঠাকুর বাড়ীর মহান্তরূপে অবস্থিতি করিয়া শিষ্যাদি করিয়া থাকেন। ও রাজা রাজড়া প্রদত্ত যায়গীর ইত্যাদির দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করেন। আর বৈরাগিগণ চিরকাল অবিবাহিত থাকিয়া কেবল ধর্ম্মালোচনাতেই নিযুক্ত থাকেন।

এই বৈরাগিগণের দেবালয়ে স্ত্রীলোক বাস করিতে পারেন না। বৈরাগীদের আচার ব্যবহার অতি সুন্দর; প্রায় সকলেই প্রত্যহ প্রাতে, মধ্যাহ্নে ও অপরাহ্নে তিনবার স্নান করিয়া থাকেন, ডোর কৌপীন পরিধান করেন ও রামাত বৈষ্ণবগণের ন্যায় বিশেষ তিলক ধারণ করেন। ইঁহাদের মধ্যে যাঁহারা একটু বয়স্ক তাঁহারা সর্ব্বদা মালা জপ করেন ও সাধারণতঃ বৈকালে পরস্পর একত্রিত হইয়া শাস্ত্রালোচনা ও সৎপ্রসঙ্গ করিয়া থাকেন। ইঁহারা সকলেই দয়ালু প্রকৃতি, প্রাণিহিংসা করেন না, অনেকেই দিন রাত্রির মধ্যে মধ্যাহ্ন কালে একবার আহার করেন। ইঁহাদের মধ্যে জাতিভেদ পূর্ণ মাত্রায় রহিয়াছে, ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবের হস্তে অর্থাৎ (পূর্ব্বে জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন এক্ষণে বৈষ্ণব হইয়াছেন) আহার করিতে কাহারও আপত্তি নাই কিন্তু অন্য জাতির হস্তে আহার করেন না। যেস্থানে ব্রাহ্মণ

বৈরাগী না পাওয়া যায় সেস্থলে নিজে নিজে পাক করিয়া আহার করেন। ইঁহারাও অনেক শিষ্য সেবক করেন এবং রাজা রাজড়া প্রদত্ত যায়গীরও অল্পাধিক পরিমাণে ইঁহাদের সকলেরই আছে।

২য়। সাধারণীগণের আচার ঐ রূপই, তবে তাঁহারা জাতিভেদ স্বীকার করেন না। এই জাতিভেদ অস্বীকার করার একটু বিশেষত্ব আছে, তাহা এই, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি জাতির হস্তে ইঁহারা আহার করেন। কিন্তু তাহা ছাড়া খৃষ্টান, মুসলমান কি ইতর লোকের হস্তে আহার করেন না।

ইঁহারা দেবালয়বাসী নহেন। চিত্রকূট সহর হইতে প্রায় দেড় মাইল দূরে জানকী কুণ্ড নামক একটি অতি নির্জ্জন স্থান আছে। (এই স্থান বন্দেলখণ্ডের রাজার অধীন) সেই স্থানের পর্ব্বতের পাদদেশে স্থানীয় গঙ্গা কুল কুল ধ্বনি করিতে করিতে প্রবাহিত হইতেছে, তাহারই নিকট কতকগুলি পর্ব্বত গুহা, সেই গুহার মধ্যে এই সমস্ত সাধুগণ বাস করিয়া নির্জ্জনে আপনাপন অভীষ্ট দেবতার সাধন ভজনে নিযুক্ত আছেন। ইঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ চীর কুমার ও কেহ কেহ গৃহত্যাগী।

এই স্থানের প্রাকৃতিক দৃশ্য অতি মনোহর। গুহা গুলির সম্মুখে নদী ও তৎপরে বৃক্ষরাশী পরিপূর্ণ পাহাড়। এই সমস্ত পাহাড়ে নানা শ্রেণীর পক্ষী সর্ব্বদাই বিহার করিতেছে; বিশেষতঃ ময়ূর ময়ূরীগণের কেকারবে সর্ব্বদাই একটী অপূর্ব্ব মাধুর্য্য ভাব মনে জাগ্রত হয়। ঈশ্বর কৃপায় আমি এইরূপ একটী গুহাতে কয়েক দিন বাস করিয়াছিলাম।

এই সমস্ত গৃহত্যাগী গুহাবাসী রামোপাসক বৈষ্ণবগণের চরিত্র অতি সুন্দর। ইহাদের ভগবানে বিশ্বাস ও জীবে দয়া দেখিয়া আমি আশ্চর্য্য হইয়াছি। আমি যে গুহাতে ছিলাম, সেই গুহাটীতে অন্য দুইটী সাধু আছেন। একদিন রাত্রে অত্যন্ত ঝড় বৃষ্টি হয় তাহাতে আমার অত্যন্ত শীত করিতে থাকে, কিন্তু আমার নিকট কম্বল বা গাত্র বস্ত্র কিছু না থাকায় শীত নিবারণের কোন উপায় ছিল না। ইহা জানিয়া উক্ত সাধু দ্বয়ের মধ্যে রামজী দাস নামক একটী সাধু, আপনার নিজের গাত্রের লুইখানি আমার গাত্রের উপর ফেলিয়া দিয়া হিন্দি ভাষায় বলিলেন যে "সঙ্গে একখানি গরম কাপড় রাখার প্রয়োজন, তুমি এই খানি কাহাকেও দিও না"। আমি বলিলাম "আপনি আমাকে নিজের গাত্রের কাপড় খানি দিলেন, আপনার কি হইবে?" প্রত্যুত্তরে তিনি কহিলেন যে "তোমার দুঃখ দেখিয়া সীতাপতি তোমাকে এই কাপড় দিলেন, আমি দি নাই। আমাকে আবার সীতাপতি দিইয়ে দিবেন, ইহাতে তুমি কিছু মনে করিও না।"

ইহাদের সহিত প্রায় প্রতিদিন বৈকালে ধর্ম্মালোচনা হইত। এখানকার বর্ত্তমান সাধুগণের মধ্যে সর্ব্ব প্রধান সাধুর নাম শ্রীমা বাবা। তাঁহার সহিত বিশেষ ভাবে শাস্ত্রালোচনা ও সাকার নিরাকার ইত্যাদি বিষয় লইয়া বিচার হইত। তিনি আমাকে খুব ভাল বাসিতেন। কিন্তু আমাকে তাঁহাদের পানীয় জল ইত্যাদি স্পর্শ করিতে দিতেন না। আমি হাড়ি মেথরের অন্নও খাইতে পারি বলিয়া তাঁহারা আমার স্পর্শ দ্রব্য ভোজন করিতে ইচ্ছুক নহেন। একদিন একটী বাবাজী আমাকে ভোজনের নিমন্ত্রণ করেন, তাহার পর শ্রীমা বাবার নিকট যখন শুনিলেন যে আমি হাড়ি মেথরেরও অন্ন খাইতে পারি, তখন বাবাজী নিমন্ত্রণ ফিরাইয়া লইয়া বলিলেন যে, এইরূপ হাড়ি মেথরের অন্ন যাহারা খায় তাহাদিগকে নিমন্ত্রণ করিতে পারি না।

এই সমস্ত গুহাবাসী সাধুগণের মধ্যে একটী গুহায় একজন অদ্বৈতবাদী সাধু থাকেন, তাঁহার নাম কৃপাল নাথ। তিনি উলঙ্গ থাকেন, কাহারও সহিত কথা কহেন না, বিশেষ আবশ্যক হইলে শ্লেটে হিন্দি ভাষায় লিখিয়া দেন। তাঁহার সহিত আমার এইরূপে কিছু কথাবার্ত্তা হয়। তিনি প্রশ্ন করিলেন "তুমি কে?" আমি উত্তর করিলাম "আমি অতি দীন মনুষ্য।" তাহাতে তিনি বলিলেন যে "আপনার এখনও দিব্য জ্ঞান হয় নাই" পরে প্রশ্নোত্তরে জানিলাম যে "আমি সেই পরমাত্মা"—এইরূপ জ্ঞান না হইলে অন্য জ্ঞানকে দিব্য জ্ঞান বলিয়া তিনি মনে করেন না। তাঁহার সাধনের বিষয় কি জিজ্ঞাসায় তিনি বলিয়াছিলেন যে, "আত্মার পরমাত্মায় এক বলিয়া চিন্তন করাই আমার সাধন।"

ইঁহাদের আহারাদি চারি প্রকার নিয়মে উপার্জ্জিত হয়। ১ম, যাঁহাদের অজগর বৃত্তি, তাঁহারা কাহারও নিকট কিছু চাহেন না ও আহারের জন্য গুহা হইতে বাহির হইয়া কোথাও যান না, আপনা হইতে যাহা আইসে তাহাই তৃপ্তি পূর্ব্বক আহার করেন। ২য়, মাধুকুরি অর্থাৎ মধ্যাহ্ন সময়ে গৃহস্থদের বাড়ী ও দেবালয় ইত্যাদি স্থানে যাইয়া রুটী ভিক্ষা করিয়া আনেন এবং তাহাই আহার করেন। ৩য়, চুটকি অর্থাৎ প্রাতে ৮।৯ ঘটিকার সময় গৃহস্থদের বাড়ী বাড়ী যাইয়া ময়দা ভিক্ষা করিয়া আনেন ও তাহাই স্বহস্তে পাক করিয়া আহার করেন। ৪র্থ শ্রেণীর সাধুরা উক্ত তিন প্রকারের কিছুই করেন না, কোন কোন স্থানে তাঁহাদের বৃত্তি আছে তাঁহারা তাহাই ও সাধারণের প্রদত্ত অর্থ দ্বারা খাদ্য দ্রব্যাদি ক্রয় করিয়া স্বহস্তে পাক করিয়া ভোজন করেন। এই সমস্ত সাধুগণের মধ্যে কেহই শিষ্য সেবক করেন না। কেহ জিজ্ঞাসু হইয়া উপস্থিত হইলে ইহারা তাহার সহিত ধর্ম্মালোচনা করেন ও ধর্ম্মোপদেশ দিয়া থাকেন। ইঁহাদের নিকট শুনিলাম এখানে যমুনা নামক একটী সাধু ছিলেন যিনি ৫।৬ বৎসর হইল পরলোকবাসী হইয়াছেন, তাঁহাকে সকলেই সিদ্ধ পুরুষ বলিয়া জানিতেন। লোকে তাঁহাকে বিরক্ত করিত বলিয়া তিনি কয়েকটি কুকুর পুষিয়া ছিলেন, তাঁহার গুহার নিকট কাহাকেও যাইতে দেখিলে তিনি সেই কুকুর গুলিকে লেলাইয়া দিতেন, কোন ব্যক্তি সেই কুকুরদের বাধা অতিক্রম করিয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইতে পারিলে তবে তিনি তাহার সহিত ধর্ম্মালোচনা করিতেন ও ধর্ম্মোপদেশ দিতেন।

এই সাধারণী বৈষ্ণবগণের মধ্যে কাহাকেও মূর্ত্তি পূজা

করিতে দোষ নাই। মূর্ত্তি পূজার কথা জিজ্ঞাসা করিলে কহিতেন যে আমরা নিজেরা মূর্ত্তি পূজা করি না ও তাহার আবশ্যকও নাই; তবে দেবালয়ে যাইয়া মূর্ত্তির নিকট অন্যদের ন্যায় প্রণামাদি করিয়া থাকি। ভগবানের নাম জপ করাই আমাদের প্রধান সাধন। কিন্তু রাম অবতারে ইঁহাদের দৃঢ় বিশ্বাস আছে। ইঁহাদের মধ্যে শাস্ত্রজ্ঞ ও জ্ঞানী ব্যক্তিরা বেদ বেদান্ত প্রভৃতি পাঠ করিয়া থাকেন।

"এখান হইতে ৫।৬ মাইল দূরে অনসূয়া নামক এক পাহাড়ে অত্রীমুনির আশ্রম নামে একটী স্থান আছে, সেখানেও ২।১ জন সাধু থাকেন। এই সমস্ত স্থান নির্জ্জন সাধনের বিশেষ উপযোগী বলিয়া স্থানে স্থানে অনেক সাধু বাস করেন। দুর্ভাগ্যক্রমে সকলের সহিত আমার আলাপ করিবার সুবিধা হয় নাই, ভগবানের কৃপায় আমি এখানে ১৫ দিন বাস করিয়া ছিলাম। আমার নিকট অর্থ সম্বল না থাকায় আমি প্রত্যহ মধ্যাহ্ন সময়ে চিত্রকূটে যাইয়া এক এক দিন এক এক দেবালয়ে অতিথি হইতাম ও ডাল রুটী পাইয়া সন্তোষের সহিত আহার করিতাম, এখানে এত বাঁদর যে পাছে খাদ্য দ্রব্য কাড়িয়া লইয়া পলায়, সে জন্য আমার আহারের সময় একজন লোক লাঠি হস্তে পাহারা দিত। এইরূপে এই স্থানে ভগবানের অশেষ কৃপা উপভোগ করিয়া স্থানান্তরে যাই।

প্রেরিত পত্র।

(পত্র প্রেরকদিগের মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন, কিম্বা কাহারও পত্র ফেরত দিতে বাধ্য নহেন)

মান্যবর শ্রীযুক্ত তত্ত্বকৌমুদী সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু—
সবিনয় নিবেদন।

মহাশয়, আমার যে পত্র গত ১লা আশ্বিনের তত্ত্বকৌমুদীতে প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহার অনুপূরক স্বরূপ এই পত্রখানা পাঠাইতেছি; অনুগ্রহপূর্ব্বক ১৬ই আশ্বিনের তত্ত্বকৌমুদীতে প্রকাশ করিয়া বাধিত করিবেন।

উপনিষদের প্রত্যেক অধ্যায়ের শেষে যেরূপ "ওঁ শান্তিঃ হরি ওঁ" আছে, ভক্তিভাজন শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের প্রণীত উপাসনা পদ্ধতিতেও সেই প্রণালী অবলম্বিত হইয়া বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত প্রচলিত হইয়া আসিয়াছে। কালে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপিত হইলে উক্ত সমাজের উপাসনা পদ্ধতিতে "ওঁ" এবং "হরি" শব্দ পরিত্যক্ত হয়। এই পরিত্যাগের অন্য কিছু অর্থই বুঝি না। উক্ত সমাজের প্রথম মুদ্রিত "ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাসে" উল্লেখ আছে;—"যে সকল নাম ঈশ্বর-প্রতিপাদক নাম হইয়াও কোন দেব দেবীর প্রতি আরোপিত হইয়াছে তাহা ব্রহ্ম-প্রতিপাদক শব্দরূপে ব্যবহার নিষিদ্ধ।" এই জন্যই যে "ওঁ" এবং "হরি" শব্দ পরিত্যক্ত হইয়াছিল তাহা উল্লিখিত বাক্য দ্বারাই বুঝা যায়। অধুনা উক্ত সমাজ যে তাঁহাদের প্রতিষ্ঠিত নিয়ম ভঙ্গ করিয়া চলিয়াছেন তাহা সকলেরই বিদিত, আমরা তৎসম্বন্ধে কিছু বলিতে চাই না। আমাদের বক্তব্য কেবল সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ সম্বন্ধে। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ যে উপাসনা ও সঙ্গীতাদিতে "হরি" নাম ব্যবহার করিতে পারেন না, তাহা অনেক ব্রাহ্মের পত্রেই যথাযথ রূপে আলোচিত হইয়াছে। কিন্তু এইক্ষণ যে, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সংগীতাদিতে "হরি" শব্দের এত ছড়াছড়ি তাহার কারণ কি? এ সকল বিষয় যতই ভাবা যায়, যতই মূল অনুসন্ধান করা যায়, ততই দৃঢ়তররূপে ধারণা হয় যে ইহা আমাদের বংশানুগত দোষ। বাস্তবিকই ইহা বংশগত দোষ গুণের ন্যায় আমাদের ভিতরে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া রহিয়াছে, সুবিধা পাইলেই প্রকাশ হইয়া পড়ে। ইহা ভিন্ন আর কোনও কারণ দৃষ্ট হয় না।

অনেক দিন হইল আমার অতীব শ্রদ্ধেয় কোন বন্ধু আমাকে বলিয়াছিলেন "চন্দ্রমোহন, সন্দেশ খাইতে খাইতে যাহাদের রসনা উহার রসে বিভোর হইয়া গিয়াছে, তাহারা যেমন মিঠাইয়ের দোকানের নিকট দিয়া গমন করিলে স্বতঃই তাহাদের জিহ্বা রসাইয়া উঠে, তেমনই আমাদের হৃদয় একবার স্বভাবসিদ্ধ কোন ইচ্ছা, আবেগ বা ভাব দ্বারা বিকৃত হইলে, অন্য দিকে হাজার দৃঢ়তা থাকিলেও যখনই সেই প্রলোভনের সুযোগ পায় তখনই তাহাতে প্রাণ না ঢালিয়া থাকিতে পারে না। তখন অন্য সকল দিক দেখিবার ও বিবেচনা করিবার শক্তি বা ইচ্ছা থাকে না, আত্মদমনও অসম্ভব হইয়া পড়ে এবং সেই প্রলোভনের মাদকতা সকল জ্ঞান ও দৃঢ়তা ডুবাইয়া তাহাতেই বিভোর করে।" এই স্থলে এই কথা গ্রহণ করিলে বোধ হয় অন্যায় হইবে না। কেন না দেখিতে পাইতেছি যাহা এক সময় নিজ জ্ঞান বিবেচনা এবং বিশ্বাস অনুসারে দোষাবহ বলিয়া পরিত্যাগ করি, তাহাই আবার ভাবে পড়িয়া গ্রহণ করিয়া থাকি। নতুবা আমরা নিজকে ব্রাহ্ম, সমাজকে ব্রাহ্মসমাজ, ধর্ম্মকে ব্রাহ্মধর্ম্ম বলিয়া প্রচার করিয়া, ধীরে ধীরে বর্ত্তমান বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের বৈরাগ্য ধর্ম্ম অপব্যবহারের ন্যায় "হরি" শব্দ ব্যবহার করিয়া লোকের মনে ব্রাহ্মধর্ম্ম সম্বন্ধে ঘৃণা এবং দ্বৈধ ভাব জন্মাইয়া দিতেছি কেন? সেই জন্যই বলিতেছিলাম উহা বংশগত দোষ গুণের ন্যায় রক্তে, মাংসে, এবং হৃদয়ে এরূপ জড়িত হইয়া গিয়াছে যে উহা ছাড়িয়াও ছাড়িতে পারি না। যে প্রাচীন সম্প্রদায়ের সহিত ধর্ম্মাদি সম্বন্ধে সমভাব না থাকায় তাঁহাদিগের হইতে স্বতন্ত্র হইয়া পড়িয়াছি তাঁহারাও তাঁহাদের উপাস্য দেবতাকে হৃদয়ের গভীর ভাবব্যঞ্জক স্তোত্রাদি দ্বারা অর্চ্চনা করিবার সময় "ব্রহ্ম" নামে প্রকাশ না করিয়া পারেন না। এই "ব্রহ্ম" নাম এমনই মহান্। এমন হৃদয়গ্রাহী সুমধুর মহান্ ব্রহ্মনাম কেন যে প্রাণে ভাব উদ্রেক করিতে সক্ষম হইবে না বুঝি না। একটী কথা জিজ্ঞাসা করি ভক্তি, নামে না অন্য কিছুর উপর নির্ভর করে? অবশ্য সকলেই মুক্তকণ্ঠে বলিতে বাধ্য হইবেন যে ভক্তি প্রধানতঃ গুণ ও দর্শনের উপর নির্ভর করে। যখন দর্শন হয় অথবা প্রাণে উপলব্ধি হয় তখনই ভাব ও ভক্তি হয়। বিশ্বাসেও (Believe) মনে যে ভাবের উদয় না হয় এমন বলিতে পারি না, কিন্তু যে পর্য্যন্ত প্রকৃত বিশ্বাস (Faith) না হয় সে পর্য্যন্ত প্রকৃত ভাব,

তুক্তি হয় না। যে ভাব-ভক্তি-প্রভাবে চিরদিন পড়িয়া থাকিতে পারি না তাহার কোন প্রয়োজন নাই।

নামের মধ্যে বিশেষ কিছু মধুরতা আছে বলিয়া আমার তেমন মনে হয় না। "হরি", "কালী", প্রভৃতি যেমন "ব্রহ্ম"ও তেমন। তবে বিশ্বজনীন নাম গ্রহণই সুসঙ্গত। কোন নামেই মাদকতা নাই। কেন না যে মদ্যপানে লোক উচ্ছন্ন যাইতেছে সেই "সুরা" নামেরও তাহা নাই, যদি থাকিত তবে লোকে ধনে প্রাণে মারা যাইত না। অতএব নামের কোন গুণ নাই ইহা স্বীকার্য্য। তবে "হরি" নাম নিতে বাধা কি, ইহা বিচার্য্য। উহার বিচারের আবশ্যকতা নাই। কেন না আমরা যাঁহার উপাসক, যিনি আমাদের উপাস্য দেবতা, তাঁহার নামে নিজকে, সমাজকে, এবং ধর্ম্মকে জগতে প্রকাশ করিয়াছি অতএব অন্য নামের প্রয়োজন করে না। বিশেষতঃ ব্রাহ্মধর্ম্ম বিশ্বজনীন ধর্ম্ম ইহা অন্য নামে অভিব্যক্ত হওয়া উচিত নয়। "হরি" প্রভৃতি নাম বিশ্বজনীন ধর্ম্মে প্রচারিত হইতে পারে না। এদেশবাসী জাতি মাত্রেই জানে যে হিন্দুগণ "কৃষ্ণ", "বিষ্ণু", "চৈতন্য", এই তিনকেই "হরি" নামে প্রচার করিয়াছেন। একদা একজন শিক্ষিত ভক্ত বৈষ্ণবকে একজন হরিনাম ভক্ত ব্রাহ্ম জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন "মহাশয় "হরি" ও "কৃষ্ণ" ভিন্ন কি না?" তদুত্তরে তিনি ভাবের সহিত বলিলেন "না তাহা কখনই নহে যেই হরি, সেই কৃষ্ণ সেই আমার চৈতন্য" ব্রাহ্ম তদুত্তরে আবার "ব্রহ্ম" ও "হরি" এক বলাতে ভক্ত তাঁহার সঙ্গে আর আলাপ করা দূরে থাকুক স্থান পরিত্যাগের উদ্যোগ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন। এই ভক্ত বৈষ্ণবের ভক্তির সরলতা ও নিষ্ঠার গভীরতা অনুভব করিয়া পরে কি কেহ বলিতে পারিবেন লোকে "ব্রহ্ম" ও "হরি" এক বলিয়া বিশ্বাস করে? ব্রাহ্মসমাজ পূর্ব্বাবধি স্বীকার করিয়া আসিতেছেন যে, যে সকল নাম কোন দেব দেবী কি অবতারে আরোপ করা হইয়াছে সেই সকল নাম ব্রাহ্মসমাজে বিজ্ঞাপিত হইবে না এবং সেই নামে উপাসনাদি হইবে না এমত স্থলে "হরি" নাম ব্রাহ্মসমাজে "ব্রহ্ম" রূপে গ্রহণ করা কোনরূপে ন্যায়-সঙ্গত মনে করি না। কেহ কেহ বলেন "হরি" "ব্রহ্মের" নামান্তর। মানিলাম, নামান্তর তাহাতে কি লাভ হইল? দেশে যখন অন্য অর্থে ব্যবহৃত, তখন প্রয়োজন কি? অপর কেহ কেহ বলেন হরির প্রতিমূর্ত্তি নাই, তাহাই বা কেমন করিয়া বলিব? বিষ্ণুর যখন প্রতিমূর্ত্তি আছে তখন হরিরও প্রতিমূর্ত্তি আছে। "বাসবদত্তা" নামক পুস্তকে "হিরণ্যনগর ও হরিহর রূপ দর্শন" এই প্রস্তাব পাঠ করিলে মূর্ত্তি আছে কি না অথবা শ্রীমদ্ভাগবতে "হরি" শব্দে কাহাকে উল্লেখ করিয়াছেন তাহা পাঠ করিলে সকলেই জানিতে পারিবেন। এবং আমি বোধ করি সকলেই ইহা জানেন। অপর কেহ কেহ বলিয়া থাকেন "হরি" নামটী সিদ্ধ হইয়াছে "কালী" "দুর্গা" নামটীও ত সিদ্ধ কিন্তু "আল্লা" নামটী কি সিদ্ধ নহে? বরং "আল্লা" নামে কোনরূপ পৌত্তলিক ভাব নাই কেবল ভাষা অন্যরূপ। তবে হরিনাম ভক্তেরা "আল্লা" নাম তেমন ভাবে গ্রহণ করেন না কেন? ইহার জন্যই বলিতে হইতেছে ইহা আমাদের মজ্জাগত ও বংশানুগত ভাব।

বিশ্বজনীন ধর্ম্ম সংকীর্ণতায় আনা কর্ত্তব্য নহে এবং আমি অতীব দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে এই "হরি" নামের বাহুল্যতাই ব্রাহ্মধর্ম্মের মন্থর গতির অন্যতম কারণ। প্রাচীনেরা নব্যদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিয়া থাকেন যে "দেখ ব্রাহ্মদের রক্তের তেজ যেই পড়িয়া আসিতেছে এবং যেই ধর্ম্মের দিকে টান পড়িতেছে অমনি "হরি" ভিন্ন গতি দেখিতেছে না। অতএব তোমরা সাবধান হও। দেখিবে কয়েক দিন পরে "কালী" "দুর্গা" ও কাঁদিবে এবং প্রতি মূর্ত্তিও নির্ম্মাণ করিবে।"

তাই ব্রাহ্মধর্ম্মানুরাগী এবং এই মহান্ ধর্ম্মের মহত্ব ও পবিত্রতা রক্ষণে যত্নশীল মহোদয়গণকে সানুনয়ে বলিতেছি আপনারা সময় থাকিতে হরি নামরূপ প্রাচীন ধর্ম্মের আবরণ হইতে প্রিয়তম সুমহান্ ব্রাহ্মধর্ম্মকে রক্ষা করুন এবং এই রক্ষার জন্য বদ্ধপরিকর হউন নতুবা কিছুকাল পরে অন্যান্য একেশ্বর-বাদের ন্যায় ইহাও "হরি" নামরূপ মহা আবর্ত্তে পড়িয়া হিন্দু-সমাজের কুক্ষিগত হইবে। এখনও সময় আছে। সময় থাকিতে জাগ্রত হউন, উত্থান করুন, পড়িয়া থাকিবার সময় নাই। যাঁহার যতটুকু শক্তি আছে তাহা ব্যবহার করিতে কেহ নিশ্চেষ্ট থাকিবেন না।

ব্রাহ্মপল্লী ময়মনসিংহ
১২ই আশ্বিন ১৩০০ } শ্রীচন্দ্রমোহন বিশ্বাস

শ্রদ্ধাস্পদ

শ্রীযুক্ত তত্ত্বকৌমুদী পত্রিকার সম্পাদক
মহাশয় শ্রদ্ধাস্পদেষু—

মহাশয়!

আমার এই পত্র খানি তত্ত্বকৌমুদী পত্রিকায় প্রকাশ করিলে অনুগৃহীত হইব।

কোন বিশেষ কারণে আজ কাল ব্রাহ্মসমাজে গুরুবাদ ও মধ্যবর্ত্তিবাদ লইয়া বিশেষ আন্দোলন হইতেছে ও তজ্জন্য স্থানে স্থানে সভা সমিতিও হইতেছে। কিন্তু যেরূপ ভাবে ইহার আন্দোলন হইতেছে, তাহাতে এই গুরুতর বিষয়ের মীমাংসা হওয়া দূরে থাকুক বরং আরও অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা। আমার বিবেচনায় উক্ত গুরুতর বিষয়ের এইরূপ ভাবে আন্দোলন না হইয়া উহার মধ্যে কিছু সত্য আছে কি না তাহাই ধীরভাবে বিচার করা উচিত। স্বপক্ষে (যাঁহারা গুরু স্বীকার করেন না) ও বিপক্ষে (যাঁহারা ব্রাহ্মসমাজের সাধনপ্রণালীর অসম্পূর্ণতা অনুভব করিয়া গুরু গ্রহণ করিয়াছেন,) যে সমস্ত যুক্তি ও অভিজ্ঞতার সাক্ষ্য দেখা যাইতেছে, তাহাতে নিম্নলিখিত তিনটী বিষয় মীমাংসীত না হইলে, এই গোলযোগ মিটিবার সম্ভাবনা কম বলিয়া বোধ হয়। সুতরাং আমি ব্রাহ্মসাধারণের মনযোগ আকর্ষণ জন্য সেই তিনটী প্রশ্ন নিম্নে লিখিতেছি, আশা করি ব্রাহ্ম মহোদয়গণ ধীরভাবে নিম্নলিখিত তিনটী বিষয় বিচার করিয়া দেখিবেন।

১ম প্রশ্ন। ব্রাহ্মসমাজের প্রচলিত সাধন প্রণালীর মধ্যে কিছু অসম্পূর্ণতা আছে কি না?

২য় প্রশ্ন। ব্রাহ্মসমাজ কখনও অভ্রান্ত গুরু স্বীকার করেন না ও করিতে প্রস্তুতও নহেন। কিন্তু এতদিন যেভাবে গুরু স্বীকার করিয়া আসিয়াছেন, বর্ত্তমান সময়ে তাহার কিছু ব্যতিক্রম হইতেছে। এখন প্রশ্ন এই যে, ধর্ম্ম রাজ্যে অগ্রগামী কোন অভিজ্ঞ ব্যক্তির নিকট [ব্যক্তি কে? তাহার কোন কথা হইতেছে না।] বিশেষ ভাবে ধর্ম্ম শিক্ষা করা ব্রাহ্মধর্ম্মের অনুমোদিত কি না?

৩য় প্রশ্ন। যোগ শিক্ষাকারিগণ বলেন যে, ঈশ্বর সকলের মধ্যে সমভাবে বর্ত্তমান থাকিয়া সকলকে আপনার দিকে আকর্ষণ করিলেও, জনসাধারণ বিষয়মোহ ও কাম ক্রোধাদির বশীভূত হইয়া, এতদূর আত্মবিস্মৃত ও বহির্ম্মুখীন হইয়া পড়িয়াছে যে তাহারা তাঁহাকে দেখিতে পাওয়া দূরে থাকুক, যে পথ অবলম্বন করিলে তাঁহাকে পাওয়া যায়, তাহাও তাহারা অবলম্বন করিতে পারে না। সুতরাং কোন একজন অভিজ্ঞ ব্যক্তি তাঁহার আত্মশক্তি দ্বারা বিষয়ী ব্যক্তির বহির্ম্মুখীন মনকে অন্তর্ম্মুখীন করিয়া,ব্রহ্ম দর্শনের পথ খুলিয়া দিতে পারেন। ইহারই নাম শক্তি সঞ্চার। এরূপ শক্তি সঞ্চারের মধ্যে কোন সত্য আছে কি না?

এক্ষণে ব্রাহ্ম ভ্রাতাদিগের নিকট বিনীত নিবেদন, তাঁহারা উক্ত তিনটী প্রশ্ন গভীর ভাবে বিবেচনা করিয়া উহাদের মধ্যে যদি কিছু সত্য থাকে, তবে তাহা ব্রাহ্মধর্ম্মের অঙ্গীভূত করিয়া লউন; নচেৎ হাজার হাজার লোকে বহু বৎসর ধরিয়া উহার বিরুদ্ধে চীৎকার করিলেও বর্ত্তমান গোলযোগ মীমাংসা হইবে না। ইতি

৮ই কার্ত্তিক, ১৩০০। } সেবক, শ্রীসত্যদর্শী।

ব্রাহ্মসমাজ।

দান—করটীয়া নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু হরনাথ ঘোষ মহাশয় তদীয় স্বর্গীয়া পত্নী শৎকুমারী ঘোষের স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে ১০০৲ টাকা দান করিয়াছেন। ঐ টাকা দ্বারা "শরৎকুমারী ফণ্ড" নামে একটী ফণ্ড স্থাপিত হইবে।

সভাসমিতি—গত ২৩এ অক্টোবর হইতে ২৬এ পর্য্যন্ত ৪ দিন ঢাকা নগরীতে পূর্ব্ব বাঙ্গালা ব্রাহ্মসম্মিলনীর অধিবেশন হইয়া গিয়াছে।

বিগত ১২ই অক্টোবর বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ৬টা ১৫ মিনিটের সময় সিটি কলেজ গৃহে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অধ্যক্ষ সভার তৃতীয় ত্রৈমাসিক অধিবেশন হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত বাবু আনন্দ মোহন বসু সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সভার অন্যান্য কার্য্যের পর শ্রীযুক্ত বাবু চণ্ডীকিশোর কুশারী মহাশয়ের নিম্নলিখিত প্রস্তাব উপস্থিত হয় যে "সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের উপাসনা, বক্তৃতা, সঙ্গীতাদিতে যেন "হরি" অথবা পৌত্তলিকতা সূচক অন্য কোনও নাম ব্যবহার করা না হয় এবং যেন সঙ্গীত ও অন্যান্য পুস্তকের নূতন সংস্করণে ঐ সকল নাম বাদ দেওয়া হয়"। শ্রীযুক্ত বাবু শরচ্চন্দ্র রায় তাঁহার প্রস্তাবের অনুমোদন করেন।

শ্রীযুক্ত বাবু হেরম্বচন্দ্র মৈত্র এই প্রস্তাবের সংশোধন করিয়া প্রস্তাব করেন যে বাবু চণ্ডীকিশোর কুশারী মহাশয়ের প্রস্তাব এবং এতদ্ বিষয়ক অন্যান্য পত্রাদি কার্য্যনির্ব্বাহক সভায় প্রেরিত হউক, তৎপরে তাঁহারা বিবেচনা করতঃ যাহা কর্ত্তব্য মনে করেন, তাহা অধ্যক্ষ সভাকে জানাইবেন। শ্রীযুক্ত বাবু শরচ্চন্দ্র রায় এই প্রস্তাবের সহিত একমত হইয়া পূর্ব্বপ্রস্তাবের সমর্থন পরিহার করেন এবং এই প্রস্তাবের সমর্থন করেন।

তৎপরে সভা ভঙ্গ হয়।

মৃত্যু—শ্রীযুক্ত বাবু নিবারণচন্দ্র রায় লিখিয়াছেন কাঁথি নিবাসী বাবু হরিপ্রসাদ দে সরকার আর ইহলোকে নাই। তিনি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের একজন উৎসাহী সভ্য ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে স্থানীয় ব্রাহ্মসমাজ একজন উদ্যমশীল ব্যক্তিকে হারাইলেন। হরিপ্রসাদ বাবু ৬।৭ মাস হইতে বহুমূত্র রোগগ্রস্ত হইয়াছিলেন। গত ১২ই অক্টোবর তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। পরমেশ্বর তাঁহার আত্মাকে শান্তিতে রক্ষা করুন।

দীক্ষা—মান্দ্রাজ হইতে অত্রত্য ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক মহাশয় লিখিয়াছেন:—

"গত ১লা অক্টোবর রবিবার সন্ধ্যা সার্দ্ধ ছয় ঘটিকার সময় স্থানীয় ব্রহ্মোপাসনা মন্দিরে শ্রীযুক্ত এল্ সুব্রহ্মণ্যম্ আয়ার ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছেন। ইনি এখানকার খৃষ্টান কলেজের সিনীয়র বি, এ, ক্লাসে অধ্যয়ন করেন। এতদুপলক্ষে, ব্রহ্মোপাসনা হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত এম্, আর, ভেঙ্কাটা রত্নম্ নয়াড় গারু এম্, এ, মহাশয় আচার্য্যের কার্য্য করেন। তদীয় অগ্নিময় উপদেশ বাক্য শ্রবণ করিয়া শ্রোতৃবর্গ প্রোৎসাহিত হইয়াছিলেন এবং নব দীক্ষিত ভ্রাতার অন্তরে ব্রাহ্মধর্ম্মের সত্য সকল সুদৃঢ় রূপে মুদ্রিত হইয়াছিল। ঈশ্বর এই ধর্ম্মমণ্ডলীকে আশীর্ব্বাদ করুন এবং ভারত মাতার শ্রেষ্ঠ সন্তান মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের প্রচারিত পরম ধর্ম্ম অবলম্বন করিবার জন্য লোকের চিত্তকে আকর্ষণ করুন।"

বিবাহ—গত ৩রা অক্টোবর কলিকাতা নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু হেমচন্দ্র দাসের কন্যা শ্রীমতী গিরিবালা দাসের সহিত শ্রীহট্ট নিবাসী বাবু প্রতুলচন্দ্র সোমের বিবাহ ব্রাহ্ম-পদ্ধতি অনুসারে নিষ্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী আচার্য্যের কার্য্য করেন। ৩ আইন অনুসারে এই বিবাহ রেজেষ্টারী করা হয়। পাত্রের বয়স ২১ বৎসর এবং কন্যার বয়স ১৭ বৎসর।

গত ৫ই কার্ত্তিক শনিবার আমাদের ঢাকাস্থ বন্ধু শ্রীযুক্ত বাবু নবকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের দ্বিতীয়া কন্যা শ্রীমতী সুবালা দেবীর সহিত শিলং প্রবাসী শ্রীযুক্ত বাবু হরকিশোর

শর্ম্মার বিবাহ পূর্ব্ববাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজ গৃহে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। বিবাহ সভাতে স্থানীয় ব্রাহ্মগণ এবং ঢাকার কতিপয় গণ্য মান্য লোক উপস্থিত ছিলেন। বাবু চণ্ডী-কিশোর কুশারি এবং বাবু নীলমণি চক্রবর্ত্তী দ্বারা বিবাহের কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছিল। শিলংস্থ বাবু শিবনাথ দত্ত বর কন্যাকে উপদেশ দিয়াছিলেন। উপদেশটী অতি হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। পূর্ব্ববাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজ গৃহে এই সর্ব্ব প্রথম ব্রাহ্মবিবাহ কার্য্য সম্পন্ন হইল। বর শিলং চিফ কমিশনরের আফিসে কার্য্য করেন। বয়স ২৭ বৎসর। কন্যার বয়স ২১ বৎসর। ১৮৭২ সনের তিন আইন অনুসারে এই বিবাহ রেজেষ্টারী হইয়াছে।

গত ১৪ই কার্ত্তিক, সোমবার কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটস্থ ১০।৩ নং ভবনে একটী ব্রাহ্মবিবাহ হইয়া গিয়াছে। পাত্র শ্রীযুক্ত বাবু সীতানাথ দত্ত বিপত্নীক, বয়স ৩৭ বৎসর। পাত্রী, শ্রীযুক্ত মথুরানাথ মুখোপাধ্যায়ের মধ্যমা কন্যা কুমারী শ্রীমতী কাদম্বিনী মুখোপাধ্যায়, বয়স ২৩ বৎসর। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় আচার্য্যের কার্য্য করেন। এই বিবাহ ১৮৭৩ সালের ৩ আইন অনুসারে রেজেষ্টারী করা হয়।

পীড়া—আমাদিগের লক্ষ্ণৌ নিবাসী প্রচারক শ্রীযুক্ত ভাই লছমন প্রসাদ অনেক দিন হইতে জ্বর রোগে কষ্ট পাইতে ছিলেন। তিনি প্রায় ২০ দিন সংজ্ঞাহীন ছিলেন। এখন আর জ্বর হয় না বটে, কিন্তু তিনি এতাদৃশ দুর্ব্বল হইয়াছেন যে প্রায় দুই মাস শয্যাগত থাকিতে হইবে। নানা স্থান হইতে তাঁহার বন্ধুগণ পত্র লিখিয়াছেন। কিন্তু তিনি এখন সে সকলের উত্তর দিতে অসমর্থ। বন্ধুগণ তাঁহার জন্য প্রার্থনা করুন।

শ্রীযুক্ত বাবু সীতানাথ দত্ত অনেক দিনের পরিশ্রমের পর ঈশ, কেন, কঠ, প্রশ্ন, মুণ্ডক, ও মাণ্ডুক্য এই কয়েক-খানি উপনিষদ টীকা ও অনুবাদ সহিত মুদ্রিত করি-য়াছেন। এই কার্য্যটী তিনি অতিশয় নিষ্ঠার সহিত সম্পাদন করিয়াছেন। যে দিন পুস্তকখানি বাহির হয় সে দিন এতদর্থে বন্ধু বান্ধবকে লইয়া বিশেষ উপাসনা করিয়াছিলেন। ইহা শুনিয়া আমরা প্রীত হইয়াছি। কারণ ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থ যে কার্য্যই করুন তাহা পরব্রহ্মের নামে উৎসর্গ করা কর্ত্তব্য। আমাদের যতদূর স্মরণ আছে, আমাদের পরলোকগত বন্ধু জগদীশ্বর গুপ্ত মহাশয় ও তাঁহার প্রণীত চৈতন্যচরিত যে দিন শেষ করেন, সে দিন বিশেষ উপাসনা করিয়াছিলেন। ব্রাহ্ম গ্রন্থকারদিগের এইরূপই কর্ত্তব্য। সীতানাথ বাবুর গ্রন্থখানি অতি সাবধানতার সহিত প্রণীত হইয়াছে। টীকাতে তিনি শঙ্করেরই অনুগমন করিয়াছেন বলিয়া তাঁহার নাম "শঙ্করানুগা" রাখিয়াছেন। অনুবাদ মূলের প্রকৃত ভাবব্যঞ্জক অথচ সুযোগ্য হইয়াছে। গ্রন্থখানি ২১০।৩।২ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট গ্রন্থকারের নিকট পাওয়া যায় মূল্য ১৲ টাকা।

পরলোকগত জগদীশ্বর গুপ্ত মহাশয় তাঁহার শ্রীপণ্ডস্থ বাসভবনে পূজার সময় ব্রহ্মোৎসব করিতেন। আমরা দেখিয়া সুখী হইলাম যে তাঁহার বিধবা পত্নী তাঁহার এই প্রথাটী যত্নের সহিত রক্ষা করিতেছেন। এবারে তিনি কলিকাতা হইতে কতিপয় ব্রাহ্মবন্ধুকে এতদর্থ নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন। তাঁহারা কয়েক দিন তাঁহার ভবনে বাস করিয়া উপাসনা সংগীত সংকীর্ত্তনাদি দ্বারা ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিয়া আসিয়াছেন।

কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করা যাইতেছে যে বিক্রমপুরের দুর্ভিক্ষ নিবারণার্থে নিম্নলিখিত রূপ দান পাওয়া গিয়াছে;

গত প্রকাশিতের পর।

বাবু রাধাবল্লভ চৌধুরী, কলিকাতা		৫৲
,, বৈকুণ্ঠনাথ দাসের দ্বারা আদায়		।০
,, বিপিনবিহারী সেন, আহিরি টোলা, কলিকাতা		১৲
,, গোপালচন্দ্র মল্লিক, কলিকাতা		১৲
,, ক্ষেত্রমোহন দত্ত	ঐ	১৲
শ্রীমতী সরস্বতী সেন	ঐ	১৲
মাং বাবু কৈলাসচন্দ্র বাগচি, পাবনা।		
বাবু দুর্গানাথ বাগচি, পাবনা		২৲
,, গিরীশচন্দ্র রায়	ঐ	
,, মোহিনীমোহন চক্রবর্ত্তী	ঐ	
,, বৈদ্যনাথ ছকি	ঐ	
,, দ্বারিকানাথ বিশ্বাস	ঐ	১৲
,, বিপিনচন্দ্র পাল	ঐ	॥০
,, শ্রীশচন্দ্র রায়	ঐ	।০
জনৈক বন্ধু	ঐ	১৲
দুই বন্ধু	ঐ	৸০
বাবু হেরম্বচন্দ্র মৈত্র	কলিকাতা	৪৲
,, কেদারনাথ কুলভি, বাঁকুড়া		১॥০
শ্রীমতী অম্বিকা দেবী,	কোন্নগর	১০৲
বাবু বটকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, কলিকাতা		১৲
,, শ্যামাচরণ বসু ৬৪।১ সুকিয়া ষ্ট্রীট, কলিকাতা		১৲
শ্রীমতী কুমারী গুপ্ত নশিপুর, মুরশিদাবাদ		২৲
বাবু জগন্নাথপ্রসাদ গুপ্ত	ঐ	
শ্রীমতী স্বরস্বতী গুপ্ত	ঐ	
বাবু অধরচন্দ্র মজুমদার	কলিকাতা	
,, রসিকলাল পাইন	ঐ	
,, সত্যনারায়ণ শাস্তগিরী	নসরিগঞ্জ, আরা	
,, মহেন্দ্রনাথ সরকার	ফয়জাবাদ	
হোসেঙ্গাবাদ জনৈক বন্ধু		১০৲
বাবু বনমালী রায়, জমিদার,	বনওয়ারী নগর	২০০৲
,, উদয়রাম দাস মিসা,	আসাম	
,, শশিভূষণ বিশ্বাস,	কলিকাতা	৫৲
,, গোবিন্দলাল রায়	চোরবাগান কলিকাতা	২৲
,, মহেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	ঐ	
,, নবীনকৃষ্ণ গুপ্ত	মুর্শিদাবাদ	
শ্রীমতী বিধুমুখী রায় চৌধুরী	কলিকাতা	
বাবু কালীনারায়ণ রায়	দিঘাপতিয়া	৪৲
ডাক্তার এম, এম, বসু	কলিকাতা	১৲
,, পি, সি, রায়	ঐ	২৲
রায় গুণাভিরাম বড়ুয়া বাহাদুর,	ঐ	১৲
বাবু কেদারনাথ রায় সি, এস্	ঐ	১৲
,, রামদুর্ল্লভ মজুমদার	ঐ	৪৲
,, অভয়চরণ মল্লিক	ঐ	২৲
,, বিপিনবিহারী দত্ত	ঐ	১৲
ডাক্তার বিপিনবিহারী সরকার	ভবানীপুর	১৲
শ্রীমতী শৈলবালা রায়	কলিকাতা	১০৲
বাবু দেবেন্দ্রনাথ পাল	ঐ	২৲
,, ক্ষেত্রমোহন দাস, প্রেসিডেণ্ট বালিশিরা আত্মীয় সমিতি কালীঘাট দক্ষিণ শ্রীহট্ট		১০৲
		৩১৯৲
	পূর্ব্ব প্রকাশিত	৫৮৲
		৩৭৭৲

২১১নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট ব্রাহ্ম মিশন যন্ত্রে শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দত্ত কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও ১৭ই কার্ত্তিক প্রকাশিত।

// Masthead: তত্ত্ব-কৌমুদী

ধর্ম্ম ও সমাজতত্ত্ব বিষয়ক পাক্ষিক পত্রিকা।

বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২৷৷০
মফস্বলে ৩
প্রতি খণ্ডের মূল্য ৵০

১৫শ সংখ্যা।
১৬শ ভাগ।

১লা অগ্রহায়ণ, বুধবার, ১৮১৫ শক, ব্রাহ্ম সম্বৎ ৬৪।

ধরে থাকি তোমারি কৃপায়।

পড়িয়া উঠিয়া, উঠিয়া পড়িয়া,
অনুতাপ অশ্রু মুছিতে মুছিতে;
ধৈর্য্যডোর দৃঢ় ছিঁড়িয়া, যুড়িয়া,
সংকল্পের ঘর ভাঙ্গিতে গড়িতে,
ধাইছে জীবন ভাই জীবন-জলধি-পানে
দেয় না ক্ষণেক দাঁড়ায়ে ভাবিতে।

এই ত নিয়তি, আসেছে শকতি,
দুর্ব্বলতা মাঝে, উঠিতে পড়িতে;
সংগ্রাম—সংগ্রাম—এই জেনো গতি,
এই বিধি ভাই এ মর্ত্ত্য মহীতে;
হায় হায় করে তবে বিষাক্ত-বিষাদ-বাণে
শান্তিহীন কেন করিতেছ চিতে?

পতনের তরে, মুখে অশ্রু ঝরে
ঝরুক সে অশ্রু বহু মূল্য তার;
শোকাশ্রু ভিতরে, চাও আশা ভরে
দিওনা ঘেরিতে নিরাশ আঁধার!
আশা যদি বেঁচে থাকে সকলি রহিল ভাই,
তাঁর কৃপা ধরে উঠিবে আবার।

দেও শুভ মতি তবে বিশ্বপতি
পড়েও আশাতে উঠিয়া দাঁড়াই;
বিশ্বাসে নির্ভরে জাগুক শকতি;
উঠি কিম্বা পড়ি তব পানে ধাই।
দুর্ব্বলে, সবলে, সদা, আলোকে আঁধারে যেন
ধরে থাকি তোমারি কৃপায়।

সম্পাদকীয় মন্তব্য।

ব্রাহ্মধর্ম্ম কি দিয়াছেন?—আমরা অনেক সময় নিরাশার কথা বলি ও শুনিতে পাই। আমরা ব্রাহ্মধর্ম্মের আশ্রয় লইয়া জীবনকে আশানুরূপ উন্নত করিতে পারি নাই। যাহা ছিলাম তাহাই রহিয়াছি। এই কথা কি সত্য? আমরা যাহা ছিলাম তাহাই কি রহিয়াছি? আমাদের জীবনের কি কিছুই উন্নতি হয় নাই? ঈশ্বরের পরিত্রাণপ্রদ করুণা কি আমাদের জীবনের কোন পরিবর্ত্তন ঘটায় নাই? আত্মজীবনে ও অন্যের জীবনে কোন পরিবর্ত্তনের চিহ্ন কি দেখিতে পাই নাই? ধর্ম্মবিশ্বাস মানব প্রাণে কি পরিবর্ত্তন ঘটায়? ধর্ম্ম মানুষকে কি দেয়? মানুষ কি জন্য ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করে? ইহার প্রধান উদ্দেশ্য দুইটী। প্রথম পাপ হইতে উদ্ধার হওয়া—দ্বিতীয় শান্তি-লাভ। মানুষ নানা প্রকার পাপের ও দুষ্প্রবৃত্তির অধীন। ঈশ্বরের নাম, ঈশ্বরের করুণা, প্রথম মানুষকে পাপ হইতে বাঁচায়। আর মানুষ নানা প্রকার শোক তাপের অধীন। দুঃখ দারিদ্র্য মানুষকে সর্ব্বদা যন্ত্রণা দেয়। ঈশ্বর বিশ্বাস মানুষকে রোগ শোক দুঃখ দারিদ্র্যের মধ্যে সান্ত্বনা দেয়। ব্রাহ্ম নর-নারীর মধ্যে এসব চিহ্ন কি আমরা দেখিয়াছি? নিজের জীবনের ও অন্যের জীবনের দিকে চাহিয়া ঈশ্বর করুণার এই সাক্ষী কি আমরা দিতে পারি না, যে ব্রাহ্মধর্ম্মের পরিত্রাণপ্রদ স্পর্শে আমরা অনেক পাপ হইতে উদ্ধার পাইয়াছি। ঈশ্বরের করুণা ব্রাহ্মধর্ম্ম ও ব্রাহ্মসমাজরূপ দ্বার দিয়া আমাদের জীবনকে পবিত্র ও উন্নত করিয়াছে এসাক্ষী কি আমরা জগতের নিকটে দিতে পারি না? আমরা স্থির-চিত্তে ভাবিয়া দেখি আমরা কি ছিলাম, কি হইয়াছি। যে হৃদয় কেবল পাপের পথে ছুটিত আজ সেই হৃদয়ে কি পাপের প্রতি ঘৃণা ও ধর্ম্মের প্রতি অনুরাগ দেখিতে পাই না? ঈশ্বরের করুণা স্মরণ, তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়া ও সেই করুণার সাক্ষী দেওয়া, প্রত্যেক ব্রাহ্মের পক্ষে কর্ত্তব্য। অপূর্ণ জীবনের দুর্ব্বলতা ও ত্রুটি একেবারে দূর হয় না; পড়িব উঠিব আবার প্রার্থনা করিব, ইহাতে আত্মার বল বৃদ্ধি হয়। আমরা নিজের জীবনে ও অন্যের জীবনে ঈশ্বরের দয়া দেখিয়া, ব্রাহ্মধর্ম্মের পরিত্রাণপ্রদ শক্তি দেখিয়া আজ কৃতজ্ঞ অন্তরে তাঁহার করুণার সাক্ষী দিতেছি। ব্রাহ্মধর্ম্ম আমাদিগকে অনেক পাপ হইতে রক্ষা করিয়াছেন; ধর্ম্মের দিকে আকৃষ্ট করিয়াছেন। ঈশ্বরের করুণারূপী ব্রাহ্মধর্ম্ম কি আমাদিগকে শোক দুঃখের

মধ্যে শান্তি দেন নাই? সন্তানের মৃত্যুতে পিতা মাতা যখন অধীর না হইয়া প্রশান্তভাবে ঈশ্বর-চরণে প্রার্থনা করেন "প্রভো তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক" তখন জীবনে ব্রাহ্মধর্ম্ম জয় যুক্ত হইল ইহা কি বলিতে পারি না? স্বামীর মৃত্যুতে যখন শিশুসন্তান লইয়া সংসারে ভাসমানা পত্নী ঈশ্বরের চরণে প্রার্থনা করেন "প্রভো আমার সংসারের স্বামী, পরম স্বামী যে তুমি তোমার আশ্রয়ে আমাদিগকে রাখিয়া গিয়াছেন; আমাদের ভয় কি; তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক। আমার স্বামীকে তোমারই অমৃত ক্রোড়ে লইয়াছ, তোমার দয়া ধন্য।" তখন কি ব্রাহ্মধর্ম্মের শান্তিপ্রদ শক্তি দেখিতে পাই না? ঘোর শোক যন্ত্রণার মধ্যে তাঁহার দয়া কি হৃদয়ে অমৃত ও শক্তি প্রদান করে নাই। আত্মজীবনে ও পরজীবনে তাঁহার দয়ার হস্ত ব্রাহ্মধর্ম্মের পরিত্রাণ-প্রদ শক্তি স্মরণ ও অনুভব করিয়া কৃতজ্ঞ হইতেছি। তাঁহার করুণার সাক্ষী কি দিব না? আমরা সকলে এই সাক্ষী দি যে ব্রাহ্মধর্ম্মের সুশীতল চরণে আশ্রয় লইলে পাপীর পাপ যায় ও শান্তি পাওয়া যায়।

প্রচার-সহায়—প্রত্যেক ধর্ম্মসম্প্রদায়ের দৈনিক জীবনে দেখা যায় যে, আপনারা যে ধর্ম্ম বিশ্বাস করে বা যাহা দ্বারা নিজেরা পরিত্রাণ লাভ করিয়াছে, তাহা জগতে প্রচারিত হউক বা সকলে গ্রহণ করুক এই জন্য শারীরিক মানসিক বা আর্থিক সকল প্রকার সাহায্য দান করিয়া থাকে। ব্রাহ্মধর্ম্মে যাঁহারা প্রবেশ করিয়াছেন, তাঁহারা কেবল সহায় নহেন তাঁহারা প্রত্যেকেই প্রচারক। কিন্তু এই মহাসত্য পাইয়াও দেখিতেছি প্রচারের জন্য ব্যগ্রতা দূরে থাকুক, প্রচারের সহায়তার জন্যও অনেক ব্রাহ্মের তেমন ব্যগ্রতা নাই। প্রচারক কোন স্থানে গেলে সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া নানাপ্রকারে প্রভুর নাম প্রচারের সুবিধা করিয়া দেওয়া, কি অর্থের দ্বারা সাহায্য করা, ইহার জন্যও তেমন আগ্রহ দেখা যায় না। হয়ত প্রচারক ধার করিয়া চলিয়া আসিলেন, কিন্তু সেখানে স্বচ্ছল অবস্থাপন্নব্রাহ্ম রহিয়াছেন, দুইটী টাকা পাথেয় দিতে পারিলেন না। ইহাতে এই বুঝা যায় ব্রাহ্মধর্ম্মকে তাঁহারা এত প্রিয় জ্ঞান করেন না যে সে জন্য কিঞ্চিৎ ব্যয় করিতে পারেন। অর্থের মায়া কি সাংসারিক সুখ-স্পৃহা এত প্রবল যে ধর্ম্ম তাহার উপর আপনার প্রভুত্ব স্থাপন করিতে পারেন নাই। ব্রাহ্মগণ নূতন ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন, নূতন জিনিস জগৎকে দিতে যাইতেছেন, এ সময় তাঁহাদের কত শ্রম কত ত্যাগ স্বীকার করিলে এ কার্য্যে সফলতা লাভ করিতে পারিবেন, তাহা প্রত্যেকের ভাবিয়া দেখা উচিত। কর্ত্তব্য জ্ঞানেও প্রচার-কার্য্যে সহায় হওয়া প্রত্যেক ব্রাহ্মের কর্ত্তব্য। আবার অনেক স্থলে দেখি ব্রাহ্মদিগের অপেক্ষা অপর সম্প্রদায়ের লোকের নিকট অধিক সাহায্য প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাঁহারা অর্থ সাহায্য করেন, আমাদের পুস্তক ও পত্রিকাদি গ্রহণ করেন। ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারে ব্রাহ্মগণের যখন এত ঔদাসীন্য তখন প্রচারক সংখ্যা বর্দ্ধিত না হওয়া কিছুই আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। যাঁহারা উৎসাহিত হইয়া আসেন তাঁহারাও এই ঔদাসীন্য দর্শনে নিরুৎসাহ হইয়া যান। শুনিতে পাই এমন ব্রাহ্মও অনেক আছেন, যাঁহারা নিজ সমাজের কাগজ না লইয়া অপর সমাজের কাগজ লইয়া থাকেন। এরূপ ভাব দেখিয়া কিছু বলিলে অনেক সময় তাঁহারা উদারতার কথাই বলেন। যাহা হউক ইঁহাদের প্রতি আমাদের পরামর্শ এই যে সমাজে থাকিয়া নিজে কৃতকৃতার্থ হইতেছ সর্ব্বাগ্রে তাহাকে বাঁচাইতে চেষ্টা কর। তোমাদের সমাজের কাগজ যদি মনের মতও না হয় তবু গ্রহণ কর, তোমাদের প্রচারকগণ মনের মত নয় তবু সহায়তা কর বরং মনের মত করিতে সর্ব্বদা সচেষ্ট হও, তাহাতে দোষ নাই। কিন্তু প্রচার-সহায় হইতে কখনই উদাসীন হইও না। ঈশ্বর ব্রাহ্মসাধারণকে তাঁর ধর্ম্মপ্রচারের সহায় করিয়া লউন।

আদেশবাদ—ব্রাহ্মধর্ম্মে যখন অভ্রান্ত শাস্ত্রবাদ কি অভ্রান্ত গুরুবাদ নাই, প্রত্যেক ব্রাহ্মই আপনার বিবেক অনুসারে চলিবেন এবং তাহাতেই আত্মার অনন্ত উন্নতি সাধিত হইবে, এই যখন বিশ্বাস; তখন বিবেকের অনুসরণ ব্যতীত ব্রাহ্মের আর গত্যন্তর নাই। বিবেকের আজ্ঞা ছাড়িয়া বা অমান্য করিয়া শাস্ত্র বা মানুষের অনুসরণ করিলে তিনি আর ব্রাহ্ম বলিয়া অভিহিত হইবারই যোগ্য থাকিলেন না। ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া, ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করিয়া,—এই শিক্ষা এই উপদেশই পাইয়াছি বা জীবন্ত ব্রহ্মের নিকট এই শিক্ষা বা এই উপদেশ পাইয়াই ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছি। যদি ইহা বিশ্বাস না করিয়াও কোন লোক ব্রাহ্মসমাজভুক্ত হইয়া থাকেন তাহা ব্রাহ্মধর্ম্মের বা ব্রাহ্মসমাজের দোষ নয়। কিন্তু ব্যক্তিবিশেষের দুর্ব্বলতা। এই বিবেককেই বিশ্বাসী ব্যক্তিরা ঈশ্বরের আদেশ বা ঈশ্বরবাণী বলিয়া ব্যাখ্যা করেন। প্রভেদ এই, বিবেক বলিতে ঈশ্বরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগ বুঝায় না কিন্তু আদেশ ও বাণী বলিতে ঘনিষ্ঠ যোগ বুঝায়। ফলতঃ ঈশ্বর আদেশ ব্যতীত ধর্ম্ম জিজ্ঞাসুর প্রকৃত জীবন্ত ধর্ম্ম জানিবার অন্য উপায় নাই। বিশেষ পুরাতন ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া নবধর্ম্মে কোন লোক আসিতে পারে না। নবধর্ম্মের জন্য কোন লোক সংসারের সকল আশা ছাড়িয়া জীবন উৎসর্গ করিতে পারে না। তখনই দুর্ব্বল মানুষ সবল হয় এবং সকল বাধা বিঘ্ন ছাড়িয়া ঈশ্বরের পথ অনুসরণ করিতে পারে, যখন সে আপনার প্রভুর আজ্ঞা প্রাপ্ত হয়। পিতার আদেশেই দুর্ব্বল সন্তানের প্রাণে বলের অভ্যুদয় হয়, ব্রাহ্মসমাজ এই মহাসত্য ঘোষণা করিয়াছেন বিশেষতঃ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ এই মহাসত্যেরই অনুসরণ করিয়া ঈশ্বরের সেবা করিতেছেন। তবে আদেশবাদের বিরুদ্ধে কখন কখন কোন কোন কথা হইয়াছে সত্য কিন্তু তাহা আদেশবাদের বিরুদ্ধে নয় প্রকৃতরূপে অভ্রান্ত গুরুবাদেরই বিরুদ্ধে। একজন আদেশ পাইয়াছেন কি ভ্রমে পড়িয়াছেন তাহা তিনি জানেন। কিন্তু ব্রাহ্মসাধারণের তাঁহার অনুসরণ করা আদেশবাদ নয়; অভ্রান্ত গুরুবাদই বলিতে হইবে। তাই ঈশ্বর আদিষ্ট হইয়া ব্রাহ্মগণ ব্রাহ্মধর্ম্মের পবিত্রতা রক্ষার জন্য কখন কখন এরূপ প্রতিবাদ করিয়াছেন, ঈশ্বর তাঁহাদের মধ্যে আপনার জীবন্ত লীলাই দেখাইয়াছেন।

বিশ্বাস চক্ষুতে দেখিলে তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। যিনি আদেশ পান, তিনি ভ্রমে পড়িলেও তাহাই মান্য করিবেন সত্য, কিন্তু আর সকলে তাহার অনুসরণ করিলে বুঝা গেল, তাহারা ব্রাহ্মধর্ম্মের মহাসত্য হইতে বিচ্যুত হইয়াছেন। তাই যেমন অভ্রান্ত মনুষ্যবাদের প্রতিবাদ পূর্ব্ব হইতে হইয়া আসিতেছে, তদ্রূপ এখনও হইতেছে। সেইরূপ আদেশবাদের কথা বলিয়া অভ্রান্ত মনুষ্যবাদের বা লোকের স্বেচ্ছাচারিতার প্রতিবাদ পূর্ব্বেও হইয়াছে এখনও হইতেছে। মানবের স্বাধীন বিবেকের কথা বলিয়াই অভ্রান্ত শাস্ত্রবাদের প্রতিবাদ করা হইয়াছে। আদেশবাদ কখনই অমান্য করা হয় নাই। আদেশই ব্রাহ্মের ধর্ম্মশাস্ত্র, গুরু ও নেতা। ব্রাহ্ম আদেশেরই অনুসরণ করিবেন।

ঈশ্বর প্রেমিকের ধর্ম্ম এবং সাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম।—সংসারে দুই শ্রেণীর লোক দেখা যায়। এক শ্রেণীর লোক সমুদয় পূর্ব্ব সংস্কার বর্জ্জিত হইয়া পরমেশ্বরের জন্য ব্যাকুল হইয়াছেন, সেই ব্যাকুলতা দ্বারাই তাঁহারা ঈশ্বরকে লাভ করিয়াছেন। তাঁহারা কোন প্রকার শাস্ত্র, গুরু কিম্বা সমাজ বা ধর্ম্মনীতির অভ্রান্ত আদেশে চালিত হন নাই। তাঁহারা পিতা মাতার বা স্বদেশের দেশ প্রচলিত ধর্ম্মের অনুকরণ করেন নাই। যে চিরপোষিত সংস্কার তাঁহাদের রক্ত মাংসের সহিত মিশ্রিত ছিল, তাহা সম্পূর্ণ রূপে বিদূরিত করিয়া নূতন প্রাণ মন লইয়া তাঁহারা ঈশ্বর-প্রাপ্তির জন্য ব্যাকুল হইয়াছিলেন। তাহাতেই তাঁহারা সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। মহম্মদ, শাক্যসিংহ, যীশুখ্রীষ্ট প্রভৃতি এ শ্রেণীর সাধক। ইহাঁরা প্রাচীন শাস্ত্র কিম্বা কোন মত প্রচার করেন নাই; পরমেশ্বরের নিকট হইতে যে সত্য পাইয়াছেন, তাহাই প্রচার করিয়াছেন। অপর শ্রেণীর লোক গতানুগতিকের ন্যায় কেবল পশ্চাৎ অনুসরণ করিয়া থাকেন। এ শ্রেণীর লোক ঈশ্বরের সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধ স্থাপন করেন না; ঈশ্বরভক্তদিগকে ঈশ্বরের স্থানে অভিষিক্ত করিয়া তাঁহাদের সহিত যোগ স্থাপন করিতে প্রয়াসী হন। ইহাঁদিগের দ্বারা এরূপেই ধর্ম্মসম্প্রদায়ের উৎপত্তি হয়। মহম্মদের অনুবর্ত্তিগণ কোরাণকে অভ্রান্ত এবং মহম্মদকে কেন্দ্র করিয়া এক সম্প্রদায় সৃষ্টি করিয়াছেন। খ্রীষ্টের অনুকরণকারিগণ বাইবেলকে অভ্রান্ত এবং যীশুখ্রীষ্টকে ঈশ্বরের আসনে অভিষিক্ত করিয়া ধর্ম্মসাধন করিতেছেন। বুদ্ধের শিষ্যগণ বুদ্ধকেই মুক্তির উপায় বলিয়া মনে করেন। চৈতন্য নানক, কবীর প্রভৃতি মহাত্মাগণের পথাবলম্বিগণ এরূপে তাঁহাদিগকে পূজা করিতেছেন। তাঁহারা স্বয়ং পরমেশ্বরকে লাভ করিবার জন্য তেমন ব্যস্ত নহেন, তাঁহাদের অবলম্বিত মহাপুরুষগণের মর্য্যাদা এবং অলৌকিকত্ব প্রতিপন্ন করিবার জন্য যত ব্যগ্র।

মহম্মদ ঈশ্বর লাভের জন্য মহা ব্যাকুল হইয়া হেরা পর্ব্বতের গহ্বরে কঠোর তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন। দিন রাত্রি সেই একমেবাদ্বিতীয়ং সত্যস্বরূপ পরমেশ্বরের উপাসনা করিতে লাগিলেন। হিন্দু ঋষিগণ যেমন হিমালয় পর্ব্বতে গভীর ধ্যানে মগ্ন থাকিয়া,পরব্রহ্মের সহিত জীবাত্মার অনন্ত যোগ অনুভব করিয়াছিলেন এবং তাঁহাকে "প্রাণস্য প্রাণম্" রূপে উপলব্ধি করিয়াছিলেন, মহম্মদও তেমনি হেরা গহ্বরে ধ্যানযোগে নিরাকার পরব্রহ্মের সাক্ষাৎ লাভ করেন। কিন্তু বর্ত্তমান মুসলমান সম্প্রদায় কি করিয়া থাকেন? তাঁহারা কোরাণকে অভ্রান্ত রূপে মান্য করা ও উপাসনার সময় বারবার মহম্মদের নাম উচ্চারণ করা এবং কতকগুলি সামাজিক বিধি অনুসারে পরিচালিত হওয়াকেই মুসলমান ধর্ম্ম বলিয়া বিশ্বাস করেন এবং তদনুযায়ী কাজ করেন। মহম্মদ যে প্রণালীতে ঈশ্বরকে লাভ করিয়াছিলেন, যেরূপ পূর্ব্ব সংস্কার বর্জ্জিত হইয়া সাধন ভজন করিয়াছিলেন, ইহাঁরা সে সকল বিষয়ের অনুসরণ করেন না, কেবল মহম্মদের স্বত্ব সাব্যস্তের জন্য ব্যস্ত। অর্থাৎ মহাপুরুষগণ ঈশ্বর লাভের জন্য ব্যস্ত ছিলেন, তদীয় শিষ্যগণ মহাপুরুষদিগকে লাভ করিবার জন্য মহা ব্যাকুল। প্রত্যেক ধর্ম্মসম্প্রদায়ই এরূপে ঈশ্বরের সম্মান এবং অধিকার খর্ব্ব করিয়া মহাপুরুষদিগকে সেই সম্মান ও অধিকার প্রদান করিতেছে। সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মের ইহাই প্রধান কলঙ্ক।

ব্রাহ্মধর্ম্ম, অসাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম। এ ধর্ম্মে কোনও ব্যক্তিবিশেষকে কেন্দ্র করিয়া ঈশ্বরোপাসনা করিতে উপদেশ দেন না। এধর্ম্মের বিশেষত্ব এই যে, পরমেশ্বরের সহিত মানবাত্মার সাক্ষাৎ যোগ উপলব্ধি করিবার জন্য অভ্রান্ত গুরু কিম্বা শাস্ত্রের অনুসরণ করিতে হয় না। মহম্মদ, বুদ্ধ প্রভৃতি যেরূপ পূর্ব্বসংস্কার বর্জ্জিত হইয়া সম্পূর্ণ স্বাধীন ভাবে ধর্ম্মসাধন এবং মুক্তিলাভ করিয়াছিলেন, ব্রাহ্মধর্ম্ম তেমনি স্বাধীনভাবে সকলকে ঈশ্বর লাভের পথ প্রদর্শন করেন। গতানুগতিক হইয়া গুরু কিম্বা শাস্ত্রের মধ্যে আবদ্ধ হইয়া স্বাধীনতা হারাইতে ব্রাহ্মধর্ম্ম নিষেধ করেন। ব্রাহ্মধর্ম্ম সাধকদিগকে বলেন "তোমরা মহম্মদ, বুদ্ধ, খৃষ্ট প্রভৃতির ন্যায় হও। কিন্তু মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বী, খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বী প্রভৃতির ন্যায় অনুকরণকারী হইও না। ব্রাহ্মধর্ম্মের ইহাই বিশেষত্ব। এই বিশেষত্বকে যাঁহারা রক্ষা করেন না, যাঁহারা গুরু কিম্বা পুস্তক বিশেষের স্বত্ব রক্ষা করিবার জন্য ব্যগ্র, তাঁহারা এ ধর্ম্মের বিনাশসাধন করিতেছেন। কোন ব্যক্তিবিশেষের নামের সহিত, শাস্ত্রের সহিত এ ধর্ম্মের যোগ নাই। এ ধর্ম্মের যোগ স্বয়ং পরমেশ্বরের সহিত।

পারিবারিক ব্রহ্মোপাসনা।—উপাসনাই ধর্ম্ম সমাজের প্রাণ। উপাসনা বিহীন সমাজ নাস্তিক সমাজ মধ্যে পরিগণিত। মুখে উচ্চ ধর্ম্মমত মানিলে কি হইবে? উচ্চতর আধ্যাত্মিক সত্য লাভ করিবার জন্য কোনও আয়োজন না করিলে সকলি বৃথা। ঈশ্বর লাভের একমাত্র উপায় উপাসনা। কেবল বিশুদ্ধ মত পোষণ করিলে ঈশ্বরকে পাওয়া যায় না। উপাসনার দ্বার দিয়াই ঈশ্বরের রাজ্যে উপস্থিত হওয়া যায়। কিন্তু আমরা অত্যন্ত দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে, বহু ব্রাহ্ম পরিবারে পারিবারিক উপাসনা হয় না। হিন্দুরা যেমন গাত্রোত্থান করিবার সময় দুর্গা কালীকে স্মরণ করেন' ব্রাহ্মগণ সেইরূপ প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান ও রাত্রিতে নিদ্রার সময় দু তিন মিনিট কাল মাত্র পরমেশ্বরের নাম করিয়া থাকেন, ইহাই তাঁহাদের উপাসনা। পরিবারস্থ সকলে সম-

বেত হইয়া দিন রাত্রি মধ্যে কোনও এক সময় উপাসনা করিবারবিধি না থাকিলে যে কোন পরিবারই ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থ হইতে পারেন না, একথা তাঁহারা বিস্মৃত হন।

পারিবারিক উপাসনা প্রতি পরিবারে প্রতিষ্ঠিত না থাকাতেই ব্রাহ্ম সন্তানগণ উপাসনাশীল হইতেছে না। যে সকল পরিবারে প্রতিদিন অন্ততঃ একবার পারিবারিক উপাসনা হয়, সে সকল পরিবারের সন্তানগণ উপাসনা করিতে এরূপ অভ্যাসশীল হয় যে, পরিণামে তাহারা যখন গৃহ পরিত্যাগ করিয়া অন্য স্থানে বাস করে, তখন সেই পূর্ব্ব অভ্যাস বশতঃ নিয়ত উপাসনা করিয়া থাকে। যে সকল গৃহে পারিবারিক উপাসনা হয় না, সে সকল ব্রাহ্ম গৃহস্থের বালক বালিকাগণ উপাসনাতে বিমুখ হয়। তখন সকলে বলিয়া থাকেন, "ব্রাহ্ম ছেলে মেয়েরা ভাল হইতেছে না।" বাস্তবিক ব্রাহ্ম পুত্র কন্যাগণ উপাসনা-বিহীন নাস্তিক হইবার প্রধান কারণ ব্রাহ্ম পরিবারে পারিবারিক উপাসনা বিহীনতা।

কি গভীর দুঃখের বিষয়, যে ধর্ম্ম সাধন করিবার জন্য ব্রাহ্মগণ আত্মীয় স্বজনকে পরিত্যাগ করিলেন, কত নির্যাতন, কত বিপদ, কত প্রকার ক্লেশ সহ্য করিলেন, এখন পরিবারের মধ্যে সেই ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত করিতেছেন না। ইহাতে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারেরও বিশেষ বিঘ্ন হইতেছে। লোকে দেখিতেছে, ব্রাহ্মেরা যাহা মুখে বলে, কার্য্যে তাহা করে না। ব্রাহ্মগণ মুখে বলিতেছে, "ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থ হইতে হইবে।" কিন্তু কার্য্যতঃ নিজ নিজ পরিবারে ঈশ্বরের নামও উচ্চারণ করিতেছে না। এরূপ কার্য্যতঃ নাস্তিকতা দেখিয়া কি ধর্ম্মপিপাসু ব্যক্তিগণ ইহাদের আশ্রয় গ্রহণ করিবেন? বাস্তবিক পারিবারিক উপাসনা-বিহীনতাই ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের প্রধান বিঘ্ন। "প্রচারকের অভাব, অর্থের অভাবে প্রচার হইতেছে না।" এ সকল কথা উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা না করিয়া যদি ব্রাহ্মগণ ঘরে ঘরে পারিবারিক উপাসনা প্রতিষ্ঠিত করেন, তবে অচিরে সেই উপাসনার বলে ব্রাহ্মধর্ম্ম চারিদিকে প্রচারিত হইবে। সদর মফঃস্বলস্থ যে সকল ব্রাহ্ম পরিবারে পারিবারিক উপাসনা, উৎসব আলোচনাদি নিয়ত হইয়া থাকে, আমরা জানি সে সকল পরিবারের সংসর্গে আসিয়া অনেকে ব্রাহ্মধর্ম্মের দিকে আকৃষ্ট হইয়াছেন। উপাসনা হইতে আমরা সকল পাইব, সকল অভাব পূর্ণ হইবে। অতএব আমাদের বিনীত অনুরোধ, ব্রাহ্মগণ পারিবারিক উপাসনার প্রতি বিশেষ মনোযোগী হউন। প্রতি পরিবার হইতে দিনে নিশীথে ব্রহ্ম নামের জয়ধ্বনি উত্থিত হইলে নিশ্চয়ই পরমেশ্বরের সত্যরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইবে।

নাম সাধন ও আরাধনা—বহুবার ঈশ্বরের নাম গ্রহণ এবং নানা প্রকারে তাঁহার স্তুতি করিবার ব্যবস্থা সকল ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের মধ্যেই বিশেষ ভাবে প্রচলিত আছে। প্রয়োজনীয় নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়া সমূহ সমাধা করিতে যে সময় টুকু ব্যয়িত হয়, তদ্ভিন্ন অবশিষ্ট সমস্ত সময় অনেক ধর্ম্মসাধক ঈশ্বরের নাম স্মরণ মননেই যাপন করা কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করেন। ব্রাহ্মসমাজও ঈশ্বরের আরাধনা এবং নাম সাধনকে আপনাদের অতি প্রয়োজনীয় সাধনরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। এই প্রকারে সুন্দর ভাষায় ঈশ্বরের স্বরূপ ব্যাখ্যা এবং তাঁহার স্তব করিবার কারণ কি? অন্যান্য সম্প্রদায়ের হয় ত মনে করেন এইরূপে ভক্তির সহিত তাঁহার আরাধনা করাতে এবং বারম্বার তাঁহার নাম কীর্ত্তন করাতে ঈশ্বরের বিশেষ প্রসন্নতা লাভের সম্ভাবনা আছে। বিশেষতঃ এদেশের পুরাণাদিতে দেখা যায় ঈশ্বর জগতের কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া, ইহার সুখ দুঃখের প্রতি উদাসীন হইয়া আছেন, কোনও আপদ্ বিপদের সংবাদ লইতেছেন না, যদি কোন গুরুতর অমঙ্গল ঘটনা আসিয়া সৃষ্টিকে বিপর্য্যস্ত করিয়া দেয়, জগৎবাসিগণের ধর্ম্মহানি হইয়া অধর্ম্মের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হইতে থাকে, জগৎপতির সে দিকেও দৃষ্টি নাই। সৃষ্ট প্রাণিগণ স্তবস্তুতি দ্বারা তাঁহার চেতনা সঞ্চার করিলে এবং জগতের দুঃখের প্রতি তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিলে তবে তিনি সেই অনিষ্টের নিবারণের জন্য কোন উপায় বিধান করেন। সুতরাং এই শ্রেণীর সাধকগণের পক্ষে বারম্বার ঈশ্বরের নাম গ্রহণ এবং তাঁহার স্তবস্তুতি করা নিতান্তই প্রয়োজন। কারণ তাঁহাদের দেবতার প্রসন্নতা লাভের ইহাই প্রকৃষ্ট উপায়। ব্রাহ্মগণ ঈশ্বর সম্বন্ধে এমন বিশ্বাস করেন না যে তিনি কখনও জগৎ সম্বন্ধে উদাসীন হন বা তাঁহার সন্তানের কল্যাণ সাধন জন্য তাঁহার চেতনা সঞ্চার করিয়া তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে হয়। ব্রাহ্মধর্ম্ম ঈশ্বরকে চির জাগ্রত, চির কল্যাণময় এবং জগতের সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সম্বদ্ধ বলিয়াই ঘোষণা করিয়াছেন। উদাসীনতা আমাদিগের মধ্যেই আছে, ব্রাহ্মগণ ইহাই জানেন; ঈশ্বরেরও যে উদাসীনতা হইতে পারে, তাহা ত ব্রাহ্ম জানেন না। অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বিগণ হয় ত মনে করেন যে নানারূপে স্তবস্তুতি দ্বারা বা তাঁহার প্রশংসা-গীতি দ্বারা তাঁহাকে বশীভূত করিতে পারা যায় ও তাঁহার বিশেষ প্রসন্নতা লাভ করা যায়। ব্রাহ্ম তাহাও মনে করেন না এবং তাহা করাও উচিত নয়। কারণ এইরূপে স্তব স্তুতির বশীভূত হওয়া ক্ষুদ্রতার পরিচায়ক। মানবীয় দুর্ব্বলতা ও প্রশংসা প্রিয়তাতেই এরূপ সম্ভব। মহান্ ঈশ্বরে এরূপ ভাবের আরোপ করিলে তাঁহার আর মহত্ত্ব এমন কি ঈশ্বরত্ব থাকে না। যদি তাহা হয় অর্থাৎ ঈশ্বর চিরজাগ্রত চিরকল্যাণময়—জীবের চির হিতৈষীই হন, তাঁহার প্রসাদ লাভের জন্য যদি কোনরূপ স্তব স্তুতির অপেক্ষা না থাকে, এমন কি যদি তিনি আমাদের মঙ্গল সাধনে আমাদের অপেক্ষাও অধিক পরিমাণে ব্যগ্র হন, তাহা হইলে আমরা তাঁহার আরাধনা ও স্তবস্তুতি করি কেন? বারম্বার তাঁহার নাম গ্রহণের ব্যবস্থাই বা কেন?

এইরূপ আরাধনা ও নাম সাধনের হেতু ইহা নয় যে, ঈশ্বর তদ্দ্বারা কিছু অধিক পরিমাণে আমাদের নিকটবর্ত্তী হইবেন বা অধিক পরিমাণে প্রীত হইবেন। তাঁহার নৈকট্যও আর বাড়িতে পারে না, তাঁহার প্রীতিও যাহা আছে তাহার আর বৃদ্ধি নাই। তবে এইরূপ আরাধনা ও নাম সাধনের কি কোনই কারণ নাই। সে কারণ ঈশ্বরের দৃষ্টি অধিক আকর্ষণ বা

তাঁহাকে অধিক পরিমাণে প্রসন্ন করা নহে। কিন্তু আমরা যে নানা প্রকারে তাঁহা হইতে দূরে থাকি ও তাঁহার বিরুদ্ধভাবাপন্ন থাকি তাহার অপনোদন করা। আমরা নিরন্তর বহির্বিষয়ে আসক্ত হইয়া, বহির্বিষয়ের চিন্তা ও অনুধ্যানে রত হইয়া ঈশ্বর হইতে দূরে অবস্থিতি করি। তাঁহা হইতে ভিন্নভাবাপন্ন হইয়া আমাদের প্রকৃতি বিকৃতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যাহা সহজ ছিল, তাহা আমাদের পক্ষে কঠিন হয়। কারণ আমাদের প্রকৃতি এই, অধিক পরিমাণে যে বিষয়ের চিন্তাতে আমরা নিযুক্ত হই, আমাদের স্বভাবের মধ্যে তাহাই সংক্রামিত হইতে থাকে। ক্রমে আমরা সেইরূপ ভাবাক্রান্ত হইতে থাকি। সংসর্গের শক্তি আমাদের জীবনে এই জন্যই এত প্রবল। আমরা যাদৃশ সংসর্গে থাকি সেইরূপ ভাবাপন্ন হইয়া পড়ি; অর্থাৎ নিরন্তর সেই চিন্তা, সেই ভাবের মধ্যে অবস্থিতি করাতে, সেই সকল দোষ বা গুণ আমাদের মধ্যে সংক্রান্ত হয়। যে যেরূপ ভাবনা করে সে সেইরূপ প্রকৃতি প্রাপ্ত হয়, ইহা একটী স্থির মীমাংসিত সত্য। সুতরাং আমাদের প্রকৃতিকে এই বহির্বিষয়ের বন্ধন হইতে মুক্ত করিয়া, সেই চিন্ময় পবিত্র স্বরূপের সহবাসের উপযোগী করিতে হইলে, যত অধিক সময় তাঁহার গুণ স্মরণ মননে নিযুক্ত থাকিতে পারা যায়, ততই উদ্দেশ্য সাধনে অগ্রসর হওয়া যাইতে পারে। আমরা চারিদিকে যে সকল পদার্থ দ্বারা পরিবেষ্টিত আছি, যে সকল ঘটনার মধ্যে নিরন্তর বাস করিতেছি, সেই সকলের সহিতই অধিক পরিমাণে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে আবদ্ধ আছি। সেই সকলই আমাদের প্রিয় হইয়া আছে। আমাদের প্রকৃতিতে সেই সমস্ত ভাবই প্রবল। এই যে আমরা স্থূল বহির্বিষয়াসক্ত হইয়া আছি, এই আসক্তি হইতে মুক্ত হইতে হইলে এবং ঈশ্বরের ভাবে ভাবুক হইতে হইলেও তাঁহার প্রকৃতি প্রাণে প্রস্ফুটিত দেখিতে ইচ্ছুক হইলে, সেই চিন্তা, সেই সহবাস, যাহাতে জ্ঞাতসারে অধিক পরিমাণে হয়, আমাদের তাহাই করা কর্ত্তব্য। আরাধনা, ধ্যান, বা তাঁহার নাম শ্রবণ কীর্ত্তন দ্বারা আমাদের প্রকৃতি সেই ভাবাপন্ন হইয়া থাকে। দিবসের মধ্যে যত অধিক সময় তাঁহার গুণ কীর্ত্তন ও মননে যায়, ততই আমাদের মধ্যে তাঁহার প্রকৃতি সংক্রান্ত হইতে থাকে ও আমরা, সেই সহবাসের উপযুক্ত হই। আমরা ক্ষুদ্রাশয়তা হইতে উন্মুক্ত হইয়া মহদাশয় হইয়া তাঁহার জ্ঞান, প্রেম, পবিত্রতা সম্ভোগের অধিকারী হই। এজন্যই দেখা যায় ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তি অসার বিষয়ের চিন্তাতে রত থাকিতে ক্লেশ অনুভব করেন। তিনি তাঁহার প্রিয়তমের স্বরূপ ধ্যান, তাঁহার পবিত্র কীর্ত্তি-ঘোষণা তাঁহার সুমধুর নাম শ্রবণ কীর্ত্তনেই সদা ব্যাপৃত থাকেন, তদ্দ্বারা তিনি ব্রহ্মকে আকৃষ্ট না করিয়া, তাঁহাকে অধিক প্রীত না করিয়া, নিজেই তাঁহার সুমধুর প্রীতি আস্বাদন করিয়া সমধিকরূপে তাঁহাতে প্রীত হন। এবং সেই প্রকৃতি প্রাপ্ত হন; ইহাই আরাধনা ও নাম সাধনের ফল। তোষামোদ করিয়া ঈশ্বরের প্রীতি পাওয়া যায় না। তাহা দ্বারা ক্ষুদ্রাশয় মানবের প্রীতি ও প্রসন্নতা পাওয়া যাইতে পারে। সুতরাং মহান্ ঈশ্বরের নাম স্মরণ মনন এবং তাঁহার গুণ কীর্ত্তন যাহাতে আমাদের প্রকৃতিকে পরিবর্ত্তিত করিয়া, তাঁহার প্রকৃতি সম্পন্ন করিতে পারে, আমরা সর্ব্বপ্রযত্নে যেন সেই নিমিত্তই ব্যাকুল হই এবং তজ্জন্য তাঁহার চিন্তা ও নামসাধনেই ব্যস্ত থাকি।

সম্পাদকীয় ও প্রাপ্ত প্রবন্ধ।

সাধন-নিষ্ঠা।

ব্রাহ্মধর্ম্ম সামাজিক ধর্ম্ম। জনসমাজের কার্য্য কলাপের ভিতর থাকিয়াই আমাদিগকে এই ধর্ম্মকে সাধন করিতে হইবে; এবং এখানকার বিবিধ প্রকার বিঘ্ন বিপদ ও প্রলোভনের সহিত সংগ্রাম করিয়াই আমাদিগকে উন্নতি লাভ করিতে হইবে। প্রাচীন কালের ব্রহ্মজ্ঞানের সহিত বর্ত্তমান ব্রাহ্মধর্ম্মের এইখানে প্রভেদ; ইহা আমরা সকলেই জানি। কিন্তু জনসমাজের কোলাহলের ও কার্য্য স্রোতের মধ্যে থাকিয়া ধর্ম্ম সাধন করার পথে যে একটী বিপদ আছে তাহা আমরা অনেক স্থলেই ভুলিয়া যাই। সে বিপদ এই:—দশজনের মধ্যে বসিয়া ধর্ম্ম সাধন করিবার কালে আমাদের দৃষ্টি অনেক সময় আপনাদের উপর হইতে উঠিয়া পরের উপরে পতিত হয়; অর্থাৎ নিজে সাধন পথে কতদূর অগ্রসর হইতেছি এই চিন্তা অপেক্ষা লোকে কি ভাবে আমার সাধনকে গ্রহণ করিতেছে এই চিন্তা লইয়া মন অধিক ব্যাপৃত হইয়া পড়ে। এই বহির্মুখীন ভাব অভ্যাস প্রাপ্ত হইলে চরিত্রের গূঢ় মর্ম্ম স্থানে এক প্রকার অসত্যতা প্রবিষ্ট হয়। তখন লোকে অজ্ঞাতসারে মনে করে যে ধর্ম্ম-সাধন, ধর্ম্ম-প্রচার ও ধর্ম্মানুষ্ঠান সব কেবল পরেরই জন্য। তাহার সহিত নিজ জীবনের সম্বন্ধ না থাকিলেও হানি নাই। এই ভাবের বশবর্ত্তী হইয়া মানুষ ভজন সাধন করে, ধর্ম্ম প্রচার করে, ও বিবিধ সদনুষ্ঠানে রত হয় কিন্তু তদ্দ্বারা তাহার নিজ হৃদয় ও জীবনের কল্যাণ সাধিত হয় না, সে সমুদায় কেবল পরের জন্যই থাকে।

এই বহির্মুখীনতা বৃদ্ধি পাইলে মানব চরিত্র অতীব অবজ্ঞার বস্তু হইয়া পড়ে। তখন যে লোকাকর্ষণের উদ্দেশে মানব বহির্মুখীন ভাব ধারণ করিয়াছিল, তাহাও বিফল হইয়া যায়। সেরূপ ব্যক্তির সাধনে, প্রচারে ও সদনুষ্ঠানে আর কেহ আকৃষ্ট হয় না। তাহার নিজের জীবনের ও মুখের ভাষার অসামঞ্জস্য দর্শনে সকলেই বীতশ্রদ্ধ হইয়া যায়। আবার এই বহির্মুখীন ভাব মানবকে ঘোর আত্ম-প্রতারণার ভিতর ফেলিয়া দেয়। ধর্ম্মের বাহিরের সাধন ও ক্রিয়াতে নিযুক্ত থাকিয়া মানুষ অজ্ঞাতসারে মনে করিতে থাকে যে ধর্ম্ম সাধন সম্বন্ধে যাহা কর্ত্তব্য তাহা করা হইতেছে; আর অধিক কিছু করিবার নাই। এই ভ্রান্ত আত্মতৃপ্তি মানুষকে ব্যাকুলতা ও সংগ্রাম বিহীন করিয়া ফেলে। তখন পরোপদেশের জন্য যাহা বলা যায়, তাহা নিজে করিবার জন্য প্রবৃত্তি ও চেষ্টা থাকে না। জগতে এইরূপ ভ্রান্ত আত্মতৃপ্ত সাধকের সংখ্যা কম নহে।

ব্রাহ্মগণ যদি সর্ব্বদা সতর্ক আত্ম-পরীক্ষা-পরায়ণ ও প্রার্থনা-শীল না থাকেন তাহা হইলে তাঁহাদিগেরও এই প্রকার আত্ম তৃপ্তির মধ্যে পতিত হইবার সম্ভাবনা। এবং ইহা কি সত্য

নহে? আমাদের অনেকের সাধন এই বহির্মুখীন-ভাবদোষে দূষিত। আমাদের সাধন ও কার্য্যের মধ্যে তলে তলে এক প্রকার অসত্যতা প্রবিষ্ট হইয়াছে।

এই অন্তঃসার বিহীন বহির্মুখীন ভাব দূর করিবার উপায় কি? ধর্ম্ম-জগতের ইতিবৃত্তে দেখিতে পাওয়া যায় যে সকল সাধক জনসমাজের কোলাহলের মধ্যে থাকিয়াও আত্মার নির্জ্জনতা রক্ষা করিতে পারিয়াছেন এবং ছায়াকে পরিহার করিয়া প্রকৃত সার বস্তুকে ধরিবার জন্য সর্ব্বান্তঃকরণে প্রয়াস পাইয়াছেন, তাঁহারাই চরমে সিদ্ধিলাভ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। এই যে ছায়াকে পরিহার করিয়া বস্তুকে ধরিবার প্রয়াস ইহাকেই সাধন-নিষ্ঠা বলে। সাধন-নিষ্ঠ ব্যক্তিগণ জন কোলাহলের মধ্যে থাকিয়াও তাহার প্রতি উদাসীন। অসার কোলাহলে তাঁহারা কোন দিন গন্তব্য পথ হইতে বিচ্যুত হন না; না পাইয়াও পাইয়াছি বলেন না অথবা ছায়াকে দেখিয়া বস্তু বস্তু করিয়া চীৎকার করেন না। যদি সহস্র রসনা তাঁহাদের গুণ কীর্ত্তন করে, অথবা তাঁহাদিগকে সাধক-শ্রেষ্ঠ বা অগ্রসর ব্যক্তি বলিয়া ঘোষণা করে, তথাপি তাঁহারা এক মুহূর্ত্তের জন্যও আপনাদের প্রকৃত অবস্থা বিস্মৃত হন না। যখন শত শত ব্যক্তি ছায়ার পশ্চাতে ধাবিত হয়, তখন হয়ত সকলের চক্ষের অগোচরে থাকিয়া তাঁহারা নিবিষ্ট-চিত্তে সত্য বস্তুর অন্বেষণে প্রবৃত্ত থাকেন। যে সকল সাধু মহাত্মার নাম ধর্ম্ম-জগতে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে এবং যাঁহাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া জগতের কোটী কোটী নরনারী জীবন পথে অগ্রসর হইতেছে, তাঁহাদের জীবনে বিশেষ গুণ কি ছিল; এই চিন্তাতে প্রবৃত্ত হইলেই এই সাধন-নিষ্ঠার প্রতি দৃষ্টি পতিত হয়। জগতের প্রচলিত ধর্ম্ম সাধনে যদি তাঁহারা আত্মতৃপ্ত হইতে পারিতেন, তাহা হইলে তাঁহাদের জীবনে সে প্রকার কঠোর সংগ্রাম জাগিত না। তাঁহাদের মহত্বের গূঢ় রহস্য এই:—যে তাঁহারা অপরের মুখে ঈশ্বর পরকাল ও ধর্ম্মাধর্ম্ম বিষয়ে যাহা শুনিলেন তাহাতে তৃপ্ত হইতে পারিলেন না; নিজ সাধনের দ্বারা সেই সকল সত্যকে আয়ত্ত করিবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞারূঢ় হইলেন।

কোন প্রকার বিঘ্ন বিপদ বা প্রলোভনের দ্বারা সেই লক্ষ্য হইতে দৃষ্টিকে আকৃষ্ট হইতে দিলেন না। অবশেষে নিরন্তর একাগ্রতার সহিত সত্যের ধ্যান্ করিতে করিতে হৃদয়ে সত্যের জ্যোতিঃ বিকীর্ণ হইল; এবং অন্ধকারের পরপারে জ্যোতির্ম্ময় ধামে দিব্য জ্ঞান-চক্ষুতে সেই সত্য পুরুষকে দর্শন করিলেন। ইহারই নাম সিদ্ধিলাভ। এই ভাব প্রাপ্ত হইয়াই ঋষিগণ বলিয়াছিলেন:—"শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ, আযে ধামানি দিব্যানি তস্থুঃ। বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তং আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।":—

অর্থ:—হে দিব্য ধামবাসী অমৃতের পুত্র সকল, তোমরা শ্রবণ কর আমি অন্ধকারের পরপারে আদিত্য বর্ণ এই মহান্ পুরুষকে জানিয়াছি।"—এইরূপ সিদ্ধিলাভ করিয়াই সাধন-নিষ্ঠ সাধকগণ জগতে ধর্ম্ম-ধন বিতরণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ব্রাহ্মদিগের চিত্ত যেমন বার বার বহির্মুখীন হইবার সম্ভাবনা তাঁহাদিগকে তেমনি দৃঢ়তা ও একাগ্রতার সহিত সাধন-নিষ্ঠা অবলম্বন করিতে হইবে।

যোগ ও ব্রাহ্মসমাজ।

(প্রাপ্ত)

যোগ কথাটীর বিভিন্ন বিবৃতি আছে। সে সমুদায় বিবেচনা করা আমাদের উদ্দেশ্য নহে। সরল অধ্যাত্ম-যোগ কি এবং উহা কোন বেশে ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করিয়াছে, ইত্যাদি বিষয় এই প্রবন্ধে আলোচিত হইবে।

ঈশ্বরের সহিত যোগ, কোন্ অর্থে ধার্ম্মিকগণ যোগ প্রয়োগ করিয়া থাকেন? যোগ বলিলেই বিয়োগের অস্তিত্ব বুঝায়। কিন্তু ঈশ্বরের সহিত বিয়োগ সম্ভবে না, কারণ তাহা হইলে আত্মা বিনাশ প্রাপ্ত হয়। ঈশ্বর ও জীব নিত্যযুক্ত; কিন্তু এই যোগ জীব অনুভব করে না, কারণ পাপ ও অজ্ঞান জীবের অন্তশ্চক্ষুকে মলিন, ও উজ্জ্বল-দৃষ্টিশক্তি-হীন করিয়া রাখিয়াছে। এই অজ্ঞান ও পাপ যত দূরীকৃত হইবে, ততই দৃষ্টিশক্তি বর্দ্ধিত হইবে, জ্ঞানচক্ষু খুলিবে। এই অধ্যাত্ম চক্ষু উন্মীলিত করিবার জন্য নানা প্রকার উপায় ব্যাকুল মানবাত্মা কর্ত্তৃক উদ্ভাবিত হইয়াছে। ইহাদেরই নাম যোগ-সাধন। ব্রাহ্ম-যোগ-সম্প্রদায় উহা কি রূপে গ্রহণ করিতেছেন এবং উহা গ্রহণ করা উচিত, ইহাই আমাদের অনুসন্ধেয়।

ঈশ্বর চিন্ময় অতীন্দ্রিয়। ইন্দ্রিয়ের সাহায্য দ্বারা তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করিবার উপায় নাই। আত্মার মধ্যে তাঁহার সত্তানুভূতিই যোগ। আত্মার মূলে ব্রহ্মশক্তি, জ্ঞানের মূলে তাঁহার জ্ঞান, প্রেমের মূলে তাঁহার প্রেম, প্রত্যেক শক্তির মূলে তাঁহার শক্তি প্রত্যক্ষ করাই যোগ। তিনি আমাতে এবং আমি তাঁহাতে, বিন্দুর মাঝে সিন্ধু ও সিন্ধুর মাঝে বিন্দু এবং সান্তে অনন্তে একটী ঘনিষ্ট প্রেমের সম্বন্ধ অতি পরিষ্কার রূপে উপলব্ধি করাই যোগ। যোগ কর্ত্তব্য হইতে বিচ্ছিন্ন নহে। কর্ত্তব্যই ধর্ম্মের মজ্জা, অস্থি। যোগ বুজরুকি নহে, অনিমা লঘিমা ইত্যাকার সিদ্ধি নহে। যোগ একটী আধ্যাত্মিক অবস্থা—শারীরিক নহে।

কিন্তু শরীর ও আত্মার আধার আধেয় সম্বন্ধ। সুস্থ শরীরে সুস্থ আত্মা চাই; নচেৎ সাধনে অনেক ব্যাঘাত জন্মিবে। কি প্রকারে দেহ সুস্থ রাখা যায়, উহা কিঞ্চিৎ যত্ন করিলেই জানা যায়। যুক্তাহার, যুক্তবিহার, যুক্তনিদ্র, যুক্তচেষ্টা, ও সাবধান হইলেই শরীর মহাশয়কে সুস্থ রাখা যায়; মোটামুটী ইহাই বলা যাইতে পারে।

এখন আমাদের চাই কি? সংক্ষেপে বলা যাইতেছে।

১। স্বাস্থ্য—সুস্থ শরীর চাই। আহার, নিদ্রা, বিহারাদিতে নিয়ম ও সাবধানতা থাকিলে ইহা সুলভ হয়। প্রাণায়ামাদি ইহার উপায় হইতে পারে, কিন্তু উহা ভয়াবহ; কারণ অনেক স্থলেই সমূহ অনিষ্টজনক। আমি যোগ সাধনকে প্রাণায়াম না বলিয়া "বাসনাবিরাম" বলি।

২। স্থান—যেস্থানে বসিলে মনঃসংযমের ব্যাঘাত হয় না, এমত স্থান চাই। নাতিগ্রীষ্ম, নাতিশীত, পরিষ্কৃত, নির্জ্জন, নিঃশব্দ স্থানই সাধনের অনুকূল। দেহ মনের প্রসন্নতা ও অক্লেশজনক স্থান চাই।

যে প্রকারে থাকিলে নিদ্রাবেশ, আলস্য, জড়তা, চঞ্চলতা, অসুখাদি উৎপন্ন হয় বা হইতে পারে, সে প্রকারে অবস্থান করিলে চলিবে না। মহর্ষি পতঞ্জলি একস্থলে সূত্রে বলিয়াছেন "আসন সহজ ও স্থির" হওয়া প্রয়োজন। কিন্তু তাঁহার টীকাকার ৮৪ প্রকার আসনের অবতারণা করিয়াও ক্ষান্ত না হইয়া ৮৪০০০ চৌরাশি সহস্র প্রকার আসন আছে, এই প্রকার বলিয়াছেন। অনেকেই এই সমুদায় উপায়কে, উদ্দেশ্য বলিয়া ভ্রম করিয়া "আসন" কুস্তি সাধনে কাল নষ্ট করেন। আমরা উহা করি নাই,অতএব উহা হইতে কোন উপকার সম্ভব কি না বলিতে ও পারি না। কিন্তু এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে শারীরিক প্রক্রিয়া অপেক্ষা,মানসিক প্রক্রিয়ার দ্বারা শীঘ্র মানসিক ফল উৎপন্ন হইবার সম্ভাবনা। বিশেষতঃ এই কাল তপস্যাদি কঠোর সাধনের কাল নহে। অতএব এখন সে সমুদায় কঠোর ব্যায়ামাদি অভ্যাস করা নিষ্প্রয়োজন। সহজ, স্থির ও অক্লেশ উপবেশন করিলেই যথেষ্ট হইতে পারে।

৪। সংযম।—ইন্দ্রিয়ের চঞ্চলতা থাকিলে মনঃস্থির হয় না। অনেক বৈজ্ঞানিক কঠোর সংযমী, কারণ অন্যথা হইলে অতি সূক্ষ্ম যন্ত্রাদি স্থির ভাবে বহুক্ষণ হস্তে ধারণ করিতে পারেন না। প্রসিদ্ধ কুস্তীগীরেরা সংযমী, নচেৎ স্নায়বিক দুর্ব্বলতা নিবন্ধন অনেক কসরৎ অসম্ভব হইত। এই কারণেই প্রাচীন গ্রীসে অলিম্পিক মেলায় মল্লযুদ্ধে যাঁহারা প্রতিযোগিতা করিতেন, তাঁহারা সংযমী হইতে বিলক্ষণ চেষ্টা করিতেন। উপযুক্ত ব্যায়াম ইন্দ্রিয়-সংযমের সহায়তা করে। অতএব সংযম শারীরিক স্থিরতার জন্যও প্রয়োজন। আন্তরিক স্থিরতার জন্য, উহার সমানই প্রয়োজন। মন অপবিত্র ও বস্তুবিষয়ে বিক্ষিপ্ত থাকিলে, চিত্তবিকার নিবন্ধন বিষয়বিশেষে মনোনিবেশ অসম্ভব। বিশেষতঃ ইন্দ্রিয়-ভোগ ইন্দ্রিয়-সুখ-লালসা বর্দ্ধিত করে। উহার বৃদ্ধি হইলে, অধ্যাত্ম-বিষয়-লালসা হ্রাস পায়। যদি তাহাই হইল, তবে কেই বা ও কিসের জন্যই বা মনঃসংযম করিবে। বাক্যাদির সংযমও নিতান্ত প্রয়োজন।

৪। চিত্ত-বৃত্তি-নিরোধ।—মানসিক বৃত্তি সমূহকে অভ্যাস দ্বারা বহির্বিষয়াদি হইতে ফিরাইয়া বস্তু বিশেষের ধ্যানে নিয়োগ করা সাধকের পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজন। রূপ রসাদিতে বিচরণশীল মনকে ক্রমশঃ ধ্যেয় বস্তুতে স্থির করিতে হইবে। শাস্ত্রকারেরা বলেন যে নাভি, হৃদয়, জিহ্বাগ্র, নাসাগ্র, ভ্রূমধ্যে, ললাট-মধ্যে বা ব্রহ্মরন্ধ্রে চক্ষুদ্বয়কে স্থিরভাবে সংলগ্ন করিয়া, দৃষ্টি স্থির করিলে মনঃস্থির ও চিত্তবৃত্তি নিরুদ্ধ হইয়া থাকে। অনেকেই বলেন যে উপযুক্ত নিশ্বাস রোধাদি দ্বারাও এই সকল ফল লাভ করা যায়। কিন্তু ইহাঁও বলেন যে প্রকৃত উপায়ে, উপযুক্ত মাত্রায় প্রাণায়াম না হইলে কুষ্ঠ, উন্মাদ, ক্ষয়যক্ষ্মা ইত্যাদি ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর ব্যাধির উৎপত্তি হয়। কখন কখনও বা হঠাৎ মৃত্যু পর্য্যন্ত ঘটিয়া থাকে এবং তজ্জন্য অনুজ্ঞা করিয়াছেন যে সর্ব্বদা গুরুসাহায্য ব্যতীত উহা করণীয় নহে। অল্প দিন হইতে এক প্রকার যোগ-রোগ ব্রাহ্মসমাজের দেহে প্রবেশ করিয়াছে, কিন্তু ইহারই মধ্যে প্রাণায়ামের এই সমুদায়, (অন্যের কথা পরে বলিব) বিষময় ফল অনেক স্থলে ভয়ঙ্কর আকারে প্রকাশিত হইতেছে। দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করা নিষ্প্রয়োজন। কারণ ব্রাহ্ম যোগ-সম্প্রদায়ের নিকট উহা অবিদিত নাই।

৫। ধ্যেয় বস্তু।—ধ্যান ত করিব, কিন্তু কি ধ্যান করিব? যোগশাস্ত্র বলেন যে চিত্তবৃত্তি নিরুদ্ধ ও আত্মা সমাহিত হইলে যাহা ধ্যান করিবে তৎসম্বন্ধে তথ্য জ্ঞাত হইতে পারিবে। এত গেল সিদ্ধাবস্থার কথা। সাধনাবস্থায় কি ধ্যান করিব? বৌদ্ধ-যোগী আত্মতত্ত্বাদি অনুধ্যান করেন, অথবা সর্ব্বধ্যান বর্জ্জন করিয়া মানসিক শূন্যতা লাভের চেষ্টা করেন। শূন্যতা ও মৃত্যু একই কথা। আমরা শূন্যতা চাহি না, পূর্ণতা চাই। আস্তিক সাধক ঈশ্বর-ধ্যান করেন। মহর্ষি পতঞ্জলি ইহাকেই সর্ব্বোচ্চ স্থান দিয়াছেন। ঈশ্বর-ধ্যান কিন্তু একটী গোলমেলে কথা। উহা কি আকারে করিব? তাঁহার বিষয়, নাম, স্বরূপ, বা তৎসম্বন্ধীয় বিষয়বিশেষে নির্ব্বাত নিষ্কম্প দীপশিখার মত মনকে স্থিরভাবে প্রয়োগ করা চাই। কিন্তু উহার মধ্যে কোন্‌টী করিব? যে স্বরূপাত্মক নাম, বা স্বরূপ চিন্তা করিলে প্রেম, ভক্তি, বিশ্বাস, বা আনন্দের উদয় হয়, তাহাই ভাবিতে হইবে। চিত্ত সহজেই তাহাতে স্থির হইবে—কারণ মন ও হৃদয় উভয়ে যুক্ত হইয়া ইচ্ছার সহিত কার্য্য করিবে; আত্মার সমুদায় বৃত্তি বহির্বিষয় হইতে নিগৃহীত হওতঃ অন্তর্মুখীন হইয়া এককালে এক কার্য্যে রত হইবে। কিছুকাল নিয়মিত সময়ে নিয়মিত রূপে এই প্রকার করিলে, আত্মার গূঢ় অতুল ও বর্ণনাতীত আনন্দানুভূতি জন্মিবে, আত্মা তখন ভূমানন্দ সাগরে, যেন "অগেয়ান" হইয়া নিমগ্ন হইবে। তখন ঈশ্বরজ্ঞানের ক্ষীণ পিপাসা ঈশ্বরদর্শন-লালসারূপ অদম্য ও খরতর বেগবান প্রবাহের আকার ধারণ করিবে। সেই সঙ্গে সঙ্গেই বিষয়-লালসা, ইন্দ্রিয়লিপ্সা, চঞ্চলতা প্রভৃতি লোপ পাইতে থাকিবে। ব্রহ্মজ্ঞান ও ব্রহ্মপ্রেম যতই স্ফূর্ত্তি পাইবে, ততই মন ও হৃদয়ের প্রবৃত্তিসমূহ মুকুলিত হইতে থাকিবে, দুর্ব্বলতা ও মলিনতা দূর হইতে থাকিবে, "হৃদয়কাননে ফুটিবে ফুল, চারিদিক হবে সৌরভে আকুল।" আত্মার নিদ্রিত বৃত্তি ও শক্তিসমূহ জাগ্রত হইতে থাকিবে। এই জন্যই উপনিষদের ঋষিগণ দূর-অতীত কাল হইতে নিদ্রিত মানবকে বলিতেছেন "উঠ, জাগো, আত্মা ও পরমাত্মাকে দর্শন করিয়া মুক্ত ও কৃতার্থ হও!" আত্মার সমুদায় শক্তি বলপূর্ব্বক এককালে প্রয়োগ না করিলে, উহাদের সম্যক্ স্ফুরণ না হইলে পরমাত্মাকে লাভ করা যায় না, সেই জন্য ঋষিগণ বলিয়াছেন "নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ।"

পুনঃ, যে স্বরূপ সাধন করিব তাহা সত্যমূলক হওয়া চাই—মিথ্যার দ্বারা সত্যে উপনীত হওয়া যায় না। সরল ও ব্যাকুল ভাবে ভ্রমবশতঃ মিথ্যাকে যদি ধরি, ভাবদর্শী ভগবান অবশ্যই পরিশেষে কৃপাপূর্ব্বক সত্যালোক প্রকাশ করিবেন সন্দেহ নাই। তখন আবার সত্যের ধ্যান ও ভজনা করিতে হইবে। কিন্তু ইহাতে বিলম্ব হইবে। নচেৎ সত্য ও মিথ্যার দ্বারা এক সময়ে সত্যলাভ করিলে সত্য ও মিথ্যার প্রভেদ কি? অতএব সত্যের ভজনা না করিলে সত্যস্বরূপের দর্শন লাভ হইবে কি প্রকারে? সত্যের ধ্যান ও পূজা করিতে হইলে সত্যভাষী,

সত্যকামী, সত্যাচারী, এবং সত্যপ্রিয় হওয়া অবশ্যই কর্ত্তব্য। নচেৎ সত্যের প্রকৃত ভজনা হওয়া আকাশকুসুমবৎ অলীক দিবা-স্বপ্ন মাত্র।

এক এক স্বরূপ এক এক প্রকৃতির আত্মার প্রিয়। যে স্বরূপটী সাধন করিবে, আত্মাও সেইভাবে রঞ্জিত হইবে। যেমন আরসুলা কুম্ভীর পোকার ধ্যান করিতে করিতে তাহার প্রকৃতি অনেক পরিমাণে লাভ করে। একটী স্বরূপ সাধন করিতে করিতে, অন্যগুলি একে একে আকাশে তারকার উদয়ের ন্যায় অন্ধকারের মধ্য হইতে যেন ফুটিয়া উঠে। প্রেমাদি ভাবের বর্ণ ধ্যানে মাখামাখী না হইলে আত্মায় তাঁহার স্বরূপের রং খুলে না—ফুটিয়া উঠে না। স্বরূপ ফুটিলে অজ্ঞান ও অপবিত্রতা দূরীভূত হইবেই হইবে। কারণ সমলিন সলিলে "পরিষ্কার প্রতিবিম্ব কখনই পড়িবে না। উহা যত স্থির ও নির্ম্মল হইবে—প্রতিবিম্ব ততই স্পষ্ট হইবে। উহা বিধর্ম্মী পদার্থকে নাশ করিবে—যেমন জ্যোতির প্রকাশে অন্ধকার বিনষ্ট হয়। অতএব ধ্যেয় বস্তুর সম্বন্ধে বিশেষ সাবধানতার সহিত সাধকের নির্ব্বাচনশক্তি প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। একেশ্বরবাদী সাধকগণ যে সমুদায় স্বরূপাত্মক মন্ত্রাদি সাধন করেন, তাহার কয়েকটী মাত্র নিম্নে উল্লিখিত হইল।

১। ওঁ তৎসৎ।
২। ওঁ সচ্চিদেকং ব্রহ্ম।
৩। ওঁ সত্যং শিবং সুন্দরং।
৪। ওঁ সচ্চিদানন্দং ব্রহ্ম।
৫। ওঁ সত্যং জ্ঞানং অনন্তম্ ব্রহ্ম।
৬। ওঁ শান্তং শিবং অদ্বৈতং।
৭। ওঁ শুদ্ধং অপাপবিদ্ধং।
৮। ওঁ আনন্দ রূপং অমৃতং।

অদ্বৈতবাদিগণ "তত্ত্বমসি," "সোহং" ইত্যাদি বিষয় ধ্যান করিয়া থাকেন।

ক্রমশঃ-

প্রেরিত পত্র।

(পত্র প্রেরকদিগের মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন, কিম্বা কাহারও পত্র ফেরত দিতে বাধ্য নহেন)

শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত তত্ত্বকৌমুদী সম্পাদক মহাশয়,

সমীপেষু।

মহাশয়!

গত ১৬ই কার্ত্তিকের তত্ত্ব-কৌমুদীতে "শ্রীসত্যদর্শী"ব্রাহ্ম সাধারণের নিকট তিনটী প্রশ্ন উপস্থিত করিয়া তাহার মীমাংসা করিতে অনুরোধ করিয়াছেন। ব্রাহ্মসমাজের পক্ষে এই সকল প্রশ্ন এমন কিছু নূতন বা অমীমাংসিত নহে। কিন্তু যখন বারম্বার এই সকল প্রশ্নের আলোচনা হইতেছে এবং সন্দেহ ও বিতর্ক আসিয়া লোকের মনকে আন্দোলিত করিতেছে,তখন এই প্রকার সন্দেহ ও বিতর্কের অবসান করিতে সকলেরই যথাসাধ্য প্রয়াসী হওয়া আবশ্যক। প্রশ্ন কয়েকটীর যথাযথ উত্তর প্রদানে সক্ষম কি অক্ষম তাহার বিচার না করিয়াও কর্ত্তব্য জ্ঞানে এই গুরুতর কার্য্যে অগ্রসর হইলাম।

সত্যদর্শী মহাশয়ের প্রথম প্রশ্ন এই যে "ব্রাহ্মসমাজের প্রচলিত সাধন প্রণালীর মধ্যে কিছু অসম্পূর্ণতা আছে কিনা" এই প্রশ্নের মীমাংসা করা বেশী কিছু কঠিন নয়। কারণ ব্রাহ্মগণ বিশ্বাস করেন মানবাত্মা অনন্ত উন্নতিশীল। আত্মা নিরন্তর উন্নতির পথেই অগ্রসর হইবে। সুতরাং এইরূপ অনন্ত উন্নতিশীল আত্মার কল্যাণোপযোগী ধর্ম্মও যে উন্নতিশীল এবং সেই ধর্ম্মের সাধন-প্রণালীও যে উন্নতিশীল হইবে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। উন্নতিশীল আত্মার পোষণক্ষম সাধন প্রণালী কখনই সীমা বিশিষ্টও সম্পূর্ণ হইবে না। ইহাতে নিত্য নূতন বিষয় সংযোজিত হইবে; নিত্য নূতন তত্ত্ব ও ভাব সকল মিলিত হইয়া ক্রমশঃ ইহাকে পূর্ণতার দিকে লইয়া যাইবে। সম্পূর্ণ হইল বলিয়া সীমা নির্দ্দেশ করিবার অবস্থা কখনও হইবে না। সুতরাং বর্ত্তমান সাধন প্রণালী যে সম্পূর্ণতা লাভ করিয়াছে এরূপ নির্দ্দেশ করা ব্রাহ্মধর্ম্মের বিরোধী। ব্রাহ্ম কখনও কোন প্রণালীকে সম্পূর্ণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে পারেন না। বর্ত্তমান সাধন প্রণালীর কত উন্নতি হইবে, কত নূতন নূতন তত্ত্ব ইহার অন্তর্নিবিষ্ট হইবে তাহা কেহই জানে না। তবে ব্রাহ্মগণ কেন যে আপনাদের সাধন-প্রণালীকে অসম্পূর্ণ জানিয়াও তাহা অবলম্বন করিয়া আছেন, তাহার উত্তর দেওয়াও কঠিন নহে। কারণ তাঁহারা নিজেরা যেমন অসম্পূর্ণ তাঁহাদের সাধন প্রণালীও তেমনি অসম্পূর্ণ। সম্পূর্ণ সাধন প্রণালীর অস্তিত্বের সম্ভাবনাও নাই। যদি থাকিত ব্রাহ্মগণ তাহার অনুসরণ করিতেন। কিন্তু তাহা নাই। সুতরাং তাঁহাদের নিকট যাহা উৎকৃষ্ট বলিয়া মনে হইতেছে,তাহাই অবলম্বন করিয়া ধর্ম্মসাধন করিতেছেন। ব্রাহ্মগণ এমনও মনে করেন না যে কোন প্রণালী বিশেষেই সকল অভাব দূর হইতে পারে। প্রণালীর স্বতঃ এমন কোন ক্ষমতা নাই, যাহার আশ্রয় মাত্রেই মানবের সকল অভাব ঘুচিয়া যাইতে পারে। সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজন—আন্তরিক অনুরাগ ও নিষ্ঠার সহিত ব্রহ্মকৃপার প্রত্যাশী হইয়া ও তাঁহাতে নির্ভরশীল হইয়া নিয়ত পরিশ্রমশীল অন্তরে সাধনে রত থাকা। নতুবা যদি প্রণালীরই বিশেষ কোন ক্ষমতা থাকিত, তাহা হইলে প্রত্যেক ব্যক্তিই ধর্ম্মের চরম সীমায় যাইতে পারিত। কেহ গুরু, কেহ শিষ্য থাকিত না। এখন যে এক একজন গুরুর পশ্চাতে শত শত শিষ্য ছুটিয়া যাইতেছেন তাহা আর ঘটিত না। কোন একটী প্রণালীর আশ্রয় গ্রহণ করিয়া সকলেই একবারে ধার্ম্মিক প্রধান হইতে পারিতেন। কিন্তু তাহার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না। একই প্রণালী অবলম্বন করিয়া জীবনে কত তারতম্য দৃষ্ট হয়। এরূপ তারতম্য ঘটিবার কারণ কি? অনুসন্ধান করিলেই দেখা যাইবে যিনি যে পরিমাণে ব্যাকুলতা সহকারে নিয়ত পরিশ্রমের সহিত সাধনে রত রহিয়াছেন, তিনি সেই পরিমাণে ধর্ম্মপথে অগ্রসর হইয়াছেন। সুতরাং একমাত্র কোন প্রণালীর আশ্রয় লইলেই সকল অভাব যায় না। বিশেষ নিষ্ঠা ও অনুরাগের সহিত সাধন করিলেই তবে উন্নতি হইতে পারে।

সত্যদর্শী মহাশয়ের ২য় প্রশ্ন "ব্রাহ্মসমাজ কখনও অভ্রান্ত গুরু স্বীকার করেন নাই ও করিতে প্রস্তুতও নহেন ইত্যাদি……এখন প্রশ্ন এই যে ধর্ম্মরাজ্যে অগ্রগামী কোন অভিজ্ঞ ব্যক্তির নিকট বিশেষভাবে ধর্ম্মশিক্ষা করা ব্রাহ্মধর্ম্মের অনুমোদিত কি না।" ব্রাহ্মসমাজ অভ্রান্ত গুরু কেন স্বীকার করেন না? যদি এমন হয় যে বাস্তবিক কেহ অভ্রান্ত আছেন, অথচ তাঁহাকে অভ্রান্ত বলিয়া মান্য করা হয় না, তাহা হইলে এরূপ আচরণ নিতান্তই অশ্রদ্ধেয় এবং সত্যের বিরোধী। ব্রাহ্মগণ এমন খামখেয়ালের কথা কখনও বলেন না। বরং ব্রাহ্মগণ ইহাই বলেন যে যিনি যে বিষয়ে অভ্রান্ত তাঁহাকে সেই বিষয়ে অভ্রান্তরূপে মানাই উচিত। বিজ্ঞানের এমন কোন কোন সত্য আছে, যাহাকে অভ্রান্ত সত্য বলিয়াই স্বীকার করিতে হয়। সুতরাং সে সত্য যিনি জানেন তাঁহাকে সেই বিষয়ে অভ্রান্ত মানিতে কোন দোষই নাই। বরং না মানাই দোষ। তা বলিয়া সেই ব্যক্তিকে সমগ্র বিজ্ঞান শাস্ত্রে অভ্রান্ত বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে, এমন কোন কথা নাই। বিজ্ঞানের কত বিষয় অমীমাংসিত, অনাবিষ্কৃত রহিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই, সুতরাং সমগ্র বিজ্ঞান বিষয়ে কাহাকেও অভ্রান্ত বলিয়া স্বীকার করা ন্যায়সঙ্গত নহে। এইরূপ প্রত্যেক বিষয় সম্বন্ধেই বলা যায়, যাহা বাস্তবিক সত্য তাহার জ্ঞান যাঁহার আছে সে বিষয়ে তিনি অভ্রান্ত। কিন্তু পূর্ণ জ্ঞান মানবের মধ্যে কাহারও থাকিবার সম্ভাবনা নাই। পূর্ণ জ্ঞান একমাত্র ঈশ্বরেই বর্ত্তমান। তিনিই সকল বিষয়ে অভ্রান্ত। মানব কোন কোন বিষয়ে অভ্রান্ত হইলেও সম্যক জ্ঞান যখন তাহাতে সম্ভবে না, তখন কিরূপে তাহাকে সম্যকরূপে অভ্রান্ত বলিয়া মানা যাইতে পারে। বাহ্য বিষয়েই যখন নানা প্রকার ভ্রম হইয়া থাকে। তখন অন্তর্জগতে আরও কত ভ্রম ঘটিবার সম্ভাবনা। বিশেষতঃ মানব জীবন অনন্ত উন্নতিশীল তাহার পোষণোপযোগী ধর্ম্মও অনন্ত উন্নতিশীল। সেই অনন্ত উন্নতিশীল ধর্ম্মের কত তত্ত্ব অনাবিষ্কৃত ও অমীমাংসিত আছে কে জানে? সুতরাং এরূপ অনন্ত উন্নতিশীল বিষয়ে কাহাকেও অভ্রান্তরূপে গ্রহণ করা ন্যায় ও যুক্তি বিরুদ্ধ। যদি কেহ আপনাকে সেরূপ অভ্রান্ত বলিয়া মনে করেন, তাঁহার সেই সাহসকে অতি সাহস ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে। যদি বাস্তবিক অভ্রান্ত কোন ব্যক্তি থাকিতেন, আর ব্রাহ্মগণ তাঁহাকে অভ্রান্ত বলিয়া স্বীকার না করিতেন, তাহা দূষনীয় হইত। কিন্তু সেরূপ ব্যক্তি নাই এবং হইতেও পারেন না। এজন্য ব্রাহ্মগণ অভ্রান্ত গুরু স্বীকার করেন না। তবে ধর্ম্মরাজ্যে অগ্রসর অভিজ্ঞ ব্যক্তির নিকট শিক্ষা করা অথবা বিশেষভাবে ধর্ম্মশিক্ষা করা কখনই অকর্ত্তব্য নহে। গণিত, বিজ্ঞান প্রভৃতি সমস্ত বিষয় যখন অপরের নিকট শিক্ষা করা যায়, ধর্ম্ম সম্বন্ধে কেন শিক্ষা করা না যাইবে। শিক্ষণীয় প্রত্যেক বিষয়ই শিক্ষা করিতে হইবে। শিক্ষার প্রণালী নানাজনের নানাপ্রকার হইতে পারে; কিন্তু শিক্ষা করিতেই হইবে। ধর্ম্মসম্বন্ধীয় সাধারণ শিক্ষা ভাষা শিক্ষার ন্যায়। জনসমাজে জন্মিলেই মানুষ কথা বলিতে শিখে। কাহার নিকট কথা বলিতে শিক্ষা করিল, তাহা যেমন নির্দ্দেশ করিবার উপায় নাই; দেশস্থ সকলেই এই ক্ষেত্রে যেমন শিক্ষক। ধর্ম্মসম্বন্ধীয় সাধারণ জ্ঞানও তেমনি। সকলেই কিছু কিছু ধর্ম্মতত্ত্ব জানে কাহার নিকট যে সে তত্ত্ব শিক্ষা হইল তাহা নির্দ্দেশ করিবার উপায় নাই। আন্তরিক জ্ঞানার্জ্জন বৃত্তি হইতে লোকে বিশেষ ভাবে কোন ব্যক্তির শরণাগত না হইয়াও অনেক তত্ত্ব শিক্ষা করিতে পারে।' এবং সেই শিক্ষাই বিশেষ শিক্ষার মূল ভিত্তিরূপে কার্য্য করে। এই সাধারণ শিক্ষার পর ভাষা সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান লাভ করিতে হইলে সাহিত্যের পণ্ডিতের নিকট গমন করিলে শিক্ষা অনেক পরিমাণে সহজে ও অল্প সময়ে হয়। কিন্তু কোন শিক্ষকের সাহায্য গ্রহণ না করিলেই যে শিক্ষালাভের সম্ভাবনা নাই; এমন বলিবার কি সুযোগ আছে। যদি তাহা সম্ভব হইত তাহা হইলে আদিতত্ত্ব কিরূপে আবিষ্কৃত হইল। আত্যন্তিক আগ্রহ প্রবল জ্ঞান-পিপাসা ও একান্ত যত্নের সহিত চেষ্টা করাতেই জগতে নানা তত্ত্বের আবিষ্কার হইয়াছে। সকলেরই প্রথম শিক্ষক জ্ঞানদাতা সর্ব্বজন গুরু পরমেশ্বর।' তিনি শিক্ষা না দিলে কোন তত্ত্বই শিক্ষা করিবার উপায় নাই। সুতরাং প্রত্যেক বিষয়েই মানুষ তাঁহার মুখাপেক্ষা করিয়া, তাঁহার প্রতি নির্ভরশীল হইয়া থাকিতে পারিলে শিক্ষা করিতে পারে। কিন্তু তাহা সময় ও পরিশ্রম সাধ্য। এজন্য যে তত্ত্ব একবার প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা জানিবার জন্য আর সেরূপ পরিশ্রম ও সময় ব্যয় না করিয়া, সেই তত্ত্বজ্ঞের নিকট শিক্ষা করাই যুক্তি সঙ্গত। তদ্দ্বারাই সহজে অল্প সময়ে শিক্ষার বিস্তার হইতে পারে। ধর্ম্মতত্ত্ব শিক্ষার জন্যও এই নিমিত্তই প্রকাশিত তত্ত্ব সম্বন্ধে শিক্ষকের সাহায্য লওয়া আবশ্যক। কিন্তু ইহা দ্বারা এমন প্রমাণিত হয় না যে সেই শিক্ষকের নিকট না গেলে আর সে তত্ত্ব শিক্ষার উপায় ছিল না বা তাঁহার নিকট শিক্ষা লাভ না করিলে কাহারও পরিত্রাণ হইবে না। ধর্ম্ম রাজ্যে এই এক ভয়ানক বিভীষিকা বর্ত্তমান আছে, যে ব্যক্তি-বিশেষের শরণাপন্ন না হইলে, তাঁহার প্রদর্শিত পথে না চলিলে আর কাহারও উপায় নাই। পরিত্রাণ নাই। তাঁহার কথার উপর সন্দেহও বিচার করিবার শিক্ষার্থীর কোন অধিকার নাই। সম্পূর্ণরূপে আত্ম-বিচারবুদ্ধি ও বিবেককে বিসর্জ্জন দিয়া কোন ব্যক্তির হস্তে আত্ম সমর্পণ না করিলে আর কিছুতেই শিক্ষা পাইবার উপায় নাই। এমন কি এ দেশে ধর্ম্মগুরু কেবল আধ্যাত্মিক বিষয়ের ভার লইয়াই ক্ষান্ত হন না—শিষ্যের সর্ব্ব প্রকার বিষয়েরই বিধাতা হইয়া থাকেন। সেরূপ বিষয়েরও শিষ্যের স্বাধীনতা থাকে না। ব্রাহ্মগণ এই প্রকার অন্ধ ভাবে অনুসরণ করাকে—আত্ম বিবেককে বিসর্জ্জন দিয়া সম্পূর্ণরূপে পরের অনুসরণ করাকে সঙ্গত মনে করেন না। তদ্দ্বারা আত্মার অধোগতির যথেষ্ট প্রমাণ সকল জগতে বিদ্যমান রহিয়াছে। এই জন্য ব্রাহ্মগণ কাহাকেও এমন ভাবে গুরু স্বীকার করেন না, যাঁহার অধীনতাতে বিবেক মলিন হইতে পারে বা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ঈশ্বরের সম্মুখীন হইবার সম্ভাবনা না থাকে। পরম গুরু পরমেশ্বর প্রত্যেক আত্মার জন্য তাঁহার শিক্ষার দ্বার খুলিয়া রাখিয়াছেন। সেই দ্বারে

গমন করিতে অভ্যস্ত হওয়াই নিরাপদ। কারণ সেই গুরুর সহিত কাহারও বিচ্ছেদ ঘটে না। তিনি সর্ব্বদা সকলের সঙ্গেই আছেন। পৃথিবীর গুরু সকল সময় সঙ্গে থাকিতে পারেন না। সকল নর নারীর পক্ষে গুরুর সাক্ষাৎ পাওয়াও সম্ভবপর নয়, কারণ গুরুর সংখ্যা বেশী নয়। এবং সকল বিষয়ে তাঁহার জ্ঞান ও সম্যক নহে। এজন্য জীবনের সমগ্র বিষয় শিক্ষার ভার কাহারও প্রতি অর্পণ করা কর্ত্তব্য নহে। যিনি যে বিষয়ে অভিজ্ঞ তাঁহার নিকট সে বিষয় অবশ্যই শিক্ষা করা যাইতে পারে। তাহাতে অল্প পরিশ্রম ও সময়ে কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে। সুতরাং তাহা কেন ব্রাহ্মের পক্ষে অকর্ত্তব্য হইবে? কিন্তু সর্ব্বদাই স্বানুভূতি সুশাস্ত্র ও সদুপদেষ্টার উপদেশকে মিলাইয়া কার্য্য করিতে হইবে। বর্ত্তমান সময়ের গুরুগণ তাহাতে বাধা দেন বলিয়াই ব্রাহ্মগণ সেরূপ গুরুকরণে অনিচ্ছুক। এবং ব্রাহ্মগণ এমনও মনে করেন না যে এই রূপে গুরুর অধীন না হইলে কাহারও পরিত্রাণ লাভ হয় না। একজন যদি আন্তরিক যত্ন ও পরিশ্রমে কোন সত্য আয়ত্ত করিতে পারিয়া থাকেন, অন্যেও তাহা পারিবেন। ইহাই ব্রাহ্মের বিশ্বাস। এজন্য কোন আশঙ্কা-জনক পথে গমন না করিয়া পরম গুরু পরমেশ্বরের নিকট যাইতে এবং তাঁহার শিক্ষাকে শিরোধার্য্য করিতেই ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের উপদেশ। মানবের মধ্যে যিনি সেই শিক্ষার অনুরূপ শিক্ষা প্রদান করিতে পারেন বা সেজন্য প্রয়াসী হন, ব্রাহ্ম সেরূপ শিক্ষকের শিক্ষা গ্রহণ করিতে কখনই বিমুখ হইবেন না।

সত্যদর্শীর ৩য় প্রশ্ন এই যে "যোগশিক্ষাকারিগণ বলেন যে ......। বিষয়ী ব্যক্তির বহির্ম্মুখীন মনকে অন্তর্ম্মুখীন করিয়া ব্রহ্ম দর্শনের পথ খুলিয়া দিতে পারেন। ইহারই নাম শক্তিসঞ্চার। এরূপ শক্তি সঞ্চারের মধ্যে কোন সত্য আছে কি না"। এইপ্রশ্নের মীমাংসা কিরূপে করা উচিত। সাধারণতঃ ফল দ্বারাই কার্য্যের গুণাগুণ নির্ণয় করা হইয়া থাকে। যোগশিক্ষাকারিগণ শক্তি-সঞ্চারের যেরূপ ফললাভের আশা করেন। এদেশের সহস্র সহস্র নর নারীর জীবনে কি তাহা প্রতিফলিত হইতেছে? শত শত বৎসর ধরিয়া এ দেশ এরূপ শক্তি সঞ্চারের ফল পরীক্ষা করিয়া আসিয়াছে। কিন্তু শক্তি সঞ্চার হইলেই যে বিষয়ী ব্যক্তির মন অন্তর্ম্মুখীন হয় বা ব্রহ্মদর্শনের পথ খুলিয়া যায় এমন দৃষ্টান্ত ত বেশী দেখা যায় না। কোন সম্প্রদায় বিশেষের নামোল্লেখ না করিলেও এ দেশের শক্তিসঞ্চারগ্রস্ত কোন কোন সম্প্রদায় জগতে ধর্ম্মজীবনের কেমন সাক্ষ্য প্রদান করিতেছেন তাহা সকলেরই জানা আছে। ঈশ্বর-দর্শনের পথ খুলিয়া গেলে অর্থাৎ ঈশ্বর-দর্শনের সুবিধা পাইলেও যদি জীবনের এরূপ দুরবস্থা থাকে বা সেই দর্শন বিষয়ে উদাসীনতাই থাকে অথবা বহির্ম্মুখীন মন অন্তর্ম্মুখীন না হয়, তাহা হইলে সে শক্তি সঞ্চারের শক্তি কেমন তাহা বুঝা যাইতেছে। এ দেশের পক্ষে শক্তিসঞ্চারের কথা নূতন নয়। তদ্দ্বারা যে সকল ফল লাভ হয়, তাহাও বহু দিন হইতেই পরীক্ষিত হইয়া আসিতেছে, যদি প্রকৃতই শক্তি-সঞ্চার মানবের ঈশ্বর দর্শনের পথ খুলিয়া দিতে সমর্থ হইত এবং বিষয়ীর বহির্ম্মুখীন মনকে অন্তর্ম্মুখীন করিতে সমর্থ হইত, তাহা হইলে এ দেশের কোটীকোটী নরনারীর জন্য যাহা শতশত বৎসর খোলা আছে তাহার ফল কি এমন হইত। যখন এ দেশের নর নারীর জীবনে সে ফল ফলে নাই, তখন শক্তি সঞ্চারের যে ফলের আশা যোগশিক্ষাকারিগণ করিতেছেন তাহা নিতান্তই দুরাশা। যোগশিক্ষাকারিগণের উদ্দেশ্য যদি সফল হইত জগতের পক্ষে তাহা একটী অতি শুভসংবাদ এবং অত্যন্ত কল্যাণকর ব্যাপার হইত। কিন্তু শত শত বৎসরে সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় নাই। শক্তি সঞ্চার দ্বারা যাঁহারা ঈশ্বর দর্শনে সমর্থ হইয়াছেন বলিয়া মনে করেন, তাঁহাদের সেই ঈশ্বর দর্শন লাভ একমাত্র শক্তিসঞ্চার বা অন্যবিধ সাধনের ফল তাহাও নিরূপিত হয় নাই। কিন্তু ইহা দেখা গিয়াছে, তাঁহাদিগকেও নিরন্তর নাম সাধন ও অন্যবিধ সাধন ভজনে রত থাকিতে হইয়াছে। সুতরাং কোন্ সাধনের ফলে ঈশ্বর দর্শন হইল কেমন করিয়া বলা যাইতে পারে। সাধারণতঃ ঈশ্বরের কৃপাবাদিগণ ঈশ্বর দর্শনকে তাঁহার কৃপার দান মনে করিয়া থাকেন। সুতরাং মানবপ্রভাব কি ঈশ্বর-প্রভাব কোন্ প্রভাবে সেই শুভফল পাওয়া গেল, তাহা কেহই স্থিররূপে নির্দ্দেশ করিতে পারেন না। এজন্য শত শত বৎসর যে ব্যাপারের ফল এদেশ পরীক্ষা করিয়া আসিয়াছে, তাহার পশ্চাতে বিফল মনোরথ হইবার জন্য কোন বুদ্ধিমানেরই যাওয়া উচিত নয়। ব্রাহ্মধর্ম্ম এরূপ শক্তি সঞ্চারের ফলবত্তা বিশেষ কিছু আছে বলিয়া মনে করেন না। যদিও কিছু ফলবত্তা থাকে তাহাও তেমন আকাঙ্ক্ষণীয় বলিয়া মনে হয় না। কারণ তদপেক্ষা সহজও সফল প্রণালী জগতের নিকট প্রকাশিত হইয়াছে। শক্তিসঞ্চারের প্রকৃষ্ট অর্থ এই যে কোন ভক্তিমান ব্যাকুলাত্মার নিকট গমন করিলে বা তাঁহার সহবাসে থাকিলে সহজেই ভক্তিবৃত্তি প্রবল হইয়া থাকে—ব্যাকুলতা বৰ্দ্ধিত হইয়া থাকে। বিশ্বাসীর সহবাসে থাকিলে বিশ্বাসের সঞ্চার হয়। অনাসক্ত বৈরাগীর সহবাসে বৈরাগ্যের সঞ্চার হইয়া থাকে। এইরূপ সাধুসহবাসের ফল সর্ব্বত্রই প্রতিফলিত হইয়া থাকে। বিশ্বাসী, ভক্ত, ও প্রেমিকের বিশ্বাস, ভক্তি, প্রেম অন্য ব্যক্তিতে সঞ্চারিত হওয়াকে যদি শক্তি সঞ্চার নাম দেওয়া যায়, সেরূপ শক্তি সঞ্চারকে ব্রাহ্মসমাজ অতি আদরের সহিত চিরদিন গ্রহণ করিবেন। ফলতঃ আধ্যাত্মিক জগতে ইহাই শক্তি। এবং এই শক্তিলাভ করিলেই সাধক সিদ্ধ মনোরথ হইতে পারেন। প্রেম, ভক্তি বিশ্বাসাদির ন্যায় আধ্যাত্মিক শক্তি ভিন্ন অপর যে শক্তি তাহা জড়ীয় শক্তি হওয়াই সম্ভব। তাহা শরীরের কল্যাণ সাধনে উপযুক্ত হইলেও হইতে পারে। আত্মার কল্যাণ সাধনে জড়ীয় শক্তির প্রভাব বেশী আছে এমন নয়। সুতরাং সেরূপ শক্তি সঞ্চারের প্রয়োজন ব্রাহ্মসমাজ স্বীকার করেন না।

নিবেদক

কলিকাতা। শ্রীআদিনাথ চট্টোপাধ্যায়।

শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত তত্ত্বকৌমুদী সম্পাদক

মহাশয় সমীপেষু—

(ভ্রাতৃদ্বিতীয়া)

মহাশয়,

এই পত্রের শিরোনামের বিষয় লইয়া অদ্য কিঞ্চিৎ আলোচনা করিতে বাসনা করি। হিন্দু সমাজের অনেকগুলি প্রাচীন গার্হস্থ্য অনুষ্ঠান আমরা ব্রাহ্মসমাজ মধ্যে গ্রহণ করিতে সক্ষম হই নাই। কেন হই নাই, তাহা বলিবার আবশ্যকতা অদ্য আমি দেখিতেছি না। কোন কোন অনুষ্ঠান অতিশয় আদরের সহিত ব্রাহ্মসমাজ গ্রহণ করিয়াছেন। তন্মধ্যে জাতাহের উল্লেখ করা যাইতে পারে। অনেক ব্রাহ্ম পরিবারে দারিদ্র্যের মধ্যেও যে প্রকার আড়ম্বরের সহিত জাতাহ পর্ব্ব সম্পন্ন হইয়া থাকে, তাহা আমরা সকলেই জানি। অবস্থার অতিরিক্তরূপ আয়োজন না করিয়া জাতাহ পর্ব্বানুষ্ঠান সম্পাদিত হওয়া বাঞ্ছনীয় বলিয়াই মনে হয়। জাতাহের ন্যায় হিন্দুসমাজ-প্রচলিত সর্ব্বপ্রকার গার্হস্থ্য অনুষ্ঠান যে ব্রাহ্ম পরিবার মধ্যে অনুষ্ঠিত হইতে পারে না, ইহার সর্ব্ববাদিসম্মত। ভ্রাতৃদ্বিতীয়া আমি তদ্বিধ একটী অনুষ্ঠান বলিয়া মনে করি। কিন্তু কতিপয় শ্রদ্ধেয় এবং আমার ভক্তিভাজন আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্ম, নিজ নিজ পরিবার মধ্যে, সাতিশয় সমারোহ সহকারে ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার অনুষ্ঠান করিতে প্রবৃত্ত হইতেছেন দেখিয়াই আমি এই বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম।

হিন্দুশাস্ত্র হইতে এই বিষয়ে কি জানিতে পারা যায়, তাহা অগ্রে দেখা যাউক।

"নির্ণয়ামৃতাদিতে" উক্ত হইয়াছে, যমদ্বিতীয়াতু "প্রতিপদ্যুতা গ্রাহ্যেতি। যমদ্বিতীয়া মধ্যাহ্ন ব্যাপিনী পূর্ব্ববিদ্ধা চেতি হেমাদ্রিঃ। অর্থাৎ নির্ণয়ামৃতাদিতে কহিতেছেন, প্রতিপদযুক্তা দ্বিতীয়া, যমদ্বিতীয়া। হেমাদ্রিতে উক্ত হইয়াছে, মধ্যাহ্নের পূর্ব্ব হইতে আরম্ভ করিয়া মধ্যাহ্নকালব্যাপিনী দ্বিতীয়া, যমদ্বিতীয়া।

অত্র বিশেষো হেমাদ্রৌ স্কান্দে :—

"ঊর্জ্জে শুক্ল দ্বিতীয়ায়ামপরাহ্নেহর্চ্চয়েৎ যমম্।
স্নানংকৃত্বা ভানুজায়াং যমলোকং ন পশ্যতি॥
ঊর্জ্জে শুক্ল দ্বিতীয়ায়াং পূজিত স্তর্পিতো যমঃ।
বেষ্টিতঃ কিন্নরৈর্হৃষ্টৈ স্তস্মৈ যচ্ছতি বাঞ্ছিতং॥

অর্থাৎ ঊর্জ্জে (কার্ত্তিক মাসের) শুক্ল দ্বিতীয়াতে অপরাহ্নে যমের অর্চ্চনা করিবে; স্নানান্তে সূর্য্যজায়া ছায়ার অর্চ্চনা করিবে, তাহা হইলে যমলোক দর্শন করিতে হইবে না। কার্ত্তিক মাসের শুক্ল দ্বিতীয়ায় পূজিত ও তর্পিত যম, হৃষ্ট ও কিন্নরগণ কর্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়া বাঞ্ছিত যাহা তাহা প্রদান করেন।

ভবিষ্য পুরাণেও প্রায় ঐরূপ উল্লেখ আছে। গৌড়দেশের নিমিত্ত নিম্নলিখিতরূপ ব্যবস্থা :—

যমঞ্চ চিত্রগুপ্তঞ্চ যমদূতাংশ্চ পূজয়েৎ।
অর্ঘ্যশ্চাত্র প্রদাতব্যো যমায় সহজদ্বয়ৈঃ॥
মন্ত্রস্তু।
"এহ্যেহি মার্ত্তণ্ডজ! পাশহস্ত!
যমান্তকালোকধরামরেশ!
ভ্রাতৃদ্বিতীয়া কৃতদেব পূজাং
গৃহাণ চার্ঘ্যং ভগবন্নমস্তে॥
ভ্রাতস্তবানুজাতাহং ভুঙ্‌ক্ষভক্তমিদং শুভম্।
প্রীতয়ে যমরাজস্য যমুনায়া বিশেষতঃ॥"
জ্যেষ্ঠাগ্রজাতেতি বদেদিতি স্মার্ত্তঃ॥ ইত্যন্ন দানমিত্যপ্যাহুঃ।

ইতি নির্ণয় সিন্ধৌ ২য় পরিচ্ছেদঃ।

উপরি-উক্ত সংস্কৃত বচনগুলির ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন। উদ্ধৃত শ্লোকগুলি দ্বারা স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার অপর নাম যমদ্বিতীয়া এবং ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার সঙ্গে যম ও যমুনা পূজা জড়িত রহিয়াছে। যম ও যমুনা পূজা না করিয়া ভ্রাতৃদ্বিতীয়ানুষ্ঠান শাস্ত্রের বিধি নহে। তবে যম ও যমুনা পূজা বাদ দিয়া ভ্রাতার আদর অভ্যর্থনা করিতে আমার আপত্তি নাই। কিন্তু তাহা কার্ত্তিকের শুক্ল দ্বিতীয়াতে না করিয়া একটী বিশেষ তারিখ ধরিয়া করাই যুক্তিসঙ্গত। ব্রাহ্ম কোন কার্য্য নিরর্থক ভাবে করিবেন না। তিনি যাহা কিছু করিবেন, তাহা যুক্তির অনুমোদিত হওয়া আবশ্যক। অর্থহীন ভাবে কোন কার্য্য করা যদি কাহারও পক্ষে গর্হিত হয়, তবে তাহা ব্রাহ্মেরই পক্ষে। ব্রাহ্ম ভগিনী যদি ভ্রাতার আদর বা পূজা করিতে চাহেন, তবে তিনি কার্ত্তিকের শুক্লদ্বিতীয়ায় না করিয়া অপর একটী নির্দ্দিষ্ট দিবসে করিলেই যুক্তিসঙ্গত হয়। ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার ভ্রাতৃপূজার অনুষ্ঠান একটী সাংবৎসরিক অনুষ্ঠান বলিয়াই বুঝিতে হইবে। ভ্রাতৃপূজার সাংবৎসরিক অনুষ্ঠান করিতে হইলে ভ্রাতৃদ্বিতীয়াতে তাহা হয় না, কেন না কার্ত্তিকের শুক্ল দ্বিতীয়া ত ঠিক ৩৬৫ দিবস পরে আসে না, প্রায়ই ৩৬৫ দিবসের অনেক অগ্রে বা পরে আসে। সুতরাং কার্ত্তিকের শুক্ল দ্বিতীয়া ধরিয়া ভ্রাতৃপূজা করিতে হইলে ভ্রাতৃপূজার সাম্বৎসরিক অনুষ্ঠানের অভিপ্রায় সিদ্ধ হইল না।

ভ্রাতৃদ্বিতীয়ায় যম ও যমুনা পূজার অংশ বাদ দিয়া ভ্রাতৃদ্বিতীয়া আনুষ্ঠান যদি ব্রাহ্মের অনুষ্ঠেয় হয়, তবে আরও কতকগুলি অনুষ্ঠান ব্রাহ্মপরিবারমধ্যে গৃহীত হইলে জাতীয়ভাব বৃদ্ধির পক্ষে বিশেষ সহায়তা হয়। যথাঃ—বিজয়ার নমস্কার ও আলিঙ্গনাদি এবং জামাতৃঅর্চ্চন, (জামাইষষ্ঠী বা ষষ্ঠীবাঁটা) ও নবান্ন প্রভৃতি। এতদ্ব্যতীত ব্রাহ্ম যদি ভ্রাতৃ-অর্চ্চন করেন, তবে তাঁহার পক্ষে বৎসরের মধ্যে অন্ততঃ একটী দিন পিতৃ-অর্চ্চন, মাতৃ অর্চ্চন, দাস দাসী অর্চ্চন প্রভৃতি বহুবিধ পূজার্চ্চনার প্রবর্ত্তন করা আবশ্যক। নতুবা বৎসরের মধ্যে কেবল মাত্র এক দিন একটী ভ্রাতৃ-অর্চ্চনের ব্যবস্থা করা যুক্তি ও তর্কানুমোদিত হয় না। আর এক কথা ভবিষ্য পুরাণে উক্ত হইয়াছে" "স্নেহেন ভগিনী হস্তাৎ ভোক্তব্যং পুষ্টিবর্দ্ধনম্, দানানিচ প্রদেয়ানি ভগিনীভ্যো বিধানতঃ॥ স্বর্ণালঙ্কার বস্ত্রান্নপূজা সৎকার ভোজনৈঃ। সর্ব্বা ভগিন্যঃ সংপূজ্যা * * * * * ॥

ব্রাহ্মগণ যে হিন্দু আচার গ্রহণ করিয়া ভ্রাতৃপূজার অনুষ্ঠান করিতেছেন সেই আচারানুসারেই আবার ভগিনীকেও স্বর্ণালঙ্কার প্রভৃতি বহুবিধ মনোহারী পদার্থ প্রদান করিবার ব্যবস্থা আছে। কিন্তু ব্রাহ্মগণ দেখেন, হিন্দুগণ ভগিনীকে কিছু বড় একটা দানাদি করেন না বা পূজাদি করেন না, সেই জন্য তাঁহারাও ভগিনী অর্চ্চন অংশ বাদ দিয়াছেন। আমার আসল বক্তব্য এই যে, হিন্দু সমাজ মধ্যে প্রাচীন কাল হইতে যে সকল পৌত্তলিক অনুষ্ঠান চলিয়া আসিতেছে তাহার পৌত্তলিক অংশ বাদ দিয়া যদি অপর অংশ গ্রহণ করা ব্রাহ্মসাধারণের অভিপ্রেত হয়, তাহা হইলে সর্ব্বাগ্রে বিজয়ার নমস্কার আলিঙ্গনাদির ন্যায় জাতীয় প্রেমোদ্দীপক অনুষ্ঠানগুলি গ্রহণ করা অত্যন্ত উচিত। তৎপর সম্ভব হইলে বিচারপূর্ব্বক আরও অনেক অনুষ্ঠান ব্রাহ্মসমাজ মধ্যে প্রবেশ করান যাইতে পারে। কিন্তু তাহা না করিয়া কেবল মাত্র ভ্রাতৃদ্বিতীয়ানুষ্ঠান সম্পন্ন করা কোন মতেই যুক্তিসঙ্গত নহে। ইতি

দেবগৃহ
১২ই নবেম্বর
১৮৯৩

নিবেদক
শ্রীউমাপদ রায়

ব্রাহ্মসমাজ।

নামকরণ—আমাদের প্রেমাস্পদ ভ্রাতা শ্রীযুক্ত গৌরীনাথ বসুর প্রথমা কন্যার নামকরণ কার্য্য গত ২৬শে কার্ত্তিক সুসম্পন্ন হইয়াছে। কন্যার নাম শ্রীমতী সুধাময়ী রাখা হইয়াছে। গৌরীবাবু এই উপলক্ষে সাধনাশ্রমে ১৲ দান করিয়াছেন। এবং গত ২৭শে কার্ত্তিক শ্রদ্ধেয় ভ্রাতা শ্রীযুক্ত বঙ্কবিহারী বসুর ২য় পুত্রের নামকরণ কার্য্য সুসম্পন্ন হইয়াছে। বঙ্কবাবু এই উপলক্ষে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রচারফণ্ডে ১৲ টাকা ও সাধনাশ্রমে ১৲ টাকা দান করিয়াছেন. এই উভয় অনুষ্ঠান উপলক্ষেই শ্রীযুক্ত নবদ্বীপচন্দ্র দাস মহাশয় উপাসনার কার্য্য করিয়াছেন। ঈশ্বর শিশুদিগকে দীর্ঘায়ু করুন।

কুমারখালি ব্রাহ্মসমাজের বার্ষিক উৎসব—গত ৫ই এবং ৬ই কার্ত্তিক শনি ও রবিবার কুমারখালি ব্রাহ্মসমাজের বার্ষিক উৎসব হইয়া গিয়াছে। দুই দিবসই প্রাতে ও সন্ধ্যাতে মন্দিরে উপাসনা উপদেশাদি হইয়াছে। শ্রীযুক্ত নবদ্বীপচন্দ্রদাস মহাশয় উপসনার কার্য্য করিয়াছেন। রবিবার অপরাহ্ণে শ্রীযুক্ত বাবু হেরম্বচন্দ্র মৈত্র এম,এ মহাশয় ইংরেজীতে বক্তৃতা করেন। বক্তৃতার বিষয় "জীবনের কৃতকার্য্যতা"।

স্থায়ী প্রচার ফণ্ড—স্বর্গীয় জগদীশ্বর গুপ্ত মহাশয়ের শ্রাদ্ধ উপলক্ষে তাঁহার সহধর্ম্মিণী স্থায়ী প্রচার ফণ্ডে ৫০০৲ পাঁচ শত টাকা দানের সংকল্প করিয়াছিলেন। তিনি এখন সমাজের হস্তে সেই টাকা অর্পণ করিয়াছেন! ঈশ্বর পরলোকগত আত্মার তৃপ্তি সাধন করুন। অনাথা বিধবা পৃথিবীতে শান্তিলাভ করুন। তাঁহার আরও অনেক গুলি সৎ সংকল্প আছে। লোকাভাবে সেগুলি সুসম্পন্ন হইতেছে না। তিনি নিজ গ্রামে যে সব সদনুষ্ঠানের বাসনা করিয়াছিলেন, তাহা সুসম্পন্ন করিতে হইলে, লোকের আবশ্যক। ঈশ্বর সাধুসঙ্কল্পের সহায় হউন। স্থায়ী প্রচার ফণ্ডের উন্নতি না হইলে প্রচার কার্য্যের সুশৃঙ্খলা হওয়া কঠিন। যাঁহারা এই ফণ্ডে দান স্বাক্ষর করিয়াছেন, তাঁহারা আপনাদের অঙ্গীকৃত দান প্রদান করিয়া ফণ্ডকে পুষ্ট করুন যাঁহারা এ বিষয়ে এখনও উদাসীন আছেন, তাঁহারা চিন্তা করুন, আপনার সমাজকে ভাল বাসিতে হইলে এইরূপেই তাহার পরিচয় দেওয়া উচিত।

উৎসব—গত ৩১এ আশ্বিন হইতে ৪ঠা কার্ত্তিক পর্য্যন্ত মাণিকদহস্থ শ্রীযুক্ত বাবু বিপিনবিহারী রায় মহাশয়ের ভবনে পারিবারিক ব্রহ্মোৎসব হইয়াছিল। কলিকাতা, ঢাকা, ময়মনসিংহ, বরিশাল প্রভৃতি স্থান হইতে ব্রাহ্মগণ উৎসবে সমাগত হইয়াছিলেন। ৩১এ আশ্বিন রাত্রে উদ্বোধন হয়। প্রচারক শ্রীযুক্ত নবদ্বীপচন্দ্র দাস আচার্য্যের কার্য্য করেন। ১লা কার্ত্তিক প্রাতে শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন বসু ও সায়াহ্ণে বাবু আদিনাথ চট্টোপাধ্যায় উপাসনা কার্য্য সম্পন্ন করেন। ২রা কার্ত্তিক প্রাতে শ্রীযুক্ত নবদ্বীপচন্দ্র দাস ও সায়াহ্ণে শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় আচার্য্য ছিলেন। ৩রা কার্ত্তিক বিপিন বাবুর বাটীর সন্নিকটস্থ একটী বটবৃক্ষের তলে উপাসনা হয়, শ্রীযুক্ত নবদ্বীপচন্দ্র দাস উপাসনা করেন ও শ্রীযুক্ত গুরুদাস চক্রবর্ত্তী ও শ্রীযুক্ত শশিভূষণ মল্লিক বক্তৃতা করেন। সায়ংকালে উপাসনা হয়। বাবু আদিনাথ চট্টোপাধ্যায় উপাসনা করেন। ৪ঠা কার্ত্তিক প্রাতঃকালে উপাসনা হয়। বাবু নবদ্বীপচন্দ্র দাস উপাসনা করেন। অপরাহ্ণে নগরকীর্ত্তন ও বাজারে বক্তৃতা হয় এবং সায়াহ্ণে স্থানীয় ব্রাহ্মসমাজের উন্নতির জন্য নবদ্বীপ বাবু প্রার্থনা করেন। তৎপরে কীর্ত্তনাদি করিয়া উৎসব কার্য্য সম্পন্ন হয়। এতদ্ব্যতিরেকে উৎসবে "ঊষা কীর্ত্তন" এবং অপরাহ্ণে আলোচনা হইত। এবারে উৎসবে অনেক তাপিত আত্মা শান্তি পাইয়াছে। ধন্য তাঁহার কৃপা, যাঁহার বিধানে মধ্যে মধ্যে উৎসবাদ আসিয়া তাপিত আত্মায় শান্তিবারি সিঞ্চন করে ও উন্নত জীবন লাভের পক্ষে সহায়তা করে।

সদনুষ্ঠান—আমাদের কটীয়াস্থ বন্ধু ডাক্তার হরনাথ ঘোষ মহাশয় ইতিপূর্ব্বে আপনার পরলোকগতা সহধর্ম্মিণী শরৎ কামিনীর নামে একটী স্থায়ী ফণ্ড সংস্থাপিত করিয়া ১০০৲ টাকা প্রেরণ করিয়াছেন। সে সংবাদ পূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছে। অল্প দিন হইল তাঁহার খুল্লতাত ভগ্নীর শ্রাদ্ধ উপলক্ষে ঐ এইরূপ তাঁহার নামে একটী ফণ্ড সংস্থাপন জন্য ১৫৲ টাকা প্রেরণ করিয়াছেন। এই ফণ্ড শ্যামাসুন্দরী ফণ্ড নামে অভিহিত হইবে। এই টাকা মূল ধন স্বরূপ থাকিয়া উহার আয় হইতে সমাজের কার্য্যে ব্যয় হইবে। শ্রাদ্ধাদি অনুষ্ঠানে মৃত ব্যক্তির নামে এইরূপ ফণ্ড সকল স্থাপন করিলে মৃত ব্যক্তিদের জন্য স্মৃতিসূচক অনুষ্ঠান হয় এবং উহা দ্বারা সমাজের প্রভূত কল্যাণ সাধিত হয়; আমরা অনুষ্ঠান সকলে অযথা অনেক টাকা ব্যয় করিয়া থাকি। কিন্তু তাহাতে বিশেষ কোনই ফল হয় না। এরূপ ফণ্ড সংস্থাপন করিলে বিশেষ উপকারের আশা করা যায়। হরনাথ বাবুকে এই সাধু সঙ্কল্পের জন্য আমরা ধন্যবাদ করি। অনুষ্ঠাতাদিগের দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট হউক ইহা বাঞ্ছনীয়।

প্রচার—শ্রীযুক্ত নবদ্বীপচন্দ্র দাস মহাশয় বাঁকুড়া অঞ্চল হইতে প্রত্যাগমন করিয়া মাণিকদহে শারদীয় উৎসবে যান। সেখানে উৎসবের কার্য্য সমাপন করিয়া কুমারখালি ব্রাহ্মসমাজের বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে তথায় যান। সেখানে উৎসবের কার্য্য সমাপন করিয়া ঢাকাতে পূর্ব্ব বাঙ্গালা ব্রাহ্মসম্মিলনীতে যোগদান করেন। তথায় পরিবারে উপাসনা করেন এবং একদিন প্রাতে সমাজে উপাসনা করেন। তথা হইতে ফরিদপুরে যান। তথায় সমাজে উপাসনা করেন এবং পরিবারে উপাসনা পাঠব্যাখ্যাদি করেন। তথা হইতে কলিকাতা প্রত্যাগমন করিয়াছেন।

দানপ্রাপ্তি—কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করা যাইতেছে যে বিক্রমপুরের দুর্ভিক্ষ নিবারণার্থে নিম্নলিখিতরূপ দান পাওয়া গিয়াছে।

পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।

তালিকা দেখ।

শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী দাস কলিকাতা	॥০
ব্রাহ্মসমাজের একজন দরিদ্র সহানুভূতিকারী বারোদী নদীয়া	।০
মাননীয় গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় কলিকাতা	১৲
শ্রীমতী গিরিবালা দাস ঐ	২৲
শ্রীযুক্ত লক্ষ্মীনারায়ণ চৌধুরী, নাগপুর	৫৲
রাঁচি ব্রাহ্মসমাজের সভ্যগণের নিকট হইতে বাবু ত্রিপুরাচরণ রায় দ্বারা সংগৃহীত	২৸৵০
শ্রীযুক্ত গৌরীনাথ বসু কলিকাতা	।০
শ্রীমতী সুবর্ণপ্রভা বসু ,,	৫৲
শ্রীযুক্ত তারণচন্দ্র দাস লাহোর	১৲
সরদার দয়াল সিংহ লাহোর	২৫৲
একটী মহিলা কলিকাতা	
কোন এক বন্ধু ,,	।

ক্রমশঃ

২১১নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট ব্রাহ্ম মিশন যন্ত্রে শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দত্ত কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও ৭ই অগ্রহায়ণ প্রকাশিত।

ধর্ম্ম ও সমাজতত্ত্ব বিষয়ক পাক্ষিক পত্রিকা।

১৬শ সংখ্যা।
১৬ শভাগ।

১৬ই অগ্রহায়ণ, বৃহস্পতিবার, ১৮১৫ শক, ব্রাহ্ম সম্বৎ ৬৪।

বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২॥০
মফস্বলে ৩৲
প্রতি খণ্ডের মূল্য ৵০

প্রার্থনাতে জেগে রও।

প্রহর না হতে রাতি, গগন ছাইল
ঘন ঘনে ; আসিছে আসিছে
মেঘরাশি ; বায়ুভরে চৌদিকে ধাইল ;
ঘোরাধাঁরে ধরণী গ্রাসিছে।

হুঙ্কারি ডাকিল বায়ু ; উঠে লম্ফ দিয়া,
তরুশিরে ভাঙ্গে মড়মড়ি ;
চপলা চমকে শত নয়ন ধাঁধিয়া ;
শত বাজ ছোটে কড়মড়ি,

ঝিমির ঝিমির ঝিম্ বর্ষে সারারাতি :
শন্ শন্ গবাক্ষে হুঙ্কারে ;
সারানিশি চিকিমিকি চপলার ভাতি ;
ভেকদল ডাকে চারিধারে।

প্রভাতে উঠিয়া দেখি, সুনীল আকাশে
মেঘবিন্দু নাহি কোনো ধারে,
নবীন অরুণ-বিভা প্রাচীতে প্রকাশে ;
হেম-দ্রবে মাথায় সংসারে।

নব-জলে স্নাত তরু সুস্নিগ্ধ কোমল,
তদুপরি সে কিরণ ধারা,
নয়নের প্রীতি-প্রদ পবিত্র উজ্জ্বল,
কিবা ধরা চিত্ত-চমৎকারা।

এই ছিল কালরাতি, এই সুপ্রভাত,
সে প্রসন্ন প্রকৃতির হাসি,
কোথা বর্ষা, সে বিজলী, কোথা বজ্রপাত,
নবানন্দে ধরা যায় ভাসি।

নিরাশে ডুবোনা ভাই, বিপদ আঁধার
রহিবে না জেনচিরকাল ;
শান্তি পবিত্রতা প্রেম পাইবে আবার,
কেটে যাবে ঘন মোহজাল।

প্রার্থনাতে জেগে রও, ব্রহ্মকৃপা স্মরি,
ধৈর্য্যডোরে বাঁধহে আপনা ;
বিপুল বিপ্লব মাঝে সেই কৃপা ধরি
কর তুমি সত্যের সাধনা।

সম্পাদকীয় ও প্রাপ্ত প্রবন্ধ।

সাধন-সম্পত্তি - একজন সাধক বলিয়াছেন, "অনুতাপের লক্ষণ কি, তাহার প্রকৃতি কি এবং তাহার কার্য্যই বা কি এ শাস্ত্র জানিতে চাই না, কিন্তু অনুতাপ করিতে চাই।" প্রকৃত সাধকের কথাই এই। অনুতাপের শাস্ত্র শুনিয়া আমার কি হইবে, অনুতাপের কারণ সত্ত্বেও যে আমার হৃদয়ে যথেষ্ট অনুতাপের উদয় হয় না, এই দুঃখেই ম্রিয়মান্ আছি। যাঁহারা আপনাদের জীবন পরীক্ষা করিয়া আপনাদিগকে অন্তরে ঘৃণা করিতে থাকেন—তাঁহাদের ধর্ম্মোপদেশের প্রতি এক প্রকার বিতৃষ্ণা জন্মিয়া যায় ; মন বলিতে থাকে, "দূর হৌক ও সকল বলিয়া ও শুনিয়া কি হইবে ?" যদি একজন বসিয়া বসিয়া মনোযোগ পূর্ব্বক সুচিকিৎসকের প্রণীত স্বাস্থ্যরক্ষা গ্রন্থ সকল পাঠ করে, এবং সে বিষয়ে তাহার পরিপক্ক জ্ঞান জন্মে, কিন্তু কার্য্যকালে যদি দেখা যায়, যে তাহার নিজের স্বাস্থ্যরক্ষার দিকে দৃষ্টি নাই, এবং দিন দিন সেই স্বাস্থ্য ভাঙ্গিয়া যাইতেছে, তবে তাহার শাস্ত্র জ্ঞানে সন্তোষের কারণ কি থাকে ? স্বাস্থ্য-রক্ষার উপায় জানিয়া তাহার লাভ কি যখন তাহাকেই রোগ-শয্যাতে পড়িয়া ছট্ফট্ করিতে হইতেছে। সেইরূপে ধর্ম্মের শাস্ত্র জানিয়া ফল কি, যদি সেই জ্ঞান পাপ হইতে বাঁচাইতে না পারে। আমাদিগকে কি অনেক সময়ে এই বলিয়া অশ্রুপাত করিতে হয় না, যে পরকে পথ দেখাইবার জন্য বাতি ধরিলাম, কিন্তু নিজের গৃহের অন্ধকার গেল না। অপরকে স্বাস্থ্যলাভের উপায় বলিয়া দিলাম কিন্তু নিজের স্বাস্থ্যলাভ হইল না ? একজন সুপ্রসিদ্ধ ফরাসি দর্শনকার বলিয়াছেন—যে প্রকৃত জ্ঞান লাভ করিতে হইলে, যাহা কিছু শুনিয়াছ কি শিখিয়াছ তাহা মন

হইতে বিদায় করিয়া, চিত্তকে জ্ঞানহীন ও একমাত্র সন্দেহের নিলয় করা আবশ্যক। সাধকের পক্ষেও বোধ হয় এই কথা বলিতে পারা যায় যে প্রকৃত ভাবে সাধন করিতে হইলে, যাহা কিছু শুনিয়াছ কি শিখিয়াছ তাহা ভুলিয়া যাও, তুমি যে টুকু চরিত্রে উপার্জ্জন করিবে সেইটুকু তোমার, সেই টুকুকেই তুমি নিজের সাধন সম্পত্তি বলিয়া গণ্য করিতে পার; তদ্ভিন্ন আর যাহা কিছু মনে সঞ্চিত হইয়াছে, তাহা তোমার নহে। এই সাধনসম্পত্তি যাঁহারা প্রাপ্ত হন, তাঁহারাই বাস্তবিক ধর্ম্মজগতে শ্রেষ্ঠ।

প্রচার—একজন ডাক্তার ম্যালেরিয়া-নাশক বটিকা" বলিয়া এক প্রকার বটিকা প্রস্তুত করিলেন, এবং তাহার গুণাবলী বর্ণনা করিয়া নানা সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দিলেন। ছোট অক্ষরে, বড় অক্ষরে নানাভাবে নানা ভঙ্গীতে তাঁহার বিজ্ঞাপন সংবাদপত্রের প্রথম স্তম্ভেই দৃষ্ট হইত; এবং কিরূপে তাঁহার ঔষধ সেবনে একজন রুগ্ন জীর্ণ কঙ্কাল-সার ব্যক্তি সুস্থ ও সবলকায় হইয়াছে, কিরূপে তাহার মুখে স্বাস্থ্য ও প্রসন্নতার আভা ফিরিয়া আসিয়াছে, তাহার একটী ছবিও ছিল। ম্যালেরিয়াগ্রস্ত ও জ্বরপীড়িত ব্যক্তিগণ প্রথম প্রথম দলে দলে তাঁহার ঔষধ ক্রয় করিতে আরম্ভ করিল। দেখিতে দেখিতে তাঁহার অনেক ধনাগম হইতে লাগিল। কিন্তু কিছুদিন পরে উক্ত ডাক্তার বদলী হইয়া একটী ম্যালেরিয়া পীড়িত জেলাতে গমন করিলেন। সেখানে গিয়া তাঁহার পরিবার পরিজনগণ সকলে ম্যালেরিয়াতে পীড়িত হইয়া পড়িলেন; অকালে দুই একটী সন্তান কালগ্রাসে পতিত হইল; তিনিও ম্যালেরিয়াগ্রস্ত হইয়া বার বার পীড়িত হইয়া ছুটী লইতে বাধ্য হইলেন। এই সংবাদ যখন সংবাদপত্রে প্রকাশ হইয়া পড়িল, তখন তাঁহার ম্যালেরিয়া-নাশক বটিকা লোকের নিকট একটা উপহাসের বস্তু হইয়া দাঁড়াইল। অসার শূন্যগর্ভ বিজ্ঞাপনের কথা উঠিলেই লোকে বলে—যথা "অমুকের ম্যালেরিয়ানাশক বটিকা।" সেব্যক্তি যদি বিজ্ঞাপনের আড়ম্বরটা এত অধিক না করিত তাহা হইলে হয়ত লোকের বিদ্বেষ বৃদ্ধি এত অধিক হইত না। দ্বিতীয় ছবি ঠিক ইহার বিপরীত। একজন চিকিৎসক একবার একটী গাছ আবিষ্কার করিলেন যাহা রক্তআমাশয়ের পক্ষে মহৌষধ মনে হইল। কিন্তু উক্ত পীড়া বিশেষের পক্ষে যথার্থ উপকারী কি না জানিবার জন্য প্রথমে গোপনে তাহার আরক ও বটিকা প্রস্তুত করিলেন ও বহুসংখ্যক রোগীকে পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। তাঁহার সত্যপ্রিয় প্রকৃতিতে কিছুমাত্র হাঁক ডাক ছিল না। লোকে জিজ্ঞাসা করিলে বলিতেন "আপনাদিগকে দেখাইবার মত এখনও কিছু হয় নাই; মনে একটা খেয়াল আসিয়াছে মাত্র পরীক্ষা করিয়া দেখিতেছি, যদি ফল কিছু দাঁড়ায় জানিতেই পারিবেন।" ক্রমে যখন তিনি ঔষধের উপকারিতা বিষয়ে নিঃসন্দেহ হইলেন, তখন ধীরে ধীরে তদনুসারে চিকিৎসা আরম্ভ করিলেন। সংবাদপত্রে যে বিজ্ঞাপন দিতে হইবে তাহা মনে আসিল না। কিন্তু কি জানি কেমন করিয়া সে সংবাদ দিন দিন চারিদিকে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। প্রতিদিন দশ পনর ক্রোশ দূর হইতে লোকে ঔষধ ক্রয় করিবার জন্য আসিতে লাগিল। তাহাতে তিনি ধনী হইয়া গেলেন। পূর্ব্বোল্লিখিত উভয় ছবির মধ্যে প্রভেদ কি তাহা চিন্তা করিলেই প্রচারের প্রকৃত প্রণালী কি তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারা যায়। যাহা পাইলে লোকে বাস্তবিক পাপ তাপ হইতে রক্ষা পায়, এরূপ কোনও বস্তু যদি তোমার নিকট থাকে, তাহা আপনাপনি প্রচারিত হইবে, আর যদি তাহা না থাকে তুমি যতই প্রচারের আড়ম্বর করিবে ততই লোকের বিতৃষ্ণা জন্মিবে। এই অসার আড়ম্বর-প্রিয়তা হইতে ঈশ্বর আমাদিগকে রক্ষা করুন।

ব্রাহ্মদিগের দরিদ্রতা—ব্রাহ্মদিগের দরিদ্রতা বিষয়ে অগ্রে কিঞ্চিৎ বলা হইয়াছে। ইহা ব্রাহ্মমাত্রেরই একটী গভীর চিন্তার বিষয়। মানুষ সামান্য অবস্থাতে থাকে, বা গুরুতর দৈহিক পরিশ্রম দ্বারা জীবন ধারণ করে, ইহা কিছুই দুঃখের বিষয় নহে, তাহাতে ধর্ম্মজীবনের হানি না হইয়া বরং সাহায্য হইবার কথা। কিন্তু মানুষ নিজ সাধ্যের অতীত অবস্থাতে থাকে, এবং দিন দিন ঋণজালে জড়িত হয়, ইহা কোনরূপেই প্রার্থনীয় নহে। ব্রাহ্মসমাজ মধ্যে এই শ্রেণীর লোক সংখ্যা বর্দ্ধিত হইলে ক্রমে ব্রাহ্মসমাজ নিম্নশ্রেণীর খৃষ্টীয় ও ফিরিঙ্গী সমাজের ন্যায় অশেষ নীচতা ও দুর্গতির আকর হইবে। যথাসময়ে ব্রাহ্মগণের চিন্তিত হওয়া আবশ্যক হইয়াছে। সমগ্রদেশের দারিদ্র্য বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মদিগের দারিদ্র্য দিন দিন বৃদ্ধি হইতেছে। ইহার কতকগুলি কারণ আছে। হিন্দুসমাজ মধ্যে একান্নভুক্ত পরিবার প্রথা প্রচলিত থাকাতে, একজন ভ্রাতা যদি কম উপার্জ্জন করে তবে অপর ভ্রাতাদিগের উপার্জ্জন দ্বারা তাহার ও তাহার স্ত্রী পুত্রের অভাব সকল পূরণ হইয়া যায়। কিন্তু ব্রাহ্মগণের অধিকাংশকেই একান্নভুক্ত পরিবার হইতে বিচ্যুত হইয়া স্বীয় পদের উপর দাঁড়াইতে হইয়াছে। যেখানেই যাউন, সঙ্গে সঙ্গে একটী ক্ষুদ্র বা বৃহৎ পরিবার গলদেশে বাঁধা আছে। সংসার সাগরের তরঙ্গে যে সন্তরণ করিবেন, ঐ বোঝাটী পৃষ্ঠের উপরে চাপান আছে; দুইদিন যে রোগশয্যায় পড়িয়া থাকিবেন ঐগুলির ভরণ পোষণের চিন্তা করিতে হইবে। একটু অব্যাহতি নাই, একটু নিঃশ্বাস ফেলিবার অবসর নাই। এদিকে পুত্র কন্যার সংখ্যা দিন দিন বাড়িতেছে; আয় তদনুরূপ বাড়িতেছে না। ইহার উপরে আবার অধিকাংশ ব্রাহ্ম বড় বড় সহরে বাস করিতে বাধ্য হইতেছেন। পল্লীগ্রামে থাকিলে নানাপ্রকার নির্য্যাতন সহ্য করিতে হয়; মনোমত সঙ্গ পাওয়া যায় না; পুত্র কন্যার শিক্ষাদির সুব্যবস্থা হয় না; সুতরাং সহরে বাস তাঁহাদের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয় হইয়া উঠিতেছে। সহরে থাকিতে গেলেই নানাপ্রকারে ব্যয়। ভদ্রলোকের সহিত দেখা করিতে হইলে, ভাল কাপড়খানি, ভাল জুতা যোড়াটী, ভাল কোটটী চাই, এক যোড়া মোজা চাই, ছড়ি গাছটী চাই; মহিলাদিগেরও ভাল ধুতি, ভাল জ্যাকেট ভাল জুতা প্রভৃতি চাই। এ সকল ব্যয় আপনা আপনি আসিয়া পড়ে। অনেক সময়ে ইচ্ছা করিলেও বাধা দিয়া রাখা যায় না। এইরূপে ব্রাহ্মগণ দারিদ্র্য ও ঋণভারে প্রপীড়িত হইতেছেন। ইহার

কোনও উপায় করিতে না পারিলে, ব্রাহ্মসমাজ মধ্যে ভয়ানক দুর্নীতি প্রবেশ করিবে। এই দারিদ্র্য নিবারণের উপায় কি তাহা সকলেরই ধীরচিত্তে বিচার করা আবশ্যক। একটা উপায় ত হাতের নিকটেই দেখা যায়। ব্রাহ্মদিগের সহরে বাস ঘুচাইতে পারিলে ভাল হয়। ব্রাহ্মদিগের জন্ম যদি মফস্বলের কোনও স্বাস্থ্যকর স্থানে একখণ্ড ভূমি পাওয়া যায়, এবং সেখানে ব্রাহ্ম-পরিবারদিগের থাকিবার বন্দোবস্ত করা হয়, তাহা হইলে সহর-বাসের অনিষ্ট ফল হইতে কিয়ৎ পরিমাণে রক্ষা করা যাইতে পারে; অথচ অনেকগুলি পরিবার একত্র থাকিলে সঙ্গলাভ ও পুত্র কন্যার শিক্ষা বিষয়ে কোনও অসুবিধা ঘটে না। আমরা দেখিয়া চিন্তিত হইতেছি যে, সহর হইতে মফস্বলে যাইবার প্রবৃত্তি বর্দ্ধিত না হইয়া অনেক দরিদ্র ব্রাহ্মের সহরে আসিবার প্রবৃত্তিই অধিক দৃষ্ট হইতেছে। আহার করিবার কোনও সংস্থান থাকুক বা না থাকুক সকলেই সহরের দিকে ছুটিতেছেন। আশা করি, এই গুরুতর বিষয়টী এবারকার বার্ষিক কনফারেন্সের বিশেষ আলোচনার বিষয় হইবে।

আদর্শ ও জীবন—একজন ব্রাহ্ম গৃহস্থের গৃহে একটী দরিদ্র বিধবা নারী স্বীয় পুত্রটীকে লইয়া ভিক্ষা করিতে আসিত। গৃহস্থ যখনি তাহাকে দেখিতেন তখনি তাঁহার দয়ার উদয় হইত, তিনি হায় হায় করিতেন, এবং মধ্যে মধ্যে কিছু কিছু অর্থসাহায্যও করিতেন। তাঁহার নিজের অবস্থা হীন হওয়াতে আর অধিক সাহায্য করিতে পারিতেন না। কিন্তু তিনি যে সাহায্য করিতেন, তাহা শুষ্ক মরুভূমিতে জলবিন্দুর ন্যায় ক্ষণেকের মধ্যে বিলীন হইয়া যাইত। এইরূপে কিছুদিন যায়, যখন একদিন একজন অন্তঃপুর শিক্ষয়িত্রী ইউরোপীয় মহিলা তাঁহার ভবনে আসিয়াছেন, সেই সময়ে উক্ত বিধবা নারীও উপস্থিত। তাহার দুর্দ্দশার কথা শুনিয়া ঐ ইউরোপীয় মহিলার অন্তরে দয়ার সঞ্চার হইল। তিনি অধিক হায় হায় করিলেন না; দয়ার বাহ্য প্রকাশ কিছুই দেখাইলেন না; কিন্তু তাহাকে পরদিন সেই সময়ে আসিতে বলিয়া চলিয়া গেলেন। পরদিন যথাসময়ে তিনি উপস্থিত হইলেন এবং বিধবাটীকে লইয়া গাড়িতে তুলিয়া ডিষ্ট্রিক্ট্ চ্যারিটেবল সোসাইটীর সম্পাদক পরলোকগত রাজা দিগম্বর মিত্র মহাশয়ের বাটীতে লইয়া গেলেন। দিগম্বর বাবু বলিলেন, "হাতে টাকা আছে কি না আফীসে না জানিয়া বলিতে পারিতেছি না।" ইউরোপীয় মহিলা বলিলেন—"আমার হাতে আফীসের উপরে চিঠী দিন আমি এক্ষণই জানিয়া আসিতেছি। রাজার নিকট চিঠী লইয়া সেই গাড়িতেই চ্যারিটেবল সোসাইটীর আফীসে বড় বাবুর নিকট গিয়া জানিয়া আসিলেন যে টাকা আছে, তাহাকে মাসে মাসে কিছু কিছু দেওয়া যাইতে পারে। তদনুসারে ঐ বিধবা নারীর জন্ম মাসিক ৪৲ টাকা করিয়া দিবার ব্যবস্থা হইল। মাসের পর মাস হায় হায় চলিয়াছিল তথাপি তাহার যে দুঃখ নিরাকরণ হয় নাই, তাহা একজন প্রকৃত কর্ম্মশীলা ও সদয়-হৃদয়া মহিলার দ্বারা দুই দিনে হইয়া গেল। এতদ্দ্বারা এইমাত্র বক্তব্য যে হৃদয়ের উৎকৃষ্ট ভাব সকলকে কার্য্যে পরিণত না করিতে পারিলে, তাহার মূল্য অতি অল্পই থাকে। পূর্ব্বোক্ত গৃহস্থ যে ঐ বিধবা নারীর দুঃখে দয়ার্দ্র হইয়াছিলেন তাহাতে সন্দেহ কি? কিন্তু সে দয়াকে কার্য্যে পরিণত করিবার বুদ্ধি না ঘটাতে তাহার কোনও মূল্য ছিল না। হৃদয়ের উচ্চভাব সম্বন্ধে যেরূপ, জীবনের উচ্চ আদর্শ সম্বন্ধেও সেইরূপ। জীবনের উন্নত আদর্শ চক্ষের নিকটে আনিয়া ফল কি যদি তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে না পারা যায়। যাহারা অসাধ্য আদর্শের কল্পনা করে, ও তাহা চিত্তে পোষণ করিয়া সুখী হয়, তাহারা এ পৃথিবীতে ভাবুক ও অকর্ম্মণ্য লোক বলিয়া গণ্য হয়। এরূপ অকর্ম্মণ্যতা ও ভাবুকতা নিশ্চিন্ত উপন্যাস পাঠিকাদিগের পক্ষেই শোভা পায়। জনসমাজের সুখ দুঃখ, উন্নতি অবনতি বিষয়ে যাহাদের দৃষ্টি এবং জনসমাজের উন্নতি সাধনের সংকল্প। তাঁহাদের পক্ষে ইহা সাজে না। তাঁহারা সর্ব্বদা চিন্তা করেন হৃদয়স্থিত আদর্শ কিরূপে কার্য্যে পরিণত করা যায়; এবং তাহা জীবনে সাধন করিতে না পারিলে, তাঁহাদের মনে শান্তি ও আরাম থাকে না। আমাদের এত কথা বলিবার অভিপ্রায় এই, যে ব্রাহ্মধর্ম্ম আমাদের সমক্ষে একটা সামাজিক আদর্শ আনিয়া দিয়াছেন। প্রাচীন সমাজের যেরূপ বিধি ব্যবস্থা ছিল, তাহা আর আমাদের মনঃপূত হইতেছে না। আমরা উৎকৃষ্টতর অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করিতেছি। কিন্তু লক্ষ্য করিলে কি হইবে, যদি তাহা একান্ত হৃদয়ে সাধন করিবার চেষ্টা না করা যায়? আমাদিগকে ধীরচিত্তে বিবেচনা করিতে হইবে যে সামাজিক ভাবে আমাদিগকে কি কি গুণাবলী অর্জ্জন করিতে হইবে, তৎপরে এরূপ সকল উপায় অবলম্বন করিতে হইবে, যাহাতে ঐ সকল গুণাবলী সমাজ মধ্যে বিকশিত হইতে পারে।

ভাবী ব্রাহ্মসমাজ—ভাবী ব্রাহ্মসমাজ কিরূপ হইবে, এ চিন্তা ব্রাহ্ম মাত্রেরই করা কর্ত্তব্য এবং এ বিষয়ে ব্রাহ্ম মাত্রেরই ভাবিবার ও করিবার কিছু আছে। বর্ত্তমান ব্রাহ্মধর্ম্মের একটী প্রধান লক্ষণ এই যে ইহা সামাজিক ভাবে সাধন হইতেছে—সমাজের উন্নতি অবনতির সহিত ইহার ঘনিষ্ঠ যোগ রহিয়াছে। আমাদের সামাজিক জীবন বিকৃত, দূষিত ও দুর্নীতিপূর্ণ হইলে, আমরা সেরূপ সমাজে এ ধর্ম্মকে সাধন করিতে পারিব না। এই কারণে ব্যক্তিগত সাধনের ন্যায় সামাজিক জীবনের উন্নতির দিকেও ব্রাহ্মদিগকে মনোযোগী হইতে হইবে। আমাদের মধ্যে এরূপ একটী দল থাকা আবশ্যক—যাঁহারা আমাদের সামাজিক জীবনের উন্নতি সাধনে সবিশেষ মনোযোগী থাকিবেন, ও তদর্থ বিবিধ প্রকার উপায় অবলম্বন করিবেন; ভাবী ব্রাহ্মসমাজ ইঁহাদিগের দ্বারাই গঠিত হইবে। ভাবী ব্রাহ্মসমাজ বলিলেই সকলের দৃষ্টি স্বভাবতঃ ব্রাহ্মবালক বালিকাদিগের উপরে পতিত হইবে। ইহাদিগের শিক্ষা ও চরিত্র গঠনের উপর ভাবী ব্রাহ্মসমাজের সুখ দুঃখ বহুল পরিমাণে নির্ভর করিতেছে। আমরা যতই চিন্তা করিতেছি ততই বোধ হইতেছে যে সম্ভব হইলে সমুদায় ব্রাহ্ম বালক বালিকাকে বোর্ডিংএ রাখিয়া শিক্ষা দিতে পারিলেই ভাল হয়। এক দিকে

দেখিতে গেলে পিতা মাতার সঙ্গের ন্যায় সঙ্গ কোথায় আছে, এবং গৃহই বালক বালিকার পক্ষে ঈশ্বর নির্দ্দিষ্ট শিক্ষার স্থান। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ বালক বালিকা যে গৃহে থাকিয়া সর্ব্ববিধ সুশিক্ষা লাভ করিতে পারে, এরূপ গৃহই এখন ব্রাহ্মদিগের মধ্যে অধিক নাই। বিশেষ যে সকল সামাজিক সদ্গুণ উপার্জ্জনের উপরে ভাবী ব্রাহ্মসমাজের উন্নতি ও কল্যাণ নির্ভর করিতেছে, সেই সকল সদ্গুণ উপার্জ্জনের অনুকূল ব্যবস্থা অতি অল্প পরিবারেই আছে। একটী বোর্ডিং এর ন্যায় স্থানে যে শৃঙ্খলা যে নিয়ম, যে সময়ের সদ্ব্যবহার, যে ধর্ম্মোপদেশের ব্যবস্থা করা সম্ভব; গৃহস্থের গৃহে ততদূর সম্ভব বোধ হয় না। এই সকল শাসন ও শিক্ষার মধ্যে থাকিয়া বর্দ্ধিত হইলে বালক বালিকার মনে সেই সকল বদ্ধমূল হইয়া যায়; এবং উত্তরকালে সেই সমুদায় ভাবী সামাজিক উন্নতির নিদানভূত হইতে পারে। এই জন্য বোর্ডিং গুলিকে সমাজের হস্তে পরমোপকারক যন্ত্র-স্বরূপ বিবেচনা করিতে হইবে। সেখানে ভাবী ব্রাহ্মসমাজের সূত্রপাত হইয়াছে।

বর্ত্তমান সময়ের একজন সুপ্রসিদ্ধ ইংরাজ বলিয়াছেন যে শৃঙ্খলা, ও সময়ের সুব্যবস্থা ইংরাজের গার্হস্থ্য ও সামাজিক জীবনের একটী প্রধান লক্ষণ। বাস্তবিক ইংলণ্ডে গমন করিলে সর্ব্বাগ্রেই এইটী চক্ষে পড়ে। আমরা দূর হইতে বিস্মিত হইয়া প্রশ্ন করি, গ্লাডষ্টোনের ন্যায় ৮৪ বৎসরের বৃদ্ধ এত কাজ করেন কিরূপে? কিন্তু ইহার তলে যে এই শৃঙ্খলা (Method) আছে তাহা চিন্তা করি না। ইংরাজের গার্হস্থ্য ও সামাজিক জীবনে (Method) না থাকিলে তাহাদিগের দ্বারা এত কাজ কোনও প্রকারে হইতে পারিত না। আমাদের বোধ হয় মধ্যবিত্ত ইংরাজ পরিবার সকলের বালক বালিকাগণ যে বোর্ডিংএ শিক্ষিত ও বর্দ্ধিত হয়, এই শৃঙ্খলার মূল সেখানে। সেখানে শৃঙ্খলাধীন থাকিয়া কাজ করিয়া তাহারা অভ্যস্ত হয়, পরে যখন গৃহধর্ম্মে প্রবেশ করে, তখন সেই অভ্যাস থাকিয়া যায়। এইরূপে শৃঙ্খলা ও সময়ের সুব্যবস্থা এক্ষণে ইংরাজের সামাজিক জীবনে প্রবিষ্ট হইয়া গিয়াছে। ব্রাহ্মদিগকেও সেইরূপ বালক বালিকাদিগকে বোর্ডিংএ রাখিয়া সেই সকল সদ্গুণে বর্দ্ধিত করিতেহইবে, যদ্দ্বারা উত্তরকালে ভাবী ব্রাহ্ম-সমাজের উন্নতি পক্ষে সহায়তা হইতে পারে।

স্বোপার্জ্জিত ধন—প্রতিদিন লোকে বাজার হইতে অর্থ দিয়া কত সুন্দর সুন্দর ফুল ফল ক্রয় করিয়া আনিয়া থাকে। আবার লোকে স্বীয় বাগানের স্বহস্ত-রোপিত গাছ হইতে—যে গাছে সে নিজে যত্নের সহিত সার প্রদান করিয়াছে এবং জলসিঞ্চন করিয়া বহু দিনের যত্ন ও সেবার পর যে গাছ ফুল ও ফল দানে সক্ষম হইয়াছে, সেই গাছ হইতে ফুল ফল সংগ্রহ করিয়া থাকে। এই যে দুই প্রকারের ফুল ফল ইহাদের বস্তুগত যে বিশেষ কোন পার্থক্য আছে এমন নয়। বরং বাজার হইতে আনীত ফুল ফল অধিকতর মনোরম অধিকতর সৌন্দর্য্যে ভূষিতও হইতে পারে। কিন্তু সেই ব্যক্তির নিকট এই দুই প্রকার ফুল ফলের মূল্য কি সমান? তিনি কি এই উভয়কে এক চক্ষে দর্শন করেন? কখনই নয়। নিজ যত্নার্জ্জিত ফল ফুলের সহিত ক্রীত ফল ফুলের তুলনাই হইতে পারে না। যাঁহারা কখনও এই প্রকারে নিজ বাগানের স্বহস্তে রোপিত এবং যত্নসেবিত গাছ হইতে ফুল ফল লাভ করিয়াছেন; তাঁহারাই তাহার মূল্য বুঝিতে পারেন। তাঁহারাই এই দুই প্রকার ফুল ফলের বস্তুগত সাম্য বর্ত্তমান থাকা সত্ত্বেও উভয়ের প্রভেদ অনুভব করিতে সমর্থ হইবেন। একদিন কোন গৃহস্থের বাটী হইতে একটী বেগুণ অপহৃত হয়। সেই বেগুণ অপহৃত হওয়ায়, তাঁহার এত কষ্ট হইয়াছিল, যে তিনি আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছিলেন, আমার যদি অন্য কোন বেশী মূল্যবান জিনিস যাইত, তথাপি আমার এরূপ কষ্ট হইত না। ইহা দ্বারা বুঝা যায় স্বোপার্জ্জিত বস্তু আর পরের অর্জ্জিত বস্তুতে কত প্রভেদ। ফুল ফলেই যে এরূপ প্রভেদ তাহাও নয়। ধন রত্নাদি সকল বস্তুতেই এইরূপ প্রভেদ দৃষ্ট হইয়া থাকে। পিতৃ পুরুষের উপার্জ্জিত ধনের একরূপ মূল্য। আর নিজ-উপার্জ্জিত ধনের অন্যরূপ মূল্য। ইহার দৃষ্টান্ত সর্ব্বত্রই দেখা যায়। লোকে পৈত্রিক ধন যত সহজে নষ্ট করিতে পারে, স্বোপার্জ্জিত ধন তত সহজে নষ্ট করিতে পারে না। বাহিরের ধন রত্ন বা অপরাপর বস্তুর সহিত যেমন স্বোপার্জ্জিত বস্তুর বিশেষ তারতম্য লক্ষিত হয়, ধর্ম্মধন সম্বন্ধে কি তাহা উক্ত হইতে পারেনা? বরং এখানে এ কথা আরও বেশী খাটে। কারণ ধর্ম্ম স্বোপার্জ্জিত ভিন্ন হয় না বলিলেই হয়। যাহারা হঠাৎ বড় মানুষ হইবার আশায় অন্যের হস্ত অবলম্বন করিয়া, অন্যের শক্তিতে শক্তিমান হইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা যদিও মনে করিতে পারেন যে খুব সহজেই ধর্ম্মের তত্ত্ব সব আয়ত্ত করিয়া ফেলিলাম। কিন্তু সে সংস্কার বেশী দিন কাযের বেলায় সাহায্য করে না। যদিও করে, তাহারও মূল্য স্বোপার্জ্জিত তত্ত্বের নিকট অতি সামান্য। বৎসরের পর বৎসর মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া, একান্ত অনু-রাগ ও যত্নে একটী তত্ত্ব উপার্জ্জন করিলে, তাহা যেরূপ প্রাণের জিনিস হইবে, অন্য হইতে লব্ধ, অনায়াস বা অযত্নলব্ধ তত্ত্ব কখনই সেরূপ প্রাণের আদরের বস্তু হইতে পারে না এবং তাহা ধরিয়া থাকিবার প্রবৃত্তিও তেমন প্রবল হইতে পারে না। এজন্য যাঁহারা গুরুর শরণাগত হইয়া, রাতারাতি বড় মানুষ হইতে চাহেন, তাঁহাদের জীবন কখনই তেমন গভীর, তেমন দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয় না। তাহারা চিরদিনই পর মুখাপেক্ষী, পরানুসরণকারী হইয়া ভাসা ভাসা ভাবে চলিয়া থাকেন। তাঁহাদের জীবন নিরাপদ অবস্থায় যাইয়া সুশান্ত হইবার সুবিধা প্রাপ্ত হয় না। গুরুর অভাব হইলেই চতুর্দ্দিক অন্ধকার দেখেন। এজন্যও সকলেরই কর্ত্তব্য বিশেষ যত্ন ও আয়াসের সহিত ধর্ম্মকে নিজ সম্পত্তি করিতে প্রয়াসী হওয়া। সহিষ্ণুতা ও ধীরতার সহিত সত্যের গূঢ়তত্ত্ব অবগত হইতে যত্নশীল হওয়া। অন্যথা নিরাপদ অবস্থা পাইবার সম্ভাবনা অত্যন্ত কম।

সম্পাদকীয় ও প্রাপ্ত প্রবন্ধ।

শক্তি-সমবায়।

মানব সমাজে সৎ ও অসৎ উভয় শক্তিই একত্র বাস করিতেছে, উভয়েই স্বীয় ইষ্ট সিদ্ধির দিকে ধাবিত হইতেছে। মঙ্গলময় বিধাতা কেন তাঁহার সৃষ্টি কার্য্যের মধ্যে অসৎ ও অমঙ্গলকে স্থান দান করিলেন, এই প্রশ্নও অতি দুরূহ ও গভীর। ইহার সমালোচনাতে প্রবৃত্ত হওয়া এই প্রবন্ধের লক্ষ্য নহে। সৃষ্টি কার্য্যে মঙ্গলের সহিত অমঙ্গলের বিদ্যমানতা দেখিয়াই বর্ত্তমান যুগের চিন্তাশীল নাস্তিকগণ বলিয়াছেন, "হয় বল, ঈশ্বর সর্ব্বশক্তিমান নহেন, না হয় বল তিনি পূর্ণ মঙ্গল নহেন। তিনি যদি পূর্ণ মঙ্গল ও পূর্ণ শক্তিশালী হইতেন তাহা হইলে কি তাঁহার সৃষ্ট কার্য্যের মধ্যে অমঙ্গল বিদ্যমান থাকিত? সে যাহা হউক সৃষ্ট কার্য্যে আমরা মঙ্গলের সহিত অমঙ্গলকে বিদ্যমান দেখিতেছি। কেবল তাহা নহে, ইহাও অনুভব করিতে পারিতেছি যে,অসতের সহিত সংগ্রামে অসৎকে পরাস্ত করিয়া সৎ প্রতিষ্ঠিত হইবে, এবং অমঙ্গলকে নিবারণ করিয়া মঙ্গল আপনাকে জয়যুক্ত করিবে, ইহাই যেন বিধাতার বিধি। পার্শ্বে অসৎ না থাকিলে সৎ কাহার সহিত সংগ্রাম করিত ও কিরূপে প্রস্ফুটিত হইত? অতএব অসতের উৎপত্তি সম্বন্ধে আমাদের যে প্রকার সিদ্ধান্তই হউক না কেন, অসতের সহিত সংগ্রাম আমরা পরিহার করিতে পারিতেছি না। সৎ ও অসৎ দুই আমাদের চিন্তাকে আন্দোলিত করিতেছে, ভাবকে উত্তেজিত করিতেছে, জীবনকে আঘাত করিতেছে।

সৌভাগ্যক্রমে বিধাতা অসৎকে মানব জীবনের পার্শ্বে থাকিতে দিয়াও তাহার জয়ী হইবার উপায় রাখেন নাই। যাহা অসত্য, যাহা অসৎ তাহা বিনাশ প্রাপ্ত হইবেই হইবে; মূলবিহীন বৃক্ষের ন্যায়, প্রাণবিহীন দেহের ন্যায় শুষ্ক ও বিনষ্ট হইবেই হইবে। ঋষিগণ বলিয়াছেন:—"সমূলো বা এষঃ পরিশুষ্যতি যোনৃত অভিবদতি।" যে অমৃতকে আশ্রয় করে সে সমূলে পরিশুষ্ক হয়। যুগে যুগে প্রত্যেক বিশ্বাসী এই কথা বলিয়াছেন এবং জগতের ইতিবৃত্তেও এই কথা প্রমাণিত রহিয়াছে। যাহা সত্য, যাহা প্রকৃত বস্তু তাহার অপলাপ অসম্ভব। গালিলিয় বলিলেন, "পৃথিবী ঘুরিতেছে," অজ্ঞ লোকে তাঁহাকে কারাগারে নিক্ষেপ করিল; ঘরে ঘরে অজ্ঞ ব্যক্তিগণ এই মতের প্রতিবাদ করিতে লাগিল; মানব সমাজে অনেক অশান্তি, অনেক বিরোধ, অনেক বিপ্লব ঘটিল; কিন্তু তাহা বলিয়া পৃথিবী থামিল না। যে ঘুরিতেছিল সেই ঘুরিতেই লাগিল। অবশেষে লোকের জ্ঞানকে সংশোধন করিয়া লইতে হইল। এইরূপ আজি হউক, কালি হউক, দুই শতাব্দীর পরেই হউক সত্যের দ্বারা জ্ঞানকে সংশোধন করিয়া লইতেই হইবে।

জগদীশ্বর যেরূপ অসত্যকে জয়শালী করেন নাই, সেইরূপ অসত্য ও অসৎকে সম্মিলিত ভাবে কার্য্য করিবার শক্তি, দেন নাই। জনসমাজের অল্প সংখ্যক অসদাচারী লোক বহু সংখ্যক শান্তি-প্রিয় ও সদাচারী লোককে সময়ে সময়ে যেরূপ উপদ্রুত করে, তাহা দেখিলে মনে হয়, যদি অসদাচারিগণ স্বীয় অভিসন্ধি চরিতার্থ করিবার জন্য সমবেত হইতে পারিত, তাহা হইলে জনসমাজের কার্য্য চালান এক প্রকার অসম্ভব হইয়া পড়িত। আজ যদি জগতের সমুদয় উৎচ্ছৃঙ্খল ও নরদ্রোহী ব্যক্তিগণ শপথ পূর্ব্বক জনসমাজ উৎসন্ন দিবার জন্য দলবদ্ধ হয় এবং ডাইনামাইট অস্ত্র ধারণ করে, তাহার জন্যই সমগ্র জগৎ টলমল করিয়া উঠে। কিন্তু এই নরদ্রোহিগণ যে আপনাপন শক্তিকে সমবেত করিবে, তাহার পথে অন্তরায় অনেক রহিয়াছে। সমবেত ভাবে কার্য্য করিবার জন্য অধার্ম্মিককেও ধর্ম্মনিয়মের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয় এবং উদ্দাম স্বার্থপ্রবৃত্তিকে কিয়ৎপরিমাণে শৃঙ্খলিত করিতে হয়। স্বার্থান্ধ ও পাপাসক্ত নরদ্রোহিগণ তাহা পারে না বলিয়াই তাহাদের দ্বারা যতটা অনিষ্ট সংঘটিত হইতে পারিত, তাহা হইতে পারিতেছে না। কিন্তু অসতের পক্ষে সমবেত হওয়া যেরূপ দুষ্কর সত্যের পক্ষে সেরূপ নহে। প্রকৃতিই এই, তাহাতে প্রেম, কোমলতা ও আত্মবিনাশ আছে, সুতরাং তাহা সমবেত হইবার অনুকূল। এক্ষণে যে জনসমাজে অসতের প্রাধান্য দৃষ্ট হয়, তাহার কারণ এ নহে যে, তন্মধ্যে সৎ বিদ্যমান নহে, কিন্তু তাহার কারণ এই যে সৎ যাঁহারা তাঁহারা পরস্পর বিচ্ছিন্ন ও উদাসীন ভাবে রহিয়াছেন। যে সকল জাতি সমবেত শক্তির ইষ্টফল একবার লক্ষ্য করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে সমবেতভাবে কার্য্য করিবার প্রবৃত্তি দিন দিন বর্দ্ধিত দেখা যাইতেছে। সমাজ মধ্যে কোনও প্রকার দুর্নীতি বা কুরীতির প্রচলন দেখিলে তাঁহারা নিরাশ হইয়া হাল ছাড়িয়া দিতেছেন না। কিন্তু তাহার নিবারণ ও প্রতিবিধানের জন্য দশ জনে পরিকর বদ্ধ হইতেছে। পদ্মানদীতে কোনও নৌকা স্রোতের মুখে উঠিতে পারিতেছে না দেখিলে, অমনি চারিদিকে ক্ষেত্রে যে সকল কৃষক কাজ করিতেছিল, তাহারা ছুটিয়া আসে ও দশজনে ধরিয়া নৌকাখানি পার করিয়া দেয়। তাহাদের বুদ্ধিতেই বলে এরূপ কাজ দশজনে হাত না দিলে হয় না। সেইরূপই সভ্যদেশ সকলের অধিবাসীদিগেরই এই স্বাভাবিক বুদ্ধি জন্মিতেছে যে, সামাজিক অনিষ্ট নিবারণ ও সামাজিক উন্নতি-সাধন দশজনে সমবেতভাবে বদ্ধপরিকর না হইলে হয় না। এই সংস্কার তাঁহাদের অন্তরে দিন দিন বদ্ধমূল হইতেছে। আমাদের ভাব ইহার বিপরীত বলিয়া আমরা স্ব স্ব স্বীয় শক্তিকে সমবেত করিতে পারিতেছি না। আমাদের ভাব যেন এই প্রকার—"যাহার নৌকা সেই টানিয়া তুলুক আমি, মাথা ঘামাইতে যাইব কেন? আবার অনেক ভাল ভাল লোকের এ প্রকার ভাব দেখা গিয়াছে—"সৎ ও অসৎ দুই সমাজ মধ্যে থাকিবে, সকল সমাজেই আছে; অসৎকে দেখিয়া ভয় পাইলে চলিবে না; সতের উপদেশ দেও, সতের আচরণ কর, অসৎ আপনি নিবারিত হইবে।" ইহাও এক প্রকার স্ব-সুখ-পরতা ও উদাসীনতা। সৎ ও অসৎ সকল সমাজেই থাকে ইহা সত্য, সকল জীবনেই থাকে ইহাও সত্য। কিন্তু সৎ

অধীন থাকে ও সাহসে থাকে এবং অসৎ সংকুচিত থাকে ও শাসনে থাকে, ইহাই সমাজের প্রকৃত সুস্থ অবস্থা। তাহা না হইয়া যদি দেখি যে, সৎ সংকুচিত, হীন-সাহস ও পরস্পর-বিচ্ছিন্ন হইয়া আছে, এবং অসৎ অবাধে ও মনের আনন্দে বুক ফুলাইয়া বেড়াইতেছে, তাহা হইলে কি প্রকার সামাজিক অবস্থা প্রকাশ করে? অতএব যাঁহারা সত্তের পক্ষপাতী, তাঁহাদের সেই পক্ষপাতিত্ব কেবল হৃদয়ে বদ্ধ রাখিলে চলিবে না। আপনাপন শক্তিকে সমবেত করা তাঁহাদের পক্ষে একান্ত প্রয়োজন ও অতীব কর্ত্তব্য। পরস্পর বিচ্ছিন্ন থাকিয়া অসৎকে শ্রীবৃদ্ধিশালী হইতে দিলে, তাঁহারা ঈশ্বর ও মানবের নিকট অপরাধী হইবেন।

উপরে সাধারণ ভাবে যে সত্যের আলোচনা করা হইল, তাহা বিশেষ ভাবে ব্রাহ্মদিগের জীবনে প্রয়োগ করিতে পারা যায়। আমরা সকলেই যে শক্তিশালী লোক তাহা নহে। কিন্তু আমাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শক্তিকে যদি আমরা সমবেত করি, তাহা হইলে তদ্দ্বারা অনেক অনিষ্ট নিবারিত ও ইষ্ট সাধিত হইতে পারে। যখন এদেশে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড রথ টানা হয়, তখন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বালক বালিকাও আসিয়া রথের কাছিতে হাত দেয়। তুমি মনে করিতে পার যে কাছি শত শত বয়ঃপ্রাপ্ত লোকে ধরিয়াছে, তাহাতে ক্ষুদ্র বালক বালিকার হাত দিয়া আর কি হইবে। কিন্তু তাহা নহে, ঐ বালক বালিকার ক্ষুদ্র আকর্ষণ রথের গতির পক্ষে কিঞ্চিৎ সাহায্য করিতেছে। সেইরূপ ব্রাহ্মসমাজ রূপ রথের গতির পক্ষে তোমার আমার ক্ষুদ্র ও মহতের সকলেরই হাত দেওয়া আবশ্যক। এই সমবায় প্রবৃত্তি বৰ্দ্ধিত না হইলে আমাদের কোনও কার্য্য সুচারুরূপে চলিবার উপায় দেখা যায় না।

যদি কোনও ব্রাহ্ম এরূপ মনে করেন, কাজ ত একপ্রকার চলিতেছে, আমি আবার কি করিব, কোথায় যোগ দিব। তবে বলিতে হইবে যে তিনি ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যের গুরুত্ব এবং মহত্ব এখনও সম্যকরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই। ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যক্ষেত্র অনন্ত বিস্তৃত। তাহার কয়েকটীমাত্র নির্দ্দেশ করিতেছি।

প্রথম—প্রচার। প্রচার ব্রাহ্মসমাজের একটী প্রধান কাজ। সকলে একবার চিন্তা করিয়া দেখুন এ কাজটী কিরূপ দুর্ব্বল ও ক্ষীণভাবে চলিতেছে। এ ক্ষেত্রে এখনও কত শত লোকের কার্য্য করিবার স্থান রহিয়াছে।

দ্বিতীয়—ব্রাহ্ম শিশুদিগের শিক্ষা। আমাদিগের মধ্যে কত পুরুষ ও কত মহিলা এ কার্য্যে জীবন দিলে তবে এ কার্য্য সুচারুরূপে চলিতে পারে!

তৃতীয়—সাহিত্য। ব্রাহ্মদিগের মধ্যে সমবায় শক্তি থাকিলে এবং সাহিত্যে পারদর্শী লোক থাকিলে, তাঁহারা ব্রাহ্মমিশন প্রেসটীকে সাহিত্য জগতে একটী প্রবল শক্তিরূপে পরিণত করিতে পারিতেন; ব্রাহ্মসমাজ হইতে স্কুল-পাঠ্য গ্রন্থাবলী প্রণয়ন ও মুদ্রণ করিতে পারিতেন; ব্রাহ্ম গৃহস্থের গৃহে পাঠ্য সুনীতিপূর্ণ উপন্যাসাবলী প্রকাশ করিতে পারিতেন; বিভিন্ন ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের ইতিবৃত্ত মুদ্রিত করিয়া ব্রাহ্মদিগের জ্ঞানকে উন্নত করিতে পারিতেন; সাধু মহাত্মাদের জীবন চরিত মুদ্রিত করিয়া লোকের ধর্ম্ম জীবনের সাহায্য করিতে পারিতেন। সমবায় শক্তির ও অনুরাগের অভাবে তাহা হইতেছে না।

চতুর্থ—ব্রাহ্মদিগের মধ্যে জ্ঞান বিজ্ঞানের (culture) উন্নতি। এ বিষয়ে ব্রাহ্মগণ দিন দিন পশ্চাতে পড়িতেছেন বই অগ্রসর হইতেছেন না। আমাদের মধ্য হইতে কতকগুলি লোক দলবদ্ধ হইয়া সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের পুস্তকালয়টীকে কেন্দ্রস্বরূপ করিয়া ব্রাহ্মসমাজ মধ্যে জ্ঞান-বিস্তারের ও বিদ্যার উন্নতির কত উপায় বিধান করিতে পারেন। সমবায় শক্তির অভাবে তাহার কিছুই হইতেছে না।

পঞ্চম—জনহিতৈষণা। সুরাপান নিবারণ, পতিতা রমণীদিগের উদ্ধার, দারিদ্র্য দুঃখ নিবারণ প্রভৃতি কত জনহিতকর কার্য্য পড়িয়া রহিয়াছে, সমবেত ভাবে কার্য্য করিলে যে সকল কার্য্যে ব্রাহ্মগণ বিশেষ কৃতকার্য্য হইতে পারেন।

এত প্রকার কার্য্যক্ষেত্র হাতের নিকট থাকিতে কোনও ব্রাহ্ম যেন এই বলিয়া দুঃখ না করেন যে তাঁহার খাটিবার কার্য্যক্ষেত্র কোথায়? আমরা আমাদের স্বেচ্ছাচার-প্রবৃত্তি ঈর্ষ্যা প্রভৃতিকে সংযত করিয়া সমবেত হইতে পারি না এই কথাই বলুন। তাহাই সত্য কথা।

ধর্ম্মসাধনে সাধুসঙ্গ।

মহাকবি ভবভূতি প্রণীত একখানি সংস্কৃত নাটকের মধ্যে নিম্নলিখিত কবিতাটী প্রাপ্ত হওয়া যায়;—

বিতরতি গুরুঃ প্রাজ্ঞে বিদ্যাং যথা তথৈব জড়ে;
নতু খলু তয়োর্ জ্ঞানে শক্তিং করোত্যপহন্তি বা।
ভবতিচ পুন র্ভূয়ান্ ভেদঃ ফলং প্রতি তদ্যথা
প্রভবতি শুচির্বিম্বোদ্গ্রাহে মণি র্ন মৃদাং চয়ঃ॥

অর্থ—"গুরু প্রাজ্ঞ ও জড় বিচার না করিয়াই সকলের প্রতি সমানভাবে বিদ্যা বিতরণ করিয়া থাকেন; তিনি কাহারও বোধশক্তি প্রদান করেন না বা হরণ করেন না; কিন্তু ফলে দেখিতে পাই অনেক তারতম্য ঘটিয়া থাকে; নির্ম্মল আতসী কাচই সূর্য্যরশ্মিকে প্রতিফলিত করিতে পারে মৃৎপিণ্ড তাহা পারে না।"

বিদ্যালয়ে সকলেই গমন করে, উৎকৃষ্ট শিক্ষকের সংসর্গে অনেক ছাত্রও বাস করে, সকলে সমান বিদ্যালাভ করে না কেন? ইহার উত্তরে কেহ বা বলিবেন সকল ছাত্রের ধারণাশক্তি সমান নহে, কেহবা বলিবেন সকল ছাত্র সমানরূপ প্রণিধান করে না। তবে দেখিতেছি দুইটী বিষয়ের পার্থক্য নিবন্ধন ফলগত তারতম্য উপস্থিত হয়। প্রথম ধারণাশক্তি, দ্বিতীয় প্রণিধান-শক্তি। ধারণাশক্তির উপরে কাহারও হাত নাই। সকলে সমানরূপ মস্তিষ্ক লইয়া জন্মগ্রহণ করে না। কাহারও কাহারও মেধা অতীব আশ্চর্য্য। যে বিষয় তাঁহাদের সমক্ষে উপস্থিত হয়, তাঁহারা ত্বরিত তাহার ভিতরে প্রবেশ করিতে পারেন এবং তাহার মর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারেন। আবার কাহার কাহারও প্রকৃতি কিঞ্চিৎ জড়ভাবাপন্ন; কোনও বিষয়ের

মর্ম্মগ্রহণ করিতে তাঁহাদের বিলম্ব হইয়া থাকে। এরূপ কথিত আছে,যে সার আইজাক নিউটন যখন শিশু ছিলেন তখন তাঁহার নিকটে ইউক্লিডের জ্যামিতির প্রথম ভাগের সাতচল্লিশ প্রতিজ্ঞা পাঠ করিয়া শুনান হইয়াছিল। তিনি শুনিবামাত্র বলিলেন ইহা ত সত্য। যে প্রতিজ্ঞার সত্যতা বোধ করিতে কত বয়ঃপ্রাপ্ত বালকের মস্তক ঘুরিয়া যায়; শিশু নিউটন স্বতঃসিদ্ধ ভাবে অনুভব করিলেন যে তাহা সত্য। কিন্তু এই মানব সংসারে সার আইজাক নিউটন হইয়া সকলে জন্মগ্রহণ করে না। কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের সুপ্রসিদ্ধ ব্যাকরণাধ্যাপক অশেষ-শাস্ত্রজ্ঞ পরলোকগত তারানাথ তর্ক বাচস্পতি মহাশয়ের বিষয়ে এরূপ শ্রুত হওয়া যায় যে, তিনি পঠদ্দশাতে সপ্তাহের অধিকাংশ দিন, এবং দিনের অধিকাংশ সময় গল্প করিয়া বেড়াইতেন, হয় ত একদিন রাত্রে কয়েক ঘণ্টা পাঠ্য গ্রন্থ লইয়া বসিলেন, অমনি দিব্যালোকের ন্যায় সমুদয় বিষয়ের মর্ম্ম গ্রহণ করিয়া সমুদয় কণ্ঠস্থ করিয়া লইলেন। সেকালে কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে নাথুরাম শাস্ত্রী নামে একজন পশ্চিম দেশীয় মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত কাব্যেরও অলঙ্কারের অধ্যাপক ছিলেন; তিনি বাঙ্গালা জানিতেন না সংস্কৃত ভাষাতেই কথা কহিতেন ও অধ্যাপনা কার্য্য চালাইতেন। তিনি অনেক সময়ে হাসিয়া বলিতেন—

"মম যত্র যত্র সন্দেহ স্তত্রৈব তারা পৃচ্ছতি।"

অর্থ—"যেখানে যেখানে আমার সন্দেহ আছে, সেই সেই খানেই তারা প্রশ্ন করে।" তারানাথের এই ধারণাশক্তি লইয়া সকলে জন্মগ্রহণ করে না।

বিদ্যা লাভ বিষয়ে ধারণাশক্তির ন্যায় প্রণিধান-শক্তিরও প্রয়োজন। অনেক বুদ্ধিমান ছাত্র প্রণিধানের অভাবে উৎকৃষ্ট আচার্য্যের নিকটে থাকিয়াও বিদ্যালাভ করিতে পারে না। কিন্তু প্রশ্ন এই, এই প্রণিধান সকলের হয় না কেন? উত্তর,—জ্ঞানলাভের জন্য যাহার ব্যাকুলতা আছে, তাহারই প্রণিধান হয় অপরের হয় না। প্রতিদিন চক্ষের উপরে দেখিতেছি, দেশের শত শত ধনিসন্তানের বিদ্যা-শিক্ষার জন্য কত উপায় অবলম্বিত হইতেছে। তাহাদিগকে বিদ্যালাভে সহায়তা করিবার জন্য প্রচুর অর্থ ব্যয় করিয়া উপযুক্ত শিক্ষক সকল দেওয়া হইতেছে; তাঁহারা উঠিতে বসিতে সঙ্গে রহিয়াছেন; উৎকৃষ্ট বিদ্যালয়, উৎকৃষ্ট শিক্ষক, উৎকৃষ্ট পুস্তকালয় প্রভৃতি সমুদয় আয়োজন রহিয়াছে, অথচ তাহাদের মধ্যে অতি অল্প সংখ্যক বালকই কৃতবিদ্য হইয়া প্রতিষ্ঠা লাভে সমর্থ হইতেছে। ইহার কারণ কি? তাহাদের সকলেই কি জড়মতি? তাহা নহে, কারণ ঐ সকল বালকের অনেকে বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া বিষয় কার্য্যনির্ব্বাহে সবিশেষ বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিতেছে। তাহার কারণ তাহাদের জ্ঞানস্পৃহার অভাব, সুতরাং শ্রম-প্রবৃত্তির অভাব। এইরূপে প্রতিদিন এই সত্যের ভূরিভূরি প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে যে জ্ঞান-স্পৃহা-সম্পন্ন, ব্যাকুল ও শ্রমশীল ছাত্রই গুরূপদেশের দ্বারা উপকৃত হয়। যাহার স্বাবলম্বন নাই, জ্ঞানস্পৃহা নাই, শ্রমশীলতা নাই, তাহার কর্ণে বিদ্যা ঢালিয়া দিলেও তাহার উপকার হয় না। বিদ্যা-লাভে স্বাবলম্বন-শক্তিই উন্নতির ভিত্তি, গুরূপদেশ সহায় মাত্র।

কিন্তু স্বাবলম্বন-শক্তি মূল ভিত্তি বলিয়া গুরূপদেশের প্রয়োজনীয়তাও অস্বীকার করা যায় না। এক্ষণে সকল বিষয়েই উৎকৃষ্ট গ্রন্থ সকল প্রণীত হইয়াছে। একটী দুরূহ বিষয়কে সমুচিত রূপে অধিকৃত করিতে হইলে, যে যে অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয়ের প্রয়োজন, তাহাও নানাবিধ গ্রন্থে নিবদ্ধ করা হইয়াছে। সুতরাং বর্ত্তমান সময়ে একজন লোক নিজ গৃহে বসিয়া শ্রম ও অনুসন্ধানের দ্বারা অধিকাংশ বিদ্যা লাভ করিতে পারে। তবে বড় বড় কলেজে বড় বড় বেতন দিয়া প্রোফেসার নিযুক্ত করিবার প্রয়োজন কি? ডাক্তারি গ্রন্থ ঘরে বসিয়া পড়িয়া ও নিজ পরীক্ষার দ্বারা ত একজন ডাক্তার হইতে পারে, তবে মেডিকেল কলেজ খুলিয়া হাজার হাজার টাকা বেতন দিয়া প্রোফেসার নিযুক্ত করা হয় কেন? ইহার কারণ এই, ঐ সকল কৃতবিদ্য প্রোফেসার সেই সকল গ্রন্থের বর্ণিত বিষয় সাধনের দ্বারা আয়ত্ত করিয়াছেন; তাঁহার নিজ অভিজ্ঞতার দ্বারা তৎসংক্রান্ত অনেক নূতন তত্ত্ব লাভ করিয়াছেন। তাঁহাদের সন্নিধানে বসিলে অল্প সময়ের মধ্যে এত বিশদরূপে এত মূল্যবান জ্ঞান-সম্পত্তি লাভ করা যায়, যাহা নিজে অনুসন্ধান দ্বারা জানিতে বহুকাল সাপেক্ষ। যখন উৎকৃষ্ট গ্রন্থ ও উৎকৃষ্ট শিক্ষক উভয় সম্মিলিত হয়, তখন বিদ্যালাভ কার্য্য সহজে ও সুন্দররূপে নির্ব্বাহ হয়।

বিদ্যালাভ সম্বন্ধে অধ্যাপক যে কার্য্য করিয়া থাকেন ধর্ম্মজ্ঞান লাভ সম্বন্ধে সাধু-সঙ্গও সেই কার্য্য করিয়া থাকে। এখানেও স্বাবলম্বন উন্নতির মূল ভিত্তি। যাহার ব্যাকুলতা নাই, নিজের সাধন ও শ্রম নাই, তাহাকে কে ধর্ম্ম দিতে পারে? তাহাকে যদি যুগ যুগ ধরিয়া ধার্ম্মিক জনের সঙ্গে ফেলিয়া রাখ, তথাপি সে ধর্ম্ম লাভ করিতে পারিবে না। যে সকল ব্যাপারের দ্বারা কত ঐরাবত চূর্ণ হইয়া যাইতেছে, কত পাতকী নবজীবন পাইতেছে, কত জীবনে বিপ্লব ঘটিতেছে, যে ব্যক্তি তাহার মধ্যে থাকিবে, সকলি দেখিবে, শুনিবে, অথচ কিছুরই উপকার প্রাপ্ত হইবে না। পদ্ম-পত্রের জল যেরূপ উপর দিয়া গড়াইয়া যায়, পত্রকে সিক্ত করে না, সেইরূপ সদুপদেশ সকলও তাহার মনের উপর দিয়া গড়াইয়া যাইবে, তাহার মনকে সিক্ত করিতে পারিবে না। আমরা কি এরূপ শত শত দৃষ্টান্ত দেখিতে পাইতেছি না? কিন্তু স্বাবলম্বন মূল ভিত্তি বলিয়া এখানেও সাধু সঙ্গকে একেবারে অগ্রাহ্য করিলে চলে না। অপরাপর বিষয়ের ন্যায় বর্ত্তমান সময়ে ধর্ম্ম গ্রন্থেরও অপ্রতুল নাই; ধর্ম্মজীবনের সকল অবস্থার উপযোগী গ্রন্থ প্রচুর পরিমাণে প্রাপ্ত হওয়া যায়, সে সকল পাঠ করিয়াও অনেকে ধর্ম্মজীবনের সাহায্য লাভ করিতে পারে তবে আবার সাধু-সঙ্গের প্রয়োজন কি? আবার বলিতেছি বিদ্যালাভ বিষয়ে অধ্যাপক যাহা করিয়া থাকেন ধর্ম্মসাধন বিষয়ে সাধুসঙ্গও তাহা করিয়া থাকে। শাস্ত্রে ত ধর্ম্মের তত্ত্ব সকল নিহিত আছে, কিন্তু সেই সকল তত্ত্বকে সাধনের দ্বারা আয়ত্ত করিয়াছেন, এরূপ ব্যক্তি যদি পাওয়া যায় তাহা হইলে সেই সকল তত্ত্বের মর্ম্মগ্রহণ সম্বন্ধে এবং অনেক নূতন তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করার সম্বন্ধে কত সহায়তা হইতে পারে? এবিষয় লইয়া বিবাদে প্রবৃত্ত

হওয়ার কোনও প্রয়োজন দেখা যায় না। ব্রাহ্ম যদি বিদ্যা লাভের জন্য অধ্যাপকের অধীন হওয়াতে আপত্তি না করেন, তবে ধর্ম্মসাধন বিষয়ে সাধুজনের অধীন হইতে কেন আপত্তি করিবেন? আমাদের বোধ হয় যাহা সহজ ও স্বাভাবিক তাহাকে অতিরিক্ত মাত্রাতে গ্রহণ করাতেই লোকের বিরুদ্ধভাব উৎপন্ন হইতেছে। প্রত্যেক ব্যক্তিকেই একটী মহাসত্য স্মরণ রাখিতে হইবে সেটী এই—"তোমার ধর্ম্মের ভার ঈশ্বর কাহারও উপরে অর্পণ করেন নাই, তাহা তোমাকেই অন্বেষণ করিতে হইবে, সাধন করিতে হইবে ও উপার্জ্জন করিতে হইবে।" এবিষয়ে কাহারও প্রতি সম্পূর্ণ ভার অর্পণ করিলে আপনাকে মনুষ্যত্ব হইতে হীন করিয়া শিশুত্বে পরিণত করা হয় এবং যে উদ্দেশে এরূপ করা হয় সেই উদ্দেশ্যই সফল হয় না; এরূপ ব্যক্তি প্রকৃত ধর্ম্মজীবন প্রাপ্ত হইতে পারে না।

যোগ ও ব্রাহ্মসমাজ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

৭। নাম ও সঙ্গীত সাধন। স্বরূপাত্মক নাম ও স্বরূপ ধ্যান একই বস্তু। কিন্তু নাম সাধনে সাধারণতঃ ধ্যানের ন্যায় গভীরতা থাকে না। হৃদয়তন্ত্রীর সহিত সুর মিলাইয়া বিভুগুণ গান করা আত্মার পক্ষে বিশ্রাম, আমোদ ও উপকারজনক। সর্ব্বদাই চিত্তবৃত্তি নিরোধ করতঃ ধ্যান-নিরত হওয়া সম্ভবপর নহে। মস্তিষ্কের অবকাশ প্রয়োজন, নচেৎ অত্যধিক তপ্ত মৃন্ময় তণ্ডুলাধারের তণ্ডুল সিদ্ধ হইবার পূর্ব্বেই শতখণ্ড হওনের ন্যায়, উহার উদ্দেশ্য সিদ্ধি বিষয়ে ব্যাঘাত জন্মে। নাম, স্বরূপ বা ভাবোদ্দীপক সঙ্গীতের মানসিক বা শাব্দিক ভাবে স্বভাব আবৃত্তি নানাপ্রকারে হিতজনক। এই সমুদায় অভ্যাসের সহিত "তস্মিন্ প্রীতি" এবং "তৎপ্রিয় কার্য্য সাধনং" নিতান্ত প্রয়োজন। প্রকৃতরূপে নাম করিতে পারা ও ব্রহ্ম দর্শন সম্ভোগ করা একই বস্তু এবং ব্রহ্ম দর্শন ও প্রকৃত জীবনও একই বস্তু। সেই জন্যই গুরু নানক বলিয়াছিলেন, "আজীবা; বিসরে মরজানা; আত্তখান্ আঁখা সাঁচা নাম; সাঁচা নামকি লাগে ভুখ; যো খাওয়ে সো তরিয়াওয়ে, দুঃখ।" অর্থাৎ তাঁহাকে স্মরণই জীবন; তাঁহার বিস্মৃতিই মৃত্যু। খাঁটি নামই প্রকৃত জীবন। প্রকৃত নামের ক্ষুধা হইলে উহা যে ব্যক্তি ভোজন করেন তিনি দুঃখসাগর উত্তীর্ণ হইয়া অক্ষয় আনন্দ ধাম লাভ করেন। এই কারণেই মহামতি ব্যাসদেবের সর্ব্ব বিধির সার বিধি এই যে "স্মর্ত্তব্যো সততং বিষ্ণুঃ," এবং নিষেধ এই যে "ন বিস্মর্ত্তব্যো কদাচনঃ।" এই কারণেই রোমক সাধক বলিয়াছেন "think of God *oftener than you* breathe"—কেবল প্রতি নিশ্বাসে নহে, যতবার নিশ্বাস লও তদপেক্ষা অধিকবার তাঁহার প্রেমমুখ স্মরণ করিও। যাঁহার অজপা সাধিত হইয়াছে, তিনি ধন্য। তাঁহার ভাব ঈশ্বরের সঙ্গে নিত্য সম্বদ্ধশীল।

এই যে "দমে দমে নাম" লওয়া ইহা কল্পনা না প্রকৃত প্রস্তাবেই সম্ভব, তাহা যিনি ভগবদ্প্রেমসিক্ত আত্মার সৌম্য মূর্ত্তি ও নির্ব্বাতে নিকম্প দীপশিখা ভাব পর্য্যালোচনা করিয়াছেন তিনিই জানেন। এইরূপ সাধুগণ চলা ফেরা প্রভৃতি সর্ব্ববিধ কার্য্যের দ্বারা ব্রহ্মের নাম প্রচার ও গুণকীর্ত্তন করেন। তাঁহাদের হৃদয় মধুচক্র সদৃশ মধুর সৌরভময় ও চিত্তভৃঙ্গাকর্ষক। তাঁহাদের আত্মা যেন আনন্দ ও মাধুর্য্যরসে বিভোর হইয়া আছে "কেবা শুনাইল তব নাম? জপিতে জপিতে নাম অবশ করিল গো, আকুল করিল মোর প্রাণ।" এই নাম 'বৃথা উচ্চারণ' করিলে বিপরীত ফল হয়, অর্থাৎ নামাপরাধ হয়। বৃথা নাম লওয়ার অর্থ এই যে, যে সময়ে মন বিষয়ান্তরে নিযুক্ত, তৎকালে শূন্য ভাবে উহা উচ্চারণ করা, শুষ্কতাজনক শূন্য ভাবে, অর্থাৎ প্রেম, ভক্তি প্রভৃতি ভাব শূন্য হইয়া নামকে কেবল শাব্দিক বস্তুতে পরিণত করিলে একটী বৃথা নাম করিবার প্রবৃত্তিরূপ অভ্যাস ও তজ্জনিত আধ্যাত্মিক অবনতি জন্মে। মহাজনেরা নাম মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়াছেন—এমন কি ঈশ্বরের নামকে তাঁহাপেক্ষাও গুরুতর বলিয়াছেন। তাঁহারা বলেন যে আমরা নাম দ্বারাই তাঁহাকে লাভ করি—অতএব নাম মহদ্বস্তু। বস্তুতঃ ধারণার অবস্থাতে নাম ও নামিত বস্তুর প্রভেদ দূর হয়।

৯। সহকারী উপায়। বিষয়াসক্ত চিত্তকে সাধনের উপযোগী ও অনুকূল করিতে হইলে প্রথমতই সত্যাসত্য, সারাসার বিচার জনিত বিবেক ও বৈরাগ্য প্রয়োজন। অসার ত্যাগ করিয়া সার জ্ঞান ও লাভের আকিঞ্চন হইলেই 'বাসনারাম্' বাসনা সংযম হইবে। গভীর বারিধিতে নিমগ্ন হইয়া হস্ত পদ ইতস্ততঃ বলপূর্ব্বক সঞ্চালন করিলে মৃত্যু অনিবার্য্য; ইতস্ততঃ যাইলে বিপদ। স্থির ভাবে সংযত ইচ্ছা ও সংযতচেষ্ট হইয়া গন্তব্য পথে যাইতে হইবে। আত্মা নিজেই আত্মার ইঞ্জিনিয়ার। উহার ব্যাকুল ইচ্ছা থাকিলে, উহা পূরণের পথ নিজেই আবিষ্কার করিবে ও খুঁজিয়া লইবে। যাহা যাহা করিলে উদ্দেশ্য সিদ্ধির সুবিধা হইবে, উহা তাহা জানিতে পারিবে ও করিবে।

সৎসঙ্গ, সদ্গ্রন্থ, সদালোচনা হইতে জীবন্ত ও মৃত ব্যক্তিগণের সাধু চিন্তা, ভাব ও সাধন-রহস্য অবগত হওয়া যায় এবং বিবেক, বৈরাগ্য, প্রেম, ভক্তি, বিশ্বাস, প্রভৃতি মহানুভাবোদ্রেককারী কথাগুলি আত্মার বল, স্বাস্থ্য ও স্ফূর্ত্তি সম্পাদন করে।

আত্মপরীক্ষাদির দ্বারা বিশেষ ফল হয়। আমাদের কি অভাব, কত পরিমাণে উহা দূর হইতেছে বা না হইতেছে, তৎসম্বন্ধে কি কি করিতেছি বা উপায় অবলম্বন করা যাইতে পারে ইত্যাকার ভাবনাদ্বারা সাধনরূপ সোপানে আরোহণের অবলম্বন একান্ত প্রয়োজন।

লক্ষ্য স্থির হওয়া চাই। আমরা কি চাই তাহা স্থির হইলে, কোন্ পথে, কোন্ উপায়ে উহা লাভের সুবিধা হইবে, স্থির করিয়া লক্ষ্যের দিকে পদ সঞ্চালন করিতে হইবে, নচেৎ ইতস্ততঃ করিলে কোন ফল হইবে না।

এইত গেল অতিশয় সংক্ষেপে সহজ ও প্রকৃত আধ্যাত্ম যোগ সাধনের সম্বন্ধে কয়েকটী মোটামুটি কথা। ইহার মূল

আত্মা ও আত্মজ্ঞানে। কিন্তু শাখা জীবনের প্রত্যেক অংশ। সাধন এই কথাটীর আদি, মধ্য ও অন্ত্য অক্ষর কি, যদি কেহ জিজ্ঞাসা করেন, তবে বলি "চরিত্র, কর্ত্তব্য ও আত্ম-বশীকরণ।" প্রকৃতিস্থ আত্মার পক্ষে এই সমুদায় স্বাভাবিক কার্য্য। সাধনের বস্তু নহে। কিন্তু যাহাদের আত্মা বিকৃত, তাহাদের পক্ষে আত্মাকে প্রকৃতিস্থ করার প্রয়োজন। ইহার প্রকৃষ্ট উপায় বহু সদ্‌গ্রন্থে ও সাধুমুখে লাভ করা যায়, বিবেচনা দ্বারাও বাহির করা যায় বটে, কিন্তু সাধন-প্রবীণ ব্যক্তিরাই শ্রবণাদি ও পরীক্ষা দ্বারা ভালরূপ জানেন। আমাদের লক্ষ্য উচ্চ হওয়া চাই, কখনই নীচ হওয়া উচিত নহে। যদি আমাদের চরিত্র মৌলিক না হয়, তাহা হইলে আদর্শ চরিত্র সম্মুখে রাখিয়া তাহার নকল করিতে হইবে। পাপ হইতে মুক্তি কামনা করিবার, অজ্ঞান তিমির হইতে উত্তীর্ণ হইবার, এবং জ্ঞান ও ধর্ম্মের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে সেই উত্তম পুরুষের সহিত নিত্য যোগে মিলিত হইতে বাসনা, আকাঙ্ক্ষা ও আশা করিবার প্রত্যেক মানবেরই অধিকার আছে। এ "আশাই" মুক্তির হেতু। কিন্তু "আশার" সঙ্গে সঙ্গে উপযুক্ত চেষ্টা চাই। মুক্তি বা যোগ কিছু ব্যক্তি ও সম্প্রদায় বিশেষের পৈত্রিক বা একচেটীয়া বস্তু নহে। সর্ব্বত্রই জীবের প্রাণে পিপাসা আছে, ও পিপাসার শান্তির জন্য নির্ম্মল ও শীতল সলিলের উৎসও আছে। সম্প্রদায় বিশেষের অন্তরে ধর্ম্মাভিমানজনিত স্ফীতি অবৈধ।

আত্ম-বশীকরণ। ইহা সাধারণের পক্ষে বড় সহজ নহে। ভয়ানক কঠিন। রিপুগণের আয়তন এমন বেয়াড়া রকমের বৃদ্ধি পাইয়াছে যে আমরা সুবিধা পূর্ব্বক উহাদিগকে "পাক্‌ড়াইতে" পারি না। উহারা ধরা ছোঁয়া দেয় না, অথচ লুক্কায়িত চীনের মত কোথা হইতে আসিয়া ছোঁ মারিয়া আমাদের অন্তরস্থ বহু যত্নের সামগ্রী সমূহ কাড়িয়া লইয়া যায়। হাফেজের মত উচ্চ আত্মাও উত্তাল তরঙ্গের বিভীষিকাময় ভীষণ আকার দেখিয়া কাতর, ব্যাকুল ও অসহায় ভাবে চিৎকার করিয়াছিলেন। কিন্তু যিনিই ধীর ভাবে অনাথশরণের চরণ ধরিয়াছেন, যিনি "ভাসায়ে দিয়েছেন দুকূল, সেই অকূল কাণ্ডারীর করে," তিনিই আত্মার মধ্যে, দুর্ব্বলতার মধ্যে "মাভৈঃ!" রবের বজ্রনির্ঘোষ শুনিয়াছেন। তিনি তরঙ্গমধ্য হইতে তীরস্থ লঘুচিত্ত ব্যক্তিগণকে উচ্চৈঃস্বরে বলিতে পারেন "আমি দুর্ব্বল হইয়াও সবল। আমি মরিতে মরিতে বাঁচিতেছি।" আমার দীর্ঘ নিশ্বাস বা ক্রন্দন তোমরা শুনিও না, আমার অশ্রু তোমরা দেখিও না। আমি একলা সংগ্রাম করিব, একলা বাঁচিব বা মরিব। আমি আমার আত্মা-প্রকোষ্ঠের ক্ষুদ্র কোণে বসিয়া আমার-বন্ধুকে হৃদয় বেদনা জানাইব। আমি একলা কাঁদিব, তিনি একলা শুনিবেন।"

মুষ্টিআঘাতের দ্বারা কাঁঠাল পাকান কতদূর ভাল জানি না। অধিকাংশ লোকেই কিল-পক্কতার পক্ষপাতী। বৃক্ষ-পক্কতার দিকে বুঝি কেহই নহেন। কোন কোন যোগকামিগণ চাহেন, যে আমরা বসিয়া থাকিব, কিন্তু বন হইতে একটী জটাজুটধারী গুরু-অভিধান সাধক বহু সাধনের ধন অর্জ্জন করিয়া আনিয়া আমাদের প্রাণে সঞ্চার করিবেন। সেই শক্তি লাভ করিয়া আমরা জিতেন্দ্রিয় হইয়া সাধন করিব। অলস ব্যক্তির পক্ষে উহা সহজ নহে, গুরুই আসুন, আর যিনিই আসুন। স্থিরপ্রতিজ্ঞ ও যত্নশীল ব্যক্তির পক্ষে উহা সহজ, অতএব গুরু-বল-সাহায্য নিষ্প্রয়োজন।

"ব্রহ্মদর্শন।" ধর্ম্মের বাজারে একটা প্রকাণ্ড হৈ চৈ পড়িয়াছে যে অমুকের ব্রহ্ম দর্শন হইতেছে, হইয়াছে বা হইবে এবং অমুকের নিকট একটী গুপ্ত তাড়িতাধার আছে, যাহার শক্তির কিঞ্চিন্মাত্র সঞ্চারিত হইলেই, রেলগাড়ির এঞ্জিনের ন্যায় উহা আমাদিগকে পশ্চাৎ হইতে ঠেলিয়া ধাক্কা দিয়া ছুট করিয়া গন্তব্য স্থানে লইয়া যাইবে। বেশ কথা। কিন্তু প্রথমতঃই ত মাশুল দিতে হইবে, আত্ম-বিক্রয় করিতে হইবে, দেউলিয়া হইতে হইবে ও ঈশ্বরের বিরুদ্ধে রাজদ্রোহিতাচরণ করা হইবে। পরে গন্তব্য স্থানে উপনীত হওনের সম্বন্ধেও কিন্তু আমার অতি গভীর সন্দেহ আছে। ব্রহ্মদর্শন বস্তুটী ইতিপূর্ব্বে গোলকণ্ডার খনি-মধ্যে, বা হিমালয়ের নিবিড়তার মধ্যে লুকান ছিল—"নিহিতং গুহায়াম্" ছিল, ব্রহ্ম "গুহাহিতং গহ্বরেষ্ঠং" ছিলেন। ব্রাহ্মসমাজ তাহার অনুসন্ধান করিলেন—কেহ কেহ বা তাহার কণামাত্র লাভ করিয়া মহত্তাখ্যান উপার্জ্জন করিলেন। তাঁহারা যে এই সাত রাজার ধনের বিন্দুমাত্র অংশ লাভ করিলেন, তাহার মূল্য নাই—কেবল বিনিময়ে বিন্দু বিন্দু শোণিত, হৃদয় ও জীবন বিসর্জ্জন দিতে হয়। সকলে তাহা দিতে পারে না। কিন্তু অনেকেই উহা পাইতে চায়। তাহারা উহার মর্য্যাদা জানে না, কত কাঠ খড় প্রয়োজন তাহা জানে না। ইহার খদ্দের বাড়িল বটে, কিন্তু আসল বস্তু কেহ দিতেও পারে না—কেহ কিনিতেও পারে না—অথচ চাই, মন ভুলান চাই—অমনি একটা নকল মেকির সৃষ্টি হইল, যাহা পথে ঘাটে পাওয়া যাইতেছে। "ব্রহ্মদর্শ" এখন, বুঝি অনেকেই করিতে-ছেন। বস্তুটী সাধকের হৃদয়গুহা হইতে সজোরে টানিয়া রাজ-পথে বাহির করা হইয়াছে—শেষে কতদূর গড়াইবে বলা যায় না। আবার ইহারও গতিক বড় সুবিধাজনক নহে। শুনা যাইতেছে যে, ব্রহ্মের সঙ্গে সঙ্গে তৎপারিষদ্‌বর্গও থাকেন, তিনি একলা থাকেন না বা ইহাদের নিকট একলা আসিতে সাহসী নহেন। এক হইতে তেত্রিশ কোটী খেচর, ভূচর উভচর, জলচর, দেবদেবীগণ ইহলোক ও পরলোক প্রভৃতি হইতে যে যেখানে ছিলেন আহার নিদ্রা বর্জ্জন করিয়া কোন কোন সাধকের মনোরঞ্জনার্থ তাঁহার ক্ষুদ্র ও কোমল মস্তিষ্কের বিস্তৃত কল্পনারাজ্যে মহা সমারোহের সহিত আসিয়া নৃত্য গীত আরম্ভ করিয়াছেন। ইহাদের সঙ্গে আমাদের কোনই সহানুভূতি নাই। আমরা ব্রহ্মদর্শনকে এমন কিম্ভূত-কিমাকার বস্তু মনে করি না—উহা উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর হইলে একদিনে বা জীবনে উহা ফুরাইবে না—উহা গুরুতর হইতেও গুরুতর বস্তু—ব্রহ্মের কৃপাই তাহা লাভের একমাত্র উপায়, মানব-কৃপা নহে।

উহার জন্য ছুটাছুটী করিলে চলিবে না; বৎসর বৎসর ধীরে ধীরে ভূমি কর্ষণ, ও বীজ বপন করিতে হইবে—উপযুক্ত

গুরুতে ক্রুপাবারি বর্ষিত হইবে—এবং উপযুক্ত কালে আমরা অবশ্য লাভ করিয়া ধন্য ও কৃতার্থ হইব।

(ক্রমশঃ)

প্রেরিত পত্র।

(পত্র প্রেরকদিগের মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন, কিম্বা কাহারও পত্র ফেরত দিতে বাধ্য নহেন)

শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত তত্ত্বকৌমুদী সম্পাদক
মহাশয় সমীপেষু—

অভ্রান্ত গুরুবাদ ও ব্রাহ্মধর্ম্ম।

অবিচারিত ভাবে অনেক গুলি মত ব্রাহ্মসমাজে প্রবিষ্ট হইয়া, ব্রাহ্মদিগের হৃদয়ের উপরে বিশেষ আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে। এক্ষণে কেহ সেই সকল মতের বিরুদ্ধে কিছু বলিলে কি করিলে তাহাকেও অবিচারিত ভাবে ব্রাহ্মধর্ম্ম বিরোধী বলিয়া মনে করা হয়। এইরূপ বিচার বিহীন সিদ্ধান্ত যে সমাজে যে পরিমাণে প্রতিষ্ঠিত হয়, সেই সমাজ সেই পরিমাণে অন্তঃসার শূন্য হইয়া পড়ে, গোঁড়ামীই কেবল সেখানে সমাজস্থিতির কর্ত্তা হইয়া দাঁড়ায়। এইরূপ ভাব হইতে বর্ত্তমান হিন্দু সমাজের কতই না অনিষ্ট হইয়াছে। নব গঠিত ব্রাহ্মসমাজ যাহাতে এই রোগের হস্ত হইতে রক্ষা পান, ইহাই প্রার্থনীয়। আমরা ইচ্ছা করি, যে সকল মত লইয়া বর্ত্তমান সময়ে ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছে, ব্রাহ্মসমাজের অভিভাবকগণ স্থির ভাবে সে সকল বিষয় লইয়া বিচার করুন, তাহাতে ব্রাহ্ম সাধারণের মত ও মন অধিকতর উদার হইবে এবং মতান্তর জনিত মনান্তরও অনেক পরিমাণে তিরোহিত হইবে আশা করা যায়। "পুনর্জ্জন্মবাদ" ব্রাহ্মধর্ম্ম বিরোধী বলিয়াই ব্রাহ্মসাধারণের বিশ্বাস ছিল, কিন্তু চিন্তাশীল ও সাধনশীল ব্রাহ্ম অভিভাবকগণ পুনর্জ্জন্মবাদকে ব্রাহ্মধর্ম্ম বিরোধী মনে করেন না, পুনর্জ্জন্ম বিশ্বাস করিয়াও একজন শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্ম থাকিতে পারেন এরূপ মনে করেন। এরূপ জানিতে পারায় উক্ত বিষয় লইয়া গোঁড়ামী ভিতরে ভিতরে কিছু কমিয়া যাইতেছে। অন্যান্য বিষয় লইয়া আলোচনা হইলেও অনেক উপকারের সম্ভাবনা।

ব্রাহ্মসমাজে যোগ লইয়া যে আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে তাহাতে অভ্রান্ত গুরুবাদের আলোচনা অবশ্য প্রয়োজনীয় হইয়া পড়িয়াছে। "সত্যই" যখন আমাদের শাস্ত্র, তখন এতকাল যাহা বিশ্বাস করিয়া আসিয়াছি, সত্যটা পাছে বা তাহার বিরুদ্ধ হয়, এরূপ ত্রাস ব্রাহ্মের মনে উপস্থিত হওয়া কদাচ সঙ্গত নহে। যাহা মিথ্যা ও কুসংস্কার বলিয়া বহুকাল পরিত্যাগ করিয়াছি, সত্য বলিয়া প্রমাণিত হইলে তাহাকে অম্লানবদনে শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ করাই সত্যানুরাগের লক্ষণ। বিশ্বাস করি ব্রাহ্মগণের মধ্যে এরূপ সত্যানুরাগ ও সৎসাহস বিরল নহে। এক্ষণে আমি আলোচ্য বিষয়ের অবতারণ করার পূর্ব্বে পাঠকগণকে একটী বিষয় বিশেষ ভাবে স্মরণ রাখিতে অনুরোধ করি ; "অভ্রান্ত গুরুবাদ ব্রাহ্মধর্ম্ম বিরোধী কিনা" ইহাই আমার আলোচ্য বিষয়, কিন্তু কিরূপে গুরুনির্ণয় করা হইবে এবং কেই বা গুরু হইবেন সে সকল কথা এ প্রবন্ধের আলোচ্য নহে, এবিষয়টী সর্ব্বদা মনে রাখিয়া আলোচনা করিতে হইবে।

আমার মনে হয় ব্রাহ্মধর্ম্মের সাধন তত্ত্বের যাহা মূলমন্ত্র তাহারই উপর অভ্রান্ত গুরুবাদের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত। জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার সাক্ষাৎ যোগই ব্রাহ্মধর্ম্মের মূল তত্ত্ব। যাঁহারা ধর্ম্মকে কেবল মাত্র আধ্যাত্মিক ব্যায়াম মনে করেন, ঈশ্বরের ব্যক্তিত্ব মানেন না, মানুষ যে ব্রহ্মদর্শন ও ব্রহ্মবাক্য শ্রবণ করিতে পারে এসমস্ত বিশ্বাস করেন না, বিবেকের অতিরিক্ত ঈশ্বর প্রত্যাদেশ যাঁহারা মানেন না, তাঁহাদের সহিত আমার আলোচনা নহে এবং এবিষয় আমি তাঁহাদিগকে বুঝাইতে ও প্রয়াসী নহি। যাঁহারা ঐ সমস্ত বিষয় অন্ততঃ মতে মানেন তাঁহাদিগের নিকটই আমার বিচার প্রার্থনা।

স্বীকার্য্য।

১। ঈশ্বর অভ্রান্ত ইহা স্বীকার্য্য।
২। ঈশ্বরের বাণী অভ্রান্ত ইহা স্বীকার্য্য।
৩। ঈশ্বরবাণী মানবাত্মায় প্রকাশ পায় ইহা স্বীকার্য্য।

এই তিনটী স্বীকার্য্য ধর্ম্মের প্রাণ এবং এই স্বীকার্য্য ত্রয়ই অভ্রান্ত গুরুবাদের জনক। এই তিনটীকে অস্বীকার করিলে অভ্রান্ত গুরুবাদ কিছুতেই টেঁকে না এবং এই তিনটীকে স্বীকার করিলে অভ্রান্ত গুরুবাদকে উপেক্ষা করা যায় না। মানুষ আপনার অভিজ্ঞতা ও বুদ্ধির উপর নির্ভর করিয়া যে সকল কথা বলে, তাহা আমরা বহু পরিমাণে বিশ্বাস করিতে পারি বটে, কিন্তু অভ্রান্তরূপে স্বীকার করিতে আপত্তি করিতে পারি। যে সকল দার্শনিক মত ও বৈজ্ঞানিক প্রণালী এক সময় সত্য বলিয়া স্থির প্রতিষ্ঠিত ছিল। সময়ে তাহার অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে। কিন্তু ঈশ্বরের বাণী কখনই ভ্রান্ত হইতে পারে না। পাঠক মনে রাখিবেন জগতে যে সকল কথা ঈশ্বরবাণী বলিয়া প্রচারিত হইয়াছে, তাহা ঈশ্বরবাণী কিনা এবং তাহা সত্য কি মিথ্যা এ প্রবন্ধে আমরা সে বিষয়ের আলোচনা করিব না, সে বিষয়ে এক্ষণ মনোযোগও করিব না, কেন না তাহাতে আমাদের চিত্ত মূল বিষয়ের বিচারে অক্ষম হইবে। জগতে এ পর্য্যন্ত কেহ ঈশ্বরবাণী শুনিতে পাইয়াছেন কিনা তাহা আমাদের বিচার্য্য বিষয় নহে। কিন্তু "মানুষ ঈশ্বরবাণী শুনিতে পায়" ইহা ব্রাহ্মধর্ম্ম বিরোধী কথা নহে এবং এরূপ কথা বিশ্বাস করিয়াও একজন খাঁটি ব্রাহ্ম থাকিতে পারেন তাহার কিছু সংশয় নাই। এক্ষণ কতকগুলি কথা উপর্য্যুপরি রাখিয়া আমি আমার প্রবন্ধের উপসংহার করিব

১। ঈশ্বর অভ্রান্ত।
২। ঈশ্বর-বাণী অভ্রান্ত।
ঈশ্বর-বাণী মানবাত্মায় প্রকাশ পায়।
এমন কোন ব্যক্তি থাকা অসম্ভব বা অযৌক্তিক নহে যিনি ঈশ্বরের বাক্য শুনিয়া শিষ্যকে সেই উপদেশ দিতে পারেন।

৫। ঈশ্বরের বাণী শুনিয়া উপদেশ দিলে সে উপদেশ অভ্রান্ত।

৬। যিনি সেইরূপ অভ্রান্ত উপদেশ প্রদান করেন, তিনিই ত অভ্রান্ত গুরু।

ইহার যে কোন কথা অস্বীকার করিলে সমগ্র ব্রাহ্মধর্ম্মকে অস্বীকার করা হয়। গুরুবাদের যে স্থূল তত্ত্ব অতি সংক্ষেপে এই প্রবন্ধে প্রকাশিত হইল, তাহাতে কোন মানুষকে অভ্রান্ত বলা হইল না। কেবল অভ্রান্ত গুরুর কথাই বলা হইল। প্রয়োজন হইলে এ সকল কথা অধিকতর পরিষ্কার করা যাইবে।

শ্রীমনোরঞ্জন গুহ,

ব্রাহ্মসমাজ।

শোক-সংবাদ—আমরা গভীর দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে, আমাদের শ্রদ্ধেয় ভ্রাতা বাবু ক্ষেত্রমোহন মুখোপাধ্যায় গত ১২ই নবেম্বর কলিকাতায় বাটীতে ইহলোক লীলা সংবরণ করিয়াছেন। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ এ বৎসর দুইটী উজ্জ্বল রত্ন হারাইলেন, পুণ্যদাপ্রসাদ এবং ক্ষেত্রমোহন। ক্ষেত্র বাবুর বিয়োগে তাঁহার বিধবা পত্নী এবং শিশুসন্তানগণ যেমন শোকসাগরে ভাসিতেছেন, তাঁহার বন্ধুগণও তেমনি শোকে নিমগ্ন হইয়াছেন এবং সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রত্যেক মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিই তাঁহার বিচ্ছেদে ম্রিয়মান্ হইবেন। গত ২৬এ নবেম্বর হরিঘোষের ষ্ট্রীটে ক্ষেত্র বাবুর বন্ধু বাবু মহেন্দ্র চন্দ্র দাঁর গৃহে শ্রাদ্ধক্রিয়া সম্পন্ন হইয়াছে। বাবু সীতানাথ দত্ত উপাসনা করেন, বাবু আদিত্যকুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁহার সংক্ষিপ্ত জীবনচরিত পাঠ করেন। উপাসনা ক্ষেত্রে অনেকেই অশ্রুজল সংবরণ করিতে পারেন নাই। ক্ষেত্র বাবুর অনাথা পত্নী শ্রাদ্ধোপলক্ষে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রচার বিভাগ সাধনাশ্রম, দাসাশ্রম, প্রভৃতিতে ৫০৲ টাকা দান করিয়াছেন। সংক্ষিপ্ত জীবনচরিত আগামী বারে প্রকাশিত হইবে। পরমেশ্বর শোকদগ্ধা বিধবার প্রাণে শান্তিদান করুন, এবং এই অনাথ পরিবারকে ধর্ম্মপথে রক্ষা করুন।

প্রচার—সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যনির্ব্বাহক সভার নির্দ্ধারণ অনুসারে বাবু কালীচন্দ্র ঘোষালবিক্রমপুরে গমন পূর্ব্বক দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত কোন কোন স্থানে সাহায্য প্রদান করেন; কিন্তু দুর্ভিক্ষ প্রশমিত হওয়ায় সম্প্রতি তিনি কলিকাতায় আগমন করিয়াছেন। দুর্ভিক্ষের কার্য্য ব্যতীত তিনি নানা স্থানে বক্তৃতা, উপাসনা, সংগীত এবং কথকতাদি দ্বারা ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিয়াছেন।

নামকরণ—গত ৫ই নবেম্বর রাজযোগিনী নিবাসী বাবু গিরিশচন্দ্র ঘোষালের কন্যার নামকরণ কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে। এতদুপলক্ষে বাবু কালীচন্দ্র ঘোষাল উপাসনা করেন। কন্যার নাম সুবালা রাখা হইয়াছে।

গত ৬ই অগ্রহায়ণ আমাদের পাবনাস্থ বাবু কৈলাসচন্দ্র বাগ্‌ছির তৃতীয় পুত্রের নামকরণ কার্য্য সুসম্পন্ন হইয়াছে। সন্তানের নাম শ্রীমান্ জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র রাখা হইয়াছে। শ্রীযুক্ত নবদ্বীপচন্দ্র দাস আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছেন। এই উপলক্ষে কৈলাস বাবু সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রচার ফণ্ডে ১৲ টাকা দান করিয়াছেন, ঈশ্বর শিশুদিগকে দীর্ঘায়ু করুন।

বিবাহ—গত ১৯এ কার্ত্তিক কুষ্টিয়ার বাবু দুর্গাচরণ বিশ্বাসের ভ্রাতা বাবু কুঞ্জবিহারী বিশ্বাসের সহিত ময়মনসিংহের বাবু রামদুর্ল্লভ মজুমদারের কন্যা শ্রীমতী সুবালা মজুমদারের শুভ বিবাহ সম্পন্ন হইয়াছে। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী আচার্য্যের কার্য্য করেন। এতদুপলক্ষে রামদুর্ল্লভ বাবু নিম্নলিখিতরূপ দান করিয়াছেন; সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রচার বিভাগ ১০৲ দাতব্যবিভাগ ৩৲ সাধনাশ্রম ২৲ গৃহতাড়িত ব্রাহ্মদিগকে ২৲ দাসাশ্রম ২৲ ব্রাহ্মবালক বোর্ডিং ২৲ বালিকা বোর্ডিং ৫৲, মোট ২৬৲ টাকা।

২রা অগ্রহায়ণ কলিকাতার মন্দিরে আর একটি বিবাহ হইয়া গিয়াছে। পাত্র ভবানীপুর নিবাসী বাবু গিরিশচন্দ্র দে, পাত্রী টাকীর বাবু কেদারনাথ রায়ের কন্যা শ্রীমতী প্রভাবতী রায়। বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত এই বিবাহে আচার্য্যের কার্য্য করেন। উভয় বিবাহই ৩ আইন অনুসারে রেজেষ্টারী হইয়াছে। পরমেশ্বর নব দম্পতিদিগকে আশীর্ব্বাদ করুন।

উৎসব—সিন্দুরিয়াপটি পারিবারিক ব্রাহ্মসমাজের বার্ষিক ব্রহ্মোৎসব গত ১১ই অগ্রহায়ণ সম্পন্ন হইয়াছে। প্রাতঃকালে বাবু আদিনাথ চট্টোপাধ্যায় উপাসনা করেন, রাত্রিতে বাবু কেদারনাথ রায় উপাসনা করেন। উপাসনান্তে দুই বেলায়ই প্রীতি-ভোজন হয়।

প্রদেশীয় ব্রাহ্মসমাজ।

উৎসব—শিলং ব্রাহ্মসমাজের ঊনবিংশতিতম উৎসব নিম্নলিখিত প্রণালী অনুসারে সম্পন্ন হইয়াছে;—

৪ঠা নবেম্বর শনিবার—রাত্রে উদ্বোধন। বাবু রাচন্দ্র চৌধুরী উপাসনা এবং উপদেশ প্রদান করেন।

৫ই রবিবার—প্রাতে লাবান উপাসনা-সমাজে উপাসনা হয়। বাবু নীলমণি চক্রবর্ত্তী আচার্য্যের কার্য্য করেন এবং বেলা ৩টার সময় শিলং ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে "বিশ্বাস" সম্বন্ধে বাঙ্গালায় বক্তৃতা করেন। তৎপরে তিনি উপাসনা করেন।

৬ই সোমবার—রাত্রে বাবু সদয়াচরণ দাস মহাশয়ের বাড়ীতে উপাসনা হয়। নীলমণি বাবু পাঠ ও উপাসনা করেন।

৭ই মঙ্গলবার—প্রাতে লাবানে পথে পথে উষাকীর্ত্তন হয়। বাবু লালমাধব বসু মহাশয়ের বাড়ীতে গিয়া নীলমণি বাবু প্রার্থনা করেন। মধ্যাহ্নে মহিলা সমাজের উৎসব হয়। রাত্রে বাবু নবগোপাল দত্ত সমাজ মন্দিরে ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ ও প্রার্থনা করেন।

৮ই বুধবার—উৎসবের দিন। বাবু রাচন্দ্র চৌধুরী প্রাতে সমাজ মন্দিরে উপাসনা এবং উপদেশ প্রদান করেন। মধ্যাহ্নে "ঈশ্বরের প্রতি প্রেম" সম্বন্ধে আলোচনা হয়। তৎপরে কীর্ত্তন ও উপাসনা হয়। বাবু নীলমণি চক্রবর্ত্তী উপাসনা করেন এবং "প্রভুকে জীবনে গৌরবান্বিত কর" এই বিষয়ে উপদেশ প্রদান করেন।

৯ই বৃহস্পতিবার—রাত্রে বাবু রাচন্দ্র চৌধুরীর বাড়ীতে কীর্ত্তন হয়। বাবু নীলমণি চক্রবর্ত্তী প্রার্থনা করেন।

১০ই শুক্রবার—রাত্রে বাবু তারকনাথ রায় মহাশয়ের বাড়ীতে উপাসনা হয়। বাবু নীলমণি চক্রবর্ত্তী উপাসনা করেন।

১১ই শনিবার—বেলা ৪॥টার সময় মৌখার ব্রাহ্মসমাজে "ঈশ্বরে মানবীয় ভাব আরোপ" এই বিষয়ে খাসিয়া ভাষায়

এক বক্তৃতা করেন। পরে রাত্রে বাবু তারিণীচরণ নন্দীর বাসায় কীর্ত্তনাদি হয়। বাবু শরৎচন্দ্র চক্রবর্ত্তী প্রার্থনা করেন।

১২ই রবিবার—প্রাতে লাবান উপাসনা সমাজে উপাসনা হয়। বাবু রাইচরণ দাস উপাসনা করেন। মধ্যাহ্নে নির্জ্জন পাহাড়ে প্রার্থনাদি হয়। বাবু সদয়াচরণ দাস এবং বাবু রাচন্দ্র চৌধুরী প্রার্থনা করেন। অপরাহ্নে সমাজ মন্দিরে উপাসনা হয়। বাবু নীলমণি চক্রবর্ত্তী উপাসনা করেন এবং "স্পর্শমণি" এই বিষয়ে উপদেশ প্রদান করেন।

দুর্ভিক্ষ।

ইতিপূর্ব্বে আমরা জানাইয়াছি যে, পূর্ব্ববাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত রিলিফ ফণ্ডের জন্য আমরা কিছু টাকা পাঠাইয়াছি। সেই কমিটী দুর্ভিক্ষের সাহায্যার্থে বিক্রমপুরে লোক প্রেরণ করিয়াছিলেন, সেই লোক উত্তর বিক্রমপুরে ৩৮ খানা গ্রামে সাহায্য করিয়াছেন। ঐ ৩৮ খানা গ্রামে ১১২৮ জন লোককে সাহায্য করা হইয়াছে, ইহাদের মধ্যে পুরুষ ১০৬ জন, স্ত্রীলোক ৩৯৬ জন, বালক বালিকা ৬২৬ জন, মোট ১১২৮ জন। এই কার্য্যে ব্রাহ্মসমাজের টাকা হইতে বেশী টাকা ব্যয় হয় নাই। মুন্সিগঞ্জের ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট মহাশয় ব্রাহ্মসমাজের লোকের হাতে যে টাকা দিয়াছেন, সেই টাকা দ্বারাই অধিকাংশ স্থানে সাহায্য করা হইয়াছে। ঐ ৩৮ খানা গ্রাম ভিন্ন আরও দুইটী গ্রামের দুইটী ভদ্র পরিবারকে গোপনে সাহায্য করা হইয়াছে। তৎপরে বাবু কাশীচন্দ্র ঘোষালকে সাহায্যার্থে প্রেরণ করা হইয়াছিল।

প্রথমাবস্থায় দুর্ভিক্ষের প্রকোপ অত্যন্ত প্রবল হইয়াছিল, সেই সময় মুন্সিগঞ্জের ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট মহাশয়ের যত্নে অনেক লোকের কষ্ট নিবারণ হইয়াছিল।

ভদ্রলোক এবং কৃষকদিগের অধিক কষ্ট হয় নাই। চাউল দুর্ম্মূল্য হওয়াতেই তাহাদের যাহা কিছু কষ্ট হইয়াছিল। অনাথা বিধবাদিগের ভয়ানক কষ্ট হইয়াছিল, দুঃখের বিষয় ইঁহারা দিনের পর দিন উপবাস করিয়া কাটাইয়াছেন, তথাপ প্রকাশ্যে সাহায্য গ্রহণ করিতে প্রস্তুত হন নাই। আমাদের এজেণ্ট গোপনে অনেক চেষ্টা করিয়া কয়েকটী বিধবার সাহায্য করিয়াছেন। বিক্রমপুরে এখন ধান পাকিতেছে, ইহাতে শ্রমজীবীদিগের কতক পরিমাণে সুবিধা হইতেছে।

দানপ্রাপ্তি স্বীকার—কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করা যাইতে যে, বিক্রমপুরের দুর্ভিক্ষ নিবারণার্থে নিম্নলিখিত দান পাওয়া গিয়াছে :—

গত প্রকাশিতের পর।

বাবু অবিনাশচন্দ্র ঘোষ	এসেনশোল	১৲
" আশুতোষ রায়	ঐ	॥০
" সিদ্ধেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়	ঐ	।০
একজন বন্ধু		২৲
মজুমদার এণ্ড কোং	কলিকাতা	১৲
বাবু কুঞ্জলাল ঘোষ হইতে প্রাপ্ত বাবু দুর্গাকান্ত চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক সংগৃহীত মারঘারিটা	আসাম	৫০৲
বাবু কালীকৃষ্ণ বসাক	কলিকাতা	১৲
" উমাকান্ত দাস	ঐ	৮৲
" মাখনলাল ঘোষ	ঐ	।০
" দেবেন্দ্রলাল মুখোপাধ্যায়	ঐ	।⁄০
" দেবেন্দ্রনাথ চৌধুরী	ঐ	।০
" দেবেন্দ্রনাথ রায়	ঐ	।০
" ফণীন্দ্রনাথ বসু	ঐ	১৲
" দীননাথ গুপ্ত	হাজারিবাগ	২৫৲
মিঃ এম, এল, শীল মারফত বাবু কালীকৃষ্ণ বসাক		১৲
বাবু দীননাথ গাঙ্গুলী	ধারওয়ার	৫৲
হীরালাল হালদার	কলিকাতা	২৲
কালীপ্রসন্ন বসু	ঐ	॥০
কুঞ্জবিহারী মিত্র	সইদপুর	২৲
উদয়চরণ মল্লিক	কলিকাতা	১৲
বনমালী ধর	ঐ	॥০
দুর্গানারায়ণ বসু কর্ত্তৃক সংগৃহীত	মেদিনীপুর	৪।০
চন্দ্রশেখর ঘোষাল	আজমির	১৲
বিনোদলাল মুখোপাধ্যায়	ঐ	১৲
লক্ষ্মণ সিং	দার্জ্জিলিং	৪৲
হরিনাথ রায় কর্ত্তৃক সংগৃহীত	চাইবাসা	৭৷৶
		১২০৮⁄০
	পূর্ব্ব প্রকাশিত	৪২৯৮৶০
		৫৫০॥৶০

বিজ্ঞাপন।

তত্ত্বকৌমুদী ও ইণ্ডিয়ান মেসেঞ্জারের গ্রাহক এবং সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্যমহোদয়গণকে পত্র লিখিয়া এবং পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়া আমরা বড় আশা করিয়াছিলাম যে তাঁহারা স্ব স্ব দেয় টাকা অনুগ্রহপূর্ব্বক যথাসময়ে এবং সত্বর পাঠাইয়া সমাজের অনেক অভাব ও দুঃখ দূর করিবেন। বৎসর ত শেষ হইতে চলিল, এখন দেখি অনেক সভ্য ও গ্রাহকের হিসাবে বিস্তর অনাদায় রহিয়াছে। যাঁহাদিগকে ধারে পুস্তক বিক্রয় করা হইয়াছিল তাঁহাদিগের নিকট হইতে, এবং মফস্বলস্থ কোন কোন এজেণ্টের নিকট হইতে সমস্ত বৎসরে যে টাকা পাইয়াছি তাহা নিতান্ত সামান্য।

আগামী মাঘোৎসবের পূর্ব্বে সমাজের অনেক দেনা পরিশোধ করিতে হইবে, এবং অন্যান্য নানা প্রকারের ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে হইবে। এক্ষণে সমাজের সভ্য ও সহযোগী মহোদয়গণ তাঁহাদিগের স্বীকৃত চাঁদা ও পুস্তকের মূল্য, এবং পত্রিকাদ্বয়ের গ্রাহক মহোদয়গণ পত্রিকাদ্বয়ের মূল্য পাঠাইতে আর যেন বিলম্ব না করেন তাঁহাদিগের সকলেরই নিকট আমার এই বিনীত প্রার্থনা।

পত্রিকার অনেক বৎসরের মূল্য বাকী আছে। সুতরাং তাঁহাদিগের পত্রিকা বন্ধ করা কর্ত্তব্য এইযুক্তি অনুসরণ করিতে আমরা আদৌ প্রস্তুত নাই। একজন গ্রাহকও যদি তাহাই বাঞ্ছনীয় মনে করেন, আমারা নিতান্তই মর্ম্মাহত হইব।

সাঃ ব্রাহ্মসমাজ
২১১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট,
কলিকাতা ৩০ নবেম্বর ১৮৯৩

শ্রীঅঘোরনাথ মুখোপাধ্যায়
সহকারী সম্পাদক
সাঃ ব্রাঃ সমাজ।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অধ্যক্ষ সভার বিগত তৃতীয় ত্রৈমাসিক অধিবেশনে সাঃ ব্রাঃ সমাজের সঙ্গীত, পুস্তক, বক্তৃতা ও উপদেশাদি হইতে হরি প্রভৃতি পৌত্তলিক নাম উঠাইয়া দিবার নিমিত্ত যে প্রস্তাব উপস্থিত হইয়াছিল, অধ্যক্ষ সভা কার্য্যনির্ব্বাহক সভাকে সে সম্বন্ধে কর্ত্তব্য কি তাহা স্থির করিতে অনুরোধ করিয়াছেন। বিষয়টি অতিশয় গুরুতর। এনিমিত্ত কার্য্যনির্ব্বাহক সভা এরূপ স্থির করিয়াছেন যে এবিষয় সম্বন্ধে ব্রাহ্ম মাত্রেরই মতামত সংগ্রহ পূর্ব্বক যথা সম্ভব নির্দ্ধারণ স্থির করিতে চেষ্টা করিবেন। অতএব কলিকাতা এবং মফঃস্বলস্থ ব্রাহ্মসমাজ এবং ব্রাহ্মমাত্রেই অনুগ্রহ করিয়া এ সম্বন্ধে তাঁহাদিগের মতামত নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইলে আমরা অত্যন্ত উপকৃত ও বাধিত হইব।

সাঃ ব্রাঃ সমাজ কার্য্যালয়
২১১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট
কলিকাতা ৩০ নবেম্বর ১৮৯৩

শ্রীঅঘোরনাথ মুখোপাধ্যায়।
সহকারী সম্পাদক, সাঃ ব্রাঃ সমাজ

২১১নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট ব্রাহ্ম মিশন যন্ত্রে শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দত্ত কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও ১৮ই অগ্রহায়ণ প্রকাশিত

ধর্ম্ম ও সমাজতত্ত্ব বিষয়ক পাক্ষিক পত্রিকা।

১৭শ সংখ্যা।
১৬শ ভাগ।

১লা পৌষ, শুক্রবার, ১৮১৫ শক, ব্রাহ্ম সম্বৎ ৬৪।

বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২৷৷৹
মফস্বলে ৩
প্রতি খণ্ডের মূল্য ৵৹

"যৎকল্যাণ মভিধ্যায়েৎ তত্রাত্মানং নিয়োজয়েৎ।"

"যাহা কিছু কল্যাণ বলিয়া জানিবে তাহাতে আপনাকে নিয়োগ করিবে।"

বিশাল জগৎ-তত্ত্ব কি তুমি বুঝিবে ?
দেখা বোঝা সকলি অসার,
প্রকৃতির যবনিকা তুমি উদ্ঘাটিবে
হেন সাধ্য কি আছে তোমার।

যে ভূমে দাঁড়ায়ে আছ, ওই পদতলে
লক্ষ রেণু ; এক রেণু লয়ে
দেখিতে বুঝিতে যাও, চিন্তার অতলে
মগ্ন হবে দিশা হারা হয়ে।

জীবনের আদি কোথা ? এই সূত্র ধরি
যাও জীবে দেখিতে বুঝিতে,
লাখ লাখ যুগ যাও কল্পনাতে তরি
এ সমস্যা রহি যাবে চিতে।

আপনা বুঝিতে যাও আদি অন্ত লয়ে,
কি বুঝিছ ? কে তুমি এখানে ?
এ গোলোক-ধাঁধা-মাঝে কোন্ পথ দিয়ে
আসিয়াছ কাহার সন্ধানে ?

কি দেখিবে ? কি বুঝিবে ? দেখা বোঝা যত,
পথ চলা আলোকে আঁধারে ;
ভাঙ্গিছে গড়িছে বিশ্ব যে শক্তি নিয়ত
তারি ক্রোড়ে সঁপ আপনারে।

আলোকে আঁধারে পথ যা কিছু দেখিছ,
তাহে চল ; আলোক আসিবে ;
ফেলিতে চরণ দেখ যে পথে রাখিছ,
আগু পিছু কি আর ভাবিবে ?

কেবা কি করেছে কবে আগু পিছু ভেবে ?
কে বেঁচেছে কেবা বাঁচায়েছে ?
বুনিয়ে বুদ্ধির জাল কে তরেছে তবে ?
গুটি-পোকা নিজে জড়ায়েছে।

বুনো না বুদ্ধির জাল আগু পিছু করি ;
কল্যাণেতে সদা লাগি রও ;
যে শক্তি পালিছে বিশ্ব সদা ক্রোড়ে ধরি
আগু পিছু তারি হাতে দেও।

সম্পাদকীয় মন্তব্য।

সরল পথ—জীবনের সরল পথ সকলেই চায় ; কিরূপে সে সরল পথ পাওয়া যায় ? বিশ্বাসী এবং নির্ভরশীল ব্যক্তিরাই এই সরল পথ পাইয়া থাকেন ; অপরের জন্য তাহা নহে। অভিসন্ধির সরলতা যেখানে, জীবন পথের সরলতা ও সেখানে। মনুষ্য সত্য ও সৎভিন্ন অন্য কিছু লাভ করিবার অভিসন্ধি রাখে বলিয়াই জীবনের পথ কুটিল হইয়া যায়। আর যে সাধুর চিত্তে সত্য ও সৎকে আশ্রয় করা ভিন্ন অন্য কামনা নাই, তাহার জীবনের পথ চিরদিন সরল। তাঁহার জীবনে যে বিপদ আসে না, বা তাহার প্রতি লোকের বিরাগ বা বিদ্বেষ বুদ্ধি জন্মে না, বা তাঁহাকে সময়ে সময়ে প্রলোভন জালে জড়িত হইতে হয় না, তাহা নহে ; এ সকলি তাঁহার পক্ষে সম্ভব এবং হয়ত ঘটিয়াও থাকে, কিন্তু তাঁহার হৃদয়ের মধ্যে কোন প্রকার অভিসন্ধি না থাকাতে সে প্রলোভন জাল তাঁহাকে আবদ্ধ করিতে পারে না ; বা সে বিদ্বেষ তাঁহাকে পথচ্যুত করিতে পারে না। পূর্ণেন্দু যেমন ক্ষণিক মেঘজাল হইতে মুক্ত হইয়া দ্বিগুণ শোভা ধারণ করে, সেইরূপ তাঁহার বিমল চরিত্রও সেই ক্ষণিক উপরাগ হইতে মুক্ত হইয়া অধিকতর সমুজ্জ্বল হয়। হয়ত তাঁহার জীবদ্দশাতে নানাবিধ কারণে লোকে তাঁহার মহত্ত্ব ও সাধুতা অনুভব করিতে সমর্থ হয় না। কিন্তু এই মর্ত্ত্য-লীলার অন্তে যখন তাঁহার স্মৃতি ও তাঁহার স্বর্ণোপম কার্য্য সকল এ জগতে পড়িয়া থাকে, তখন পরবংশীয় পুরুষেরা তাঁহার গুণাবলী স্মরণ করিয়া ও কীর্ত্তি কলাপ আলোচনা করিয়া মুগ্ধ হইতে থাকে। কত সাধু মহাজনের জীবনচরিতে এই কথার সাক্ষ্য প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। দৃষ্টান্তের জন্য আমাদিগকে দূরে যাইতে হইবে না। মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় ইহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। জীবদ্দশাতে তিনি স্বদেশবাসীদিগের কিরূপ বিরাগ ভাজন

হইয়াছিলেন তাহা পাঠক মাত্রেই অবগত আছেন। যখন হিন্দু স্কুল স্থাপনের সূচনা হয়, তখন সহরবাসী ভদ্রলোকেরা বলিয়াছিলেন যে, রামমোহন রায় কমিটীতে থাকিলে তাঁহারা সে কমিটীতে থাকিবেন না। তাঁহার প্রতি কলিকাতা সহরের বড়লোকদিগের বিদ্বেষবুদ্ধি এতই প্রবল ছিল। ইংলণ্ডে যখন রাজার মৃত্যু হয়, তখন হোরেস হেমান উইলসন্ সাহেব ভারতবর্ষ হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া ইংলণ্ডে বাস করিতেছিলেন। সুপ্রসিদ্ধ রামকমল সেন মহাশয়ের সহিত উইলসন সাহেবের অতিশয় প্রীতি ছিল। রাজার মৃত্যু হইলে ডাক্তার উইলসন রামকমল সেনকে সেই সংবাদ দিয়া শেষে লিখিলেন—"কিন্তু ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে, রামমোহন রায় সাধারণ ব্যক্তি ছিলেন না।" পাছে রামকমল সেন বিরক্ত হন এই ভয়ে এ কথাটাও যেন তিনি ভয়ে ভয়ে লিখিয়াছিলেন। রামমোহন রায়ের প্রতি লোকের এতই বিদ্বেষ ছিল। কিন্তু আজ সে বিদ্বেষ কোথায়? সমুদ্রতীরে শিশু-হস্ত-নির্ম্মিত বালুকাময় প্রাচীরের ন্যায় তাহা কালস্রোতে ধৌত হইয়া গিয়াছে। রামমোহন রায়ের গুণাবলী ও কীর্ত্তিকলাপ জাগ্রত রহিয়াছে আর সকলি কালগর্ভে বিলীন হইয়াছে। ইহার কারণ কি, রামমোহন রায় সুখের ও দুঃখের কুটিল পথ পরিত্যাগ করিয়া কর্ত্তব্যের সরল পথ অবলম্বন করিয়াছিলেন। আর এই সরল পথে চলিবার যে পুরস্কার তাহাও তিনি উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন "লোকে আমার যতই প্রতিকূলতাচরণ করুক না কেন, এই চিন্তা জনিত আত্মপ্রসাদ হইতে কেহই আমাকে বঞ্চিত করিতে পারিবে না যে, আমার অভিসন্ধি তাঁহার নিকট বিদিত যিনি নির্জ্জনে দর্শন করিয়া সজনে পুরস্কৃত করেন।" এই সংকল্পের বিশুদ্ধতাই তাঁহার সর্ব্ব প্রধান অস্ত্র স্বরূপ ছিল, এবং ইহাই তাঁহার পথের সরলতাকে রক্ষা করিয়াছিল।

সত্যাদর—কিছুদিন হইল কলিকাতা সহরে উপর্য্যুপরি কয়েক দিন আহিফেন কমিশনের অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। উক্ত কমিশনের সহিত ইংলণ্ডের আহিফেন ব্যবসায় নিবারণী সভার সম্পাদক আলেকজণ্ডার সাহেব আসিয়াছিলেন। তিনি ব্রাহ্মদিগের দ্বারা অনুরুদ্ধ হইয়া বিগত ৪ঠা ডিসেম্বর সোমবার সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে সুরাপান নিবারণ সম্বন্ধে একটী বক্তৃতা করিয়াছিলেন। বক্তৃতার মধ্যে অনেক সারবান কথা ছিল। কিন্তু তাঁহার মুখে একটী কথা শুনিয়া আমরা অতিশয় লজ্জিত ও দুঃখিত হইয়াছি। তিনি বক্তৃতার মধ্যে দুঃখ করিয়া বলিলেন, আমি এদেশে আসিয়া এদেশের ভদ্রলোকদিগের মুখে অনেক ভাল ভাল ও বড় বড় কথা শুনিয়াছি, কিন্তু অনুসন্ধান দ্বারা পরে বুঝিতে পারিয়াছি যে, তাহার অধিকাংশ কপটতাপূর্ণ। এদেশীয় শিক্ষিত লোকদিগের কপটতা দেখিয়া অতিশয় দুঃখিত হইয়াছি। আলেকজণ্ডার সাহেব একজন বারিষ্টার; তিনি স্বীয় বিশ্বাসের জন্ম নিজ ব্যবসায় পরিত্যাগ করিয়া কেবল জনহিতকর কার্য্যে জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন; সুরাপান নিবারণের উদ্দেশে আফ্রিকা দেশে গমন করিয়াছিলেন; সুতরাং তাঁহার পক্ষে কপটতা দেখিয়া মর্ম্মাহত হওয়া কিছুই বিচিত্র নহে। আমাদের লজ্জা ও ক্ষোভের বিষয় এই যে, একজন বিদেশীয় ভদ্রলোক এদেশে কয়েক দিনের জন্ম আসিয়া এদেশীয় শিক্ষিত ব্যক্তিদিগের সহিত মিশিয়া এই দেখিয়া গেলেন যে, ইংরাজী শিক্ষাতে ইহাদিগকে কপট করিয়াছে। তিনি এই ধারণা লইয়া স্বদেশে ফিরিয়া যাইবেন—ইহাই দুঃখের বিষয়। এই কপটতা এক প্রকার ব্যাধির ন্যায় অনেকের চরিত্রে প্রবিষ্ট হইয়াছে, অপরকে প্রবঞ্চনা করিতে করিতে অনেকের জীবনে প্রবঞ্চনাই স্বভাব ও সত্য-প্রিয়তা তাহার ব্যতিক্রম স্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এমন কি বর্ত্তমান সময়ে যে অনেকের মুখে স্বধর্ম্ম ও স্বজাতির প্রতি অনুরাগের কথা শুনিতে পাওয়া যায়, তাহার ভিতরেও কপটতা প্রবিষ্ট হইয়া রহিয়াছে। এই জন্ম সে সকল কথারও কোনও প্রকার শক্তি জাগিতেছে না। এই অন্তঃসারবিহীন কপটতা মানব-চরিত্র হইতে অন্তর্হিত না হইলে কোনও প্রকার মহৎ ও উচ্চ ভাব তাহাকে অধিকার করিতে পারে না। এজগতে মহত্ত্ব ও মনুষ্যত্ব কপটের জন্ম নহে। চিন্তা, বাক্য ও কার্য্যগত সত্যতা না থাকিলে মনুষ্যত্ব জাগ্রত হয় না।

ক্ষুদ্র কার্য্যে মহৎ ভাব—শ্রম বিভাগের দৃষ্টান্ত দিতে হইলেই লোকে সচরাচর আলপিন নির্ম্মাণ প্রণালীর দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া থাকে। এক পয়সাতে হয় ত চল্লিশ পঞ্চাশটী আলপিন পাওয়া যাইতে পারে; কিন্তু ঐ আলপিন গুলি কত লোকের শ্রমের ফল স্বরূপ? একজন লোহার তার কাটিয়াছে, একজন ঘষিয়াছে, একজন অগ্রভাগ সূক্ষ্ম করিয়াছে, একজন আলপিনের মাথাটী করিয়াছে। এইরূপে নানা হস্তের ভিতর দিয়া একটী আলপিন প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছে। কিন্তু প্রত্যেকে যদি স্বীয় স্বীয় অংশ সুচারুরূপে সম্পন্ন না করে তাহা হইলে সমগ্র আলপিনটী সুন্দর ও উৎকৃষ্ট হইতে পারে না। ধর্ম্ম-সমাজের কার্য্যকেও এই ভাবে দেখিতে হইবে। আমাদের যাহার প্রতি যে কার্য্যের ভার আছে, আমরা প্রত্যেকে যদি তাহা সুচারুরূপে সম্পন্ন না করি, তাহা হইলে সমগ্র কার্য্যটী কখনই সুন্দর ও উৎকৃষ্ট হইতে পারে না। এই ভাবটা যদি আমাদের সকলের হৃদয়ে প্রবেশ করে, তাহা হইলে সমাজের বিশেষ কল্যাণ হয়। এক অর্থে ধর্ম্মসমাজের সকল কাজই সমান, কারণ সকল কাজই ঈশ্বরের কাজ, এবং তদ্দ্বারা তাঁহারই সেবা হয়। কিন্তু আর এক দিক দিয়া দেখিলে সকল কাজ সমান নহে, কোনও কাজ ক্ষুদ্র ও সামান্য এবং কোনও কাজ মহৎ। যাঁহার হস্তে ক্ষুদ্র কাজটীর ভার পড়িয়াছে তিনি যদি মনে করেন, এই সামান্য কাজে আবার মনোযোগী হইব কি? বড় কাজ যখন আসিবে তখন সুচারুরূপে সম্পন্ন করিব এবং নিজের সমগ্র শক্তি সামর্থ্য নিয়োগ করিব, তাহা হইলে সমাজের অধিকাংশ কার্য্যই দুর্দ্দশাপন্ন হইবে। যাঁহার হস্তে ক্ষুদ্র কার্য্যটীর ভার পড়িয়াছে, তাঁহাকেও মহৎভাবে দেখিতে হইবে। তিনি স্মরণ রাখিবেন যে, তাঁহার

চরিত্রের উন্নতি বা অধোগতি তদুপরি নির্ভর করিতেছে। তিনি যদি দায়িত্ববিহীন ভাবে, ঔদাসীন্যের সহিত সে কার্য্যটী সমাধা করেন, তাহা হইলে ঐ প্রকারে কার্য্য করা তাঁহার অভ্যাস হইয়া যাইবে। একবার দায়িত্ববোধের শিথিলতা জন্মিলে, তিনি যে কার্য্যেই প্রবৃত্ত হইবেন, কোনটাই সুচারুরূপে করিতে পারিবেন না; তাঁহার বিবেক অনুজ্জ্বল হইয়া যাইবে এবং তিনি ঈশ্বরের নিকটে অপরাধী ও মানবের অবজ্ঞার পাত্র হইবেন।

জীবনের মধ্য পথ—যুবরাজ সিদ্ধার্থ যখন পিতৃগৃহ ত্যাগ করিয়া তপস্যার্থে নিরঞ্জন নদীর অভিমুখে গমন করেন, তখন পাঁচজন ব্রাহ্মণ যুবক তাঁহার সমভিব্যাহারী হইয়াছিলেন। ইহাঁরাই সেই অরণ্য মধ্যে তাঁহার কঠোর তপস্যার সাক্ষী ও সঙ্গী ছিলেন। কিন্তু যে দিন বুদ্ধ কঠোর তপস্যাকে বিফল জানিয়া পরিত্যাগ করিলেন ও নিয়মিত অন্নপান গ্রহণ করিতে লাগিলেন, সেই দিন তাঁহার প্রতি উক্ত পাঁচজন ব্রাহ্মণ সন্ন্যাসীর মন চটিয়া গেল। তাহারা তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া বারাণসীর অভিমুখে প্রস্থান করিল। শাক্য সিংহ তাহাতে ভগ্নহৃদয় না হইয়া দ্বিগুণ প্রতিজ্ঞার সহিত পুনরায় গভীর ধ্যানে নিমগ্ন হইলেন। যখন তিনি সিদ্ধিলাভ করিলেন, তখন সর্ব্বাগ্রে সেই পঞ্চ ব্রাহ্মণের অন্বেষণে বহির্গত হইলেন এবং কাশীধামে তাহাদিগকে প্রাপ্ত হইয়া তাহাদিগের নিকট নিম্নলিখিত ভাবে স্বীয় মনোগত ভাব ব্যক্ত করিলেন:—"হে ব্রাহ্মণগণ! দুই অতিরিক্ত সীমাকে পরিত্যাগ করিতে হইবে; একদিকে, যে ইন্দ্রিয় সুখাসক্তির দ্বারা চিত্তকে কলুষিত করে, তাহাকে বর্জ্জন করিতে হইবে; অপরদিকে যে কঠোর তপস্যা শরীরকে ভগ্ন ও চিত্তকে অশান্তি পূর্ণ করে, তাহাকেও পরিহার করিতে হইবে।"

ব্রাহ্মধর্ম্ম মহাত্মা শাক্যসিংহের প্রদর্শিত এই পথকে অবলম্বন করিয়াই চলিতেছেন। কিন্তু এই পথ অতি কঠিন পথ; তাহা আমরা প্রত্যেকে প্রতিদিন অনুভব করিতেছি। আমরা প্রতিদিন বলিয়া থাকি যে সংসারে বাস করিব অথচ তাহাতে লিপ্ত হইব না। এই মর্ম্মে কত উপদেশ আমাদের বেদী হইতে প্রদত্ত হইয়া থাকে; কত দৃষ্টান্ত আমাদের সমক্ষে প্রদর্শিত হইয়া থাকে। রাজর্ষি জনকের দৃষ্টান্ত আমরা কতবার প্রদর্শন করিয়াছি ও সে বিষয়ে কতবার আলোচনা করিয়াছি। বর্ত্তমান সময়ের একজন ধর্ম্মোপদেষ্টা সর্ব্বদা বলিতেন যে ধনীর গৃহের দাসী যেরূপে ধনী সন্তানের সেবা করে, সেইরূপে সংসারের সেবা কর। অর্থাৎ ধনীর দাসী যেমন ধনীর সন্তানকে খাওয়ায় ধোওয়ায়, নাচায়, আদর করে; জননী নিজ সন্তানকে যাহা করিয়া থাকে, তাহা সমুদায় করে, এবং হয় ত অন্তরের সহিত প্রীতিও করে, কিন্তু ইহা বিলক্ষণ স্মরণ থাকে যে, সে সন্তান তাহার নহে, সে বড় হইলেই তাহার হস্ত হইতে যাইবে। সেইরূপ সংসারকে খাওয়াও ধোওয়াও নাচাও আদর কর, কিন্তু সর্ব্বদা স্মরণ রাখ যে, তাহা তোমার নহে, এ দৃষ্টান্তটীও অতি সুন্দর তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু কাজে দেখিতেছি এ ভাবে সংসারকে সেবা করার ন্যায় কঠিন কাজ অতি অল্পই আছে। যাঁহারা বলিতেছেন, সংসারে থাকিয়া ঈশ্বরের সেবা করিব তাঁহাদের অনেকে বিষয় সুখের মাত্রাকে এত বাড়াইতেছেন, যে ঈশ্বর-সেবা চাপা পড়িয়া যাইতেছে। যীশু বলিয়াছেন "কেহই দুই প্রভুর সেবা করিতে পারে না, বিষয় ও ঈশ্বর উভয়কে এক সঙ্গে সেবা করা যায় না।" ব্রাহ্মগণ ইহার উত্তরে বলিয়াছেন—ঠিক কথা। দুই প্রভু রাখিলে সেবা করা কঠিন; কিন্তু ঈশ্বরকে একমাত্র প্রভু করিয়া সংসারকে তাঁহার অনুগত করিয়া কেন সেবা করা যাইবে না। একথা ত শুনিতে বেশ। কিন্তু এভাবে কার্য্য করা কত কঠিন। অনেক হিন্দু গৃহস্থের বাড়ীতে দেখা যায়, শয়ন ঘর, বৈঠকখানা, পাঠাগার প্রভৃতি বড় বড়, ঠাকুর ঘরটী অতি সংকীর্ণ, এক পার্শের একটী কুঠরী। তেমনি অনেক ব্রাহ্মের জীবনে ইহা কি সত্য নহে যে, বিষয়সুখ সমুদায় স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে, ব্রাহ্মধর্ম্ম অতি সংকীর্ণ একটী কুঠরীর মধ্যে বদ্ধ হইয়াছে? আমরা নিজ নিজ জীবন যতই আলোচনা করি ততই ভগবদ্গীতার নিম্নলিখিত বচনটী স্মরণ হয়:—

> ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষূপজায়তে।
> সঙ্গাৎ সংজায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে॥
> ক্রোধাদ্ভবতি সংমোহঃ সংমোহাৎ স্মৃতি-বিভ্রমঃ।
> স্মৃতি ভ্রংশাদ্ বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি॥

অর্থ—নিরন্তর বিষয় মধ্যে বাস ও বিষয়ের ধ্যান করিতে করিতে মানবের তাহাতে আসক্তি জন্মে; আসক্তি হইতে কামনার উদয় হয়; কামনা হইতে ক্রোধের উৎপত্তি হয়; ক্রোধ হইতে চিত্ত-বিভ্রম জন্মে; চিত্ত-বিভ্রম হইতে স্মৃতি ভ্রংশ; স্মৃতি ভ্রংশ হইতে বুদ্ধিনাশ; বুদ্ধিনাশ হইতে মহৎ-বিনাশ; অবনতির এই ক্রম।

কি উপায় অবলম্বন করিলে এই স্বাভাবিক ক্রম বিনাশকে বাধা দিতে পারা যায় ও জীবনের মধ্যপথ অবলম্বন করিয়া চলা যায়, তাহা গভীর চিন্তার বিষয়। আমাদের বোধ হয় জীবনের আদর্শকে উন্নত করিতে না পারিলে এবং সুখ ও দুঃখের ভূমিকে ত্যাগ করিয়া কর্ত্তব্যের ভূমির উপরে দণ্ডায়মান হইতে না পারিলে এই মধ্যপথ ধরিতে পারা যায় না।

ব্রাহ্মধর্ম্মের উদারতা—শেক সাদী প্রণীত বোস্তাঁ গ্রন্থে নিম্নলিখিত আখ্যায়িকাটী প্রাপ্ত হওয়া যায়; এই আখ্যায়িকাটী কনওয়ে সাহেব প্রণীত গ্রন্থে সংগৃহীত হইয়াছে। আখ্যায়িকাটী এই:—একবার য়িহুদী জাতির আদি পিতা ইব্রাহিম সাত দিন উপবাস করিয়া রহিলেন। উপবাসান্তে সংকল্প করিলেন যে, একজন অতিথিকে আহার না করাইয়া আহার করিবেন না। এই সংকল্প করিয়া তিনি উৎসুক চিত্তে মরুর অভিমুখে চাহিয়া রহিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে দেখিলেন যে, একজন অতি প্রাচীন ও জরাজীর্ণ লোক তাঁহার ভবনাভিমুখে আগমন করিতেছে। ঐ বৃদ্ধকে দেখিয়া ইব্রাহিম অতিশয় আপ্যায়িত হইলেন এবং অতি সমাদর পূর্ব্বক অভ্যর্থনা করিয়া নিজ ভবনে গ্রহণ করিলেন। ক্রমে

আহারের সময় উপস্থিত হইলে, যখন অন্ন ব্যঞ্জন আনীত হইল তখন ইব্রাহিম তাঁহার প্রথানুসারে পরমেশ্বরকে ধন্যবাদ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন দেখা গেল, যে সেই বৃদ্ধ তাঁহার পরিবার পরিজনের সহিত স্তুতিবাদে যোগ দিলেন না। ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করাতে ঐ বৃদ্ধ বলিলেন যে, তিনি অগ্নির উপাসক তাঁহাদের সম্প্রদায়ে আহারের পূর্ব্বে ও প্রকার স্তুতি করিবার নিয়ম নাই। তখন ইব্রাহিম অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া সেই বৃদ্ধকে তাড়াইয়া দিলেন। বৃদ্ধ চলিয়া গেলে এক দেবদূত হঠাৎ ইব্রাহিমের নিকট প্রকাশিত হইয়া বলিলেন—"ইব্রাহিম প্রায় শত বৎসর কাল প্রভু পরমেশ্বরের করুণা, সূর্য্য কিরণ, বৃষ্টিধারা, ও অন্ন পানের আকারে ঐ ব্যক্তিকে প্রতিপালন করিয়াছে; তুমি সামান্য মতগত পার্থক্য নিবন্ধন উহাকে তাড়াইয়া দিলে?" এই বলিয়া দেবদূত অন্তর্হিত হইলেন। ইহা অতি প্রাচীন উপদেশ, এবং অতি সামান্য কথা; কিন্তু সামান্য কথাও স্মরণ রাখা কত কঠিন। আমরা কতবার এই সামান্য উপদেশ ভুলিয়া সংকীর্ণতার মধ্যে পতিত হই। একজন এদেশীয় ব্রাহ্ম ইংলণ্ড বাস কালে একবার ব্রিষ্টল নগরে যাইতে ইচ্ছা করিলেন। সে নগরে তাঁহার পরিচিত কোনও পরিবার ছিল না। তাঁহার লণ্ডনস্থ কোনও ইংরাজ বন্ধুর এক ভগিনী ব্রিষ্টলে বাস করেন। উক্ত লণ্ডনস্থ ইংরাজ বন্ধু প্রস্তাব করিলেন যে, তাঁহারা উভয়ে ভগিনীর বাটীতে গিয়া থাকিবেন। তদনুসারে তাঁহার ভগিনীকে লেখা হইল। তাঁহার ভগিনীপতি তখন গৃহে ছিলেন না। ভগিনীপতির সহিত পরামর্শের অপেক্ষা না করিয়াই ভগিনী লিখিলেন, "উত্তম কথা, তোমরা এস আমরা অতিশয় সুখী হইব।" কিন্তু যখন দুই বন্ধুতে ব্রিষ্টল যাত্রা করিতেছেন তখন টেলিগ্রাম আসিল যে, সে গৃহে ব্রাহ্মবন্ধুর আতিথ্য গ্রহণ সম্ভব নহে। যাহা হউক অন্য প্রকার বন্দোবস্ত করিয়া তাঁহারা ব্রিষ্টলে গমন করিলেন। ব্রিষ্টলে গিয়া অনুসন্ধান দ্বারা জানিতে পারিলেন, তাঁহার ভগিনীপতি একজন গোঁড়া খ্রীষ্টান, তিনি আসিয়া বাইবেল অনুসন্ধান করিয়া কি এক বচন পাইয়াছেন, যাহাতে একজন খ্রীষ্টাবিশ্বাসী ব্যক্তিকে আতিথ্যে গ্রহণ করা উচিত বোধ হয় নাই। যাহা হউক লোকের ধর্ম্ম বিশ্বাসের উপরে কাহারও হাত নাই। কিন্তু যে প্রকার ভাব হইতে উক্ত খ্রীষ্টীয় গৃহস্থ একজন ব্রাহ্মকে স্বীয় ভবনে স্থান দিতে পারিলেন না, সেই প্রকার ভাব কি আমাদেরও অন্তরে অনেক সময়ে কাজ করে না? ব্রাহ্মধর্ম্মের ন্যায় উদার ধর্ম্ম যাঁহারা গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদের প্রেমের বাহু সর্ব্ব সম্প্রদায়ের লোককে আলিঙ্গন করিবার জন্য বিস্তৃত থাকিবে, ইহাই লোকে দেখিতে আশা করে।

গুরুবাদ কিম্বা আচার্য্যবাদ—গুরুবাদ কিম্বা আচার্য্যবাদ ব্রাহ্মধর্ম্মের অনুমোদনীয়, তাহা বিশেষবিবেচ্য বিষয় নয়। কিন্তু ইহাই বিচারের বিষয় যাহা দ্বারা আত্মার কল্যাণ সাধিত হয়। যাহাতে মানবাত্মা ঈশ্বরের সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সম্বদ্ধ হইতে পারে, তাঁহার সম্মুখীন হইতে পারে তাহাই ব্রাহ্মধর্ম্মের অবলম্বনীয়। গুরুবাদ মানা অনাবশ্যক কিম্বা আচার্য্যবাদ মানা অনাবশ্যক, এরূপ নামের প্রভেদ জন্য নয়। কিন্তু যাহা মানবাত্মাকে তাহার স্বাধীন বিবেক-নির্দ্দিষ্ট পথে চলিতে বাধা প্রদান করে—যাহাতে তাঁহার বিচার শক্তিকে বিনষ্ট করিয়া বা সেরূপ বিচারের পথ অবরুদ্ধ করিয়া, ঈশ্বরের সহিত মানবাত্মার সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সম্বদ্ধ হইবার পথে ব্যাঘাত উপস্থিত করে, তাঁহাই ব্রাহ্মধর্ম্মের অননুমোদিত। শব্দের তারতম্য নয়, কিন্তু অবস্থা ও বস্তুগত তারতম্যই বিচার্য্য। প্রচলিত গুরুবাদ বা আচার্য্যবাদ মানবাত্মাকে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ঈশ্বরের সহিত সম্বদ্ধ হইতে এবং সাক্ষাৎভাবে তাঁহার সম্মুখীন হইতে বাধা দেয় বলিয়াই তাহা ব্রাহ্মগণের পরিত্যাজ্য।

নববিধানী বন্ধুগণ তাঁহাদের প্রতিবাদকারিগণের অর্থাৎ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কোন কোন লোককে প্রকাশ্যে বা গোপনে গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করিতে দেখিয়া আচার্য্যবাদের সমর্থন করিতেছেন। ব্রাহ্মসমাজ কোন দিন গুরুবাদ বা তাঁহারা যেরূপ আচার্য্যবাদ মানিতে বলেন, তাহা মানেন নাই। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের লোকদিগের মধ্যে কেহ কেহ যে পরিমাণে দূষণীয় গুরুবাদ অর্থাৎ যাহা উপরে নির্দ্দেশ করা গেল, এরূপ গুরুবাদের আশ্রয় লইয়াছেন সেই পরিমাণে তাঁহারা ব্রাহ্মধর্ম্ম হইতে বিচ্যুত হইয়াছেন। অথবা যাঁহারা তটস্থ হইয়া আছেন, তাঁহারাও ব্রাহ্মধর্ম্ম হইতে সেই পরিমাণে বিচ্যুত হইবার জন্য পা বাড়াইয়া আছেন। ব্রাহ্মধর্ম্ম সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ঈশ্বরের সহিত যোগের ধর্ম্ম। তাহাতে যে কোন ব্যক্তি বা বিষয় বাধা দেয় তাহাই পরিত্যাজ্য, তাহার নাম যাহাই হউক। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কেহ কেহ গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা নিতান্ত পরিতাপের কারণ সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহাতে নববিধানী বন্ধুদিগের সান্ত্বনা লাভের কোনই হেতু নাই। কারণ তাঁহারা গুরুবাদের অন্য নামকরণ করিয়াই কি রক্ষা পাইবেন, মনে করিতেছেন? তাহার সম্ভাবনা নাই। নববিধানী বন্ধুগণ এসম্বন্ধে তাঁহাদের পত্রে যেরূপ লিখিতেছেন, তাহা হইতেই বুঝা যাইতেছে যে, তাঁহারাও গুরুবাদের দূষণীয়তা হইতে রক্ষা পান নাই। প্রতিবাদকারিগণ কি আদেশবাদের প্রতিবাদ করিয়া পৃথক্ হইয়া পড়িয়াছিলেন? আদেশবাদ অগ্রাহ্য করা ব্রাহ্মধর্ম্মের বিধি নয়। কারণ তাহাই ব্রাহ্মগণের অবলম্বন এবং তাহাই শাস্ত্র। তাহাই ধর্ম্ম জীবনের আলো। তবে তাঁহারা কোন কোন আদেশের প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। সরল ভাবে বিবেকের অনুমোদনীয় নয় বলিয়া যদি কেহ কোন ব্যক্তির আদেশের প্রতিবাদ করে, তাহার অনুসরণ না করে, তাহা নিন্দনীয় নয়, বরং তাহাই ব্রাহ্মের কর্ত্তব্য। তাঁহারা যেরূপ আদেশবাদ বা আচার্য্যবাদ মানিতে বলেন, তাহাই ব্রাহ্মের পরম শত্রু। সেই শত্রুকে মিত্র বলিয়া মনে করা কখনই নিরাপদের অবস্থা নয়। তাঁহারা আদেশ বাদের সমর্থন করেন, প্রত্যেক ব্রাহ্মই করিয়া থাকেন। কিন্তু তাঁহারা কি প্রত্যেক ব্যক্তির নিকট প্রকাশিত আদেশ মান্য করিয়া চলেন? যদি চলিতেন, তাহা হইলে তাঁহাদের মন্দিরের বেদী লইয়া এমন বিবাদ

বিসংবাদ কেন? তাঁহারা যখন সকলের নিকট প্রকাশিত আদেশকে মান্য করা উচিত মনে করেন না, সেরূপ সকলের পক্ষেই সকল আদেশ মান্য করিয়া চলা উচিত না হইতে পারে। এরূপ অনুদারতা এবং ব্রাহ্মভাবের বিরোধিতাই অনিষ্টের কারণ এবং তাহাই ব্রাহ্মের পক্ষে অনমুমোদনীয়। আচার্য্য বাদ নামেই সব দোষ কাটিয়া যায় না। মূল বস্তুতে দূষণীয় ভাব রাখিয়া নাম পরিবর্ত্তন বা ভাষা পরিবর্ত্তন করিয়াই নিস্তার পাইবার উপায় নাই।

সম্পাদকীয় ও প্রাপ্ত প্রবন্ধ।

ধর্ম্ম প্রচার।

এক শ্রেণীর লোকে স্বভাবতঃ প্রাণের আবেগে বা প্রকৃতি-প্রদত্ত শক্তি দ্বারা চালিত হইয়া কবিতা এবং প্রবন্ধাদি লিখিয়া থাকেন। তাঁহাদিগকে কেহ উত্তেজিত করুক আর না করুক, কেহ উৎসাহ প্রদান করুক আর না করুক, তাঁহারা না লিখিয়া পারেন না বলিয়া লিখিয়া থাকেন। অনুরোধ উপরোধের জন্য তাঁহারা বসিয়া থাকেন না অথবা লোকে তাঁহাদের লিখিত কবিতা বা প্রবন্ধ আদর করে কি অনাদর করে তাহার প্রতিও তাঁহাদের দৃষ্টি নাই। আর এক শ্রেণীর লেখক আছেন তাঁহারা প্রয়োজন মত লিখিয়া থাকেন অথবা না লিখিলে কাজ চলে না বলিয়া লিখিয়া থাকেন। যেমন কোন ব্যক্তি একখানি সংবাদ-পত্র প্রকাশ করিতেছেন। প্রতিদিন বা সপ্তাহে তাঁহাকে কাগজ জনসমাজের নিকট উপস্থিত করিতে হয়। সুতরাং তাঁহাকে কিছু লিখিতেই হইবে। যে কোন রূপেই হউক পত্রিকার কলেবর পূর্ণ করিয়া সাধারণ্যে প্রচার করিতেই হইবে। তাঁহার অন্তরের অবস্থার প্রতিও দৃষ্টি করিবার সময় বা সুবিধা নাই। সে সময় তাঁহার অন্তর হইতে কোন সরস লেখা বাহির হওয়া সম্ভব কি না, সে বিচার করিবার অবসরও তাঁহার নাই। যেরূপেই হউক তিনি না লিখিয়া পারেন না। আবার অনুরোধ ও ফরমাইস্ দ্বারা চালিত হইয়াও লোককে অনেক সময় লিখিতে হয়। এই বিভিন্ন প্রকারের লেখক ও তাঁহাদের রচিত প্রবন্ধে যে প্রভেদ, ধর্ম্মপ্রচারে যাঁহারা প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাঁহাদের কার্য্যের মধ্যেও সেরূপ প্রভেদ দৃষ্ট হইয়া থাকে। যাঁহারা স্বভাবের তাড়নায়, প্রাণের আভ্যন্তরীণ উত্তেজনায় বশীভূত হইয়া স্বাভাবিক ভাবে ধর্ম্মপ্রচারে প্রবৃত্ত হন, তাঁহাদের প্রচারে আর যাঁহারা প্রয়োজন বলিয়া, ভাবিয়া চিন্তিয়া প্রচার-ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন—কোন বিশেষ সমাজের মত বা ভাব প্রচার করিতে ভারপ্রাপ্ত হইয়াছেন, প্রচার না করিলে তাঁহাদের দিনপাত হয় না, এই জন্য স্বভাবের প্রবল তাড়নায় নয়, কিন্তু লোকের অনুরোধ উপরোধ বা অনুরাগ বিরাগ দ্বারা চালিত হইয়া কার্য্য করেন; এই দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রচারে বহু প্রভেদ। এই দুই শ্রেণীর লোকের সহিত পরিচিত না হইয়া, তাঁহাদের স্বভাব, অবস্থা ও উদ্দেশ্যাদি অবগত না হইয়াও লোকে অতি সহজে কার্য্যের প্রণালী ও অবস্থা দেখিয়াই তাহার প্রভেদ অনুভব করিতে পারে। বিবেচক লোকের নিকট তাহাদের কার্য্যের তারতম্য অতি সহজেই প্রকাশিত হইয়া পড়ে এবং তাহার ফলও সেইরূপ ফলিয়া থাকে। এজন্য যাঁহারা প্রচারব্রত গ্রহণ করিয়াছেন বা করিতেছেন তাঁহাদের বিশেষ সতর্কতার এবং আত্মপরীক্ষার সহিত দেখা প্রয়োজন, কোন্ ভাব দ্বারা চালিত হইয়া কার্য্য করিতেছেন বা কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেছেন। পৃথিবীতে কার্য্যের অভাব নাই। ঈশ্বরের প্রিয়কার্য্যেরও অভাব নাই। সুতরাং কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে ইহাই দেখা আবশ্যক—সে কার্য্য দ্বারা নিজের কল্যাণ হইবে কি না—নিজের আত্মার সদ্গতি হইবে কি না। যে কার্য্যে নিজের সদ্গতি লাভের সম্ভাবনা নাই, তাহা দ্বারা অপরেরও কোন উপকারের প্রত্যাশা নাই। সুতরাং কোন্ কার্য্যে নিযুক্ত হইলে আত্মকল্যাণ ও জগতের কল্যাণ উভয় সাধিত হইবে, তাহা নিরূপণপূর্ব্বক তবে তাহাতে প্রবৃত্ত হওয়া আবশ্যক। ভাল কাজে নিযুক্ত হইয়াও এজন্য লোকের অধোগতি হইয়া থাকে। শেষে নিজের নিকটেও জীবন ভারবহ বোধ হয়, অপরের নিকটও বিরক্তিকর হইয়া পড়ে। শুধু বিরক্তিকর নয় কিন্তু অকল্যাণকর হইয়া থাকে। এজন্য কার্য্য সৎ হইলেও তাহাতে আত্মার রুচি ও অনুরাগ স্বাভাবিক বা অন্য কারণপ্রসূত, অতি ধীরভাবে তাহার বিচার করিয়া তাহাতে প্রবৃত্ত হওয়া আবশ্যক।

বর্ত্তমান যুগে লোকের মন বিষয় বাণিজ্যের উন্নতির জন্য যেমন ব্যস্ত, একদিকে যেমন রজনী প্রভাত হইতে না হইতে বলবানের বল, বুদ্ধিমানের বুদ্ধি, ধনীর ধন, বিদ্বানের বিদ্যা বিষয় ও বাণিজ্যের কোলাহল বৃদ্ধির জন্য—তাহার শ্রীবৃদ্ধির জন্য নিযুক্ত হইতেছে, অপর দিকে ধর্ম্মপ্রচারের জন্যও লোকের আগ্রহের সীমা নাই। লোকে যেমন সাংসারিক উন্নতির জন্য শরীর মন বুদ্ধি বিদ্যা ধন প্রভৃতি নিয়োগ করিতেছে; অন্য দিকে ধর্ম্ম প্রচারের জন্যও হাজার হাজার লোক আপনাদের সুখ দুঃখকে উপেক্ষা করিয়া অগম্য স্থানে যাইতেছে—ভীষণ বিপদাশঙ্কাকে অগ্রাহ্য করিয়া, জীবনের মায়া পরিত্যাগ করিয়া নিত্য নূতন প্রদেশে গমন করিতেছে এবং নূতন নূতন বিপদকে আহ্বান করিয়া আনিতেছে। লোকের অর্থ বিদ্যা বুদ্ধি এ কার্য্যে যে কম ব্যয় হইতেছে এমন নয়। কিন্তু লোকে ধর্ম্মপ্রচারের জন্য যে এত ব্যস্ত, ইহার মূলে প্রবেশ করিয়া আমরা কি দেখিতে পাই? আমরা কি সর্ব্বদাই দেখিতেছি যে লোকে অজ্ঞানাচ্ছন্ন হইয়া, সত্যের পথ পরিত্যাগ করিয়া এবং সত্য হইতে বিচ্যুত হইয়া বিষম অনর্থের পথে, অকল্যাণের পথে যাইতেছে, আত্মা অধোগতির দিকে যাইতেছে, তাহা হইতে উদ্ধার করিয়া কল্যাণের দিকে আনয়ন করিয়া, সকলেইকি মানবের সদ্গতির জন্যই ব্যস্ত? তাঁহাদের ভাষা সেইরূপ ভাবই প্রচার করে তাহাতে সন্দেহ নাই এবং তাঁহাদের ভাষার অনুরূপ অন্তঃকরণবিশিষ্ট ব্যক্তিও যে অনেক আছেন তাহাতেও সন্দেহ নাই। কিন্তু সকল সময় এরূপ অনুভব করিবার অবকাশ পাওয়া যায় না। ধর্ম্ম প্রচারের মূলেও এক প্রকার ক্ষুদ্র স্বার্থ বা প্রলোভন দেখা যায়। তাহা নানাপ্রকারের হইলেও প্রধানতঃ এই ভাবের যে

লোকে প্রকৃত সত্য লাভ করুক বা না করুক আমি যাহা বুঝিতেছি তাহা গ্রহণ করুক। লোকের অজ্ঞানতা ঘুচিয়া প্রকৃত সত্যালোক লাভ হউক তাহার প্রতি উদারভাবে তত দৃষ্টি নাই, কিন্তু আমি যে সম্প্রদায়ের লোক তাহার প্রচারিত মত গ্রহণ করুক। এই প্রকার মত প্রচারের সহিত আত্মবুদ্ধি বিবেচনার আত্মজ্ঞান গরিমার শ্রেষ্ঠতার ভাবও মনে প্রবল না থাকে এমন নয়। এজন্যই দেখা যায় লোকে সত্য প্রদান করিবার জন্য যেমন ব্যস্ত, সত্য গ্রহণ করিবার জন্য তেমন ব্যস্ত নয়। দলগত মত প্রচার ও দলবৃদ্ধির জন্য যত ব্যস্ত প্রকৃত বিচারশক্তির বৃদ্ধির সহিত সত্যাসত্য নিরূপণ করিবার প্রবৃত্তি বা শক্তিকে প্রবল করিবার জন্য তেমন ব্যস্ত নয়। প্রকৃত প্রচারক তিনি যিনি লোকের সত্যানুসন্ধিৎসা বৃত্তিকে প্রবল করেন। স্বাধীনভাবে বিচারের প্রবৃত্তিকে বৃদ্ধি করেন। তিনি কোন দলের মত গ্রহণ করাইবার জন্য ব্যস্ত না হইয়া, বা আত্মদলের মত গ্রহণ করাইবার জন্য তত ব্যস্ত না হইয়া ধর্ম্মক্ষুধা ও সত্য-অনুসন্ধান ও গ্রহণের ক্ষুধাকেই প্রবল করিয়া থাকেন। তাহা হইলেই তাঁহার পক্ষে সন্তুষ্ট হওয়া উচিত। নতুবা দল বৃদ্ধি বা স্বমত গ্রহণ করাইবার প্রবৃত্তি যাঁহাদের প্রবল তাহারা খুব ত্যাগশীল ও ধার্ম্মিকাগ্রগণ্য বলিয়া পরিচিত হইলেও তাঁহারা প্রকৃত ত্যাগস্বীকার করিতে পারেন নাই। আত্মজ্ঞান ও বুদ্ধির প্রশংসাধ্বনি শ্রবণ করিতে—আত্মগৌরব-ঘোষণা শ্রবণ করিতে তাঁহাদের মন এখনও ব্যস্ত। দলের স্বার্থ তাঁহারা ছাড়াইতে পারেন নাই। সুতরাং সেরূপ প্রচারেও প্রকৃত কল্যাণ লাভের আশা কম। তাহা দ্বারা ঈশ্বরের প্রসন্নতা অপেক্ষা স্বদলের ও আত্মপ্রশংসা লাভের সম্ভাবনাই অধিক। যাঁহারা ধর্ম্মপ্রচারের ব্রত গ্রহণ করিতেছেন বা করিয়াছেন তাঁহাদের সর্ব্বাগ্রে দেখা উচিত কোন্ ভাব প্রাণে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রবল। লোকে ঈশ্বরের মহিমা বুঝিতে সমর্থ হউক এবং বুঝিয়া তাহা জীবনে পরিগ্রহ করিয়া, তাঁহার মহিমা মহিমান্বিত করুক—সত্যের উদার আশ্রয় লাভ করিয়া কল্যাণের পথে অগ্রসর হউক, এরূপ আকাঙ্ক্ষাই প্রবল অথবা লোকে দলের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া অথবা দলের প্রচারিত মত সকল মান্য করিয়া সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের বিদ্যা বুদ্ধি প্রভৃতির শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করুক, এরূপ আকাঙ্ক্ষাই প্রবল। ঈশ্বরের মহিমা বিস্তৃত হউক, জয় যুক্ত হউক এরূপ উদ্দেশ্য না লইয়া যদি কেহ ধর্ম্মপ্রচারের জন্য ব্যস্ত হন, তাঁহার সেই ব্যস্ততা সেই আগ্রহের মূলে নিজ গৌরব-প্রয়াস প্রকাশ পাইবেই পাইবে। সুতরাং তাহা যেমন সত্য প্রচারের সহায় হইবে না; তেমনি নিজ কল্যাণ লাভের অনুকূলও হইবে না। কার্য্য ও ব্যবসা জগতে অনেক প্রকারের আছে। ধর্ম্মপ্রচারও যেন সেইরূপ কোন আর দশটা কার্য্যের মত একটা কার্য্য বা অপর কোন ব্যবসায়ের মত একটা ব্যবসায় না হয়। তাহা দ্বারা ইহলোকে তৃপ্তি পাওয়া গেলেও প্রকৃত কল্যাণ লাভের সম্ভাবনা তাহাতে নাই। সুতরাং প্রচারব্রত গ্রহণ অতি উচ্চ কার্য্য হইলেও তাহাতেও সর্ব্বদা সজাগ আত্মদৃষ্টির সহিত নিজকে পরীক্ষা করা উচিত। গৌরবের প্রয়াস দলগতই হউক আর আত্মগতই হউক অতি অনিষ্টকারী এবং মারাত্মক।

দোষ কাহার—সাধন প্রণালীর না সাধকের?

(প্রাপ্ত)

কিছু দিন হইতে ব্রাহ্মসমাজে সাধনপ্রণালীর সম্বন্ধে নানা কথা হইতেছে। গত ১৬ই কার্ত্তিকের তত্ত্বকৌমুদীতে শ্রীযুক্ত সত্যদর্শী মহাশয় এই প্রশ্ন উত্থাপিত করিয়াছেন। এবিষয়টী সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা প্রয়োজন হইয়া উঠিয়াছে। আমাদের অক্ষমতা আমরা বিশেষরূপে অবগত আছি, কিন্তু আর কেহই এ কার্য্যের ভার গ্রহণ করিতেছেন না বলিয়া, নিতান্ত কর্ত্তব্য বোধে ইহাতে হস্তক্ষেপ করিতেছি।

সর্ব্ব প্রথমে আমাদের সাধন প্রণালীটী কি তাহা সংক্ষেপে আলোচনা করা প্রয়োজন। আমাদের সাধনের চারিটী অঙ্গ (১) উদ্বোধন, (২) আরাধনা, (৩) ধ্যান, (৪) প্রার্থনা।

(১) উদ্বোধন,—আমরা অনেক সময় বহির্ম্মুখীন থাকি, অতএব সর্ব্বপ্রথমে আমাদের প্রাণকে পরব্রহ্মের উন্মুখীন করিতে হইবে—এইরূপ অবস্থাতে আনিতে হইবে, যাহাতে তাঁহার প্রকাশ সম্ভবপর হয়। তাঁহাকে পাওয়ার জন্য সরল ব্যাকুল আকাঙ্ক্ষা এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাতে নির্ভর হইলেই এই অবস্থা হইল—উদ্বোধন হইল। বোধ হয় বলিতে হইবে না; এই অবস্থাকেই প্রার্থনা বলা হয়। প্রাণের এই অবস্থা হইলে—প্রার্থনা হইলে, পরব্রহ্ম আত্মাতে তাঁহার স্বরূপ প্রকাশ করেন। (২) আরাধনা স্বরূপ বর্ণনও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ। আত্মাতে পরব্রহ্মের প্রকাশ হইলে তাঁহাকে বিশেষ ভাবে চিন্তা করিতে, তাঁহার স্বরূপ সকল বিশেষ ভাবে মনন করিতে এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাকে গভীররূপে উপলব্ধি করিতে সক্ষম হওয়া যায়। এসময় প্রাণে কৃতজ্ঞতাও উপস্থিত হয়। এবং তাঁহাকে যতই বেশী উপলব্ধি করা যায় ততই প্রেম, ভক্তি ও কৃতজ্ঞতার উদয় হয়। ইহার নাম আরাধনা। এই ভাবে গভীর হইতে গভীরতর রূপে তাঁহাকে উপলব্ধি করিতে করিতে প্রাণ তাঁহাতে নিমগ্ন হয় অর্থাৎ (৩) ১। ধ্যানের অবস্থাতে উপনীত হয়। এই ভাবে গভীর উপলব্ধি হইলে তাঁহার অপানুরাগ উদ্দীপ্ত হয়, তাঁহাকে পাইবার আকাঙ্ক্ষা প্রবল হয় এবং এই অবস্থাতে, তুলনায় নিজ দুরবস্থা বেশী হওয়াতে তাহা দূর করিবার আকাঙ্ক্ষাও প্রবল হয়; প্রাণ (৪) প্রার্থনার অবস্থায় উপনীত হয়। তাই দেখিতেছি আমাদের সাধন প্রণালী সংক্ষেপতঃ এই—প্রার্থনা, প্রার্থনার ফলস্বরূপ আত্মাতে ব্রহ্ম প্রকাশ হইলে তাঁহার চিন্তা, তাহার ফল স্বরূপ গভীররূপে ব্রহ্ম উপলব্ধি এবং ইহার ফল স্বরূপ প্রবলতর আকাঙ্ক্ষা বা প্রার্থনা।

এখন দেখা যাউক উক্ত সাধন অবলম্বনে ফল লাভ হইতে পারে কি না। প্রার্থনা বা সরল ব্যাকুল আকাঙ্ক্ষা হইলে যে আত্মাতে ব্রহ্ম প্রকাশিত হন—ব্রহ্মদর্শন হয়—একথা আমরা দৃঢ়তর জানি, সর্ব্ববাদী-সম্মত। সর্ব্বদেশীয় ও সকল শ্রেণীর

লোক ইহা স্বীকার করিতেছেন। কাজেই ইহার সত্যতা প্রমাণ জন্য আজ আমরা কিছু বলিব না। যদি কেহ আপত্তি করেন তবে এ বিচার করা যাইবে। ব্রাহ্মসমাজের পুস্তক, পত্রিকা ও বক্তৃতা, উপদেশাদিতে এবিষয় অনেকবার আলোচিত হইয়াছে। বিশেষতঃ মেসেঞ্জার পত্রিকাতে এ সম্বন্ধে কত সুন্দর সুন্দর উদ্ধৃত ও সম্পাদকীয় প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে। আগুন জ্বালিলে যেরূপ বাতাস আসিবেই, দ্বার খুলিলে যেরূপ ঘরে আলো প্রবেশ করিবেই, সেইরূপ প্রার্থনা বা আকাঙ্ক্ষা হইলে ব্রহ্ম প্রাণে প্রকাশিত হইবেনই। ইহা না হইয়া পারে না, ইহা একটী আধ্যাত্মিক নিয়ম। সুতরাং অনেক সময় পর্য্যন্ত মনন বা স্বরূপ চিন্তা দ্বারা যে এই দর্শন গভীর হইবে, অধিকতর স্পষ্টরূপে যে ব্রহ্ম উপলব্ধি হইবে তাহা সহজেই বুঝা যায়। কোন বস্তু অনেক সময় পর্য্যন্ত মনোযোগের সহিত পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখিলে যে উক্ত বস্তুর জ্ঞান অধিক হইবে, উহাকে অধিকতর স্পষ্টরূপে জানা যাইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। এবং কোন বস্তু, বিশেষতঃ কোন সুন্দর বস্তু চিন্তা করিতে করিতে যে মন তাহাতে মগ্ন হইয়া যাইবে তাহা সহজেই বুঝা যায়। কাজেই এরূপ স্বাভাবিক নিয়মানুসারেই অনেক সময় পর্য্যন্ত ব্রহ্ম-আরাধনা করিলে প্রাণ তাহাতে নিমগ্ন হইয়া যাইবে—ধ্যানের অবস্থাতে উপনীত হইবে এবিষয়ে সন্দেহ নাই। প্রেমস্বরূপ সুন্দর পরব্রহ্মকে প্রাণে দেখিলে যে প্রেম ভক্তি জন্মিবে, প্রাণ তাঁহাকে ছাড়িয়া উঠিতে চাহিবে না ইহাও সহজেই বুঝা যাইতেছে। অনন্তব্রহ্মে প্রাণ যতই ডুবিবে, তাঁহাকে আরও অধিকতররূপে উপলব্ধি করিবার জন্য প্রাণ ততই ব্যাকুল হইবে এবং ব্রহ্ম উপলব্ধি হইলে নিজ ক্ষুদ্রতা, অসারতা স্পষ্টতর ভাবে বোধ হইবেই হইবে। ধ্যান হইতে প্রাণ স্বাভাবিক ভাবে প্রার্থনার অবস্থায় উপস্থিত হয়। এই অবস্থার ফল আরও অধিকতররূপে ব্রহ্ম উপলব্ধি সুতরাং আমরা দেখিতেছি, ইহারা পরস্পর এরূপ সম্বন্ধে আবদ্ধ যে স্বাভাবিক ভাবে প্রত্যেকে পরবর্ত্তী অবস্থা আনিয়া দেয়। সহজ যুক্তিতেই আমরা বুঝিতে পারিতেছি ইহা আমাদিগকে উন্নতজীবন লাভে সমর্থ করে। এই স্বাভাবিক নিয়মের উপরেই আমাদের সাধন প্রণালী প্রতিষ্ঠিতা। মনোবিজ্ঞান, সাধারণ যুক্তিও এই প্রণালীর পক্ষে সাক্ষ্য দিতেছে। স্বশ্রেণীস্থ ও অন্য শ্রেণীস্থ শত শত সাধক ইহার পক্ষে সাক্ষ্য দিতেছেন। আমরা দেখিতেছি ইহা উন্নত ধর্ম্ম-জীবন লাভের সম্পূর্ণ উপযোগী এবং নিশ্চিত ফলপ্রদ উপায়।

এখন একটী গুরুতর প্রশ্ন রহিয়াছে। উদ্বোধন হইলে—সরল ব্যাকুল প্রার্থনা হইলে ফল হইবে বুঝা যায়। কিন্তু প্রশ্ন এই উক্ত প্রার্থনার অবস্থা পাইবার জন্য কি সাধন আছে? এবিষয়ে ব্রাহ্মসমাজ নিম্নলিখিত সাধন নির্দ্দেশ করিতেছেন। (১) সৎগ্রন্থ পাঠ, (২) প্রকৃতি-চর্চ্চা, (৩) সাধুসঙ্গ ও (৪) নিজ জীবনে ব্রহ্মকৃপা ও তাঁহার কার্য্য বিষয়ে এবং নিজ অবস্থা বিষয়ে চিন্তা। ইহাদের প্রত্যেক উপায় দ্বারাই যে কিছু উপকার হইতে পারে, ধর্ম্মজীবন লাভের—ব্রহ্মলাভের আকাঙ্ক্ষা জন্মিতে পারে তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন, কিন্তু সকল সময়, সকল অবস্থাতে ইহারা কার্য্যকারী কিনা তাহাই বিচার্য্য। ইহাদের সকলের যে সমান উপকারিতা আছে তাহা আমরা বলিতে পারি না। সৎগ্রন্থ পাঠে ও প্রকৃতি চর্চ্চাতে যে অনেক সময় প্রাণ জাগ্রত হয় তাহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু আমরা একথা বলিতে পারি না, সকল সময়ে ইহারা কার্য্যকারী হইবে। ইহাদের কার্য্যকারিতা অনেকটা আমাদের প্রাণের অবস্থার উপর নির্ভর করে। প্রাণের অবস্থা অনুকূল না হইলে ফল লাভ হয় না। সাধু সঙ্গ ইহাদের অপেক্ষা অধিক ফল দায়ক। যেটী যেরূপ বস্তু সেইটী আমাদের প্রাণে সেই ভাবই জাগাইয়া দেয়। সাধু জীবন্ত মানুষ উন্নত জীব, কাযেই তাঁহার সংসর্গে প্রাণে সদ্ভাব জাগ্রত হইবে, উচ্চ আকাঙ্ক্ষা প্রদীপ্ত হইবে, তাঁহার কথার ফল বেশী হইবে। কারণ তাঁহার কথার পশ্চাতে প্রকৃত জীবন রহিয়াছে। তীর যত বলের সহিত নিক্ষিপ্ত হইবে, তাহা যেমন তত গভীর ভাবে বিদ্ধ হইবে, সেইরূপ কথা প্রাণের যত গভীর স্থল হইতে উত্থিত হইবে, তাহা তত গভীর ভাবে শ্রোতার প্রাণে প্রবেশ করিবে, বক্তব্য বিষয় বক্তার যতদূর জীবন লব্ধ সত্য হইবে, উহা তত কার্য্যকারী হইবে। কিন্তু তাই বলিয়া একথা বলা যায় না সাধুসঙ্গ সর্ব্বদাই কার্য্যকারী হইবে। ইহার ফলও প্রাণের অবস্থার উপর অনেকটা নির্ভর করে। বস্তুটী কোমল না হইলে অথবা অনুকূল অবস্থায় না থাকিলে তীর যেমন লক্ষ্য বিদ্ধ করিতে পারে না সেইরূপ সাধুসঙ্গকারীর প্রাণের অবস্থা "কোমল" (অর্থাৎ পাপে বেশী লিপ্ত নয়) অথবা সেই সময়ের জন্য অনুকূল না হইলে বিশেষ ফল হইবে না। কাজেই অবস্থা বিশেষে সাধুসঙ্গকারীর উপর সাধুর কার্য্য এত ক্ষীণ হইতে পারে যে কিছুই হইল না মনে করা যায়; কারণ উহা সেস্থলে বিশেষ কার্য্যকারী নহে, প্রাণকে জাগ্রত করিতে সক্ষম নহে। সাধুর এরূপ ক্ষমতা নাই যে, সমস্ত প্রতিকূল অবস্থা দূর করিয়া উক্ত লোককে সম্পূর্ণরূপে অনুকূল অবস্থাতে আনিয়া দিতে পারে। কারণ কোন ব্যক্তির উপরই কাহারও সম্পূর্ণ আধিপত্য নাই। মানুষের কর্ত্তৃত্ব তাহার নিজের উপর অন্যের উপর নহে। কোন মানুষের উপরই তাহার নিজের এবং স্বয়ং পরমেশ্বরের ভিন্ন অন্য কাহারও সম্পূর্ণ কর্ত্তৃত্ব নাই। কাযেই প্রত্যেক মনুষ্যের উপর তাহার নিজের এবং প্রভু পরব্রহ্মের কার্য্য সর্ব্বাপেক্ষা অধিক কার্য্যকারী। সুতরাং এই পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে, প্রার্থনার অবস্থা আনয়ন সম্বন্ধেও স্বীয় ও ব্রহ্মকৃপার কার্য্য সর্ব্বাপেক্ষা ও সকল সময়ের জন্য ফলদায়ক। জীবন্ত মঙ্গলময় বিধাতা পরব্রহ্ম যে আমাদের সকল বাধা বিঘ্ন দূর করিয়া আমাদের কোন চেষ্টা না থাকা সত্বেও অথবা বিরুদ্ধ চেষ্টা থাকা সত্বেও নানা ভাবে তাঁহার দিকে আকৃষ্ট করিতে পারেন, প্রাণকে তাঁহার উন্মুখীন করিতে পারেন, প্রাণে প্রবল আকাঙ্ক্ষা জাগাইয়া দিতে পারেন, তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন। মানব নিজ চেষ্টাতে কি করিতে পারে তাহাই বিচার্য্য। কি হইলে প্রার্থনা বা ব্যাকুল আকাঙ্ক্ষার অবস্থা লাভ হইতে পারে? অভাব বোধ হইলে তাহা দূর করিবার আকাঙ্ক্ষা

জন্মিবে। নিজে গভীর পাপে লিপ্ত আছি—অথবা জীবনের অক্ষ স্বরূপ পরব্রহ্ম হইতে দূরে রহিয়াছি, গভীর ভাবে প্রাণে এরূপ অনুভব করিতে পারিলেই প্রার্থনা আসিবে। ভাসা ভাসা রূপে একটু বোধ হইলে প্রাণে গভীর আকাঙ্ক্ষা জন্মিবে না। নিজে কোন্ অবস্থায় আছি ইহা বিশেষরূপে উপলব্ধি করিতে পারিলে এ আকাঙ্ক্ষা জন্মিতে পারে। বিশেষ চিন্তা করা ভিন্ন অন্য কোন উপায়ে গভীর অভাব বোধ কতকটা জাগাইয়া দিতে পারে সত্য, কিন্তু বিশেষ গভীর ভাবে জাগাইয়া দিতে পারেন না। কারণ উপলব্ধি সম্পূর্ণ চিন্তার কার্য্য। যতই চিন্তা করা যাইবে জ্ঞান ততই পরিষ্কার হইবে। আর সকল উপায়ই বাহিরের, তাহাদের এখানে বিশেষ ক্ষমতা নাই। কাজেই এ অভাববোধ পক্ষে গভীর আত্মচিন্তা বা আত্মপরীক্ষাই একমাত্র উপায় (অবশ্য ব্রহ্মকৃপা ভিন্ন আমরা অন্য উপায়ের কথাই বলিতেছি) এই উপায় যে নিশ্চয় ফলপ্রদ তাহাও সহজেই বুঝা যাইবে। গভীর ভাবে নিজ অবস্থা চিন্তা করিলে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করিলে নিজ দুরবস্থা বিশেষ রূপে অনুভব হইবে ও তাহা প্রাণে মুদ্রিত হইবে। একথা সহজেই বুঝা যাইতেছে ইহা না হইয়া পারে না। ইহা স্বাভাবিক নিয়ম। কাজেই আত্মচিন্তাই শ্রেষ্ঠতম এবং নিশ্চিত ও সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ফলপ্রদ। এ উপায় অবলম্বনও সকলের পক্ষে সহজ। মানুষ যত দুরবস্থাপন্ন হউক না কেন, যত গভীর ভাবে পাপে নিমগ্ন থাকুক না কেন সকলের নিজ অবস্থা সম্বন্ধে চিন্তা করিতে পারে। সামান্য ইচ্ছা হইলেই এপথ অবলম্বন করিতে পারে। আমরা দেখিতে পাইতেছি উপরিলিখিত উপায় চতুষ্টয়ের মধ্যে চতুর্থটী দ্বারা অর্থাৎ নিজ অবস্থা চিন্তা দ্বারা সর্ব্বাপেক্ষা বেশী পরিমাণে উপকৃত হওয়া যায়। শুধু তাহা নহে, চতুর্থ উপায়টী সকল সময়েই ফলপ্রদ। এ প্রণালীতে সাধন করিলে কোন মতেই বিফল হইতে হয় না। এখন প্রমাণিত হইল আমাদের সাধন প্রণালী উন্নত ধর্ম্মজীবন লাভ পক্ষে সম্পূর্ণ কার্য্যকারী।

মূল প্রশ্নের মীমাংসার পূর্ব্বে আরও কয়েটী বিষয় সম্বন্ধে আলোচনা করা প্রয়োজন, কি ভাবে সাধন করিলে এই প্রণালীতে ফল পাওয়া যাইবে না তাহা দেখা উচিত। প্রার্থনা আরাধনা কি তাহা বলা হইয়াছে, কি নয় সে বিষয় কিছু আলোচনা করা প্রয়োজন। ইহার পর আমরা আলোচ্য বিষয় সম্বন্ধে আমাদের মত প্রদান করিব।

(ক্রমশঃ)

ব্রাহ্ম পর্য্যটকের পত্র।

ওঁকারনাথ।

মধ্য প্রদেশের অন্তর্গত নিমার অথবা খাণ্ডোয়া জেলার মধ্যে মান্ধাতা নামক একটী স্থান আছে। ওঁকারনাথ সেই মান্ধাতার নিকট নর্ম্মদা নদীর অপর পারে অবস্থিত। খাণ্ডোয়া হইতে হোলকার ষ্টেট-রেলওয়ের রাস্তায় খেঁড়ি ঘাট নামক নর্ম্মদা নদীর তীরে একটী ষ্টেসন আছে, সেই ষ্টেসন হইতে ওঁকারনাথ ৭ মাইল। খেঁড়িঘাট হইতে ওঁকারনাথ যাইবার বেশ পাকা রাস্তা আছে; যাওয়া আসার জন্য গরুর গাড়ী পাওয়া যায়।

খেঁড়ি ঘাটে একটী বাঙ্গালী ব্রহ্মচারী আছেন, তাঁহার সহিত আলাপে জানিলাম তিনি প্রায় ২৫ বৎসর হইল ঐ অঞ্চলে আছেন, ৩।৪ বৎসর হইল তিনি খেঁড়ি ঘাটে নর্ম্মদা নদীর তীরে একটী ধর্ম্মশালা প্রস্তুত করিয়া সেখানে বাস করিতেছেন। অতীত অভ্যাগত আসিলে তিনি তাঁহাদের আহারাদি দিয়া সেবা করিয়া থাকেন। ব্রহ্মচারী মহাশয় নিজের আশ্রমে কোন প্রকার মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেন নাই। প্রণবাদি মন্ত্র জপ করিয়া থাকেন। তাঁহার জন্মস্থান হুগলি জেলা। এক্ষণে বৃদ্ধ হইয়াছেন।

এই ব্রহ্মচারীজী কহিলেন যে ওঁকারনাথের মহাদেবের নামানুসারে ঐ স্থানের নাম ওঁকারনাথ হয় নাই, যে পাহাড়ে ঐ মহাদেব আছেন সেই পাহাড়ের নাম ওঁকারনাথ। আমি ঐ পাহাড়ের চারিদিক ঘুরিয়া বিশেষ রূপে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখিয়াছি যে পাহাড়টীর আকার কতকটা ওঁএর মত।

এই ওঁ আকৃতি পাহাড়টীর দৈর্ঘ্য প্রায় ২ মাইল ও প্রস্থ ½ মাইল হইবে। ইহার সম্মুখ দিয়া পূর্ব্ববাহিনী নর্ম্মদা নদী গম্ভীর শব্দ করিতে করিতে প্রবাহিত হইতেছে এবং পাহাড়ের মস্তক দেশ হইতে নর্ম্মদার একটী শাখা বহির্গত হইয়া (এই শাখাকে স্থানীয় অধিবাসীরা কাবেরী কহে) পাহাড়টীকে বেষ্টন করিয়া আবার পাহাড়ের পাদদেশে মূল নদীর সহিত মিলিত হইয়াছে। ইহাতে পাহাড়টীকে একটী দ্বীপের ন্যায় দেখা যায়।

এই পাহাড়ের উপর উঠিলে চতুর্দ্দিকের প্রাকৃতিক দৃশ্য অতি সুন্দর দেখায়। সেই স্থানের চতুর্দ্দিকেই পাহাড়। নর্ম্মদা নদীর উভয় কূল আমাদের দেশের নদীর বাঁধের ন্যায়। পাহাড় শ্রেণী প্রাচীরের মত মস্তক উন্নত করিয়া শোভা পাইতেছে। ইহাতে উক্ত স্থানের সৌন্দর্য্য ও গাম্ভীর্য্য সাধকের প্রাণে বিশেষ ভাবে প্রবেশ করিয়া, সেই অনন্ত বিশ্বনির্ম্মাতাকে স্মরণ করাইয়া দেয়। সেই জন্য বোধ হয় এই স্থান হিন্দুসাধকদিগের একটী পবিত্র তীর্থ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

এই পাহাড়ের পাদদেশে একটী ছোট সহরের মত বাজার আছে, সেই বাজারের মধ্যস্থলে ওঁকার নাথ নামক মহাদেবের মন্দির। এই মহাদেব দেখিবার জন্য নানাদেশ হইতে হিন্দু-তীর্থযাত্রীগণ আসিয়া মহাদেব দর্শন ও পূজাদি দিয়া থাকেন। এখানকার লোকেরা শ্রাবণ মাসকে পুণ্যমাস মনে করেন। সেই জন্য শ্রাবণ মাসে এখানে যাত্রীদিগের অত্যন্ত ভীড় হয় এবং অনেক লোক পুণ্য হইবে বলিয়া এই স্থানে সমস্ত শ্রাবণ মাস বাস করিয়া থাকেন।

এই ক্ষুদ্র বাজারের পূর্ব্ব দিকে কিছুদূরে ঐ পাহাড়ের মধ্য দেশে কয়েকটী গুহা আছে, তাহাতে কয়েক জন সাধু বাস করিয়া থাকেন। এই অল্প সংখ্যক সাধু এক একজন এক এক সম্প্রদায় ভুক্ত, সকলের গুহাতেই দেবতার মূর্ত্তি আছে এবং প্রায় সকলেই গাঁজা ভাঙ্গাদি খাইয়া থাকেন এই

একটী গুহাতে আমাদের ব্রাহ্মবন্ধু শ্রদ্ধের বাবু প্যারীলাল ঘোষ মহাশয় থাকেন, আমি তাঁহার গুহাতেই কয়েক সপ্তাহ ছিলাম।

প্যারী বাবুর কঠোর বৈরাগ্য ও সাধন ভজন দেখিয়া আমার মহাত্মা বুদ্ধদেবের কথা স্মরণ হইত, বাস্তবিক তাঁহার বৈরাগ্য ও সাধন দেখিলে তাঁহাকে দ্বিতীয় বৌদ্ধদেব বলিয়া বোধ হয়। তিনি ভোরে উঠিয়া শৌচাদি করিয়া একটী বিশেষ আসনে বসিয়া ধ্যানে নিমগ্ন হন, তাহার পর মধ্যাহ্ন সময়ে ১০।১৫ মিনিটের জন্ম একবার উঠিয়া স্নানাদি করিয়া আবার ধ্যানে নিমগ্ন হন। ঠিক সন্ধ্যার একটু পূর্ব্বে উঠিয়া একপোয়া আন্দাজ দুগ্ধ ও কিঞ্চিৎ বেলপত্র বাটা খাইয়া পুনরায় ঘণ্টা খানেক বাদে সাধনাতে নিযুক্ত হন। রাত্রে ২।৩ ঘণ্টামাত্র নিদ্রা যান, কোন কোন দিন আরও কম নিদ্রা যান বলিয়া বোধ হয়। এইরূপে তিনি প্রায় আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া কঠোর সাধনাতে নিযুক্ত আছেন। তিনি এখন মৌনব্রত অবলম্বন করিয়া আছেন, কথা কহেন না, আমার সহিত তাঁহার লেখালেখির দ্বারা কিছু কিছু হইত।

ক্রমশঃ।

প্রেরিত পত্র।

(পত্র প্রেরকদিগের মতামতের জন্ম সম্পাদক দায়ী নহেন, কিম্বা কাহারও পত্র ফেরত দিতে বাধ্য নহেন)

অভ্রান্ত গুরুবাদ ও ব্রাহ্মধর্ম্ম।

পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত তত্ত্ব-কৌমুদী সম্পাদক
মহাশয় সমীপেষু।

মহাশয়,

গতবারের "তত্ত্ব-কৌমুদী"তে উপরোক্ত বিষয়ে একখানি পত্র বাহির হইয়াছে। আশা করি ইহা দ্বারা ব্রাহ্মসমাজের বিশেষ কল্যাণ সাধিত হইবে; কারণ ইহাতে পরস্পরের চিন্তা বিনিময় করিবার একটা সুবিধা হইয়াছে। পৃথিবীতে যত কলহ, বিবাদ, তাহার অনেকেরই মূলে পরস্পরের সম্বন্ধে অজ্ঞতা বিদ্যমান; সুতরাং যাহাতে অন্তের মনের ভাব জানিবার পক্ষে সুবিধা হয়, তাহা কদাচ সামান্য বস্তু নহে। এই কারণেই শ্রদ্ধের মনোরঞ্জন বাবুর পত্রখানিকে মূল্যবান মনে করা উচিত এবং যে উদ্দেশ্যে পত্রখানি বাহির হইয়াছে, তদ্বিষয়ে সকলেরই মনোযোগী হওয়া কর্ত্তব্য। ব্রাহ্মগণ অভ্রান্ত গুরুবাদকে বহুদিন হইল সমাধিস্থ করিয়া নিশ্চিন্ত মনে স্বচ্ছন্দচিত্তে বাস করিতেছিলেন; হঠাৎ এই শত্রু স্বীয় সমাধি হইতে উত্থান করিয়া সমাজে বিচরণ করিতে আরম্ভ করিয়াছে, ও আপনার গাত্রের পূতিগন্ধ চারিদিকে ছড়াইয়া দিতেছে। এখন আর নিশ্চেষ্ট থাকিলে চলিবে না। গুরুবাদী ভ্রাতৃগণের কি বলিবার আছে, তাহা জানিয়া আলোচনাদ্বারা যাহাতে আমরা একটী স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি, তদ্বিষয়ে প্রত্যেক ব্রাহ্মেরই যত্নশীল হওয়া উচিত মনে হইতেছে। আমি এই কর্ত্তব্যবুদ্ধির অধীন হইয়া নিম্নে কয়েকটী কথা বলিব। আশা করি বন্ধুগণ অবহিতচিত্তে আমার পত্রখানি পাঠ করিয়া স্বীয় স্বীয় মন্তব্য প্রকাশ করতঃ গুরুবাদ সম্বন্ধে যাহাতে একটা নিশ্চিত মীমাংসা হইয়া যায়, তদ্বিষয়ে সহায়তা করিবেন। যে সমাজে স্বাধীন চিন্তা অপ্রতিহত, সে সমাজে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির চিন্তা ভিন্ন বিষয়ের দিকে প্রবাহিত হওয়াই স্বাভাবিক। সেখানে একতা রক্ষা করিতে হইলে পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা রাখিয়া স্থিরচিত্তে ও নিষ্ঠার সহিত বিরোধী মতের আলোচনা করিয়া নির্দ্ধারিত সত্যের অনুসরণ করাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপায়। আমরা যেন এই মহৎ সত্য বিস্মৃত না হই।

শ্রদ্ধের মনোরঞ্জন বাবু লিখিয়াছেন:—

"আমার মনে হয় ব্রাহ্মধর্ম্মের সাধনতত্ত্বের যাহা মূলমন্ত্র তাহারই উপর অভ্রান্ত গুরুবাদের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত। জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার সাক্ষাৎ যোগই ব্রাহ্মধর্ম্মের মূলতত্ত্ব।"

কথাটা নিতান্ত আত্মবিরোধিতা দোষে দূষিত বলিয়া বোধ হইতেছে। জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার সাক্ষাৎ যোগ যদি স্বীকার কর, তাহা হইলে গুরুর সম্বন্ধেও সেই যোগ যেরূপ সম্ভব, শিষ্যের সম্বন্ধেও সেইরূপই সম্ভব; সুতরাং যদি অভ্রান্ত গুরু স্বীকার কর, তাহা হইলে অভ্রান্ত শিষ্যও স্বীকার করিতে হইবে। অতএব যদি কেবল অভ্রান্ত গুরুই স্বীকার কর, তাহা হইলে জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার যোগ কেবল গুরুর সম্বন্ধে স্বীকার করা হইল, শিষ্যের সম্বন্ধে আর স্বীকার করা হইল না; সুতরাং জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার যোগ যুগপৎ স্বীকার ও অস্বীকার করা হইতেছে। আত্মবিরোধিতা দোষ ঘটিল না কি? আর যদি গুরু ও শিষ্য উভয়েই অভ্রান্ত হন, (মনোরঞ্জন বাবুর অভ্রান্ততার ভিত্তি অন্ততঃ তাহাই প্রমাণ করিতেছে,) তাহা হইলে গুরু ও শিষ্যে কোন প্রভেদ রহিল না, দুজনে এক হইয়া গেলেন, আমাদেরও বিবাদ মিটিয়া গেল। এস্থলে এই আপত্তি উঠিতে পারে যে, শিষ্যও অভ্রান্ত হইতে পারে, কিন্তু সাধন সাপেক্ষ। বেশ কথা। কিসের সাধন? অবশ্য পরমাত্মার সহিত যোগেরই সাধন, কারণ মনোরঞ্জন বাবু বলিয়াছেন, তাহাই অভ্রান্ততার ভিত্তি। সকল আত্মারই সহিত যখন পরমাত্মার একই সম্বন্ধ, তখন গুরু যে প্রণালী অবলম্বনপূর্ব্বক পরমেশ্বরের সহিত সাক্ষাৎ যোগ অনুভব করিয়া অভ্রান্ত হইয়াছেন, শিষ্যকেও ঠিক সেই প্রণালী অবলম্বন করিতে হইবে, এবং সেই প্রণালী তাহারও নিকট প্রকাশিত হইবে; সুতরাং গুরুর আর দাঁড়াইবার স্থল কোথায়? একটী দৃষ্টান্ত গ্রহণ করা যাউক। মনে করুন এক ব্যক্তি ঢাকায় গিয়াছিল, আর এক ব্যক্তি ঢাকায় যাইবে; উভয়েরই একই পথ, এবং একই ব্যক্তি উভয়েরই নেতা। এরূপ স্থলে শেষোক্ত ব্যক্তির পক্ষে পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তি কি অত্যাবশ্যক? কখনই নহে। সেইরূপ, সকল মানবেরই গন্তব্যস্থান ও পথ যখন এক এবং ঈশ্বর যখন সকলেরই নেতা, তখন যিনি একটুকু অগ্রসর হইয়াছেন, তিনি ব্যতীত আমার চলিবে না কেন? এতদ্ব্যতীত গুরু অভ্রান্ত হইলে শিষ্যের কিছুই লাভ নাই; কারণ শিষ্য যতক্ষণ গুরুকে অভ্রান্ত বলিয়া না জানিতেছেন, অর্থাৎ গুরু যে প্রণালীতে সত্য লাভ করিয়া

অভ্রান্ত হইয়াছেন, শিষ্যও সেই প্রণালীতে সত্য লাভ করিয়া অভ্রান্ত না হইতেছেন, অর্থাৎ যতক্ষণ তাঁহাতে অভ্রান্তিতা দর্শনের চক্ষু না ফুটিতেছে, ততক্ষণ গুরুর অভ্রান্ততা শিষ্যের সম্বন্ধে কিছুই নহে। এবং শিষ্য যখন স্বয়ংই অভ্রান্ত হইলেন, তখন ত দুই জনে একাসনে আসীন হইলেন, এবং গুরুর আর প্রয়োজন রহিল না। বস্তুতঃ অভ্রান্ত গুরুবাদ স্বীকার করিলেই তাহার সঙ্গে সঙ্গে মধ্যবর্ত্তিবাদ স্বীকার করিতে হয়, সুতরাং মানবাত্মার সহিত পরমাত্মার সাক্ষাৎ যোগ অন্ততঃ শিষ্যের সম্বন্ধে অস্বীকার করা হয়; কারণ গুরু অভ্রান্ত বলিলেই তাহার সঙ্গে সঙ্গে বলা হইল যে শিষ্য অভ্রান্ত নহেন, অর্থাৎ অভ্রান্ত ঈশ্বরকে প্রাণে পাইতে পারে না; সুতরাং তাঁহাকে গুরুরূপী মধ্যবর্ত্তীর আশ্রয়ে থাকিতে হইবে।

শ্রদ্ধেয় মনোরঞ্জন বাবু অভ্রান্ত গুরু প্রমাণের জন্য যে যুক্তি অবলম্বন করিয়াছেন, তাহা কতদূর সারগর্ভ, এখন তাহারই বিচারে প্রবৃত্ত হওয়া যাউক।

১। ঈশ্বরের বাণী অভ্রান্ত;

২। ঈশ্বরের বাণী মানবাত্মায় প্রকাশ পায়।

উল্লিখিত বাক্যদ্বয় (premises) মনোরঞ্জন বাবুর নিজের। কিন্তু এই দুই বাক্য হইতে যুক্তি শাস্ত্রের নিয়মানুসারে কি কি সিদ্ধান্তে (conclusion) উপনীত হওয়া যায়? এই কি নয় যে "মানব অভ্রান্ত"? আত্মবাত্মা বলিতে কিছু ব্যক্তি বিশেষের আত্মা বুঝায় না। সুতরাং মনোরঞ্জন বাবুর বাক্যদ্বয় কেবল ব্যক্তি বিশেষের অভ্রান্ততা প্রমাণ করিতেছে না, সমগ্র মানব জাতির অভ্রান্ততা প্রমাণ করিতেছে। মনোরঞ্জন বাবু পরে বলিয়াছেন, যে এই বাণী শুনে সেই অভ্রান্ত। কিন্তু 'শুন' আর প্রকাশ পাওয়া একই কথা। সকলেই যদি অভ্রান্ত হইল, তাহা হইলে সকলেই অভ্রান্ত গুরু,

গুরুতে গুরুতে ধূল পরিমাণ।
দশ বিশ গণ্ডা ভূতলে শয়ান॥

এতদ্ব্যতীত সকলই গুরুময় হইয়া গেল, শিষ্য বেচারির আর দাঁড়াইবার স্থান রহিল না।

আর একটা কথা। 'গুরু' সম্বন্ধ বাচক শব্দ; অর্থাৎ গুরু বলিলেই শিষ্য বুঝায়, এবং শিষ্য ব্যতিরেকে গুরুর ধারণাই হয় না। সুতরাং গুরু যদি অভ্রান্ত হন, তবে তিনি শিষ্যেরই সম্বন্ধে অভ্রান্ত, অর্থাৎ শিষ্য যদি তাঁহাকে অভ্রান্ত বলিয়া জানেন তবেই তিনি অভ্রান্ত, নতুবা নয়। সত্যের প্রত্যক্ষ প্রকাশ ভিন্ন যখন অভ্রান্ততার নিদর্শন পাওয়া যায় না, এবং শিষ্যের মনে যখন সত্য প্রত্যক্ষভাবে প্রকাশিত হয় নাই (কারণ প্রকাশিত হইলে আর গুরুর প্রয়োজন থাকিত না); তখন শিষ্য গুরুকে অভ্রান্ত বলিয়া জানিতে পারেন না, অর্থাৎ তিনি অভ্রান্ত নহেন।

আর একটা কথা। মনোরঞ্জন বাবুর দ্বিতীয় বাক্য (the second premise) শিষ্যের সম্বন্ধে সত্য নহে; কারণ শিষ্য যতক্ষণ শিষ্য, অর্থাৎ যতক্ষণ তাহার নিকট প্রত্যক্ষভাবে সত্য প্রকাশিত হয় নাই, ততক্ষণ তিনি জানেন না যে মানবের আত্মায় সত্য প্রত্যক্ষভাবে প্রকাশিত হয়, অর্থাৎ ঈশ্বরের বাণী শুনা যায়; সুতরাং তিনি কি প্রকারে বলিতে পারেন যে "ঈশ্বরের বাণী মানবাত্মায় প্রকাশ পায়" ইহা সত্য। যুক্তি শাস্ত্রের নিয়ম এই যে, যদি দুইটী বাক্যের (premises) মধ্যে একটী অসত্য হয়, তাহা হইলে সিদ্ধান্তও (conclusion) অসত্য। সুতরাং মনোরঞ্জন বাবুর "গুরু অভ্রান্ত" এই সিদ্ধান্ত যাহা "ঈশ্বরের বাণী মানবাত্মায় প্রকাশ পায়" এই অসত্য বাক্য (premise) হইতে করা হইয়াছে, তাহাও অসত্য; অর্থাৎ গুরু অভ্রান্ত নহেন।

আর একটা কথা। মানব যখন পরিমিত, অর্থাৎ সত্য যখন পূর্ণরূপে তাঁহার মধ্যে প্রকাশিত হইতে পারে না, তখন তিনি চিরদিনই অজ্ঞ অর্থাৎ ভ্রমশীল, অর্থাৎ ভ্রান্ত; সুতরাং শিষ্য যদি জানেনও যে গুরুর মধ্যে কোন সত্য প্রকাশিত হইয়াছে, তথাপি তিনি বলিতে পারেন না যে গুরু অভ্রান্ত, অর্থাৎ অপূর্ণ মানব পূর্ণ হইয়া গিয়াছে, সান্ত অনন্ত হইয়াছে। অতএব গুরু কোন ক্রমেই অভ্রান্ত হইতে পারেন না।

অবশেষে শ্রদ্ধেয় মনোরঞ্জন বাবু বলিয়াছেন, "ইহাতে কোন মানুষকে অভ্রান্ত বলা হইল না। কেবল অভ্রান্ত গুরুর কথাই বলা হইল।" তাহা হইলে মনোরঞ্জন বাবুর মতে গুরু মানুষ নহেন; কারণ তিনি স্পষ্টতঃ গুরু ও মানুষ এই দুই শ্রেণীবিভাগ করিলেন। গুরু যদি মানুষই না হইলেন, তবে "মানবাত্মায় ঈশ্বরের বাণী প্রকাশ পায়" এই যুক্তির দ্বারা গুরুর অভ্রান্ততা প্রমাণ হইল কিরূপে? একেই বলে যে ডালে বসা সেই ডালই কাটা।

শ্রদ্ধেয় মনোরঞ্জন বাবু যুক্তিদ্বারা গুরুর অভ্রান্ততা প্রমাণ করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। তাঁহার যুক্তিদ্বারা যদি গুরুর অভ্রান্ততা প্রমাণ হইয়া থাকে, তাহা হইলে তাঁহার যুক্তিও অভ্রান্ত; কারণ ভ্রান্ত যুক্তিদ্বারা কখনও অভ্রান্ততা প্রমাণ হইতে পারে না; আর তাঁহার যুক্তি যদি অভ্রান্ত হয়, তাহা হইলে তিনিও অভ্রান্ত; কারণ স্বয়ং ভ্রান্ত হইলে কখনও অভ্রান্ত যুক্তি উৎপাদন করিতে পারিতেন না; কারণে যাহা নাই তাহা কার্য্যে থাকিতে পারে না। তাঁহার যুক্তি যদি অভ্রান্ত গুরু প্রমাণ করে, তাহা হইলে তাঁহার যুক্তি গুরু অপেক্ষা অভ্রান্ত; আর তাঁহার যুক্তি যদি অভ্রান্ত হয়, তাহা হইলে তিনি স্বয়ং তাঁহার যুক্তি অপেক্ষা অভ্রান্ত; কারণ কার্য্য অপেক্ষা কারণ শ্রেষ্ঠ; সুতরাং মনোরঞ্জন বাবু মহা মহা অভ্রান্ত, অর্থাৎ তিনি অভ্রান্ত গুরুর পিতামহ।

শ্রদ্ধেয় মনোরঞ্জন বাবু বলিয়াছেন অভ্রান্ত গুরুবাদ ব্রাহ্মধর্ম্ম বিরোধী নহে। কেন নহে? যে যুক্তির বলে তিনি গুরুর অভ্রান্ততা প্রমাণ করিতেছেন, তাহা যখন মিথ্যা বলিয়া প্রমাণিত হইল, অর্থাৎ গুরুর অভ্রান্ততা যখন প্রমাণিত হইল না, অর্থাৎ তিনিই ভ্রান্তই রহিয়া গেলেন, তখন তাঁহাকে অভ্রান্ত বলিলে অসত্য কথা বলা হয়। যাহা অসত্য তাহা ব্রাহ্মধর্ম্ম বিরোধী; সুতরাং অভ্রান্ত গুরুবাদ ব্রাহ্মধর্ম্ম বিরোধী।

"ওঁ ব্রহ্মকৃপাহিকেবলং"।

দীনহীন
শ্রীঅবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

অভ্রান্ত গুরুবাদ সম্বন্ধে আমরা আরও অনেকগুলি পত্র প্রাপ্ত হইয়াছি। ক্রমে প্রকাশ করিবার ইচ্ছা আছে।

প্র—স

বিনীত নিবেদন এই—

১৬ই অগ্রহায়ণের তত্ত্বকৌমুদীতে শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন গুহ মহাশয়ের পত্র খানি পড়িয়া শঙ্কিত হইয়াছি। অসত্যকে বারপর নাই ভয় করি, কিন্তু সকল সময় তাহাকে চিনিয়া উঠিতে পারি, এরূপ বিদ্যা বুদ্ধি নাই। সুতরাং গভীর আধ্যাত্মিক বিষয়ের অবতারণার পূর্ব্বেই যদি "গোঁড়ামি" "অন্তঃসার শূন্যতা" ইত্যাদির বিভীষিকা এবং সত্য ও বিশ্বাসের বিরোধ বিষয়ক সুমিষ্ট শ্লেষের কয়েক মাত্রা সেবন করিয়া লইতে হয়, তবে অল্প বুদ্ধি লোক সহজেই শঙ্কিত হইতে পারে। পুনর্জ্জন্মের দৃষ্টান্তটী পড়িয়া ও আশ্বস্ত হইতে পারি নাই। কারণ এখনও সরল ভাবে (কিন্তু "অবিচারিত ভাবে" নয়) বিশ্বাস করি যে জন্মান্তরের রাজ্যে একবার মনুষ্য দেহ ধারণ করিয়া, বেঙ্গুছে বাঘ, ঢোঁড়া সাপ, চিংড়ি মাছ, ওলাউঠার বীজ ইত্যাদি পর্য্যায় ক্রমে অধোগমনের ব্যবস্থা নাই। ব্রাহ্ম অভিভাবকগণ যতই চিন্তাশীল, উপাসনাশীল এবং শ্রদ্ধাস্পদ হউন না কেন, তাঁহাদের উল্লিখিত রূপ বিশ্বাস থাকিলে, অন্ততঃ এবিষয়ে আমি তাঁহাদের পদানুসরণ করিতে অসমর্থ। সত্যই যখন আমাদিগের শাস্ত্র, তখন অসত্যে কি করিয়া বিশ্বাস স্থাপন করি? এর নাম যদি গোঁড়ামি হয়, তবে হে গোঁড়ামি! তুমি কমিও না, কমিও না, কমিও না।

স্বীকার্য্য-অধ্যায়ের অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী পারাগ্রাফটীর প্রারম্ভেই "ব্রাহ্মধর্ম্মের সাধন-তত্ত্বের মূলমন্ত্রের" উপর অভ্রান্ত গুরুবাদকে প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে। "প্রভু পরমেশ্বরকে প্রীতি করা এবং তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধন করা", ইহাই ত ব্রাহ্মধর্ম্ম, ইহাই ত তাহার সাধন, ইহাই ত তাহার তত্ত্ব, ইহাই ত তাহার মূল, ইহাই ত তাহার মন্ত্র। ইহাতে 'অভ্রান্ত' হইতে হইলে সর্ব্বাগ্রে নিজেরই অভ্রান্ত হওয়া প্রয়োজন, কারণ নির্ব্বাচন কর্ত্তা স্বয়ং। এ কথাটী গুহ মহাশয়ের উক্ত প্রবন্ধের আলোচ্য নহে বলিয়াছেন। আর বলিয়াছেন, "মানুষকে অভ্রান্ত বলা হইতেছে না, অভ্রান্ত গুরুর সম্বন্ধে আলোচনা করা হইতেছে।" অভ্রান্ত গুরুদের কি মনুষ্যত্ব লোপ পায়? বাস্তবিক ত্রিভুজের বাহু ছাড়িয়া কোণ মাত্র লইয়া "গৰ্দ্দভসেতু" * লঙ্ঘনের চেষ্টা যেরূপ, গুহ মহাশয়ের এ চেষ্টাও দেখিতেছি সেইরূপ। সুতরাং আগে এবিষয়টার একটা মীমাংসা না হইলে চলিতেছে না। গুরু অভ্রান্ত হইলে কি হইল, যদি আমি তাঁহাকে চিনিতে গিয়া ভুল করিয়া বসিলাম? অভ্রান্ত গুরু নির্ণয়ের একটী অভ্রান্ত উপায় চাহি। সে উপায়টী কি শিষ্য নির্দ্ধারণ করিবেন? তবে ত তাঁহার নিজেরই আগে অভ্রান্ত হওয়া চাহি। আর অভ্রান্ত হইলে তাঁর গুরুর প্রয়োজনই বা কি? সে উপায়টী কি গুরু বলিয়া দিবেন? তাহা হইলে ত নির্ব্বাচনই অগ্রিমস্থানগামী নয়, কারণ তাহার পূর্ব্বে গুরুকে গ্রহণ করিতে হইতেছে।

অভ্রান্ত গুরুর নির্ণয় সম্বন্ধে যদি এত গোল, তবে তাঁহার অস্তিত্ব লইয়া তর্কে কি লাভ?

"অভ্রান্ত" মানুষ কি হওয়া সম্ভব? মানুষ যে অপূর্ণ; আর তার চিরকাল উন্নতি হইবে—অর্থাৎ সে চিরকালই অপূর্ণ থাকিবে, নচেৎ উন্নতি বন্ধ হইবে। অপূর্ণ যে, সে কি অভ্রান্ত হইতে পারে? সুতরাং গুরু যদি অভ্রান্ত হইতে চাহেন, তাঁহাকে মানুষ ভিন্ন আর কিছু হইতে হইবে। একমাত্র সেই পূর্ণ পুরুষই আমাদের অভ্রান্ত গুরু সেই প্রভু সর্ব্বাগ্রে ভিক্ষা করি "অসত্য হইতে সত্যেতে লইয়া যাও।"

গুহ মহাশয়ের স্বীকার্য্যগুলি না মানিলেও অভ্রান্ত গুরুবাদ টিকিতেই পারে না। সে গুলি যিনি মানেন, তিনি যদি মানুষকে পূর্ণ করিয়া দিবার নূতন ক্ষমতাশালী পুরুষ না হন, তবে তিনি ও অভ্রান্ত গুরুবাদকে টিকাইতে পারিবেন না; কারণ; "মানুষ ভ্রান্ত" এই চতুর্থ স্বীকার্য্যটীকে তাহার এড়াইবার যো নাই।

এক্ষণে কতকগুলি কথা উপর্য্যুপরি রাখিয়া পত্রের উপসংহার করিতেছি।

১। ঈশ্বর অভ্রান্ত।

২। ঈশ্বরের বাণী অভ্রান্ত।

৩। মানুষ ভ্রান্ত।

৪। মানুষের শ্রুতি ভ্রান্ত।

৫। বিশ্বময় ঈশ্বরের বাণী অবিরত উচ্চারিত হইতেছে, কিন্তু এমন কোন মানুষ থাকা অসম্ভব এবং অযৌক্তিক যে, সেই বাণী শুনিতে এবং তদ্বিষয়ক উপদেশ দিতে তাহার কদাচ ভুল হইতে পারে না।

৬। তবেই ত আর মানুষ অভ্রান্ত গুরু হইতে পারিল না।

উপসংহারে এবিষয়ের অবতারণার জন্ত গুহ মহাশয়কে ধন্যবাদ করি। কিন্তু তাঁহার নিকট বিনীত নিবেদন এই যে, মতভেদ হইলেই যে প্রতিপক্ষ গোঁড়ামী, অবিচার, অসরলতা ইত্যাদি অপরাধে অপরাধী হয়, এরূপ মনে করিবার কোন কারণই নাই। বিশেষতঃ এরূপ যুক্তিতে আলোচনার উপর এক রশ্মিও আলোক নিক্ষেপ করে না। ইতি।

বিনয়াবনত

কলিকাতা শ্রীউপেন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী।

* "Ass's bridge."

ব্রাহ্মসমাজ।

উৎসব—থালোড় হইতে কোন বন্ধু লিখিয়াছেন;—

নিম্নলিখিত প্রণালী অনুসারে থালোড় ব্রাহ্মসমাজের ৬ষ্ঠ বার্ষিক উৎসব সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে;

১৮ই কার্ত্তিক রাত্রে উৎসবের উদ্বোধন ও উপাসনা বাবু রসিকলাল রায় সম্পন্ন করেন। ঐ দিন হইতে উপাসক মণ্ডলীর প্রাণে একটী নবভাবের সঞ্চার হইয়াছিল।

১৯এ কার্ত্তিক—কলিকাতা সাধনাশ্রম হইতে আগত শ্রীযুক্ত বাবু হরিমোহন ঘোষাল প্রাতে উপাসনার কার্য্য করেন এবং বৈকালে সমাজ গৃহে "জগাই মাধাই উদ্ধারের"

বিষয়ে কথকতা করেন। এই দিন কথকতা শুনিবার জন্য অনেক লোক আসিয়াছিলেন।

২০এ কার্ত্তিক—সমস্ত দিনব্যাপী উৎসব। প্রাতঃকালের উপাসনার কার্য্য কলিকাতা হইতে সমাগত শ্রীযুক্ত বাবু বিপিন চন্দ্র পাল সম্পন্ন করেন। মধ্যাহ্নে আলোচনা হয়। বৈকালে ধর্ম্ম সম্বন্ধে বিপিন বাবু একটি সুন্দর বক্তৃতা করিয়া সমাজ গৃহে আগত বহু সংখ্যক লোকের মনোরঞ্জন করেন। রাত্রে উপাসনার কার্য্য হরিমোহন বাবু করেন। উপাসনা মধুর ও হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল।

২১এ কার্ত্তিক—প্রাতে বাবু ভুবনেশ্বর ভট্টাচার্য্য উপাসনার কার্য্য করেন। বৈকালে বাগনানের বাজারে নগর সংকীর্ত্তন ও বক্তৃতা হয়। রাত্রে সমাজ গৃহে ব্যক্তিগত প্রার্থনা হয়।

২২এ কার্ত্তিক—রাত্রে শান্তিবাচন।

গত ২৯ নবেম্বর তারিখে খাসিয়া পাহাড়স্থ চেরাপুঞ্জী প্রচার আশ্রমের প্রথম সাম্বৎসরিক উৎসব নিম্নলিখিত প্রণালী অনুসারে সম্পন্ন হইয়াছে।

প্রাতে আশ্রমে বাঙ্গালা এবং খাসিয়া ভাষায় উপাসনা হয়। বাবু নীলমণি চক্রবর্ত্তী উপাসনা করেন। সন্ধ্যাকালে আশ্রমে প্রার্থনাদি হয়। এবং ক্ষুদ্র একটী প্রবন্ধ পঠিত হয়। পরে বাঙ্গালা এবং খাসিয়াতে প্রার্থনা হয়।

সিরাজগঞ্জ ব্রাহ্মসমাজের পঞ্চদশ বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে কলিকাতা হইতে প্রচারক শ্রীযুক্ত নবদ্বীপচন্দ্র দাস এবং শ্রীযুক্ত হরিমোহন ঘোষাল তথায় গমন করেন। নিম্নলিখিত রূপে তথাকার উৎসব সম্পন্ন হইয়াছে ;—

১২ই অগ্রহায়ণ রবিবার—প্রাতে ব্রহ্মমন্দিরে উৎসবের উদ্বোধন হয়। নবদ্বীপ বাবু উপাসনা করেন। অপরাহ্নে বাজারে কীর্ত্তন ও বক্তৃতা হয়। হরিমোহন বাবু বক্তৃতা করেন। রাত্রিতে পুনরায় মন্দিরে উপাসনা ও উপদেশ হয়, নবদ্বীপ বাবু উপাসনা করেন। ১৩ই অগ্রহায়ণ রাত্রিতে মন্দিরে নবদ্বীপ বাবু "ব্রাহ্মসমাজে ঈশ্বরের শক্তির পরিচয়" এ বিষয়ে বক্তৃতা করেন। ১৪ই অগ্রহায়ণ সমস্ত দিনব্যাপী উৎসব। দুই বেলা উপাসনা, উপদেশ, পাঠ ব্যাখ্যা ও আলোচনা হয়। নবদ্বীপ বাবুই সমস্ত কার্য্য করেন। ১৫ই তারিখে সন্ধ্যাকালে বাজারের নিকটবর্ত্তী ধানগড়া নামক গ্রামে মুসলমানদিগের সভার অধ্যক্ষ কর্ত্তৃক আহূত হইয়া সেখানে সকলে উপস্থিত হন। প্রার্থনার পর নবদ্বীপ বাবু ও হরিমোহন বাবু উভয়ে বক্তৃতা করেন, সেখানে প্রায় তিন শত লোক উপস্থিত হইয়াছিলেন, বক্তৃতা শুনিয়া তাহারা প্রীত হইয়াছিলেন। ১৬ই অগ্রহায়ণ উৎসবের শেষ দিন নবদ্বীপ বাবু উপাসনা করেন। উপাসনান্তে শ্রীমান্ অনাথ বন্ধু সরকার ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হন।

পাবনা হইতে বাবু কৈলাসচন্দ্র বাগছি লিখিয়াছেন ;—

গত ৪ঠা ও ৫ই অগ্রহায়ণ, শনি ও রবিবার দুইদিন পাবনা ব্রাহ্মসমাজের সপ্তত্রিংশ সাম্বৎসরিক উৎসব সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। প্রচারক শ্রীযুক্ত নবদ্বীপচন্দ্র দাস মহাশয় এতদুপলক্ষে এখানে আসিয়াছিলেন। প্রথম দিন প্রত্যূষে ঊষা সঙ্গীত করিতে করিতে সহরের অনেক স্থান প্রদক্ষিণ করিয়া সমাজে উপস্থিত হওয়া যায়। দ্বিতীয় দিনও ঐরূপ ঊষা কীর্ত্তন হয়। প্রথমদিন প্রাতে মন্দিরে নবদ্বীপ বাবু উপাসনা করেন। অপরাহ্নে বাজারে কিছুক্ষণ কীর্ত্তনের পর নবদ্বীপ বাবু "সকলেরই নিজ নিজ কর্ম্মফল ভোগ করিতে হইবে" এই বিষয়ে বক্তৃতা করেন। তৎপর কীর্ত্তন করিতে করিতে মন্দিরে যাওয়া যায়, সন্ধ্যাকালে বাবু হেরম্বচন্দ্র মৈত্র মহাশয় "আদর্শ অনুসারে জীবন পথে অগ্রসর হওয়া উচিত" এই বিষয়ে ইংরাজীতে একটী বক্তৃতা করেন। দ্বিতীয় দিন দুই বেলা মন্দিরে উপাসনা উপদেশ পাঠ ও ব্যাখ্যা হয়। নবদ্বীপ বাবু আচার্য্যের কার্য্য করেন।

বিজ্ঞাপন।

আগামী ১১ই জানুয়ারী ১৮৯৩ বৃহস্পতি বার অপরাহ্ন ৬ ঘটিকার সময় সিটিকলেজ ভবনে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অধ্যক্ষ সভার ৪র্থ ত্রৈমাসিক অধিবেশন হইবে।

বিবেচ্য বিষয়।

১। চতুর্থ ত্রৈমাসিক কার্য্যবিবরণ ও হিসাব।

২। আগামী বর্ষের অধ্যক্ষ সভার জন্য ভোট গণনাকারী সবকমিটী নিয়োগ।

৩। কার্য্যনির্ব্বাহক সভার সভ্য নিয়োগ সম্বন্ধীয় অবান্তর নিয়মের কিছু কিছু পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে কার্য্যনির্ব্বাহক সভার প্রস্তাব।

৪। বিধবা অথবা বিপত্নীদিগের পুনর্ব্বিবাহ সম্বন্ধীয় নির্দ্ধারণ সম্বন্ধে পুনর্ব্বিচারের জন্য বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত প্রস্তাব উপস্থিত করিবেন।

৫। সমাজের বার্ষিক কার্য্যবিবরণ সম্বন্ধে বিচার।

৬। বিবিধ।

সাঃ ব্রাঃ সমাজ কার্য্যালয়
২১১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট
কলিকাতা ৭ই ডিসেম্বর ১৮৯৩

শ্রীগুরুচরণ মহলানবিশ।
সাঃ ব্রাঃ সমাজ সম্পাদক

ভোটিং পত্র।

আগামী বর্ষের অধ্যক্ষ সভা গঠনের নিমিত্ত ভোটিং পত্র সভ্যগণের নিকট প্রেরিত হইয়াছে। যদি কোন সভ্য ভোটিং পত্র প্রাপ্ত না হন, অনুগ্রহ পূর্ব্বক সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ কার্য্যালয়ে জানাইলে পাইতে পারিবেন। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের মফঃস্বলস্থ সভ্য মহোদয়গণকে বিশেষ ভাবে অনুরোধ করা যাইতেছে যে তাঁহারা যেন স্ব স্ব ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক মহাশয়গণের নিকট হইতে ভোটিং পত্র লইয়া এবং তাহা পূরণ করিয়া আগামী ৫ই জানুয়ারী ১৮৯৪ তারিখের মধ্যে নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইয়া আমাদিগকে বাধিত করেন।

সাঃ ব্রাঃ সমাজ
২১১নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট
কলিকাতা ১লা পৌষ ১৩০০

শ্রীঅঘোরনাথ মুখোপাধ্যায়।
সহকারী সম্পাদক সাঃ ব্রাঃ সমাজ

কোলের দেশে চাঁইবাসা সহরে ব্রাহ্মসমাজের একটি মন্দির প্রতিষ্ঠা করিবার প্রস্তাব হইয়াছে। ইহাতে আনুমানিক এক হাজার টাকা ব্যয় হইবে। সহরটি নিতান্ত সামান্য ও দরিদ্র হইলেও এখানকার অধিবাসিগণ অনুগ্রহ পূর্ব্বক ইতিমধ্যেই ৩২১ টাকা স্বাক্ষর করিয়াছেন এবং আরও শতাবধি টাকা এস্থান হইতে সংগৃহীত হইবার সম্ভাবনা। যদ্যপি এখনও অনেক টাকার অভাব রহিয়াছে, তথাপি ভগবানের কৃপা ও সাধারণের দাতব্যের উপর নির্ভর করিয়া, আমরা এই গুরুতর কার্য্য আরম্ভ করিয়াছি। এক্ষণে সর্ব্বসাধারণের নিকট আমাদের সানুনয় প্রার্থনা যে তাঁহারা কৃপা করিয়া এই অনুষ্ঠিত কার্য্যে সহায়তা করিবেন। দান যতই সামান্য হউক না কেন সাদরে ও কৃতজ্ঞতার সহিত গৃহীত হইবে। কলিকাতা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের পূজনীয় শ্রীযুক্ত বাবু মহেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় এবং পণ্ডিত নবদ্বীপচন্দ্র দাস মহোদয়গণকে দান গ্রহণ করিবার ভার দেওয়া হইয়াছে।

চাঁইবাসা
২রা ডিসেম্বর ১৮৯৩

শ্রীঅঘোরনাথ ঘোষ।
সম্পাদক

২১১নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট ব্রাহ্ম মিশন যন্ত্রে শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দত্ত কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও ৭ই পৌষ প্রকাশিত।

ধর্ম্ম ও সমাজতত্ত্ব বিষয়ক পাক্ষিক পত্রিকা।

১৮শ সংখ্যা। ১৬শ ভাগ।

১৬ই পৌষ, শনিবার, ১৮১৫ শক, ব্রাহ্ম সম্বৎ ৬৪।

বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২৷৷০
মফস্বলে ৩
প্রতি খণ্ডের মূল্য ৵০

জীবন সঞ্চার।

কোমল শিশির-বিন্দু পড়ে কোন্ ক্ষণে ?
কে সাজায় নব দুর্ব্বাদলে ?
রবিতাপে খিন্ন তরু, কে তারে গোপনে
সিক্ত করে শান্তি-প্রদ জলে ?

দেখিনা ত কোন্ ক্ষণে জমে সে শিশির,
মুক্তাপাঁতি বিমল প্রভাতে,
প্রেমাশ্রু-সলিল-সিক্ত মুখে প্রকৃতির
দেখি শুধু অরুণ-বিভাতে।

ধরার উত্তপ্ত মুখে স্নিগ্ধ কর দিয়া
কবে বায়ু করে সম্ভাষণ ?
যে পরশে প্রেম-বিন্দু শিশির হইয়া
সেই তাপ করে নিবারণ ?

জানিনা ত কবে পড়ে সে শিশির বারি,
দেখি শুধু সৌন্দর্য্য তাহার,
সংসার-তাপিত চিত্তে করুণা তাঁহারি
গোপনেতে বর্ষে এ প্রকার।

হৃদয় পাতিয়া থাক উর্দ্ধপানে চেয়ে
দুর্ব্বাদল যথা সদা রয় ;—
বর্ষিবে সে কৃপারাশি জেন সুসময়ে
যাবে তাপ যুড়াবে নিশ্চয়,

আসিছে বসন্ত কাল, তাপিত সংসারে,
তরুলতা সাজিবে আবার,
জীর্ণ অবসন্ন তরু অমৃত আসারে
পাবে, হবে জীবন-সঞ্চার।

সম্পাদকীয় মন্তব্য।

নিরাশা ও আশায় দ্বন্দ্ব—উৎসব সমাগত। আবার আশাপূর্ণ নয়নে ব্রাহ্মগণ মহোৎসবের দিকে চাহিতেছেন। যদি কেহ বলেন, তোমরা ত বার বার আশা কর, বার বার ঈশ্বরের করুণা লাভ কর, অথচ বার বার তাহার সমুচিত ব্যবহার কর না, তবে আর আশা কর কেন ? আমরা মুক্ত-কণ্ঠে ও অবনতমস্তকে আপনাদের সকল দুর্ব্বলতা স্বীকার করি—অথচ আবার আশা করি। এই আশাই আমাদের জীবন। জীবনের উচ্চ আদর্শ যাঁহারা হৃদয়ে ধারণ করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে নিরন্তর এই নিরাশা ও আশার মধ্যে আন্দোলিত হইতে হয়। ব্রাহ্মধর্ম্ম আমাদের নিকট যে উন্নত আদর্শ প্রকাশ করিয়াছেন, তদনুসারে ব্যক্তিগত জীবন ও সামাজিক জীবনকে গঠন করা কি সহজ কথা ? যখনই আমরা আত্ম-পরীক্ষা করিব তখনই দেখিব যে আদর্শ হইতে অনেক দূরে রহিয়াছি। তবে আমরা সকল সময় আত্মপরীক্ষা করি না, বলিয়াই নিরন্তর আত্মগ্লানি সহ্য করি না এবং অনেক সময়ে যেখানে আত্ম-তৃপ্তির কারণ নাই সেখানেও আত্ম-তৃপ্ত হইয়া থাকি। ইহার উপরে স্মরণ রাখিতে হইবে যে আমাদের কার্য্য করিবার শক্তিও অল্প। আমরা হৃদয়ের উত্তেজনাতে অনেক কার্য্যে হস্তার্পণ করি, যাহা সুচারুরূপে সম্পন্ন করিতে আমাদের শক্তিতে কুলায় না। অনেক স্থলে আমাদের বিবেকের দুর্ব্বলতা বশতঃও আমরা অনেক কর্ত্তব্যসাধনে পরাঙ্মুখ থাকি। আপনাদের এই সকল দুর্ব্বলতা স্মরণ হইলে, বাস্তবিক এক এক সময়ে নিজেদের প্রতি এতই অশ্রদ্ধা হয়, যে তখন আর আপনাদিগকে ঈশ্বর ও মানবের সেবার উপযুক্ত বলিয়া মনে হয় না। কিন্তু মানবের আধ্যাত্মিক জীবনের গূঢ় রহস্য এই যে নিরাশার পার্শ্বে আশা লুকাইয়া থাকে ;—মানবের দুর্ব্বলতার মধ্যেই ঈশ্বরের সবলতা নিহিত থাকে। প্রকৃত বিশ্বাসী ব্যক্তি আপনার দুর্ব্বলতা যতই গভীররূপে অনুভব করিয়া থাকেন, তাঁহার করুণার উপরে ততই গাঢ় নির্ভর উপস্থিত হয়। অতএব শত দুর্ব্বলতা সত্ত্বেও আজ ব্রাহ্মগণ আশাপূর্ণ অন্তরে প্রভু পরমেশ্বরের করুণার দিকে চাহিতেছেন। বৎসর যতই শেষ হইয়া আসিতেছে ; আত্ম-পরীক্ষার তীব্র ছুরিকা আমাদের হৃদয় মনকে কাটিতেছে। কত শুভ সংকল্প বিফল হইয়াছে, কত অনুষ্ঠিত কার্য্য পরিত্যক্ত হইয়াছে, কত শুভ উদ্যোগ অসমাপ্ত রহিয়াছে ; কত ভ্রম, প্রমাদ, ত্রুটী দুর্ব্বলতা সঞ্চিত হইয়াছে। আজ কোন্ ব্রাহ্ম এরূপ আছেন, যিনি মহোৎসবের আনন্দ ভেরীর নিনাদ শুনিয়া

উঠিয়া দাঁড়াইবার সময়ে এ কথা বলিবেন না—"আমার যাহা করা উচিত ছিল অথচ করিতে পারিলাম না, প্রত্যুত যাহা করা অনুচিত ছিল অথচ করিলাম, আমার সে সকল অপরাধ ক্ষমা কর আমি অনুতাপ সহকারে প্রার্থনা করিতেছি।" তবে কথা এই আর মৃত সংকল্পের শ্মশানে বসিয়া রোদন করিয়া কি হইবে, অনুতাপাশ্রুরূপ প্রায়শ্চিত্তের পণ উৎসর্গ করিয়া আমাদিগকে নবশক্তি লাভের জন্ম প্রার্থনাপূর্ণ অন্তরে উঠিয়া দাঁড়াইতে হইবে। এই ব্যাপার জীবনে সর্ব্বদা চলিতেছে। এই নিরাশা ও আশার দ্বন্দ্বে ঈশ্বর আমাদের সহায় হউন।

নিম্নভূমি—সর্ব্বদাই দেখা যায়, মানুষ যতক্ষণ কোনও গুরুতর কার্য্যে হস্তার্পণ না করে, কোনও কঠিন ব্রত সাধনের ভার আপনার উপরে না লয়, ততক্ষণ সে আপনার বলের প্রকৃত পরিমাণ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না। কর্ত্তব্য ক্ষেত্র হইতে দূরে বসিয়া অনেক দুর্ব্বল ব্যক্তি আপনাকে সবল ভাবিতে পারে, ভীরু আপনাকে সাহসী বিবেচনা করিতে পারে, সংকীর্ণ-চেতা ব্যক্তি আপনাকে উদার মনে করিতে পারে, কিন্তু সেই সকল ব্যক্তি যখন কার্য্যক্ষেত্রে অবতরণ করেন, যখন কোনও গুরুতর দায়িত্ব আপনাদের উপরে গ্রহণ করেন, যখন কোনও মহৎ-আদর্শ কার্য্যে পরিণত করিতে প্রয়াসী হন, তখন আপনাদের দুর্ব্বলতা আপনাদের চক্ষে প্রতিভাত হইতে থাকে; তখন অন্তরের গূঢ় ব্যাধি যে কিছু আছে তাহা ধরা পড়ে। আমরা ব্রাহ্মধর্ম্মের উচ্চ আদর্শ জীবনে সাধন করিতে গিয়া এবং ব্রাহ্মসমাজের মহৎ কার্য্যে হস্তার্পণ করিয়া আপনাদের অন্তরে কোথায় কি ব্যাধি আছে, তাহা প্রতিদিন লক্ষ্য করিতে পারিতেছি। ইহা ত পরম লাভ। ইহাতে বিনয় আনিয়া দেয়। যেখানে বিনয় সেইখানেই ব্রহ্মকৃপা। অতএব মহোৎসবের আনন্দে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে আমরা এই বিনয়কে হৃদয়ে স্থান প্রদান করি। আপনাদের কোথায় কোন ব্যাধি আছে, তাহা জানিতে ত আর বাকি নাই। সেই সকল স্মরণ করিয়া অবনত মস্তকে ব্রহ্ম-কৃপার জন্ম অপেক্ষা করি। বৃষ্টির জল সর্ব্বত্রই পতিত হয়, কিন্তু উচ্চভূমি হইতে তাহা গড়াইয়া চলিয়া যায় এবং নিম্ন ভূমিতে গিয়া সঞ্চিত হইয়া থাকে। ইহা অতি প্রাচীন দৃষ্টান্ত। কিন্তু ইহার প্রাচীনতা নিবন্ধন ইহার গভীরতা যেন আমরা বিস্মৃত না হই। এই যে মহোৎসব আসিতেছে এতদ্দ্বারা কে সমধিক উপকৃত হইবে? বিনয়ে যাঁহার মস্তক অবনত থাকিবে উৎসব তাঁহারই জন্ম আসিবে। কত উৎসবে আমরা দেখিয়াছি ব্রহ্ম কৃপার স্রোত বন্যার জলের ন্যায় প্রবাহিত হইয়াছে; যাঁহারা অহঙ্কারে বা অপ্রেমে মস্তক উন্নত করিয়া থাকিয়াছেন, তাঁহারা সকলে বঞ্চিত হইয়াছেন, তাঁহারা যে শুষ্ক হৃদয় লইয়া ছিলেন তাহা লইয়াই পড়িয়া থাকিয়াছেন আর যাঁহাদের হৃদয় নিম্ন ভূমির ন্যায় অবনত থাকিয়াছে তাঁহারাই ব্রহ্ম-কৃপার স্রোত প্রাণ ভরিয়া সম্ভোগ করিয়াছেন। জগদীশ্বর সুসময়ে আমাদিগকে বিনয় দিয়া উৎসবের জন্ম প্রস্তুত করুন।

প্রকৃত নির্ভরশীলতা—আহারাচ্ছাদন প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার শারীরিক প্রয়োজনীয় পদার্থের জন্ম চিন্তিত না হইয়া সম্যকরূপে সে সকল বিষয়ে পরমেশ্বরের প্রতি ভারার্পণ করিয়া এবং তাঁহার প্রতি নির্ভরশীল হইয়া, তাঁহার ইচ্ছা পালন করা, তাঁহার প্রিয়কার্য্যে রত থাকা, ইহাই সর্ব্ব সময়ের সর্ব্ব দেশের বিশ্বাসিগণের লক্ষণ বলিয়া অভিহিত হইয়া আসিতেছে। সংসারের চিন্তা একেবারে দূর করিয়া সে সকল বিষয়ের ভার সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরে সমর্পণ করিতে পারা একদিকে যেমন বিশ্বাসের লক্ষণ, অপরদিকে এসকল ক্ষুদ্র বিষয়ের জন্ম লোকের মুখাপেক্ষী হওয়া এবং মানবের সাহায্য-প্রার্থী হওয়া বা মানবের উপর নির্ভর করা, তেমনি হীনতা-ব্যঞ্জক এবং আশঙ্কাজনক। সাধক সর্ব্বদাই আহার-পান প্রভৃতি বিষয়ে ঈশ্বরের উপরে নির্ভর করিবেন। তিনি যে ভাবে রাখেন, যে ভাবে চলিতে বলেন সে ভাবেই থাকিবেন এবং চলিবেন। তাহা যেমন গৌরবকর তেমনি নিরাপদ। দুর্ব্বল মানবের প্রতি সাধকের আস্থা এমন কম যে সামান্য শারীরিক প্রয়োজন সাধনার্থও তাহার উপর নির্ভর করিতে সাহসী হন না এবং তাহাকে নিরাপদ অবস্থা জ্ঞান করেন না। বরং সেরূপ করাকে অত্যন্ত লঘুতা-ব্যঞ্জক ও গৌরব-হানিকর বলিয়াই জানেন। সামান্য শারীরিক প্রয়োজন সিদ্ধ করিবার জন্যই যদি লোকের প্রতি নির্ভর করিতে ভরসা না হয় এবং তাহা যদি ধর্ম্মহানিকর ও বিশ্বাসের অল্পতার পরিচায়ক হয়—যে শরীরের সহিত অতি অল্প সময়ই আত্মার সম্বন্ধ থাকিবে, যে শরীরের অস্তিত্ব কয়েক বৎসর বা মাস বা দিনেই পর্য্যবসিত হইবে, যাহার প্রয়োজন অতি সামান্য চেষ্টা ও যত্নে সিদ্ধ হইতে পারে, তাহার ভারই যদি মানবের প্রতি দেওয়া এত আশঙ্কা-জনক ও ধর্ম্মহানিকর হয়, তাহা হইলে যে আত্মা অনন্ত কাল থাকিবে—অনন্ত উন্নতিই যাহার স্বভাব, তাহার কল্যাণ সাধনের ভার লোকে কোন্ ভরসায় যে আর একজন ক্ষুদ্র, দুর্ব্বল ও সামান্য জ্ঞানসম্পন্ন মানবের উপর প্রদান করিয়া নিশ্চিন্ত হইতে চায় তাহার রহস্য বুঝা যায় না। শরীরের জন্য ভাবনা করা ধর্ম্মহানিকর, তাহার ভার অন্য লোকের উপর দেওয়া যদি হীনতা-ব্যঞ্জক ও অপমানকর হয় তবে আত্মার ভার অন্য মানবের দেওয়া কি হীনতার প্রকাশক নয়, তাহা কি আত্মার অপমানকর নয়? শরীরের ভারই যদি অন্য লোকের প্রতি দিতে ভরসা না হয় তাহা হইলে আত্মার ভার কোন্ ভরসায় অন্য লোকের প্রতি দেওয়া যাইতে পারে? যাঁহারা এরূপে আত্মার ভার অন্য লোকের উপর দেন, তাঁহারা হয় আত্মার প্রতি উদাসীন; না হয় আত্ম-জ্ঞানে বঞ্চিত। যাঁহারা ভরসা করিয়া আত্মার ভার ঈশ্বরে অর্পণ করিতে পারেন না, তাঁহাতে নির্ভরশীল হইয়া তাঁহার মুখাপেক্ষী হইয়া ও তাঁহার ব্যবস্থার অপেক্ষায় থাকিতে সাহসী হন না, তাঁহাদের ঈশ্বরের প্রতি শারীরিক ভারার্পণের কথাও অসঙ্গত ও অর্থহীন হইয়া পড়ে। তাঁহারা ঈশ্বরকে একটা কথার কথা বলিয়া মনে করেন। কাজের বেলায় তাঁহাতে নির্ভরশীল হইতে পারেন না। প্রকৃত বিশ্বাসী তিনি, যিনি কি শারীরিক কি আধ্যাত্মিক সকল

বিষয়েই সেই সর্ব্বশক্তিমানের প্রতিই নির্ভরশীল হন। কেবল শরীরের ভার নয়; কিন্তু সম্পূর্ণরূপে আত্মার ভারও তাঁহাতে অর্পণ করিয়া আশ্বস্ততার সহিত তাঁহারা ধর্ম্মপথে চলিয়া যান। ব্রাহ্মগণ শরীর ও আত্মা উভয়ের ভারই পরমেশ্বরে অর্পণ করিতে অভ্যস্ত হউন। তাহাতেই পরম কল্যাণ লাভ হইবে। ঈশ্বর আমাদিগকে শুভ মতি প্রদান করুন যেন সকল বিষয়েই আমরা তাঁহার মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে পারি।

কে ঈশ্বরের করুণার সাক্ষী দিবে?—সর্ব্বত্রই ঈশ্বরের নাম প্রচার করিবার জন্য লোকের প্রয়োজন। যে সকল ব্রাহ্ম নরনারী তাঁহার করুণায় নবজীবন পাইয়াছেন—তাঁহার করুণার পরিচয় পাইয়াছেন—তাঁহারা কি সেই করুণার কথা জগতের নরনারীর নিকট বলিয়া পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্মের শীতল ছায়াতে সকলকে ডাকিবেন না? আমরা সর্ব্বদাই অনুভব করিতেছি ব্রাহ্মধর্ম্মের সমাচার নরনারীর নিকট বলিবার জন্য শত শত ব্রাহ্ম ব্রাহ্মিকার জীবন উৎসর্গ করা প্রয়োজন। যাহা বুঝিতেছি তাহার অনুসরণ করিয়া সকলকেই আহ্বান করিতেছি—যাহারা ঈশ্বরের করুণার সাক্ষী দিতে ইচ্ছুক তাঁহারা ত্বরায় জীবন মন এই কার্য্যে নিয়োগ করুন। জীবনের যত বেশী দিন তাঁহারা করুণার কথা বলিতে পারেন ততই ভাল। যাঁহাদের প্রাণে ইচ্ছা আছে—ও যাঁহারা তাঁহার ডাক অনুভব করিতেছেন তাঁহারা আর বিলম্ব করিবেন না। আমরা ঈশ্বরের কার্য্যে ঈশ্বরের নামে তাঁহাদিগকে ডাকিতেছি। আমাদের এই ডাক কাহারও কর্ণে না পৌছিলেও প্রভু তাঁহার কার্য্য করাইবার জন্য লোক ডাকিয়া আনিবেন, এই বিশ্বাসের অধীন হইয়া সকলকে ডাকিতেছি ও তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিতেছি, তিনিই তাঁহার কার্য্য করাইয়া লইবেন। ব্রাহ্মধর্ম্মের কার্য্য-অতি বিস্তৃত, এখানে কার্য্য করিবার লোকের সংখ্যা অতি অল্প। পঞ্জাবে প্রচারক্ষেত্র খুলিবার জন্য প্রস্তাব হইতেছে, পূর্ব্ববাঙ্গালায় বিশেষ ভাবে প্রচারের বন্দোবস্ত আবশ্যক। বোম্বে, মান্দ্রাজ প্রভৃতি প্রদেশে লোক প্রেরণ করা অত্যন্ত প্রয়োজন। জাপান ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিবার অতি উপযুক্ত ক্ষেত্র। কিন্তু তাঁহার ক্ষেত্রে কাজ করে লোক কোথায়? আমরা আবার ঈশ্বরের নামে ব্রাহ্ম নরনারীদিগকে আহ্বান করি, যাঁহারা তাঁহার কার্য্যে জীবন দিতে ইচ্ছুক, তাঁহারা আর বিলম্ব করিবেন না। এবার মাঘোৎসবের পরে যেন সকলে কার্য্যক্ষেত্রে বিশেষ ভাবে প্রবেশ করিতে পারেন। ঈশ্বরের আহ্বান শ্রবণ করিয়া তাঁহার করুণায় নির্ভর করিয়া একাগ্যে অগ্রসর হউন। তিনিই তাঁহার পথ দেখাইবেন, তিনিই এপথের সহায়, কোনও ভয় নাই। তাঁহার কার্য্যে এ জীবন দিতে পারিলে কিনা হইল। ঈশ্বর আমাদের সহায় হউন।

কার্য্যে-সুশৃঙ্খলা—ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যে সুশৃঙ্খলতার অভাব সর্ব্বদাই অনুভব করা যায়। উচ্চ আদর্শ লইয়াই অনেক সময় কার্য্যের অনুষ্ঠান হয়, কিন্তু কিছুদিন যাইতে না যাইতেই দেখি সেই আদর্শ হইতে দূরে পড়িয়াছি। মনে মনে কতই সুন্দর ছবি গড়িয়া, কাগজে অঙ্কিত করিতে গেলাম, কিন্তু কাগজে আর সেই ছবি অঙ্কিত হইল না, এখন সে ছবি কদাকার। মন আর সেই ছবি দেখিয়া সন্তুষ্ট হয় না। প্রায় প্রত্যেক কার্য্যেই এই প্রকার ভাব দেখিতেছি। স্থিরচিত্তে ইহার কারণ অনুসন্ধান করিলে, এই শিথিলতার মূলে বিশেষভাবে আমাদের হৃদয় নিহিত যে দুই একটী দোষ লক্ষিত হয়, এস্থলে তাহারই উল্লেখ করিব। প্রথম কারণ এই আমরা অনেক কার্য্য আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে বিশেষ চিন্তা ও আত্ম-পরীক্ষা করি না। সেই কার্য্য পরিচালন করিবার শক্তি ও সামর্থ্য আমাদের মধ্যে আছে কি না, তাহার বিষয় বিশেষরূপে ভাবি না। অতি দায়িত্ব-বিহীনভাবে অনেক কার্য্যের সূচনা করি, কিন্তু ইহার পরিণাম কে রক্ষা করিবে, কি ভাবে রক্ষা হইবে, তাহার বিষয় ভাবি না। কোন কার্য্যে হস্ত দিবার পূর্ব্বে সেই কার্য্য পরিচালনের উপযুক্ত ব্যক্তির অনুসন্ধান করা যে একান্ত কর্ত্তব্য তাহা একেবারে ভুলিয়া যাই। জগতে অনেক সৎকার্য্য আছে, কিন্তু জীবনের লক্ষ্যের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া সেই কার্য্যে কতটুকু লিপ্ত হইতে পারিব, তাহা বিবেচনা না করিয়া গুরুতর কার্য্যে আমরা হাত দি। তাহার ফল এই হয় যে, সেই কার্য্যে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয়।

ইহার দ্বিতীয় কারণ কার্য্যে অনুরাগ ও কর্ত্তব্যপরায়ণতার অভাব। আমাদের জীবনে এক প্রকার এমন লঘুভাব রহিয়াছে যে, আমাদের জীবনের নিকট যাহা উপস্থিত হয়, তাহাই ধরি ও তাহার পশ্চাতেই ছুটী। সমাজ ও ব্যক্তিগত জীবনের যেন কোন কেন্দ্র নাই। সৎকার্য্য আমাদের জীবনের নিকট অনেক সময় প্রলোভনের কার্য্য করে। একটী দৃষ্টান্ত দিলে আমাদের কথা পরিষ্কার হইবে। ব্রাহ্মসমাজের প্রধান কার্য্য আধ্যাত্মিক উন্নতি। সেই কার্য্যের সহায়তার জন্য মন্দির প্রতিষ্ঠা, উপাসকমণ্ডলী, আচার্য্য ইত্যাদি। যদি সমাজের অন্ততঃ ৪।৫ জন প্রধান প্রধান ব্যক্তি দিনরাত এই কাজের জন্য খাটেন, তবে এই উপাসকমণ্ডলীর উন্নতি হয়। কিন্তু তাহা হইতেছে না। মুখ্য ও গৌণকার্য্যের বিচারে আমাদের শক্তি অতি অল্প। আমাদের লোকের যদি অল্পতা থাকে, অনেক কার্য্যভার না লইলেই হয়। আশা করি, নববর্ষের কার্য্যারম্ভের সময় এই সকল বিষয় আলোচিত হইবে।

সম্পাদকীয় ও প্রাপ্ত প্রবন্ধ।

ব্রহ্মোৎসব

কুসুমকুন্তল তরুগণ এবং কুসুমকুন্তলা লতারাজি যখন সুসময়ে সৃষ্টির সর্ব্বোত্তম উপাদেয় ও মনোহর আভরণে ভূষিত হইয়া, সুসৌরভে চারিদিক আমোদিত করিতে থাকে, যখন তাহারা ফুলসাজে সজ্জিত হইয়া উল্লাসের সহিত মধু সঞ্চয়কারী মধুকরগণকে প্রমত্ত করিয়া, আকর্ষণ করিতে থাকে এবং তাঁহাদের অনুকূল আমন্ত্রণে আমন্ত্রিত হইয়া লুণ্ঠনব্যবসায়ী মধুকরগণ

যখন আপনাদের চিরাভ্যস্ত লুণ্ঠন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া, মধুভাণ্ডে মুখ দিয়া মধু সঞ্চয় করিতে থাকে এবং আপনাদের স্বভাবসুলভ চপলতা বিস্মৃত হইয়া, যখন শান্তভাবে মধু সঞ্চয়ে নিযুক্ত থাকে এবং মধুর গুন গুন ধ্বনিতে চারিদিক প্রতিধ্বনিত করিতে থাকে, তখন মনে হয়, তাহারা উৎসব করিতেছে। কারণ উৎসব সেই অবস্থাকেই বলা উচিত,যে অবস্থায় সর্ব্বাপেক্ষা প্রার্থনীয় এবং প্রিয় পদার্থের সহিত সংযোগ ঘটে। যাহা সর্ব্বাপেক্ষা লভনীয় এবং আরাম ও কল্যাণপ্রদ তাহার সহিত সম্মিলনই প্রকৃত আনন্দের উপযুক্ত সময়। মধুমক্ষিকাদিগের পক্ষে মধু-সংগ্রহের কালই সর্ব্বাপেক্ষা প্রার্থনীয় কাল। তাহাই তাহাদের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা শান্তি আরামপ্রদ সময়। সে সময়ে তাহাদের স্বভাবেও আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন লক্ষিত হয়। তাহাদের স্বভাবসুলভ নিত্য চপলতা আর তখন লক্ষিত হয় না। এমন যে চপল—এমন কে অস্থির, যাহারা মুহূর্ত্তকালও স্থিরভাবে অবস্থিতি করে না, তাহারাও তখন শান্তভাবে মধুভাণ্ডে মুখ সংলগ্ন করিয়া আনন্দে মধুপান করে, মধু সঞ্চয় করে এবং গুন গুন ধ্বনিতে তাহাদের সুসময়দাতার মহিমা কীর্ত্তন করে। তখন তাহারা দুর্ব্বল হইয়াও সবল হয় সহজভীরু হইয়া নির্ভীক হয়, তখন তাড়াইলে তাহারা আপন স্থান হইতে বিচলিত হয় না। মধুকরের পক্ষে ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম সময় এবং প্রার্থনীয় অবস্থা। তাহাদের পক্ষে ইহাই প্রকৃত মহোৎসব।

উপরে যাহা বর্ণিত হইল তাহা দ্বারাই আমাদের ব্রহ্মোৎসব কি তাহা বুঝা যাইতেছে। মানবাত্মার পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা প্রার্থনীয় এবং কল্যাণকর অবস্থা কি? ব্রহ্ম-সত্তাতে নিমগ্ন হইয়া মানব যখন আত্মার চিরসম্বল চিরকালের অবলম্বন অমৃত ধন আস্বাদনে তৃপ্ত হয়, যখন তাহার আরাম ও বিশ্রাম স্থল প্রিয়তম পরমেশ্বরের সহিত সাক্ষাৎ হয় এবং তাঁহাতেই যখন আত্মা বিচরণ করে, তাঁহাতেই সান্ত্বনা লাভ করে এবং তাঁহার আরামপ্রদ পবিত্র সহবাসে থাকিয়া যখন আপনার জীবন সম্বল পুণ্যধন সঞ্চয় করিতে করিতেও তাঁহার পবিত্র যশঃ ও মহিমা কীর্ত্তন করিতে থাকে এবং সংসারের সকল ভাবনা বিস্মৃত হইয়া, সেই সত্তা সাগরে নিমগ্ন হইয়া যায়, যখন বিষয়ীর বিষয়কামনা, কর্ম্মীর কর্ম্মলালসা তাঁহাকে পাইয়া নিবৃত্ত হয়; যখন যশঃ প্রার্থীর যশঃলালসা ধনাভিলাষীর ধন-পিপাসা এবং পৃথিবীর সর্ব্বপ্রকার ভোগ বিলাসীর ভোগ বিলাসের আকাঙ্ক্ষা তাঁহাকে পাইয়া, তাঁহার সুধাময় সহবাসে নিমগ্ন হইয়া শান্ত হয়, চিরাভ্যস্ত চপলতা ও অস্থিরতা যাইয়া যখন মধুকরের ন্যায় সুধাময় পরমেশ্বরে প্রাণ মন সংযোজন পূর্ব্বক সুস্থির প্রশান্ত হয়, তখনই তাহার পক্ষে প্রকৃত ব্রহ্মোৎসব উপস্থিত হয়। তখনই সে উৎসবানন্দ সম্ভোগ করিতে সমর্থ হয়। পরমাত্মাতে আত্মা বিহার করিবে, তাহাতেই নিমগ্ন হইয়া পৃথিবীর অন্য সকল বাসনা কামনা অতিক্রম করিয়া সেই আনন্দ ও শান্তির খনি হইতে আনন্দ শান্তি আহরণ করিবে, ইহাই মানবের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা প্রার্থনীয়, সর্ব্বাপেক্ষা আরামপ্রদ ও সর্ব্বাপেক্ষা কল্যাণকর অবস্থা; তাহারই নাম ব্রহ্মোৎসব। ব্রহ্মকে লইয়া আনন্দ করা, তাঁহাকে বিশ্রাম করা এবং তাঁহাকে পাইয়া শান্ত হওয়া ইহাই ব্রহ্মোৎসবের চরম ফল।

আমরা এই উৎসবের অধিকারী, এই প্রকার উৎসবানন্দ সম্ভোগ করিবার জন্যই আমরা সৃষ্ট হইয়াছি। ব্রহ্মোৎসবে বাহিরের আড়ম্বর ধূমধাম তখনই শোভনীয়, যখন তাহা সেই ব্রহ্মসত্তা সাগরে নিমগ্ন হইবার পক্ষে সাহায্যকারী হয়। তখনই ব্রহ্মোৎসবের আয়োজন সার্থক হয়, যখন আত্মা তাঁহার চির-প্রার্থিত বস্তু ও চির আরামের স্থল অধিকার করিতে পারে। আমাদের জন্য সেই ব্রহ্মোৎসব আবার আসিতেছে। সেই প্রার্থনীয় সময় সমাগত হইতেছে যে সময় আমরা বিশেষ ভাবে এই উৎসব করিতে সুবিধা পাই। বাস্তবিকই কি ব্রাহ্মগণ এই উৎসবে তাঁহাদের সর্ব্বাপেক্ষা প্রার্থনীয় অধিকার ব্রহ্ম-সহবাস লাভে সক্ষম হইবেন? বাস্তবিকই কি তাঁহাকে প্রাণে পাইয়া ব্রাহ্মগণ পৃথিবীর ধন মান যশাকাঙ্ক্ষা বিস্মৃত হইতে সক্ষম হইবেন এবং সেই অমৃতভাণ্ডে মুখ যোজনা করিয়া অমৃতের আস্বাদন করিতে করিতে অমরত্ব পাইতে পারিবেন। যদি তাহা পারেন, তাহা হইলে মাঘোৎসব সার্থক হইবে এবং তাহার আয়োজন সার্থক আয়োজন হইবে। নতুবা উৎসবের জন্য আমরা সকল কার্য্যই করিব, কিন্তু সেজন্য যে পরিশ্রম ও সময় ব্যয় হইবে তাহা পরিশ্রম মাত্রই সার হইবে এবং যে সময় ব্যয় হইবে তাহার বৃথা সময়ক্ষেপ মাত্রই হইবে।

এই উৎসবের জন্য যে আয়োজন তাহা কি প্রকারের আয়োজন? আমাদের বল, বুদ্ধি, ধন,জন এ কার্য্যে যে বেশী সহায়তা করিবে তাহা নয়। কিন্তু এই আয়োজনের আদি অন্ত নির্ভর ও ব্যাকুলতা। সেই ক্ষুধা পাওয়া চাই, যে ক্ষুধা জন্মিলে মানুষের আর অন্য চিন্তার অবসর থাকে না। দুর্ভিক্ষের সময় মানুষ যেমন অনন্য-কর্ম্মা হইয়া, অনন্যচিত্ত হইয়া কেবল আহার্য্য বস্তুরই অনুধ্যান করে, তাহারই অন্বেষণ করে এবং যাহা পায় তাহাই উদরস্থ করে, অমৃত ধনের জন্য—পুণ্য ধনের জন্য আমাদের সেই ক্ষুধা পাওয়া চাই। সেইরূপ নির্ভর ও ব্যাকুলতা চাই, অনুদ্গত-পক্ষ বিহগশাবক তাহার মাতার জন্য যেমন ব্যাকুলভাবে অপেক্ষা করে। তাহার নিজের কিছুই করিবার শক্তি নাই, বাসা হইতে উড়িয়া যাইয়া আহার করে এমন সাধ্য নাই, ক্ষুধায় প্রাণ আকুল অথচ নিজে আহার্য্য সংগ্রহ করিতে পারে তাহার এমন কোনই শক্তি নাই, তখন মাতাই তাহার একমাত্র ভরসা। মাতা আসিয়া আহার না দিলে তাহার আহার পাইবার আর কোন সম্ভাবনা নাই। সেই অবস্থায় তাহার মাতার জন্য যে ব্যাকুলতা—মাতার জন্য যে অপেক্ষা করিয়া থাকিবার ভাব, আমাদিগকে সেইভাবে অপেক্ষা করিতে হইবে,সেই ভাবে অনন্যো-পায় হইয়া নির্ভর ও ব্যাকুলতার সহিত জগন্মাতার জন্য অপেক্ষা করিতে হইবে। পক্ষীশাবক যেমন জানে তাহার মাতা আসিয়া তাহাকে আহার দিবেই, আমাদেরও সেইরূপ দৃঢ় বিশ্বাস লইয়াই থাকিতে হইবে, যে জগন্মাতা আমাদের ক্ষুধায় অন্ন দিবেনই দিবেন। তাঁহার অঙ্গীকার অব্যর্থ-অঙ্গীকার। তাহা তিনি পূর্ণ করিবেনই—আমাদের আশা কখনই অপূর্ণ রাখিবেন না।

মধু সঞ্চয়কারী মধুকরগণকে কি কেহ নিমন্ত্রণ করিয়া ডাকিয়া আনে? কেহ কি যাইয়া বলে যে বনে ফুল ফুটিয়াছে, তোমরা যাও, মধু সংগ্রহে প্রবৃত্ত হও। কেহ কি এমন সংবাদ লইয়া তাহাদিগকে ডাকিতে যায়? কে যে তাহাদিগকে সে সংবাদ দেয় কেহই তাহা জানে না। তবে মনে হয়, ফুলের আকর্ষণেই তাহারা মধু সঞ্চয় করিতে যায়। ফুলের সৌরভই তাহাদের প্রাণকে আকুল করিয়া থাকে। আমাদের উৎসবের নিমন্ত্রণ কর্ত্তা কে? কোন মানুষ কি এই নিমন্ত্রণের ভার পাইয়াছেন? মানুষের যে আমন্ত্রণপত্র যায় তাহা ত অতি সামান্য, উপলক্ষ মাত্র। কিন্তু প্রকৃত আমন্ত্রণ সেই সুধাময়ী জগন্মাতাই করিয়া থাকেন। তাঁহার সুমধুর আহ্বানের বিরাম নাই। অনাহত শব্দে নিরন্তর তিনি তাঁহার সন্তানগণকে ডাকিতেছেন। সে আমন্ত্রণধ্বনির বিরাম নাই। যাহার কর্ণ সেই ধ্বনি শুনিতে পায়, সে আর সুস্থির হইয়া বসিয়া থাকিতে পারে না। তাহার পৃথিবীর বিষয় সম্পদ একদিকে পড়িয়া থাকে; তাহার প্রাণ সেদিকে দৃষ্টিপাত করিবারও অবসর পায় না। এই ধ্বনি শুনিয়া যাঁহারা উৎসবে প্রবৃত্ত হইবেন, তাঁহারাই বাস্তবিক ব্রহ্মোৎসবের উৎকৃষ্ট ফল লাভে সমর্থ হইবেন। তাঁহাদের পক্ষেই "নিমন্ত্রিত আজি সবার প্রেম ভবনে" এই গান করা শোভা পাইবে। ব্রহ্মোৎসব কোন সময়বিশেষে আবদ্ধ নহে। কোন স্থান বিশেষেও তাহা আবদ্ধ নয়। ব্যাকুলাত্মার পক্ষে—ব্রহ্মপিপাসুর পক্ষে তাঁহার সহবাস লাভ, তাঁহার সাক্ষাৎ লাভ সকল সময়ে সকল স্থানেই সম্ভবে। মূল আয়োজন নির্ভর ও ব্যাকুলতার সহিত অকিঞ্চন ভাবে, তাঁহার জন্য অপেক্ষা করা তাঁহাকে ডাকা।

অনেক প্রতিবন্ধক এই পথে বাধা প্রদান করিবার জন্য আগবাড়াইয়া আছে। সাংসারিকতা প্রভৃতি বাহিরের শত্রু অপেক্ষা অন্তরের শত্রু—অক্ষুধা অরুচি ও আলস্য প্রভৃতি শত্রুগণই অলক্ষ্য ভাবে প্রধানতঃ শত্রুতা সাধন করিয়া থাকে। আমাদের পক্ষে সেই সকল আন্তরিক শত্রুর সহিত সংগ্রাম করাই বিশেষ কঠিন। কারণ তাহারা অন্তরে লুক্কায়িত ভাবে থাকিয়া কার্য্য করে। প্রথমতঃ এসকলকে ধরিতে পারাই নিতান্ত দুঃসাধ্য। তৎপর এই সকলকে ধরিতে পারিলেও অতিক্রম করা আরও কঠিন। অতিক্রম করিতে হইলেই নিজের অন্তরের সহিত সংগ্রাম করিতে হয়। পরের সহিত সংগ্রাম করিবার ইচ্ছা সহজেই হইতে পারে। কিন্তু নিজের সহিত সংগ্রাম করা সহজসাধ্য নহে এবং লোকে তাহাতেই অধিক পরিমাণে অনিচ্ছুক হইয়া থাকে। এই ভিতরকার শত্রুকে ধরিয়া তাহাকে পরাস্ত করিতেই বিশেষ ব্যগ্র হইতে হইবে। একা একা এই সকল শত্রুর সহিত সংগ্রাম করিতে অনেক সময় প্রবৃত্তিও হয় না, তেমন জোরে আঘাত করিতে সুবিধাও হয় না। এজন্য সমবেত চেষ্টা এবং ব্যাকুলাত্মাগণের সম্মিলনেই আমরা বিশেষ বল প্রাপ্ত হই এবং প্রবল বলে অন্তরের শত্রুকে আক্রমণ করিতে পারি। এই জন্য উৎসবক্ষেত্রে ব্যাকুলাত্মাগণের সম্মিলন বিশেষ ফলদায়ক এবং তাহাই ব্রহ্মোৎসব সম্ভোগের পক্ষে সুসময়। ব্যাকুলাত্মাগণ সকলে সম্মিলিত হউন। ব্রহ্মোৎসবে ব্রহ্মধন লাভ করিয়া সকল মনোরথ হউন। ফলদাতা সিদ্ধিদাতা পিতা সকলকে ব্রহ্মোৎসবের শ্রেষ্ঠ দান—তাঁহার পরিচয় ও তাঁহাতে নিমগ্ন হইবার সুযোগ আমাদিগকে প্রদান করিয়া কৃতার্থ করুন।

• •

দোষ কাহার—সাধন-প্রণালীর না সাধকের?

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

কতকগুলি সুমিষ্ট বাক্য, প্রার্থনা নয়। অন্য লোকের দেখা দেখি হউক অথবা অন্য যেরূপেই হউক, আমাদের মধ্যে সময় সময় যে একটুকু ভাসা ভাসা আকাঙ্ক্ষা জন্মে অথচ প্রাণের গভীর প্রদেশের ভাব, পাপ লইয়া—অন্য জিনিস লইয়া বেশ আছি, তাহা ছাড়িতে প্রস্তুত নহি। গভীর প্রদেশে কোন অভাব বোধ নাই, কোন কষ্ট নাই,—এরূপ আকাঙ্ক্ষাও প্রকৃত আকাঙ্ক্ষা নহে—প্রার্থনা নহে। এরূপ প্রার্থনায় কোন ফল হইতে পারে না। এভাবে চিরজীবন সাধন করিলেও ব্রহ্মদর্শন লাভ হইবে না। কারণ এখানে প্রাণের পরিবর্ত্তন নাই। এরূপ সাধনে বরং আমরা প্রকৃত জীবন লাভের অন্তরায় আনয়ন করি! এভাবে চলিলে শেষে আমাদের প্রকৃত প্রার্থনাতে অবিশ্বাস জন্মে এবং আমরা সাধনাদি পরিত্যাগ করি। অপর পক্ষে এই সকল বাহ্যানুষ্ঠানে অহঙ্কার জন্মে। ব্রহ্ম লাভ সম্বন্ধে আরও কতকগুলি অন্তরায় আছে। এসম্বন্ধে মহাত্মা ইমার্সন (Emerson) বলিতেছেন। "When we have broken our God of tradition, and ceased from our God of Rhetoric, then may God fire the heart with his presence. অর্থাৎ সংস্কার লব্ধ ঈশ্বর, বাক্যের ঈশ্বর, অনুমানের ঈশ্বর, সর্ব্বপ্রকার কল্পনার ঈশ্বর, প্রাণে প্রকাশিত হইতে পারেন। যে পর্য্যন্ত ইঁহাদিগকে ভাঙ্গিয়া না ফেলি সেই পর্য্যন্ত তিনি প্রকাশিত হইতে পারেন না। কারণ আমরা ছায়াকেই ব্রহ্ম মনে করিয়া তৃপ্ত থাকি; আর তাঁহার জন্য ব্যাকুল হই না। এই অবস্থা যে প্রকৃত ব্রহ্মদর্শনের কত শত্রু তাহা বলা যায় না। ইহা আমাদিগকে যতদূর ভ্রান্ত করিয়া থাকে, আর কিছুতেই এরূপ পারে না। কারণ ইহা অনেক বিষয়েই ব্রহ্মের অনুরূপ অথচ ব্রহ্ম নয়। বিশেষ পরীক্ষা ভিন্ন আমরা এ ভুল ধরিতে পারি না। কি কি ভাবে এরূপ অবস্থা হয় এবং তাহাতে কেন ব্রহ্ম লাভ হইতে পারে না, সে বিষয়ে কিছু আলোচনা করা প্রয়োজন।

আমরা ঈশ্বর সম্বন্ধে অনেক কথা শুনি অনেক পুস্তক পড়ি, ইহাতে তাঁহার সম্বন্ধে আমাদের প্রাণে একটী ভাব দাঁড়াইয়া যায়, আমাদের প্রাণে তাঁহার একটী প্রতিকৃতি (Image) গঠিত হয়। ইহা কখনও সত্য ব্রহ্ম নহে। আবার আমরা নিজে তাঁহার নানা স্বরূপ বর্ণনা করিয়া প্রাণে তাঁহার ভাব জন্মাইতে পারি। এই অবস্থায়ও প্রাণে তাঁহার একটী প্রতিকৃতি গঠিত হয়। ইহাও সত্য ব্রহ্ম নহে। পূর্ব্বে কোন সময়ে, ব্রহ্মদর্শন হইলে, স্মরণ-শক্তির ক্রিয়া দ্বারা সেই অবস্থাটী

প্রাণে আনয়ন করিতে পারি—এই অবস্থায়ও প্রাণে তাঁহার ভাব জন্মিবে তাঁহার প্রতিকৃতি গঠিত হইবে। ইহাও সত্য ব্রহ্ম নহে। যাহা বলা হইয়াছে ইহা হইতে আমরা বুঝিতে পারি, কি প্রকারে আমরা প্রার্থনার ন্যায় আমাদের আরাধনারও অপব্যবহার করিতে পারি। ব্রহ্মদর্শন হইলে বিশেষ ভাবে তাঁহার চিন্তা করার নাম আরাধনা। প্রথম প্রাণে ব্রহ্ম প্রকাশিত না হইলে আরাধনা অসম্ভব হয়, কাযেই সেই "আরাধনাতে" ফল হইতে পারে না। সত্যং জ্ঞানং ইত্যাদি বাক্য উচ্চারণ দ্বারা অথবা পূর্ব্বে যে সত্য স্বরূপ জ্ঞান স্বরূপ ব্রহ্মকে সাক্ষাৎ ভাবে প্রাণে পাই-য়াছি তাহার স্মরণ দ্বারা কোন মতেই প্রকৃত ব্রহ্মদর্শন হইতে পারে না। কোনও প্রকার মধ্যবর্ত্তী থাকিলেই ব্রহ্ম দর্শন হইতে পারে না। এস্থলে এসকলকে মধ্যবর্ত্তী করা হইয়াছে ইহার মধ্যে ব্রহ্মের কার্য্য নাই। এই ভাবে কোন মতেই ব্রহ্ম-দর্শন হইতে পারে না। আমাদের একথাতে কিছু সত্য আছে কিনা বিচার করিয়া দেখা যাউক। বর্ণনা শুনিয়া বা বর্ণনা করিয়া আমরা কখনও কোন বিষয় দেখিতে পারি না। অথবা একবার কোন বস্তু দেখিলে পুনর্ব্বার দেখিবার সময় পূর্ব্ব ভাব স্মরণ দ্বারাও বস্তুটী দেখিতে পারি না। দেখিতে হইলে সকল সময়েই সাক্ষাৎ ভাবে দেখিতে হইবে। অর্থাৎ বস্তুটী আমাদের চক্ষুর সম্মুখে থাকিবে ইহা আমাদের দর্শনেন্দ্রিয়ের উপর বিশেষ ভাবে ক্রিয়া করিবে। উহার পরিবর্ত্তে অন্য বস্তু এই ক্রিয়া করিলে তাহারই দর্শনই হইবে, ইহার দর্শন হইবে না। সকল প্রকার বস্তু-জ্ঞান সম্বন্ধেই এই কথা। দর্শন,-স্পর্শন-শ্রবণ সকল বিষয়েই এক কথা। এখানেও মধ্যবর্ত্তীতা কার্য্য-কারী নহে। বর্ণনাদি দ্বারা বস্তুর দর্শন হয় না। মনের মধ্যে বস্তুটীর একটী প্রতিকৃতি গঠিত হয় মাত্র। পূর্ব্বে আমরা যে সকল বস্তু দেখিয়াছি বা গুণ জানিতে পারিয়াছি, তাহার বিভিন্ন সংযোজনা দ্বারা আমরা বর্ণনানুযায়ী বস্তুটী মনে ধারণা করিতে পারি। উহা বর্ণিত বস্তুর সম্পূর্ণ অনুরূপ হইবে, কিন্তু উক্ত বর্ণিত বস্তুর অস্তিত্ব কিম্বা অভাবের সঙ্গে ইহার সম্পর্ক নাই। অস্তিত্ব না থাকিলেও আমরা মনে এরূপ বস্তু ধারণা করিতে পারি। আর বস্তুটী থাকিলেও এই উপায়ে বস্তু দেখা হইল না, বস্তু সম্বন্ধে সাক্ষাৎ জ্ঞান লাভ হইল না, বস্তুটীর একটী প্রতি-কৃতিকেই আমরা জানিলাম। এস্থলে শুধু আমাদের জ্ঞানের ক্রিয়া এই প্রতিকৃতিটী সম্পূর্ণ রূপে আমাদের জ্ঞানদ্বারা গঠিত কাযেই উহাকে আমাদের সৃষ্ট বস্তু বলিতে হয়। আমাদের জ্ঞানের বাহিরে ইহার অস্তিত্ব নাই। এই জন্যই ইহাকে কল্পনা বলা হয়, কল্পিত বস্তু বলা হয়। বাহিরে উহার অনুরূপ বস্তু থাকিতে পারে। কিন্তু যাহা আমরা এই ভাবে দেখিতেছি বা অনুভব করিতেছি, ইহা আমাদের কল্পনা ভিন্ন কিছু নহে। পূর্ব্বে যে বস্তুটী দেখিয়াছি স্মরণদ্বারা তাহার জ্ঞান জন্মাইলে, অর্থাৎ তাহাকে ধারণা করিতে গেলেও যে উহা কল্পনাই হইবে, বস্তু সম্বন্ধে সাক্ষাৎ জ্ঞান হইবে না, উক্ত বস্তুর দর্শন হইবে না তাহা আর বলিতে হইবে না। কাযেই এই ভাবে ব্রহ্ম যে ব্রহ্ম তাহাও ব্রহ্ম নয়—কল্পনা সৃষ্ট তাঁহার প্রতিকৃতি মাত্র। উহার জীবন নাই। আমরা উহার অধীন নহি। উহাই সম্পূর্ণরূপে আমাদের অধীন। আমাদের পুতুল মাত্র। এতাদৃশ ব্রহ্মজ্ঞান লাভে কেবল মানবীয় শক্তিরই কার্য্য, মানবশক্তি বহির্ভূত কোন শক্তি পরমাশক্তি, চৈতন্যময় ব্রহ্মের কোন কার্য্য নাই। কিন্তু দুই শক্তির কার্য্য ভিন্ন বস্তুজ্ঞান অসম্ভব—ব্রহ্মজ্ঞানও অসম্ভব। ব্রহ্মদর্শনে ব্রহ্মশক্তিই কার্য্য করিবে, মানব কেবল গ্রহণ করিবে। এইজন্য আমরা বলি ব্রহ্ম স্বপ্রকাশ, ব্রহ্ম-কৃপা ভিন্ন তাঁহার দর্শন হইতে পারে না। তাই প্রাণের গভীর স্থান হইতে গীত উঠে "তুমি নাহি দিলে দেখা কেহ কি দেখিতে পায়, তুমি না ডাকিলে কাছে সহজে কি চিত ধায় * * "মানবাত্মা কিছু করিতে পারে না, মধ্যবর্ত্তী কিছু দূরে দাঁড় করাইলে তাহা শুধু কল্পনা হইবে, সেখানে ব্রহ্মদর্শন অসম্ভব হইবে।

সৃষ্টি ও মানব ইতিবৃত্ত আলোচনা দ্বারা আমাদের প্রাণ জাগ্রত হইতে পারে। কিন্তু সৃষ্টির মূলে সৃষ্টিকর্ত্তা পরব্রহ্মকে দেখিতে যাইয়া, অনেক সময় আমরা কল্পনার, অনুমানের, ব্রহ্মে উপনীত হই। যখন সৃষ্টি ও ইতিহাসকে আমরা মধ্যবর্ত্তী রূপে স্থাপিত করি; তাহাদের সাহায্যে ব্রহ্মদর্শন লাভ করিতে যাই তখন আমরা অনুমানের ঈশ্বর ভিন্ন আর কিছুই লাভ করি না। জ্ঞানের কার্য্য দেখিয়া স্থির করি উহার মূলে জ্ঞানময় কর্ত্তা আছেন। এ সিদ্ধান্ত সত্য; কিন্তু ইহাতে বস্তুটী সম্বন্ধে অনুমানই করিতেছি। যুক্তিতর্ক কোন বস্তুর জ্ঞান জন্মাইতে পারে না। যুক্তি কুসংস্কার দূর করিয়া প্রতিবন্ধক সকল দূর করিতে পারে, দর্শনের সহায়তা করিতে পারে; কিন্তু দর্শন করাইতে পারে না। দর্শন করিবার এক ভিন্ন দ্বিতীয় উপায় নাই। যুক্তি, তর্কদ্বারা, "সুতরাং," "অতএব" দ্বারা যে বস্তু জ্ঞান আমরা লাভ করি, তাহা অনুমান ভিন্ন কিছুই নহে। সেখানেও শুধু আমাদের জ্ঞান-কার্য্য করিতেছে; কল্পনা কার্য্য করিতেছে। কাযেই এই উপায়ে সত্য ব্রহ্ম লাভ হইতে পারে না। ইহাতে কাল্পনিক ব্রহ্ম, অনুমানের ব্রহ্মই (God of Infrence) লাভ হয়। তবে আত্মাতে সাক্ষাৎভাবে ব্রহ্মদর্শন হইলে, সৃষ্টি ও ইতিহাসের মধ্যে সাক্ষাৎভাবে ব্রহ্মদর্শন হয়। কিন্তু সে সময় যুক্তির কার্য্য থাকে না, কার্য্য হইতে কারণে যাওয়া হয় না। এ সকল মধ্যবর্ত্তীরূপে থাকে না। এরূপ দর্শন না হইলে উহাদিগকে মধ্যবর্ত্তী করিয়া ব্রহ্মদর্শনের চেষ্টা করিলেই কল্পনার ঈশ্বর লাভ হইবে। এ বিষয়ে বেশী কিছু বলিবার দরকার নাই।

সংগীত সংকীর্ত্তন আমাদের প্রাণকে সহজে জাগ্রত করিতে পারে এবং ব্রহ্মদর্শন হইলে তাহাকে গভীর ভাবে উপলব্ধি করিবার সাহায্যও করিতে পারে। কিন্তু সংগীত সংকীর্ত্তন দ্বারা ব্রহ্মদর্শন করিতে গেলে, পূর্ব্বোক্ত রূপ ফলই হইবে, কারণ এখানেও বর্ণনা। বিশেষতঃ সংগীত সংকীর্ত্তন যেরূপ মত্ততা ও আনন্দ আনিয়া দিতে পারে, তাহাতে বিশেষভাবে আত্ম-পরীক্ষা না করিলে, উহা হইতে মহা অনিষ্ট হইতে পারে, উচ্চ-জীবন লাভ হইয়াছে, এই ভ্রম জন্মিতে পারে। ভাবুকতা আসিতে পারে।

অন্য লোকের উপাসনাদিতে যোগ দেওয়াতেও উপকার

হইতে পারে, প্রাণ সহজে জাগ্রত হইতে পারে এবং উপলব্ধির গভীরতাও জন্মিতে পারে। কিন্তু উহা দ্বারা ব্রহ্মদর্শন লাভ করিতে গেলেও পূর্ব্বোক্ত ফলই আসিবে কারণ এখানেও বর্ণনা; বিশেষতঃ অনেক সময় প্রাণ পরিবর্ত্তিত না হইলেও ভাবের উত্তেজনা জন্মিতে পারে, অন্যের ভাব সংক্রামিত হইতে পারে। বিশেষ আত্মচিন্তা না থাকিলে অন্যের জিনিষকে নিজের বলিয়া মনে করিয়া সন্তুষ্ট থাকিতে পারি।

বিপদের কথা এই যে এই কল্পিত বস্তু সম্পূর্ণরূপে সত্য বস্তুর অনুরূপ। ইহা ভাব উদ্রেক করিতে পারে, ইহার প্রতি ভালবাসা জন্মিতে পারে, ইহাকে পাইবার ইচ্ছা হইতে পারে। এই জন্যই সহজে সন্দেহ জন্মে না, সত্যবস্তু লাভ হইতেছে এরূপ ভ্রম হয়। বিশেষভাবে আত্মপরীক্ষা না করিলে এ ভ্রম ধরা যায় না। কারণ অধিকাংশ সময় একটুকু তৃপ্তি, সামান্য আনন্দ দ্বারাই জীবনের অবস্থার বিচার করি। অথচ সত্য ব্রহ্ম ছাড়া কল্পিত "ব্রহ্মে"ও এই লাভ হইতে পারে। সত্য বস্তুতে ও কল্পিত বস্তুতে প্রভেদ এই যে কল্পিত বস্তুর কোন শক্তি নাই। সত্যবস্তুই শক্তির আধার। কাযেই এরূপ ব্রহ্মলাভে জীবন পরিবর্ত্তিত হইতে পারে না। আমরা যেরূপ ক্রমশঃ অনন্ত উন্নতির দিকে যাইতে চাহি, তাহা হয় না; জীবন যেখানে, সে খানেই দাঁড়াইয়া থাকে, কাযেই উক্তপ্রকার সাধনশীল জীবনে এরূপ দুরবস্থা দেখা যায়, যাহা ব্রহ্মলাভ হইলে কোনমতেই থাকিতে পারে না। জীবনের উন্নতি দ্বারা বিচার না করিলে, বিশেষভাবে আত্মপরীক্ষা না করিলে, আমরা এই ভ্রম হইতে রক্ষা পাইতে পারি না। তাই অধিকাংশ সময়ে আত্ম-প্রতারিত হই। ব্রহ্মলাভ হইল, অথচ জীবন যেস্থানে ছিল সেইস্থানেই দাঁড়াইয়া রহিল, ইহা হইতে পারে না। কাযেই জীবনের গতি-দ্বারাই বিচারিত হইবে আমরা কি লইয়া আছি। এখন আমরা দেখিতেছি যে ব্রহ্মদর্শন সম্বন্ধে সর্ব্বপ্রকার মধ্যবর্ত্তী দূর না করিলেই যত দুরবস্থা। মধ্যবর্ত্তী দ্বারা ব্রহ্মলাভ অসম্ভব বলিয়াই, ব্রাহ্মধর্ম্ম সর্ব্বপ্রকার মধ্যবর্ত্তীবাদের ঘোর শত্রু। এই জন্য ব্রাহ্মকবি গান করেন "তুমি আর আমি মাঝে কেহ নাই" ইহার বিরুদ্ধ কিছু করিতে গেলেই বিপদ এবং ইহার অনুসরণ করিলেই প্রকৃত জীবন লাভ হইবে। তখন আর আমাদের কিছু হইল না বলিয়া ক্রন্দন করিতে হইবে না।

ধর্ম্মসাধনে গভীর চিন্তাশীলতার প্রয়োজন কিন্তু এ বিষয়ে আমাদের নিতান্তই অভাব। আমরা কার্য্যে এতই ব্যস্ত এবং জাতীয় চরিত্রগুণে আমাদের চিন্তাশীলতার এতই অভাব যে কোন বিষয়েই গভীর ভাবে ডুবিতে পারি না। আমরা চাহি সহজ ধর্ম্ম। যে সকল অবস্থার মধ্য দিয়া না গেলে ধর্ম্মলাভ হইতে পারে না, আমরা সে সকল অবস্থা লাভ করিতে প্রস্তুত বা বিশেষ চেষ্টিত নহি। যে যত্ন ও পরিশ্রম প্রয়োজন আমরা তাহা করিব না অথচ ফল পাইব, ইহা কিরূপে সম্ভবপর হইবে? প্রণালীটী যদিও সহজ। ইহার সাধনা কোনমতেই সহজ নহে বরং বড়ই কঠিন। আমরা অনেকেই সেই কষ্টটুকু স্বীকার করিতে চাহি না—কাযেই আমরা ফললাভ করিতে পারি না।

যেখানে দুই শ্রেণীর লোক দুই প্রকার সাক্ষ্য দিতেছেন সেখানে বিশুদ্ধ যুক্তি ভিন্ন সত্যনির্দ্ধারণের অন্য উপায় নাই। উভয় শ্রেণীই সরল ধর্ম্মপ্রার্থী ও সত্যবাদী। এক শ্রেণী বলেন এই সাধনে ফল পাইতেছেন না অন্য শ্রেণী বলেন ফল পাইতে-ছেন। আবার আমাদের ন্যায়ও কেহ কেহ আছেন যাঁহারা বলিতেছেন ইহাতে ফল পাওয়া যায় অথচ জীবনে বিশেষ কোন ফল লক্ষিত হইতেছে না। এই অবস্থায় আমাদের জীবন দেখিয়া অথবা প্রথমোক্ত শ্রেণীর কথা শুনিয়া আমরা এ প্রকার মীমাংসা করিতে পারি না যে সাধন প্রণালীর দোষ আছে। যে পর্য্যন্ত বিশুদ্ধ যুক্তি এই প্রণালীর কোন ত্রুটি না দেখাইতে পারে, সেই পর্য্যন্ত শুধু এই কারণে আমরা প্রণালীর দোষ দিতে পারি না। কাযেই বাধ্য হইয়া বলিতে হইবে, আমরা ঠিক ভাবে সাধন করি না বলিয়াই এরূপ ঘটিতেছে। আমাদের জীবনে ফল না হইলেও ইহা বলিতে পারি না যে কোন জীবনেই ইহাতে ফল হয় নাই। অন্ততঃ দুই একজনও যখন এই প্রণা-লীতে সাধন করিয়া ফল পাইয়াছেন, তখন অবশ্য বলিতে হইবে প্রণালীর দোষ নাই দোষ আমাদেরই। বিকৃত ভাবে সাধন করি বলিয়াই আমাদের এই দুরবস্থা।

ব্রাহ্ম পর্য্যটকের পত্র।

ওঁকারনাথ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

প্যারী বাবু এই ওঁকারনাথে আসিবার পূর্ব্বে চিত্রকূটে ১২ বৎসর ছিলেন, তাহার পর প্রায় ৩২ বৎসর হইল ওঁকারনাথে আসিয়াছেন। এই ওঁকারনাথেই সাধনের কঠোরতা বৃদ্ধি করি-য়াছেন। তিনি এখন যোগ সাধন করেন, কোন মনুষ্য গুরুর নিকট কোন দিন কোন উপদেশ লাভ করেন না। দিন দিন তিনি ঈশ্বরের দিকে অগ্রসর হইতেছেন ও তাঁহার অবস্থা খুব আশাজনক বলিয়া তিনি কহিয়াছেন। কিন্তু এ কথাও বলিয়াছেন যে এখনও তাঁহার ব্রহ্মদর্শন হয় নাই। এক্ষণে তাঁহার নিজের কোন ইচ্ছা নাই, ভগবানের দর্শন লাভ হইলে, ভগবান তাঁহাকে যাহা আদেশ করিবেন তাহাই তিনি করিবেন,—এইরূপ তাঁহার ইচ্ছা।

তিনি ইহাও বলিয়াছিলেন যে যদিও তিনি এপর্য্যন্ত কোন মনুষ্য গুরু স্বীকার করেন নাই বা সাধন ভজন সম্বন্ধীয় কোন কথা এপর্য্যন্ত কোন মনুষ্যকে জিজ্ঞাসা করেন নাই বটে; কিন্তু সূক্ষ্ম দেহধারী আত্মাগণ তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া সাধনাদি সম্বন্ধে তাঁহাকে উপদেশ দিয়া থাকেন। প্রশ্ন করিয়া জানিয়াছি যে শঙ্কর অর্থাৎ মহাদেব বিশেষ ভাবে তাঁহাকে উপদেশ দেন। মহাদেবকে তিনি একজন খুব বড় যোগী পুরুষ মনে করেন ও মানবাত্মা যে শ্রেণীর আত্মা মহাদেব সে শ্রেণীর আত্মা নহেন, কিন্তু মানবাত্মা হইতে উন্নত আর এক শ্রেণীর আত্মা।

ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের উপর প্যারীবাবুর গভীর শ্রদ্ধা আছে। তিনি একদিন গোস্বামী মহাশয়ের একখানি চিঠি আমাকে দেখাইয়াছিলেন, তাহাতে

প্রধানতঃ এই দুইটী বিষয় লেখা ছিল। ১ম "আমি নিজ অভিজ্ঞতার দ্বারা ইহা জানিয়াছি যে বহির্জগৎ যেমন অকাট্য নিয়মের দ্বারা পরিচালিত হইতেছে, আধ্যাত্মিক জগতেও সেইরূপ অকাট্য নিয়ম সমূহ আছে। তন্মধ্যে ব্রহ্মদর্শনের ইহা একটী অকাট্য নিয়ম যে সদ্গুরুর কৃপা ভিন্ন তাহা হইবার নহে।" ২য় "হৃদয় হইতে সকল প্রকার সংস্কার ও বাসনা দূর হওয়া চাই, প্রচারের বাসনা থাকিলেও ব্রহ্মদর্শন হইবে না।"

এখন প্যারীবাবুর পৃথিবীর সহিত কোন সম্বন্ধ নাই। আমি এতদিন তাঁহার গুহায় ছিলাম। কিন্তু আমাকে ব্রাহ্মসমাজ সম্বন্ধীয়, কি কলিকাতার, কি তাঁহার ভ্রাতা ভগ্নী বা বন্ধু বান্ধব প্রভৃতির কাহারও কোন কথা কোন দিন জিজ্ঞাসাও করেন নাই। কেবল একমনে সর্ব্বদাই ধ্যানে নিমগ্ন আছেন। আমি মাঝে মাঝে তাঁহার সহিত সাধন ভজন সম্বন্ধীয় কথার আলোচনা করিতে চেষ্টা করিতাম, একদিন তিনি স্পষ্টই লিখিয়া দিয়া ছিলেন যে "ভাই! আমার সময় এখন বড় অমূল্য, এখন আমার এরূপ অবস্থা যে ধর্ম্মালোচনা বা ধর্ম্ম গ্রন্থ পাঠ ইত্যাদি করাকেও সময় নষ্ট বলিয়া বোধ হয়, সুতরাং এখন এ সমস্ত কথা বলিবার সময় নাই, যদি ভগবান কখন দিন দেন, তবে তাঁহার করুণার কথা দ্বারে দ্বারে বলিব।"

প্যারী বাবু বাক্য বন্ধ করিয়া আছেন বলিয়া, স্থানীয় লোকেরা তাঁহাকে মৌনীবাবা বলিয়া অভিহিত করেন। এখানকার সমস্ত সাধু ও অন্যান্য লোকেরা ইঁহাকে খুব শ্রদ্ধা করেন, এমন কি একাদশীর দিন অনেক লোক বেলা ৪ টার সময় হইতে ইঁহার গুহার নিকট এই অভিপ্রায়ে বসিয়া থাকেন, যে ইনি সন্ধ্যার সময় গুহা হইতে বাহির হইলে, ইঁহাকে দর্শন করিয়া গিয়া জলগ্রহণ করিবেন। স্থানীয় গুহাবাসী সাধুগণ আমাকে বলিয়াছেন যে "আমরা অনেক সাধু দেখিয়াছি। কিন্তু এমন সাধনাতে নিমগ্ন কোন সাধুকে কখনও দেখি নাই।"

প্যারী বাবু অতি সামান্য দুগ্ধাহার করেন বলিয়া তাঁহার শরীর অত্যন্ত শীর্ণ হইয়া গিয়াছে। ইহাতে স্থানীয় সাধুগণ অত্যন্ত দুঃখিত। তাঁহারা আমাকে কহিয়াছিলেন যে "আহার না করিলে শরীর কখনও থাকিবে না তুমি আহার করিতে মৌনীকে বিশেষ ভাবে অনুরোধ কর ও গীতার বচন উদ্ধৃত করিয়া বল।" বাস্তবিক আমিও প্যারী বাবুকে আহার বৃদ্ধির জন্য বিশেষ অনুরোধ করিয়াছিলাম, তদুত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন "ঈশ্বরের আদেশে বাধ্য হইয়া, এইরূপ আহার ত্যাগ করিতে হইয়াছে। আমি ইচ্ছা করিয়া আহার ত্যাগ করি নাই, তিনি আবার আদেশ করিলে আহার বৃদ্ধি করিব।" আমি আসিবার সময় দেখিয়া আসিয়াছি, তিনি দুগ্ধের পরিমাণ কিছু বৃদ্ধি করিয়াছেন।

আমি প্যারী বাবুর গুহাতে পাঁচ সপ্তাহ ছিলাম, তাঁহাকে যে সেট (দোকানদার) দুগ্ধাদি দেন, তিনিই আমাকে প্রত্যহ ২।৩ টার সময় ডালরুটী ইত্যাদি পাঠাইয়া দিতেন, আমি তাহাই পরম সুখে আহার করিতাম। এইরূপে এখানে ভগবানের কৃপায় আত্মার অভিপ্সিত বিষয় লাভ করিয়া, কৃতার্থ হইয়া নানাস্থান ভ্রমণ করিতে বহির্গত হই।

প্রেরিত পত্র।

(পত্র প্রেরকদিগের মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন, কিম্বা কাহারও পত্র ফেরত দিতে বাধ্য নহেন)

শ্রদ্ধাস্পদ

শ্রীযুক্ত তত্ত্বকৌমুদী সম্পাদক

মহাশয় সমীপেষু

শ্রদ্ধেয় মহাশয়,

অনুগ্রহপূর্ব্বক এই পত্রখানি তত্ত্বকৌমুদীতে প্রকাশ করিয়া বাধিত করিবেন।

অভ্রান্ত গুরুবাদ এবং ব্রাহ্মসমাজ সম্বন্ধে বাবু মনোরঞ্জন গুহ ১৬ই অগ্রহায়ণের তত্ত্বকৌমুদীতে যে পত্রখানি লিখিয়াছেন তাহা অত্যন্ত আপত্তিজনক এবং যুক্তিবিরুদ্ধ। তিনি যে সকল কথা স্বীকার্য্য বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, তাহার সকলগুলি স্বীকার্য্য বলা যায় না। ঈশ্বরের বাণী মানবাত্মায় প্রকাশ পায় সত্য, কিন্তু মানুষ জ্ঞানে প্রেমে এবং পবিত্রতায় এরূপ উন্নত নয় যে সেই বাণী যে ভাবে ঈশ্বরের নিকট হইতে আসে, ঠিক সেইভাবে ধারণ এবং হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে। যেমন সকল দর্পণেই প্রতিবিম্ব পড়ে সত্য কথা। কিন্তু দর্পণের গুণানুসারে তাহার ইতর বিশেষ হয়, সেইরূপ যাঁহারা ধর্ম্মজগতে যত অগ্রসর তাঁহারা সেই পরিমাণে ঈশ্বরের বাণী গ্রহণ করিয়া থাকেন। কিন্তু যখন কেহই সম্পূর্ণরূপে নিষ্পাপ নহেন অথবা জ্ঞান এবং প্রেমেতে এত উন্নতি লাভ করেন নাই যে পূর্ণজ্ঞানী এবং প্রেমিক বলা যাইতে পারে, তখন সেই বাণী যতটুকু লাভ করেন তাহাও সম্পূর্ণরূপে অভ্রান্ত বলা যায় না।

তারপর আর একটী কথা এই যে সেই বাণী প্রাণে অনুভব করিয়া, উপদেশ দেওয়ার সময় আবার তাহা ঠিক ঠিক রূপে বাহির হয় না। প্রাণে যাহা অনুভব করা যায়, তাহা মুখে কখনই অভ্রান্ত রূপে প্রকাশ করা যায় না। এবিষয় বোধ হয় সকলেই স্বীকার করিবেন। তাহা হইলে দেখা যায় যে, ১মতঃ ঈশ্বরের বাণী মানুষ অভ্রান্তরূপে গ্রহণ করিতে পারে না; ২য়তঃ সেই বাণী যতটুকু গ্রহণ করে, তাহা আবার ঠিক সেই ভাবে মুখে প্রকাশ করিতে পারে না। সুতরাং ঈশ্বর এবং তাঁহার বাণী অভ্রান্ত হইলেও উপদেষ্টার মুখে অভ্রান্ত ভাবে বাহির হয় না এবং তজ্জন্য অভ্রান্তগুরু (অথবা মনোরঞ্জন বাবুর মতে অভ্রান্ত ঈশ্বরের বাণী প্রকাশক হওয়াও সম্পূর্ণরূপে অসম্ভব।)

তিনি ইহার সঙ্গে সঙ্গে আর একটী কথা লিখিয়াছেন যথা "চিন্তাশীল ও সাধনশীল ব্রাহ্ম "অভিভাবকগণ" পুনর্জ্জন্মবাদকে ব্রাহ্মধর্ম্ম বিরোধী মনে করেন না" এই অভিভাবক কয়জন এবং তাঁহাদের নাম কি প্রকাশ করিলে ভাল হইত। দেখিতেছি ব্রাহ্ম অভিভাবক নামে একটী নূতন কথা সৃষ্ট হইল। যাহা হউক ব্রাহ্ম অভিভাবকগণ পুনর্জ্জন্মবাদ স্বীকার করিতে

পারেন। কিন্তু আমরা তাহা স্বীকার বা অস্বীকারের কোন আবশ্যকতা দেখি না। পরলোকের বিষয় সমস্ত সম্পূর্ণভাবে ভগবানের হস্তে। তদ্বিষয়ে কল্পনা না করাই ভাল। অমরাত্মা কোন একটা অবস্থায় থাকিবেই। কি অবস্থায় থাকিবে, যিনিই বর্ণনা করিবেন কল্পনা মাত্র। অতি দুঃখের বিষয় যে এতকাল ব্রাহ্মসমাজ যাহা ঈশ্বরের হস্তে রাখিয়াছিল, মনোরঞ্জন বাবুর ব্রাহ্ম অভিভাবকেরা তাহা লইয়াও টানাটানি করিতেছেন। যাহা হউক পুনর্জ্জন্মবাদীদিগের দুর্দ্দশার একটী দৃষ্টান্ত সংক্ষেপে লিখিয়া আমার বক্তব্য শেষ করিতেছি।

কয়েক বৎসর হইল হুগলী জেলার কোন স্থানে উপাসনা এবং সংকীর্ত্তন হইতেছিল। সেই সময়ে বাহিরে একটা ছাগল দাঁড়াইয়া কোন রোগ বশতঃ চক্ষের জল ফেলিতেছিল এবং ঘন ঘন পা নাড়িতেছিল। হঠাৎ তাহার উপর কোন ভক্তের চক্ষু পড়িল এবং তখনই গুরুকে কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। পুনর্জ্জন্মবাদী গুরু বলিলেন এ ছাগল পূর্ব্বজন্মে হরিভক্ত ছিল তাই হরিনাম শুনিয়া কাঁদিতেছে। সকলে তখন বাহিরে আসিয়া ছাগলকে ঘিরিয়া সংকীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। কেহ কেহ ছাগলের পাও ধরিতে লাগিলেন। ছাগল বেচারা ত তখন প্রাণান্ত। চীৎকার করিয়া পলাইতে পারিলে বাঁচে।

কেহ বলিতে পারেন ইহা অপেক্ষা পাগলের কাণ্ড আর কি আছে?

ঝালকাটী
বরিশাল
৬ই ডিসেম্বর ১৮৯৩

একান্ত অনুগত
শ্রীরজনীকান্ত দে।

শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত তত্ত্বকৌমুদী সম্পাদক
মহাশয় সমীপেষু।

মহাশয়,

বিগত ১৬ই অগ্রহায়ণের তত্ত্বকৌমুদীতে "অভ্রান্ত গুরুবাদ ও ব্রাহ্মধর্ম্ম" সম্বন্ধে আমার একখানা পত্র প্রকাশিত হইয়াছিল। জানা গেল সেই পত্রের লিখিত বিষয় সম্বন্ধে অনেকের মনে অনেক রূপ সন্দেহ ও আপত্তি উপস্থিত হইয়াছে, সেই সকল আপত্তি খণ্ডন ও সন্দেহভঞ্জনের চেষ্টায় অদ্যকার এই পত্রখানা লিখিত হইল। অনুগ্রহপূর্ব্বক তত্ত্বকৌমুদীতে স্থান দান করিয়া বাধিত করিবেন।

১। আমি লিখিয়াছিলাম "জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার সাক্ষাৎ যোগই ব্রাহ্মধর্ম্মের মূলতত্ত্ব।" ইহাতে কেহ কেহ মনে করিয়াছেন, তবে ত সকলেই ব্রহ্মযোগে যোগী, সুতরাং সকলেই আদেশ প্রাপ্ত। তবে আর গুরুশিষ্য-সম্বন্ধ কিসের জন্য? বস্তুতঃ আমি আমার প্রবন্ধে এরূপ অর্থে উক্ত কথা প্রয়োগ করি নাই। প্রবন্ধ মধ্যে স্পষ্টই এই ভাব রহিয়াছে যে জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার যে সাক্ষাৎ যোগ হয়, ইহা ব্রাহ্মধর্ম্মের মূলতত্ত্ব এবং এরূপ যোগ লাভ করাই ব্রাহ্মধর্ম্ম সাধনের উদ্দেশ্য। যিনি সেই যোগ লাভ করিয়া সাক্ষাৎ প্রত্যাদিষ্ট হন, এবং সেইরূপ প্রত্যাদিষ্ট হইয়া উপদেশ দেন, তাঁহার সেই উপদেশ অভ্রান্ত উপদেশ এবং সেইরূপ উপদেশদাতা গুরু অভ্রান্ত গুরু, একথা ব্রাহ্মধর্ম্ম বিরোধী নহে। বরঞ্চ ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রতিপাদক, যিনি ব্রহ্ম-যোগ করেন নাই, তেমন ব্যক্তি যদি শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়া প্রত্যাদিষ্ট গুরুর বাক্য অনুসারে চলেন, তবে তাহাও ব্রাহ্মধর্ম্ম-বিরোধী হয় না। কাষ্ঠ লোষ্ট্রের সহিত পরমাত্মার যে অচ্ছেদ্য যোগ রহিয়াছে, মানুষের সহিতও সেইরূপ যোগ রহিয়াছে। "জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার সাক্ষাৎ যোগ" বলিতে আমি সে যোগের কথা বলি নাই, সাধন-সাপেক্ষ চৈতন্য-যোগের কথা বলিয়াছি। সুতরাং সকল মানুষেরই সে যোগে যুক্ত হওয়ার আশা থাকিলেও সকলেই কিছু সে যোগে যুক্ত নহে, যিনি যুক্ত অযুক্তেরা তাঁহার উপদেশ শুনিবে ইহাই ত সকল প্রকার শিক্ষার প্রণালী, ইহাতে আবার আপত্তি কি?

২। কেহ ভাবেন গুরু যে প্রণালী অবলম্বন করিয়া প্রত্যা-দেশ পাইয়াছেন, শিষ্যও ত সেই প্রণালী অবলম্বন করিয়া যুক্ত হইতে পারেন, তবে আর গুরু মানার প্রয়োজন কি? আমার বক্তব্য এই যে, গুরু আশ্রয় ভিন্ন কেহ ধর্ম্মলাভ করিতে পারিবে কি না আমার প্রবন্ধে আমি তাহার কিছুমাত্র আলোচনা করি নাই, কেবল অভ্রান্ত গুরুবাদ ব্রাহ্মধর্ম্ম বিরোধী নহে, আমি ইহাই দেখাইয়াছি, সুতরাং অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া অনাবশ্যক। গুরু আশ্রয় ভিন্ন পারত্রাণ হয় একথা কেহ প্রমাণ করিলেও গুরু গ্রহণ করা অধর্ম্ম ইহা প্রমাণিত হয় না। মানুষ আপনা আপনি বিদ্যা উপার্জ্জন করিতে পারে প্রমাণিত হইলেও, শিক্ষকের আশ্রয় গ্রহণ করায় বিদ্যা উপার্জ্জন হইতে পারে না, ইহা প্রমাণিত হয় না। অকূল আটলাণ্টীক সাগরে তরণী ভাসাইয়া কলম্বস্ নূতন মহারাজ্যে উপস্থিত হইয়া-ছিলেন, আর একজন যদি কলম্বসের ন্যায় অকূলে না ভাসিয়া তাঁহার উপদেশ ধরিয়া তাঁহার প্রদর্শিত পথে আমেরিকায় যায়, তবে তাহাতে কি কিছু নিকৃষ্টতা হয়? বস্তুতঃ জীবনের প্রত্যেক প্রয়োজনীয় বিষয়েতেই আমরা এইরূপ পরোপদেশ লাভ করিয়া কার্য্য করিয়া থাকি, ইহাতে অধর্ম্ম হয় না। বস্তুতঃ এরূপ না করিলে মানবজীবন বোধ হয় পশুজীবন হইয়া যায়। গত বৎসর কলিকাতায় আনীত ভল্লুক-প্রতিপালিত কন্যাটীই তাহার প্রত্যক্ষ সাক্ষী।

৩। কেহ কেহ "অজ্ঞ ও ভ্রান্ত" এবং "ভ্রান্ত ও অপূর্ণ" একই কথা মনে করেন। কাজেই অভ্রান্ত গুরুবাদ কথাটা তাঁহাদের প্রাণে গুরুতর আঘাত করে। কেন না একমাত্র ঈশ্বর ভিন্ন আর কেই বা পূর্ণ হইতে পারে? এটী যে অতি স্থূল-ভ্রান্তি তাহা সহজেই বুঝা যায়। ভ্রান্ত মাত্রই অজ্ঞ এবং অপূর্ণ। কিন্তু অজ্ঞ ও অপূর্ণ মাত্রই যে ভ্রান্ত হইবে এরূপ কোন কথা নাই। পৃথিবীর কেন্দ্র স্থলে কিরূপ উত্তাপ তাহা আমি জানি না, ইহাতে আমি অজ্ঞ এবং অপূর্ণ হইলাম বটে। কিন্তু ভ্রান্ত হইলাম কি? যে অবগত নহে তাহাকে অজ্ঞ ও অপূর্ণ বলে। আর যে ভুল করিয়াছে তাহাকেই ভ্রান্ত বলে। উভয় কথাই এক কি? ব্রাহ্মধর্ম্মের মূলতত্ত্বগুলি একত্র করিয়া মুদ্রিত করিলে ব্রাহ্মের বিচারে তাহা অবশ্যই অভ্রান্ত গ্রন্থ হইবে। কিন্তু তাহাকে পূর্ণগ্রন্থ বলা যাইবে কি? ইউক্লিডের

জ্যামিতি যদি অভ্রান্ত গ্রন্থ হয়, তাহাতে তাহা পূর্ণ হইল কি? সুতরাং কোন মানুষকে যদি অভ্রান্তও বলা যায় তথাপি তাহাকে পূর্ণ বলা হইল না। কিন্তু আমার প্রবন্ধে আমি অভ্রান্ত মানুষের কথা বলি নাই, কেবল অভ্রান্ত গুরুর কথাই বলিয়াছি। এ কথাটার অর্থ বুঝিতেও অনেকে দেখিতেছি ভুল করিয়াছেন। বোধ হয় তাঁহারা এই উভয় বাক্যের পার্থক্য উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। জগদীশ পণ্ডিত অভ্রান্ত দার্শনিক এবং জগদীশ পণ্ডিত অভ্রান্ত মানুষ এই উভয় বাক্যে কি কিছু পার্থক্য নাই? এই কথাগুলি এত দূর বিস্তারি করিয়া বলিতে হইবে প্রথম পত্র লিখিবার সময় আমার সেরূপ ধারণা হয় নাই।

৪। কেহ কেহ এরূপও চিন্তা করিয়াছেন যে "অভ্রান্ত গুরু জানিতে হইলে, অভ্রান্ত শিষ্যের প্রয়োজন নতুবা অভ্রান্তকে অভ্রান্ত ভাবে কিরূপে বুঝা যাইবে? সুতরাং গুরুর পূর্ব্বে শিষ্যের অভ্রান্ত হওয়ার প্রয়োজন এবং শিষ্য অভ্রান্ত হইলে আর গুরুর প্রয়োজন কি?" নিজে অভ্রান্ত না হইলে অন্যকে অভ্রান্ত বলিয়া জানা যায় না, এই যুক্তি অবলম্বন করিয়া নাস্তিকেরা যখন আমাদের সঙ্গে তর্ক করেন তখন তাঁহাদের কথায় কোন উত্তর দিতে পারি না। কিন্তু কোন ব্রাহ্ম এরূপ প্রশ্ন করিলে তাহার উত্তর দেওয়া অতিশয় সহজ হয়। কেন না ব্রাহ্মগণ আপনারা অভ্রান্ত, সর্ব্বজ্ঞ, পূর্ণ-পবিত্র ইত্যাদি না হইয়াও ঈশ্বরকে ঐসকল গুণ যুক্ত বলিয়া স্থির করিয়াছেন। অভ্রান্ত না হইয়া কাহাকেও অভ্রান্ত স্থির করা যায় না, ইহা যিনি বলেন, তিনি অজ্ঞেয়তা-বাদী কিন্তু ব্রাহ্ম নহেন। অজ্ঞেয়তাবাদীর ঐ সকল আপত্তি খণ্ডন করিতে আমার কোন শক্তি নাই। অপর কেহ কেহ এরূপও ভাবিয়া থাকেন, আমরা আত্ম বুদ্ধি দ্বারা যখন গুরুকে নির্ণয় করিব তখন গুরু অপেক্ষা আমাদের বুদ্ধিই শ্রেষ্ঠ। এরূপ চিন্তা করা একান্ত বালকতা মাত্র। কেন না আমরা আত্ম বুদ্ধিদ্বারা ঈশ্বরকে নির্ণয় করিয়াছি এবং ঈশ্বরের অভ্রান্তত্তা জ্ঞাত হইয়াছি। এই জন্য ঈশ্বর অপেক্ষা আমাদের বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ হইয়াছে এবং আমরা ঈশ্বর অপেক্ষা অভ্রান্ত হইয়াছি এরূপ নহে। আমরা সর্ব্বদা যে সমস্ত ব্যক্তিকে মহাত্মা বলিয়া শ্রদ্ধা করিয়া থাকি, তাঁহাদিগকে মহাত্মা স্থির করিতে যাইয়া, আমরা তাঁহাদিগের অপেক্ষা মহাত্মা হইয়া যাই এরূপ নহে, এরূপ চিন্তা একরূপ দুশ্চিন্তা মাত্র।

৫। কেহ কেহ বলেন "ঈশ্বর অভ্রান্ত এবং তাঁহার বাণীও অভ্রান্ত বটে, কিন্তু ভ্রান্ত অপূর্ণ মানুষের মধ্য দিয়া আসিতে তাহা খাঁটিরূপে আসিতে পারে না।" একথার মধ্যে একটী গুরুতর ভ্রান্তি এই যে মানুষ যদি কখনও অভ্রান্ত ঈশ্বর বাণী না পায়, তবে সে অভ্রান্ত ঈশ্বর বাণীর অস্তিত্ব কোথায় পাইবে? যাহা অভ্রান্তরূপে মানুষের কাছে পৌঁছে না, মানুষ তাহাকে অভ্রান্ত জানিলে ফলই বা কি? যাহাহউক এই কথার মধ্যে একটী প্রচ্ছন্ন বিশেষ তত্ত্ব রহিয়াছে। মুসলমান, খ্রীষ্টান, হিন্দু প্রভৃতি যদি বলেন, অপূর্ণ ও মলিন মানুষের মধ্য দিয়া খাঁটি অভ্রান্ত ঈশ্বর বাণী আসিতে পারে না, তবে আমি তাঁহাদের কথার কোন উত্তর দিতে পারি না। কেননা মুসলমান বলিতে পারেন "আল্লা পবিত্র পুরুষ মহম্মদকে বিশেষভাবে সৃষ্টি করিয়া তাঁহার মধ্যদিয়া খাঁটি সত্য প্রেরণ করিয়াছেন। খ্রীষ্টান ও বৈষ্ণব বলিতে পারেন, ঈশ্বর স্বয়ং অবতীর্ণ হইয়া, জগতে সত্য প্রচার করিয়া গিয়াছেন," হিন্দু বলিতে পারেন, আমাদের বেদ অপৌরুষের ব্রহ্মবাক্য;" কিন্তু ব্রাহ্মগণের সেরূপ কিছু বলিবার অধিকার নাই, মানুষের মধ্যদিয়া ঈশ্বরের বাণী ও ব্রহ্মতত্ত্ব অভ্রান্তরূপে প্রকাশিত হয়, একথা অস্বীকার করিলে ব্রাহ্মধর্ম্মের কি দাঁড়াইবার স্থল থাকে? সেরূপ হইলে ব্রাহ্মগণকে বলিতে হয় "আমরা ধর্ম্মতত্ত্ব যাহা কিছু বলিতেছি তাহার কিছুই অভ্রান্ত সত্য নহে। ইহা মলিন ও ভ্রান্ত মনুষ্যের কপোল কল্পিত মলিনতা ও ভ্রান্তি বিজড়িত চিন্তা মাত্র।" কোন বিশ্বাসী ব্রাহ্ম কি এরূপ বলিতে প্রস্তুত আছেন? ভগবান ব্রাহ্মসমাজকে এরূপ প্রচ্ছন্ন নিগূঢ় ভীষণ মতের হস্ত হইতে রক্ষা করিবেন। ১লা পৌষের তত্ত্বকৌমুদীর ১৯৬ পৃষ্ঠার দ্বিতীয় কলমে সম্পাদকীয় স্তম্ভে লিখিত হইয়াছে "আদেশবাদ অগ্রাহ্য করা ব্রাহ্মধর্ম্মের বিধি নয়, কারণ তাহাই ব্রাহ্মগণের অবলম্বন এবং তাহাই ধর্ম্ম জীবনের আলো।" শ্রদ্ধাস্পদ তত্ত্বকৌমুদী সম্পাদক মহাশয় সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্য ও প্রচারক, তাঁহার মুখে একথা শুনিয়া আমরা কিছু আশস্ত হইলাম। আমরা বিশ্বাস করি ঈশ্বর এক ব্যক্তি, তিনি যখন মানুষকে প্রত্যাদেশ করেন, তখন এ ভাবে করেন না, যে আমি যে আদেশ করিব তাহা এ ব্যক্তি যেন খাঁটি বুঝিতে না পারে। যদি আমাকে কোন বিষয় আদেশ করা ঈশ্বরের ইচ্ছা হয় এবং তিনি আদেশ করেন, কিন্তু জড় শক্তি কি আমার অপূর্ণতা সেই আদেশকে খাঁটিরূপে আমার নিকট উপস্থিত হইতে বাধা দিতে সক্ষম হয়, তবে ঈশ্বরকে কি শক্তিহীন বলা হয় না? আত্মসংকল্প ও বিবেকবাণীকে আদেশ ভাবিলেই ঐরূপ সব সন্দেহ উপস্থিত হয়। এ সকল সন্দেহ যে তর্কে মিটে না তাহা জানি, তবে প্রসঙ্গ ক্রমে বলিতে হইল।

৬। কেহ কেহ অভ্রান্ত গুরুবাদকে জীবাত্মা ও পরমাত্মার মধ্যগত আবরক ভাবিয়া ইহাকে ব্রাহ্মধর্ম্ম বিরোধী মনে করেন। ইহা কেবল গুরুতত্ত্ব সম্বন্ধে অনভিজ্ঞতার ফল, ঈশ্বরের সহিত সাক্ষাৎ যোগের বাসনায়ই মানুষ গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করে। সুতরাং গুরু ব্রহ্ম-আবরক নহেন। পরন্তু ব্রহ্মযোগের বিশেষ সহায়। এরূপ হইলে যদি ব্রহ্ম আবরক হন, তবে উপদেষ্টামাত্রই অল্পাধিক পরিমাণেই আবরক হইবেন।

৭। সাধনপন্থাকে অভ্রান্ত না মানিলে কখনই সাধন-নিষ্ঠা দাঁড়ায় না। যাঁহারা কোন অবস্থা লাভ করিতে প্রয়াসী হইয়া সাধন করেন, তাঁহারা অবশ্যই কিছু না কিছু অভ্রান্ত মানেন। কেহবা আপনার স্বকপোলকল্পিত মত ও পথকে অভ্রান্ত ভাবেন, কেহবা যাঁহাকে ঈশ্বরানুপ্রাণিত বলিয়া বিশ্বাস করেন তাঁহার কথিত মত ও প্রদর্শিত পথকে অভ্রান্ত মানেন। একজন ভাবেন সাধন ভজনহীন আমি অভ্রান্ত, অন্য একজন মনে করেন, শান্ত সমাহিত যোগযুক্ত ব্যক্তি, অভ্রান্ত প্রভেদ এইমাত্র। যিনি দ্বিতীয় ব্যক্তির প্রদর্শিত পথকে অভ্রান্ত ভাবেন, তাহার একটা যুক্তি এই আছে যে উক্ত ব্যক্তি ঈশ্বরাদিষ্ট সুতরাং অভ্রান্ত, প্রথম ব্যক্তির

মত এই যে আমি যাহা বুঝিয়াছি তাহাই অভ্রান্ত। কেহ বা অভ্রান্ত গুরু মানে কেহ বা অভ্রান্ত অহং মানে, ইহার অধিক কিছু প্রভেদ নাই। ইতি

ভবানীপুর } নিবেদক
শ্রীমনোরঞ্জন গুহ।

ব্রাহ্মসমাজ।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যনির্ব্বাহক সভা নিম্নলিখিত প্রণালী অনুসারে আগামী চতুঃষষ্টি মাঘোৎসব সম্পন্ন করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন। আবশ্যক হইলে এই প্রণালীর সামান্যরূপ পরিবর্ত্তন হইতে পারিবে। আমরা তত্ত্বকৌমুদীর গ্রাহকগণকে এবং ব্রাহ্মসমাজের সহানুভূতিকারী প্রত্যেককেই এই উৎসবে যোগদান করিবার জন্য বিশেষ আগ্রহের সহিত নিমন্ত্রণ করিতেছি। মফস্বলস্থ বন্ধুগণের স্মরণার্থ নিবেদন করিতেছি যে তাঁহারা উৎসবে আগমন করিবার সময় যেন শীত নিবারণের উপযুক্ত লেপ বা কম্বল সঙ্গে আনয়ন করেন এবং যাঁহারা সপরিবারে এখানে আগমন করিবেন, তাঁহারা যেন ব্রাহ্মসমাজ কার্য্যালয়ে সে সংবাদ অগ্রে প্রদান করেন।

মাঘ	জানুয়ারি	
১লা মাঘ,	১৩ই জানুয়ারি	শনিবার—ব্রাহ্ম পরিবার সকলে উপাসনা ও ব্রাহ্মসমাজের কল্যাণার্থ প্রার্থনা।
২রা "	১৪ই "	রবিবার—প্রাতঃকালে উপাসনা। অপরাহ্নে বিডনপার্কে প্রচার; তৎপরে নগর সংকীর্ত্তন এবং উপাসনা।
৩রা "	১৫ই "	সোমবার—সায়ংকালে উৎসবের উদ্বোধন।
৪ঠা "	১৬ই "	মঙ্গলবার—প্রাতঃকালে উপাসনা। সায়ংকালে বক্তৃতা।
৫ই "	১৭ই "	বুধবার—প্রাতঃকালে উপাসনা। সায়ংকালে ব্রহ্মবিদ্যালয়ের উৎসব।
৬ই "	১৮ই "	বৃহস্পতিবার—প্রাতঃকালে উপাসনা। সায়ংকালে বক্তৃতা।
৭ই "	১৯এ "	শুক্রবার—প্রাতঃকালে উপাসনা। সায়ংকালে সঙ্গতের উৎসব।
৮ই "	২০এ "	শনিবার—ব্রাহ্মিকাসমাজ ও বঙ্গমহিলা সমাজের উৎসব। সায়ংকালে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বার্ষিক অধিবেশন।
৯ই "	২১এ "	রবিবার—প্রাতে উপাসনা। অপরাহ্নে আলোচনা, সায়ংকালে উপাসনা।
১০ই "	২২এ "	সোমবার—প্রাতঃকালে উপাসকমণ্ডলীর উৎসব। অপরাহ্নে নগরসংকীর্ত্তন, সায়ংকালে উপাসনা।
১১ই "	২৩এ "	মঙ্গলবার—সমস্ত দিনব্যাপী উৎসব।
১২ই "	২৪এ "	বুধবার—প্রাতঃকালে সাধনমণ্ডলীর উৎসব। মধ্যাহ্নে আলোচনা। সায়ংকালে বক্তৃতা।
১৩ই "	২৫এ "	বৃহস্পতিবার—প্রাতঃকালে উপাসনা। অপরাহ্নে বালকবালিকাসম্মিলন। সায়ংকালে ছাত্রসমাজের উৎসব।
১৪ই "	২৬এ "	শুক্রবার—প্রাতঃকালে উপাসনা। সায়ংকালে বক্তৃতা।
১৫ই "	২৭এ "	শনিবার—প্রাতঃকালে উপাসনা। অপরাহ্নে রবিবাসরিক বিদ্যালয়ের সায়ংকালে বক্তৃতা।
১৬ই "	২৮এ "	রবিবার—উদ্যানে ব্রাহ্মসম্মিলনীর উৎসব।

অনাথাশ্রম—অসহায়, অনাথ, অক্ষম লোকদিগের জন্য সিরাজ গঞ্জের ব্রাহ্মবন্ধুগণের যত্নে তথায় একটী ক্ষুদ্র আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। স্থানীয় ভদ্রলোক ও প্রধান প্রধান রাজ কর্ম্মচারিগণ ইহার প্রতি বিশেষ সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াছেন। পরমেশ্বর উদ্যোগকারীদিগের প্রাণে বল বিধান করুন।

প্রচার—গত ১০ই ডিসেম্বর রবিবার কলিকাতা হইতে কতিপয় ব্রাহ্মবন্ধু গঙ্গাতীরবর্ত্তী বেলুড় নামক গ্রামে গিয়া উপাসনা, সংগীত, সংকীর্ত্তন এবং বক্তৃতাদি করিয়াছেন। গ্রামের লোকে বিশেষ মনোযোগের সহিত যোগদান করিয়াছিলেন। কলিকাতাবাসী ব্রাহ্মগণ অবসর মতে এরূপে নিকটবর্ত্তী স্থানে গমন করিয়া বিবিধ উপায়ে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করেন, প্রার্থনীয়।

শ্রাদ্ধ—গত ১৭ই ডিসেম্বর রবিবার দিঘাপাতিয়া ষ্টেটের ম্যানেজার বাবু কালী নারায়ণ রায়ের পরলোকগত পিত আদ্যশ্রাদ্ধ কলিকাতা বাসাবাটীতে সম্পন্ন হইয়াছে। বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত আচার্য্যের কার্য্য করেন। কালী নার. বাবু পিতার সংক্ষিপ্ত জীবন চরিত পাঠ ও প্রার্থনা করেন। শ্রাদ্ধোপলক্ষে কালী নারায়ণ বাবু সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে ১২৫৲ টাকা এবং সাধনাশ্রমে ৫৲ টাকা ও অন্যান্য স্থানে ৭০৲ টাকা মোট দুই শত টাকা দান করিয়াছেন। পরমেশ্বর পরলোকগত আত্মাকে শান্তি দান করুন।

গত ৬ই ডিসেম্বর কাঁথির পরলোকগত ব্রাহ্মবন্ধু বাবু হরিপ্রসাদ সরকারের আদ্য শ্রাদ্ধ গত ৫ই নবেম্বর সম্পন্ন হইয়াছে। কলিকাতা হইতে আগত বাবু ইন্দুভূষণ রায় আচার্য্যের কার্য্য করেন। হরিপ্রসাদ বাবুর স্ত্রী এতদুপলক্ষে সাঃ ব্রাঃ সমাজে ২৲ টাকা সাধনাশ্রমে ২৲ টাকা ও এবং স্থানীয়

ব্রাহ্মসমাজে ১৲ টাকা এবং অন্যান্য স্থানে ২৲ টাকা মোট ৭৲ টাকা দান করিয়াছেন। পরমেশ্বর পরলোকগত আত্মাকে তাঁহার অমৃত নিকেতনে স্থান দান করুন এবং স্ত্রীর প্রাণে শান্তি দান করুন।

জাতকর্ম্ম—জলপাইগুড়ির শ্রীযুক্ত বাবু হরিমোহন চক্রবর্ত্তীর প্রথম পুত্রের জাতকর্ম্ম গত ৬ই কার্ত্তিক সম্পন্ন হইয়াছে। বাবু অবিনাশচন্দ্র দাস, মুন্সী জালাল উদ্দীন এবং বাবু হরিদাস গুপ্ত মহাশয়েরা নবকুমারের কল্যাণ কামনায় বিশেষভাবে প্রার্থনা করেন।

বার্ষিক শ্রাদ্ধ—গত ৮ই পৌষ শুক্রবার নিমতা গ্রামে শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের ভগ্নীর পরলোক গমন দিবসে বিশেষ উপাসনা হয়। বাবু আদিনাথ চাট্টোপাধ্যায় উপাসনা করেন। মহেন্দ্র বাবু প্রার্থনা করেন। এই উপলক্ষে কয়েকজন ব্রাহ্ম বন্ধু নিমতায় গমন করিয়াছিলেন।

নামকরণ—গত ২৮শে অগ্রহায়ণ মঙ্গলবার খাসিয়া পাহাড়স্থ শেলা নামক স্থানে উ টয়া·টন কাজিণাম্ এবং উ গোবিন্দচন্দ্র রায়ের কন্যার নামকরণ ব্রাহ্ম পদ্ধতি অনুসারে সম্পন্ন হইয়াছে। বাবু নীলমণি চক্রবর্ত্তী আচার্য্যের কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন। কন্যা দুইটীর নাম যথাক্রমে সৌদামিনী এবং কুমুদিনী রাখা হইয়াছে।

কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করা যাইতেছে যে বিক্রমপুরের দুর্ভিক্ষ নিবারণার্থে নিম্নলিখিত দান পাওয়া গিয়াছে।

বাবু দীননাথ গুপ্ত ঢাকাবিবাগ	
(শ্রীমতী চঞ্চলা দেবী দ্বারা সংগৃহীত)	১১॥০
" জানকী নাথ চট্টোপাধ্যায় পঞ্চসার	১৲
" দুর্গাদাস বসু মেদিনীপুর (সংগৃহীত)	৮৲
" অধরচন্দ্র মজুমদার কলিকাতা	১৲
সিমলা পর্ব্বতের একটি বন্ধু	৲
	২৬॥০
পূর্ব্বে প্রকাশিত	৫৫০॥৶
মোট	৫৭৭৶

বিজ্ঞাপন।

আগামী ২০শে জানুয়ারী শনিবার অপরাহ্ণ ৬ ঘটিকার সময় কলিকাতা ১৩নং মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীটস্থ সিটি কলেজ ভবনে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের ষোড়শ সাম্বৎসরিক সভার অধিবেশন হইবে।

সভ্য মহোদয়গণের উপস্থিতি একান্ত প্রার্থনীয়।

বিবেচ্য বিষয়।

১। ষোড়শ বার্ষিক কার্য্যবিবরণী এবং আয় ব্যয়ের হিসাব।

২। কর্ম্মচারী নিয়োগ।

৩। অধ্যক্ষ সভা সংগঠন।

৪। অধ্যক্ষ সভার সভ্য নিয়োগ সম্বন্ধীয় অবান্তর নিয়মের নিম্নলিখিতরূপ পরিবর্ত্তন বিষয়ে কার্য্যনির্ব্বাহক সভার প্রস্তাব :—

(ক) অবান্তর নিয়মের দ্বিতীয় নিয়মে "অনানুষ্ঠানিক" শব্দের পর এই সকল শব্দের যোগ হইবে। যথা—"বয়স ২৫ বৎসরের অধিক কি না, তিন বৎসরের অধিক কাল সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্য কি না।"

(খ) অবান্তর নিয়মের তৃতীয় নিয়মে নিম্নলিখিতরূপে পরিবর্ত্তিত হইবে ;—

"সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অধ্যক্ষ সভা তাঁহাদের তৃতীয় ত্রৈমাসিক অধিবেশনে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের ৯ জন সভ্য লইয়া একটী মনোনয়ন সব-কমিটী গঠন করিবেন। ঐ ৯ জনের মধ্যে সাঃ ব্রাঃ সমাজের সম্পাদক বা সহকারী সম্পাদক একজন থাকিবেন, এবং তিনি এই সব-কমিটীর সম্পাদকের কার্য্য করিবেন। মনোনয়ন সব-কমিটী, আবশ্যক বোধ করিলে সাঃ ব্রাঃ সমাজের উপযুক্ত সংখ্যক সভ্যের নাম তাঁহাদের মত জানিয়া অধ্যক্ষ সভার সভ্য মনোনয়নার্থ প্রেরণ করিতে পারিবেন। এতদ্ব্যতীত সাঃ ব্রাঃ সমাজের কার্য্যনির্ব্বাহক-সভা আবশ্যক বোধ করিলে, সমাজের ২২ নিয়মানুসারে যাঁহারা ২৫ বৎসরের ন্যূন বয়স্ক কিম্বা তিন বৎসরের অপেক্ষা ন্যূন কাল সমাজের সভ্য, তাঁহাদের মধ্য হইতেও অধ্যক্ষ সভার সভ্য মনোনয়নার্থ প্রেরণ করিতে পারিবেন।

অধ্যক্ষ সভার পদপ্রার্থী সভ্যগণের নামের তালিকায় ভিন্ন ভিন্ন রূপে মনোনীত সভ্যগণের মধ্যে কোনও ইতর বিশেষ করা হইবে না।

(গ) সপ্তম অবান্তর নিয়ম উঠিয়া যাইবে।

(ঘ) ৮ম, ৯ম, ১০ম অবান্তর নিয়মের "ভোট-গণনাকারী" কিম্বা "গণনাকারী" শব্দের পরিবর্ত্তে "মনোনয়ন" হইবে।

(ঙ) পঞ্চম অবান্তর নিয়মের মুদ্রিত "ক তপসীল এবং ক তপসীলের অনুযায়ী মুদ্রিত" উঠিয়া যাইবে।

৫। বাবু বাণীকান্ত রায় চৌধুরী মহাশয় নিম্নলিখিত প্রস্তাব উপস্থিত করিবেন :—

(১) ব্রাহ্ম-ছাত্রীনিবাস সব-কমিটীর সম্পাদক বাবু গুরুচরণ মহলানবিশ মহাশয়ের সম্পাদকীয় কার্য্যের অবসান বিষয়ে কার্য্যনির্ব্বাহক সভার আচরণের প্রতি অসন্তোষ প্রকাশ করা হউক।

(২) ব্রাহ্ম-ছাত্রীনিবাস সংস্থাপন অবধি বাবু গুরুচরণ মহলানবিশ মহাশয় যেরূপ সুদক্ষতার সহিত ইহার কার্য্য সম্পাদন করিয়াছেন, তাহাতে ন্যায়ানুরোধে কার্য্যনির্ব্বাহক সভার (অধ্যক্ষ সভারও) কার্য্য সম্বন্ধে দুঃখ প্রকাশ করা হউক এবং আগামী বর্ষের কার্য্যনির্ব্বাহক সভাকে অনুরোধ করা হউক যে কোন প্রকারে তাঁহাকে পুনর্নিযুক্ত করিয়া তাঁহার প্রতি যেন উপযুক্ত ব্যবহার এবং ছাত্রীনিবাসের শ্রীবৃদ্ধি করেন।

সাঃ ব্রাঃ সমাজ কার্য্যালয়
২১১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট
কলিকাতা ৭ই ডিসেম্বর ১৮৯৩

শ্রীগুরুচরণ মহলানবিশ।
সাঃ ব্রাঃ সমাজ সম্পাদক।

আগামী ১১ই জানুয়ারী ১৮৯৩ বৃহস্পতিবার অপরাহ্ণ ৬ ঘটিকার সময় সিটিকলেজ ভবনে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অধ্যক্ষ সভার ৪র্থ ত্রৈমাসিক অধিবেশন হইবে।

বিবেচ্য বিষয়।

১। চতুর্থ ত্রৈমাসিক কার্য্যবিবরণ ও আয় ব্যয়ের হিসাব।

২। আগামী বর্ষের অধ্যক্ষ সভার জন্য ভোট গণনাকারী সব্‌কমিটী নিয়োগ।

৩। অধ্যক্ষ সভার সভ্য নিয়োগ সম্বন্ধীয় অবান্তর নিয়মের কিছু কিছু পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে কার্য্যনির্ব্বাহক সভার প্রস্তাব।

৪। বিধবা অথবা বিপত্নীকদিগের পুনর্ব্বিবাহ সম্বন্ধীয় নির্দ্ধারণ সম্বন্ধে পুনর্ব্বিচারের জন্য বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় প্রস্তাব উপস্থিত করিবেন।

৫। সমাজের বার্ষিক কার্য্যবিবরণ সম্বন্ধে বিচার।

৬। বিবিধ।

সাঃ ব্রাঃ সমাজ কার্য্যালয়
২১১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট
কলিকাতা ৭ই ডিসেম্বর ১৮৯৩

শ্রীগুরুচরণ মহলানবিশ
সাঃ ব্রাঃ সমাজ সম্পাদক।

ভোটিং পত্র।

আগামী বর্ষের অধ্যক্ষ সভা গঠনের নিমিত্ত ভোটিং পত্র সভ্যগণের নিকট প্রেরিত হইয়াছে। যদি কোন সভ্য ভোটিং পত্র প্রাপ্ত না হন, অনুগ্রহ পূর্ব্বক সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ কার্য্যালয়ে জানাইলে পাইতে পারিবেন। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের মফঃস্বলস্থ সভ্য মহোদয়গণকে বিশেষ ভাবে অনুরোধ করা যাইতেছে, যে তাঁহারা যেন স্ব স্ব ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক মহাশয়গণের নিকট হইতে ভোটিং পত্র লইয়া এবং তাহা পূরণ করিয়া আগামী ৫ই জানুয়ারী ১৮৯৪ তারিখের মধ্যে নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইয়া আমাদিগকে বাধিত করেন।

সাঃ ব্রাঃ সমাজ
২১১নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট
কলিকাতা ১লা পৌষ ১৩০০

শ্রীঅঘোরনাথ মুখোপাধ্যায়
সহকারী সম্পাদক

২১১নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট ব্রাহ্ম মিশন যন্ত্রে শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দত্ত কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও ১৮ই পৌষ প্রকাশিত।

ধর্ম্ম ও সমাজতত্ত্ব বিষয়ক পাক্ষিক পত্রিকা ।

১৯শ সংখ্যা ।
১৬শ ভাগ ।

১লা মাঘ, শনিবার, ১৮১৫ শক, ব্রাহ্ম সম্বৎ ৬৪।

বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২॥০
মফস্বলে ৩
প্রতি খণ্ডের মূল্য ৵০

প্রার্থনা ।

হে দীনদয়াল পিতা! আবার তোমার দীনহীন সন্তানগণ উৎসব করিবার জন্ম তোমার দ্বারে আসিয়াছে। প্রভো! এই অপরাধী সন্তানদিগের জীবনের সকল সংবাদ তুমি জান। যাহা করা উচিত ছিল না, তাহা করিয়াছি, যাহা করা উচিত ছিল তাহা করি নাই, পিতা আমাদের অপরাধ ক্ষমা কর। পিতা অনেককে ভক্তি ও শ্রদ্ধা করা উচিত ছিল; কিন্তু করি নাই, কত জনকে প্রীতি করা উচিত ছিল অথচ করি নাই,তুমি আমাদিগের অপরাধ ক্ষমা কর। তোমার সাধন ও সেবা যেরূপ নিষ্ঠা ও ভক্তির সহিত করা উচিত ছিল,তাহা করি নাই, তুমি আমাদিগকে ক্ষমা কর। সাধু সঙ্গে তোমার পবিত্র নামের হাওয়াতে বসিলে মহা-পাপীর হৃদয়ও গলিয়া যায়,স্বর্গীয় ভাবে হৃদয় পূর্ণ হয়। ক্ষণকালের জন্ম সংসারের জ্বালা যন্ত্রণা ভুলিয়া যাই। এইরূপ স্বর্গীয়ভাবের আভাস ত উৎসব-ক্ষেত্রে বার বার পাইতেছি, আর দুইদিন যাইতে না যাইতেই হারাইয়া ফেলিতেছি। দুঃখী ও অপরাধী সন্তানের দুঃখ ও অপরাধ কি ঘুচিবে না? জীবনে কি তোমার সত্যের আলো চিরদিনের মত প্রতিষ্ঠিত হইবে না? প্রভো এবার উৎসবে তোমার মলিন সন্তানদিগের মলিনতা ঘুচাইতে হইবে, পাপের জ্বালা নির্ব্বাণ করিতে হইবে; তোমার করুণার হাওয়াতে নূতন সংকল্প প্রাণে আসিতেছে; নূতন প্রতিজ্ঞা জীবনকে অধিকার করিতেছে; তোমার প্রেমমুখ না দেখিয়া, তোমার সত্যালোককে চিরদিনের মত সম্বল না করিয়া তোমার উৎসবের দ্বার ছাড়িব না। ব্রাহ্মসমাজের অধীশ্বর, এবার তোমার ব্রাহ্মসমাজকে তোমার ক্রোড়ে দেখিব, আর সকল অশান্তি ও দুঃখ ভুলিয়া যাইব। তোমাকে ভুলিয়া, তোমাকে হারাইয়া আমাদের যে দুর্দ্দশা, তাহা ত জান। ক্ষত দেহে, মৃত প্রাণে নবজীবনের সঞ্চার কর। প্রভো এই প্রতিজ্ঞা ও সংকল্পের মধ্যে তুমি শক্তিরূপে প্রকাশিত হও। তোমার কৃপার উপরে একান্ত ভাবে নির্ভর করিয়া যেন আমরা তোমার মহোৎসবে প্রবৃত্ত হই। আশীর্ব্বাদ কর, যেন বিনয় ও আত্ম-সমর্পণের সহিত তোমার করুণার প্রতীক্ষা করিতে পারি। তোমার ভক্তগণের শুভাকাঙ্ক্ষা এবং তোমার আশীর্ব্বাদ মস্তকে লইয়া যেন তোমার প্রসাদের অপেক্ষা করিতে পারি।

সম্পাদকীয় মন্তব্য ।

প্রাচীনে নবীন—কালে সকলি প্রাচীন হয়। জগতের বহুপদার্থ কালে জরা প্রাপ্ত হয়, তাহাদের শ্রী সৌন্দর্য্য অন্তর্হিত হয়, এবং মৃত্যু তাহাদিগকে ধীরে ধীরে গ্রাস করে। আবার যাহাদের শ্রী সৌন্দর্য্য একেবারে অন্তর্হিত হয় না, তাহারাও মানবের চক্ষে প্রাচীন হইয়া পড়ে। যাহা দশ দিন দেখিয়াছি তাহা আর দেখিতে ইচ্ছা করে না। এমনি চক্ষের স্বভাব, পরম সুন্দর যাহা, যাহা একদিন চিত্তকে বিস্ময়-রসে পূর্ণ করিয়াছিল, হৃদয়ে অপূর্ব্ব আনন্দ বিস্তার করিয়াছিল, তাহা কালক্রমে প্রাচীন ও সৌন্দর্য্য হীন হইয়া পড়ে; আর চিত্তকে আশ্চর্য্য-রসে সিক্ত করে না। বিধাতার বোধ হয় এই প্রকার বিধি, মানব যদি পুরাতনে তৃপ্ত থাকিত তবে আর নব সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি বিষয়ে প্রয়াসী হইত না। মানব-হৃদয়ে এই নূতনের স্পৃহা বলবতী থাকাতেই মানব সমাজ চিরদিন নবীকৃত হইতেছে। যে উন্নতি বা যে সৌন্দর্য্য একবার সাধিত হইয়াছে, মানব মন তাহাকে ত্যাগ করিয়া যাইতেছে, ও তদপেক্ষা অধিকতর উন্নতি ও অধিকতর সৌন্দর্য্য উৎপাদনে প্রয়াসী হইতেছে। সকল বিভাগেই এই অতৃপ্ত নবীন স্পৃহা কার্য্য করিতেছে। কিন্তু এই জীবনেই এরূপ কতকগুলি বিষয় রহিয়াছে যাহা কখনও পুরাতন হয় না। প্রিয় জনের মুখ কোনও দিন আমরা পুরাতন বলিয়া অনুভব করি না। কোনও দিন বলি না ও মুখ পুরাতন হইয়াছে, আর আনন্দ বিধানের শক্তি নাই, এখন নূতন মুখ চাই। কে কবে আপনার প্রণয়িণীকে বা আপনার পুত্র কন্যাকে বলিয়াছে, তোমাদের মুখ প্রাচীন হইয়া গিয়াছে নূতন মুখ পরিধান কর? বরং এই কথাই কি সত্য নহে যে প্রেমাস্পদ ব্যক্তিদিগের মুখ যত পুরাতন হয়, ততই অধিক সুন্দর হয়। প্রেমের এমনি গুণ। ইহা যাহাকে স্পর্শ করে তাহাকে নূতন করে। বিদেশে বহুদিন বাস করিতেছি, স্বদেশের ভাষা অনেক দিন শুনি নাই, বিদেশীর মধ্যে, বিভাষীর মধ্যে দিন চলিয়া যাইতেছে, যদি হঠাৎ একদিন একজন কোনও প্রিয় সুহৃদের প্রাচীন মুখ দেখিতে পাই, তবে

সে প্রাচীন মুখ হৃদয়ে কি আনন্দই প্রদান করে! তখন কি সেই প্রাচীনের জন্য সমুদায় নবীন ত্যাগ করিতে পারা যায় না? প্রেমের এমনি মহিমা। এই জগৎ ত অনেক দিনের প্রাচীন। কিন্তু যে দিন প্রেমের চক্ষে ইহার দিকে চাই, সে দিন আর প্রাচীন লাগে না। সে দিন ইহার গুপ্ত কথা সকল প্রকাশ হইয়া পড়ে; সে দিন ইহার পত্রে পুষ্পে ফলে কত নূতন উপদেশ দেখিতে পাই। কবি প্রেমের চক্ষে প্রকৃতিকে দর্শন করেন বলিয়া প্রকৃতি তাঁহার নিকট চিরযৌবনা।

আমরা যে মহোৎসবে প্রবৃত্ত হইতে যাইতেছি তাহার ন্যায় প্রাচীন আর কি আছে? ঈশ্বরের নামের ন্যায় প্রাচীন শব্দ মানব ভাষাতে অতি অল্পই আছে। প্রেম-বিহীন হৃদয়ের পক্ষে ধর্ম্মের সমুদায় ব্যাপারই পুরাতন, ঈশ্বরের নাম পুরাতন, তাঁহার মহিমাগান পুরাতন;—তাঁহার দ্বারে প্রার্থনা পুরাতন; শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন সকলি পুরাতন। কিন্তু ব্রহ্মকৃপার আবির্ভাবে হৃদয়ে যদি প্রেম সঞ্চার হয়, তাহা হইলে আমরা সকলি নূতন দেখিব; তাহার শক্তির সংস্পর্শে সমুদায় নূতন হইয়া উঠিবে। অতএব ব্রহ্মকৃপার জন্য প্রতীক্ষা কর।

ঐকতান বাদন—বহু সংখ্যক বাদ্যযন্ত্র সংযোগে যে অপূর্ব্ব স্বর-লহরীর সৃষ্টি হয়, তাহাকে ঐকতান বাদন বলে। ঐকতান বাদনের দলে একজন দলপতি বা শিক্ষক থাকেন, তিনি সর্ব্বপ্রথমে একটা সুর বাঁধিয়া থাকেন, তৎপরে সেই সুরের সহিত মিলাইয়া অপর সকলকে স্বীয় স্বীয় যন্ত্র বাঁধিতে আদেশ করেন। একে একে সকল যন্ত্রগুলি যখন বাঁধা হয়, তখন তাঁহার ইঙ্গিত মাত্র সকলে এক সঙ্গে বাজাইতে আরম্ভ করে। কিন্তু আমরা সর্ব্বদাই অনুভব করিতেছি যে আমরা দশজনে এক সুর বাজাইতে পারিতেছি না। দশজনের সুর ভিন্ন ভিন্ন হইয়া বাজিতেছে এবং প্রীতি উৎপাদন না করিয়া অপ্রীতি উৎপন্ন করিতেছে। ইহার কারণ কি? আমাদের যন্ত্রনায়ক যিনি তাঁহার সুরের সহিত নিজ নিজ সুর মিলাইতে পারিতেছি না। যন্ত্রনায়ক স্বয়ং পরমেশ্বর। হৃদয়কে প্রশান্ত ও বিশুদ্ধ করিলেই তাঁহার সুর শুনিতে পাওয়া যায়; তাহা প্রতি জনেরই কর্ণে বাজে। যাঁহারা সেই সুরের সঙ্গে সুর মিলাইয়াছেন, তাঁহাদের জাতি, শিক্ষা, ভাষা ও সামাজিক অবস্থাগত বিচিত্রতার মধ্যে ও কেমন সুরের অপূর্ব্ব ঐক্য দৃষ্ট হইতেছে! একজন জন্মিলেন বঙ্গে, আর একজন জন্মিলেন সুদূর পশ্চিমে, কিন্তু বাজিলে জানা গেল এক সুর বাজিতেছে। আমরা হৃদয়কে শুদ্ধ করিতে পারি না বলিয়াই, সেই বিশ্বব্যাপী ও বিশ্বজনীন সুর শুনিতে পাই না। যেমন ফাটা বাঁশীতে ফাটা শব্দ নির্গত হয়, তেমনি আমাদের স্বার্থ-দূষিত অবিশুদ্ধ হৃদয় হইতে যে সুর বহির্গত হইতেছে তাহার মধ্যে স্বার্থের ফাটা আওয়াজ শ্রুত হইতেছে। বিবেক কর্ণ বধির প্রায় হওয়াতে ব্রহ্মাণ্ডের সুর ঠিকভাবে শুনিতে পাইতেছি না এবং নিজ নিজ সুর মিলাইতে পারিতেছি না। এইরূপ গোলে মালে বেসুর বাজিয়া বৎসরের পর বৎসর চলিয়া যাইতেছে। মহোৎসব উপস্থিত-ব্রহ্মরাগ এইবার আবার একবার ভাল করিয়া বাজিবে। এ সময়ে আমাদের প্রত্যেকের পক্ষে কর্ত্তব্য কি? ঐকতান বাদনস্থলে বাদকগণ যাহা করে, তাহা আমাদের প্রত্যেককে করিতে হইবে। বাদকগণের যখন যন্ত্র মিলাইবার সময় উপস্থিত হয়, তখন বলিতে থাকে "আঃ গোলটা একটু থামুক, সুরটা একবার শুনি, যন্ত্রটা মিলাইয়া লই।" তেমনি আমরা প্রত্যেকে যেন বলি "আঃ গোলটা একটু থামুক, যন্ত্রটা একবার মিলাইয়া লই।" আমাদের মধ্যে যাঁহারা উৎসবের প্রারম্ভ হইতেই নিজ নিজ যন্ত্র মিলাইয়া লইতে পারিবেন, তাঁহাদেরই হৃদয়ে উৎসবক্ষেত্রে ব্রহ্মাণ্ডের মহারাগ, ব্রহ্মরাগ বাজিবে। তাঁহারাই পূর্ণমাত্রায় উৎসবের আনন্দ সম্ভোগ করিতে পারিবেন। অপরেরা প্রবঞ্চিত হইবেন; তাঁহারা সেই পরম পুরুষের সুর না বাজাইয়া নিজ নিজ বেসুর বাজাইবেন।

যদি ব্রহ্মডাঙ্গায় না দাঁড়াল জল—"কত দিন গান করিলাম"—যদি ব্রহ্মডাঙ্গায় না দাঁড়াল জল, তবে জগৎ জনে বলবে কেন ভকত বৎসল"। এই গানটী আবার স্মরণ করিবার দিন আসিয়াছে। ব্রহ্মডাঙ্গা কাহাকে বলে? বিশাল প্রান্তরের মধ্যে সময়ে সময়ে এক একটী উচ্চ ভূমি দেখিতে পাওয়া যায়; যাহার উপরে বর্ষার জল কখনও দাঁড়ায় না; তাহা উষরক্ষেত্র, সেখানে শস্যাদি জন্মে না। তাহাকে ব্রহ্মডাঙ্গা বলে। যেবারে অতিশয় বন্যা হয় সেবারে ব্রহ্মডাঙ্গা পর্য্যন্ত ডুবিয়া যায়; লোকে বলে এবার ব্রহ্মডাঙ্গা ডুবিয়াছে। ভক্তগণ কখনও কখনও আপনাদের হৃদয়কে ব্রহ্মডাঙ্গা বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। যেমন একটী আট দশ হাত উর্দ্ধ মৃত্তিকার স্তূপে একটী পর্ব্বতকেও আমাদের দৃষ্টি হইতে আবরণ করিয়া রাখিতে পারে, সেইরূপ আমাদের হৃদয়স্থিত সামান্য অহঙ্কারও অনেক সময়ে পর্ব্বত সমান ব্রহ্ম-কৃপাকেও আমাদের দৃষ্টি হইতে আবৃত করিয়া রাখে। আপনাদের হৃদয়কে প্রকৃত বিনয়ে পূর্ণ করা যে কি কঠিন তাহা আমরা প্রতিদিন অনুভব করিতেছি। অহঙ্কার এমনি শত্রু যে ইহাকে এক দ্বার দিয়া বিদায় করিলে, রূপান্তর ধারণ করিয়া অপর দ্বার দিয়া হৃদয়ে প্রবিষ্ট হয়। এমন কি রামায়ণোল্লিখিত মহীরাবণ যেরূপ অবশেষে বিভীষণের আকার ধারণ করিয়া আসিয়া শিবিরে প্রবিষ্ট হইয়া স্বীয় অভীষ্ট সিদ্ধ করিয়াছিল, তেমনি যে বিনয়ের দ্বারা অহঙ্কারের দমন হইবে, অহঙ্কার অনেক সময়ে সেই বিনয়ের আকার ধারণ করিয়া আগমন করে। এই অহঙ্কারের হস্ত হইতে আমরা নিষ্কৃতি পাই কিরূপে? উৎসবের দ্বারা তাঁহারাই উপকৃত হইবেন, যাঁহারা বিনয়ে আপনাদের হৃদয়কে বাস্তবিক নিম্নভূমির ন্যায় করিতে পারিবেন। আর এখনও যাঁহারা অহঙ্কারে গ্রীবা সমুন্নত রাখিবেন, তাঁহাদের হৃদয় ব্রহ্মডাঙ্গা হইয়া থাকিবে। উৎসবে যাহারা আসিয়া যোগ দিবেন তাঁহাদিগকে যেমন হৃদয় ক্ষেত্রকে নিম্নভূমির ন্যায় করিতে হইবে তেমনি ইহার কার্য্যের ভার যাঁহাদের উপরে পড়িয়াছে তাঁহাদিগকে আরও সমাধিকরূপে হৃদয়কে নিম্নভূম করিতে হইবে।

এই সকল কার্য্যের গৌরব যাহা কিছু তাহা সেই পরম প্রভুরই— এই ভাবটী যদি তাঁহারা অন্তরে জাগরুক রাখিতে পারেন, তাহা হইলে তাঁহাদের কার্য্যের উপরে ঈশ্বরের কৃপা বর্ষিত হইবে। যদি আত্মগৌরববুদ্ধি কিঞ্চিন্মাত্রও তাহাদের অন্তরে প্রবল হয়, তাহা হইলে তাঁহাদেরও হৃদয় উচ্চক্ষেত্রের ন্যায় শুষ্ক থাকিবে। ঈশ্বর করুন যেন আমরা সকলে যথাসময়ে হৃদয়কে নিম্নভূমির ন্যায় করিতে পারি।

উৎসবের বিশেষত্ব—আমরা যে মধ্যে মধ্যে উৎসব করিয়া থাকি তাহাতে বিশেষত্ব কি আছে? সেই ত উপাসনা, প্রার্থনা, ধ্যান, ধারণা, কীর্ত্তন ও সংগীত। সেই ত আলোচনা, বক্তৃতা ও উপদেশ। সেইসকল প্রাচীন ব্যাপার ভিন্ন বিশেষভাবে উৎসবের জন্য আর কি বিশেষ আয়োজন করা হয়, যাহার প্রতি আমরা এত গুরুতররূপে মনোযোগ আকর্ষণ করিবার জন্য অনুরোধ করিতেছি। গুরুত্ব ও বিশেষত্ব কোথায়? আমরা উৎসবে উপাসনা প্রার্থনাদির অনুষ্ঠান করিলেও ইহার বিশেষত্ব না আছে এমন নয়। সে বিশেষত্ব অন্তরে, বাহিরে নয়। আন্তরিক পরিবর্ত্তনেই এই বিশেষত্ব উপলব্ধি হয়। শরীর সম্বন্ধেও আমরা সময় সময় এরূপ পরিবর্ত্তন অনুভব করিয়া থাকি। একই বস্তু বিশেষ সময়ে আমাদের বিশেষ মিষ্ট লাগে, এবং তাহা দ্বারা শরীরের বিশেষ তৃপ্তি হয়। আমরা সকলেই জানি কোন কোন সময় সরবৎ খাইতে বিশেষ ইচ্ছা করে, অন্য দিন বা অম্লের আস্বাদন বিশেষ প্রীতিকর হয়। কোন দিন ঝালের আস্বাদন ভাল লাগে, আবার অন্য দিন হয় তিক্ত বস্তু বিশেষ তৃপ্তিদায়ক হইয়া থাকে। এই সকল দিনে অম্ল, ঝাল বা তিক্ত আস্বাদনের বস্তুগুলিতে যে কোনরূপ পরিবর্ত্তন ঘটে, তাহা নয়। তাহারা পূর্ব্বেও যেমন ছিল পরেও তেমনি থাকে। আমাদের শারীরিক পরিবর্ত্তনেই এক এক সময় এক বস্তু বিশেষ প্রিয় হয় ও তৃপ্তিদায়ক হয়। তেমনি উপাসনা, প্রার্থনা সংগীত, সংকীর্ত্তন প্রভৃতি সেই প্রাচীন বস্তু হইয়াও উৎসবে তাহা নূতন আকার ধারণ করিয়া, অন্তরের বিশেষ তৃপ্তিদায়ক এবং প্রাণদায়ক হয়। এইরূপ পরিবর্ত্তিত প্রাণ লইয়া যাঁহারা উৎসবে প্রবৃত্ত হইতে পারেন, তাঁহাদের পক্ষেই উৎসবের বিশেষত্ব আছে। তাহার অভাবে "ঘাটের গঙ্গা জল" এই প্রবাদ বাক্যের ন্যায় উৎসবের উপাসনাদিও আমাদের পক্ষে বিশেষত্ব হীন ও পুরাতন বস্তু হইয়া পড়ে। কিরূপ পরিবর্ত্তন লইয়া উৎসবে প্রবৃত্ত হইতে হইবে? সে পরিবর্ত্তন রুচির পরিবর্ত্তন, আকাঙ্ক্ষার পরিবর্ত্তন। প্রতিদিন যে আকাঙ্ক্ষা লইয়া উপাসনা করি সেইরূপ আকাঙ্ক্ষা লইয়া যদি উৎসবে প্রবৃত্ত হই, তবে আমাদিগের সেইরূপ ফলই লাভ হইবে, তাহার বেশী আশা করিবার কি হেতু আছে। সুতরাং বিশেষ ব্যাকুলতা বিশেষ সংকল্প লইয়া উৎসবে গমন করিতে হইবে। আমরা দেখিতে পাই শরীর উত্তপ্ত হইলে, সহজেই শীতল সরবৎ পানের আকাঙ্ক্ষা হয়। আমাদের প্রাণ কি সংসারের উত্তপ্ত বায়ুতে উষ্ণ হয় না? উষ্ণ হয়, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু আমরা যাহাতে প্রাণ শীতল হইতে পারে, তাহার সন্ধান পাই না—তাহা পাইতে ব্যাকুল হই না। অন্যবিধ বস্তু দ্বারা প্রাণের জালা নিবারণ করিতে যাই, তাই মনে হয় প্রাণের জালা যাইবার নয়, উৎসবে সে জালা যাইবে না। আবার অনেক সময় জালাকে জালা বলিয়া বোধ করিবার শক্তিও থাকে না। তাহাতেও ব্যাকুলতা জন্মে না। এই জন্য বিশেষ ভাবে আত্মানুসন্ধান করিয়া দেখিতে হইবে কেন ক্ষুধা হয় না, কেন সন্তাপকে সন্তাপ বলিয়া মনে হয় না, অতি তীক্ষ্ণ আত্মদৃষ্টি ভিন্ন এরোগ ধরিবার উপায় নাই; সুতরাং উৎসবে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে যাহাতে বিশেষ আত্মানুসন্ধান দ্বারা ক্ষুধার সঞ্চার হয়, পুণ্য পবিত্রতার জন্য প্রাণের আকাঙ্ক্ষা হয়, এখন তাহাই করিতে হইবে।

আর এক ভাবেও আমরা উৎসবের বিশেষত্ব অনুভব করিতে পারি। আমরা অনেক উপাদেয় বস্তু একাকী আহার করিয়া থাকি। সে সময়ে তাহার যে মিষ্টতা অনুভব করি, যখন দশজন সুহৃদের সহিত প্রীতি ও সদ্ভাবে তাহা আহার করি, তাহার মিষ্টতা কত অধিক অনুভব করিয়া থাকি। আবার আহার করিতে করিতে তাহা যদি কোন বন্ধুকে প্রদান করি তাহাতে কত অধিক তৃপ্তি অনুভব করি। তখন আহারের আনন্দের সঙ্গে অন্যবিধ আনন্দও সম্ভোগ করিতে থাকি। বস্তুগত তারতম্য না থাকিলেও বন্ধুজনের সমাগমে আনন্দের পরিমাণ কত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। তেমনি উৎসবে যখন নানা স্থান হইতে ব্যাকুলাত্মা ও সজ্জনগণের সমাগম হয়,তখন একাকী উপাসনায় যে তৃপ্তি পাইতেছিলাম, তাহার পরিমাণ কত বাড়িয়া যায়। একগুণ শক্তি শতগুণ হয়। একগুণ প্রেম শতগুণ হয়। তখনকার গান, তখনকার আলোচনা, প্রার্থনাদি সকলই বিশেষ তৃপ্তি-দায়ক, আশাজনক এবং জড়তা-নাশক হয়। ভক্ত ও ব্যাকুলাত্মাগণের সম্মিলন তাড়িত শক্তির ন্যায় প্রাণের উপর আশ্চর্য্যরূপে কার্য্য করে। অনেক সময় সেই শক্তি কোথা হইতে আসে তাহা অনুভবও করা যায় না। তখনই উৎসবের বিশেষত্ব সহজেই অনুভূত হয়। বাস্তবিক উৎসবকে আধ্যাত্মিক ভোজে "ক্ষুধিত ও তৃষিত আত্মাগণের সম্মিলন" এই নামে অভিহিত করাই উচিত। ব্যাকুলতায় ব্যাকুলতার সঞ্চার করে। একের ত্যাগ স্বীকারের দৃষ্টান্ত অপরের নিষ্প্রভ ত্যাগস্বীকারের আকাঙ্ক্ষা জ্বলিয়া উঠে। শুভসম্মিলন যত হয় ততই আত্মার কল্যাণ। ধর্ম্ম জগতে অগ্রসর হইবার পক্ষে ততই অধিকতর সুবিধা পাওয়া যায়। আমাদের পক্ষে ব্রহ্মকৃপা অনুভব পক্ষে উৎসব অতি প্রশস্ত সময়। এমন সুযোগ লাভ করা সৌভাগ্যের বিষয়। আমরা আলস্য ও জড়তা পরিত্যাগ করিয়া এই উৎসব সম্ভোগ করিবার জন্য এখন হইতে প্রস্তুত হই।

স্বাভাবিক গতি—পুষ্প প্রদর্শনীতে লোকে যখন সমাগত ব্যক্তিদিগের মনস্তুষ্টির জন্য ফুল সকল সুসজ্জিত করিয়া রাখে, তখন সকলেই যথাশক্তি সর্ব্বাপেক্ষা মনোহর, সর্ব্বাপেক্ষা সুদৃশ্য ও সুগন্ধযুক্ত ফুল সকলই সংগ্রহ করিয়া থাকে। এবং সে সকল ফুল যথাশক্তি সুন্দরভাবেই সাজাইয়া রাখে। দর্শক-

পর সকল ফুলই বিশেষ আগ্রহের সহিত দর্শন করিতে থাকেন। সকল ফুলেই তাঁহাদের মনোহরণ করিবার শক্তি থাকিলেও সকল ব্যক্তিকেই যে সকল ফুল সমান আকৃষ্ট করে তাহা নহে। কেহ এক প্রকারের একটা গোলাপের দৃশ্য দেখিয়া মুগ্ধ হইতেছেন, কেহ বা অপর প্রকারের একটা গোলাপে বেশী আকৃষ্ট হইতেছেন। একজন হয়ত বলিতেছেন "দেখ কেমন সুন্দর রূপে ফুলগুলি সাজাইয়াছে" এইরূপে এক এক জন এক এক প্রকার ফুলের প্রশংসা করিতেছেন। এসকল স্থলে ফুল সকল যে ব্যক্তি বিশেষকে কিছু অধিক আদর করিয়াছিল বা তাহার জন্য যে কিছু বেশী সাজ সজ্জা করিয়াছিল তাহা নহে। মালীগণ যে কোন ব্যক্তিবিশেষকে বিশেষভাবে কোনও রূপ আদর অভ্যর্থনা করিয়া বা কোনরূপে মনস্তুষ্টিকর বাক্য বলিয়া প্রলুব্ধ করিয়াছিল এমন নয়। লোকে আপনা হইতে, প্রকৃতিদত্ত বিশেষ বিশেষ মানসিক ভাব হইতেই এক একজন এক এক প্রকার ফুল বা সাজ সজ্জায় মুগ্ধ হইয়া তাহার প্রশংসা করিয়াছিলেন। স্বাভাবিক ভাবেই লোকে এইরূপ বিভিন্নরূপে আত্ম-রুচি ও সৌন্দর্য্য-নির্ণয়-শক্তির পরিচয় প্রদান করিয়া থাকে। ইহাতে স্বভাব ভিন্ন অন্য কাহাকে চালক দেখা যায় না। এই প্রদর্শনীতে যেমন লোকে কাহারও কর্তৃক চালিত না হইয়াও কোন কোন ফুল বা সাজ সজ্জায় অধিক পরিমাণে আকৃষ্ট হয়, তাহার পক্ষপাতী হয়, সেইরূপ আধ্যাত্মিক জগতেও লোকে স্বভাব হইতেই কোন কোন বিষয়ে অধিক আকৃষ্ট হয়। অধিক পরিমাণে পক্ষপাতী হয়। এখানেও স্বভাবের চালনা ভিন্ন অন্য কোনরূপ প্ররোচনা দেখা যায় না। এই স্বভাবের প্ররোচনা হইতেই কেহ বা প্রেম ও ভক্তির অধিকতর পক্ষপাতী, কেহবা জ্ঞানের সমাদর করিতে সমুৎসুক। অপরেরা আবার কর্ম্মপ্রিয়। কিন্তু স্বভাবের চালনায় লোকে যে ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে অধিক আকৃষ্ট হয়, অধিক পরিমাণে বিষয় বিশেষের প্রশংসা করে তাহাও লোকের সহ্য হয় না। দেখা যায় জ্ঞানী, ভক্ত ও প্রেমিককে তত পছন্দ করে না। ভক্ত ও প্রেমিক আবার জ্ঞানীকে একটু কেমন ভাবে দর্শন করেন। কর্ম্মীও হয়ত জ্ঞানী ও ভক্তকে তেমন ভালভাবে গ্রহণ করেন না। বিবাদের কোন হেতু না থাকিলেও এইরূপ বিবাদের-অতীত বিষয় সকল লইয়াও সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে কতই না বিরোধ চলিতেছে। ব্রাহ্ম সমাজ এ প্রকার বিবাদকে নিতান্তই অযৌক্তিক ও অহেতুক মনে করেন। এবং সকলের প্রতিই উদার ও সদ্ভাব প্রদর্শন করিতে উপদেশ দেন। কিন্তু লোকে তাহা শুনিতে চায় না। এই প্রকার সামান্য বিষয়ে বৃথা তর্ক দ্বারা পরস্পর হইতে দূরে সরিয়া যায়। এবং এইরূপ অনর্থকর বিবাদ বিসংবাদে লোকে অপরের প্রতি উদাসীন হয় এবং অপরের নিকট হইতে যাহা পাইবার ছিল তাহাতে বঞ্চিত হয়। এজন্য সর্ব্বদাই সকল ভাবাপন্নকেই উদার প্রীতিতে গ্রহণ করিতে হইবে। একটী কথা বিশেষভাবে মনে রাখিতে হইবে যে যদিও স্বভাবই বিশেষ বিশেষ বিষয়ে আমাদিগকে আকৃষ্ট করে,তথাপি সকলের পক্ষেই সেই প্রদর্শনীতে প্রবেশের ন্যায় অধ্যাত্মরাজ্যের সকল দিকেই মনোযোগ দিতে হইবে। আগে এই রাজ্যের সকল বিষয়ের সহিত পরিচিত হইয়া, পরে যাহার যেটী ভাল লাগে তাহাতে বিশেষ মনোযোগ দিতে হইবে। তাহা না হইলে ধর্ম্ম অসম্পূর্ণ থাকিবে, জীবন অঙ্গহীন থাকিবে। এই শুভ মহোৎসব নিকটবর্ত্তী হইতেছে, এই উৎসবে যেন আমরা ধর্ম্মের সকল তত্ত্বই অনুশীলন করিতে পারি। পক্ষপাতিতার অধীন হইয়া অপরের প্রতি তুচ্ছ তাচ্ছিল্য না করিয়া, যেন উদার প্রীতিতে সকলে সম্মিলিত হইতে পারি।

সম্পাদকীয় ও প্রাপ্ত প্রবন্ধ।

ক্ষয় ও উপচয়

প্রকৃতির নিয়ম এই শ্রমান্তে বিশ্রাম, ক্ষয়ান্তে উপচয়। শ্রমকালে যে সকল শারীরিক শক্তি বিপর্য্যস্ত হয় বিশ্রামকালে প্রকৃতি তাহা পুনর্গঠিত করিয়া লন। এই কারণে নিদ্রার ন্যায় বন্ধু মানবের অতি অল্পই আছে। সমস্ত দিবসের শ্রম, উষ্ণতা, উত্তাপ, উদ্বেগ, প্রভৃতি সমুদায় হরণ করিয়া নিদ্রা মানবের দেহ মনকে সুস্থ, প্রকৃতিস্থ, প্রসন্ন ও কর্ম্মক্ষম করিয়া দেয়। এইরূপ প্রকৃতির মধ্যে ক্ষয় ও উপচয় সর্ব্বদা চলিতেছে। প্রতি মুহূর্ত্তের কার্য্য দ্বারা আমাদের দৈহিক ধাতুপুঞ্জ নিরন্তর ক্ষয় প্রাপ্ত হইতেছে। শরীরের পুরাতন অণু সকল নানা আকারে দেহ হইতে বহির্গত হইয়া যাইতেছে। এই ক্ষয় ক্রিয়া এত দ্রুত চলিতেছে, যে বর্ত্তমান সময়ের কোন কোনও পণ্ডিত গণনা করিয়া বলিয়াছেন, তিন বৎসরের পূর্ব্বে দেহে যে সকল পরমাণু ছিল, তিন বৎসর পরে তাহার একটী অণুও থাকে না। কিন্তু প্রকৃতি যেমন ক্ষয়ের দ্বার উন্মুক্ত রাখিয়াছেন, তেমনি উপচয়ের দ্বারও খুলিয়া রাখিয়াছেন। আমরা প্রতিদিন যে সকল অন্ন পান গ্রহণ করিতেছি তদ্দ্বারা ক্ষয় প্রাপ্ত দৈহিক ধাতুপুঞ্জ গঠিত হইতেছে।

এই ক্ষয় ও উপচয়ের নিয়ম অধ্যাত্ম-রাজ্যেও খাটে। সংসার-মধ্যে আমরা যখন বাস করি এবং কার্য্যক্ষেত্রে যখন বিচরণ করি তখন আমরা সকল সময়ে অনুকূল অবস্থার মধ্যে থাকি না। কত পাপ প্রলোভনের মধ্যে পড়িতে হয়, কত চিত্তের বিক্ষোভকারী কারণ ঘটিয়া থাকে, কত উত্তপ্ত বায়ু আসিয়া আমাদের আত্মাকে শুষ্ক করিতে থাকে। এই সকল সংগ্রামের মধ্যে অনেক সময়ে আমাদের আধ্যাত্মিক শক্তি সামর্থ্যের ক্ষয় হইতে থাকে। আমরা অনেক সময়ে দেখিতে পাই যে আমাদের প্রাণের সরসতা হ্রাস হইতেছে; উৎসাহ মন্দীভূত হইতেছে; বিশ্বাস ও নির্ভর যেন ম্লানভাব ধারণ করিতেছে। একদিকে যখন এইরূপ ক্ষয়ের লক্ষণ প্রকাশ পাইতে থাকে, তখন অপরদিকে উপচয়ের জন্য ব্যগ্র হইতে হয়। কিন্তু শরীরের ধাতুপুঞ্জ ক্ষয় প্রাপ্ত হইলে, যেমন অন্ন জলের দ্বারা পুনরায় গঠিত হয়, সেইরূপ আত্মার ক্ষয়কে নিবারণ করিয়া উপচয়কে বৃদ্ধি করিবার উপায় কি? যেমন অন্ন পান দ্বারা দেহ রক্ষা হয়, আত্মা সেইরূপ সে

পরম পুরুষের শক্তি ও আবির্ভাব দ্বারা বাঁচিয়া থাকে। এই কারণে কোনও ভাবুক সাধক বিশ্বাসী ও অনুরাগী জনের চিত্তকে জলপার্শ্বে রোপিত বৃক্ষের ন্যায় বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। নদী তীরবর্ত্তী তরু যেমন সর্ব্বদা সতেজ, সর্ব্বদা জীবন্ত ও সর্ব্বদা স্নিগ্ধ-কান্তি, তেমনি প্রেমযোগে সেই পবিত্র পুরুষের সহিত যুক্ত আত্মাও সর্ব্বদা সতেজ, জীবন্ত ও হরিদ্বর্ণময়।

যিনি আত্মার অনুপান স্বরূপ আত্মার জীবন রক্ষার ও স্বাস্থ্যের উন্নতি জন্য সর্ব্বদা তাঁহার সহিত যোগ অন্বেষণ করিতে হইবে। সংসারের কার্য্যের ব্যস্ততার মধ্যে আমরা অনেক সময়ে এই আধ্যাত্মিক যোগ সাধন বিষয়ে ইচ্ছানুরূপ মনোযোগী হইতে পারি না। প্রতিদিনের চিন্তা ও কার্য্যের স্রোত আমাদিগকে অনেক সময়ে বহিয়া লইয়া যায়। আমরা বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে বিক্ষিপ্ত হইয়া ভ্রমণ করিতে থাকি। যদি সেই মনকে সময়ে সময়ে কার্য্যের ব্যস্ততা হইতে অপসৃত করিয়া বিশেষরূপে সেই পরম পুরুষের প্রতি মনকে নিয়োগ না করা যায়, তাহা হইলে আত্মা শুষ্ক ও দুর্ব্বল হইয়া পড়িতে থাকে। শরীর সম্বন্ধে এরূপ অবস্থা অনেকে দেখিয়া থাকিবেন যে অবস্থাতে কোন ও বিশেষ পীড়া দেখা যায় না, কোন ও ব্যাধির লক্ষণ প্রকাশ নাই, কিন্তু তথাপি দেহ দুর্ব্বল কার্য্যে অপটু ও শ্রমে পরাঙ্মুখ। কার্য্যক্ষম ও শ্রম-প্রিয় ব্যক্তিরা যখন আপনাদের অন্তরে এই শ্রম-বিমুখতা লক্ষ্য করেন, তখন অনুভব করিতে থাকেন যে ত্বরায় কার্য্য হইতে অবসৃত হইয়া স্বাস্থ্য কর আহার ও স্বাস্থ্যকর বায়ু সেবন ও বিশ্রামের বন্দোবস্ত করা কর্ত্তব্য নতুবা দেহ ত্বরায় পীড়া দ্বারা আক্রান্ত হইবে। সেইরূপ আমরা ও কি সময়ে সময়ে আত্মার মধ্যে এক প্রকার অবসাদ অনুভব করি না, যখন দেখি কোনও বিশেষ পীড়ার বিদ্যমান নাই কিন্তু হৃদয়, মন নিস্তেজ, নীরস ও অবসন্ন? এই সময়ে কার্য্য হইতে অবস্থিত হইয়া স্বাস্থ্যকর আধ্যাত্মিক আহার ও স্বাস্থ্যকর আধ্যাত্মিকে বায়ু সেবনের জন্য যাইতে হয়।

আমরা উৎসব কালকে সংসার পথের শ্রান্ত ও ক্লান্ত পথিকগণের স্বাস্থ্যকর আধ্যাত্মিক বায়ু সেবনের সময় বলিয়া মনে করি। কিন্তু এ বায়ু কি প্রকার বায়ু? লোকে ব্রহ্ম শক্তিকে সচরাচর বায়ুর সহিত তুলনা করিয়া থাকে। কোন দিক দিয়া বায়ু বহিবে এবং কখন তাহা বেগে আসিবে তাহা যেমন কেহই বলিতে পারে না, সেইরূপ ব্রহ্মশক্তি যে কখন কোন উপায়ে, কোন সূত্র ধরিয়া হৃদয়ে অবতীর্ণ হইবে তাহা কেহই বলিতে পারে না। আমাদিগকে কেবল অপেক্ষা করিয়া থাকিতে হয়; ব্রহ্ম কৃপার প্রতি একান্ত নির্ভর রাখিয়া ও তাঁহার করুণার বায়ুর অপেক্ষা করিয়া সকল কার্য্যের সহিত যোগ দিতে হয়। কোন বিষয়টী কাহার নিকট যে জীবনের বার্ত্তা আনিবে তাহা কে বলিতে পারে? কত বার ত দেখিয়াছি বড় বড় ব্যাপারে যোগ দিলাম, অথচ হৃদয় কবাট খুলিল না; হঠাৎ একটী সামান্য কথাতে হৃদয় দ্বার খুলিয়া গেল ও হৃদয় মধ্যে ব্রহ্ম কৃপার বায়ু প্রবাহিত হইল।

অতএব আশা পূর্ণ ও নির্ভর-শীল অন্তরে আমাদিগকে মহোৎসবে প্রবেশ করিতে হইবে। যাঁহাদের সম্বৎসর শক্তি সামর্থ্যের ক্ষয় হইয়াছে, তাঁহাদের ক্ষতি পূরণের সময় উপস্থিত। স্বয়ং প্রভু পরমেশ্বর স্বহস্তে কৃপার অন্ন বিতরণ করিবেন, যে অন্নে রোগ যায়, দুর্ব্বলতা যায় অবসাদ যায়, সেই অন্ন বিতরণ করিবেন। ভক্ত সমাগমে তাঁহার শক্তি পবিত্র সুস্নিগ্ধ বায়ুর ন্যায় প্রবাহিত হইবে। সেই বায়ু যিনি প্রাণ ভরিয়া সেবন করিতে পারিবেন তিনি স্বাস্থ্যসুখ লাভ করিয়া গৃহে প্রতিনিবৃত্ত হইতে পারিবেন। আমরা তবে প্রার্থনাপূর্ণ অন্তরে মহোৎসবে প্রবেশ করি।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যনির্ব্বাহক সভার ৪র্থ ত্রৈমাসিক কার্য্যবিবরণ।

১৮৯৩।

বিগত তিন মাসে কার্য্যনির্ব্বাহক সভার ১২টী সাধারণ এবং ২টী বিশেষ অধিবেশন হইয়াছিল। আগামী বর্ষের অধ্যক্ষ সভা সংগঠন জন্য সমাজের সভ্যদিগের নিকট ভোটিং পত্র প্রেরিত হইয়াছে। আশা করা যায় এবার অধ্যক্ষসভা গঠনে অসুবিধা হইবে না।

হরি প্রভৃতি কোন কোন নাম কতিপয় সভ্যের মতে পৌত্তলিক বলিয়া আপত্তি জনক হওয়াতে কার্য্যনির্ব্বাহক সভা সমগ্র ব্রাহ্মসমাজের সভ্য ও ব্রাহ্ম মাত্রেরই এ সম্বন্ধে মতামত অবগত হইবার নিমিত্ত চেষ্টা করিতেছেন।

দুর্ভিক্ষ।

পূর্ব্ববাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত রিলিফ ফণ্ডের হস্তে আমরা কিছু টাকা পাঠাইয়াছিলাম। সেই কমিটী দুর্ভিক্ষের সাহায্যার্থে বিক্রমপুরে যে লোক প্রেরণ করেন, তিনি উত্তর বিক্রমপুরে ৩৮ খানা গ্রামে সাহায্য করিয়াছেন। ঐ ৩৮খানা গ্রামে ১১২৮ জন লোককে সাহায্য করা হয়, তন্মধ্যে পুরুষ ১০৬, স্ত্রীলোক ৩৯৬, বালক বালিকা ৬২৬, মোট ১১২৮ জন। এই কার্য্যে ব্রাহ্মসমাজের সংগৃহীত টাকা হইতে বেশী টাকা ব্যয় হয় নাই। মুন্সিগঞ্জের ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট মহাশয় ব্রাহ্মসমাজের লোকের হাতে যে টাকা দিয়াছিলেন, সেই টাকা দ্বারাই অধিকাংশ স্থানে সাহায্য করা হইয়াছে। ঐ ৩৮ খানা গ্রাম ভিন্ন আরও দুইটী গ্রামের দুইটী ভদ্র পরিবারকে গোপনে সাহায্য করা হইয়াছিল। তৎপরে বাবু কাশীচন্দ্র ঘোষালকে তথায় প্রেরণ করা হয়।

প্রথমাবস্থায় দুর্ভিক্ষের প্রকোপ প্রবল হইয়াছিল, সেই সময় মুন্সিগঞ্জের ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট মহাশয়ের যত্নে অনেক লোকের কষ্ট নিবারণ হয়।

ভদ্রলোক এবং কৃষকদিগের অধিক কষ্ট হয় নাই। চাউল দুর্ম্মূল্য হওয়াতেই তাহাদের যাহা কিছু কষ্ট হইয়াছিল। অনাথা বিধবাদিগের ভয়ানক কষ্ট হইয়াছিল। ইহারা দিনের পর দিন উপবাস করিয়া কাটাইয়াছে, তথাপি প্রকাশ্যে সাহায্য গ্রহণ করিতে প্রস্তুত হয় নাই। আমাদের এজেণ্ট গোপনে অনেক চেষ্টা করিয়া কয়েকটী বিধবার সাহায্য করিয়াছিলেন।

The Royal Opium Commission সম্বন্ধে সমাজের পক্ষ হইতে সাক্ষ্য প্রদান করিবার জন্য সমাজের কয়েকজন সভ্যকে অনুরোধ করা হয়। তাঁহাদের একজন ব্যতীত সকলেই এই কার্য্য সুদক্ষতার সহিত সম্পন্ন করিয়াছেন। এই কমিশন সংসৃষ্ট যাঁহারা বিলাত হইতে কলিকাতায় আগমন করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে J. G. Alexander সাহেব "Temperance" বিষয়ে, এবং Parliament মহাসভার সভ্য H. J. Wilson সাহেব "Some moral and Social Reforms in England" বিষয়ে, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ উপাসনালয়ে বক্তৃতা করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত ছাত্রসমাজের সংশ্রবে Revd. Thomas Evans সাহেব এবং Mrs. Hauser, President World's women's Christian Temperance Union Calcutta, উভয়েই Temperance বিষয়ে সমাজ মন্দিরে বক্তৃতা করিয়াছিলেন। এই সকল বক্তৃতার জন্য বক্তাদিগকে আমরা হৃদয়ের সহিত কৃতজ্ঞতা প্রদান করিতেছি।

কার্য্যনির্ব্বাহক সভা Royal opium commission Temperance পক্ষীয় সভ্যগণকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য শ্রীযুক্ত সভাপতি মহাশয় এবং অন্য কতিপয় সভ্যকে অনুরোধ করেন। তাঁহাদিগের একজন এবং অপর কয়েকজনের উদ্যোগ ও চেষ্টায় বঙ্গমহিলা সমাজের এক সায়ংসমিতি হয়। তাহাতে Mrs. and Miss Pease, Messrs Arthur Pease M. P., H. J. Wilson M. P. এবং J. G. Alexander মহোদয় এবং মহোদয়াগণ নিমন্ত্রিত হইয়া তথায় আগমন পূর্ব্বক সমাজের অনেক সভ্যের সঙ্গে আলাপ করিয়া আপ্যায়িত করিয়াছিলেন।

খাসিয়া মিশন। বাবু নীলমণি চক্রবর্ত্তী যথাশক্তি এই মিশনের কার্য্য সম্পন্ন করিতেছেন। দিন দিন ইহার উন্নতি হইতেছে। চিরাপুঞ্জিতে যে প্রচার-ভবন প্রস্তুত হইয়াছে, তাহাতে উপাসকমণ্ডলীর আর স্থান হয় না। বিদ্যালয় ও ঔষধালয়ের কার্য্য ভালই চলিতেছে। পারিবারিক অনুষ্ঠান ও ব্রাহ্মসমাজের প্রণালী অনুসারে হইতেছে। সম্প্রতি যাঁহারা প্রাচীন প্রণালী পরিত্যাগ করিতেছেন, তাঁহাদিগকে নির্যাতন সহ্য করিতে হইতেছে।

স্থায়ী প্রচার ফণ্ড। প্রচার এবং অন্যান্য কার্য্যে সাহায্য হেতু কয়েকটী ফণ্ড স্থাপিত হইয়াছে। এই ফণ্ডগুলির মূলধন অব্যয়িত থাকিয়া তাহাদের সুদ নির্দ্দিষ্ট কার্য্যে ব্যয় সম্পন্ন হইবে। আয় ব্যয়ের হিসাবে এই ফণ্ডগুলির নাম উল্লেখ করা হইবে। স্বর্গীয় জগদীশ্বর গুপ্ত মহাশয়ের শ্রাদ্ধ উপলক্ষে তাঁহার সহধর্ম্মিণী স্থায়ী প্রচার ফণ্ডে ৫০০৲ পাঁচ শত টাকা দানের সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। তিনি এখন সমাজের হস্তে সেই টাকা অর্পণ করিয়াছেন।

প্রচার ও সাম্বৎসরিক উৎসব উপলক্ষে এই তিন মাস কাল মধ্যে শিরাজগঞ্জ, পাবনা, কুমিল্লা, কোচবিহার, বাগআঁচড়া, রামপুর-বোয়ালিয়া, চক্রবেড়িয়া, চট্টগ্রাম, ঢাকা প্রভৃতি স্থান হইতে প্রচারকগণের নিমন্ত্রণ আসিয়াছিল।

আমাদিগের প্রচারকগণ নিম্নলিখিতরূপে বিগত তিন মাস কার্য্য করিয়াছেন।

পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী—কলিকাতা উচ্চ নীতি বিধায়িনী ছাত্র সভাতে "সাহিত্যে জাতীয় চরিত্র" সম্বন্ধে একটি, ছাত্রসমাজে একটি, এবং একদিন ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় প্রশ্নের উত্তর প্রদান উপলক্ষে একটি বক্তৃতা করেন। ব্রাহ্মবালিকা বোর্ডিং এবং স্কুলের সম্পাদকতা, আশ্রমের উপাসনায় অধিকাংশ সময় আচার্য্যের কার্য্য, সময়ে সময়ে মন্দিরে উপাসনা, নিয়মিতরূপে তত্ত্ব-কৌমুদীর সম্পাদন কার্য্য এবং কোন কোন বাসায় উপাসনা ও অনুষ্ঠানে আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়—বাত, জ্বর প্রভৃতি পীড়ায় কষ্ট পাওয়াতে গত তিন মাস কাল-ইচ্ছানুরূপ প্রচার কার্য্য করিতে পারেন নাই। কলিকাতা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে দুই দিবস উপাসনা, কোন ব্রাহ্মপরিবারে একটি শিশুর জন্মদিন উপলক্ষে উপাসনা, সিটিকলেজ ভবনে, ব্রাহ্মসম্মিলনীতে উপাসনা এবং সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে 'মহাশক্তি' বিষয়ে একটি বক্তৃতা করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত ভবানীপুর প্রার্থনাসমাজে উপাসনা এক দিবস একটি শিশুর নামকরণ উপলক্ষে উপাসনা, ব্রাহ্ম ও অন্যান্য লোকের সহিত ধর্ম্ম ও সামাজিক বিষয়ে আলোচনা, সাময়িক পত্রিকায় ধর্ম্মবিষয়ে প্রবন্ধ, এবং ধর্ম্মসম্বন্ধীয় পুস্তক রচনা করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত বাবু নবদ্বীপচন্দ্র দাস—বাঁকুড়া অঞ্চল হইতে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক কিছুদিন কলিকাতায় প্রচার করিয়া মাণিকদহে শারদীয় উৎসব, তৎপর কুমারখালি ব্রাহ্মসমাজের বার্ষিক উৎসব কার্য্য সম্পন্ন করিয়া ঢাকা পূর্ব্ববাঙ্গালা ব্রাহ্মসম্মিলনীতে যোগদান করেন। তথায় পরিবারে এবং সমাজে উপাসনা করেন। ঢাকা হইতে ফরিদপুরে গমন করিয়া তথায় সমাজে এবং পরিবারে উপাসনা পাঠব্যাখ্যানাদি করেন। তৎপর কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিয়া সাধনাশ্রমে, মন্দিরে এবং কোন কোন পরিবারে উপাসনাদি করেন; পরে পাবনা ও সিরাজগঞ্জের উৎসব কার্য্য সম্পন্ন করিয়া ঢাকায় যাত্রা করেন। পূর্ব্ব বাঙ্গালা ব্রাহ্ম-সম্মিলনী হইতে কার্য্যনির্ব্বাহকসভা এক অনুরোধ পত্র প্রাপ্ত হন, তাহার মর্ম্ম এই যে, উক্ত সম্মিলনী পূর্ব্ব বাঙ্গালা ও আসাম প্রদেশ লইয়া একটা প্রচার ক্ষেত্র প্রস্তুত করিবেন এবং আমাদিগের প্রচারক বাবু নবদ্বীপচন্দ্র দাস মহাশয়কে সেই ক্ষেত্রে প্রচার কার্য্যের ভার অর্পণ করিবেন। মাঘোৎসব নিকটবর্ত্তী, তাহার পর এই বিষয় সম্বন্ধে কর্ত্তব্য কি তাহা স্থির করিবার সুবিধা জন্য কার্য্যনির্ব্বাহকসভা উক্ত প্রচারক মহাশয়কে এক মাসের নিমিত্ত একটি প্রচারদলসহ ঐ অঞ্চলে গিয়া প্রচার করিতে অনুরোধ করেন। উক্ত প্রচারক মহাশয় সিরাজগঞ্জে কয়েক দিন পীড়িতাবস্থায় ছিলেন তৎপর একটু সুস্থ হইলে পর ঢাকা হইয়া কুমিল্লা উৎসবে গমন করিয়াছেন। তাঁহার শরীর এখন সম্পূর্ণ সুস্থ বা সবল হয় নাই।

শ্রীযুক্ত বাবু শশিভূষণ বসু—মধ্যে মধ্যে নিমতা ব্রাহ্মসমাজে, কোন কোন ব্রাহ্ম পরিবারে এবং মন্দিরে তিন রবিবার রাত্রে আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছেন। "Brahmoism" নামক পুস্তিকা প্রকাশে রত ছিলেন। Indian Messenger পত্রিকা সম্পাদনেও কিছু কিছু সাহায্য করিয়াছেন। তিনি লিখিতেছেন, "আমি দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে, এই তিন মাস কাল মধ্যে আমার উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে যাইবার কথা ছিল। কিন্তু কোন কোন বিশেষ কারণে সেখানে যাইতে পারি নাই এবং আশানুরূপ কার্য্যও করিতে পারি নাই।" সম্প্রতি তিনি বাঘআঁচড়া ব্রাহ্মসমাজের উৎসবে গমন করিয়াছেন। তথা হইতে কুচবিহার উৎসবে যাত্রা করিতেন কিন্তু অসুস্থতা বশতঃ তিনি কুচবিহার যাইতে অসমর্থ হইয়াছেন।

শ্রীযুক্ত লক্ষ্মণপ্রসাদ—অক্টোবর মাসে কঠিন জ্বর রোগে প্রায় ২০ দিন সংজ্ঞাহীন থাকেন। তৎপর অল্প অল্প করিয়া আরোগ্য লাভ করেন। এই পীড়া তাঁহার কার্য্যের বিস্তর ক্ষতি করিয়াছে। তথাপি তিনি নিতান্ত দুর্ব্বল অবস্থায়ও লক্ষ্ণৌ সহরের মধ্যে পূর্ব্বে যেখানে ছিলেন, সেই স্থানে আগমন পূর্ব্বক তথাকার সমাজে দৈনিক ও সাপ্তাহিক উপাসনার কার্য্য করিয়াছেন এবং তথায় একটী ব্রহ্ম বিদ্যালয় সংস্থাপন পূর্ব্বক কয়েকটি বন্ধুর সাহায্যে সেই বিদ্যালয়ের কার্য্য এবং তাঁহার হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসালয়ের কার্য্যও তিনি যথাশক্তি সম্পন্ন করিয়াছেন। তাঁহার শরীর এখনও দুর্ব্বল। আমাদিগের বন্ধু বাবু হীরালাল রায় এবং আর একটি যুবক তাঁহার যথেষ্ট সেবা ও সাহায্য করিতেছেন।

সাধনাশ্রম।

পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী এবং নবদ্বীপচন্দ্র দাসের কার্য্য প্রচারকগণের কার্য্যবিবরণের সহিত দেওয়া হইয়াছে। অন্যান্য পরিচারকগণের কার্য্য বিবরণ এইরূপ :—

শ্রীযুক্ত আদিনাথ চট্টোপাধ্যায় নিয়মিতরূপে ব্রাহ্মমিসন প্রেসের কার্য্যাধ্যক্ষতা করিয়াছেন। শারদীয় উৎসব উপলক্ষে মাণিকদহ সমাজে, সাধনাশ্রমে, কয়েকটী পারিবারিক অনুষ্ঠানোপলক্ষে সিন্দুরিয়াপটি পারিবারিক সমাজের উৎসবে এবং মন্দিরেও কোন কোন রবিবার প্রাতে আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছেন। তত্ত্ব-কৌমুদী সম্পাদনে সাহায্য করিয়াছেন এবং ব্রাহ্মবালিকা বোর্ডিংএ উপাসনা করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত প্রকাশ দেব গত সেপ্টেম্বর মাসে ছোট নাগপুর অঞ্চলে গমন করেন। চাঁইবাসা উৎসব উপলক্ষে একদিন হিন্দিতে উপদেশ দেন, তথাকার ছাত্র সভায় একটি বক্তৃতা করেন এবং দুই দিন সমবেত উপাসনায় আচার্য্যের কার্য্য করেন। পুরুলীয়া টাউন হলে এক দিন বক্তৃতা, আসেন্সোলে এক দিন উপদেশ প্রদান, বাঁকুড়ায় জেলায় দুই দিন সমবেত উপাসনায় আচার্য্যের কার্য্য, এক দিন বাজারে প্রকাশ্য বক্তৃতা এবং মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের মৃত্যু দিনে একটি বক্তৃতা করেন। তৎপর কলিকাতায় প্রত্যাগত হইয়া শারদীয় উৎসব উপলক্ষে মাণিক দহে এক দিন বাজারে প্রকাশ্য বক্তৃতা করেন। তৎপর কয়েকদিন কলিকাতায় থাকিয়া পরে হাজারিবাগে গমন করেন। সেখানে বক্তৃতা, উপাসনা এবং আলোচনাদি দ্বারা ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিতেছিলেন, ইতিমধ্যে পারিবারিক দুর্ঘটনা বশতঃ জন্মভূমি পঞ্জাব প্রদেশে গমন করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় নিয়মিত রূপে, সাঃ ব্রাঃ সমাজের ধনাধ্যক্ষের কার্য্য, শারদীয় উৎসব উপলক্ষে মাণিকদহে আচার্য্যের কার্য্য, কলিকাতায় কয়েকটি ব্রাহ্ম পরিবারের তত্ত্বাবধান, রবিবার প্রাতে কয়েক দিন মন্দিরে উপাসনা, নিমতা ব্রাহ্মসমাজে প্রতি শনিবার সামাজিক উপাসনা এবং একটি অনুষ্ঠানে আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত গুরুদাস চক্রবর্ত্তী নিয়মিত রূপে ব্রাহ্মবালক ছাত্র নিবাসের তত্ত্বাবধারকের কার্য্য, ব্রাহ্মবালিকা শিক্ষালয়ের শিক্ষকতা কার্য্য, এবং শারদীয় উৎসব উপলক্ষে মানিকদহে প্রকাশ্য বক্তৃতা, আশ্রমের উপাসনা এবং কোন কোন সময়ে অনুষ্ঠানোপলক্ষে উপাসনা, এতদ্ব্যতীত সময় সময় তত্ত্ব-কৌমুদী সম্পাদনের সহায়তাও করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত কাশীচন্দ্র ঘোষাল মাণিকদহ শারদীয় উৎসবে যোগদান করিয়া ঢাকা ব্রাহ্মসম্মিলনীতে উপস্থিত হন। সম্মিলনীর অধিবেশন শেষ হইলে তিনি তথা হইতে বিক্রমপুরে দুর্ভিক্ষ-প্রপীড়িতদিগকে সাহায্য করিবার জন্য প্রেরিত হন। দুর্ভিক্ষের প্রকোপ প্রশমিত হওয়ায় তিনি কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন। কলিকাতা প্রত্যাবর্ত্তনের পূর্ব্বে সঙ্গীত, সংকীর্ত্তন, বক্তৃতা ও কথকথাদি দ্বারা ঢাকা ও বিক্রমপুরের কোনও কোনও স্থানে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করেন ও তদ্ভিন্ন একটী পারিবারিক অনুষ্ঠানে আচার্য্যের কার্য্য করেন। কলিকাতায় অবস্থিতিকালে আশ্রমের কার্য্যাধ্যক্ষতা ও তত্ত্বকৌমুদীর সম্পাদন বিষয়ে সহায়তা করিয়াছেন।

আয়		ব্যয়	
ভিক্ষাপ্রাপ্তি	৯৩৷৵১৫	অতিথিগণের জন্য ব্যয়	৫৬৷/০
দানপ্রাপ্তি	৯৪৵০	শেল্‌টারের জন্য সাধারণ	
ঘর ভাড়া প্রাপ্তি	২৪৲	ব্যয় এবং পাথেয়াদি	৯৭৷৵১০
অতিথি ফণ্ডের জমা	১১৲	আশ্রমবাসীদিগের	
পুস্তক বিক্রয়	৯৮/০	আহারাদির ব্যয়	৪৮৮৷১৫
পাথেয় হিঃ	৬৭৮/০		
জিনিস বিক্রয়	২৬৷০		৬৪২৷৫
আশ্রমবাসিগণের		স্থিত	৫৷৶৫
নিকট হইতে প্রাপ্ত	৩২০৵৫		
	৬৪৭/০		৬৪৭৶১০

উপাসকমণ্ডলী—মন্দিরে নিয়মিতরূপে প্রাতে ও সন্ধ্যার সময় উপাসনা হইয়াছে। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী, বাবু শশিভূষণ বসু এবং বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় প্রধানতঃ আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছেন।

আয় ব্যয়ের হিসাব

আয়		ব্যয়	
দান প্রাপ্তি	১।৵১৫	কর্ম্মচারীর বেতন	২৬৸৹
চাঁদা সংগ্রহ	১০৬৷৵৹	ক্ষুদ্র ব্যয়	১০/৹
	———	গ্যাসের আলো হিঃ	২৬৷৹
	১০৭৸১৫	মন্দির মেরামত হিঃ	৫৲
পূর্ব্বস্থিত	৪।৴১২॥	হারমোনিয়ম মেরামত	১০৲
মোট	১১২।৭॥		৭৮।/৹
		হস্তেস্থিত	৩৩৸৴৭॥
			১১২।৭॥

ব্রহ্মবিদ্যালয়—শারদীয় ছুটীর পর ব্রহ্মবিদ্যালয়ের কার্য্য পুনরারব্ধ হইয়াছে। ধর্ম্মবিজ্ঞানের ইংরেজি শ্রেণী ও ভগবদ্গীতার শ্রেণীর কার্য্য নিয়মিতরূপে চলিতেছে। প্রথমোক্ত শ্রেণীর সংশ্রবে গত ১২ই ডিসেম্বর শ্রীযুক্ত বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় "মহাশক্তি" বিষয়ে একটী বক্তৃতা করেন। উক্ত শ্রেণীর সংশ্রবেই উক্ত প্রচারক মহাশয় "ঈশ্বরের অস্তিত্ব" বিষয়ে পূর্ব্বে একটী বক্তৃতা করিয়াছিলেন।

ব্রাহ্মসম্মিলনী—এই তিন মাসের মধ্যে ১১ই ডিসেম্বর হইতে ১৬ই ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ৬ দিবস প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় সিটিকলেজ ভবনে উপাসনা হইয়াছে। শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র দত্ত, শিবনাথ শাস্ত্রী, নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, শশিভূষণ বসু, মহেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ও কৃষ্ণকুমার মিত্র উপাসনা করিয়াছিলেন।

ছাত্রসমাজ—বিগত শারদীয় অবকাশান্তে ২রা ডিসেম্বর তারিখে ছাত্রসমাজের কার্য্য পুনরায় আরব্ধ হয়। বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় এই উপলক্ষে মন্দিরে উপাসনার কার্য্য করেন। ৯ই তারিখে রেভারেণ্ড টমাস ইভান্স সাহেব "on the need of Temperance-work in India" বিষয়ে মন্দিরে একটী বক্তৃতা করেন। এই সভায় পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় সভাপতির কার্য্য করেন। বক্তৃতান্তে মিঃ এ এম বসু মহাশয় একটী সুললিত এবং উৎসাহসূচক বক্তৃতা দ্বারা বক্তাকে হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা প্রদান করেন। Mrs. Hauser ও একদিন উপাসনালয়ে বক্তৃতা করিয়াছিলেন। ১৬ই তারিখে "মহাশক্তি" বিষয়ে বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় মন্দিরে একটি বক্তৃতা করেন, এই বক্তৃতাটি ছাত্রসমাজ এবং ব্রহ্মবিদ্যালয় উভয়ের সমবেত চেষ্টায় হইয়াছিল! ১২ই এবং ১৬ই তারিখে শ্রীযুক্ত বাবু জগদীশ চন্দ্র বসু মহাশয় সম্পাদককে সঙ্গে লইয়া দুইটী ছাত্রনিবাস পরিদর্শন করেন।

ব্রাহ্মছাত্রীনিবাস ও ব্রাহ্মবালিকা শিক্ষালয়।—এই তিন মাসে ছাত্রী সংখ্যা ৭৭ জন ছিল, তন্মধ্যে ১৬টী বালক নয় বৎসরের ন্যূন বয়স্ক। বোর্ডিংএর ছাত্রী সংখ্যা ২৭টী। ৪টী ছাত্রী পরীক্ষা দিয়াছে এবং সকলকেই আগামী প্রবেশিকা পরীক্ষায় উপস্থিত করা হইবে।

আয়		ব্যয়	
ছাত্র ছাত্রীর বেতন আদায়		বোর্ডিং খরচ	৪৩৪৸৴৹
	১২১১॥৵৹	কর্ম্মচারীর বেতন	৬৭৮৴৫
বোর্ডিং ফি	৭৫১॥৹	গাড়ী	২৮৮৸৵৫
স্কুল ফি	৪২০৵৹	বাড়ী ভাড়া	২৭০৲
প্রবেশিকা পরীক্ষার ফিঃ	৪০৲	প্রবেশিকা পরীক্ষার ফি	৪০৲
		বিবিধ	৪৭।১৫
	১২১১॥৵৹		১৭৫৯।/৫
চাঁদা ও এককালীন দান		হস্তেস্থিত	১৩৬৴
	৯১৩॥৵৹		
	১৬০২।১৫		
পূর্ব্বস্থিত	২৯৩৴১০		
মোট	১৮৯৫॥৫	মোট	১৮৯৫॥৫

রবিবাসরীয় নীতি বিদ্যালয়—নীতিবিদ্যালয়ের কার্য্য নিয়মিতরূপে চলিয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে ছাত্র ছাত্রী সংখ্যা ৯০। ইহার পুস্তকালয়ের জন্য বিলাত হইতে কতকগুলি সুন্দর পুস্তক আনান হইয়াছে। কুমারী মার্টিনোর নিকট হইতে এবিষয়ে অনেক সাহায্য পাওয়া গিয়াছে, এজন্য তাঁহার নিকট আমরা বিশেষ কৃতজ্ঞ আছি।

সঙ্গত সভা—এই তিন মাস কালে সঙ্গত সভার অধিবেশন নিয়মিতরূপে হইয়াছিল। কেবল ১২ই ও ১৯এ ডিসেম্বর এই দুই মঙ্গলবার ব্রাহ্মসম্মিলনীর উৎসব ও সমাজ মন্দিরে বক্তৃতা হইয়াছিল বলিয়া সঙ্গতের অধিবেশন হয় নাই। অন্যান্য অধিবেশনে আত্মোৎসর্গ ও সর্ব্বমত্যাস্তং গর্হিতং এই দুইটী বিষয়ের আলোচনা বিশেষ ভাবে হইয়াছিল।

গত ৩০এ অগ্রহায়ণ হইতে সঙ্গত সভার কয়েকটী উৎসাহী সভ্য কর্ত্তৃক মাঘোৎসবের উদ্বোধন স্বরূপ পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের মত ব্রাহ্ম ভ্রাতাদিগের বাড়ী বাড়ী ভোর সংকীর্ত্তন হইতেছে।

দাতব্য বিভাগ—দাতব্য বিভাগের কার্য্য গত ৩ মাস কাল প্রায় পূর্ব্ববৎই চলিয়াছে। এই তিন মাস মধ্যে ৯টী পরিবার ১২টী, ছাত্র, ৩টী, অন্ধ, এবং একটী কুষ্ঠ রোগীকে অর্থ সাহায্য করা হইয়াছে। যাঁহারা দয়া করিয়া এই দাতব্য বিভাগে অর্থ দান করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে হৃদয়ের সহিত ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। আয় ব্যয়ের হিসাব নিম্নে প্রদত্ত হইল।

জমা		খরচ	
অনুষ্ঠান উপলক্ষে	৩০॥	মাসিক দান	৬৯
বার্ষিক দান	৬॥৹	এক কালীন দান	১৯৵৹
মাসিক দান	৭৲		
এককালীন			৮৮৵৹
		হস্তেস্থিত	১৭৩৸৹
	৫৪৵		
পূর্ব্বকার স্থিত	২০৭৸		
	২৬১৸৵৹		২৬১৸৵৹

ইণ্ডিয়ান মেসেঞ্জার ও তত্ত্ব-কৌমুদী—এই পত্রিকাদ্বয়ের সম্পাদন কার্য্য ভার যাঁহাদিগের হস্তে অর্পিত আছে তাঁহারা যথাশক্তি এই কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন।

আয় ব্যয়ের হিসাব।

সমাজ।

আয়		ব্যয়	
সভ্য ও সহযোগিগণের		প্রচার ব্যয়	৫৪৪৵০
চাঁদা আদায়	৪২৩৶০	কর্ম্মচারীর বেতন	১৬৮৲
বার্ষিক ২৩৩৶১৫		কমিশন	/১০
মাসিক ১৮৯৸৶৫		ডাকমাশুল	১১৸৶০
———		বিবিধ (অধ্যক্ষসভার,	
৪২৩৶০		মুদ্রাঙ্কন এবং অন্যান্য	
প্রচারার্থ দানপ্রাপ্তি	২৫৫।/০	ক্ষুদ্র ব্যয়)	৫১৵০
বার্ষিক ৪০॥৵০		সুদ	৪৫৲
মাসিক ১৩২।০		প্রচার গৃহ	৫৸/১০
এককালীন ৮২।৶০		পাথেয়	১৮॥০
———		আসাম মিশন	৪৲
২৫৫।/০		সিটিকলেজ বৃত্তি	৮০॥০
বিবিধ	১২৵১০	সৌদামিনী বৃত্তি	২০৲
সুদ	৮৩।০	ট্রাষ্টডিড	৭৭।৶০
পাথেয়	২৪৲	দুর্ভিক্ষ ফণ্ড	৮৸১০
স্থায়ী প্রচার ফণ্ড	৫০৫৲	তত্ত্বকৌমুদী	১৮০৸/১৫
বিল্‌ডিং ফণ্ড	৩৸০	মেসেঞ্জার	১২৬৵১৫
খাসিয়া মিশন	১১৲	গচ্ছিত বা হাওলাত	১৬০৫৸/০
বাগআঁচড়া মিশন	৭৮৲		———
সিটিকলেজ বৃত্তি	৮০॥০		২৯৪৮৶০
দুর্গাময়ী ফণ্ড	২০৲	হস্তেস্থিত	২২২৸৫
দুর্ভিক্ষ ফণ্ড	৫৭৭৶০		———
নানাবিধ স্থায়ী ফণ্ড	৪৪০৲		
শরৎকামিনী ১০০৲			
শ্যামাসুন্দরী ১৫৲			
রাণী অন্নপূর্ণা গুপ্তা ৫০৲			
পার্ব্বতী গুপ্তা ২৫৲			
হীরালাল গুপ্ত ২৫৲			
থ্যালা গুপ্তা ২৫৲			
দুর্গাপ্রসাদ গুপ্ত ২৫৲			
আশারাম গুপ্ত ২৫৲			
জানকী গুপ্তা ৫০৲			
জয়নারায়ণ রায় ১০০৲			
———			
৪৪০৲			
তত্ত্বকৌমুদী	১৫॥০		
ইঃ মেসেঞ্জার	১।/৫		
পুস্তক	১২৯।০		
গচ্ছিত বা হাওলাত	৪৯।০		
	———		
	২৭০৮॥৵১৫		
গত ত্রৈমাসিকের স্থিত	৪৬৩।১০		
	———		
	৩১৭১৸৶৫		৩১৭১৸৶১৫

Audited

BANKUBEHARY BOSE

Auditory

8/1/94.

ইণ্ডিয়ান মেসেঞ্জার।

আয়		ব্যয়	
মূল্য আদায়	২৬৭/০	কর্ম্মচারীর বেতন	৪১॥০
বিজ্ঞাপন	১০১/১০	মুদ্রাঙ্কন	১৩০৲
নগদ বিক্রয়	৸৶০	কাগজ	৪০৲
কাগজ বিক্রয়	৭॥০	ডাকমাশুল	১৮৫৸৶০
বিবিধ	২৸১০	বিবিধ	১৬৻১০
	———		———
	২৮৮॥৵০		৪১৩।৶১০
গত ত্রৈমাসিকের স্থিত		হস্তেস্থিত	১।/৫
	১২৬৵১৫		———
	———		৪১৪৸১৫
	৪১৪৸১৫		

তত্ত্বকৌমুদী।

আয়		ব্যয়	
মূল্য আদায়	১১৯।৵০	কর্ম্মচারীর বেতন	৮১॥০
নগদ বিক্রয়	২৲	মুদ্রাঙ্কন	৮১৲
	———	কাগজ	৩০৻১০
	১২১।৶০	ডাকমাশুল	৮৬৸৫
		বিবিধ	৭।৶০
গত ত্রৈমাসিকের			———
স্থিত	১৮০৸/১৫		২৮৬॥৶১৫
	———		
	৩০২৶১৫	হস্তেস্থিত	১৫॥০
			———
			৩০২৶১৫

পুস্তক।

আয়		ব্যয়	
নগদ বিক্রয়	১৫১॥৵০	অপরের পুস্তক বিক্রয়	
ঐ অপরের	৩৪৻১০	মূল্য শোধ	২।৵০
বাকী মূল্য আদায়	২৯॥১০	কর্ম্মচারীর বেতন	১০॥০
ডাকমাশুল (ফেরৎ)	৭।৶১০	কাগজ	২৮/১০
কমিশন	॥/১০	মুদ্রাঙ্কন	৭৪।০
মুদ্রাঙ্কন	৬৲	ডাকমাশুল	৯।৶০
বিবিধ	৩৸৵০	কমিশন	১২৸৵১০
গচ্ছিত বা হাওলাত	৫৫॥/০	বিবিধ	৮।৵০
	———	গচ্ছিত বা হাওলাত শোধ	১৩॥০
	২৮৮॥৶০		———
			১৫৯।৶০
		হস্তেস্থিত	১২৯।০
			———
			২৮৮॥৶০

ব্রাহ্মমিশন প্রেস।

আয়		ব্যয়	
আদায় (মুদ্রাঙ্কন, কাগজ, দপ্তরি প্রভৃতি বাবদে যাহা আদায় হইয়াছে)	৬৬৪৩৶৫	মুদ্রাঙ্কন, কাগজ, দপ্তরি প্রভৃতি বাবদে যাহা অপরকে ধার দেওয়া হইয়াছে	১৫৬৬/১০
ছাপাই (যত টাকার কাজ হইয়াছে)	১১৮২৲	সরঞ্জামী	৯৪৸৶১০
		বিবিধ	৪।৶১০
কাগজ বিক্রয়	১০৪॥৵৫	ডাকমাশুল	॥৵৫
প্রেস প্রস্তুত হিঃ	১২৮৲	কাগজ খরিদ	১০৩৵১৫
গৃহ প্রস্তুত হিঃ	৩০৲	বেতন হিঃ	৬৩৫/০
প্যাকিং হিঃ	৶০	প্রেস প্রস্তুত	৮৯।৶১০
হাওলাত	৭৫৬॥৵১০	সুদ হিঃ	৭৮৲
দঃ কর্ম্মচারীর বেতন ৬১৭।০		বাটীভাড়া	৩০৲
টাইপের মূল্য ৬৪।৵১০		ওয়ার এণ্ড টিয়ার	১১৭॥০
দঃ সুদ ৭৫৲		ছাড়	৩৮৵১৫
		হাওলাত	১০৮৫৸৶১০
		দঃ কর্ম্মচারী ৭৫০৵১৫	
ছাড় হিঃ	৭৩॥৫	দঃ সুদ ৭৫৲	
		দঃ টাইপ ২৬০৸১৫	
	৩৯১৮৶৫		
গত ত্রৈমাসিকে স্থিত	১৪৸/১০		
			৩৮৪৩॥৫
	৩৯৩৩৲১৫	স্থিত	৮৯॥১০
			৩৯৩৩৲১৫

ব্রাহ্মসমাজ।

প্রচার—সাধনাশ্রম হইতে শ্রীযুক্ত প্রকাশদেব এবং শ্রীযুক্ত সুন্দর সিং গত নবেম্বর মাসে হাজারিবাগ ব্রাহ্মসমাজের অনুরোধে তথায় গমন করেন। ইঁহারা সেখানে হিন্দি বক্তৃতা, উপাসনা, আলোচনা এবং সংগীতাদির দ্বারা ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করেন। পারিবারিক দুর্ঘটনা বশতঃ শ্রীযুক্ত প্রকাশদেব ইতি-মধ্যে জন্মস্থান পঞ্জাবে গমন করেন, সে সময় শ্রীযুক্ত সুন্দর সিং হাজারিবাগে উক্ত প্রকারে কার্য্য করেন। সম্প্রতি মাঘোৎসব উপলক্ষে তাঁহারা উভয়েই সাধনাশ্রমে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত বাবু নবদ্বীপচন্দ্র দাস এবং বাবু হরিমোহন ঘোষাল পূর্ব্ববঙ্গে প্রচারে বহির্গত হইয়া, কুষ্টিয়া, সিরাজগঞ্জ, ত্রিপুরা প্রভৃতি স্থানে গমন করিয়া উপাসনা, বক্তৃতা ও সংগীতাদি দ্বারা ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিয়াছেন। হরিমোহন বাবু ইতিপূর্ব্বে কলিকাতা সাধনাশ্রমে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন, নবদ্বীপ বাবু ঢাকাতে অবস্থিতি করিতেছেন। সম্ভবতঃ ঢাকার ব্রাহ্ম-বন্ধুদিগের দ্বারা অনুরুদ্ধ হইয়া এবার মাঘোৎসবের সময়ে তিনি ঢাকাতেই অবস্থিতি করিবেন।

"চটকাবেড়ে হইতে কোনও ব্রাহ্মবন্ধু লিখিয়াছেন,

চটকাবেড়িয়া ও তৎসন্নিকটবর্ত্তী গ্রামসমূহে অনেক ভদ্র-লোকের (যথা ব্রাহ্মণ কায়স্থ ও সদগোপ প্রভৃতি) এবং কৃষক শ্রেণীয় অনেক হিন্দু মুসলমানের বসতি আছে। কিন্তু এত দিনেও এত লোকের মধ্যে একমাত্র বাবু চন্দ্রনাথ চৌধুরী ব্যতীত আর কেহ ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করেন নাই এবং ব্রাহ্মধর্ম্ম যে কি, তৎসম্বন্ধে এখানকার অধিকাংশ লোক একবারে অনভিজ্ঞ। চন্দ্রবাবুর পুত্র শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চৌধুরি মধ্যে মধ্যে অবকাশ সময়ে এখানে আসিয়া কয়েক বৎসর যাবৎ এখানে ব্রাহ্মধর্ম্ম বিস্তারের প্রয়াস পাইয়া আসিয়াছেন। এ বৎসর খ্রীষ্টম্যাসডে উপলক্ষে তিনি কলিকাতা সাধনাশ্রমের শ্রীযুক্ত বাবু কাশীচন্দ্র ঘোষাল মহাশয়কে সঙ্গে লইয়া এখানে আগমন করতঃ বিশেষভাবে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের চেষ্টা করিয়া-ছেন। ঈশ্বরেচ্ছায় সুবাতাস বহিয়াছে। হিন্দুপ্রধান গ্রামে যেখানে ব্রাহ্মধর্ম্ম সম্বন্ধে লোকের জ্ঞান একবারেই নাই, এবং যেখানে মামলা মোকদ্দমাতে ও প্রচলিত ধর্ম্মের উপর অবি-শ্বাসের জন্য, সাধারণের নৈতিক অবস্থা অতি শোচনীয়, সেখানে লোকে আগ্রহ পূর্ব্বক কাশী বাবুর সঙ্গীত ও বক্তৃতাদি শ্রবণ করিয়াছে ও প্রীত হইয়াছে।

কাশী বাবুর আগমনে আমরা বিশেষ উপকৃত হইয়াছি। এ অঞ্চলে বিশেষ ভাবে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার এখন হইতে আরম্ভ হইল। ভগবান তাঁহার ধর্ম্মকে সকল ধর্ম্মের উপরে জয়যুক্ত করুন।"

উৎসব—বোয়ালিয়া ব্রাহ্মসমাজের বার্ষিক উৎসবের প্রারম্ভে সম্পাদক বাবু মথুরামোহন মৈত্র অকস্মাৎ মানবলীলা সংবরণ করেন। ইনি তথাকার ব্রাহ্মসমাজের একজন বিশেষ উৎসাহী সভ্য ছিলেন। ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যে কখনও তাঁহার শিথিলতা ছিল না। হঠাৎ তাঁহার অভাবে অনেকেই মনে করিয়াছিলেন যে, বোধ হয় এবার বোয়ালিয়া সমাজের উৎসব হইবে না; কিন্তু পরমেশ্বরের কৃপায় উৎসব সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। কার্য্যবিবরণ প্রাপ্ত হইলে পরে প্রকাশিত হইবে।

গত ১লা জানুয়ারী নিমতা ব্রাহ্মসমাজের বার্ষিক উৎসব অতি সুন্দররূপে সম্পাদিত হইয়াছে। পূর্ব্ব দিন অপরাহ্ণে কলিকাতা হইতে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী প্রমুখ কতিপয় ব্রাহ্ম তথায় গমন করেন। স্থানীয় এণ্ট্রান্স স্কুলগৃহে সভা হয়। সংগীতের পর শাস্ত্রী মহাশয় পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। তৎপর দিন কলিকাতা হইতে অনেকে গমন করেন। অতি প্রত্যুষে বাড়ী বাড়ী গিয়া ভোর কীর্ত্তন করা হয়, তৎপর ৭॥ টার সময় বহুসংখ্যক লোক মিলিত হইয়া নগরকীর্ত্তন করেন। ৮॥ টার সময় উপাসনা হয়, বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত আচার্য্যের কার্য্য করেন। এবং যোগ সম্বন্ধে অতি উপাদেয় উপদেশ প্রদান করেন। মধ্যাহ্নে গরিব দুঃখিদিগকে চাউল বিতরণ করা হয়, তৎপর আদি ব্রাহ্মসমাজের

শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ শাস্ত্রী ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ পাঠ করেন, তৎপর বাবু বিপিনচন্দ্র পাল নির্ভর সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। বক্তৃতা হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। রাত্রিতে নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় উপাসনা করেন এবং বিশ্বাস সম্বন্ধে উপদেশ দেন। এই উৎসব উপলক্ষে বাবু মহেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় সাধনাশ্রমে ২৲ টাকা দান করিয়াছেন।

মাণিকদহ ব্রাহ্মসমাজের দশম বার্ষিক উৎসব নিম্নলিখিত প্রণালীতে সম্পন্ন হইয়াছে। ১৬ই পৌষ উদ্বোধন। বাবু কালীপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য উপাসনা করেন। ১৭ই পৌষ পূর্ব্বাহ্নে ব্রহ্মোপাসনা; বাবু উমেশচন্দ্র নাগ উপাসনা করেন। অপরাহ্নে শাস্ত্র পাঠ এবং সন্ধ্যাকালে উপাসনা হয়, কালীপ্রসন্ন বাবু উপাসনা করেন।

বাগআঁচড়া ব্রাহ্মসমাজের একত্রিংশৎ সাম্বৎসরিক উৎসব উপলক্ষে কলিকাতা হইতে প্রচারক শ্রীযুক্ত বাবু শশিভূষণ বসু এবং শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র সেন তথায় গমন করেন। গত ১২ই পৌষ হইতে ১৭ই পৌষ পর্য্যন্ত উৎসব হইয়াছে। উৎসবে উপাসনা আলোচনা, মহিলা সমাজের উৎসব, বালকবালিকা সম্মিলন, নগর সংকীর্ত্তন প্রভৃতি হইয়াছে। বক্তৃতা উপাসনাদি শশী বাবু করিয়াছেন, কৈলাস বাবু সংগীত সংকীর্ত্তন করিয়াছেন।

মৃত্যু সংবাদ—আমরা দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতেছি, আমাদের ব্রাহ্মবন্ধু বাবু গুরুচরণ সমাদ্দারের পত্নী রক্তামাশায় রোগে গত ৯ই জানুয়ারী কলিকাতা ১০।৩ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীটস্থ ভবনে চারিটি শিশুসন্তান রাখিয়া ২৩ বৎসর বয়সে অকালে পরলোক গমন করিয়াছেন। পরমেশ্বর মাতৃহীন শিশুদিগকে রক্ষা করুন এবং শোক-দগ্ধ স্বামীর প্রাণে শান্তিদান করুন।

শ্রাদ্ধ—শ্রীযুক্ত বাবু ললিতমোহন দাসের পিতৃশ্রাদ্ধ উপলক্ষে সাধনাশ্রমে উপাসনা হয়। শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় উপাসনা করেন। ললিত বাবু এতদুপলক্ষে সাঃ ব্রাঃ সমাজের স্থায়ী প্রচার বিভাগে ২৲ টাকা এবং পতিতা রমণীদিগের আশ্রমের জন্য ২৲ টাকা ও দাতব্য বিভাগে ১৲ টাকা দান করিয়াছেন।

বাগআঁচড়া নিবাসী শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ মল্লিকের পিতার আদ্য শ্রাদ্ধোপলক্ষে বাবু শশিভূষণ বসু উপাসনা করেন। রাজেন্দ্র বাবু এই উপলক্ষে সাঃ ব্রাঃ সমাজে ১৲ টাকা দান করিয়াছেন।

গত ১৯শে অগ্রহায়ণ মাণিকদহের বাবু কালীপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্যের পিতার শ্রাদ্ধ তাঁহার জন্মভূমি কাউলীবেড়া গ্রামে সম্পন্ন হইয়াছে। এতদুপলক্ষে মাণিকদহ হইতে কতিপয় ব্রাহ্মবন্ধু তথায় গমন করেন। কালীপ্রসন্ন বাবু নিজেই আচার্য্যের কার্য্য করেন।

আমাদের ময়মনসিংহস্থ ব্রাহ্মবন্ধু শ্রীযুক্ত বাবু শ্রীনাথ চন্দ মহাশয়ের পরলোকগত পুত্র সত্যানন্দের স্মরণার্থ অনুষ্ঠানের নিম্নলিখিত বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে।

১২ই পৌষ মঙ্গলবার প্রত্যূষে দ্বারে দ্বারে উষা কীর্ত্তন তৎপর সমাধি-স্থানে দাঁড়াইয়া প্রার্থনা। পূর্ব্বাহ্ন ৮ ঘটিকার সময় সমবেত উপাসনা। মধ্যাহ্নে সংগীত, গীতা প্রভৃতি গ্রন্থ পাঠ, ব্যাখ্যা এবং মৃত্যু ও পরলোক বিষয়ে আলোচনা। ৪টা হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত সমাধি স্থলে ধ্যান, প্রার্থনা ও সংকীর্ত্তন, রাত্রিতে সম্মিলিত উপাসনা। ১৩ই পৌষ প্রাতে সংকীর্ত্তন ও উপাসনা। মধ্যাহ্নে ব্রাহ্মবালকবালিকা সেবা। সত্যানন্দ যে সকল বস্তু ভাল বাসিত, তাহার পিতা মাতা সেই সকল বস্তু স্বহস্তে প্রস্তুত করিয়া অতি যত্নে বালকবালিকাদিগকে ভোজন করাইয়াছিলেন। অপরাহ্নে ১৪০ জন দীন দুঃখী বালকবালিকাদিগকে নূতন কাপড় ও কমলালেবু প্রভৃতি খাদ্য দ্রব্য বিতরণ করা হয়। অন্যান্য প্রকারের শতাধিক দরিদ্রকে চাউল ও পয়সা দেওয়া হয়। সন্ধ্যাকালে সংকীর্ত্তন ও উপাসনা হইয়া কার্য্য শেষ হয়। স্থানীয় উভয় সমাজের ব্রাহ্মগণই আগ্রহের সহিত এই অনুষ্ঠানে যোগ দিয়া ছিলেন। শিশু রস্মৃতি স্থায়ী করিবার জন্য, তাহার সমাধি স্থান প্রস্তরনির্ম্মিত হইতেছে; তথায় একটী ইষ্টকময় সাধন কুটীরও নির্ম্মিত হইতেছে। সত্যানন্দের নামে একটী স্থায়ী তহবিল স্থাপন করিবার জন্য শীঘ্রই কিছু টাকা কোন ও হিতকর কার্য্যে অর্পিত হইবে।

জাতকর্ম্ম—গত ২৫শে অগ্রহায়ণ মাণিকদহ নিবাসী সতীশচন্দ্র ঘোষের ষষ্ঠ সন্তানের (চতুর্থ কন্যার) জাতকর্ম্ম উপলক্ষে বিশেষ উপাসনা হইয়াছে। এতদুপলক্ষে কন্যার মাতা সাঃ ব্রাঃ সমাজের দাতব্য বিভাগে ॥০ আনা দান করিয়াছেন।

বিবাহ—বিলাতের ব্রাহ্মবন্ধু শ্রীযুক্ত ভয়সী সাহেবের তৃতীয়া কন্যার সহিত হায়দরাবাদের শ্রীযুক্ত মতিরাম সখীরাম এডভানির শুভবিবাহ করাচি সহরে সম্পাদিত হইয়াছে, পাত্র বারিষ্টারের কাজ করেন। নববিধান-প্রচারক শ্রীযুক্ত বাবু অমৃতলাল বসু আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছেন। ইংলণ্ডীয় মহিলার সহিত ভারতবাসীর বিবাহ ব্রাহ্মসমাজে এই প্রথম।

দানপ্রাপ্তি—ডুমরাওণের বাবু ব্রজেন্দ্রকুমার বসুর চতুর্থ পুত্রের নামকরণ উপলক্ষে সাঃ ব্রাঃ সমাজে ৩৲ টাকা এবং সাধনাশ্রমে ১৲ টাকা এবং সিরাজগঞ্জের বাবু ভগবানচন্দ্র গুহের প্রথম পুত্রের নামকরণ উপলক্ষে সাঃ ব্রাঃ সমাজে ১৲ টাকা ও সাধনাশ্রমে ১৲ টাকা দান করিয়াছেন।

ব্রাহ্মবালক ছাত্রাবাসে ময়ুরভঞ্জের মহারাজা এক-

কালীন ১০০৲ এক শত টাকা দান করিয়াছেন। আমরা এই দানের জন্ত মহারাজাকে বিশেষ ধন্তবাদ প্রদান করিতেছি।

প্রেরিত পত্র।

(পত্র প্রেরকদিগের মতামতের জন্ত সম্পাদক দায়ী নহেন, কিম্বা কাহারও পত্র ফেরত দিতে বাধ্য নহেন)

মান্তবর
শ্রীযুক্ত তত্ত্বকৌমুদী সম্পাদক
মহাশয় সমীপেষু।

মহাশয়,

আপনার ১৬ই অগ্রহায়ণ ও ১৬ই পৌষের তত্ত্বকৌমুদীতে বাবু মনোরঞ্জন গুহ মহাশয়ের দুই খানি পত্র প্রকাশিত হইয়াছে। অভ্রান্ত গুরুবাদ যে ব্রাহ্মধর্ম্মের মত বিরুদ্ধ নহে, উভয় পত্রেই তিনি ইহা প্রতিপন্ন করিবার যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছেন। প্রথম পত্রের সূচনাতেই তিনি বলিয়াছেন "অবিচারিত ভাবে অনেকগুলি মত ব্রাহ্মসমাজে প্রবিষ্ট হইয়া ব্রাহ্মদিগের হৃদয়ের উপরে বিশেষ আধিপত্য বিস্তার করিয়াছেন। ব্রাহ্মেরা অবিচারিত ভাবে কোন মত গ্রহণ করিয়াছেন কি না তাহার বিচারে প্রবৃত্ত না হইয়াও একথা অনায়াসে স্বীকার করা যাইতে পারে যে, তাঁহারা গুহ মহাশয়ের বিচার প্রণালী কখনও অবলম্বন করেন নাই, এবং সেইরূপ বিচার করিয়া কোন মত গ্রহণ বা পরিত্যাগও করেন নাই। সুতরাং ব্রাহ্মসমাজ যে অবিচারিত ভাবে কতকগুলি মত গ্রহণ করিয়াছেন একথা বলিবার গুহ মহাশয়ের সম্পূর্ণ অধিকার আছে। গুহ মহাশয়ের বিচার প্রণালী কেবল অভিনব নহে, অদ্ভুতও বটে। কিন্তু গুহ মহাশয় বলিবেন, তোমরা যাহাই মনে কর না কেন, তাহাতে আমার কিছু আসে যায় না, আমি ব্রাহ্মধর্ম্মের এই মূলমন্ত্র অভ্রান্ত গুরুবাদ তোমাদিগকে বুঝাইতে প্রয়াস নাই, "চিন্তাশীল ও সাধনশীল ব্রাহ্ম অভিভাবকগণকে আমি ইহা বুঝাইতে অভিলাষী। তাঁহারাও পূর্ব্বেই ব্রাহ্মধর্ম্মের আর এক মূলমন্ত্র পুনর্জ্জন্মবাদের অভ্রান্ততা স্বীকার করিয়াছেন। যদি তাঁহাদিগের নিকট জয়ী হইতে পারি, তোমরা মেষপালের ন্যায় রাখালের অনুসরণ করিবে। গুহ মহাশয় স্পষ্ট ভাবে এতগুলি কথা বলেন নাই, কিন্তু প্রকারান্তরে বলিয়াছেন। গুহ মহাশয় যে মতের পোষক তাহাতে অনুযাত্রীদিগকে উপেক্ষা করিয়া কেবল নেতৃবর্গের প্রতি লক্ষ্য রাখা তাহার পক্ষে স্বাভাবিক। কিন্তু আমরা অনুযাত্রী দল নিজেদের স্বার্থ লইয়াই অধিক ব্যস্ত। আমাদিগের কিসে কল্যাণ বা অকল্যাণ হইবে অগ্রে তাহাই দেখিতে চাই। গুহ মহাশয় কিম্বা অপর চিন্তাশীল ও সাধনশীল ব্রাহ্ম অভিভাবকদিগের বিবেচনার জন্ত আমি কোন কথা বলিতেছি না। আমাদিগের নিজের—অনুযাত্রী দলের বিবেচনার জন্ত আমি দুই চারিটী কথা বলিতে সাহসী হইয়াছি গুহ মহাশয় প্রতিপন্ন করিয়াছেন, ঈশ্বরের বাণী অভ্রান্ত, সেই বাণী যিনি শুনিয়া অভ্রান্ত উপদেশ প্রদান করেন তিনিই ত অভ্রান্ত গুরু। গুহ মহাশয়ের এই অভ্রান্ত যুক্তি প্রণালী অবলম্বন করিয়া আমিও আর একটী অভ্রান্ত সত্য ব্রাহ্ম ভ্রাতাদিগের নিকট উপস্থিত করিতে সাহসী হইয়াছি, যথা:—

(১) জল তরল পদার্থ।
(২) জল ঘটে অবস্থিতি করে।
(৩) ঘট জলের আধার,

সুতরাং ঘটও তরল পদার্থ। গুহ মহাশয়ের যুক্তি তত্ত্বের সহিত আমার যুক্তি তত্ত্বের সম ধর্ম্মত্ব কোথায়? যাঁহারা জিজ্ঞাসা করিবেন তাহাদিগের অবগতির জন্ত কথাটা একটু পরিষ্কার করিয়া বলা আবশ্যক। ঈশ্বরের বাণী অভ্রান্ত, সেই অভ্রান্ত বাণীর কোনও একটী কোন ব্যক্তি বিশেষের মধ্য দিয়া প্রকাশিত হইলে সেই ব্যক্তি সেই অভ্রান্ত বাণীর আধার মাত্র হইল। কোনও অভ্রান্ত বাণীর আধার যদি অভ্রান্ত হয়, তবে জলের আধার যে ঘট সেও তরল পদার্থ বলিয়া গণ্য হইবে না কেন? এই যুক্তি প্রণালী আর একটু প্রসারণ করিলে ইহাও প্রতিপন্ন হইবে যে আমার তিন বৎসর বয়সের বালকও অভ্রান্ত। সে বলে মানুষের দুই পা, দুই হাত, দুই কাণ, দুই চোখ, এক নাক। ইহা যে অভ্রান্ত। সত্য তাহার সন্দেহ নাই। এই অভ্রান্ত সত্য যে বলে সেই ত অভ্রান্ত পুরুষ। গুহ মহাশয়ের সিদ্ধান্ত অনুসারে মনুষ্য, মাত্রেই অভ্রান্ত। কেন না জগতে এমন মানুষ বোধ হয় নাই, যে কোন না কোনও অভ্রান্ত সত্য জ্ঞাত নহে।

এস্থলে গুহ মহাশয় অবশ্যই বলিতে পারেন, একটী কি দুইটী অভ্রান্ত সত্য জ্ঞাত থাকিলে বা কাহারও মধ্য দিয়া প্রকাশিত হইলেই কেহ অভ্রান্ত গুরু হয় না। কিন্তু ঈশ্বরের কয়টী অভ্রান্ত বাণী শুনিয়া কয়টী অভ্রান্ত উপদেশ দিলে, মানুষ অভ্রান্ত গুরু হইতে পারেন, গুহ মহাশয় তাহা উল্লেখ করেন নাই। এইরূপ কোন নির্দ্দেশ না থাকায় লোকের মনে দুইটী সিদ্ধান্ত উপস্থিত হইতে পারে। প্রথম সিদ্ধান্ত এই যে, ঈশ্বরের কোন অভ্রান্ত বাণী শুনিয়া যিনি তাহা প্রকাশ করেন, তিনিই অভ্রান্ত গুরু। এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলে অভ্রান্ত গুরু অসংখ্য হইয়া দাঁড়ায়। দ্বিতীয় সিদ্ধান্ত এই যে, ঈশ্বরের একটী কিম্বা দশটী অভ্রান্ত বাণী শুনিলেই কেহ অভ্রান্ত গুরু হইতে পারেন না, ঈশ্বরের সমস্ত বাণী যিনি শুনিতে পান এবং তাহা শুনিয়া অভ্রান্ত উপদেশ দেন, তিনিই অভ্রান্ত গুরু। শেষোক্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হইলেও ইহা স্বীকার করা আবশ্যক যে, হয় ঈশ্বরের বাণীর নির্দ্দিষ্ট সংখ্যা আছে, নতুবা অসংখ্য ঈশ্বর বাণী শুনিবার পক্ষে শ্রোতার অসীম শক্তি বিদ্যমান রহিয়াছে। ঈশ্বর যখন যাহা বলিবেন অভ্রান্ত গুরু তখনই তাহা শুনিতে পাইবেন। একদিকে ঈশ্বরের শক্তি সীমা বিশিষ্ট করা, কিম্বা অপরদিকে কোন মনুষ্যের শক্তি অসীম করা ব্যতীত শেষোক্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া অসম্ভব। গুহ

মহাশয় ইহার কোন্ পক্ষ অবলম্বন করিয়া চলিতে চাহেন, জানিতে পারিলে উপকৃত হইব। আর যদি আমাদিগের ক্ষুদ্র চিন্তাশক্তির অতিরিক্ত মহাজনদিগের গন্তব্য অন্য কোনও প্রশস্ত পথ থাকে সুধাত্রীবর্গ তাহাও জানিবার অনভিলাষী নহেন।

গুহ মহাশয় বলিয়াছেন, ভ্রান্তি ও অজ্ঞতা একার্থ বোধক নহে, আমিও তাহা বলিতেছি না। কিন্তু ভ্রান্তি ও অজ্ঞতা অনেক স্থলে পরস্পরের সহচর। অজ্ঞতা স্থলেও যেখানে জ্ঞানের অভিমান করা যায়, সেখানেই ভ্রান্তি বিদ্যমান। পৃথিবীর কেন্দ্রস্থলে কিরূপ উত্তাপ তাহা আমি জানি না, ইহা আমার অজ্ঞতা বটে কিন্তু ভ্রান্তি নহে। এই অজ্ঞতা তখনই ভ্রান্তিতে পরিবর্ত্তিত হইবে, যদি আমি বলি যে, "কেন্দ্রস্থলে কিরূপ উত্তাপ আছে, তাহা ঠিক না জানিয়াও একথা অনায়াসে বলিতে পারা যায় যে, তথাকার উত্তাপ মানুষের পক্ষে সহ্য করা অসম্ভব।" তথাকার উত্তাপ কিরূপ না জানিয়া উহা মানুষের সহন শক্তির সীমাধীন কিনা তাহা কিরূপে নির্দ্দেশ করিব? ঈশ্বরবাণী বলিয়া জগতে যে সকল কথা প্রচারিত হইয়াছে, তাহা প্রকৃত ঈশ্বরবাণী কিনা এবং এপর্য্যন্ত কেহ ঈশ্বরবাণী শুনিতে পাইয়াছেন কি না তাহা অগ্রে বিবেচনা না করিয়া অভ্রান্ত গুরু কিরূপে স্বীকার করা যাইতে পারে, তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। গুহ মহাশয় বলেন "ঈশ্বরবাণী কখনই ভ্রান্ত হইতে পারে না," একথায় কাহারও কোন সংশয় নাই। কিন্তু ইহার দ্বারা অভ্রান্ত গুরুবাদ প্রতিপাদিত হইল কিরূপে? মেঘ হইতে নির্ম্মল জলধারা নির্গত হয়, ইহা সকলেই স্বীকার করেন, কিন্তু সেই জলধারা পুষ্করিণীতে পতিত হইলে তাহার বিশুদ্ধতা বিনষ্ট হইল একথা যদি কেহ বলেন, তাহা হইলে তিনি মেঘের জলের বিশুদ্ধতা অস্বীকার করিলেন, ইহাই কি প্রতিপন্ন হইল। বিশুদ্ধ জল অবিশুদ্ধ পুষ্করিণীতে পতিত হইলে তাহার বিশুদ্ধতা বিনষ্ট হইতে পারে গুহ মহাশয় নিজেও বোধ হয় তাহা অস্বীকার করিবেন না। পুষ্করিণীতে পতিত জল বিশুদ্ধ কিনা তাহা বিচার করিতে হইলে পুষ্করিণীর বিশুদ্ধ বা অবিশুদ্ধ অবস্থার অনুসন্ধান করা আবশ্যক। মেঘের জল বিশুদ্ধ কিনা এস্থলে সে বিচার নিষ্প্রয়োজন। মেঘের জল বিশুদ্ধ হইলে পুষ্করিণীর জলও যে বিশুদ্ধ হইবে তাহা অনুমান করা সুসঙ্গত নহে। ঈশ্বর অভ্রান্ত, ঈশ্বরের বাণীও অভ্রান্ত ইহা সম্পূর্ণ সত্য। কিন্তু মানুষ অভ্রান্ত নহে, মানুষের যেমন অজ্ঞানতা ও অপূর্ণতা আছে, তেমন ভ্রান্তি প্রমাদও আছে। নির্ম্মলতা যদি পুষ্করিণীর স্বভাবিক ধর্ম্ম হইত, তাহা হইলে পুষ্করিণীতে পতিত মেঘের জল বিশুদ্ধ কি না, এ প্রশ্ন উপস্থিত হইত না। কেন না তাহা হইলে উভয় জলই বিশুদ্ধ বলিয়া গণ্য হইত। মানুষও যদি অভ্রান্ত হইতেন তবে তিনি ঈশ্বরের অভ্রান্ত বাণী অভ্রান্ত ভাবেই যে শুনিয়াছেন একথায় কাহারও সংশয় হইত না। কিন্তু মানুষের যখন ভ্রান্তি প্রমাদ আছে, তখন তিনি ঈশ্বরের বাণী অভ্রান্ত ভাবে শুনিতে পাইয়াছেন কিনা, এ প্রশ্ন স্বভাবতঃই উপস্থিত হইবে। কিন্তু এ প্রশ্ন কাহারও মনে উপস্থিত হইলে গুহ মহাশয় বলেন, "সমগ্র ব্রাহ্মধর্ম্মকে অস্বীকার করা হয়।" অভ্রান্ত গুরু স্বীকার না করিলে সমগ্র ব্রাহ্মধর্ম্মকে অস্বীকার করা হয়, ইহা বিশেষ সাহসিকতার কথা বটে। অভ্রান্ত ঈশ্বর স্বীকার করিতে হইলে অভ্রান্ত গুরুও স্বীকার করিতে হইবে, না করিলে অজ্ঞেয়তা বাদী বলিয়া গণ্য হইতে হইবে, ইহা গুহ মহাশয়ের "অধিকতর উদারতার" লক্ষণ, গোঁড়ামীর চিহ্ন নহে। এস্থলে গুহ মহাশয়কে বলা উচিত, চিকিৎসক অগ্রে আত্ম রোগের প্রতিবিধান করুন। গুহ মহাশয় কি ইহাই বলিতে চাহেন, ঈশ্বরকে অভ্রান্ত বলিয়া স্বীকার করা যেরূপ সহজ, গুরুকে অভ্রান্ত স্বীকার করাও সেইরূপ সহজ? কিন্তু আমাদিগের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে তাহা বুঝিতে পারিতেছে না। কেন না আমরা জানি ঈশ্বর পূর্ণ সর্ব্বশক্তিমান ও সর্ব্বদর্শী; যিনি পূর্ণ ও সর্ব্বদর্শী তাহার পক্ষে ভ্রান্তি অসম্ভব। সুতরাং ঈশ্বরকে অভ্রান্ত বলিয়া স্বীকার করা যেমন সহজ, কোন মানুষকে অভ্রান্ত বলিয়া স্বীকার করা তেমনই কঠিন। কেননা গুরুই হউন, আর অন্য মানুষই হউন, তিনি অপূর্ণ ও অদূরদর্শী, সুতরাং প্রতিপদে তাঁহার ভ্রান্তি ঘটিবার সম্ভাবনা। ভ্রান্তির এমন সম্ভাবনা সত্বেও কোন ব্যক্তিকে অভ্রান্ত গুরু বলিয়া স্বীকার করিতে হইলে কোন্ কোন্ লক্ষণ দ্বারা তাঁহাকে চিনিয়া লইতে হইবে। গুহ মহাশয়ের তাহা উল্লেখ করা উচিত ছিল; কিন্তু তিনি তাহার উল্লেখ করেন নাই। অথচ যাঁহারা তাঁহার স্বীকার্য্য পথ স্বীকার করিতে প্রস্তুত হন নাই, তিনি তাঁহাদিগকে অসঙ্কুচিত চিত্তে অজ্ঞেয়বাদী ও অব্রাহ্ম বলিতেছেন। ইহাই কি উচ্চ সাধনার ও চিন্তাশীলতার লক্ষণ? তিনি তিনটী স্বীকার্য্যের উপর আর যে তিনটী সম্ভাবিত স্বীকার্য্য যোজনা করিয়াছেন, তাহা স্বীকার্য্য বলিয়াই গণ্য হইতে পারে না। জগতে অনেক বস্তু অসম্ভব না হইতে পারে, কিন্তু অসম্ভব না হইলেই যে উহা সম্ভব হইল ইহা স্বীকার্য্য বা স্বতঃসিদ্ধ নহে। সকলেই জানেন, "যে যে বস্তু কোন এক বস্তুর সমান তাহারা পরস্পর সমান," ইহা জ্যামিতি শাস্ত্রের একটী স্বতঃসিদ্ধ। কিন্তু এই স্বতঃসিদ্ধের উপর নির্ভর করিয়া যদি কেহ আমাকে বলে যে, রাম যখন আমার বন্ধু এবং সে যদুরও বন্ধু তখন যদু ও আমি পরস্পর বন্ধু, তাহা হইলে কি আমাকে স্বীকার করিতে হইবে যে, যদু প্রকৃতই আমার বন্ধু। যদুর সঙ্গে আমার পরিচয় না থাকিতে পারে, যদুর যে গুণে কিম্বা দোষে রাম তাহার বন্ধু হইয়াছে, আমি তাহার পক্ষপাতী না হইতে পারি; রামের অপর গুণ বা দোষ আমার হৃদয় আকর্ষণ করিয়াছে, যদুর পক্ষে আমার বন্ধু হওয়া অসম্ভব নহে, কিন্তু তাহা বলিয়াই উহা ধ্রুব নিশ্চিত সত্য নহে। আকৃতি সম্বন্ধে যাহা স্বতঃসিদ্ধ, প্রকৃতি সম্বন্ধেও তাহাই স্বতঃসিদ্ধ বলিয়া গণ্য হইবে তাহা বলা যায় না। ঈশ্বরের বাণী মানবাত্মায় প্রকাশ পায়, একথা বলিলেই কোন মানুষ অভ্রান্ত গুরু হইল না। ঈশ্বর পূর্ণ অভ্রান্ত, অপূর্ণ মানুষের পক্ষে পূর্ণ অভ্রান্ত হওয়া অসম্ভব। কোন মানুষ এক বিষয়ে অভ্রান্ত হইলেই তিনি অভ্রান্ত গুরু হইলেন না, কেন না তাহা হইলে প্রত্যেক মানুষই অভ্রান্ত গুরু একথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। গুহ মহাশয়ের অভ্রান্ত গুরু সেরূপ কখনই নহে। পূর্ণ অভ্রান্ত গুরু না হইলে তাঁহার

কথার প্রকৃত সিদ্ধান্ত হয় না। কিন্তু পূর্ণ অভ্রান্ত গুরু অসম্ভব। অপূর্ণ অভ্রান্ত গুরু পদার্থটা কি তাহা বুঝিতে পারিলাম না। গুরুর ভ্রান্তি সম্ভাবনা মনে করিলেই তাঁহার কথা অবিচারিত ভাবে গ্রহণ করা অসম্ভব হইয়া দাঁড়ায়। জগতে শারীরিক দাসত্বের যে ভাবে সৃষ্টি হইয়াছিল, অভ্রান্ত গুরুবাদে ব্রাহ্মসমাজে আধ্যাত্মিক, মানসিক ও নৈতিক দাসত্ব সেই ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইবে। গুরুপদাকাঙ্ক্ষীদিগের ইহাতে লাভ থাকিতে পারে, কিন্তু আমাদিগের ন্যায় অনুযাত্রীবর্গের' ইহাতে ঘোরতর সর্ব্বনাশ হইবে।

নিবেদক
শ্রীদ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়।
৩রা জানুয়ারি ১৮৯৪।

শ্রীযুক্ত তত্ত্বকৌমুদী সম্পাদক মহাশয়
শ্রদ্ধাস্পদেষু।

সকলের নিকট হইতেই উপদেশ গ্রহণ করিতে ব্রাহ্ম যেমন বিনীতভাবে প্রস্তুত, অন্য কোন ধর্ম্মাবলম্বীই তেমন নহেন। সুতরাং মনে যেন থাকে যে উপদেষ্টা লইয়া কোন তর্ক হইতেছে না, সেই উপদেষ্টা "অভ্রান্ত" হইতে পারেন কি না সেই বিষয়েই সন্দেহ। যাঁহার কদাচ ভ্রম হইতে পারে না—যাঁহার কথার উপর বিবেকের বিচার চলিবে না—"অভ্রান্ত গুরু" ইত্যাকার। ভিতরে সত্য থাকিলেই যদি অভ্রান্ত হয়, তবে ত সকলেই অভ্রান্ত গুরু; কারণ এমন লোক নাই যাহার ভিতরে কিছুমাত্র সত্য নাই—আগাগোড়াই ভ্রান্তি।

১। মনোরঞ্জন বাবুর দ্বিতীয় পত্রে সাতটী ধারা। প্রথম ধারায় তাঁহার সেই পুরাতন কথারই পুনরুক্তি করিয়াছেন। তাহা যে ভ্রান্তিমূলক, তাহা প্রমাণিত হইয়াছে।

২। দ্বিতীয় ধারায় ভল্লুক-পালিত কন্যার দৃষ্টান্ত। মানুষকে ছাড়িয়া ভল্লুকের অনুসরণ করাতে তাহার ঐ দশা হইয়াছিল। সেই জগৎ-গুরুর উপদেশ উপেক্ষা করিয়া মানুষের উপদেশ অভ্রান্ত মনে করিয়া চলিলে না জানি কি দশা হয়! কারণ তাঁহার তুলনায় মানুষ ভল্লুক হইতে ও অধম।

৩। তৃতীয় ধারায় "অজ্ঞ-ভ্রান্ত ও অপূর্ণ" কথাগুলি লইয়া বিরাট বিচার। কেহ কেহ নাকি 'অজ্ঞ' ও 'ভ্রান্ত' এবং 'ভ্রান্ত' ও 'অপূর্ণ' একই কথা মনে করেন! এই অজ্ঞাত অভিযুক্তকে ধরাশায়ী করিয়া তৎপর ব্যাখ্যা—"যে অবগত নহে তাহাকে অজ্ঞ ও অপূর্ণ (!) বলে। আর যে ভুল করিয়াছে তাহাকেই ভ্রান্ত বলে।" সাক্ষী দুইজন গ্রন্থ! বাস্তবিক দেখিলাম তাহারা কিছুই অবগত নহে আর কোন ভুলও করে নাই। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, অচেতন পদার্থ মাত্রেরই এই গুণ দেখিলাম—কিছুই অবগত নহে। আর কোন ভুলও করে নাই। তখন বুঝিলাম যে, কাষ্ঠ লোষ্ট্রের যে "অভ্রান্তি" প্রস্তাবিত "অভ্রান্ত গুরুর" ও সেইরূপ অসম্ভব অভ্রান্তি। বাস্তবিক বিচার শক্তি যাহার আছে, ভ্রমাভ্রম তাহারই সম্ভবে। গ্রন্থের পক্ষে কিছু অবগত হওয়া অথবা ভুল করা সম্ভবে না। "অভ্রান্ত গুরুদের কি মনুষ্যত্ব লোপ পায়?" এই কথার উত্তরে আমাদিগের নরত্ব গুরুত্ব বিবেক সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করিয়া প্রশ্ন হইয়াছে—"জগদীশ পণ্ডিত অভ্রান্ত দার্শনিক এবং জগদীশ পণ্ডিত অভ্রান্ত মানুষ এই উভয় বাক্যে কি কিছু পার্থক্য নাই?" দুঃখের বিষয়, এহেন প্রশ্নের পরও আমাদের সন্দেহ যাইতেছে না। কারণ, আমাদের বোধ হয় যে অভ্রান্ত দার্শনিক জগদীশ পণ্ডিতের শ্রোত্রাকর্ষণ করিলে মানুষ জগদীশবাবু কোন কালেই আপত্তি করিতে ছাড়িবে না। সুতরাং তখন তাহার মনুষ্যত্ব লোপ পাইয়াছে, কি করিয়া মনে করি।

৪। কোন্ ব্যক্তিতে কতখানি ভ্রান্তি আছে, জানিতে হইলে তাহার জ্ঞানের পরিমাণটা আমার আগাগোড়া জানা চাহি, আর সেই জ্ঞানের বিষয়গুলির সম্বন্ধেও সম্যক জ্ঞান চাহি। যতটুকু না জানি, তাহাতে ভ্রান্তি আছে কি না, জানিতে পারি না। ভগবানের কথা দূরে থাকুক, কোন মানুষের জ্ঞানের পরিমাণও যাথার্থ্য সম্যক্ নিরূপণ করিবার শক্তিই মানুষের নাই। যদি থাকিত, তবে সে নিজেই অভ্রান্ত হইত।

৫। ঈশ্বরের বাণী মানুষের ভিতর দিয়া খাঁটিরূপে আসিতে পারেই না, আমি এরূপ কথা বলি নাই। আমি বলিয়াছি যে, এমন কোন মানুষ থাকা অসম্ভব এবং অযৌক্তিক যে, সেই বাণী শুনিতে এবং তদ্বিষয়ক উপদেশ দিতে তাহার "কদাচ ভুল হইতে পারে না।" বাস্তবিক আমাদের যে ভুল হইবার উপযুক্ত অপূর্ণতা রহিয়াছে, এ অতি সত্য কথা। এখন যাহাকে সত্য বলিয়া মনে করি, জ্ঞানোন্নতি সহকারে তাহাতে ভ্রম লক্ষিত হইতে পারে। এই সহজ কথাটায় ওরূপ ত্রাহি ডাক ডাকিবার কোন কারণ দেখি না। "সত্যই যখন আমাদিগের শাস্ত্র, তখন এতকাল যাহা বিশ্বাস করিয়া আসিয়াছি, সত্যটা পাছে বা তাহার বিরুদ্ধ হয়, এরূপ ত্রাস ব্রাহ্মের মনে উপস্থিত হওয়া কদাচ সঙ্গত নহে।" (মনোরঞ্জন বাবুর প্রথম পত্রের ভূমিকায় দেখুন)। জড়শক্তি কিম্বা আমার অপূর্ণতা ঈশ্বরের আদেশকে খাঁটিরূপে আমার নিকট উপস্থিত হইতে বাধা দিতে সক্ষম হইলে, অবশ্য ঈশ্বরকে শক্তিহীন মানিতে হয়। সুতরাং আমার জন্য যদি কোন আদেশ থাকে তবে নিশ্চয়ই তাহা আমার নিকট পৌঁছিবে; তখন তদনুসারে কার্য্য করিব। যতক্ষণ না পৌঁছাইতেছে ততক্ষণ নিশ্চয় বুঝিব যে, আমার জন্য কোন আদেশ নাই। সে অবস্থায় যদি বিবেক-প্রণোদিত হইয়া কাহারও উপদেশ গ্রহণ করি তবে পাপ হইবে, কারণ তাহা ঈশ্বরের আদেশ নহে। সুতরাং গুরু গ্রহণ করা অধর্ম্ম। বিবেকবাণীকে আদেশ না ভাবিলে এইরূপ সব সন্দেহ উপস্থিত হয়।

৬। "ঈশ্বরের সহিত সাক্ষাৎ যোগের বাসনায়ই মানুষ গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করে, সুতরাং গুরু ব্রহ্ম আবরক নহেন।" এরূপ যুক্তি গ্রাহ্য হইলে অতি সহজেই অভ্রান্ত গুরুর সদ্গতি হয়। ঈশ্বরের সহিত সাক্ষাৎ যোগের অন্তরায় মনে করিয়াই আমরা অভ্রান্ত গুরুকে বর্জ্জন করি। সুতরাং তিনি বর্জ্জনীয়।

৭। "সাধন পন্থাকে অভ্রান্ত না মানিলে কখনই সাধন নিষ্ঠা দাঁড়ায় না।" একটা অভ্রান্ত সাধন প্রণালী যদি পাই, তবে ত বাঁচিয়া যাই। অবলম্বিত সাধন প্রণালীতে যদি ভ্রম থাকে, তবে তাহাকে অভ্রান্ত ভাবিয়া লইয়া সাধকের প্রভূত অকল্যাণ বই আর কোন ফল হইবে না। বাস্তবিক "এইরূপ বিচার বিহীন সিদ্ধান্ত যে সমাজে যে পরিমাণে প্রতিষ্ঠিত হয়, সেই সমাজ সেই পরিমাণে অন্তঃসার শূন্য হইয়া পড়ে, গোঁড়ামিই কেবল সেখানে সমাজস্থিতির কর্ত্তা হইয়া দাঁড়ায়।" (মনোরঞ্জন বাবুর প্রথম পত্রের ভূমিকায় দেখুন)

উপসংহারে দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে যে, অভ্রান্ত গুরুবিরোধীদিগের উপর "অভ্রান্ত অহং" বাদ আরোপ করাতে সত্যের অপলাপ হইয়াছে। ইতি।

বিনয়াবনত
শ্রীউপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী।

২১১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট ব্রাহ্ম মিশন যন্ত্রে শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দত্ত কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও ৫ই মাঘ প্রকাশিত।

ধর্ম্ম ও সমাজতত্ত্ব বিষয়ক পাক্ষিক পত্রিকা

২০শ সংখ্যা।
১৬শ ভাগ।

১৬ই মাঘ, রবিবার, ১৮১৫ শক, ব্রাহ্ম সম্বৎ ৬৫।

বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২৷৷০
মফস্বলে ৩
প্রতি খণ্ডের মূল্য ৵০

প্রার্থনা।

হে করুণাসিন্ধু! নববর্ষের কার্য্যক্ষেত্রে অবতরণ করিবার সময়ে আমরা তোমার চরণে পতিত হইতেছি। আমাদের দুর্ব্বলতা তোমার অবিদিত নাই। আপনাদের মলিন জীবন দ্বারা তোমার সত্যধর্ম্মকে কিরূপ মলিন করিয়া ফেলিতেছি, তাহা স্মরণ করিয়া লজ্জাভারে অবসন্ন হইয়া পড়িতেছি। কিন্তু প্রভো সরল ভাবে যে প্রার্থনা করে, অকপটে যে সংগ্রাম করে, তোমার কৃপা চিরদিনই তাহার সহায়। সেই কৃপা দ্বারা আমাদের সহায় হও, আমাদের দুর্ব্বলতাকে সবলতাতে পরিণত কর। তোমার সত্যধর্ম্ম সর্ব্বত্র বিস্তৃত হউক; তোমার সত্যরাজ্য সর্ব্বত্র প্রতিষ্ঠিত হউক। তোমার চরণে এই প্রার্থনা!

পাঠকগণের প্রতি নিবেদন—কয়েক বারের তত্ত্ব-কৌমুদী প্রকাশ করিতে বিলম্ব হইল। পাঠকগণ এই ত্রুটী মার্জ্জনা করিবেন। মাঘোৎসবের কার্য্যে ইহার পরিচায়কগণ ব্যস্ত থাকিতে হয়। এই নিমিত্ত প্রতি বৎসরই উৎসবের পরের কয়েক সংখ্যা বিলম্বে প্রকাশিত হইয়া থাকে। আশা করি এই বিলম্ব ত্বরায় শুধরাইয়া লওয়া যাইবে।

চতুঃষষ্টিতম মাঘোৎসব।

যৎকালে ভারতাকাশ অজ্ঞানের অমানিশায় এবং কুসংস্কার ও পাপের ঘনঘটায় সমাচ্ছন্ন, যখন ইহার চতুর্দ্দিকেই অন্ধকার, যখন কেহই এরূপ আশা করেন নাই যে, অচিরাৎ সেই বিষম অন্ধকার ভেদ করিয়া সত্যধর্ম্মের উজ্জ্বল তপন নভোমণ্ডলে উদিত হইবে। তখন যে জাগ্রত পুরুষ আমাদের কল্যাণের জন্য মুক্তিপ্রদ ব্রাহ্মসমাজের অভ্যুদয় করিলেন, সেই সিদ্ধিদাতা পরমেশ্বরের প্রসাদেই ব্রাহ্মসমাজ জীবন-পথে আর এক বৎসর অগ্রসর হইল। এই উপলক্ষে অনুষ্ঠিত চতুষষ্টিতম মাঘোৎসব সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে। ব্রাহ্মগণ সমস্ত বৎসর শোক, দুঃখ, নীরসতা, বিশৃঙ্খলতা প্রভৃতির সহিত সংগ্রাম করতঃ অবসন্নপ্রায় হইয়া সতৃষ্ণ নেত্রে মাঘোৎসবের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। সকলেই আশা করিতেছিলেন, যখন মাঘোৎসব আসিবে এবং সাধু ভক্তগণের একত্র সমাবেশে ও ব্যাকুল প্রার্থনায় ভগবানের কৃপা-স্রোত অবতীর্ণ হইবে, তখন সেই স্রোতে আমরা সকলেই ভাসিয়া যাইব, আমাদের অবসন্ন দেহে উৎসাহের উষ্ণ শোণিত প্রবাহিত হইবে, আবার আমরা নবীন উৎসাহে নববর্ষের কার্য্যপ্রণালী আরম্ভ করিব। এইরূপে সকলেই উৎসুক হৃদয়ে দিন যাপন করিতেছেন; উৎসব-কমিটী উৎসবের আয়োজনে ব্যস্ত আছেন; প্রত্যেক ব্রাহ্ম গৃহসজ্জা, উপহার প্রভৃতির যথাসাধ্য আয়োজন করিতেছেন, এমন সময়ে দেখিতে দেখিতে পৌষ মাস চলিয়া গেল।

মাঘমাসের প্রথম দিন আসিল। ঐ দিনের নবসূর্য্যের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মগণ নূতন উৎসাহ লইয়া জাগ্রত হইলেন। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় এবারেও প্রত্যেক ব্রাহ্ম-গৃহস্থ নিজগৃহে উপাসনার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। ব্রাহ্ম-ছাত্রগণ তরুণ বয়সের তরুণ উদ্যমের সহিত ছাত্রাবাস সকল সুসজ্জিত করিলেন। অনেক পরিবারও ঐ দিন স্ব স্ব গৃহ পুষ্প পত্রাদিতে বিভূষিত করিলেন। অনেক স্থলে ব্রাহ্মধর্ম্মের বিজয় নিশান উড্ডীন হইল। অতি প্রত্যুষ হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত দিন নানাস্থানে উপাসনা চলিতে লাগিল। সমস্ত দিন ব্যাপিয়া এবং কতক রাত্রি পর্য্যন্ত ব্রাহ্মগণ ব্রাহ্মসমাজের কল্যাণের জন্য স্ব স্ব গৃহে প্রার্থনা করিলেন।

২রা মাঘ, ১৪ই জানুয়ারী, রবিবার—প্রাতঃকালে শ্রীযুক্ত বাবু আদিনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সমাজমন্দিরে উপাসনা করেন। অপরাহ্ণ ৩টার সময় বীডন উদ্যানে প্রচারার্থ গমন করা হয়। পূর্ব্ব হইতেই জ্ঞাপন করা হইয়াছিল যে, অপরাহ্নে বীডন উদ্যানে বক্তৃতার পর সংকীর্ত্তন করিতে করিতে মন্দিরে আগমন করা হইবে। সুতরাং সেই সময় মন্দিরে মৃদঙ্গের মধুর ধ্বনি উঠিবামাত্র ব্রাহ্মগণ এবং অন্যান্য অনেক লোক চতুর্দ্দিক হইতে মন্দিরাভিমুখে আগমন করিতে লাগিলেন। পরে সেখান হইতে সকলে নির্দ্দিষ্ট স্থানে গমন করিলেন। সকলে ক্রমে বীডন উদ্যানে আসিয়া মিলিত হইলে প্রার্থনানন্তর বাবু মথুরামোহন গাঙ্গুলি, ভাই প্রকাশ দেব, বাবু বিপিনচন্দ্র পাল প্রভৃতি মহাশয়গণ সময়োচিত ভাষায় এবং ভাবে বক্তৃতা করিলেন। এতদুপলক্ষে খাসিয়া পর্ব্বত হইতে সমাগত একজন খাসিয়া বন্ধু কিছু বলিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত বাবু নীলমণি চক্রবর্ত্তী তাঁহার ভাব ব্যাখ্যা করিয়া দিলেন।

বক্তৃতাদির পর গায়কগণ উৎসাহের সহিত নিম্নলিখিত কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন।

নগরসংকীর্ত্তন।

তাল রূপক।

ব্যাকুল অন্তরে, ব্রহ্মনাম গাও প্রাণ-ভরে।
ব্রহ্মনাম গানে মৃত প্রাণে জীবন সঞ্চারে।
এ নাম সাধুর হৃদয়ের ধন,
পাপীর অবলম্বন,
এ নাম শ্রবণে মহাপাতকী তরে।

তাল লোফা।

কাহার মধুর রব উঠেছে গগনে?
(কিবা মধুর মধুর রে!)
কাহার মধুর বাণী শুনিরে পরাণে?
(তোরা বল বল রে!—হৃদয়-বীণা কে রে বাজায়—)
ভাই রে!
কে—রে এমন করি ভাঙ্গি ঘুমের ঘোর,
(তোরা জানিস কিরে ভাই!—এমন করে কে রে মাতায়—)
মৃদুল মোহন তানে হৃদয় করে ভোর?
(প্রাণ আকুল করে)
ভাই রে!
কোমল পরশে কার শিহরিছে প্রাণ?
(তোরা জানিস কি রে ভাই!—
মরা মানুষ কে—রে বাঁচায়, এমন করে কে—রে নাচায়—)
নীরস মলিন কণ্ঠে (আজ) উঠে কার নাম।

তাল খয়রা।

এস, পশিয়ে পরাণে, মরমের কাণে,
শুনি সে মধুর নাম;
(কিবা মধুর মধুর রে! পরাণ আকুল করে)
ঘুচিবে যাতনা, ভয় ভাবনা,
ঘুচিবে সকল কাম।
(ব্রহ্ম নামের গুণে)
কাম ক্রোধ আদি, যত রিপুগণ,
নাম-গন্ধ যদি পায়;
কাঁপি থর থর, ভয়ে জড় জড়
আপনি দূরে পালায়।
(ব্রহ্ম নামের তেজে—)
মায়া-মোহ জাল, ভবের জঞ্জাল,
ছুঁইলে নামের আগুন,
আঁখির পলকে, হয় ভস্মময়,
এমনি নামের গুণ।
জ্ঞানের গরবে, স্ফীত যার প্রাণ,
সেও যদি নাম পায়;
ত্যজি অভিমান, তৃণের সমান,
(মান আর থাকে না থাকেনা—)
সকলের পায়ে লুটায়।
আপনার প্রেমে, আপনার নামে,
বাঁধা পড়ে দয়াময়।
নরাধম জন, লইলে শরণ
আপনি এসে কোলে লয়।

তাল—খেমটা।

আমরা ব্রহ্মনামে তরে যাব,—
আজ আমরা বেঁচে যাব।
ব্রহ্মনামের বলে সবে নবজীবন পাব,
সে চরণে হৃদয় মন সবাই ঢেলে দিব।
নামামৃত পানে বিষয়-তৃষ্ণা নিবারিব,
তাঁরই কথায়, তাঁরই সেবায় জীবন কাটাইব।
আনন্দরূপ দেখে ভয়-ভাবনা ঘুচাব,
"তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক"—সুখে দুখে গাব।
ব্রহ্ম-প্রেমে বিভোর হয়ে আপনা ভুলিব,
যারে পাব তারেই প্রেম-আলিঙ্গন দিব।
বিশ্বরূপ মাঝে ব্রহ্ম-রূপ নেহারিব,
ব্রহ্ম-শক্তির জয় গাইয়ে ব্রহ্মধামে যাব।

কীর্ত্তনের দল উৎসাহে গান করিতে করিতে ভক্তি-ভাজন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের বাটীতে সমাগত হইলেন। এবং তথায় কিয়ৎক্ষণ কীর্ত্তন করিয়া আদি ব্রাহ্ম-সমাজমন্দিরের নিকট আসিলেন। তথায় মন্দিরের সম্মুখে কতক্ষণ গান করতঃ পুনরায় তথা হইতে সকলে সাধারণ সমাজমন্দিরে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। কিয়ৎক্ষণ কীর্ত্তনের পর উপাসক ও দর্শক সকলে স্ব স্ব স্থান পরিগ্রহ করিলে শ্রীযুক্ত বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় উপাসনা করিলেন।

---

৩ রা মাঘ, ১৫ই জানুয়ারী, সোমবার—আজ উদ্বোধন উদ্বোধন। পূর্ব্ব হইতেই বিজ্ঞাপিত হইয়াছিল যে সায়ংকালে মন্দিরে উদ্বোধন-কার্য্য সম্পাদিত হইবে। সুতরাং সন্ধ্যার পূর্ব্বেই মন্দিরে অনেক লোকের সমাগম হইল। ঠিক ৬½ ঘটিকার সময় উপাসনা আরম্ভ হইল। শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় আচার্য্যের কার্য্য করিলেন। তাঁহার উপদেশের সারমর্ম্ম নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

উৎসবের ভিতর বাড়ী।

"সময়ে সময়ে বড় বড় সহরে মহামেলা হয়, তাহাকে Exhibition অথবা প্রদর্শনী বলে। সেই মেলাতে নানাপ্রকার দেখিবার পদার্থ থাকে। নানা দেশ বিদেশে যে যে উৎকৃষ্ট দ্রব্য পাওয়া যায় একটী স্থান ঘিরে সেইগুলিকে নানা ভাবে সজ্জিত করিয়া রাখে। কিন্তু তাহার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর, সর্ব্বাপেক্ষা দেখিবার উপযুক্ত, যে বিশেষ জিনিস থাকে তাহার জন্য স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত দেখিতে পাওয়া যায়। তাহার জন্য বিশেষ

ভাবে একটী স্থান ঘেরা হয়। সকলে তাহা দেখিতে পায় না। দেখিবার জন্য বিশেষ টিকিট হয়। মেলায় যেদিকে মানুষ যায়, দেখিতে পায় কত সুন্দর জিনিস, কত হাসিবার জিনিস সজ্জিত রহিয়াছে। সে সব দেখে দেখে ঘুরে ঘুরে বেড়ায়, বন্ধু বান্ধবের সহিত কত আমোদ করে। অনেক সময়ে এমন হয় যে পয়সার অভাবে কেহ সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর জিনিসটা না দেখিয়াই ফিরিয়া যায়। আবার এমন লোকও আছে যে মেলায় আসিয়া কেবল বন্ধু বান্ধবের সহিত আমোদ আহ্লাদেই সময় কাটায়। বাহিরের জিনিস দেখিয়াই বাড়ী ফিরিয়া যায়। সেখানে যদি কেহ তাহাকে জিজ্ঞাসা করে, "কি দেখিলে, সেখানে যে এক অপূর্ব্ব সুন্দর জিনিস আছে, তাহা দেখিয়াছ কি ?" সে বলে, "না তাহা ত দেখি নাই।" তখন প্রশ্নকর্ত্তা বলে, "তবে কি দেখিয়াছ ? যাহা দেখিবার জন্য যাওয়া তাই দেখ নাই, তবে, কি দেখিলে ? তবে আর কি হল ?" তাহাকে সকলে এইরূপ লজ্জা দেয়। সে নিজের ত্রুটি বুঝিতে পারিয়া বড়ই লজ্জিত হয়। আমাদের এই মহোৎসবে যাঁহারা প্রবেশ করিতে যাইতেছেন, তাঁহারা জানিবেন, ইহার দুইটী বাড়ী। উৎসবের ভিতর বাড়ী আর বাহির বাড়ী। উৎসবের বাহির বাড়ীতে কত আমোদ হইতেছে, ছেলেরা নাগরদোলায় দুলিতেছে, কত লোক কত জিনিস কিনিতেছে খাইতেছে; নিশান উড়িতেছে, ঘণ্টা বাজিতেছে। এইটা উৎসবের বাহির বাড়ী। কিন্তু একটা ভিতরের বাড়ীও আছে। সে একটা আশ্চর্য্য বাড়ী। সেখানে আজব কারখানা। সেখানে প্রবেশ করিবার টিকিট আছে। সেই জায়গা সকলের শ্রেষ্ঠ জায়গা। তাহাকে কেহ বলে ব্রহ্মপুর, কেহ বলে হিরন্ময় পরমকোষ। ইহা কি ? এখানে কি আছে ? তাহা দেখা যায়, কিন্তু বাহির থেকে বলা যায় না। প্রবেশ না করিলে বুঝিতে পারা যায় না। যাঁহারা প্রবেশ করেন তাঁহাদের আনন্দ আর ধরে না। অপূর্ব্ব সত্য-জ্যোতিতে তাঁহাদের প্রাণ পরিপূর্ণ হয়।

এই স্থানে মহাসভা বসিয়া গিয়াছে। ইহা ইহকাল পরকাল-ব্যাপী সভা। এখানে যাঁহারা রহিয়াছেন, তাঁহাদের অন্ত নাই। ইহা বিশ্বাসী অমরাত্মাদের সভা। এখানে কেবলই বন্দনা উঠিতেছে। অনাহত ভেরীর রব, অনাহত বন্দনা। এখানে যাঁহারা রহিয়াছেন, তাঁহাদের মস্তক দিব্যালোকে উজ্জ্বল। এই অমরাত্মাদের কেহ ইহকালে রহিয়াছেন, কেহ পরকালে গিয়াছেন। এখানকার এক অপূর্ব্ব গন্ধ ! এখানে চারি প্রকার গন্ধ পাওয়া যায়। যেমন বাবুদের বাগানে গেলে বেল, মল্লিকা, গোলাপ, জুঁই প্রভৃতি নানাপ্রকার পুষ্পের গন্ধ পাওয়া যায়, সেইরূপ এই স্থানে চারি প্রকার গন্ধ পাওয়া যায়। প্রেমের গন্ধ, আনন্দের গন্ধ, আশার গন্ধ ও পবিত্রতার গন্ধ। এই রাজ্যে যিনি প্রবেশ করেন, তাঁহার প্রাণ প্রেমে পূর্ণ হয়, প্রাণে আনন্দ ফুটিয়া উঠে, আশা ও পবিত্রতায় প্রাণ পরিপূর্ণ হইয়া যায়। এই রাজ্যে যে যায় সে পূর্ব্বের রকম থাকিতে পারে না। আর এক রকম হইয়া যায়। বাহির বাড়ীতে যে বলিতেছিল, "ও আমার কাছে আসে কেন, দূরে দাঁড়াক—ও আমার কাছে দাঁড়ায় কেন ?" সে যেমন এই ভিতর বাড়ীতে প্রবেশ করে, আর অমনি বলিয়া উঠে, "আয় আয়, নিকটে আয়"। যে বাহির বাড়ীতে কতবার বলিতেছিল, "কিছু হবেনা কিছু হবেনা," সে যেই এইখানে আসিয়াছে যেই সভা হাওয়া তাহার গায়ে লাগিয়াছে, আর অমনি আশা ফুটিয়া উঠিয়াছে। সে অমনি বলিয়া উঠে, "আমি বাঁচিব, আমি বাঁচিব"। বাহির বাড়ীতে যে নিরানন্দে ছিল, প্রাণ যাহার তিক্ত বোধ হইতেছিল, সেই এখানে প্রবেশ করিল, আর অমনি আনন্দের সঞ্চার। এ কি হাওয়া গায়ে লাগিল ! যাহার বাহির বাড়ীতে মনটা একেবারে মলিন হইয়াছিল, ঝড়ে কদলী বৃক্ষের ন্যায় যাহার চরিত্র ছিন্ন ভিন্ন ও আন্দোলিত হইতেছিল, অপবিত্রতার মলিনতাতে যাহার প্রাণটা পূর্ণ ছিল, সে ভিতর বাড়ীতে যেই প্রবেশ করিল, আর ওকি হইল ? চক্ষু কি দেখিল ? সকলি বদলাইয়া গেল। এই উৎসবে যাঁহারা প্রবৃত্ত হইতে যাইতেছেন, কেবল বাহির বাড়ীতে খাওয়া দাওয়ায় ব্যস্ত না থাকিয়া ভিতর বাড়ীতে প্রবেশ করুন। শুধু বাহির বাড়ী হইতে ফিরিয়া ঘরে গেলে, যখন সকলে জিজ্ঞাসা করিবে, "কি দেখিলে," তখন কি উত্তর দিবেন ? অনেকে এইরূপে বাহির বাড়ী হ'তে ফিরিয়া যান বলিয়া প্রাণে আনন্দ, আশা, কিছুই পান না। যিনি নিরাশ রহিয়াছেন, তিনি নিরাশ হইয়া ফিরিয়া যান। যিনি নিরানন্দ রহিয়াছেন, তিনি নিরানন্দই থাকিয়া যান। যিনি অপবিত্র তাঁহারও কিছু হয় না। উৎসবের ভিতর বাড়ীতে প্রবেশ করা হইল না, তাহা হইলে ত কিছুই হইল না। এই ভিতর বাড়ীর দরজা কে খোলেন ? স্বয়ং উৎসবের অধিপতি। তিনি স্বয়ং প্রসন্ন মুখে দ্বার খুলিয়া বলেন, "এস প্রবেশ কর।" আমরা এইখানে দাঁড়াইব। এই যে সেই আসল জায়গা। বলিব, "উৎসবের অধিপতি, দ্বার খোল।" তাঁহাকে যদি না পাওয়া যায় তবে কিছুই ত হইল না। সেই বিমল সন্নিধানে আসিলাম কি না, সেই হাওয়া গায় লাগিল কি না তাই দেখিতে হইবে। যেন প্রতারিত হইয়া ফিরিয়া না যাই। প্রভু এমন কৃপা করুন, ... আমাদের উৎসবের আয়োজন সার্থক হয়। আমরা করযোড়ে তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইয়া যেন প্রার্থনা করিতে পারি

৪ঠা মাঘ, ১৬ই জানুয়ারী, মঙ্গলবার—আজ উষাকালে মন্দিরে প্রথমতঃ সংকীর্ত্তন হইল সংকীর্ত্তনের পর শ্রীযুক্ত বাবু মহেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় উপাসনা করিলেন। তাঁহার উপদেশের সারমর্ম্ম এই :—

"দীনাত্মা লোকেরা ধন্য, কারণ স্বর্গ রাজ্যে তাঁহাদের অধিকার। ধর্ম্ম প্রযুক্ত তাড়িত লোকেরা ধন্য কারণ স্বর্গ রাজ্যে তাহাদের অধিকার।—কেবল যে খ্রীষ্ট এই উপদেশ দিয়াছেন তাহা নহে। দেশে বিদেশে সকল সাধু এক বাক্যে বলিয়াছেন যে, আপনাকে বিনয়ী ও দীন ভাবাপন্ন না করিতে পারিলে ধর্ম্ম রাজ্যে কেহই অধিকার পায় না। ভক্ত চৈতন্য মহা উৎপীড়ন বিনয়ের সহিত সহ্য করিয়া ধর্ম্মের জয় করিয়া-ছিলেন। আমরা ও সময়ে সময়ে এ পাপ জীবনেও দেখিয়াছি যেখানে দীন ভাবে ধর্ম্মের জন্য যাহা কিছু সহ্য করিয়াছি সেই খানেই ব্রাহ্মধর্ম্ম জয় লাভ করিয়াছেন। এক সময়

যেখানে লোকে প্রহার করিয়াছে আবার ইহাও দেখিলাম যে সেই লোকেরা আবার আগ্রহ সহকারে ব্রাহ্মধর্ম্মের কথা শুনিয়াছে ও ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে, আমার বিশ্বাস এই যে যদি আমরা বিনয় ও দীনতার সহিত ধর্ম্মের জন্য লোকের উৎপীড়ন সহ্য করিয়া ধর্ম্ম প্রচার করিতে পারি তাহা হইলে ব্রাহ্মধর্ম্ম স্বদেশে ও বিদেশে অতি সত্বর জয়লাভ করিবে। ঈশ্বর আশীর্ব্বাদ করুন যেন তাঁহার জন্য সকল সহিতে পারি।

সন্ধ্যাকালে শ্রীযুক্ত বাবু শশিভূষণ বসু মহাশয় "ধর্ম্মজীবনের বিকাশ" বিষয়ে বক্তৃতা প্রদান করেন। তাহার সারাংশ নিম্নে দেওয়া গেল।

"আজ কাল চারিদিকে ধর্ম্মের আন্দোলন চলিতেছে। নানা প্রকার ধর্ম্মসভা প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। ৪টী প্রধান সম্প্রদায় এই পৃথিবীতে আছে। হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান, মুসলমান। চারি সম্প্রদায়ের লোকই ভারতবর্ষে ধর্ম্মপ্রচার করিতেছেন। অনেকে দেশ বিদেশ পরিভ্রমণ করিয়া মৃতপ্রায় হিন্দুসমাজকে জীবন দিবার জন্য তার স্বরে বক্তৃতা করিতেছেন। অনেক আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা" বাহির হইতেছে। বৌদ্ধ প্রচারকগণও নীরব নন। ধর্ম্মপাল প্রভৃতি বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার করিতেছেন। ইউরোপ প্রভৃতি দেশে বৌদ্ধধর্ম্মের আলোচনা হইতেছে। মুসলমানগণও নীরব নন। তাহারাও খুব প্রচার করিতেছে। Wellington squareএ একজন ইংরাজ মুসলমান হইয়াছেন।

খ্রীষ্টধর্ম্মের কথাই নাই। চারিদিকে খুব প্রচার হইতেছে মুক্তিফৌজ নূতন রকমে খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচার করিতেছেন। এই সমস্ত ধর্ম্মের আন্দোলন চারিদিকে খুব চলিয়াছে। ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়ে দেখিতে পাই বৈষ্ণব, শৈব, শাক্ত, ও গাণপত্য এদেশে খুব প্রধান। এই সকলের মধ্যে ব্রাহ্মসমাজ অনেক সময়ে অনেক লাঞ্ছনা সহ্য করিয়াও আপনার সত্য প্রচার করিতেছেন। চারিদিকে অনেক শত্রু থাকা সত্ত্বেও দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। ইহার মধ্যে আবার Theosophy নামে নূতন মত বৌদ্ধ ও হিন্দুধর্ম্মের সংমিশ্রণে উৎপন্ন। পরমেশ্বর থাকুন বা না থাকুন ক্ষতি নাই, বাহ্য প্রক্রিয়া পালন করিলেই হইল। ধর্ম্মবিশ্বাস থাকা বা না থাকাতে ক্ষতি বৃদ্ধি নাই। এই গুলির মধ্যে ব্রাহ্মসমাজ কি দেখাইতেছেন? মুক্তির পথে কি করে যেতে হবে। কোন্ পথ অবলম্বন করিলে প্রকৃতরূপে ধর্ম্মজীবনের বিকাশ হইতে পারে। ধর্ম্মজীবনেও ভৌতিক জগতের ন্যায় নিয়ম রহিয়াছে। মানবের ধর্ম্মমুকুল সকল সেই নিয়মে বিকশিত হয়। তার প্রথম নিয়ম, আত্মার পবিত্রতা। হৃদয় পবিত্র না হইলে পরমেশ্বরকে দেখা যায় না। ষড়রিপু আমাদের ভয়ানক প্রতিকুলাচরণ করে। ইহাদিগকে যাঁহারা নির্ম্মূল করিতে না পেরেছেন ভগবানের সাক্ষাৎ দর্শন তাঁদের অসম্ভব। যদ্দারা কুভাবের দিকে মন ধাবিত হয় তার মধ্যে প্রথম ঘৃণিত পুস্তক পাঠ করা। অধিকাংশ যুবক ইংরেজী জঘন্য novel পড়েন। মন কলুষিত করিবার পক্ষে এমন আর কি হইতে পারে? দ্বিতীয় রঙ্গভূমি, নরকের পিশাচ রঙ্গভূমি ছাড়া আর কোথায় আছে? পবিত্রতা লাভের জন্য প্রত্যেক ধর্ম্মশাস্ত্রে কত কঠোর বিধি ছিল।

২য়—পবিত্রতা লাভ করিলে আপনা আপনি পরমেশ্বরের প্রতি একটা প্রেমের ভাব হয়। ঈশ্বরের দর্শনে প্রাণ বিকশিত হয়। ইহার বিরুদ্ধে গুরু ও পুরোহিত মানবাত্মার অত্যন্ত ক্ষতি করিয়াছে। অভ্রান্ত গুরু মানবের যত ক্ষতি করিয়াছে আর কিছুতে তত নহে। অভ্রান্ত গুরু মানিতে গেলে হিতাহিত বিবেচনা একেবারে পরিত্যাগ করিতে হয়। আত্মার সঙ্গে পরমাত্মার নৈকট্য ধর্ম্মজীবন লাভের উপায়।

৩য়—জ্ঞানালোচনা। জ্ঞানের প্রতি দৃষ্টি না থাকিলে কত যে ক্ষতি হয় বৈষ্ণব সম্প্রদায় দেখাইয়াছেন। মহাত্মা চৈতন্য একদিন অদ্বৈতকে বলিয়াছিলেন জ্ঞান অপেক্ষা ভক্তি শ্রেষ্ঠ। এক্ষণ বৈষ্ণব সমাজে এত পাপ প্রবেশ করিয়াছে যে তাহাতে হৃৎকম্প হয়। এ দেশে যুবকদের মধ্যে তেমন জ্ঞানচর্চ্চা নাই। অধিকাংশ পুস্তকের দোকানে স্কুলপাঠ্য ছাড়া অন্য ভাল বই পাওয়া যায় না। তার কারণ শিক্ষা ভাল রকমে প্রচার হয় নাই। ধর্ম্মজীবনের পক্ষে জ্ঞান নিতান্ত প্রয়োজনীয়।

৪র্থ—সজন ও নির্জ্জন উপাসনা ও প্রার্থনা। এক সঙ্গে উপাসনা করিলে প্রাণে কেমন চমৎকার ভাব ও আনন্দ পাই।

৫ম। সাধুসহবাস। তাহাতে প্রাণের মধ্যে আপনি ভাব আসে। কর্ত্তাভজারা বলেন এক সঙ্গে সাধন না করিলে সাধনই হয় না।

৬ষ্ঠ। উদারতা। সত্য প্রাণে ধারণ করিতে গেলে সকল জাতি হইতে সত্য গ্রহণ করিতে হয়। সকল দেশীয় ধর্ম্মাচার্য্যগণ প্রায় একই কথা বলিয়া গিয়াছেন। যাহারা ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে চান তাঁদের নিকট Asia, Europe একই কথা। যেখানে সাধুতা সেখানেই মাথা অবনত করিতে হইবে।

৭ম—স্বার্থত্যাগ ও নরসেবা। এদেশে যাঁরা ধর্ম্মজীবন সাধন করিয়াছেন তাঁহারা কেবল নিজেরাই করিয়াছেন। কিন্তু অপরের সেবা না করিলে তাহাতে ক্ষতি হয়। Love thy neighbour as thyself, তুমি তোমার প্রতি বেশীকে আপনার ন্যায় ভাবিবে। এই ৭টী ভাবে ধর্ম্মজীবনের বিকাশ। যাঁহারা ইহার সবগুলি গ্রহণ না করেন তাঁহাদের একাঙ্গ সাধন হয়। বর্ত্তমান সময়ে ব্রাহ্মসমাজ এই ভাব দিবার জন্য দণ্ডায়মান। লোকে যা বলে বলুক এই ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে এক চমৎকার ভাব আছে।

৫ই মাঘ, ১৭ই জানুয়ারী, বুধবার—আজ প্রাতঃকালে মন্দিরে উপাসনা হয়। শ্রীযুক্ত ভাই প্রকাশ দেব আচার্য্যের কার্য্য করেন। সন্ধ্যাকালে ব্রহ্মবিদ্যালয়ের উৎসব সম্পন্ন হয়। এতদুপলক্ষে প্রার্থনার পর ব্রহ্মবিদ্যালয়ের সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু সীতানাথ দত্ত মহাশয় বিদ্যালয়ের বার্ষিক বিবরণ পাঠ করেন। ঐ রিপোর্ট হইতে জানা যায় যে এ বৎসর ইংরেজী কোর্সে তিন জন, বাঙ্গালা নিম্নতর কোর্সে একজন, এবং ইংরেজি নিম্নতর কোর্সের কেবল বাইবেলে একজন পরীক্ষার্থী পরীক্ষা দেন। ইহার কারণ (১) নিয়মিত শিক্ষকের অভাবে কোন কোন শ্রেণীর কার্য্য নিয়মিত রূপে হয় নাই, (২) পাঠ্যের কঠিনতা। বর্ত্তমান বর্ষে দ্বিতীয় কারণ দূর করা হইয়াছে। ডাক্তার প্রসন্নকুমার রায় ইংরেজি ধর্ম্ম বিজ্ঞানের, পণ্ডিত

শিবনাথ শাস্ত্রী 'ভগবদ্গীতার' বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত বাইবেলের, এবং বাবু অবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বাঙ্গালা কোর্সের পরীক্ষা গ্রহণ করেন। পরীক্ষার্থিগণ সকলেই উত্তীর্ণ হইয়াছেন। তাঁহাদের নাম এই:—

উচ্চতর ইংরেজি শ্রেণী।

প্যারীলাল ঘোষ	প্রেসিডেন্সিকলেজ,	চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণী
মুনীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	ঐ	ঐ
অন্নদাপ্রসাদ সেন	সিটিকলেজ	ঐ

বাঙ্গালা নিম্নতর শ্রেণী

যোগানন্দ প্রামাণিক শান্তিপুর।

তৎপরে শ্রীযুক্ত বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় পরকাল বিষয়ে বক্তৃতা করেন। বক্তৃতার সার মর্ম্ম নিম্নে দেওয়া গেল:—

"সংশয়বাদীরা বলেন আত্মা একটী স্বতন্ত্র বস্তু নয়—তাহা মস্তিষ্কের ক্রিয়া মাত্র। এই মত সত্য হইলে মৃত্যুতেই আমাদের শেষ। আত্মা যে জড়ের ক্রিয়া নয়,গতবারে এই মত অনেকগুলি অখণ্ডনীয় যুক্তি দ্বারা প্রতিপন্ন করিয়াছিলাম। মৃত্যুর পরেও যে আত্মা থাকে, আমি সে সম্বন্ধে কিছু বলি নাই। আত্মার পরকালে অস্তিত্ব প্রমাণ করিতে হইলে আত্মার অস্তিত্ব আগে প্রমাণ করিতে হয়। অনাত্ম-বাদখণ্ডন পূর্ব্বেই হইয়াছে। অনাত্ম-বাদখণ্ডন ও পরকাল দুটী স্বতন্ত্র বিষয় নয়। একই বিষয়ের দুটী অংশ।

অনাত্মবাদী বলেন মৃত্যুতেই শেষ। মৃত্যুর পরে আর কিছু নাই। চিতানলে বা পূর্তিগন্ধে সকলই ফুরাইয়া যায়। কিন্তু একটী কথা; জগতে কিছুরই বিনাশ হয় না। ভঙ্গ হয়। পরিবর্ত্তিত হয়। জড়ের বিনাশ নাই। তবে কি আত্মার বিনাশ আছে? ইহার উত্তরে বলিতে পারেন, জড়ের ভঙ্গ আছে, তেমনি আত্মাও ভঙ্গ হইতে পারে। দেহ ভঙ্গ হইলে যেমন তার দেহত্ব থাকে না, আত্মা ভঙ্গ হইলে তার আত্মত্ব কিরূপে থাকে? যাহা পরমাণুর সমষ্টি তাহারই ভঙ্গ হইতে পারে, যাহা তাহা নয় তাহা ভঙ্গ হইতে পারিবে কেন? ভঙ্গ হওয়ার অর্থ পরমাণুর বিশ্লেষণ। সুতরাং যখন আত্মা পরমাণুসমষ্টি নয়, তখন আত্মা অখণ্ড, ইহা ভঙ্গ হওয়া অসম্ভব। সুতরাং আত্মার আত্মত্ব চিরদিনই সমান। কেহ বলিতে পারেন, সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বর কি আত্মাকে বিনাশ করিতে পারেন না? যিনি সর্ব্বশক্তিমান্ তিনি পারেন না ইহা কে মুখে আনিবে? ইচ্ছা করিলে তিনি পারেন, কিন্তু তিনি ইচ্ছা করেন কি না, যুক্তিসঙ্গত কি না ইহাই বিবেচ্য। জগতের সমস্ত পদার্থ কি বলে? জগতের একটী বালুকণাও বিনাশ হয় না। তবে কি তিনি জ্ঞানধর্ম্মের অধিকারী, নিখিল ব্রহ্মাণ্ড হইতে শ্রেষ্ঠ আত্মাকে বিনাশ করিবেন? ইহা কি বিচারসঙ্গত? আত্মার অমরত্বের আলোচনা করিতে হইলে দুইটী দিক্ দেখিতে হয়। প্রথম পরমেশ্বরের স্বরূপ। তিনি দয়াময়, ন্যায়বান সত্য-সঙ্কল্প। অপর দিকে আত্মার প্রকৃতি। এই দুইদিকের তুলনায় সমালোচনা করিলে পরকালের অস্তিত্ব নিশ্চিত প্রমাণ হয়। পরমাত্মার সহিত মিলাইয়া আত্মার প্রকৃতি দেখুন। প্রথম ন্যায়বুদ্ধি, sense of justice সহস্র কণ্ঠে আত্মার অমরত্ব ঘোষণা করিতেছে। পদে পদে আমাদের ন্যায়-বুদ্ধি ক্লিষ্ট। প্রজার প্রতি রাজার, দরিদ্রের প্রতি ধনীর অত্যাচার যে কত, কে তাহার গণনা করিবে, পৃথিবীময় এই সব অত্যাচার স্মরণে হৃৎকম্প হয়।

যত তুমি ভাল হইবে,আত্মা পবিত্র হইবে,তত এই অত্যাচার দেখিয়া কষ্ট হইবে। ন্যায়-বুদ্ধি বলে, যে অন্যায় করে, তার অবশ্যই কর্ম্মফল ভোগ করিতে হইবে। কিন্তু জগতে কি তাহা সর্ব্বদা দেখিতে পাই? অন্যায় অত্যাচারী কি সর্ব্বদা উপযুক্ত কর্ম্মফল ভোগ করে? অনেক স্থলে করে না। বলিতে পারেন, বাহিক কষ্ট না পাইলেও আন্তরিক যন্ত্রণা অবশ্যই হয়। একথাটা ভাল লাগে না। ইহলোকে উপযুক্ত আন্তরিক যন্ত্রণা যে সব স্থলে হয় এ কথা স্বীকার করিতে পারি না। যখন দুষ্কার্য্য করে তখন খুব গ্লানি হয়। দ্বিতীয় বার অপেক্ষাকৃত অল্প। তার পর আরও কম। ক্রমে আত্মগ্লানি ক্ষীণ হইয়া আসে। শেষে দুষ্কার্য্য অভ্যাস হয়, কিছুমাত্র গ্লানি হয় না। তবে পাপের আন্তরিক যন্ত্রণা ইহ সংসারে কৈ? কিন্তু ন্যায়বাদী বলিতেছেন, পাপের উপযুক্ত কর্ম্মফল অবশ্যই ভোগ করিতে হইবে। নতুবা, সাধু ও পাপীর অবস্থা এক হইয়া যায়। ইহার আর এক দিক আছে। অত্যাচরিত ব্যক্তি ন্যায়বান্ ভগবানের রাজ্যে যে অন্যায় অত্যাচার সহ্য করিল, তাহার কি পূরণ হইবে না? ইহসংসারে Compensation দেখিতে পাই না। তবে তাঁর দয়া কোথায় থাকে? পরকাল আছে, তাই আমাদের ন্যায়-বুদ্ধি শান্তিলাভ করে।

মানবাত্মার প্রকৃতি আলোচনা করিলে দেখি আত্মার গতি পূর্ণতার দিকে। সীমাবদ্ধ ক্ষুদ্রে আত্মা তৃপ্ত নয়। জ্ঞানপিপাসার কোথাও বিশ্রাম নাই। এ সংসারে তাহা চরিতার্থ হয় না। অনন্তের দিকে মানবাত্মা ছুটিতেছে। অতএব পরকাল আছে। অসীমের দিকে মানবের শক্তি ও ইচ্ছার গতি, কিন্তু সময় সীমাবদ্ধ। মানসিক ও আধ্যাত্মিক শক্তির সীমা নাই। অতএব মানুষ অনন্ত কালের জন্য। প্রেমের গতিও ক্রমোন্নতিশীল। মৃত্যুতেই যদি শেষ, তবে ইহকাল পরকালব্যাপিনী হৃদয়ের প্রসারিণী শক্তি কেন হইল? যে অনন্ত জীবনের বীজ আত্মার মধ্যে দেখি, তাহা ইহকালের জন্য নয়। শিশুর প্রসব হওয়া যেমন, মৃত্যু তেমনি দ্বিতীয় প্রসব।

প্রেম প্রেমাস্পদের সঙ্গে চিরসম্বন্ধে বদ্ধ হইতে চায়। প্রেম বলে, "মলেও যেন দেখা পাই।" প্রেমের এই স্বভাব তিনি দিয়াছেন। অথচ বিশ্বাসঘাতকের মত মরিবার সময় গলা টিপিয়া মারিয়া দেন ইহা কি সম্ভব? মৃত্যুতেই যদি শেষ হয়, তবে প্রেমাস্পদ মানুষ ও প্রেমাস্পদ পরমেশ্বরের সঙ্গে, আমাদের ক্ষণিক সম্বন্ধ। তবে তাঁহাকে সত্য সংকল্প কেন বল? তিনি প্রেমকে যে স্বভাব দিলেন তাহা কি মিথ্যা হইবে?

পবিত্রতার দিক্ দেখুন। বিবেক বলে 'পবিত্র হও'। চারি আনা হওয়া নয়, ষোলআনা পবিত্র হইতে হইবে। মানবের ধর্ম্মবুদ্ধি বলে "ধর্ম্মকে সম্পূর্ণরূপে পালন কর।" এজন্য অনন্তকাল চাই। পূর্ণ ধর্ম্ম এ লোকে সম্ভব নয়। মহাসাধুও আপনার ত্রুটী দেখিয়া ক্ষুব্ধ হন। ধর্ম্মকে যতই ধারণ করিতে

যান ততই উচ্চ হইতেও উচ্চতর হয়। তখন দেখেন ইহজীবন পূর্ণ ধর্ম্ম সাধনের পক্ষে অসম্ভব। কিন্তু প্রাণের ভিতর হইতে কে সর্ব্বদাই বলিতেছে "ধর্ম্মকে পূর্ণরূপে সাধন কর।" তবে বিবেক কি মিথ্যাবাদী? তাহা বলিতে পারি না। তাই সে বলিতে বলে "অনন্ত জীবনে অনন্ত ধর্ম্ম-ধন লাভ করিয়া জীব কৃতার্থ হইবে।"

তার পর আমাদের সুখেচ্ছা। সম্পূর্ণ সুখ চাই। কিন্তু ইহলোকে কার সুখ পূর্ণ হইয়াছে? জগতে পূর্ণ তৃপ্তি দেখিতে পাই না। জীবন্মুক্ত পুরুষের কি পূর্ণ তৃপ্তি হইয়াছে? অনন্ত প্রেম, জ্ঞান তাঁহার সম্মুখে। অনন্ত জীবনের অনন্ত সম্ভোগ, তাঁহার আশা এই। পরিমিত জীবনের কয়দিনে তাহা সম্ভব নয়। কোথাও কেউ বলে না, তৃপ্ত হইয়াছি আর চাই না। মানবের হৃদয় নিহিত, পরমেশ্বরে প্রতিষ্ঠিত আশা কখনও তৃপ্ত হইবে না। প্রকৃতিতে দেখি, এক দিকে অভাব অপর দিকে তাহার পূরণ। কিন্তু ভাবুন দেখি, ক্ষুধা আছে অন্ন নাই, এরূপ হইলে জগৎ কয়দিন রক্ষা হইত? যিনি শারীরিক অভাব পূরণের ব্যবস্থা করিয়াছেন, তিনি ইহার আত্মার অভাব অপূর্ণ রাখিবেন? তাঁহার ন্যায় ও করুণা মানবের স্বভাব ও জগতের উপমিতি শতকণ্ঠে বলিতেছে, যিনি এই ক্ষুধা দিয়াছেন তিনি অবশ্যই অন্ন দিবেন। "যোবৈভূমা তৎসুখম্। নাল্পে সুখমস্তি।"

পূর্ণ প্রেম, জ্ঞানের অধিকারী হওয়া কি এক দিনের কাজ? "লাখ লাখ যুগ হিয়াপর রাখিনু তবু হিয়া জুড়ান না গেল।"

আমরা জীবন কত ভাল বাসি। বাঁচিতে যত ভাল বাসি এত আর কিছুই নয়। বাঁচিয়া থাকিবার অনন্ত তৃষ্ণা মানুষের মনে কেন আসিল? ৬০। ৭০ বৎসরেই তৃপ্তি হয় না কেন? এটী অতি প্রবল যুক্তি, Plato এই যুক্তিটী বলিতেন। জীবন তৃষ্ণার প্রকৃতি কি? ইহার অনন্ত গতি। আর এই বর্ত্তমান জীবনে কেহ সন্তুষ্ট নহে; ইহা ভবিষ্যতের দিকে তাকাইয়া আছে।

আর এক দিকে—যে যাহাকে ভাল বাসে সে কি ইচ্ছা করে তার প্রেমাস্পদ মরিয়া যাক্? সে চিরজীবী হয়, না মরে, এই ইচ্ছা করে? অনন্ত প্রেমময়ী মা তার ছেলেকে গলা টিপিয়া মারিয়া ফেলিবেন? তিনি আশীর্ব্বাদ করিতেছেন 'চির-জীবী হও।'

পরমাত্মার সহিত যে নিগূঢ় যোগ তাহা এক অলৌকিক অবস্থা। এ যোগ হইলে আত্মা স্পষ্ট বুঝিতে পারে, ইহা অস্থায়ী নয়। ইহা অনন্ত। এ সম্বন্ধে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর বলিতে-ছেন:—

পরকাল চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হয়; কিন্তু তাই মাত্র প্রমাণ নয়। অন্তরূপে, জ্ঞানে পরমেশ্বর ও পরকাল জানিতে পারি, সাধন ভজন দ্বারা জানিতে পারি। যিনি ব্রহ্মে স্থিতি করেন, তিনি ব্রহ্মকে দর্শন করেন এবং তিনি তাঁহার মধ্যে ইহকাল পরকাল দর্শন করেন; পৃথিবীতে থাকিয়াও এই অপার্থিব অবস্থা হয়, যদি সাধন করা যায়। মায়ান্ধ এ কথা বুঝে না।

৬ই মাঘ, ১৮ই জানুয়ারী বৃহস্পতিবার।

প্রাতঃকালে এবং সন্ধ্যার সময় মন্দিরে উপাসনা হয়। প্রাতে শ্রীযুক্ত বাবু মহেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় এবং সায়ংকালে শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী আচার্য্যের কার্য্য করেন।

৭ই মাঘ, ১৯শে জানুয়ারী শুক্রবার।

প্রাতঃকালে শ্রীযুক্ত বাবু শশিভূষণ বসু উপাসনা করেন। সায়ং-কালে সঙ্গত সভার বার্ষিক উৎসব হয়। শ্রীযুক্ত বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত উপাসনা করেন এবং সভাপতির আসন পরিগ্রহ করেন। শ্রীযুক্ত বাবু কুঞ্জবিহারী সেন সভার কার্য্যবিবরণ পাঠ করেন। কার্য্যবিবরণ স্থানান্তরে প্রকাশিত হইবে। তৎপর শ্রীযুক্ত বাবু হরগোবিন্দ চৌধুরী, শ্রীযুক্ত বাবু মহেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত বাবু চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত বাবু মথুরামোহন গাঙ্গুলী ও শ্রীযুক্ত বাবু বিপিনচন্দ্র পাল ধর্ম্মসাধন সম্বন্ধে স্ব স্ব জীবনের অভিজ্ঞতা ব্যক্ত করেন।

৮ই মাঘ, ২০শে জানুয়ারী শনিবার।

আজ বঙ্গমহিলাসমাজ ও ব্রাহ্মিকা সমাজের উৎসব। প্রত্যূষ হইতে মহিলাগণ মন্দিরে সমাগত হইতে আরম্ভ করিলেন। মন্দির কেবল মহিলাবর্গের উপাসনার জন্য পূর্ব্ব হইতেই নির্দ্দিষ্ট ছিল, মন্দিরে নারীগণ সমবেত হইয়া পর ব্রহ্মের গুণগানে চতুর্দ্দিক পূর্ণ করিলেন। শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী উপাসনা করিলেন। সিটিকলেজে পুরুষদিগের উপাসনা হয়। তথায় শ্রীযুক্ত বাবু কালীপ্রসন্ন বসু উপাসনা করেন। তাঁহার উপদেশের সারমর্ম্ম নিম্নে বিবৃত হইল।

পরমেশ্বর দয়া করিয়া পাপীর উদ্ধারের নিমিত্ত দুই একটী উপায় করিতেছেন এমন নয়, কিন্তু শত সহস্র উপায় করিতে-ছেন, অসংখ্য উপায় করিতেছেন। অতএব আমাদিগের নিরাশ হইবার কোন কারণ নাই। আসুরিক ভাবাপন্ন হইয়া আমরা তাঁহার অনেক উপায় ব্যর্থ করিয়াছি। তিনি আমাদিগকে তাঁহার প্রেরিত উপায় ব্যর্থ করিবার ক্ষমতা দিয়াছেন, বলিয়াই আমরা ব্যর্থ করিতে পারিয়াছি, না হইলে তাঁহার উপায়কে আমরা ব্যর্থ করি আমাদিগের এমন সাধ্য কি? আমরা কি সর্ব্বশক্তিমান অপেক্ষা ও অধিক শক্তিশালী? কিন্তু অতীত-কালে আমরা তাঁহার যত উপায়ই ব্যর্থ করিয়া থাকি না কেন, তাহা বলিয়া আমরা ভবিষ্যতের আশা পরিত্যাগ করিতে পারি না। চিরকাল আমরা পাপে মজিয়া পাপের দাসত্ব করিব এজন্য ভগবান আমাদিগকে পৃথিবীতে আনেন নাই। অনন্তকাল আমরা পাপ এবং পাপজনিত ক্লেশ সহ্য করিব ইহা যখন ঈশ্বরের অভিপ্রায় নহে, তখন তাঁহার প্রেরিত উপায় অবশ্যই সফল হইবে। শত সহস্র উপায় যখন বিধান করিয়াছেন আরও করিবেন, তাহার একটী উপায় ও কি আমাদিগের উদ্ধার সাধন করিবে না? বিজয়ী ঈশ্বর নিজ ধনুক হইতে আমাদিগকে লক্ষ্য করিয়া শত সহস্র পরিত্রাণের বাণ নিক্ষেপ করিতেছেন, একটী ও কি আমাদিগকে ভূপাতিত এবং তাঁহার পদতলে পাতিত করিতে পারিবে না? অতএব উপাসকগণ সাহসী হও। নৈরাশ্য পরিত্যাগ কর। কোন বিখ্যাত ধর্ম্মগ্রন্থে আছে যে স্বর্গ রাজ্যের কোন যাত্রীকে একদা নৈরাশ্য-অসুর পথ হইতে ধরিয়া আনিয়া তাহার কেল্লাতে

অবরুদ্ধ করিয়া নিত্য নিত্য অশেষ যন্ত্রণা দিতে লাগিল। কিন্তু ব্রহ্মের কৃপাবলে অকস্মাৎ একদিন সেই মনুষ্য জাগ্রত হইল। এবং কারাগার ভাঙ্গিয়া বাহিরে আসিয়া দেখিতে পাইল যে অসুর প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া আছে; অমনি সে ছুটিয়া গিয়া সেই অত্যাচারীর মস্তক ছেদন করিল। ব্রহ্ম আমাদিগকে পরিত্রাণ দিবার জন্য কত উপায়ই বিধান করিতেছেন। চন্দ্র সূর্য্য আকাশে পর্য্যায়ক্রমে উদিত, অস্তমিত হইতেছে, কত নক্ষত্র আকাশে প্রস্ফুটিত হইয়া অন্ধকারময় আকাশকে উজ্জ্বল করিয়াছে, আমাদিগের বাসভূমি পৃথিবী নানা রূপে সুসজ্জিত। নদী তড়াগ সমুদ্র হ্রদ তরুলতা তৃণ গুল্ম অসংখ্য প্রকার জীব ইহাতে আছে। চক্ষে যাহা কিছু দেখিতেছি সকলই ত আমাদের পরিত্রাণের উপায়। এই যে মাহোৎসব আসিয়াছে ইহাও আমাদিগের একটী পরিত্রাণের উপায়স্বরূপ হইয়া আসিয়াছে। কিন্তু পরিত্রাণের উপায় পাইলে হয় না, উহার সদ্ব্যবহার চাই। পরিত্রাণের উপায় পাইয়া যদি অধিকতর আগ্রহের সহিত আমরা ঈশ্বরের অনুগত হইয়া তাঁহার উপাসনায় প্রবৃত্ত না থাকি, তাহা হইলে উপায় নিষ্ফল হইবে। ঈশ্বর যেমন আমাদিগের উদ্দেশ্য, তেমন আমাদিগের উপায়ও বটেন। পাপ হইতে পরিত্রাণের নানা উপায় দিয়াছেন সত্য, কিন্তু তিনি স্বয়ংই আবার সর্ব্ব প্রধান উপায়; তাঁহাকে ছাড়িয়া আর কোন উপায় কার্য্যকর হইতে পারে না।

সাধুসঙ্গ একটী পরিত্রাণের উপায় যাহা মাঘোৎসবে আমরা বিশেষ ভাবে লাভ করিব বলিয়া প্রত্যাশা করি। কিন্তু ঈশ্বরে মতিগতি না জন্মিলে সাধুসঙ্গ আমাদের কি উপকারে আসিবে? কতলোক আছে যে ঈশ্বরেতে ভক্তি নাই বলিয়া সাধুসঙ্গ লাভ করিয়াও তাহাতে ফললাভ করিতে পারে না। অবশেষে সাধুনিন্দা করিয়া পাপ সঞ্চয় করে। এবং ঈশ্বরোপাসনাতে কিছু হয় না এরূপ মিথ্যাকথা প্রচার করিতে ও কুণ্ঠিত হয় না। অতএব সাবধান, মাঘোৎসবের আকারে আমাদের যে পরিত্রাণের উপায় আসিয়াছে, আমরা যেমন ইহার সুবিধা গ্রহণ করিব তেমনি মাঘোৎসবের প্রেরয়িতা ঈশ্বরকে যেন ভুলিয়া না যাই। কিন্তু যেন মহোৎসাহে তাঁহার উপাসনাতে প্রবৃত্ত হই, তাহা হইলে আমাদিগের কামনা সফল হইবে।

সায়ংকালে ৬॥ ঘটিকার সময় সিটিকলেজে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বার্ষিক সভার অধিবেশন হয়। প্রার্থনান্তে শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। এ দিন বিশেষ কোনও কার্য্য হয় না। বার্ষিক রিপোর্ট ও কর্ম্মচারী নিয়োগ লইয়া অনেক বাদানুবাদের পর ২৯শে জানুয়ারী ১৭ই মাঘ সোমবার পুনরায় সভা হইবে বলিয়া সভা স্থগিত হয়।

৯ই মাঘ, ২১শে জানুয়ারী রবিবার।

প্রত্যুষে মন্দিরে সংকীর্ত্তন, তৎপরে উপাসনা হয়। শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় আচার্য্যের কার্য্য করেন। মধ্যাহ্ন ১ ঘটিকার সময় (Conference) আলোচনা সভা হয়। তথায় উৎসব উপলক্ষে সমাগত অধিকাংশ ব্রাহ্ম ও ব্রাহ্মিকা উপস্থিত ছিলেন। শ্রীযুক্ত বাবু কেদারনাথ রায় (সি, এস) মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। এই সভায় "ব্রাহ্মবালক ও বালিকাদিগের শিক্ষা এবং ব্রাহ্মদিগের সাংসারিক অবস্থা" এই দুইটী বিষয়ের আলোচনা হয়। শ্রীযুক্ত বাবু কৃষ্ণকুমার মিত্র মহাশয়ের উপর বালকদিগের শিক্ষা সম্বন্ধে প্রস্তাব উত্থাপিত করিবার ভার ছিল।

কৃষ্ণকুমার বাবু কলিকাতা সিটিকলেজের তত্ত্বাবধায়ক; তাঁহাকে প্রতিদিন বালকদিগের উন্নতি ও নীতির দিকে দৃষ্টি রাখিতে হয়। সিটিকলেজে অনেকগুলি ব্রাহ্মবালক পাঠ করে, তাহাদের শিক্ষার অবস্থা, নীতিও চরিত্র কিরূপ, তাহা লক্ষ্য করিবার অবসর তাঁহার প্রতিদিনই ঘটিতেছে। সুতরাং ব্রাহ্মবালকদিগের শিক্ষাসম্বন্ধে তিনি যাহা বলিলেন, তাহার প্রতি সকলেরই বিশেষ রূপে প্রণিধান করা কর্ত্তব্য। ব্রাহ্মবালক বালিকার শিক্ষাবিষয়ে ব্রাহ্মসমাজের দায়িত্ব কিরূপ গুরুতর তাহা প্রদর্শন করিয়া তিনি তৎপরে ব্রাহ্ম পিতা মাতার বিবেচনার্থ কতকগুলি সারগর্ভ কথা বলিলেন। তাঁহার বক্তৃতার সারাংশ এবং কনফারেন্সে পঠিত অপরাপর বিষয় স্থানান্তরে মুদ্রিত হইবে।

কৃষ্ণকুমার বাবুর উক্তি শেষ হইলে অনেকে তৎসম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করেন। কেহ কেহ প্রস্তাব করিয়াছিলেন, যে ব্রাহ্মবালক বালিকাদের জন্য প্রত্যেক ব্রাহ্মের নিকট হইতে তাঁহাদের আয়ের উপরে শতকরা কিছু কিছু ট্যাক্স লওয়া কর্ত্তব্য। এবিষয়ের আলোচনা শেষ হইলে, ব্রাহ্মদিগের সাংসারিক অবস্থা বিষয়ে আলোচনা আরম্ভ হয়।

"ব্রাহ্মদিগের সাংসারিক অবস্থা" বিষয়ে আলোচনা উপস্থিত করিবার ভার শ্রীযুক্ত বাবু সূর্য্যকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রতি অর্পিত হইয়াছিল।

তিনি তাঁহার বক্তৃতায় দরিদ্র ব্রাহ্মদিগের দুরবস্থার ছবি চিত্রিত করিয়া দেখাইলেন যে, ব্রাহ্মসমাজে দরিদ্র পরিবারের সংখ্যা দিন দিন বৰ্দ্ধিত হইতেছে। ইঁহাদের কাহারও কাহারও এরূপ হীনাবস্থা যে পুত্র কন্যার শিক্ষা দিতে সমর্থ নহে। এই সকল অশিক্ষিত বালক বালিকা উত্তরকালে কিরূপ দাঁড়াইবে তাহা সকলেই অনুমান করিতে পারেন। দারিদ্র্যের তাড়নায় ব্রাহ্মগণের নীতি আর রক্ষা হইবে না। তাহারা প্রবঞ্চক, মিথ্যাবাদী, পরস্বাপহারক হইয়া উঠিবে, এবং ব্রাহ্ম পরিবার সকল সর্ব্ববিধ দাচারের আলয় হইয়া উঠিবে। এই সকল উল্লেখ করিয়া অবশেষে তিনি দারিদ্র্য নিবারণের পাঁচ প্রকার উপায় নির্দ্দেশ করিলেন।

প্রথম, ব্রাহ্মপল্লী স্থাপন অর্থাৎ সহরবাস পরিত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মদিগের মফস্বলে বাসস্থান নির্ম্মাণ করা।

দ্বিতীয়, ব্যয় সংকোচ। ব্রাহ্ম পুরুষ ও রমণীদিগকে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহার্থ দৈহিক শ্রমসাধ্য কার্য্য করিতে অভ্যস্ত করা; ও আহার বিহারাদির ব্যয়ের স্বল্পতার দিকে দৃষ্টি রাখিতে উপদেশ দেওয়া।

তৃতীয়—অর্থ সংস্থান। অর্থাৎ জীবনবীমা প্রভৃতির ন্যায় অর্থ সংস্থানের উপায় করা।

চতুর্থ—স্বাধীন ব্যবসায়। ব্রাহ্মগণ যাহাতে রাজকার্য্য প্রার্থী না হইয়া স্বাধীন ব্যবসায় দ্বারা সংসার পালন করিতে পারেন তাহাই প্রার্থনীয়।

পঞ্চম—মিলিত ভাণ্ডার (co-oparative stores) এতদ্দ্বারা সুলভ মূল্যে উৎকৃষ্ট দ্রব্য সকল যোগান যাইতে পারে।

এই বিষয়ে যে আলোচনা উপস্থিত হয়, তাহাতে অনেকে যোগ দিয়াছিলেন। উপসংহারে সভাপতি বলেন যে দরিদ্র ব্রাহ্মযুবকদিগকে জীবন সংগ্রামে সাহায্য করিতে পারে এরূপ একটী কমিটী থাকা একান্ত আবশ্যক। সূর্য্যকুমার বাবুর পঠিত প্রবন্ধ স্থানান্তরে প্রকাশিত হইবে।

রাত্রিকালের উপাসনাকার্য্য শ্রীযুক্ত বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদন করিয়াছিলেন। তাঁহার উপদেশের সারাংশ নিম্নে দেওয়া গেল।

আর শুনা কথায় তৃপ্তি হয় না। প্রত্যক্ষ, স্থায়ী কিছু চাই। যে ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছি, তাহার বিশেষ লক্ষণ এই যে এখানে সকলি প্রত্যক্ষ। পরকালে ঈশ্বরদর্শন লাভ করিবে, আমাদের ধর্ম্ম একথা বলে না। এখানেই তাঁহাকে দেখ। প্রচলিত ধর্ম্মের উপদেশ, পৃথিবীতে ধর্ম্ম-জীবন যাপন কর, বৈকুণ্ঠে ভগবানের দর্শন পাবে। ব্রাহ্মধর্ম্ম এমন কথা বলে না। ধর্ম্ম প্রত্যক্ষ; জীবনে প্রত্যক্ষ না হইলে, সেটী আমার শুনা কথা থাকিল; নিজস্ব হইল না। সমুদ্রগর্ভে অনেক রত্ন আছে শুনিয়া আমার দারিদ্র্য ঘোচে না। শুনাকথাতে বা তর্কের মীমাংসায় হয় না, পাওয়া চাই। সাধুরা ধর্ম্মের অনেক উচ্চ কথা বলেন, তাহা শুনিয়া আধ্যাত্মিক দারিদ্র্য ঘোচে না। শাস্ত্রে থাকিলে কি হইবে, প্রাণে চাই। সত্য কোনও জ্ঞানই কেবল শুনাতে হয় না। যে হিমালয় দেখে নাই সে কালিদাসের বর্ণনা পড়িয়া কি হিমালয়ের ভাব গ্রহণ করিতে পারে? প্রভুর নাম কত মধুর, ভক্তজন আস্বাদন করিয়া অজ্ঞান হইয়া যান। সংসারের লোকের নিকট সেই নাম একটা কথা মাত্র, তাহার মধ্যে আর কি অমৃত আছে? ঐ নামে কত মধুর ভাব, তাহাতে যে পুত্র শোক দূর হয় ইহা কেবল ভক্তজনের বিদিত। নাম বলিবামাত্র কোথায় গেল শোকতাপ। "যায় শোক, যায় তাপ, যায় হৃদয় ভার" প্রত্যক্ষ কথা, তর্ক করিয়া কে বুঝাইবে? সর্ব্বস্বান্ত হইয়া, হাহাকার করিতে করিতে যে বলিয়াছে "প্রভু, কোথায় তুমি" প্রাণে হাত' দিয়া বলিয়াছে, "তুমিই সর্ব্বস্ব প্রভু।" প্রার্থনা প্রাণের হাহাকার, প্রাণের ক্ষুধা তৃষ্ণা। কেবল কথাই কি প্রার্থনা? মহর্ষি বলেন, সাধন কর, এখনই আত্মাতে তাঁহাকে দেখিবে। কুতার্কিক বলিবে উহা মনের খেয়াল, বিশ্বাসী বলবে সত্য। শাস্ত্রের কথা শুনা কথা। তবে কি শাস্ত্রের কথা অগ্রাহ্য করিব, কখনই নয়। সাধুসঙ্গ করিব, শ্রদ্ধাপূর্ব্বক শাস্ত্র আলোচনা করিব, এসকলে সাহায্য করে; কিন্তু যতক্ষণ না তুমি বলিতে পারিবে, হাঁ আমি দেখিয়াছি, সত্য বটে, নিজে আস্বাদন করিয়া দেখিয়াছি, জীবনে প্রত্যক্ষ করিয়াছি ঈশ্বর আছেন, নামে অপূর্ব্ব মাধুরী, ততক্ষণ ধর্ম্মজীবনের কিছুই হয় নাই। প্রকৃত বিশ্বাস যেখানে প্রকৃত ধর্ম্মজীবন সেই খানে।

ধর্ম্মজীবনের বুনিয়াদ বিশ্বাস। ইহা ক্রমোন্নতিশীল। ভাবিয়া দেখ দেখি, অনন্তজীবনের পথে কি অগ্রসর হইতেছ? প্রকৃত ধর্ম্মজীবন এক জায়গায় স্থির হইয়া থাকে না। হয় পশ্চাতে, নয় অগ্রসর হয়। যদি ধর্ম্মপথে এক এক পা অগ্রসর হইতে না পারি তবে প্রকৃত ধর্ম্মজীবন হয় নাই। সাধুরা ধর্ম্মজীবনের উচ্চস্থানে উঠিয়া যাহা লাভ করিয়াছেন, নিম্নস্থানের লোকেরা তাহা জানে না। ধর্ম্মজীবন বটবীজের ন্যায়। ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হয়। অনেক সময়ে, আমরা একই কথা বলি, এক রাস্তায় চলি, কলুর বলদের মত অগ্রসর হই না। একই তর্ক ২০।২৫ বৎসর চলিয়াছে, অগ্রসর হয় না। অনেক সময় মনে করি মহাত্মাদের সবকথা বুঝিয়াছি। একজন গোয়ালন্দ দেখিয়া যদি ঢাকার বর্ণনা করে, তবে যেমন হয় আমাদের অনেকের দশা তেমনি। কাম ক্রোধের গোলাম হইয়া রহিয়াছে, অথচ ব্রহ্ম-দর্শনের কথা বলে। ধর্ম্মজীবনের অনন্ত রাস্তা। অগ্রসর হও, চল। কত নূতন দেখিবে, পুরাতন নয়। যাহাদের উন্নতি হয় না, তাহারাই বলে নূতন কথা শুনা যায় না। যীশু বলিলেন—"আমি ও আমার পিতা এক; জগতের লোক তার অর্থ না বুঝিয়া যীশুকেই ঈশ্বর মনে করিয়া পূজা করিতে লাগিল। অনেকে মনে করে তীক্ষ্ণ বুদ্ধি থাকিলেই বুঝি ধর্ম্মের কথা বুঝা যায়; মিথ্যা কথা। প্রকৃত বিশ্বাসী সোজা পথে চলিয়া যান, পশ্চাতে ফিরিয়া দেখেন না। দ্বিতীয় লক্ষণ, বিশ্বাসী অচঞ্চল। সাধারণ লোকের দেখি, কেবলই পরিবর্ত্তিত হইতেছে। শুনা কথা ত হইবেই। পরের মুখে ঝাল খাওয়া, উল্টে ত যাবেই। অনেকের শেষ গ্রন্থের অনুযায়ী মত হয়। যেখানে বিশ্বাস শুনা কথা, তাহা বদ্‌লাবে, তর্কের মীমাংসা বদ্‌লাবে; যেখানে দেখা জিনিস সেখানে অটল, অচঞ্চল। ধর্ম্মজীবন বিষয়েও তাই। যথার্থ ধর্ম্মজীবন যে লাভ করিয়াছে, সে অটল। সুখের সময় দয়াময় বলা সোজা; সর্ব্বস্বান্ত হইয়া বলা কঠিন! আর এক শ্রেণীর লোক দুঃখের সময় ভগবানকে ডাকে, সুখের সময় ভোলে। কাহারও মাঝামাঝি পথ আছে। স্ত্রীপুত্রও চাই, ভগবানও চাই। যথার্থ বিশ্বাসীর নিকট এক পরমেশ্বর; পাঁচটার মধ্যে একটা নয়। "সব যাক্ তুমি থাক।" এইভাব যাঁহার হইয়াছে, তিনিই প্রকৃত ধর্ম্মজীবন লাভ করিয়াছেন। যে দুঃখে ডাকে, সুখে ডাকে সেই প্রকৃত ধর্ম্মজীবন লাভ করিয়াছে।

১০ই মাঘ, ২২শে জানুয়ারী সোমবার।

অদ্য প্রাতে কলিকাতা উপাসকমণ্ডলীর উৎসব। প্রথম সংকীর্ত্তন, তৎপরে উপাসনা হয়। শ্রীযুক্ত বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় আচার্য্যের কার্য্য করেন। তাঁহার উপদেশের সারাংশ নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

One thing have I desired of the Lord, that will I seek after; that I may dwell in the house of the Lord all the day of my life, to behold the beauty of the Lord, and to enquire in his temple. Ps. XXVII. 4.

"ঈশ্বরের নিকট আমার এই একটী মাত্র ভিক্ষা, এবং তাহা-রই জন্য আমি চেষ্টা করিব, যেন পরমেশ্বরের আলয়ে যাবজ্জীবন বাস করিয়া আমি তাঁহার সৌন্দর্য্য দর্শন করি, এবং তাঁহার মন্দিরে তাঁহাকে অনুসন্ধান করি।"

ভগবানের নিকটে কত লোক কত প্রার্থনা করিয়া থাকে। ধন, মান, পুত্র, ঐশ্বর্য্য কত কি চায়। আবার কত ধর্ম্মার্থী আছেন, তাঁহারা এই সকল চাহেন না বটে, কিন্তু অন্য কামনা জানান। স্বর্গলাভ, নির্ব্বাণ, মুক্তি, অষ্ট ঐশ্বর্য্য প্রভৃতি চান। ভক্তের প্রার্থনা কিন্তু একটি সে এই; "আমি যেন তোমাকে দেখিতে পারি।" চিরদিনই এই প্রার্থনা থাকে। ঈশ্বরকে দেখিবার জন্য, সর্ব্বদা প্রত্যক্ষ করিবার জন্য একান্ত প্রার্থনা। ভগবানকে কি দেখা যায়? এ কথা লোকের মুখে শুনিয়া কি আমরা ভয় পাইব? ভোগ করিবার বস্তু ত ইহসংসারেই রহি-য়াছে, তাহার অতিরিক্ত কি আবার কিছু পাওয়া যায়? ভক্তের কামনা তাই। ইহলোকের বস্তুতেই যদি ভক্তের তৃপ্তি হইত, তাহা হইলে আর ঈশ্বরের সৌন্দর্য্য অনিমেষে দেখিবার জন্য আকাঙ্ক্ষী হইতেন না।" সকল দেশের, সকল কালের ভক্ত-দিগের এই একই কথা; সংসারে যথার্থ সুখ ও আনন্দ পাওয়া যায় না। "রসোবৈসঃ—তিনিই রস স্বরূপ।"

কোন কোন সম্প্রদায়ের লোকে শব-সাধনা করিয়া থাকেন। শবের উপরে বসিয়া ঈশ্বরের ধ্যান করেন। ইহার গূঢ় মর্ম্ম এই যে ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য যে বস্তু সকল আছে, তা হতে আপনাকে বিযুক্ত করিতে না পারিলে, সংসারকে মৃতবৎ দেখিয়া তাহার উপর বসিয়া ভগবানের সাধনা না করিতে পারিলে, প্রকৃত রূপে তাঁহাকে পাওয়া যায় না। শবের ন্যায় সংসারের বস্তু সকলকে দেখিতে হইবে, তবে সেই অমৃত স্বরূপকে লাভ করা যাইবে। যদি অক্ষয় বস্তু দেখিতে চাও, তবে ইন্দ্রিয়ের অতীত রাজ্যে তাঁহাকে অন্বেষণ করিতে হইবে। গীতা—"যা নিশা সর্ব্বভূতানাং তস্যাং জাগর্ত্তি সংযমী। "সকল প্রাণীর নিকটে যাহা রাত্রি সংযমী তাহাতে জাগিয়া থাকেন।" এই মৃত্যুর পরপারে অমৃত স্বরূপ বাস করিতেছেন, এখানে মরিতে হইবে, সেখানে আমরা জীবিত হইব। আকার বিশিষ্ট বস্তু নশ্বর তাহা হইতে যে আনন্দ লাভ করি তাহার তিন লক্ষণ;—(১) তাহাতে পাপ মিশ্রিত থাকে; (২) সে আনন্দ পাতলা, যতই ভিতরে যাওয়া যায় ততই ফাঁকা ফাঁকা দেখা যায়। (৩) আর তাহা ক্ষণস্থায়ী। আর ইন্দ্রিয়াতীত ঈশ্বরের চরণ হইতে যে সুখ লাভ করা যায় তাহা নির্ম্মল, গাঢ় ও অক্ষয়। ভক্তের প্রাণ এই জন্য নশ্বর শোভা সৌন্দর্য্যে তৃপ্তি মানে না; নিরাকার সত্যস্বরূপ দেবতার সৌন্দর্য্য দেখিতে ব্যগ্র হয়? কোথায় তাঁহাকে দেখা যায়। অনেক স্থলে তিনি আপনাকে দেখান। সকল পদার্থে তিনি বাস করিতেছেন। কিন্তু এ সকল যথার্থ তাঁহার রূপ নয়, এ এ তাঁহার প্রতিরূপ ছায়া। মন্দিরে কত সময়ে কত সুখ পাই, এও বাহ্য, ছায়া। কিন্তু যথার্থ কথা, দায়ূদ বলেন "তোমার মন্দিরে তোমার রূপ দেখিব।" আমরা বাহিরের রাজ্যে তাঁহাকে দেখি কিন্তু আবার হারাইয়া ফেলি। তাঁহার নিত্য-গৃহে তাঁহাকে দেখিতে হইবে। ইন্দ্রিয়ের, মনের, বিজ্ঞানের রাজ্যে নয়; অতি গভীরতম সেই স্থান, যেখানে তিনি নিত্য সৌন্দর্য্যে পূর্ণ রহিয়াছেন। সেখানে তাঁহার নিত্যপদ প্রাপ্ত হইয়া ভক্ত সকল বন্ধন হতে মুক্ত হন।" হিরন্ময়ে পরে কোষে বিরজং ব্রহ্ম নিকলং—হিরন্ময় পরমকোষে সেই নিরঞ্জন। সেখানে তাঁহাকে দর্শন করিতে হয়। সে বাহিরের গৃহ নয়, অন্তরের গৃহ। আমাদের আত্মাতে তার দ্বার আছে, সেখান দিয়া তিনি প্রবেশ করেন। সকল ভক্ত আপনার অন্তরের ভিতর দিয়া সেই দেশে যান। সেখানকার দর্শন শেষ হয় না। অনন্তকাল থাকে। এই নিগূঢ় দর্শনই কি সকল সাধনের উদ্দেশ্য নয়? তাঁর দর্শন হলে আর কি বাকী থাকে, সকল আশা পূর্ণ হয়। প্রকৃত ব্রহ্মকাম তাঁহাকে পাইয়া কৃতার্থ তাঁহাকে পাইয়া সুখী হন। ব্রহ্মোপাসকদিগের সকলেরই চিরদিন যেন এই প্রার্থনা অব-লম্বন হয়।

অপরাহ্নে নগরসংকীর্ত্তন বাহির হয়; ওয়েলিংটন স্কোয়ারে সংকীর্ত্তন আরম্ভ হইবার কথা ছিল। সুতরাং ৩টার পর হইতে সকলে তথায় গমন করিতে আরম্ভ করি-লেন। সকলে সমবেত হইলে প্রথমতঃ একটী সঙ্গীত হইল। তৎপরে শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় সময়োচিত প্রার্থনা করিলেন এবং তৎপরসকলে উৎসাহের সহিত নিম্ন-লিখিত কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন:—

লোফা।

তোরা আয় আয় রে গাই ব্রহ্ম নাম,
সবে মিলে হৃদয় খুলে গাই রে।
নামে সুধা-সিন্ধু উথলিবে,
মোদের তাপিত হৃদয় জুড়াইবে।

খয়রা।

অমৃত সাগরে, পাইনু অন্তরে,
কেন বা হেলিনু তায়;
(মোহে অন্ধ হয়ে রে)
বিন্দু বারি তরে, কেন মরু-পরে,
ছুটিনু মৃগের প্রায়;
(আশা-মরীচিকায়)
প্রাণের পিয়াসে, সুখের লালসে,
যা কিছু ছুটিয়া ধরি;
(দিশা হারা হয়ে রে)
না ধরিতে তাই, এ কিরে বালাই,
অমনি পলায় সরি;
(আশায় নিরাশ করে)
বুঝিনু এখন, ব্রহ্ম সনাতন,
অমূল্য পরশমণি;
(তাঁর তুলনা নাই রে) (অতুলন প্রেম-মণি)
অনিত্য সংসারে, মরণ-মাঝারে,
সেই ত অমৃতখনি। (মৃত-সঞ্জীবন)

দশকুশি।

(দেখ) দেখরে প্রেম নয়নে, হৃদয়ে হৃদয়-ধনে রে
প্রাণ-সখা প্রাণে বিরাজিত, রে
(প্রাণের প্রাণ হয়ে রে)
সে প্রেমের উৎস হতে, প্রেম ধারা এ জগতে
দশদিশে হয় প্রবাহিত।
(হৃদয় সরস করে রে) (সুনির্মল প্রেমধারে)
সে প্রেমে নিজে পাসরি, সুখ স্বার্থ পরিহরি
কর কর সত্যের সাধন রে।
(হৃদয় মন সঁপে রে) (প্রেমময়ের শ্রীচরণে)
প্রেমে দিব্য জ্ঞান পাবে, বাসনা বিলয় হবে,
নিবে যাবে পাপের দহন রে।
(প্রাণ শীতল হবে রে) (প্রেমময়ের প্রেম-নীরে)

একতালা।

মন ভুলো না, কভু ভুলো না, সেই সৎ স্বরূপে ভুলো না রে;
বিষয়-মোহে ভুলে, ভবে মজো না রে,
সেই সারাৎসারে ত্যজ না রে। (ওরে অবোধ মন)
ছাড় আপনারে, প্রেমে পাবে তাঁরে,
তিনি প্রেমে বাঁধা এ সংসারে। (ও সেই প্রেমময়)

ঝুলন।

মনের সাধে, আজ সবাই মিলে দয়াল বল—
আজ গাহরে ভাই দয়াল নাম, উড়ায়ে নিশান,
গগন কাঁপায়ে কর তাঁরি গুণ গান।
আজ গাহরে ভাই দয়াল নাম অমৃতের সার,
শ্রবণে কীর্ত্তনে প্রাণে অমৃত সঞ্চার।
আজ গাহরে ভাই দয়াল নাম, এ ভবে তরণী,
সংসার-জলধি যাহে অতি তুচ্ছ গণি।
আজ গাহরে ভাই দয়াল নাম, পাপী জনের আশা,
ভগ্ন হৃদয়-বাসী দয়াল এম্‌নি ভালবাসা।
আজ গাহরে ভাই দয়াল নাম, সুখের বারতা,
ঘুচুকরে বিচ্ছেদ প্রাণে জাগুক রে একতা।
আজ গাহরে ভাই দয়াল নাম মিলায়ে হৃদয়,
আজ পাপী তাপী সবাই বল জয় দয়াময়।
মিল—ওরে কিবা মধুর এই দয়াল নাম,
সংসার-মরু-মাঝে শান্তি ধাম প্রাণারাম রে।

ক্রমে কীর্ত্তন দল বাগান ছাড়িয়া রাজপথে আসিয়া উপস্থিত হইল। সকলে গাইতে গাইতে উত্তরাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। ক্রমে তাঁহারা একটী ব্রাহ্ম ভবনের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলে, মহিলাগণ আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। গায়কদিগের মস্তকে রাশি রাশি পুষ্প বর্ষিত হইল। সেখানে কিছুক্ষণ সঙ্গীতের পর আবার সকলে অগ্রসর হইলেন। কীর্ত্তনদল ক্রমে বহুবাজার ষ্ট্রীট, আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট এবং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট হইয়া মন্দিরে আসিয়া উপনীত হইলেন। তৎপরে সকলে উপবেশন করিলে উপাসনা আরম্ভ হইল। শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় আচার্য্যের কার্য্য সম্পাদন করিলেন।

১১ই মাঘ ২৩শে জানুয়ারী মঙ্গলবার।—আজ মাঘের একাদশ দিবস। আজ সেই দিন, যে দিনে চতুঃষষ্টি বৎসর পূর্ব্বে মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় এই মহা নগরীতে বিশ্ববিজয়ী ব্রাহ্মধর্ম্মের বিজয় নিশান প্রোথিত করিয়াছিলেন। আজ সেই দিন, যে দিনে ব্রাহ্মধর্ম্মের মহাকেতু বিশ্বজনীন প্রেমের মৃদুল হিল্লোলে ইতস্ততঃ সঞ্চারিত হইয়া ভারতের, দেশ বিদেশের, সমগ্র জগতের পাপী তাপী নরনারীর প্রাণে শান্তিধারা বর্ষণ করিবার জন্য সকলকে ইহার দিকে সর্ব্ব প্রথমে আকর্ষণ করিতেছিল এবং দুর্ব্বল ও হতাশ্বাস ভারতবাসীর প্রাণে সর্ব্বপ্রথম বল ও আশার সঞ্চার করিতেছিল। আজ সেই দিন যে দিনের কথা স্মরণ করিলে ব্রাহ্মের প্রাণ শিহরিয়া উঠে। আজ সেই মাঘের একাদশ দিবস। আজ মহাযজ্ঞের পূর্ণাহুতি। দশদিন ধরিয়া কুশ-সমিধ আহৃত হইতেছিল; যজ্ঞকুণ্ড নির্ম্মিত হইতেছিল; সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের পুরোহিত পরম পুরুষ অগ্নি প্রজ্জলিত করতঃ পূর্ণাহুতির আয়োজন করিতেছিলেন। এই দিন শীতজনিত ক্লেশ অগ্রাহ্য করিয়া সূর্য্যোদয়ের অনেক পূর্ব্ব হইতে ব্রাহ্মগণ মন্দিরাভিমুখে আসিতে লাগিলেন। একজন, দুইজন, দশজন করিয়া ক্রমে শত শত নর নারী মন্দিরে উপস্থিত হইলেন। অন্ধকার যত বিদূরিত হইতে লাগিল, ততই দেখা গেল যে মন্দির লোকে পরিপূর্ণ। গায়কেরা সঙ্গীত ধরিলেন। স্থানাভাবে বহুসংখ্যক লোককে দণ্ডায়মান হইয়া থাকিতে হইল। আজ আচার্য্য, উপাসক সকলেরই নূতন ভাব। সকলের মুখেই আশা ও উৎসাহের জ্যোতি ফুটিয়া বাহির হইতেছে। সকলেই প্রফুল্ল। সঙ্গীত চলিতেছে কিন্তু অনেকেই উৎসুক মনে উপাসনার আরম্ভ প্রতীক্ষা করিতেছেন। দেখিতে দেখিতে নির্দ্দিষ্ট সময় উপস্থিত হইল। গায়কেরা এতক্ষণ সঙ্গীত করিতেছিলেন কিন্তু এখন নূতন উৎসাহে সঙ্গীত আরম্ভ করিলেন। তৎপরেই উদ্বোধন আরম্ভ হইল। শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় আচার্য্যের কার্য্য করিলেন। আচার্য্য প্রথমে এই মহোৎসবে প্রবেশ করিতে হইলে কি উপকরণ লইয়া যাইতে হয় তাহার বর্ণনা করিয়া, যে মহাপুরুষদিগের আধ্যাত্মিক রক্তে ব্রাহ্মগণের জন্ম, তাঁহাদের তর্পণ করিলেন।

উদ্বোধনের সময় হইতেই উপাসকবৃন্দের ভাবোচ্ছ্বাসের লক্ষণ সকল প্রকাশ পাইতে লাগিল। ক্রমে আরাধনা ধ্যান প্রভৃতির শেষ হইলে, আচার্য্য নিম্নলিখিত উপদেশটী দিলেন।

"ত্যাগেনৈকেনামৃতত্বমানশুঃ।"

পূর্ব্বকালের মহাত্মারা ত্যাগ দ্বারাই ঈশ্বরকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। উপনিষদেরও পূর্ব্বে যে সকল ধার্ম্মিক লোক ছিলেন, তাঁহারা একমাত্র ত্যাগের দ্বারাই অমৃতকে পাইয়া-

ছিলেন। তাই উপনিষৎকার ঋষিগণ বলিতেছেন, আমাদের পূর্ব্বের মহাত্মারা ত্যাগের দ্বারাই অমৃতত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।" মানবাত্মা তো চিরদিনই অমর; ত্যাগের দ্বারা আবার অমর হওয়ার অর্থ কি? উপনিষদে এবিষয়ে উক্ত আছে।

"যদা সর্ব্বে প্রভিদ্যন্তে হৃদয় স্যেহ গ্রন্থয়ঃ
অথ মর্ত্ত্যোঽ মৃত্তোভবত্যেতাবদনুশাসনম্

"যে সময়ে এখানে সমুদায় হৃদয়-গ্রন্থি ভগ্ন হয়, তখনই জীব অমর হয়েন; এইমাত্র উপদেশ জানিবে।" ইহার অর্থ এই, আমরা যখনই অমর, অমৃতত্ব প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার করিব, তখনই বুঝিবে হৃদয়গ্রন্থি হইতে মুক্তি, সমুদয় কামনা হইতে নিষ্কৃতি। কিসের দ্বারা সেই সকল মহাত্মারা অমৃতত্বকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন? ত্যাগের দ্বারা, কেবল ত্যাগের দ্বারা। ত্যাগেনৈকেন। ত্যাগ কাহাকে বলে? অর্থাৎ ছাড়া; কাহাকে ছাড়া? আপনাকে ছাড়া, স্বার্থ নাশ করা কেবল এই পথ ধরিয়া তাঁহারা অমৃতত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। নিবিষ্ট-চিত্তে চিন্তা করিয়া দেখিলে অনুভব করিতে পারা যায়, যে সকল মহাত্মার ও মহাজনের কীর্ত্তি আলোচনা করিয়া থাক, যাঁহাদের অনুসরণ কর, তাঁহারা সকলেই এই ত্যাগের দ্বারাই অমৃতত্ব পাইয়াছিলেন। মহাত্মাদের জীবনের কয়েকটী আশ্চর্য্য লক্ষণ আছে, যাহা চিন্তা করিলে তাঁহাদিগকে আর সাধারণ মনুষ্য মনে করা যায় না। তাহার কতিপয় লক্ষণ নির্দ্দেশ করিতেছি।

প্রথম জীবের প্রতি অপূর্ব্ব প্রেম। বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বীরা বলেন, শাক্যসিংহ মুক্তাত্মা, তথাপি তিনি যে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, সে কেবল জীবের প্রতি অনুগ্রহের জন্য। জরা-মরণের হস্তে মানবের নিগ্রহ দেখিয়া তাঁহার হৃদয় এত ব্যথিত হইয়াছিল যে তাহার জন্য এই ক্লেশ বহন করিয়াছিলেন। খ্রীষ্টয়ানগণ বলেন যীশু স্বয়ং পরমেশ্বর; তিনি যে এত যন্ত্রণা সহ্য করিয়া জীবন দিলেন, সে কেবল জীবানুগ্রহের জন্য। এই জীবানুগ্রহ সকল মহাত্মার লক্ষণ। এই জীবানুগ্রহের গভীরতার বিষয় চিন্তা করিলে উহাঁদিগকে আর সাধারণ মনুষ্য বলা যায় না। আমাদের প্রেমের প্রকৃতি এই যে ব্যক্তি প্রেমাস্পদ, সুন্দর, কোমল, এবং অনুরাগশীল, তাহার উপরই যায়। কিন্তু যেখানে কদর্য্যতা, দুর্গন্ধ, অসাধুতা, সেখানে আমাদের প্রেম গিয়া আলিঙ্গন করে না। বরং যে পাপী তাহাকেও প্রেম করা যায়, কিন্তু যে প্রেমের পরিবর্ত্তে অপ্রেম দেয়, কৃতঘ্ন হইয়া অপকার করে, তাহাকে প্রীতি করা আমাদের সাধ্যায়ত্ত নয়। সাধুদের মহত্ত্ব দেখুন, যে হস্ত আঘাত করিতেছে, তাহাকে প্রেম দিয়াছেন। ঈশা, বুদ্ধ প্রভৃতি বড় বড় নাম অন্বেষণ করিতেছি কেন, মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় লিখিয়াছেন যে পৌত্তলিকতা দেখিয়া তাঁহার প্রাণ এতই ব্যথিত হইয়াছিল যে ইহার উচ্ছেদের জন্য অর্থ সামর্থ্য শরীর,ধন, সমুদয় নিয়োগ করিয়াছিলেন। যে জাতি তাঁহাকে উৎপীড়ন করিয়াছে, নগণ্য লোকের ন্যায় ব্যবহার করিয়াছে,পাষণ্ডের ন্যায় পরিত্যাগ করিয়াছে, অপমান করিয়াছে, তাহারই উদ্ধারের জন্য অর্থ সামর্থ্য শরীর, বল সমুদয় নিয়োগ করিলেন। ইংলণ্ডে ভজনালয়ে গেলে, উপাসনা কালে রাজার চক্ষু দিয়া জলধারা পড়িত। সেখানকার উপাসকগণ কারণ জিজ্ঞাসা করিলে বলিতেন "উপাসনার যোগ দিতে গেলে, দেশের লোকের জন্য আমার প্রাণ ব্যাকুল হয়।" কি প্রেম! "যার খরতর শরে জর জর, তাহারি কল্যাণ অন্তরের ধ্যান" এ যদি মহত্ব না হয় তবে আর মহত্ব কোথায়? মহাত্মাদিগের প্রেম, ও জীবানুগ্রহ অসাধারণ।

মহাত্মাদিগের আর একটী লক্ষণ আশা। ঈশ্বরের উপর ও মানুষের উপর আশা অসাধারণ। ঈশ্বরের উপর আশা করা বড় কঠিন নয়। কিন্তু মানুষের উপর আশা করা বড় কঠিন। পৃথিবীর পাপ তাপ দুর্গতি ইহাঁরা যেমন দেখেন অন্য লোক এমন দেখে না। ইহাঁরা লোকের নিকৃষ্টতা যেমন অনুভব করেন, অন্য লোক তেমন করে না। অথচ ইহাঁরা মানুষের উপর আশাহীন হইতেন না। যদি মানুষের উপর বিশেষ আশা না থাকিত তবে আর ধর্ম্মপ্রচার করিতেন না। বিশ্বাস না থাকিলে কি আর তাহাদের কাছে গিয়া ধর্ম্মের কথা বলিতে পারিতেন? আমরা দেখিতে পাই অনেক নরহিতৈষী লোক মানুষের পাপ ও দুর্নীতি দেখিয়া দেখিয়া তাহাদের উপর আশা ও বিশ্বাস একেবারে হারাইয়া ফেলিয়া,শেষে নরবিদ্বেষী হইয়াছেন। কিন্তু ইহাদের কার্য্য দেখ! এত দুর্গতি, এত পাপ দেখিয়াও মানুষের উপর কত আশা রাখিতেন! আবার দেখ আশা রাখিতেন কোথায়! বড় ক্ষমতাশালী, সম্ভ্রমশালী যে সকল লোক, তাহাদের উপরে কি আশা রাখিতেন? তাহা নয়। পৃথিবী যাহাদের অগ্রাহ্য করিয়াছে, সেই দুর্ব্বল, অশিক্ষিত জেলেমালার মুখের দিকে তাকাইয়া ইহাঁরা কি এক আশা পাইলেন। একটী বড় বাড়ী তৈয়ারি করিবার জন্য অনেক ইট কাঠ সংগ্রহ করা হইয়াছে। মিস্ত্রীরা ভাঙ্গা ইটগুলিকে দূরে ফেলিয়া দিতেছে। তখন একজন নূতন কারিকর আসিয়া বলিলেন "ও কি করিতেছ, আসল জিনিস যে ফেলিয়া দিতেছ! ঐ ভাঙ্গা ইটগুলিই যে মজবুত ইট!" মহাজনেরা ঠিক এই রকমে, আমরা যে সকল ইট কাট অকর্ম্মণ্য বলিয়া ফেলিয়া দি, তাহাই লইয়া অট্টালিকা প্রস্তুত করেন। ইহাঁদের চক্ষু আছে, ইহাঁরা আমাদের চক্ষু দিয়া দর্শন করেন না। ইহাঁরা সেই ভাঙ্গা ইটের মধ্যে এমন কিছু দেখিতে পান যাহা আমরা দেখিতে পাই না। ঈশ্বরের উপর ইহাঁদের কেমন আশা! যখন চারিদিক প্রতিকূল, তখনও আশা ছাড়েন নাই! যীশুর শত্রুগণ যখন চারিদিকে বাড়িতে লাগিল, যখন তাঁহার শিষ্যদিগের উপর অত্যাচার উৎপীড়ন হইতে লাগিল, তখন তিনি কয়েকজন শিষ্যকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "Will ye also go away?" তিনি তখন তাহাদিগকেও ছাড়িতে প্রস্তুত? তার পর ঐ বারজনও ছাড়িয়া গেল। একাকী যখন তাঁহাকে হত্যা করিতে লইয়া যায় তখনও তিনি স্বর্গরাজ্যের প্রসঙ্গই করিতেছেন।

তৃতীয় অপূর্ব্ব সাহস। এই অপূর্ব্ব সাহস অনেক মহাত্মার জীবনেই দেখা গিয়াছে। সমুদয় দেশ ও জাতি যখন প্রতিকূল, তখনও তাঁহারা নির্ভীকচিত্তে দণ্ডায়মান থাকিতেন। মহম্মদ যখন ধর্ম্মপ্রচারে প্রবৃত্ত হইলেন, তখন দেশের সমুদয় লোক

বিরুদ্ধে দাঁড়াইল। মহম্মদের খুড়া মহম্মদকে অতিশয় ভাল বাসিতেন। তাঁহার বিরোধীরা তাঁহার খুড়ার কাছে গিয়া বলিল "আপনার ভ্রাতুষ্পুত্র এ দেশে অরাজকতা উপস্থিত করিয়াছে। সে দেবতাদিগকে বিদ্রূপ করিতেছে। লোকদিগকে দেবতার উপাসনা হইতে নিবৃত্ত করিতেছে। সমস্ত দেশের লোক উহার উপর খড়্গহস্ত হইয়াছে; কেবল আপনাকে শ্রদ্ধা করে বলিয়া এখনও কিছু করে নাই।" সুতরাং আপনাকে বলিতেছি আপনি শীঘ্র উহাকে নিবৃত্ত করুন নতুবা, জানিবেন, উহার জীবন রক্ষা করা ভার হইবে। মহম্মদের খুড়া মহম্মদকে ডাকিয়া বলিলেন, "মহম্মদ আমি তোমার বাল্যকাল হইতে প্রতিপালন করিয়াছি, এতদিন তোমাকে সন্তানের ন্যায় স্নেহে রক্ষা করিয়া আসিয়াছি। কিন্তু এখন আর তোমাকে আমার পক্ষপুটে রাখা অসম্ভব হইয়াছে; আমি স্নেহের অনুরোধে বলিতেছি তুমি নিবৃত্ত হও।" মহম্মদ খুড়ার নিকটে অত্যন্ত বিনীত ভাবে কথা বলিতেন, সর্ব্বদা অবনত মস্তকে চলিতেন। তাঁহার এই অনুরোধ শুনিয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "আমার এক হস্তে সূর্য্য আর এক হস্তে চন্দ্র আনিয়া দিলেও নিবৃত্ত হইব না।"

এই আশা ও সাহসের মধ্যে কি দেখা যায়? ত্যাগেনৈকেনামৃতত্বমানশুঃ,এমন একটী গুণ ইহাঁদের ছিল যাহার জন্য যে সত্য জানিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে নিজকে ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। কে পক্ষ কে বিপক্ষ তাহা গণনা করিবার অবসর হয় নাই। তাঁহাদের মানবের প্রতি যে বিশ্বাস তাহার মূলে এই। ঈশ্বরের হাতে সমস্ত সমর্পণ করিয়া দিয়াছিলেন, বলিয়াই মানবে এমন বিশ্বাস ও এমন সাহস। যদি মনে করিতেন সত্যের জয় পরাজয় আমার উপর নির্ভর করে, তবে নিজের দুর্ব্বলতা দেখিয়া নিরাশ হইতেন। ত্যাগের দ্বারা, আত্মসমর্পণের দ্বারা, সত্যের হাতে নিজেকে ছাড়িয়া, সেই বল পাইয়াছিলেন। তাঁহারা দেখিয়াছিলেন যেমন পৃথিবীতে মাধ্যাকর্ষণ সমুদয় পদার্থকে স্ব স্ব স্থানে প্রতিষ্ঠিত রাখিয়াছে, তেমনি পরমেশ্বরের শক্তি ধর্ম্মকে প্রতিষ্ঠিত রাখিয়াছে। সে জন্য ঈশ্বরের হাতে তাঁহারা আপনাদিগকে সমর্পণ করিয়াছিলেন। এজন্যই তাঁহাদিগের বাসনা বিলয় হইয়াছিল। সত্যের চিন্তনে, লোকভয় ও ক্ষুদ্রাশয়তার বন্ধন সমুদায় ছিন্ন হইয়াছিল। Know the truth and the truth shall make you free. সত্যের প্রেমে মানুষ আপনাকে ছাড়িয়া দিলে, তবে স্বাধীন হয়। তাঁহারা সত্যে আপনাকে দিলেন বলিয়া বল, আশা, সাহস পাইলেন, নবজীবন পাইয়া সত্যের বলে বলী হইলেন। মানবের অমরত্ব ত্যাগ ভিন্ন হয় না। যদি কোন মন্ত্র জপ করিতে হয় তবে এই মন্ত্র জপ কর "ত্যাগেনৈকেনামৃতত্বমানশুঃ।" ঈশ্বরের নাম যতই করি না কেন, বার বার উপাসনা করি না কেন, ত্যাগ,—ত্যাগ,—ত্যাগ ভিন্ন অমৃতত্ব পাওয়া যাইবে না। যিনি যে পরিমাণে স্বার্থনাশে প্রস্তুত, তিনি সেই পরিমাণে ধর্ম্মলাভে ইচ্ছুক, তিনি সেই পরিমাণে অমৃতত্ব লাভের অধিকারী; নতুবা অমৃতত্ব পাওয়া যাইবে না; স্বার্থনাশের ভাব না আসিলে বড় বড় কথা ও বাহিরের সাধন মাতালের নৌকা চালান'র মত; নৌকা বাঁধিয়া রাখিয়া সারারাত্রি দাঁড় টানার মত। ধর্ম্মপ্রচার সম্বন্ধেও সর্ব্বদা এই কথা স্মরণ রাখিতে হইবে। ধর্ম্মের কথা কি লোকের কাণের কাছে বলিলেই হইল? মনে করিলে এক মাসের মধ্যেই এই কলিকাতা সহরের সকল লোককে ব্রাহ্মধর্ম্মের কথা শুনাইতে পারি। ব্যাণ্ড বাজাইয়া, বিজ্ঞাপন দিয়া পাড়ায় পাড়ায় মিটীং করিয়া কীর্ত্তনের দল বাহির করিয়া, অতি সহজেই এক মাসের মধ্যে ব্রাহ্মধর্ম্মের নাম সহরের সকল লোকের কাছে পৌঁছাইয়া দিতে পারি। কিন্তু তাহাতে কি হইবে? ব্রাহ্মধর্ম্মের কথা শুনাইলেই কি ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার হইল? প্রচারের অর্থ কি? "একমাত্র ঈশ্বরই উপাস্য, তাঁহার উপাসনা ও প্রার্থনা করা উচিত, জাতিভেদ রাখিতে নাই," ইত্যাদি কথা কয়টা শুনানই কি প্রচার! যদি এই প্রচার হয়, তবে তা কঠিন নয়। কিন্তু প্রচারের অর্থ যদি মানুষের মন বদ্‌লান হয়, ব্রাহ্ম হইয়া যাওয়া, যদি স্বার্থপরের নিঃস্বার্থ হওয়া, বিষয়াসক্তের বিষয়াসক্তি শূন্য হওয়া হয়, তবে, আপনারা বলুন দেখি, কাকে তাহা হইতেছে কি না? দুজন লোকের মন বদ্‌লাইবার ভার দিলে আমি নাচার। এই পনর বৎসরের মধ্যে আমি তো অনেক বক্তৃতা করিয়াছি, অনেক উপদেশ দিয়াছি, ভারতবর্ষের প্রায় সকল স্থানেই গিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মের নাম শুনাইয়া আসিয়াছি। কিন্তু ভাই রে, ক'জনের হৃদয় বদ্‌লাইয়াছি? যদি কাহারও হৃদয় বদ্‌লাইবার সাহায্য হইয়া থাকে তবে পরমেশ্বরকে ধন্যবাদ দিই, তবে মনে করি, আমার প্রচারক হওয়া সার্থক হইয়াছে। দশ জন লোকের যদি হৃদয় বদ্‌লাইয়া থাকে তবে জীবন সার্থক মনে করি। কিন্তু দশ হাজার লোক যে আমার বক্তৃতা শুনিয়াছে, তাহাতে প্রচার হয় নাই। যদি পাপের প্রতি ঘৃণা জন্মাইয়া দেওয়া, হৃদয় পরিবর্ত্তন হওয়া প্রচার হয়, তবে দেখ সে প্রচারক কে আছে! বক্তৃতা বেশ করিতে পারিব, আধ্যাত্মিক বিষয়ের কূট প্রশ্ন সকল জিজ্ঞাসা কর, বেশ পরিষ্কার মীমাংসা করিয়া দিব; যদি জিজ্ঞাসা কর "যোগ কাহাকে বলে?" তবে বেশ বুঝাইয়া দিতে পারিব। কিন্তু ভাই, আমাকে যদি জিজ্ঞাসা কর, আমার যোগ কতটা হইয়াছে, তবে যে লজ্জা পাই। ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার কি কথায় হইবে? যদি দেখ যে ব্রাহ্মধর্ম্মের জন্য স্বার্থনাশ করিতে প্রস্তুত, ইহার জন্য কিছু stake করিতে প্রস্তুত, তবে আমি বলি, তাহার দ্বারা প্রচার হইবে। যদি নিজের স্বার্থ, সুখের পথটী বেশ পরিষ্কার রাখিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিতে যাও, সে রকম করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার হইবে না। রেখে দাও ও বক্তৃতা; স্বার্থনাশ, স্বার্থনাশ, স্বার্থনাশ—ত্যাগেনৈক,—ত্যাগ হইলেই হয়। ইহার দৃষ্টান্ত জগতে যথেষ্ট। শিখ ধর্ম্মের এত প্রতাপ হইল কেন? শিখদিগের দশম গুরু গোবিন্দ সিংহ একবার শিখধর্ম্মের উন্নতি চিন্তায় নির্জ্জন পর্ব্বতে ধ্যানে নিমগ্ন হইলেন। কিছুদিন পরে আসিয়া সকল শিখকে সমবেত করিয়া উন্মুক্ত তরবারি হস্তে লইয়া বলিলেন—"দেবীর এই আদেশ হইয়াছে—শিখধর্ম্মের রক্ষার জন্য একশত মানুষের মাথা চাই; কে শির দিবে এস; আমি এই তরবারিতে তাহার মাথা কাটিয়া দেবীর কাছে লইয়া যাইব।" এই বলিয়া বারবার চীৎকার করিয়া ডাকিতে লাগিল।

৩১১নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট ব্রাহ্ম মিশন যন্ত্রে শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দত্ত কর্তৃক মুদ্রিত ও ১১ই ফাল্গুন প্রকাশিত।

ধর্ম্ম ও সমাজতত্ত্ব বিষয়ক পাক্ষিক পত্রিকা।

২০শ সংখ্যা।
১৬শ ভাগ।

১লা ফাল্গুন, সোমবার, ১৮১৫ শক, ব্রাহ্ম সম্বৎ ৬৫।

বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২॥০
মফস্বলে ৩
প্রতি খণ্ডের মূল্য ৵০

মাঘোৎসব।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

কিন্তু কেহই অগ্রসর হইল না। তখন গোবিন্দ সিংহ বলিলেন "আচ্ছা, একশত জন না হউক, পঞ্চাশ জন এস।" পঞ্চাশ জনও আসিল না। তখন তিনি দুঃখিত হইয়া বলিলেন "শিখ ধর্ম্মের জন্য প্রাণ দিতে পারে এমন পঁচিশ জন লোক কি নাই? এস, পঁচিশ জনও এস"। তখনও কেহ অগ্রসর হইল না। তখন নিরাশ হইয়া গুরু গোবিন্দ সিংহ বলিলেন "দশজন, দশজন,"। তখনও কেহ আসিল না। তখন গোবিন্দ সিংহ বলিলেন "দশজন না হয় পাঁচ জন এস।" যখন পাঁচজনও আসিল না, তখন গুরুগোবিন্দ অস্থির হইয়া উঠিলেন। নিরাশায় উত্তেজিত কণ্ঠে বলিলেন "শিখধর্ম্মের জন্য মাথা দিতে পারে এমন একজন লোকও কি নাই? শিখধর্ম্ম গেল যে! শিখধর্ম্মের রক্ষার জন্য কেহ কি প্রাণ দিতে পার না?" তখন একজন সরলমতি জাঠ দণ্ডায়মান হইল। গুরু গোবিন্দ সিংহের ন্যায় লম্ফ দিয়া তাহার চুল ধরিয়া টানিয়া লইয়া চলিলেন। নিকটে এক তাঁবু ছিল, তাহার মধ্যে লইয়া গিয়া তাহাকে সুসজ্জিত পালঙ্কে বসাইলেন, বসাইয়া তাহার পদধূলি লইলেন। তাঁবুর ভিতরে তাহাকে বসাইয়া রাখিয়া একটা পাঁঠা কাটিলেন, তাহার রক্ত গড়াইয়া তাঁবুর বাহিরে চলিল। তখন সেই রক্তাক্ত তরবারি হস্তে লইয়া বাহিরে গিয়া বলিলেন "আর চারি জন চাই, আর চারি জন হইলেই হইবে।" সমবেত লোকেরা সেই রক্তাক্ত তরবারি ও সেই রক্তের ধারা দেখিয়া অনুমান করিল সেই ব্যক্তিকে কাটা হইয়াছে। এইবার গুরুগোবিন্দ সিংহের আহ্বান শুনিয়া আর একজন অগ্রসর হইল, তাহাকেও ঐরূপ চুলে ধরিয়া তাঁবুর ভিতরে লইয়া পালঙ্কে বসাইলেন, তাহারও পদধূলি লইলেন, এবং আগের বারের মত আর একটী পাঁঠা কাটিলেন। এইরূপে পাঁচ বার গেলেন, পাঁচবারে পাঁচজন লোক তাঁহার আহ্বানধ্বনি শুনিয়া জীবন দিতে অগ্রসর হইলেন। তিনি তাঁবুর ভিতরে সেই পাঁচ জনকে একত্র করিয়া তাঁহাদিগকে আলিঙ্গন করিলেন ও বলিলেন "আজ হইতে তোমরা প্রত্যেকে গুরুগোবিন্দ সিংহ, আজ হইতে আমরা ছয় জন গুরুগোবিন্দ সিংহ হইলাম।" এই ছয় জন গুরুগোবিন্দ সিংহের দ্বারাই শিখধর্ম্ম জীবন পাইল। এই ছয় জনের জীবনই সমগ্র শিখমণ্ডলীর মধ্যে জীবন উৎপন্ন করিল। তাই বলি স্বার্থনাশ না হইলে শক্তি জাগে না। আমি অনেক দিন বসিয়া চিন্তা করিয়াছি, খ্রীষ্টধর্ম্মের জয় কিরূপে হইল? এ প্রশ্ন আজও আমার ভালরূপে মীমাংসা হয় নাই। খ্রীষ্টধর্ম্মের অভ্যুদয় কালে দেখিতে পাই, দুইটী প্রবল পরাক্রান্ত শক্তি ইহার প্রতিকূলে ছিল—এক গ্রীসের সভ্যতা, আর এক, রোমের রাজশক্তি। এত বড় দুইটী শক্তিকে কিসে পরাস্ত করিল? শক্তি ছাড়া শক্তিকে অন্য কিছুতে বাধা দিতে পারে না। কোথায় সে শক্তির জন্ম, যাহা এই দুইটী পরাক্রান্ত শক্তিকে বাধা দিতে ও জয় করিতে সমর্থ হইয়াছে? বাইবেলে এই প্রশ্নের উত্তর কি নাই? এই দেখিতে পাই যে খৃষ্টের শিষ্যগণ নিঃস্বার্থতার মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। তখন যে খ্রীষ্টান হইত, তাহারই যথাসর্ব্বস্ব বিক্রয় করিয়া সাধারণ ধনভাণ্ডারে দিতে হইত। আজ যদি ব্রাহ্মসমাজে নিয়ম করা যায় যে আয়ের দশ ভাগের এক ভাগ দিতে হইবে, নতুবা ব্রাহ্মসমাজের সভ্য হওয়া হইবে না, তবে কেমন সভ্য হয় দেখি? তার পর এই নিঃস্বার্থতা পদে পদে। প্রেরিতদিগের বিরুদ্ধে একবার অভিযোগ হয় যে বিধবাদের সমুচিত পরিচর্য্যা হইতেছে না। তাঁহারা কি এই অভিযোগ শুনিয়া অভিমান করিলেন? তাহারা কি বলিলেন কি, এত বড় আস্পর্দ্ধা, যাহারা ঈশ্বরের প্রেরিত, তাহাদের নামে আবার অভিযোগ?" তাহা করিলেন না। সমুদয় মণ্ডলীকে ডাকিয়া সমবেত করিলেন; বলিলেন "আমরা বাস্তবিকই এই কাজ করিতে পারিয়া উঠিতেছি না; তোমরা লোক পছন্দ করিয়া দেও।" এই কথা শুনিয়া সমুদয় অপ্রেম ও অভিযোগ নির্ব্বাণ হইল। ইহাদিগের স্বার্থ বিনাশ পদে পদে। ইহাতেই তো শক্তি জাগিয়া উঠিল। ব্রাহ্মসমাজ যে এতদিন জাগিয়া আছে তাহার কারণ কি? তাহার কারণ কি এই যে তুমি আমি ও আর দশজনে বক্তৃতা ও উপদেশের দ্বারা ইহাকে রক্ষা করিতেছি? তাহা নয়; যে দু একজন লোক ইহার জন্য স্বার্থত্যাগ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের সেই ত্যাগের ফলেই ইহা এতদিন বাঁচিয়া আছে। রাজা রামমোহন রায় যখন ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিতে আরম্ভ করেন, তখন সহরের অনেক বড়লোক তাঁহার সঙ্গে জুটিয়াছিলেন। কেহ কেহ বলেন রাজার এ সম্বন্ধে একটা Policy ছিল। তিনি বড় লোকদিগকে হাতে রাখিতেন। কিন্তু বড় লোক তো অনেক জুটিয়াছিল, তাহাতে কি হইল? তাহারা কি ব্রাহ্মসমাজ রাখিয়াছে? রাজা যখন ইংলণ্ডে চলিয়া গেলেন, তখন আর তাদের উদ্দেশ পাওয়া গেল না।

কিন্তু একজন দরিদ্র ব্রাহ্মণ রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ যিনি ব্রাহ্মসমাজের প্রতি প্রেমে আবদ্ধ ছিলেন যিনি শ্মশানে প্রদীপ জ্বালিয়া বৎসরের পর বৎসর অপেক্ষা করিতেছিলেন—তাঁহার জীবনের দ্বারা ব্রাহ্মসমাজ জীবিত রহিল। তাঁহার জীবন স্বার্থত্যাগের দৃষ্টান্ত। আর তারপর মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ যিনি ইচ্ছা করিলে বড় লোকদের মধ্যে নিশ্চয় স্থান পাইতে পারিতেন, যিনি ইচ্ছা করিলে আজও British Indian associationএর secretary থাকিতে পারিতেন—একজন রাজা মহারাজা হইতে পারিতেন—তাঁহার দৃষ্টান্ত দেখ! তিনি প্রাণ দিয়া ব্রাহ্মসমাজকে ধরিলেন, অর্থ, সামর্থ্য, সমুদয় ইহার জন্য নিয়োগ করিলেন। তারপর কেশবচন্দ্র—ইনি ইচ্ছা করিলে টাকশালের দেওয়ান হইতে পারিতেন, তাহা না করিয়া স্বার্থে জলাঞ্জলি দিয়া ব্রাহ্মসমাজকে প্রাণ দিয়া ধরিলেন। তাঁহার সঙ্গের প্রচারকগণ প্রত্যেকে নিজের নিজের স্বার্থ ও সুখের আশা পরিত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মসমাজকে রাখিয়াছেন। সেই জন্যই বলি, "ত্যাগেনৈকেনামৃতত্বমানশুঃ—" এই স্বার্থ নাশ ব্যতীত শক্তি হইবে না, বাসনা বিলয় হইবে না। যার যত স্বার্থনাশ, তার ততটা শক্তি জাগিবে। ভাল কথা শাস্ত্রে ঢের আছে, তুমি বিশ পঁচিশ বৎসর বক্তৃতা করিয়া তাহার বেশী কিছু বলিতে পারিবে না। কিন্তু সত্যকে জীবন দিয়া ধরা চাই। প্রাণ দিয়া না ধরিলে সত্যের শক্তি হয় না। বিধাতা ব্রাহ্মসমাজের উপর এই ভার দিয়াছেন, সত্য মুখে বলা নয়, সত্যকে জীবন দিয়া ধরা। "অমূল্য রতন, অমূল্য রতন" তো কত বলিয়াছি। রত্ন কি বুঝিতেছি? ব্রাহ্মধর্ম্মকে রত্ন বলিয়া কি বুঝিতেছি। ইহা কি এমন জিনিস হইয়াছে, যে জন্য আপনাকে দিতে পারি? ব্রাহ্মসমাজে তো অনেক যুবক যুবতী আছেন, সকলেই কি সংসারের পথে চলিবেন? তোমরা ব্রাহ্মসমাজে আসিয়াও কি সকলেই—সকলেই—সংসারের পথে চলিবে? ব্রাহ্মসমাজকে প্রাণ দিয়া কি একজনও ধরিবে না? কেবল দৃষ্টান্ত শুনাই সার হইল? আমরা অহঙ্কার করিয়া যাহাদের সম্বন্ধে বলি যে তাহারা উপধর্ম্মের সেবা করে, তাহারা তো তাহাদের ধর্ম্মের জন্য জীবন দিতে পারে, আর আমরা পারি না? সত্যের জন্য প্রাণ দিতে পারে এমন কি কেউ নাই? একটু স্বার্থ ছাড়িলে কি জীবন সার্থক হয় না? শরীরের শক্তি কত বৃথা কাজে যাইতেছে, ঈশ্বরের সেবায় গেলে কি সার্থক হয় না? তিনি কি এতটুকুও প্রিয় নন? তবে কি প্রচার করি? কি উৎসব করি? প্রভু পরমেশ্বর আজ লজ্জা দিন, লজ্জা দিন। সত্যে প্রাণ না দিলে স্বাধীন হইব না। তবে এই প্রার্থনা করি। আজ উৎসবের দিনে হৃদয় দেখি, কতটুকু ছাড়িতে প্রস্তুত। বড় বড় কথা সকল আমাদের বলা আর ভাল দেখায় না। এসকল কথার গুরুত্ব গেল. আমাদের হাতে পড়িয়া কথাগুলির গুরুত্ব গেল। "স্বার্থনাশ" "স্বার্থনাশ বলিয়া কথাটার গুরুত্ব গেল। ছোট ছোট স্বার্থ ছাড়ি দেখি। তিনি এই প্রতিজ্ঞার উদয় করিয়া দিন যে ছাড়িব। নতুবা তাঁহার ধর্ম্মের শক্তি জাগিবে না।

প্রায় দশটার সময় উপাসনা শেষ হইল। কিন্তু তখনও সঙ্গীত, কীর্ত্তন চলিতে লাগিল। আজ আর কাহারও ছাড়িয়া যাইতে ইচ্ছা করে না। ১টার সময় আত্মচিন্তা আরম্ভ হইল। কিন্তু ইহার পূর্ব্বে অল্প সময়ের জন্য সঙ্গীতাদি বন্ধ নাই। ঘটিকা হইতে পাঠব্যাখ্যা ইত্যাদি চলিতে লাগিল। মধ্যাহ্নে আত্মচিন্তার সময় মন্দিরে বেশী লোকের সমাবেশ ছিল না। কিন্তু পাঠব্যাখ্যার সময় হইতে আবার মন্দিরাভিমুখে জনস্রোত প্রবাহিত হইতে লাগিল। অপরাহ্ন ৪টার সময় মন্দির পূর্ণ হইয়া উঠিল।

প্রথমতঃ শ্রীযুক্ত বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় নানা শাস্ত্র হইতে বচন উদ্ধার করিয়া ব্যাখ্যা করিলেন, তৎপরে শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় উপনিষদের কয়েকটী শ্লোক পাঠ করিয়া ব্যাখ্যা করিলেন। তারপর তিনি ভক্তিভাজন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের প্রেরিত একটী উপদেশ পাঠ করিলেন। মহর্ষি তাহার অসুস্থতা বশতঃ স্নেহাস্পদ ব্রাহ্মগণের সহিত মিলিত হইয়া মাঘোৎসব সম্পন্ন করিতে পারেন না। এই জন্য তিনি উপদেশ ও আশীর্ব্বাদ প্রেরণ করিয়াছিলেন। উহা পাঠ করিয়া সেই কয়টী কথা সর্ব্বদা স্মরণ রাখিবার জন্য শাস্ত্রী মহাশয় সকলকে অনুরোধ করিলেন। উপদেশ ও আশীর্ব্বাদ নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

ওঁতৎসৎ

আয়ুষ্মন্!

ঈশ্বর তোমার কল্যাণ সাধন করুন। তাঁহার শরণাপন্ন হইয়া কুশলে সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ কর। হৃদয়ের শ্রদ্ধা ভক্তি প্রস্ফুটিত করিয়া দিনান্তে নিশান্তে তাঁহার পূজা কর। তাঁহার নিকটে অনুক্ষণ শুভ বুদ্ধি ও ধর্ম্মবল প্রার্থনা কর—তিনি "মহদ্ভয়ং বজ্রমুদ্যতং," তাঁহাকে ভয় কর, তবে আর লোকের ভয় থাকিবে না। "রসো বৈ সঃ," তিনি স্নেহের আকর, প্রেমের সাগর—তাঁহাকে প্রীতি কর, তাহা হইলে সকলের প্রিয় হইবে। বিপদে পড়িয়া, রোগে শোকে কাতর হইয়া তাঁহার নিকটে ক্রন্দন কর, তিনি তোমাকে বিপদ হইতে রক্ষা করিবেন, তোমার অশ্রুজল মার্জ্জনা করিবেন। পাপে পতিত হইলে সেই পতিতপাবনের নিকট সন্তপ্তচিত্তে ক্ষমা প্রার্থনা কর—এমন কর্ম্ম আর করিব না, এই কথা মনের সহিত বল—তাহা হইলে তিনি তোমাকে ক্ষমা করিবেন—পাপ হইতে মুক্ত করিবেন। যখন সম্পদের হিল্লোলে বিচরণ করিবে, তখন তাঁহাকে ভুলিও না। সেই সময়ে তোমার হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা তাঁহার সিংহাসনের প্রতি উত্থিত হউক। তাহা হইলে আপনার ক্ষমতার প্রতি আর অভিমান থাকিবে না। তোমার প্রতি আমার এই উপদেশ, তোমার প্রতি আমার এই আশীর্ব্বাদ।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

অদ্যকার ভাব লিখিয়া বর্ণনা করা যায় না। না দেখিলে প্রাণ তৃপ্ত হয় না। সন্ধ্যা পর্য্যন্ত এইরূপ চলিল। সন্ধ্যার পর সায়ংকালীন উপাসনা আরম্ভ হইল। শ্রীযুক্ত বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় আচার্য্যের কার্য্য করিলেন। এসময় মন্দিরে কিছু

মাত্র স্থান ছিল না। অনেকে মন্দিরে প্রবেশ করিতে পারেন নাই। বহুলোকের সমাগম হওয়াতে মন্দিরের এক অপূর্ব্ব দৃশ্য হইয়াছিল। অতি উৎসাহে ও আনন্দের সহিত উপাসনা শেষ হইল। উপাসনার পর শ্রীযুক্ত বাবু বসন্তকুমার চৌধুরী সস্ত্রীক ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেন। দীক্ষান্তে আচার্য্য নিম্নলিখিত উপদেশটী প্রদান করিলেন।

"আজ যাঁহারা প্রকাশ্যরূপে এই মাঘের ১১ দিবসে পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষাগ্রহণ করিতেছেন, তাঁহাদের জীবনে ইহা একটী সুমহৎ ও অতি গুরুতর ব্যাপার। ইহা গ্রহণ করিয়া তাঁহারা তাঁহাদের মস্তকে একটী গুরুতর দায়িত্ব লইতেছেন। যে ধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন সে ধর্ম্মের প্রতি আমাদের দেশের লোকের কিরূপ ভাব তাহা তাঁহারা বিশেষ অবগত আছেন। এই ধর্ম্মের, এই ব্রাহ্মসমাজরূপ আন্দোলনের বিরুদ্ধে দেশের শত শত লোক খড়্গহস্ত। দেশের প্রচলিত মত, বাহ্যিক ক্রিয়াকাণ্ড এবং যে সকল কুসংস্কার দেশমধ্যে প্রচলিত আছে, তাহার বিরুদ্ধে আন্দোলন করিয়া আমরা দেশের লোকের দ্বারা ঘৃণিত ও অশেষ প্রকারে লাঞ্ছিত হইয়াছি। হে ভাই, হে ভগ্নি, এই ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া সমাজের লোকের নিকট প্রীতিলাভ করিবে, আশা করিও না। এখন একমাত্র লোকের ঘৃণা ও অত্যাচার সহ্য করিবার জন্য প্রস্তুত হও। কিন্তু হৃদয়নিহিত বিবেক, পরমেশ্বরের সাক্ষাৎ বাণী অনুসরণ করিয়া চলিবার চেষ্টা করিবে। লোকের নিন্দা বা প্রশংসার দিকে দৃষ্টি করিবে না। সত্যেই জীবন, আজীবন সত্যকে ধারণ করিয়া তোমাদের নিজ নিজ বিবেকের অনুসরণ কর। লোকের নিন্দা কয় দিনের জন্য, আমরা কয় দিনের জন্য এ সংসারে আসিয়াছি। সত্যের জন্যই জীবন, সত্যই গমাস্থান। নিন্দা বা প্রশংসা কিছুই নয়। পরমেশ্বর লক্ষ্য। তিনিই সহায়। জয় পরমেশ্বরের জয়। কিছু ভয় নাই। মানুষ কিছুই নয়। মানুষ কীটাণুকীট। আজ যদি প্রচলিত ধর্ম্মের, মিথ্যা কুসংস্কারের পক্ষ অবলম্বন করিয়া তাহার গুণকীর্ত্তন করি দেশের লোক কত আদর করিবে। কিন্তু সে আদর অভ্যর্থনা আমরা চাই না। দূর হউক কুসংস্কার, দূর হউক পৌত্তলিকতা।

পরমেশ্বরের কৃপায় সকল প্রকার কুসংস্কারের বিরুদ্ধে ব্রাহ্মধর্ম্ম যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছেন। যে দিন মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় ভারতে এই মহাযুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছেন আজ সেই মহাদিন। সেই যুদ্ধে যাঁহারা যোগদান করেন তাঁহারা সব সৈনিক; তোমরাও সৈনিক হইয়া আজ এই মহাযুদ্ধে যোগদান করিতেছ। প্রাণপণে যুদ্ধ কর। শুধু বাহিরের সহিত যুদ্ধ করিলে চলিবে না। আমাদের অন্তরে বাহিরে শত্রু। বাহিরের কুসংস্কারের বিরুদ্ধে যেমন যুদ্ধ করিবে, ভিতরের পরম শত্রু রিপু কট'র সহিতও প্রাণপণে যুদ্ধ করিয়া তাহাদিগকে পরাজিত করিবার চেষ্টা করিবে। আমার মনে হয় বাহিরের শত্রু অপেক্ষা অন্তরের শত্রুই অধিকতর প্রবল। হে ভাই, হে ভগ্নি, এবং সমাগত ব্রাহ্মবন্ধুগণ, তোমরা এই যুদ্ধে বিশেষ মনোযোগী হও। জয় প্রভু পরমেশ্বর, তোমারই জয়। তুমিই আমাদের যুদ্ধের সেনাপতি। আমাদের অন্তরে বাহিরে যুদ্ধ। তুমি সহায় হও।

এই পৌত্তলিকতা এবং অশেষ প্রকার সামাজিক দুর্নীতির বিরুদ্ধে আমরা ব্রাহ্মসমাজের সন্তাগণ দণ্ডায়মান হওয়াতে কত প্রকার বিদ্রূপের পাত্র হইয়াছি। কিন্তু আমরা ওসব গ্রাহ্য করি না। জানি সত্য আমাদের পক্ষ। সুতরাং সত্যস্বরূপ পরমেশ্বর আমাদের পক্ষ। আমরা নিন্দা বিদ্রূপ গ্রাহ্য করি না। তোমরা বীরের ন্যায় ধর্ম্মজীবন যাপন কর, নিন্দা প্রশংসা কিছুই গ্রাহ্য করিও না।

এই যে মহাযুদ্ধ, ইহা প্রেমের যুদ্ধ। এ যুদ্ধে কেমন করিয়া যোগ দিতে হয়? যাঁহারা আমাদিগকে বিদ্বেষ করিবেন আমরা তাঁহাদিগকে প্রেম করিব। যাঁহারা আমাদের নিন্দা করিবেন, আমরা তাঁহাদের সদ্গুণের কথা বলিয়া তাঁহাদের প্রশংসা গান করিব। তাঁহারা গালি দিবেন, আমরা বলিব "হে পরমেশ্বর, তুমি তাঁহাদের কল্যাণ কর।" এ যুদ্ধে নিন্দার পরিবর্ত্তে প্রশংসা, গালির পরিবর্ত্তে কল্যাণ প্রার্থনা, প্রহারের পরিবর্ত্তে প্রেমালিঙ্গন; এই সকল অস্ত্র ব্যবহার করিতে হইবে। যীশু এ সম্বন্ধে কি উপদেশ দিয়াছেন তাহা সকলেই জানেন। "তোমার দক্ষিণ গণ্ডে কেহ চপেটাঘাত করিলে তোমার বাম গণ্ড তাহাকে ফিরাইয়া দাও।" ইহা কি বাড়াবাড়ি উপদেশ? না, এ উপদেশ না মানিলে এ যুদ্ধে জয়লাভের সম্ভাবনা নাই। "মারলি তুই কলসির কাণা, তাই ব'লে কি প্রেম দিব না?" জয় হইল কার, পাপের না পুণ্যের? মার খাইয়া প্রেম দেওয়া হইল বলিয়াই ত পুণ্যের জয় হইল—মহাপাপীর উদ্ধার সাধন হইল। যদি বিদ্বেষের পরিবর্ত্তে বিদ্বেষ, চপেটাঘাতের পরিবর্ত্তের চপেটাঘাত, এই যুদ্ধের অস্ত্র হয়, তাহা হইলে, হে ব্রাহ্মগণ, জানিও ব্রাহ্মধর্ম্মের জয় হইবে না। সকল ঘৃণা, সকল অত্যাচার প্রেমের খাতিরে সহ্য করিতে হইবে। প্রেমের স্রোতে সমুদায় ভাসিয়া গেল এই যখন লোকে দেখিবে, তখন অবনত মস্তকে তাহারা সত্য গ্রহণ করিবে, পুণ্যের পথ অবলম্বন করিবে, তখনই যুদ্ধে জয়লাভ হইবে।

আমরা কুসংস্কার ও পৌত্তলিকতা পরিহার করিয়াছি। "ন তস্য প্রতিমা অস্তি।" আমরা ভালই করিয়াছি। কিন্তু আজ এখানে যাঁহারা উপস্থিত আছেন, তাঁহাদের সকলকেই জিজ্ঞাসা করি, যাঁহারা পৌত্তলিকতা পরিত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মসমাজে আসিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে ইহা অপেক্ষা কি অধিকতর পৌত্তলিকতা নাই? এমন লোক কি দেখি না যে পৌত্তলিক ক্রিয়া করে না—অথচ এই রিপু কয়টার দাস, স্বার্থপরতার দৃঢ় রজ্জুতে বদ্ধ। ইট কাট দিয়ে যে দেবতা গড়া হয় তাহার পূজা ছাড়িয়াছে, কিন্তু তামা রূপার দেবতার পূজা ছাড়িতে পারে নাই। ইহা অপেক্ষা সূক্ষ্মতর পৌত্তলিকতা—রিপুর পূজা, স্বার্থপরতার পূজা। পিতা মাতার বক্ষে শেল বিদ্ধ করিয়াছ, কিন্তু তোমার পৌত্তলিকতা ত যায় নাই।

আজ প্রাতঃকালে ভক্তিভাজন আচার্য্য যে উপাসনার সময় বলিয়াছেন তাহা ঠিক—খাতায় নাম লিখাইলেই ব্রাহ্ম হয় না। এই বাহ্যিক পৌত্তলিকতা পরিত্যাগ করিয়াছ সত্য, কিন্তু যদি আধ্যাত্মিক পৌত্তলিকতা না গেল তবে মা বাপ পরিত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মসমাজে আসিয়া কি হইবে? সাবধান, হে ভাই, হে ভগ্নি, সাবধান। বাহ্যিক পৌত্তলিকতা অপেক্ষা

অধিকতর পৌত্তলিকতা আছে। চিত্তশুদ্ধি, ক্ষমা, স্বার্থত্যাগ চাই। এই চিত্তশুদ্ধি—নির্ম্মল হওয়া—অতি কঠিন। আমি অনেক দিন ব্রাহ্ম হইয়াছি কিন্তু যতই দিন যাইতেছে, ততই দেখিতে পাইতেছি এই রিপু কটা দমন করা কি কঠিন। এই যে বাহ্যিক পৌত্তলিকতা ছাড়িয়াছি ইহার সঙ্গে সঙ্গে অন্তরের পৌত্তলিকতা ত যায় নাই। ইহা বড়ই কঠিন। এই যে ভিতরের রিপু কয়টা, ইহাদের বিনাশ করি কেমন করিয়া? তবে কি কোন উপায় নাই? আমি আর কিছু জানি না। ইহা কেবল তাঁরি কৃপা। আমি অনেক দেখিলাম আর কিছুতেই হয় না। 'কেবল একান্তচিত্তে তাঁর প্রার্থনা। তাঁহার সাধনা ভিন্ন হইবে না। যীশু বলিয়াছেন,"Pray without ceasing না থেমে অবিশ্রান্ত প্রার্থনা কর।" ইহা ভিন্ন আর অন্য উপায় নাই। ইহাতেই নির্ম্মল হইতে পারিব। জয়ডঙ্কা বাজাইয়া খবরের কাগজে প্রচার করিলেই ধর্ম্ম হয় না। তাহাতে অন্তরের বিষ ত যাবে না। অহরহ সেই বিষের জ্বালায় জ্বলিয়া মরিবে। এই বন্ধন, কিছুতেই যাইবে না। নম নম করে ধর্ম্ম হইবে না। তাহাতে জগতের লোক ভুলিবে, কিন্তু ভিতরের শত্রু যেমন তেমনই থাকিবে। আমি একজন পুরাতন ব্রাহ্ম অনেক বক্তৃতা করিয়াছি, অনেক গলাবাজি করিয়াছি। যখন প্রাণের ভিতর প্রবেশ করি, দেখি জ্বালা যায় না। যখন প্রাণ ভরিয়া তাঁহাকে ডাকি তখনই যাতনা ভুলিয়া যাই। ব্রহ্মসাগরে ডুব দাও, নতুবা এই অন্তরের যাতনা আর কিছুতেই যাইবে না। প্রাণ দিয়া ধর্ম্ম করা চাই,—অর্দ্ধেক হইলে চলিবে না। স্বামী চায় স্ত্রী প্রাণ দিয়া তাঁহাকে ভাল বাসুক। যিনি জগতের স্বামী তিনি কি চান? সংসারের ভাবে নয়, আধ্যাত্মিক ভাবে বলি, তিনিও বলিতেছেন, ঐ ষোল আনা প্রাণ দেওয়া চাই। বাইবেলে আছে "God is a jealous God." তিনি হিংসুকে পরমেশ্বর। আমরা আমাদের প্রাণের খানিকটা তাঁহাকে দি আর খানিকটা রিপুসেবা এবং স্বার্থ-পরতায় পরিপূর্ণ করিয়া রাখি, তাহা তিনি সহ্য করিতে পারেন না। তিনি ঐ ১৬ আনাই চান। যীশু বলিয়াছেন, "সমুদায় প্রাণ মন দিয়ে তোমার প্রভুকে ভাল বাস।" সমুদায় কাজের মধ্যে তাঁহাকে দেখা চাই, দশটা কাজের মধ্যে তাঁহার উপাসনা একটা, এরূপ করিলে চলিবে না। সকল কাজ তাঁহার, তিনিই সব। এই ভাবে হৃদয়কে প্রস্তুত কর। গৃহে বসিয়া সন্ন্যাসী হইতে গেলে সম্পূর্ণ রূপে তাঁহাকে প্রাণ দেওয়া চাই। সকল কার্য্যেই তাঁহাকে অধিষ্ঠাত্রী দেবতা করা চাই। ব্রাহ্মধর্ম্ম যে ভাবে চলিতেছেন সে ভাবে হইলে চলিবে না। হে প্রভু, আমরা যে ভাবে চলিতেছি এ ভাবে হইলে ত ধর্ম্মসাধন হইবে না। আমরা সংসারের সেবা করিতেছি, আমাদের দিনটা চলিয়া যাইতেছে। এ ভাবে হইলে চলিবে না। প্রাণ দিতে হইবে। সকল দেশের সাধুগণের এই একই কথা। বিদেশীয় সাধু যীশু বলিয়াছেন; "যারা পরমেশ্বরের জন্ত প্রাণ দেয় তারা প্রাণ পায়।" উপনিষদে একটী আখ্যায়িকা আছে। আপনারা আখ্যায়িকাটীর খোসা ফেলে শাঁস গ্রহণ করুন। আখ্যায়িকাটী এই,—একবার এই মহাযজ্ঞের আয়োজন হয়। চক্ষু, কর্ণ, প্রভৃতি মানবদেহের বৃত্তিসমূহ এই যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। যজ্ঞের মন্ত্র, "অসতোমা সদ্গময়, তমসোমা জ্যোতির্গময়, ... ইত্যাদি।" প্রথমতঃ যজ্ঞের হোতা হইল চক্ষু। চক্ষুর বড় অহঙ্কার। সে মনে করিল আমি কত কি দেখি, আমি না থাকিলে সমুদায় জগত অন্ধকারময় হইত। চক্ষুর এই অহঙ্কার হওয়াতে যজ্ঞ পণ্ড হইল। তৎপরে কর্ণ আসিল, তাহারও এইরূপ অহঙ্কার হওয়াতে যজ্ঞ পণ্ড হইল। ক্রমে ক্রমে রসনা প্রভৃতি অপরাপর বৃত্তিসমূহ আসিলেন। তাঁদেরও যজ্ঞ পণ্ড হইল। কি হইবে, সিদ্ধিলাভ যে হয় না। একজন বাকী ছিলেন। তিনি কে? তাঁহার নাম প্রাণ। শেষে প্রাণ গেলেন। তাঁহার অহঙ্কার হইল না। তিনি সিদ্ধিলাভ করিলেন। এই সামান্য গল্পটীতে কি মহৎ উপদেশ রহিয়াছে। চক্ষু, কর্ণ, রসনা, প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণ অহঙ্কারেই মত্ত, যজ্ঞসিদ্ধি হইবে কেন? যখন প্রাণ যায় তখনই হয়। "হে প্রভো, "অসতোমা সদ্গময়, ইত্যাদি" কাণ, চক্ষু, রসনা কতবার বলিল, কিছুই হইল না। যখন প্রাণ গিয়াই বলে তখনই হয়। কেন হয়? প্রাণের কোন স্বার্থ নাই। প্রাণ সকলের জন্য আত্মবলি দিতে প্রস্তুত। মস্তকের কেশ হইতে পদাঙ্গুলি পর্য্যন্ত প্রাণ পরের জন্য দিতে প্রস্তুত। প্রাণ কত ত্যাগ স্বীকার করিয়াছে। নিস্বার্থ প্রাণ যখন প্রার্থনা করে "অসতোমা সদ্গময়, ইত্যাদি" তখনই প্রকৃত প্রার্থনা হয় এবং তাহা সুসিদ্ধ হয়। নাক মুখ চোক প্রার্থনা করিলে কি হইবে। সাধক যতক্ষণ কথায় সাধক ততক্ষণ তাহার সাধনা হয় না। যখন প্রাণ দিয়া করে তখনই হয়। বড় বড় শক্ত শক্ত কথা বলিয়া সাধন করিলেই হয় না। প্রাণ না দিলে হইবে না। পরিবারের মধ্যে সবাই খাইতেছে সবাই পরিতেছে। যদি একজন এমন থাকে যে কেবল অন্যের সুখের জন্যই ব্যস্ত আর সকলে কেমন করিয়া সুখে থাকিবে, এই যাহার চিন্তা, যে সকলের সুখে সুখী দুঃখে দুঃখী, সেই পরিবারের প্রাণ। প্রাণের স্বভাব স্বার্থত্যাগ। আমাদের ব্রাহ্মসমাজের প্রাণ কে হইবে। যে স্বার্থ ভুলিবে, অপরের জন্য খাটিবে তাহাকেই প্রাণ বলিব। যিনি নিঃস্বার্থ হিতৈষী, দেশের মধ্যে, জাতির মধ্যে তিনিই প্রাণ। ব্রাহ্মসাধনে পরের জন্য প্রাণ দেওয়া চাই। যদি প্রবল শত্রু আসিয়া বলে "তোমার ব্রাহ্মধর্ম্ম, ব্রাহ্মসমাজ, ছাড়িতেই হইবে নতুবা এই তরবারির দ্বারা তোমার মস্তক কাটিয়া ফেলিব। এই জলন্ত আগুনে তোমায় দগ্ধ করিয়া মারিব।" যদি আমি তরবারীতে প্রাণ দিই, চিতানলে পুড়ে মরি, তাহা হইলে প্রাণ দেওয়া হইল। যদি বল মরিতে হয় মরিব, তবুও সত্য ছাড়িব না, তাহা হইলেও প্রাণ দেওয়া হইল। "শির দিয়া শির নাহি দিয়া।" এ এক রকম প্রাণ দেওয়া। আর এক রকম প্রাণ দেওয়া আছে যাহা প্রতিদিন দিতে হয়। প্রতি পদক্ষেপে পরের সুখের জন্য তোমার প্রাণটী দিতে হইবে। দরিদ্রতার কশাঘাতে ছট ফট করিতেছ। তবু অসদুপায়ে অর্থোপার্জ্জন করাকে ঘৃণা কর, ভগবানকে প্রাণটী একেবারে দিয়া ফেলিয়াছ, দরিদ্রতা আসুক, সুখ আসুক দুঃখ আসুক, সকল অবস্থাতেই তোমার প্রাণ ভগবানের দিকে। এই যে প্রতিদিনের আত্ম বলিদান,

এ বড় ভয়ঙ্কর প্রাণদান। হে ব্রাহ্মগণ, তোমাদিগকে এই প্রাণদান করিতে হইবে। যদি পার তবে ভাল, নতুবা কিছুই হইল না। প্রতিক্ষণে পরের সুখের জন্য আত্মবলি দিতে হইবে।

উপাসনা শেষ হইলেও প্রায় রাত্রি ১১টা পর্য্যন্ত সকলে ভাবে বিভোর হইয়া কীর্ত্তন করিলেন। এইরূপে ব্রাহ্ম ইতিহাসে সুপ্রসিদ্ধ ১১ই মাঘের মহোৎসব সম্পন্ন হইল।

১২ই মাঘ, ২৪শে জানুয়ারী, বুধবার—আজ সাধনাশ্রমের উৎসব। গত বৎসর এই দিনে ভক্তিভাজন শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় পরিচারকগণকে শুভাশীর্ব্বাদ করতঃ সাধনাশ্রমের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। এক বৎসর পূর্ব্বে এই দিনে ব্রহ্মকৃপা অজস্রধারে ব্রাহ্মসমাজের উপর বর্ষিত হইয়াছে। ১১ই মাঘের ন্যায় এই দিনটীও ব্রাহ্ম-সমাজের ইতিহাসে অমরত্ব লাভ করিয়াছে। ওয়ার্কারগণ অতি প্রত্যুষে সংকীর্ত্তন করিতে করিতে দুই একটী ব্রাহ্ম বাটীতে গমন করেন। তদনন্তর সকলে মন্দিরে সমাগত হইয়া যতক্ষণ রজনীর অন্ধকার ছিল ততক্ষণ সংকীর্ত্তন করেন। প্রাতঃসূর্য্যের অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে চতুর্দ্দিক আলোকিত হইলে মন্দিরে বহুলোকের সমাগম হইল। অনেকেই ইহার পূর্ব্বে আসিয়া কীর্ত্তনে যোগ দিয়াছিলেন। গত বৎসর যে অজস্রধারে ব্রহ্মকৃপা-বৃষ্টি হইয়াছিল, ওয়ার্কারগণ তাহার সমূহ সদ্ব্যবহার করিতে পারেন নাই, তাঁহারা সম্পূর্ণরূপে ভগবদিচ্ছার অধীন হইতে পারেন নাই, সম্পূর্ণরূপে স্বার্থ, নিজত্ব নাশ করিতে পারেন নাই বলিয়া, ক্ষোভ অনুতাপে দগ্ধ হইয়া মন্দিরে উপস্থিত হইয়াছেন। তাঁহারা ভাবিতেছেন এবার কি আবার সেইরূপ কৃপাস্রোত প্রবাহিত হইবে—আবার কি আমরা সেই স্রোতে ভাসমান হইয়া জন্মের মত স্বার্থপরতার উচ্ছেদ সাধন করিতে পারিব। এইরূপে তাঁহাদের হৃদয়ে যুগপৎ ক্ষোভ, অনুতাপ, আশা ও বিস্ময়ের তরঙ্গ উঠিতেছে, এমন সময়ে পূর্ব্ব নির্দ্দেশ অনুসারে একজন গাইয়া উঠিলেন, "শোন রে শোন রে তাঁর বাণী।" গত বৎসর এই মহাসঙ্গীতের মহাশক্তিশালী বাক্যে সকলের হৃদয়ে তাড়িতপ্রবাহ ছুটিয়াছিল, এবার কি কিছুই হইবে না? অবশ্যই হইবে। এই কীর্ত্তনটী গাহিতে গাহিতে অনেকে মাতিয়া উঠিলেন। ওয়ার্কারদের অনেকের ভাব উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। বহুক্ষণ গান হইলে উপাসনা আরম্ভ হইল। সাধনাশ্রমের তত্ত্বাবধায়ক শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় উপাসনা করিলেন। উপাসনান্তে শ্রীযুক্ত বাবু গুরুদাস চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুক্ত ভাই প্রকাশদেব, শ্রীযুক্ত বাবু আদিনাথ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত বাবু কালীচন্দ্র ঘোষাল এই আশ্রম সম্বন্ধে স্ব স্ব জীবনের অভিজ্ঞতা ব্যক্ত করিয়া ভগবৎ-কৃপার সাক্ষ্য প্রদান করিলেন এবং প্রার্থনা করিলেন। তদনন্তর পঞ্জাব নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু হরশরণ দাস ঈশ্বরের হস্তে আপনাকে সমর্পণ করিলেন এবং মহিলাদিগকে কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবার জন্য আহ্বান করিয়া প্রার্থনা করেন। জলপাইগুড়ির শ্রীযুক্ত মুন্সী জালাল-উদ্দীন মিঞা প্রার্থনা করিলেন এবং স্বীয় জীবনের অভিজ্ঞতা ও অতীতের বিষয় কিছু কিছু বলিলেন। তাহার পর সাধনাশ্রমের নিত্যপাঠ্য স্তোত্রটী পঠিত হইয়া উপাসনা শেষ হইল। উপাসনা শেষ হইলেও ১২টা পর্য্যন্ত কীর্ত্তন চলিল। সকলে প্রায় উন্মত্ত হইয়া উঠিলেন। কিন্তু ১টার সময় আলোচনা হইবার কথা ছিল বলিয়া কীর্ত্তন বন্ধ হইল।

১টা বাজিলে আলোচনা আরম্ভ হইল। শ্রীযুক্ত বাবু উমেশ-চন্দ্র দত্ত মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন। শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় ব্রাহ্ম-বালিকাদিগের শিক্ষা সম্বন্ধে একটী প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। তাহা স্থানান্তরে প্রকাশিত হইবে। প্রবন্ধ পাঠান্তে যে আলোচনা হয়, তাহাতে অনেকে যোগ দিয়াছিলেন। কেহ বা বালিকাদিগের বিশ্ববিদ্যালয়ের অবলম্বিত প্রণালীতে শিক্ষা দেওয়ায় সপক্ষে কেহবা তাহার বিপক্ষে মত প্রকাশ করিলেন।

সায়ংকালে শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় "প্রাচ্য ও প্রতীচ্য ধর্ম্ম" বিষয়ে বক্তৃতা করেন। ২ ঘণ্টার অধিককাল বক্তৃতা হয়। বক্তা প্রাচ্য ও প্রতীচ্য ধর্ম্মের বিশেষ বিশেষ ভাব নির্দ্দেশ করিয়া তাহাদের সমাবেশের প্রয়োজনীয়তা প্রতিপন্ন করিয়াছিলেন। বক্তৃতা অন্য স্থানে প্রকাশিত হইবে।

১৩ই মাঘ, ২৫শে জানুয়ারী, বৃহস্পতিবার—প্রাতে উপাসনা হয়। বাবু নীলমণি চক্রবর্ত্তী মহাশয় আচার্য্যের কার্য্য করেন এবং "ধর্ম্মজীবনে নিরাশা" এই বিষয়ে উপদেশ প্রদান করেন। তাঁহার উপদেশের সারমর্ম্ম এইরূপ;—

"কয়েক দিন ধরিয়া আমরা মাঘোৎসব উপভোগ করিয়া হৃদয়ে কত আনন্দ লাভ করিয়াছি। ব্রহ্মকৃপা স্পর্শে আমাদের প্রাণে কত আশা এবং উৎসাহ জাগিয়া উঠিয়াছে। পাপ তাপের কথা আমরা এখন ভুলিয়া গিয়াছি। কিন্তু এই ভাব হয় ত অধিক দিন থাকিবে না। গত বর্ষে হয় ত অনেকে অনেক সময় শুষ্কতার মধ্যে পড়িয়াছেন। আবার আগামী বৎসরে হয় ত অনেককে শুষ্কতার মুখ দেখিতে হইবে। যতদিন না প্রকৃতভাবে ধর্ম্মজীবন গঠিত হয়, ততদিন সময়ে সময়ে শুষ্কতা বা সরসতা, সময়ে সময়ে উৎসাহ বা নিরুৎসাহ আসিবেই আসিবে। কিন্তু ইহার মধ্যে এক বিপদ আছে। এইরূপ শুষ্কতার মধ্যে সময়ে সময়ে নিরাশা আসিতে পারে। নিরাশা ধর্ম্মজীবনের পথে ঘোর শত্রু। চিররুগ্ন যাহারা, তাহারা অনেক দিন ধরিয়া অনেক প্রকার ঔষধ সেবন করিয়া, পথ্যের অনেক নিয়ম পালন করিয়া যখন দেখে যে, রোগের কিছুই উপশম হইতেছে না, তখন তাহাদের আর আরোগ্য লাভের আশা থাকে না, অথবা ঔষধের উপকারিতাতে আর বিশ্বাস থাকে না। ক্রমে ক্রমে কুপথ্য করিয়া তাহাদের রোগ বৃদ্ধি হয় এবং শেষে তাহারা হয় ত মৃত্যুমুখে পতিত হয়। সেইরূপ শুষ্কতার মধ্যে কাহারও কাহারও মনে হইতে পারে যে, এতদিন এত উপাসনাদি সাধন ভজন করিলাম, কৈ পাপ ত গেল না, কিছু ত হইল না। তবে বুঝি পাপ আর যাইবার নয়, অথবা উপাসনার কোনও উপকারিতা নাই, অন্য কোনও বিশেষ সাধন অবলম্বন

করিতে হইবে। এইরূপ নিরাশার অবস্থার মধ্যে পড়িয়া কেহ কেহ হয় ত একেবারে উপাসনাদি ত্যাগ করিতে পারেন এবং কেহবা অন্য প্রকার সাধনপ্রণালী আশ্রয় করিতে পারেন। ইহাতে বিশেষ আধ্যাত্মিক ক্ষতি হয়, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। এইরূপ নিরাশার দুইটী কারণ অনেক সময়ে দেখা যায়; ঈশ্বরের করুণাতে অবিশ্বাস এবং তাঁহার মঙ্গলভাবের উপর নির্ভরের অভাব। অনন্ত মঙ্গলময় তিনি, যাহাতে আমাদের প্রকৃত মঙ্গল হয়, তিনি ত তাহাই বিধান করিতেছেন। আমরা কি জানি? আমরা যাহাকে অমঙ্গল বলিয়া কল্পনা করিয়া কত ভীত হই, কিছুদিন পরে হয় ত বুঝিতে পারি যে, তাহারই মধ্যে আমাদের প্রকৃত কল্যাণ নিহিত ছিল। আমরা যাহাকে শুষ্ক মরুভূমি বলিয়া মনে করি, হয় ত তাহারই মধ্যে সুশীতল বারিস্রোত লুক্কায়িত রহিয়াছে। প্রকৃতভাবে কিসের দ্বারা আমাদের মঙ্গল হয়, তাহা কি আমরা জানি? যে শুষ্কতার মধ্যে পড়িয়া নিরাশ হইতেছি, হয় ত তাহারই পশ্চাতে তাঁহার অপার করুণা লুক্কায়িত রহিয়াছে। অতীত জীবনের দিকে চাহিলে আমরা কি দেখিতে পাই? আমরা কোথায় ছিলাম, তিনি আমাদিগকে কোথায় আনিয়াছেন? জীবনের এত বৎসর এ ভাবে কাহার কৃপায় চলিয়া গেল? তিনি কি আমাদিগকে পরিত্যাগ করিতে পারেন? আমরা যতই পাপগ্রস্ত হই না কেন, তাঁহার করুণার অনুপযুক্ত আমরা কিছুতেই হইতে পারি না। সংসারের জননী যেমন সুস্থ সন্তান অপেক্ষা আপনার রুগ্ন শিশুকে অধিক যত্ন করেন, যতদিন না রোগ দূর হয়, ততদিন তাহার কাছে বসিয়া থাকেন, যতদিন না তাহার রোগগ্রস্ত মলিন মুখে সুস্থতার বিকাশ হয়, ততদিন তাঁহার মনে আনন্দ হয় না। সেইরূপ আমাদের আত্মার জননী যিনি, আমাদের অমরাত্মা যাঁহার অমৃত-ক্রোড়ে চিরকাল বাস করিবে, পাপগ্রস্ত আত্মাকে তিনি কখনও পরিত্যাগ করেন না। তাঁহার সন্তান হইয়া মানবাত্মা পাপে মলিন রোগীর ন্যায় হইয়া থাকিবে, ইহা তিনি দেখিতে পারেন না। যত দিন না সেই আত্মা আপনার স্বাভাবিক পুণ্যের জ্যোতিতে উজ্জ্বল ও সুন্দর হয়, ততদিন তিনি ক্ষান্ত হইতে পারেন না। পাপীর উদ্ধার সাধনের জন্য তিনি সর্ব্বদা ব্যস্ত। পাপীর উদ্ধারের জন্যই তিনি ব্রাহ্মধর্ম্ম পাঠাইয়াছেন। পাপীকে আশ্রয় দিবার জন্যই ব্রাহ্মসমাজের অভ্যুদয় হইয়াছে। আমরা যতই দুর্ব্বল ও পাপী হই না, আমাদের জীবনে যাহা ঘটিয়াছে তাহা তিনিই করিয়াছেন। আমরা যে পথে আসিয়াছি তিনিই আনিয়াছেন, আমাদের যাহা যাহা প্রয়োজন তিনিই দিয়াছেন। তবে কেন আমরা নিরাশ হইব? শুষ্কতা বা সরসতা, দুর্ব্বলতা বা সবলতা সকল অবস্থায় মধ্যে তাঁহার করুণাতে বিশ্বাস করিয়া তাঁহার মঙ্গলভাবের উপর নির্ভর করিয়া পড়িয়া থাকিব। তাঁহার এত করুণা উপভোগ করিয়া যদি তাহাতে অবিশ্বাসী হই, তবে ঘোর নাস্তিকতা অপরাধে অপরাধী হইব। যিনি প্রতিদিন জীবন চালাইতেছেন, এ জীবনের ভার তাঁহার হাতে। এইরূপ বিশ্বাস থাকিলে আর নিরাশা আসিতে পারিবে না।

অপরাহ্নে মন্দিরে বালক বালিকা-সম্মিলন হয়। প্রায় ছয় শত বালক বালিকা সুন্দর সাজে সজ্জিত হইয়া মিলিত হইয়াছিল—তাহাদের সে দৃশ্য কি মনোরম! সকলে সম্মিলিত হইলে প্রত্যেকের গলায় ফুলের মালা দেওয়া হয়। প্রথমতঃ তাহারা একটী সঙ্গীত করে পরে শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় শিশুদিগকে তাহাদের উপযোগী একটী সদুপদেশ দেন এবং তিনি ডাক্তার নীলরতন সরকার মহাশয়ের পরলোকগতপুত্র নির্ম্মলরতনের নাম উল্লেখ করিয়া বলেন "নির্ম্মলের পিতা ও মাতা নির্ম্মলের স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ তোমাদিগকে পুষ্প উপহার দিবেন।" তিনি যখন এই কথার উল্লেখ করেন তখন সেই বালকের স্মৃতি মনোমধ্যে উদিত হইয়া উপস্থিত ব্যক্তিগণের চিত্তে এক অপূর্ব্ব ভাবের উদয় করিয়াছিল। শাস্ত্রী মহাশয়ের উপদেশের পর পুষ্পোপহার দেওয়া হয়। তদনন্তর তাহারা সকলে আনন্দবাজারে আনন্দে আহার করে। ডাক্তার নীলরতন সরকার মহাশয় ইহার ব্যয়ভার বহন করেন।

সায়ংকালে ছাত্রসমাজের উৎসব উপলক্ষে শ্রীযুক্ত বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় "নীতিহীন ধর্ম্ম ও ধর্ম্মহীন নীতি" বিষয়ে বক্তৃতা করেন। বক্তৃতাটীর বিবরণ না পাওয়াতে প্রকাশ করিতে পারা গেল না।

১৪ই মাঘ, ২৬শে জানুয়ারী, শুক্রবার—প্রাতঃকালে মন্দিরে শ্রীযুক্ত বাবু কালীপ্রসন্ন বসু মহাশয় উপাসনা করেন তাহার উপদেশের সার মর্ম্ম :—

যোগ কাহাকে বলি? যোগের অর্থ ঈশ্বরের সহিত মানবাত্মার সম্মিলন। বিশ্বসংসারে যোগ-সামঞ্জস্য দেখা যাইতেছে। পরমাণুতে পরমাণুতে সংযোগ করিয়া ঈশ্বর জগৎ উৎপন্ন করিয়াছেন। তাঁহারই ইচ্ছাতে এখানে সুশৃঙ্খলা দৃষ্ট হইতেছে। যদি আমরা তাঁহার ইচ্ছানুগত হইয়া চলি, তাহা হইলে সমুদয় বিশ্বসংসারে যে যোগ-সামঞ্জস্য দেখা যাইতেছে, তাহারই সহিত আমাদের ঐক্য হইয়া চলা হইল। যদি তাঁহার ইচ্ছানুগত না হই, তাহা হইলে আমরা যোগভ্রষ্ট হইয়া সংসারে বিশৃঙ্খলা আনিলাম। এই প্রকার বিশৃঙ্খলা আসাতেই সংসারে দুঃখের মাত্রা বাড়িয়াছে, সুখের মাত্রা কমিয়াছে। ফলতঃ অতিরিক্ত সুখ-কামনা করিয়া আমরা সংসারের বিশৃঙ্খলা উৎপন্ন করিতেছি, দুঃখের মাত্রা বৃদ্ধি করিতেছি। দুঃখের অংশ, সুখের অংশ ঈশ্বর সমুদয় মানুষের জন্যই রাখিয়াছেন। কিন্তু আমরা নিজ সুখের অংশে সন্তুষ্ট থাকিতে না পারিয়া পরমেশ্বর অন্যের জন্য যে সুখের অংশ রাখিয়াছেন তাহাতে হাত দিতে যাই। এই প্রকারে অন্যের সুখে হস্তক্ষেপ করিয়া আমরা নিজেই কি সুখী হইতে পারি? তাহাও পারি না। অতিরিক্ত সুখ কামনা না করিয়া, ঈশ্বর আমাদিগকে যাহা বলেন যদি তাহাই করিতাম, সুখ কিম্বা দুঃখ ঈশ্বর আমাদিগকে যাহাই দেন না কেন, তাহাই আমাদের প্রাপ্য অংশ বলিয়া যদি শিরোধার্য্য করিয়া লইতাম, তাহা হইলে আমরা নিজেও সুখী হইতাম, অন্যকেও সুখী করিতে পারিতাম। আমাদিগের উচিত যে আমরা সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরের বাধ্য হই। এইরূপ পূর্ণ বাধ্যতা আমাদের

জীবনের মূল মন্ত্র হওয়া উচিত। আমাদিগের বৈরাগ্য এই বাধ্যতার অন্তর্গত হওয়া আবশ্যক। বৈরাগ্যের নিজের কোন মূল্য নাই। যে বৈরাগ্য বাধ্যতার অন্তর্গত নহে তাহা অনিষ্টকারী, তাহাতে পাপ হয়। আমাদিগের দেশে নগ্ন সন্ন্যাসী-দল এই প্রকারে বৈরাগ্যের আচরণ করে। তাহাদিগের গৈরিক বস্ত্র, জটাজুট, এবং ভস্মাচ্ছাদিত কলেবর তাহাদিগকে এক প্রকার ভয়ানক মূর্ত্তি প্রদান করে। এই মূর্ত্তি দেখিয়া আমাদিগের বালক বালিকারা অত্যন্ত ভয় পায়। দুঃখের বিষয় অনেক ব্রাহ্ম ইহাদিগের বাহির দেখিয়াই ভুলিয়া যান। তাঁহারা উপদেশ শুনিবার জন্য ইহাদিগের নিকট যাদৃশ বিনীত ভাবে দণ্ডায়মান হন, ব্রাহ্মসমাজের কোন উপদেষ্টার নিকট হয়ত কখনও সেইরূপে উপস্থিত হন নাই। ব্রাহ্মসমাজের কত উপদেষ্টা পূর্ণ বাধ্যতার পথ গ্রহণ করিয়া, যথার্থ প্রেমিক এবং ভক্তের ন্যায় যাহাতে ঈশ্বর প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মসমাজ রূপ পরিবার পৃথিবীতে বজায় থাকে, তজ্জন্য ব্রাহ্মসমাজের এই দুঃসময়ে প্রাণপণে খাটিতেছেন। আমরা তাঁহাদিগকে প্রেমিক ভক্ত যোগী বলিয়া বিবেচনা না করিয়া কি মাদক-সেবী নগ্ন সন্ন্যাসী দলকে কিম্বা বঙ্গদেশের কপট বৈরাগীদিগকে তাহা বিবেচনা করিব? যাঁহারা পিতার ঘর বজায় রাখিবার জন্য শরীরের রক্ত জল করিতেছেন, আমি পিতার সেই সুধী পুত্রদিগকেই যোগী বলিব? কিম্বা তাহাদিগকেই যোগী বলিব, যাহারা যোগের হুজুক তুলিয়া পিতার পরিবার ছিন্ন ভিন্ন করিয়া পিতার ঘর ভাঙ্গিয়া সন্ন্যাসী হইয়া চলিয়া যাইতে চান? শেষোক্তদিগকে কখনই যোগী বলিতে পারি না, বরং বিয়োগী বলিতে পারি। যোগের অর্থ মিলন। তুমি সমুদয় প্রাণের সহিত, মনের সহিত, হৃদয়ের সহিত পরমেশ্বরকে ভাল বাস। এবং নরনারীকে ভাই ভগিনী বলিয়া প্রেম কর, ইহাই যোগের মূল সূত্র। ভালবাসার স্বাভাবিক গতি মিলনের দিকে—যোগের দিকে। কিন্তু যাহারা পিতার ঘর ভাঙ্গিয়া দিতে প্রস্তুত, তাঁহারা কেমন প্রেমিক—কেমন যোগী। ব্রাহ্ম ভাই ভগিনী ব্রাহ্মসমাজের এই দুরবস্থার সময়ে যাঁহারা প্রকৃত শ্রদ্ধার পাত্র, যাঁহারা আমাদের পরিচালক হইবার যোগ্য তাঁহাদিগকে চিনিয়া লইবেন। ঈশ্বরের মেষদল যেন ছিন্ন ভিন্ন না হইতে পারে। তাহা হইলে বিপদ এবং মৃত্যু আসিবে। যেমন পরমাণুতে পরমাণুতে গ্রথিত করিয়া ঈশ্বর ব্রহ্মাণ্ড উৎপন্ন করিলেন, সেইরূপ সমুদয় নরনারীকে একত্রিত করিয়া তিনি জগতে মহা পরিবারে মহাযোগ উৎপন্ন করিবেন। আমরা তাঁহারই কোলে ভাই ভগিনীকে দেখিয়া, এবং ভাই ভগিনীতে তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিয়া কৃতার্থ হইব। ঈশ্বর তাহাই করুন।"

সায়ংকালে বাবু শশিভূষণ বসু উপাসনার কার্য্য করেন এবং জগতের ধর্ম্মাচার্য্যদিগের বিষয়ে উপদেশ দেন। তাঁহার উপদেশের মর্ম্ম এই:—সময়ে সময়ে পৃথিবীতে ঝড়ের যেমন বিশেষ প্রয়োজন হয়, তেমনি মানব সমাজেও বিশেষ বিশেষ ক্ষমতাশালী ব্যক্তিরও আবশ্যক হইয়া থাকে। সেই সকল বীর পুরুষ সমাজে মহাবিপ্লব উপস্থিত করিয়া থাকেন। তাঁহারা সমাজের স্রোতকে অন্য দিকে ফিরাইয়া দেন। এই সকল মহৎ লোক জগৎকে আন্দোলিত করিয়াছিলেন, এবং নিজেদের উদ্ভাবনা শক্তিদ্বারা অনেক নূতন সত্য জগতে প্রদান করিয়াছিলেন।

(১) মুষা। ইনি য়িহুদী জাতির মধ্যে ঘোরতর পরিবর্ত্তন উপস্থিত করিয়াছিলেন। মগ্নুন্ পরমেশ্বরের নাম প্রচার করিয়াছিলেন। সিনাই পর্ব্বতের উপর হইতে যে দশ আজ্ঞা প্রচার করিয়াছিলেন, তাহার প্রথম আজ্ঞা এই যে পরমেশ্বর ব্যতীত অন্য কোন দেব দেবীর নিকট মস্তক অবনত করিও না। মুষাই ইস্রেলের বংশের পরিত্রাতাস্বরূপ হইয়া তাহাদের অশেষ কল্যাণ করিয়াছিলেন।

(২) শাক্য মুনি। এই প্রবল প্রতাপান্বিত ব্যক্তির বিষয় যত পাঠ ও চিন্তা করা যায়, ততই মন যেন গাম্ভীর্য্যরসে পূর্ণ হইয়া উঠে। আজ কাল ইয়ুরোপ ও আমেরিকা প্রভৃতি সুসভ্য জগতে বুদ্ধের জীবন ও ধর্ম্ম সম্বন্ধে অনেক পণ্ডিত ব্যক্তি বিশেষ রূপে আলোচনা করিতেছেন, এবং অনেকে ইহাঁকে মহাত্মা খ্রীষ্ট অপেক্ষাও উচ্চস্থান প্রদান করিতেছেন। স্বর্গীয় পণ্ডিতবর Renan সাহেব তাঁহার সুবিখ্যাত খ্রীষ্টের জীবন চরিতে" মহর্ষি ঈশার গুণ কীর্ত্তন করিবার সময় বুদ্ধের নাম উল্লেখ না করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারেন নাই। তিনি এক স্থানে বলিতেছেন "No man has trampled under foot the family joys, the happiness of this world (sakyamuni excepted)" অর্থাৎ কোন মানব পৃথিবীর সুখ ঐশ্বর্য্য পদদলন করিতে সমর্থ হন নাই (শাক্য মুনি ব্যতীত)। একদিক হইতে দেখিতে গেলে এত বড় মহাপুরুষ বোধ হয় আর পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেন নাই। শাক্য সিংহের জীবনে একটি বড় আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখা যায়। (প্রোফেসার) মোক্ষমুলর এক স্থলে লিখিয়াছেন যে তাঁহার শিষ্য বৃন্দ একবার তাঁহাকে বলেন, "পৃথিবীর সকল মহাপুরুষ কোন কোন অলৌকিক ব্যাপার প্রদর্শন করিয়া থাকেন, আপনিও আমাদিগকে কিছু দেখান।" তাহাতে শাক্য মুনি বলেন, "Confess before Men the sins you have committed, that is the true miracle ;—"গোপনে যে সকল পাপ করিয়াছ তাহা জগতের কাছে প্রকাশ কর, তাহাই অলৌকিক কার্য্য" কেমন সরলতা! তাঁহার জীবন ধ্যানপরায়ণ ছিল। নিস্তব্ধ ও গম্ভীর ভাবে তিনি নিজ আত্মার মধ্যে প্রবেশ করিতেন। অনেকে বলেন তিনি নিরীশ্বরবাদী ছিলেন, ইহা কখন বিশ্বাস করা যাইতে পারে না। নির্ব্বাণ অর্থে ব্রহ্মে লীন হওয়া। বর্ত্তমান সময়ে চারিদিকে যেরূপ বিষয়ের কোলাহল, তাহাতে শাক্যমুনির ধ্যান অনুসরণ করা আমাদের বিশেষ প্রয়োজন হইয়াছে। তাঁহার অপূর্ব্ব বৈরাগ্যের বিষয়ও আমাদের বিষয়-বাসনাপূর্ণ সময়ে বিশেষরূপ চিন্তা করা আবশ্যক। শাক্যমুনি তপস্যারবলে ষড়রিপু দমন করিয়াছিলেন। তিনি যখন সাধন-সিদ্ধ হইয়া প্রচারে বহির্গত হন, তখন সেই ধর্ম্মবীর শিষ্যদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন, "সন্ন্যাসীর দল, আমি দুর্জ্জয় রিপু সকল দমন করিতে কৃতকার্য্য হইয়াছি। আশা করি, তোমরাও আমার ন্যায় জিতেন্দ্রিয় হইয়া দেশ

বিদেশে নির্ব্বাণ তত্ত্ব প্রচারে রত থাকিবে।" তাঁহার দুর্জ্জয় প্রতিজ্ঞা-বল ছিল। যখন তিনি গভীর নিশীথে গৃহ পরিত্যাগ করেন, এবং তাঁহার প্রিয় অনুচর ছন্দক তাঁহার মহান্ ব্রতের পথে বিঘ্ন স্বরূপ হইয়া দণ্ডায়মান হন, তখন তিনি বলিয়াছিলেন, "যদি মস্তকে শিলার সহিত বৃষ্টি পতিত হয়, ধাতুপূর্ণ আগ্নেয়গিরি যদি মস্তকে ভাঙ্গিয়া পড়ে, শক্তির শেল সম কুঠার যদি মস্তকে বিদ্ধ হয়, তথাপি আমি কখনও গৃহে থাকিব না।" এই দুই প্রতিজ্ঞার কথা শ্রবণ করিয়া ছন্দক অবাক হইয়া রহিল। শাক্য সিংহের জীবন অদ্ভুত ঘটনায় পূর্ণ। খ্রীষ্ট জন্মিবার ৫০০ বৎসর পূর্ব্বে তিনি অপূর্ব্ব ত্যাগস্বীকার, বৈরাগ্য, জ্বলন্ত পবিত্রতা, অসাধারণ প্রতিজ্ঞা ও নরনারীর কল্যাণের জন্য জীবন্ত প্রচারের ভাব দেখাইয়া গিয়াছেন।

৩। সক্রেটিস্। ইনি গ্রীসে নীতি-বিপ্লব আনয়ন করেন। এই মহাপুরুষ যুবকবৃন্দের চরিত্রের উন্নতির জন্য চারিদিকে সুনির্ম্মল নীতি প্রচার করিতেন। তখন কোন লোকের চরিত্রের বিশুদ্ধতা অবগত হইতে হইলে লোকে জিজ্ঞাসা করিত, "সক্রেটিস্ কি তোমার চরিত্র নির্ম্মল করিয়া দিয়াছেন?" তিনি যুবকদিগের গুরু ও নেতা হইয়া যখন নীতির পথে আনিতে কৃতকার্য্য হইলেন, তখন দেশের অসচ্চরিত্র দুষ্ট লোকেরা তাহা সহ্য করিতে না পারিয়া এই মহাত্মার বিরুদ্ধে রাজার নিকট নানা অভিযোগ উপস্থিত করিল। সক্রেটিস্ রাজ-সমীপে নীত হইলে রাজা তাঁহাকে তাঁহার অভিযোগের বিরুদ্ধে মতামত প্রকাশ করিতে বলেন। শান্তস্বভাব সক্রেটিস্ তাহাতে কোন উত্তর না করাতে তাঁহাকে কারাবদ্ধ করা হয় এবং তাঁহার প্রাণ বিনাশের আজ্ঞা হয়। তিনি যে কয়েকদিন কারাগারে ছিলেন, তাঁহার অনুগত শিষ্যেরা সর্ব্বদাই তাঁহাকে পরিবেষ্টন করিয়া থাকিত। তিনি শান্ত প্রফুল্ল মনে তাঁহাদিগকে পরলোকের বিষয় উপদেশ দিতেন। একবার তাঁহার কোন শিষ্য এই বলিয়া দুঃখ প্রকাশ করেন "বিনাদোষে সক্রেটিসের প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা হইল," সক্রেটিস্ তাহা শুনিয়া বলিলেন, "তুমি কি চাও যে, সক্রেটিস অপরাধ করিয়া প্রাণত্যাগ করে?" কয়েকদিন পরে তাঁহাকে হেমলক্ বিষপান করিতে দেওয়া হইল। তিনি স্বহস্তে পাত্র গ্রহণ করিয়া উহা পান করিলেন। মৃত্যু-সময় পর্য্যন্ত আনন্দ মনে শিষ্যদিগকে স্বর্গধামের বিষয়ে উপদেশ প্রদান করেন। অবশেষে হেমলক্ বিষ সেবন করিয়া শয্যায় শয়ন করিলেন, কিয়ৎক্ষণ পরে তাঁহার কণ্ঠরোধ হইয়া আসিল ; তিনি চক্ষু মুদিত করিয়া ইহ-সংসার পরিত্যাগ করিলেন। সক্রেটিস্ পুরাকালের একজন প্রধান নীতি-সংস্কারক। ইঁহার গুণে গ্রীস দেশের প্রভূত কল্যাণ সাধিত হইয়াছে। বর্ত্তমান সময়েও সক্রেটিসের ন্যায় লোকের বিশেষ আবশ্যক হইয়াছে।

৪। ঈশা। ইনি পৃথিবীতে এক যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছেন। ইঁহার প্রতাপে জগতে কতই ব্যাপার সংঘটিত হইয়াছে। খ্রীষ্টের জীবনে দুইটী প্রধান বিষয় দেখিতে পাওয়া যায় ; বিশ্বাস ও পবিত্রতা। তিনি শিষ্যদিগকে বলিয়াছিলেন, "যদি তোমাদের সর্ষপ কণার ন্যায় বিশ্বাস থাকে, পর্ব্বতকে বলিবে স্থানান্তরিত হও, এবং তখনই উহা স্থানান্তরিত হইবে।" তিনি বিশ্বাসীর চূড়ামণি ছিলেন। তিনি যেন জীবন্ত পরমেশ্বরকে মানবের সম্মুখে ধরিয়া দিতেন। তাঁহার বিশ্বাসের জীবন আমাদের বিশেষ শিক্ষার স্থল। বর্ত্তমান সময়ে চারিদিকে যেরূপ সংশয়বাদ, অজ্ঞেয়তাবাদ, প্রবল হইতেছে, এসময়ে খ্রীষ্টের জীবন অধ্যয়ন করা নরনারীর অতীব কর্ত্তব্য। ইহাতে আমাদের বিশ্বাস খুব দৃঢ় হইতে পারে। অন্য দিকে তাঁহার জীবনে পবিত্রতার ভাব দেখিলে অবাক্ হইতে হয়। তিনি কেমন জোরের সহিত বলিয়াছিলেন, "যদি তোমার ডান চক্ষু অভদ্র দর্শন করে, উহা উৎপাটন করিয়া ফেল, যদি তোমার দক্ষিণ হস্ত কোন অপবিত্র কার্য্য করে, তাহা কর্ত্তন করিয়া ফেল।" পবিত্রতার দিকে খ্রীষ্টের বিশেষ দৃষ্টি ছিল। তিনি বলিয়াছিলেন, "নির্ম্মলচিত্ত ব্যক্তিরা ধন্য কারণ তাহারা পরমেশ্বরের দর্শন লাভ করিবে।" বিশ্বাস ও পবিত্রতা এই দুই পরম বস্তু সর্ব্বদা তাঁহার জীবনে উজ্জ্বল ভাবে স্থান পাইয়াছিল। পরমেশ্বরের পথে গমন করিতে হইলে, এই দুই বস্তুর বিশেষ প্রয়োজন, বিশ্বাস ও পবিত্রতা।

৫। মহম্মদ। ইনি আরব দেশের উদ্ধারকর্ত্তা। ইনি ধর্ম্মসংস্কারকদিগের মধ্যে ধর্ম্মবীরত্বের পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। বিশ্বাস বলে সর্ব্বদা বলীয়ান হইয়া ইনি নিজ ব্রতপালনে সর্ব্বদা রত থাকিতেন। মহম্মদের বীরত্বের কথা স্মরণ করিলে শরীর যেন রোমাঞ্চিত হয়। ইনি যখন মহান্ পরমেশ্বরের নাম প্রচারে রত হন, তখন আরব দেশের অজ্ঞ ও পৌত্তলিক নরনারীরা ইঁহার পরম শত্রু হইয়া উঠিয়াছিল। এই শত্রুকুলে পরিবেষ্টিত হইয়া এই ধর্ম্মবীর কাবার মন্দিরমধ্যে গমন করিয়া পুত্তলদিগের মস্তকে হস্ত রাখিয়া বলিতেন "সত্য আসিয়াছে এখন মিথ্যা তিরোহিত হউক।" এই বলিয়া শিষ্যদিগকে তাহা ভগ্ন করিতে বলিতেন। কি বীরত্ব! আমরা লোকের ভয়ে—সমাজের ভয়ে কত বিষয় সত্য বলিয়া বুঝিয়াও তাহা পালন করিতে পারি না। মহম্মদের জীবন আমাদিগকে এই শিক্ষা দিতেছে, যে নির্ভয়ে মহান্ পরমেশ্বরের নাম প্রচার কর—নির্ভয়ে সত্যের ঘোষণা কর।

অবশেষে আমাদের ব্রাহ্মসমাজের কথা বলা আবশ্যক বোধ হইতেছে। যখন এই বঙ্গদেশ অন্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল, তখন মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় নিরাকার পরব্রহ্মের নাম ঘোষণা করেন। কত নির্যাতন সহ্য করিয়া তিনি ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহার বিষয় অধিক আর কি বলিব, আমরা অনেকেই তাঁহার বিষয় বিশেষরূপে অবগত আছি। তৎপর আমেরিকার দিকে একবার দৃষ্টিপাত করুন। আমরা আমেরিকার নিকট বিশেষ ঋণী। মহাত্মা থিয়োডোর পার্কার বোষ্টন নগরে একেশ্বরবাদ প্রচার করেন। পার্কারই "Harmonious development সর্ব্ব সামঞ্জসীভূত উন্নতির" বিষয় কথায় এবং কার্য্যে বিশেষ ভাবে দেখাইয়া গিয়াছেন। তাঁহার রাশীকৃত গ্রন্থ পাঠ করিলে আমরা দেখিতে পাই যে তিনি নানা বিষয়ে পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার গ্রন্থে, যেমন ধর্ম্মভাব তেমনি সাহিত্য, বিজ্ঞান দর্শন প্রভৃতি নানা বিষয়ের উল্লেখ দেখিতে

পাওয়া যায়। এদিকে যেমন তাঁহার ধর্ম্মানুরাগ ও পাণ্ডিত্য ছিল, তেমন অপরদিকে দেশহিতৈষণাও ছিল। তিনি দেশের নানা হিতকর কার্য্যে রত থাকিতেন। দাসত্ব প্রথার বিরুদ্ধে তিনি মহাযুদ্ধ করিয়াছিলেন। এবং তিনিই ত্রিত্ববাদের বিরুদ্ধে সমর ঘোষণা করিয়া মহান্ নিরাকার পরব্রহ্মের নাম ঘোষণা করিয়াছিলেন। এই সকল কারণে চারিদিকে তাঁহার শত্রুদল বৃদ্ধি হইয়াছিল। কিন্তু সেই বীরপুরুষ দ্বিতীয় লুথর সদৃশ হইয়া কুসংস্কার, ও নরদেবতার বিরুদ্ধে সমর ঘোষণা করিয়াছিলেন। ইহাঁর জীবনচরিত পাঠ করা আমাদের একান্ত কর্ত্তব্য; বিশেষতঃ ব্রাহ্মসমাজের প্রত্যেকের তাঁহার গ্রন্থ ও তাঁহার জীবন চরিত পাঠ করা অতীব কর্ত্তব্য। ব্রাহ্মসমাজ তাঁহার নিকট বিশেষ ভাবে ঋণী।

অবশেষে মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেনের নাম উল্লেখ করা আজ আবশ্যক, তাহা না করিলে আমরা অকৃতজ্ঞ হইব। যদিও সত্যের অনুরোধে আমরা তাঁহাকে পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছি, তথাপি তাঁহার জীবনের বিশেষ বিশেষ গুণ আমাদের স্মরণ করা একান্ত কর্ত্তব্য। কেশবচন্দ্রের জীবনে পবিত্রতার ভাব বিশেষ ভাবে পরিলক্ষিত হইত। তাঁহার জীবনে Puritanic ভাব খুব প্রবল ছিল। আবার অন্য দিকে তাঁহার মধুর উপাসনা. প্রার্থনা ও উপদেশ সকল আমাদের বিশেষ উপকার সাধন করিয়াছে। সেজন্য তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ থাকিব। তাঁহার জীবন চরিত আমাদের সকলের পাঠ করা উচিত।

যে সকল মহাপুরুষের বিষয় এখানে বর্ণনা করা হইল, তাঁহারা জগতে বিশেষ কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। কিন্তু আরও অনেক লোক জগতের বিশেষ কল্যাণ সাধন করিয়া গিয়াছেন। আমরা তাঁহাদের নিকটও বিশেষ কৃতজ্ঞ হইব। আর যে সকল লোকের নাম জগতের ইতিহাসে উল্লিখিত হয় নাই, এমন সাধু লোকও জগতে অনেক জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহারা গোপনে পরমেশ্বরের নাম কীর্ত্তন ও ধ্যানে জীবন কর্ত্তন করিয়াছেন। সর্ব্বদর্শী পরমেশ্বর তাঁহাদের নামকে গৌরবান্বিত করিবেন। কিন্তু আমাদের বিশেষ স্মরণ রাখা উচিত যে মহান্ পরমেশ্বরই মানবের প্রধান ধর্ম্মাচার্য্য, তিনিই গুরুর গুরু, পরম গুরু।

১৫ই মাঘ, ২৭শে জানুয়ারী, শনিবার—প্রাতঃকালে মন্দিরে উপাসনা হয়। বাবু নীলমণি চক্রবর্ত্তী মহাশয় আচার্য্যের কার্য্য করেন। তাঁহার উপদেশের মর্ম্ম এই :—

গত ১২ই মাঘ প্রাতে এই মন্দিরে কেমন উৎসাহের সহিত ব্রহ্মনাম কীর্ত্তন হইতেছিল। ব্যাকুলতার ভাবে পরমেশ্বরের সন্তানগণের মুখ কেমন উজ্জ্বল ও সুন্দর হইয়াছিল। ব্রহ্মনাম এতই মধুর লাগিতেছিল যে অনেক বেলা হইয়া গেল, তথাপি অনেকে মন্দির ত্যাগ করিতে পারিলেন না। পথে এক বন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ হইল। তিনি বলিলেন "এখন প্রাণে কত আনন্দ, হৃদয়ে কত আশা জাগিয়াছে, কিন্তু এই ভাব স্থায়ী হয় না কেন?" এই কথা আমারও প্রাণে লাগিল। মনে হইল যে মাঘোৎসবের সময় আমরা যেন নূতন হইয়া যাই, আবার কয়েক দিন পরে আমাদের যে হীন দশা সেই হীন দশা হয়। এই সময় একটী আখ্যায়িকার কথা স্মরণ হইল। এক সময়ে এক ব্যক্তি আসিয়া এক ধর্ম্মপ্রচারককে জিজ্ঞাসা করিল, "শ্রদ্ধেয় মহাশয়, আমি অনেক বৎসর ধরিয়া ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনাদি করিয়া আসিতেছি, নীতিপালন এবং পরহিত সাধনও করিয়া থাকি। কিন্তু কিছুতেই আমার জীবনের পরিবর্ত্তন হইতেছে না. আমার পাপও যাইতেছে না।" এই কথা শুনিয়া উক্ত ধর্ম্মপ্রচারক বলিলেন "যাও, গৃহে ফিরিয়া যাও এবং প্রভু পরমেশ্বরকে গৌরবান্বিত কর।" এই কথার মূলে অমূল্য সত্য নিহিত রহিয়াছে। যত দিন না আমরা আমাদের ইচ্ছাকে সম্পূর্ণরূপে প্রভু পরমেশ্বরের অধীন করিতে পারিব, যতদিন না আপনাদের গৌরবকে ভুলিয়া জীবনের সকল কার্য্যের মধ্যে তাঁহাকে গৌরবান্বিত করিতে শিক্ষা করিব, ততদিন কিছুই হইবে না। আমরা কত সাধন ভজন, কত উপাসনা সঙ্গীত করিয়া থাকি। কত উৎসব আসে এবং যায়, অথচ আমরা তাঁহার হাতে সম্পূর্ণরূপে আপনাকে ছাড়িয়া দিতে পারি না। আপনাদের শক্তি ও জ্ঞানকে আমরা কত বিশ্বাস করি, আপনাদের খ্যাতি এবং গৌরবের জন্য কত আমরা ব্যস্ত! সকল কার্য্যের সময় কি বলিতে পারি—"প্রভো! আমরা নয়, তুমিই গৌরবান্বিত হও?" ধর্ম্মজীবনের পথে যত প্রকার শত্রু আছে, তন্মধ্যে অহঙ্কার এবং আত্মাভিমানই প্রধান। ইহা ছাড়িয়াও ছাড়ে না। যে ব্যক্তি সকল ছাড়িয়া, সকল স্বার্থ সুখকে অগ্রাহ্য করিয়া সামান্য এক কৌপীন মাত্র ধারণ করিয়াছে, তাহারও কোথায় এই শত্রু লুক্কায়িত হইয়া বাস করে তাহা সে বুঝিতে পারে না। অলক্ষিত ভাবে এই আত্মাভিমান আমাদের জীবনে কতই অনর্থ সাধন করে, তাহা বলা যায় না। ইহা ভিতরে থাকিলে আলোচনার সময় সত্য নির্ণয়ের দিকে দৃষ্টি না থাকিয়া আপনার জেদ বজায় রাখিবার দিকে আকাঙ্ক্ষা হয়; কোনও সাধু কার্য্য করিবার সময় তাহার মধ্যে পরমেশ্বরের ইচ্ছা জয়যুক্ত হউক এইরূপ মনে না হইয়া কিসে আপনার গৌরব বর্দ্ধিত হয় প্রাণে এই ভাবই আসে। অন্য কেহ মতের বিরুদ্ধে কথা কহিলে এই অভিমান প্রাণে জাগিয়া উঠে, অন্যের যে বিবেক আছে, সত্য বুঝিবার শক্তি আছে, সে যে ঈশ্বরের সন্তান একথা আর মনে থাকে না। এই অভিমানের ভাব থাকিতে ধর্ম্মজীবনের প্রকৃত উন্নতি সাধিত হয় না। আমরা কত উৎসব করিতেছি, প্রভু পরমেশ্বরও করুণাদানে কখনও কৃপণতা করিতেছেন না। কিন্তু তাহা আমাদের জীবনে স্থায়ী হইতেছে না। পর্ব্বতশৃঙ্গে যতই বৃষ্টিধারা নিপতিত হউক না কেন, উন্নত বলিয়া সেখানে যেমন জল দাঁড়ায় না, সেইরূপ অহঙ্কৃত, আত্মাভিমানে স্ফীত ব্যক্তির জীবনে পরমেশ্বরের সত্য এবং করুণা স্থায়ী হয় না। আত্মাভিমান তাহা সরাইয়া দেয়। পরমেশ্বর করুন আমাদের এই শত্রু বিনষ্ট হউক। আমরা সর্ব্বতোভাবে তাঁহার অধীন হই, জীবন, বাক্য, কার্য্য ও চিন্তায়

আপনাদের গৌরব অন্বেষণ না করিয়া তাঁহাকে গৌরবান্বিত করিতে শিক্ষা করি। তিনি আমাদের জীবনের প্রভু, আমাদের সমাজের রাজা হউন। আমাদের সকল প্রাণ মিলিত হইয়া তাঁহারই দিকে ধাবিত হউক, আমাদের সকল ইচ্ছা একত্র মিলিয়া তাঁহার মঙ্গলময়ী ইচ্ছার সঙ্গে যুক্ত হউক তাহা হইলে তাঁহার শান্তি, তাঁহার আনন্দে আমাদের প্রাণ, আমাদের জীবন প্লাবিত হইবে। এবং ব্রহ্মোৎসবের ফল স্থায়ী হইবে।

অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকার সময় ১৩ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট ভবনে রবিবাসরীয় নীতি বিদ্যালয়ের পুরস্কার বিতরণ হয়। বালক বালিকাগণ সঙ্গীত, আবৃত্তি এবং অভিনয় দ্বারা দর্শকগণকে তুষ্ট করিয়াছিল।

সায়ংকালে মন্দিরে শ্রীযুক্ত বাবু শশিভূষণ বসু মহাশয় উপাসনা করেন। তাঁহার উপদেশের সারাংশ এই :—

প্রচণ্ড রৌদ্রের উত্তাপে ধরা যখন উত্তপ্ত হয়, লোকে যখন গ্রীষ্মের উত্তাপে ছট্‌ফট্ করিতে থাকে, উত্তাপ যখন অসহ্য হইয়া উঠে, তখন দেখা যায়, প্রকৃতির নিয়মানুসারে আকাশে মেঘের উদয় হয়, এবং বৃষ্টিধারায় ধরা শীতল হইয়া থাকে। মানবসমাজেও প্রায় এইরূপ প্রণালী দেখা গিয়া থাকে। প্রায় ৪০০ শত বৎসর পূর্ব্বে বঙ্গদেশে বৈদান্তিক পণ্ডিতগণ যখন শুষ্ক ক্রিয়াকলাপ লইয়া ব্যস্ত ছিলেন, যখন অবিশ্বাস, নাস্তিকতা ও অপ্রেমে লোকের মন এক প্রকার শুষ্ক ও কঠোর হইয়া উঠিয়াছিল, তখন মহাত্মা চৈতন্য নবদ্বীপে জন্মগ্রহণ করিয়া পরমেশ্বরের মধুর নামে বঙ্গদেশ প্লাবিত করিয়াছিলেন। তিনি ন্যায় শাস্ত্রে মহা পণ্ডিত হইয়াও পাণ্ডিত্য দূরে নিক্ষেপ করিয়া হরিপ্রেমে উন্মত্ত হইয়া অসংখ্য নরনারীকে মাতাইয়া তুলিয়াছিলেন। তাঁহার জীবনে দেখা যায় যে, তিনি পরমেশ্বরকে পাইবার জন্য নিরন্তর ব্যাকুল হইয়া বেড়াইতেন। তিনিই নগর সংকীর্ত্তন প্রবর্ত্তিত করেন, তাঁহার পূর্ব্বে নগর সংকীর্ত্তন ছিল না, লোকে করতালী দিয়া কীর্ত্তন করিত। মহাত্মা চৈতন্য নগর সংকীর্ত্তন বাহির করিয়া কত লোককে যে প্রেমের জালে আবদ্ধ করিয়াছিলেন তাহা বলা যায় না। তিনি মধুরভাবে হরিনাম সাধন করিয়াছিলেন। বৈষ্ণব শাস্ত্রের মধ্যে যে শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মাধুর্য্য ভাবের উল্লেখ দেখা যায়, মহাত্মা চৈতন্য এই শেষ ভাবের সাধন করিয়া প্রেমের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া গিয়াছেন। এই ভাবের সাধন করিয়া তিনি প্রেমে বিভোর হইয়া নীলাম্বু-বক্ষে চন্দ্রের জ্যোতি দর্শনে ঝম্প প্রদান করেন। মহাত্মা চৈতন্য বঙ্গদেশে প্রেমের বিপ্লব উপস্থিত করিয়া গিয়াছেন। পরমেশ্বর কৃপা করুন, আমরা যেন চৈতন্যের ব্যাকুলতা ও অনুরাগ জীবনে লাভ করিতে সমর্থ হই।

১৬ই মাঘ, ২৮এ জানুয়ারি, রবিবার—আজ উৎসবের শেষ দিন। অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এবারেও উদ্যান সম্মিলন হইয়াছিল। এবার সকলে উল্টাডিঙ্গি, বাবু রাজকৃষ্ণ করের বাগানে সম্মিলিত হইয়াছিলেন। প্রাতঃকাল হইতেই বন্ধুগণ তথায় যাইতে আরম্ভ করেন। বেলা প্রায় ১০টার সময় সকলে একত্র হইলে সমবেত উপাসনা হয়। শ্রীযুক্ত বাবু নবদ্বীপচন্দ্র দাস মহাশয় উপাসনার কার্য্য করেন। তাঁহার উপদেশের সারমর্ম্ম এই ;—

মাঘোৎসব—ব্রহ্মোৎসব, মানবীয় ব্যাপার নয়, ইহাতে স্বয়ং ভগবান ব্যাকুল আত্মাদিগকে লইয়া লীলা করেন, ইহাতে মানব-আত্মাতে স্বর্গের প্রভু স্বয়ং স্বর্গের অমৃতবারি সিঞ্চন করেন, স্বর্গের পুষ্পবৃষ্টি বর্ষণ করেন। যাঁহারা পিপাসিত হইয়া আইসেন তাঁহারা তৃপ্ত হইয়া যান। তবে অনেক সময় দেখা যায়, বৃষ্টি খুব হইয়া গিয়াছে, একদিক ভাসিয়া গিয়াছে, কিন্তু অন্য দিক শুষ্কই রহিয়াছে। অনেক সময় দেখা যায়, ফুল সকল ফুটিয়াছে, উত্তম সাজে সজ্জিত হইয়াছে, কিন্তু নিচে লুক্কায়িতভাবে কাঁটা সকল রহিয়াছে, তুলিতে গেলে, তাহাতে হাত লাগাইতে গেলে আঘাত পাওয়া যায়। তাই ব্রহ্মোৎসবে প্রতি বৎসরেই এক মহা কাণ্ড হয়, কিন্তু শেষে তাহার সুফল দীর্ঘকাল ভোগ করিতে পারি না। মাঘোৎসবের ব্যাপার যাঁহারা দেখিয়াছেন তাঁহারাই অবাক হইয়াছেন। কিন্তু শেষে তেমন ফল দেখেন না কেন? ইহার উত্তর আমি এই দিতে পারি যে এক দিক দিয়া বৃষ্টির জল গড়াইয়া গিয়াছে, সকল দিক ভিজে নাই। কাঁটার উপরই ফুল সকল পড়িয়াছিল, তাই এ ফল ফলিয়াছে। যদি এই সময় সকল দিকে দৃষ্টি করিতেন এবং ভিজাইতে চেষ্টা পাইতেন, বিদ্বেষ কাঁটা সকলের প্রতি দৃষ্টি করিয়া তুলিয়া ফেলিতে চেষ্টা করিতেন, তাহা হইলে এ উৎসবের শেষে যাহা দেখিতে পাইতেন, তাহা এক অপূর্ব্ব জিনিষ হইত। কিন্তু তাহা না হওয়াতেই এই দুর্দ্দশা হইতেছে।

সে কাঁটা কি? আমি আজ একটী কাঁটার কথা বলিতেছি, সেইটীই প্রধান কাঁটা বলিয়া মনে হয়, সেটী আমিত্ব। নিজকে না ভুলিতে পারিলে এ বৃষ্টি এ পুষ্পবর্ষণে সে শোভা হইতেছে না। তাই মিল করিতে যাই, আলিঙ্গন করি, কোথায় কোমল স্পর্শে এবং গন্ধে আকৃষ্ট হইবে, না নিচের কণ্টকের আঘাতে দূরে পলায়ন করে। এই আমিত্বই মহাশত্রু। নিজে একটা কর্ত্তা হইব, নিজের কোটটা বজায় রাখিব, নিজের ষোল আনা আগে, তাহার পর আর সকল, এই জন্যই এ ফল ফলিতেছে। আজ সম্মিলনীর উৎসবে একথা এই জন্যই বলিতেছি, যদি সম্মিলন করিতে চাও আপনাকে ভোল, নিজের যাহা করিবার আছে কর, আপনা আপনি সম্মিলন হইবে, সম্মিলনের জন্য ভাবিতে হইবে না এবং ব্যস্তও হইতে হইবে না। অবশ্যই ইহা বলিয়া নিজের মত ও বিশ্বাসকে বিসর্জ্জন করিবে না। এই নির্জ্জনে ঈশ্বর সেই জন্য ডাকিয়া আনিয়াছেন, যাহার যে দিক ভিজে নাই ভিজাইয়া লও, যাহার যে কাঁটাটা তুলিতে পার নাই এখানে তুলিয়া লও। পিতা দয়ালু তিনি শত অপরাধ মার্জ্জনা করিতে প্রস্তুত আছেন এবং সেই জন্যই এই ব্যাপার আনিয়াছেন এখন আমরা তাঁহার সেই প্রসাদ লাভ করিয়া ধন্য হই।

তৎপর বেলা প্রায় ৪টা পর্য্যন্ত ব্রাহ্মসমাজের বর্ত্তমান আধ্যাত্মিক অবস্থা বিষয়ে আলোচনা হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত

উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের উপর সেদিন আলোচ্য বিষয়ের অবতারণার ভার ছিল।

এই আলোচনাতে শ্রীযুক্ত গুরুচরণ মহলানবিশ শ্রীযুক্ত মথুরামোহন গাঙ্গুলী, শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল, শ্রীযুক্ত কেদার নাথ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত নবদ্বীপচন্দ্র দাস প্রভৃতি মহাশয়গণ কিছু কিছু বলেন।

সায়ংকালে মন্দিরে উপাসনা হয়। শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় আচার্য্যের কার্য্য করেন। তিনি নিম্নলিখিত মর্ম্মে উপদেশ প্রদান করেন :—

আমাদের মাহোৎসব সাঙ্গ হইল। ভক্তবৃন্দ ত্বরায় স্ব স্ব স্থানে গমন করিবেন। লোকে যখন মেলা হইতে ফিরিয়া আসে, তখন পাড়ার লোক দেখিতে আসে কে কি কিনিয়াছে, কে কি পাইয়াছে, কে কি আনিয়াছে। উৎসব হইতে প্রতি নিবৃত্ত হইলে লোকে দেখিতে চাহিবে কে কি পাইল। অতএব উৎসবান্তে একবার আলোচনা করি, কে কি পাইলাম। ব্রহ্মশক্তির লীলা অতি অদ্ভুত। ইহা যখন অবতীর্ণ হয় তখন নানা দিকে নানা ফল উৎপন্ন করে। যেমন একই পৃথিবীর রস বৃক্ষ বিশেষে ও ফল বিশেষে বিশেষ বিশেষ রস প্রসব করিয়া থাকে, কোনও ফল মিষ্ট কোনও ফল তিক্ত, কোনও ফল কটু ইত্যাদি, তেমনি একই ব্রহ্মশক্তি হৃদয়ে হৃদয়ে বিভিন্ন ফল উৎপন্ন করিয়া থাকে। যদি এরূপ কোনও রাজাকে দেখেন, যাহার দ্বারে দশজন প্রার্থী দশটী প্রার্থনা লইয়া উপস্থিত; তিনি সমুদয় প্রার্থনা শুনিয়া একটী শব্দ উচ্চারণ করিলেন, অমনি দশজনের দশ প্রকার প্রার্থনা পূর্ণ হইয়া গেল, তাহা হইলে তিনি কেমন বিস্ময়ান্বিত হন? ব্রহ্ম শক্তির আবির্ভাব ও ক্রিয়া এমনি বিস্ময়কর ব্যাপার। ব্রহ্ম এক শব্দ উচ্চারণ করিলেন, অমনি আমাদের দশজনের দশটী প্রার্থনা পূর্ণ হইয়া গেল। ব্রহ্মশক্তির আবির্ভাবে দশটী হৃদয়ে দশটী সংকল্প জাগিল। কেহ প্রতিজ্ঞা করিলেন এবার হইতে উপাসনাশীল জীবন যাপন করিবেন; কেহ প্রতিজ্ঞা করিলেন, যাহার অনিষ্ট করিয়াছেন তাহার ক্ষতিপূরণ করিবেন; কেহ প্রতিজ্ঞা করিলেন, ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারে জীবন সমর্পণ করিবেন; কেহ প্রতিজ্ঞা করিলেন জীবনের অপবিত্রতা দূর করিবেন ইত্যাদি। এক শক্তি শতধা হইয়া শত প্রতিজ্ঞার উদয় করিল। হৃদয়ে সৎসংকল্পের জন্ম হইতেই আমরা ব্রহ্মশক্তির আবির্ভাব লক্ষ্য করিয়া থাকি। অদ্য উৎসবান্তে একবার আলোচনা করিয়া দেখি হৃদয়ে কোনও সাধু সংকল্প জন্মিল কি না। কি লইয়া আমরা উৎসব হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইতেছি। কাহার হৃদয়ে কি সংকল্প জাগিয়াছে, প্রত্যেকে লক্ষ্য করুন এবং যাহাতে সম্বৎসরে তাহা কার্য্যে পরিণত হয়, তাহার উপায় বিধান করুন।"

এইরূপে চতুঃষষ্টিতম মাঘোৎসবের কার্য্য সম্পন্ন হইল। অপরাপর বৎসরের ন্যায়, এবারেও নানা স্থান হইতে ব্রাহ্মবন্ধুগণ উৎসবে যোগ দিবার জন্ম সমাগত হইয়াছিলেন। দুঃখের বিষয় কার্য্যবিবরণ সমগ্রভাবে প্রকাশ করিতে পারা গেল না। যাঁহাদের উপদেশাদির বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে তাহাই প্রকাশিত হইল। যে সকল বক্তৃতাদির বিবরণ পাওয়া গেল না তাহা প্রকাশ করিতে পারা গেল না।

ব্রাহ্মসমাজ।

বর্ত্তমান বর্ষের জন্য শ্রীযুক্ত আনন্দমোহন বসু মহাশয় সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভাপতি, শ্রীযুক্ত রজনীনাথ রায় মহাশয় সম্পাদক, শ্রীযুক্ত অঘোরনাথ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত প্রাণকৃষ্ণ আচার্য্য মহাশয়দ্বয় সহকারী সম্পাদক এবং শ্রীযুক্ত গুরুচরণ মহলানবিশ মহাশয় কোষাধ্যক্ষ মনোনীত হইয়াছেন।

অধ্যক্ষ সভা—নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ এবারকার সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অধ্যক্ষ সভার সভ্য মনোনীত হইয়াছেন :—

কলিকাতার জন্য পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী, বাবু হেরম্বচন্দ্র মৈত্র, উমেশচন্দ্র দত্ত, কৃষ্ণকুমার মিত্র, আদিনাথ চট্টোপাধ্যায়, নবদ্বীপ চন্দ্র দাস, ডাক্তার নীলরতন সরকার, বাবু দ্বারকানাথ গাঙ্গুলী, ডাক্তার, পি, কে, রায়, বাবু কালীশঙ্কর সকুল, নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, শশিভূষণ বসু, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, উমাপদ রায়, দুর্গামোহন দাস, শ্রীমতী কাদম্বিনী গাঙ্গুলী, ডাক্তার মোহিনীমোহন বসু, মধুসূদন সেন, ডাক্তার জে, এন, মিত্র, বাবু আদিত্যকুমার চট্টোপাধ্যায়, ডাক্তার পি, সি, রায়, রায় গুণাভীরাম বড়ুয়া, কুমারী কামিনী সেন, বাবু বঙ্কবিহারী বসু, বাবু চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, যদুনাথ চক্রবর্ত্তী, সীতানাথ নন্দী, বিপিনবিহারী সরকার, হরিমোহন ঘোষাল, জগদীশচন্দ্র বসু।

মফস্বলের জন্য মিঃ লছমন প্রসাদ লক্ষ্ণৌ, ডাঃ ডি, বসু পুরুলিয়া, নীলমণি চক্রবর্ত্তী খাসিয়া হিল, বিপিনবিহারী রায় মানিকদহ, মুন্সী জালালউদ্দিন জলপাইগুড়ী, বাবু চণ্ডীকিশোর কুশারী ঢাকা, নবকান্ত চট্টোপাধ্যায় ঐ, শশিভূষণ বসু নেপাল, হীরালাল হালদার বহরমপুর, ভুবনমোহন কর দিনাজপুর, রজনীকান্ত ঘোষ ঢাকা, কুমারী কুমুদিনী খাস্তগীর মতিহার, রাধাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় বগুড়া, কালীমোহন দাস বরিশাল, মিঃ কে, এন, রায় সি, এস, বাবু চণ্ডীচরণ সেন মুন্সীগঞ্জ, শ্রীনাথ চন্দ ময়মনসিংহ, মধুসূদন রাও কটক, পার্ব্বতীচরণ গুপ্ত পূর্ণিয়া, কৈলাসচন্দ্র বাগছী পাবনা।

নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ নিম্নলিখিত স্থানের প্রতিনিধিরূপে অধ্যক্ষ সভাতে গৃহীত হইয়াছেন :—বাবু রাজচন্দ্র চৌধুরী শিলং, বাবু ভুবনমোহন সেন, ফরিদপুর, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় বাঁকুড়া, সাতকড়ি দেব কোন্নগর, ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্ত্তী দার্জ্জিলিং, মিঃ কে, জি, গুপ্ত কৃষ্ণনগর, বাবু বিশ্বনাথ কর কটক, কৃষ্ণকুমার মিত্র টাঙ্গাইল, মধুসূদন সেন বোয়ালিয়া, শরচ্চন্দ্র রায় ময়মনসিংহ, নবদ্বীপচন্দ্র দাস বগুড়া, দ্বারকানাথ ঘোষ কাঁথি।

কার্য্যনির্ব্বাহক সভা—গত ১২ই ফেব্রুয়ারী অধ্যক্ষ সভার বিশেষ অধিবেশনে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ বর্ত্তমান

বৎসরের জন্য কার্য্যনির্ব্বাহক সভার সভ্য মনোনীত হন :—বাবু যদুনাথ চক্রবর্ত্তী, নবদ্বীপচন্দ্র দাস, হেরম্বচন্দ্র মৈত্র, কৃষ্ণকুমার মিত্র, ডাঃ পি, কে, রায়, ডাঃ এম, এম, বসু, বাবু কালীশঙ্কর সুকুল, বাবু উমাপদ রায়, মধুসূদন সেন, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, ডাঃ পি, সি, রায় এবং বাবু বঙ্কবিহারী বসু।

গত ৬ই ফেব্রুয়ারী মঙ্গলবার সাধনাশ্রমে একটি ব্রাহ্ম বিবাহ হইয়া গিয়াছে। পাত্রের নাম শ্রীমান্ হারাণচন্দ্র সিংহ রায়, বয়স প্রায় ৩০ বৎসর; পাত্রী কুমারী যমুনাবালা, বয়স অনুমান ২৮ বৎসর। কয়েক বৎসর হইল যে তিনটি অসহায়া নেপালী বালিকা ব্রাহ্ম সমাজের ক্রোড়ে আশ্রয় গ্রহণ করেন, এই পাত্রী তাঁহাদের সর্ব্ব জ্যেষ্ঠা। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী এই বিবাহে আচার্য্যের কার্য্য করেন। বিবাহ ৩ আইন অনুসারে রেজিষ্টারী হইয়াছে।

গত মাঘোৎসব যে কেবল কলিকাতাতেই সম্পন্ন হইয়াছে তাহা নহে, ভারতের আরও অনেক স্থানে ব্রাহ্মগণ উৎসাহের সহিত উৎসব করিয়াছেন। ঈশ্বরের করুণায় এমন দিন আসিবে যখন কেবল ভারতবর্ষ নহে, কিন্তু সমস্ত জগৎবাসী এই মহা উৎসবে যোগদান করিবে। আমরা অনেক স্থানের উৎসবের বিবরণ প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহা এখন প্রকাশ করা সুবিধাজনক নহে। এজন্য প্রকাশিত হইল না।

আমরা শুনিয়া বিশেষ আনন্দিত হইলাম যে আমাদের লক্ষ্ণৌস্থ নববিধান ও সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্যগণ মিলিত হইয়া মাঘোৎসব করিয়াছেন। লক্ষ্ণৌতে একটি ব্রহ্ম মন্দির আছে, এপর্য্যন্ত নববিধানী বন্ধুগণই তাহা ব্যবহার করিয়া আসিতেছিলেন। সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের সভ্যগণ স্বতন্ত্র স্থানে উপাসনাদি করিতেন। এবারও তাঁহারা স্বতন্ত্র উৎসবের উদ্যোগ করিতেছিলেন। কিন্তু ইতিমধ্যে নববিধানী বন্ধুগণ একত্র মিলিয়া উৎসব করিবার জন্য তাঁহাদিগকে আহ্বান করেন। তৎপর সকলে মিলিত হইয়া প্রার্থনা পূর্ব্বক উৎসবের কার্য্য প্রণালী স্থির করেন এবং তদনুসারেই উৎসব হয়। নববিধান প্রচারক শ্রীযুক্ত দীননাথ কর্ম্মকার এবং সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রচারক শ্রীযুক্ত লছমন প্রসাদ এই উৎসবের কার্য্য সম্পন্ন করেন।

ব্রাহ্মবিবাহ—বিগত ২০এ জানুয়ারী ভাগলপুরে একটি ব্রাহ্মবিবাহ হইয়া গিয়াছে। পাত্রী আমাদের শ্রদ্ধেয় বন্ধু বাবু নিবারণ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের কন্যা কুমারী সরোজিনী এবং পাত্র শ্রীমান্ লালবিহারী রায় চৌধুরী বি, এ। নিবারণ বাবু স্বয়ং আচার্য্যের কার্য্য করেন। বিবাহ ৩ আইন অনুসারে রেজিষ্টারী হইয়াছে।

প্রচার যাত্রা—সাধনাশ্রম হইতে এক প্রচার-দল নির্গত হইয়া বেহার ও উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে যাত্রা করিয়াছেন। আপাততঃ শ্রীযুক্ত ভাই প্রকাশ দেব, শ্রীযুক্ত গুরুদাস চক্রবর্ত্তী শ্রীযুক্ত কাশীচন্দ্র ঘোষাল, শ্রীযুক্ত ভাই সুন্দর সিং এই প্রচার দলে আছেন। কাশী বাবু কিছুদিন পরে ফিরিয়া আসিবেন এবং তৎস্থানে শ্রীমান্ শ্রীরঙ্গ বিহারী লাল গিয়া তাঁহাদের সঙ্গে যোগ দিবেন। এই প্রচার-দল বর্দ্ধমান, রামপুর হাট, নলহাটী, মুর্শিদাবাদ, ভাগলপুর, মুঙ্গের প্রভৃতি স্থানের সমাজ পরিদর্শন করিয়া বাঁকীপুর পর্য্যন্ত পৌঁছিয়াছেন। সর্ব্বত্রই ব্রাহ্মবন্ধুগণ সাদরে ইঁহাদিগকে গ্রহণ করিয়াছেন, এবং বিধাতা ইঁহাদের ক্ষুদ্র কার্য্যের প্রতি কৃপা করিয়াছেন। ইঁহারা ক্রমে উত্তর পশ্চিমাঞ্চলাভিমুখে অগ্রসর হইবেন এবং উত্ত পশ্চিমে কিছুকাল স্থিতি করিবেন। ইঁহাদের প্রচার যাত্রার পূর্ব্বদিন কলিকাতা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে তদর্থ বিশেষ উপাসনা ও দান সংগ্রহ হয়। ঐ উপাসনা কালে ৩০৲ টাকার অধিক সংগৃহীত হইয়াছিল। তাহাই সম্বল করিয়া ইঁহারা বহির্গত হইয়াছেন। অবশিষ্ট নির্ভর প্রভু পরমেশ্বরের উপর।

আমাদের নূতন সহযোগী "ব্রাহ্ম" খাসিয়া মিশন সম্বন্ধে এই প্রকার মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন ;—"সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত খাসিয়া মিশন একটি অতি মহৎ কার্য্য। এই মিশনের ভারপ্রাপ্ত, বিশ্বস্ত কার্য্যকারক শ্রীযুক্ত নীলমণি চক্রবর্ত্তী নানারূপ বাধা ও প্রতিকূলতার মধ্যে যেরূপ সহিষ্ণুতার সহিত কার্য্য করিয়াছেন, আমরা তাহার প্রশংসা করিয়া শেষ করিতে পারি না। আমরা আশাকরি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ এই মিশনকে স্থায়ী ভূমিতে দাঁড় করাইবার জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করিবেন।"

নিম্নলিখিত প্রণালীতে মোসমাই, সওয়াবী ও নন্‌গ্রিম ব্রাহ্মসমাজের সভ্যগণ মিলিত হইয়া চিরাপুঞ্জিতে মাঘোৎসব সম্পন্ন করেন :—

রবিবার ২২এ জানুয়ারী মিসন হাউসে উৎসবের উদ্বোধন সূচক উপাসনা হয়। মিঃ ইউ বরধন রায় আচার্য্যের কার্য্য করেন।

সোমবার—প্রাতে মিঃ ইউ বরধন রায় এবং সন্ধ্যায় মিঃ ইউ সাইমন উপাসনা করেন।

মঙ্গলবার—প্রাতে ইউ বরধন রায় উপাসনা করেন, মিঃ কাবাইরিন প্রার্থনা করেন। মধ্যাহ্নে বালক বালিকা সম্মিলন হয়, তাহাতে মিঃ সাইমন প্রার্থনা করেন। অপরাহ্নে মিঃ সাইমন "অন্য ধর্ম্মের সহিত ব্রাহ্মধর্ম্মের কি তফাৎ" এ বিষয়ে বক্তৃতা করেন, তৎপূর্ব্বে মিঃ ইউ হালী সিং প্রার্থনা করেন।

গত ১লা ফেব্রুয়ারী সাধনাশ্রমের প্রতিষ্ঠা দিন উপলক্ষে সাধনাশ্রমে বিশেষ উৎসব সম্পন্ন হইয়াছে। ১৮৯২ সনের এই দিনে পরিচারকাশ্রম প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রাতে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় উপাসনা করেন। আশ্রমের এ ক্ষুদ্র জীবনে ঈশ্বরের যে অপার করুণার নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে, শাস্ত্রী মহাশয় কয়েকটি ঘটনা উল্লেখ করিয়া তাহা অতি উজ্জ্বল রূপে উপাসক বৃন্দের হৃদয়ে মুদ্রিত করেন। তৎপরে বাবু জয়শঙ্কর রায়, যিনি এক বৎসর কাল আশ্রমের সহিত সংসৃষ্ট আছেন, তাঁহাকে ওয়ার্কাররূপে গ্রহণ করা হয় এবং শ্রীমতী চঞ্চলা ঘোষ ও বাবু হরিমোহন ঘোষাল সংকল্পাধীন ওয়ার্কাররূপে গৃহীত হন এবং বাবু কুঞ্জলাল ঘোষ, বাবু হারাণচন্দ্র সিংহ রায় ও মুন্সী জালাল উদ্দিন আশ্রমের সহায়শ্রেণীভুক্ত হন। অপরাহ্নে শ্রীযুক্ত বাবু নবদ্বীপচন্দ্র দাস উপাসনার কার্য্য করেন।

২১১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, ব্রাহ্ম মিশন যন্ত্রে শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দত্ত কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও ২০এ ফাল্গুন প্রকাশিত।

তত্ত্ব কৌমুদী

ধর্ম্ম ও সমাজতত্ত্ব বিষয়ক পাক্ষিক পত্রিকা।

২২শ সংখ্যা।
১৬শ ভাগ।

১৬ই ফাল্গুন, মঙ্গলবার, ১৮১৫ শক, ব্রাহ্ম সম্বৎ ৬৫

বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২৷৷০
মফস্বলে ৩৲
প্রতি খণ্ডের মূল্য ৵০

প্রার্থনা।

হে মঙ্গলময় বিধাতা! তুমি কতবার আমাদের হৃদয়কে জাগ্রত কর আবার কতবার আমরা মোহ-নিদ্রাতে অভিভূত হই। কতবার হৃদয়ে শুভ সঙ্কল্পের অভ্যুদয় কর, কতবার তোমার চরণে প্রতিজ্ঞা করি, আবার কতবার তাহা বিস্মৃত হইয়া অবসন্ন ও জড়ভাবাপন্ন হইয়া পড়ি। এইরূপে আমাদের জীবন দুর্ব্বলতা সবলতার মধ্যে আন্দোলিত হইয়া যাইতেছে। কিন্তু দুর্ব্বলতার দ্বারা সময়ে সময়ে অভিভূত হইলেও আমরা নিরাশ হই না, কারণ তোমার করুণা সর্ব্বদা আমাদের সহায়। অকপটচিত্তে যে তোমার সাহায্য প্রার্থনা করে তুমি তাহার সহায়তা করিতে কখনই বিমুখ নও। তোমার প্রসাদে তাহার দুর্ব্বলতা সবলতাতে পরিণত হইয়া থাকে। আমরা নববর্ষের প্রারম্ভে তোমার চরণে পড়িয়া প্রার্থনা করিতেছি যে তুমি আমাদিগকে বল দেও যাহাতে আমরা বর্ত্তমান বর্ষে সমধিক দৃঢ়তার সহিত তোমার প্রদর্শিত পথের অনুসরণ করিতে পারি। তুমি আমাদের প্রত্যেকের উপরে যে কর্ত্তব্য ভার অর্পণ করিয়াছ তাহা যেন সমুচিত রূপে বহন করিবার জন্য চেষ্টা করি।

সম্পাদকীয় মন্তব্য।

আগামী বর্ষের কার্য্য সূচনা—নূতন বৎসরের জন্য কর্ম্মচারী, অধ্যক্ষ সভা, কার্য্যনির্ব্বাহক সভা প্রভৃতি মনোনীত হইয়া কার্য্যারম্ভ হইয়াছে। বর্ত্তমান বর্ষে কি কি কার্য্যে হস্তার্পণ করা হইবে সেই আলোচনা চলিয়াছে। মাননীয় সভাপতি মহাশয় তাঁহার বিগত সাম্বৎসরিক বক্তৃতাতে কতকগুলি কার্য্যের সূচনা করিয়াছেন। বিগত ব্রাহ্ম সম্মিলনীতে যে কয়েকটী গুরুতর বিষয়ের আলোচনা উপস্থিত করা হইয়াছিল, তাঁহার বক্তৃতাতেও সেইগুলির প্রতি বিশেষ দৃষ্টি ছিল। বর্ত্তমান বর্ষে সেইগুলি কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য কিঞ্চিৎ সচেষ্ট হওয়া কর্ত্তব্য। সম্মিলনীর তিন দিনের সমালোচনাতে প্রধানতঃ চারিটী বিষয়ের অবতারণা করা হয়। (১ম) ব্রাহ্মবালকদিগের শিক্ষা (২য়) ব্রাহ্মবালিকাদিগের শিক্ষা (৩য়) ব্রাহ্মদিগের সাংসারিক অবস্থা (৪র্থ) ব্রাহ্মসমাজের বর্ত্তমান আধ্যাত্মিক অবস্থা। সকলগুলিই অতিশয় প্রয়োজনীয় বিষয় এবং প্রত্যেক বিষয়েই কিছু কিছু করিবার আছে। ইহার মধ্যে ব্রাহ্ম বালক বালিকাদিগের শিক্ষাবিষয়ে কিঞ্চিৎ সূত্রপাত করা হইয়াছে এই মাত্র। কিন্তু তাহাতেও করিবার অনেক আছে। ব্রাহ্ম বালকদিগের জন্য একটী বোর্ডিং এবং ব্রাহ্মবালিকাদিগের জন্য একটী বোর্ডিং ও বিদ্যালয় স্থাপন করা হইয়াছে। উক্ত উভয় উপায়ে যে ইষ্টফল ফলিতেছে, তাহা আমরা সকলেই লক্ষ্য করিয়াছি। কিন্তু ক্ষোভের বিষয় যে উক্ত উভয় বিষয়েও ব্রাহ্মবন্ধুদিগের সাহায্য সমুচিতরূপে পাওয়া যাইতেছে না। ব্রাহ্মবালক বোর্ডিংটী ব্রাহ্মবালকদিগের জন্য করা হইয়াছিল, কিন্তু ব্রাহ্মবালকের সংখ্যা আশানুরূপ হয় নাই। বালক-বালিকার প্রকৃত শিক্ষার ন্যায় গুরু দায়িত্বভার ধর্ম্মসমাজের পক্ষে অতি অল্পই আছে। অথচ সমুচিত অর্থ সাহায্যের অভাবে উক্ত উভয় কার্য্যই অতি কষ্টের সহিত ও অসম্পূর্ণ ভাবে চালাইতে হইতেছে। আশা করি বর্ত্তমান বর্ষে এবিষয়ে বন্ধুগণের মনোযোগ অধিকতর রূপে আকৃষ্ট হইবে।

তৎপরে ব্রাহ্মদিগের সাংসারিক অবস্থা। ইহাও একটী গুরুতর চিন্তার বিষয়। এবিষয়ে যে প্রবন্ধ পঠিত হইয়াছিল তাহাও স্থানান্তরে প্রকাশিত হইল। ব্রাহ্মদিগের সাংসারিক অবস্থার উন্নতি বিধানের উপায় না করিতে পারিলে স্বরায় সমাজের বিশেষ অবনতি হইবে, এই আশঙ্কা অনেকের মনে হইয়াছে। বর্ত্তমান বর্ষে এবিষয়েও কিছু ভাবিবার ও করিবার আছে।

সর্ব্বশেষে সমাজের বর্ত্তমান আধ্যাত্মিক অবস্থা। এই এক মহৎ কার্য্যক্ষেত্র। কলিকাতাতেই করিবার কত আছে। কলিকাতার উপাসকমণ্ডলীটীর অবস্থা অতিশয় নিস্প্রভ। অন্যান্য ধর্ম্মসমাজে এরূপ এক একটী উপাসকমণ্ডলী কিরূপ

আধ্যাত্মিক শক্তির উৎসস্বরূপ হইয়া রহিয়াছে তাহা চিন্তা করিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। আর আমাদের উপাসকমণ্ডলীটীর অবস্থা পর্য্যালোচনা করিলে দুঃখিত হইতে হয়। উপাসনাকার্য্যের ভার যাঁহাদের প্রতি অর্পিত হয়, উপাসকদিগের সহিত তাঁহাদের ঘনিষ্ঠ যোগ নাই; উপাসকে উপাসকে ঘনিষ্ঠতা নাই। সহরের ব্রাহ্মদিগের সকলে নিয়মিত সাপ্তাহিক উপাসনাতে আসেন না। উপাসকমণ্ডলীর কার্য্যে অনেকের বিশেষ উৎসাহ দৃষ্ট হয় না। অর্থের অসচ্ছলতানিবন্ধন উপাসকমণ্ডলীর অত্যাবশ্যক ব্যয় নির্ব্বাহ করাও সময়ে সময়ে কঠিন বোধ হয়।

এইরূপ যে দিকেই দেখা যাইবে সেই দিকেই করিবার যথেষ্ট আছে। সুখের বিষয় বর্ত্তমান বর্ষের কার্য্যনির্ব্বাহক সভা ইতিমধ্যেই এই সকল বিষয়ে মনোযোগ দিতেছেন, আশা করা যাইতেছে যে বর্ত্তমান বর্ষ অতীত না হইতেই আমরা এই সকল বিষয়ে কিছু কিছু ফল দেখিতে পাইব। ব্রাহ্মসম্মিলনীতে পঠিত প্রবন্ধগুলি স্থানান্তরে প্রকাশিত হইল।

সম্পাদকীয় ও প্রাপ্ত প্রবন্ধ।

ব্রাহ্ম বালকদিগের শিক্ষা।

(৯ই মাঘ দিবসের ব্রাহ্ম সম্মিলনীতে শ্রীযুক্ত বাবু কৃষ্ণকুমার মিত্র কর্ত্তৃক বিবৃত।)

ব্রাহ্মগণ পুত্রদিগকে কিরূপ শিক্ষা দিতে ইচ্ছা করেন? যে শিক্ষাতে ধন মান লাভ হয়, সেই শিক্ষা দিতে চান, কি যদ্দ্বারা পূর্ণ মনুষ্যত্বের বিকাশ হয় সেই শিক্ষা দিতে চান? সন্তানগণ যদি বিনয়, প্রেম, সদিচ্ছা ও ঈশ্বর-ভক্তি-পরায়ণতা-শূন্য হইয়া কেবল ধনী ও মানী হয়, ব্রাহ্ম তাহাতে সন্তুষ্ট, না ধন মান-শূন্য হইয়াও যদি প্রেম, বিনয়, পবিত্রতা, সাধু ইচ্ছা ও ভগবদ্ভক্তি-পরায়ণ হয় তাহাতেই সন্তুষ্ট? আমাদের নিকট শিক্ষার উদ্দেশ্য কি?

প্রাচীন কালে গ্রীস দেশে স্পার্টা এক নগণ্য রাজ্য ছিল, ইহার অধিবাসিগণ দুর্ব্বল ছিল, তাহাদের চারিদিকে পরাক্রান্ত প্রতিদ্বন্দ্বী জাতি সমূহ বাস করিত। লাইকারগাস নামক একজন প্রতিভাশালী জ্ঞানী, জন্মভূমিকে বীর ভূমি করিবার জন্য দৃঢ়সঙ্কল্প হইলেন। বীর সৃষ্টি করা তাঁহার লক্ষ্য; সুতরাং স্বদেশের বালক ও বালিকাদিগকে সঙ্কল্পসিদ্ধির উপযোগী শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিলেন।

যাহারা বিকলাঙ্গ তাহারা কখনও বীর হইতে পারে না। সুতরাং তিনি আইন করিলেন যে বিকলাঙ্গ শিশুদিগকে বধ করিতে হইবে। বালকগণের যখন সাত বৎসর বয়স হইবে, তখন তাহাদের পিতামাতার নিকট হইতে তাহাদিগকে লইয়া আসিয়া রাজপুরুষদিগকর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত শিক্ষালয়ে রাখিতে হইবে। ৭ বৎসর হইতে ৩০ বৎসর পর্য্যন্ত তাহারা ব্যায়াম ও যুদ্ধকৌশল শিক্ষা করিবে। সহিষ্ণুতা শিক্ষা দিবার জন্য মধ্যে মধ্যে তাহাদিগকে নৃশংস ভাবে বেত্রাঘাত করা হইত। তাহাদের সর্ব্বাঙ্গ হইতে রুধিরধারা বহির্গত হইত, তথাপি কেহ আর্ত্তনাদ করিতে পারিত না। শীত, গ্রীষ্মে একই পরিচ্ছদ পরিধান করিত—কখনও কখনও অনশন-ব্রত অবলম্বন করিতে হইত—উদর পূর্ণ করিয়া কখনও তাহারা আহার করিতে পাইত না—ক্ষুধার জ্বালা নিবৃত্ত করিবার জন্য তাহাদিগকে মৃগয়া বা চৌর্য্যবৃত্তি অবলম্বন করিতে উৎসাহিত করা হইত। ৩০ বৎসর পূর্ণ না হইলে কেহ বিবাহ করিতে পারিত না—কোন সভা সমিতিতে যাইয়া তর্ক বিতর্কে যোগ দিতে পারিত না। লাইকারগাস যে শিক্ষা প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন তাহাতে অচিরকাল মধ্যেই স্পার্টার নরনারীগণ বিক্রমশালী হইয়াছিল। তাহাদের বীরদর্পে সমস্ত গ্রীসদেশ কম্পিত হইয়াছিল। লাইকারগাস স্বদেশবাসীকে বীর করিতে সঙ্কল্প করিয়াছিলেন এবং সঙ্কল্পসিদ্ধির উপযোগী শিক্ষার প্রথাও প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন সুতরাং তাঁহার লক্ষ্য সিদ্ধি হইয়াছিল।

আমরা ব্রাহ্মসমাজে জ্ঞানী, প্রেমী, দুর্জ্জয় ইচ্ছা-শক্তি-সম্পন্ন, ঈশ্বর-পরায়ণ লোক সৃষ্টি করিতে চাই। দশ হাজার ধনী লোক অপেক্ষা আমরা একজন ধার্ম্মিককে শ্রেষ্ঠ মনে করি। আমাদের যখন ইহাই মত, তখন পুত্রদিগকে কিরূপ শিক্ষা দিতে আমরা ইচ্ছা করি?

বর্ত্তমান সময়ে এদেশে অপরা বিদ্যার চর্চ্চা হইতেছে। কিন্তু পরা বিদ্যার প্রতি কাহারও মনোযোগ নাই। ব্রাহ্মদের পুত্রগণও দেশ-প্রথানুসারে কেবল অপরা বিদ্যায় শিক্ষিত হইতেছে। সুতরাং ব্রাহ্মদের লক্ষ্য সিদ্ধি হইতেছে না। পুত্রগণ জ্ঞান, প্রেম, সদিচ্ছা ও ঈশ্বরনিষ্ঠা পূর্ণ হইতেছে না। এখন আমাদের কর্ত্তব্য কি?

(১) অপরাবিদ্যা শিক্ষার জন্য দেশে বিদ্যালয়ের অভাব নাই। কিন্তু কোন বিদ্যালয়েই পরাবিদ্যা শিক্ষা দেওয়া হয় না। আমাদের বালকদের জন্য যদি পৃথক বিদ্যালয় স্থাপন করিতে পারিতাম তবে বিদ্যালয়েই পরা ও অপরা বিদ্যা শিক্ষা দিতে সক্ষম হইতাম। কিন্তু কেবল ব্রাহ্ম বালকদের জন্য বিদ্যালয় স্থাপন করা এখন নানা কারণে সম্ভব বোধ হইতেছে না। সুতরাং আমাদের বালকগণ সাধারণ বিদ্যালয়ে অপরা বিদ্যা শিক্ষা করিতেছে, গৃহে তাহাদিগকে পরা বিদ্যা শিক্ষা দিতে হইবে। ব্রহ্মজ্ঞান উদ্দীপিত করিবার জন্য গৃহেই ব্যবস্থা করিতে হইবে। পিতা মাতার উপরেই এই গুরুভার পড়িতেছে। তাঁহারা সন্তানদিগকে ক্রমে ঈশ্বর-বিষয়ক সহজ তত্ত্ব হইতে গভীরতর ধর্ম্মবিজ্ঞান শিক্ষা দিবেন। এইরূপে বালকদের জ্ঞান বৃদ্ধি করিতে হইবে।

(২) প্রেম-বিহীন মানুষ মানুষই নহে। পরমেশ্বর সকল সদ্গুণের বীজই আত্মাতে নিহিত করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু বিনা কর্ষণে সে বীজ অঙ্কুরিত হইতে পারে না। সাধারণ বিদ্যালয়ে প্রেমশিক্ষা হয় না। বালকদের প্রাণে প্রেম বিকাশ করিবার ভার পিতা মাতার উপরেই পড়িতেছে। পিতা অপেক্ষা মাতাই এই শিক্ষাদানের সমধিক অধিকারিণী। পিতা মাতা বালকদের প্রাণে ধীরে ধীরে কোমলভাবগুলি

ফুটাইয়া তুলিবেন। তাহারা যাহাতে ভাই ভগিনীকে ভাল বাসে, বিড়াল প্রভৃতি গৃহপালিত জীবকে ভাল বাসে, সেই শিক্ষা দিতে হইবে। এমন কি বৃক্ষ লতাকে যাহাতে আদর যত্ন করিয়া জল দেয় সেইরূপ শিক্ষা দিতে হইবে। অন্ধ প্রভৃতি আতুরদিগকে সন্তানদের দ্বারা ভিক্ষা দেওয়াইতে হইবে। বাড়ীতে কাহারও পীড়া হইলে সন্তানদের দ্বারা তাহাদের সেবা শুশ্রূষা করাইতে হইবে। এইরূপে সন্তানদিগকে প্রেমশিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য।

(৩) বাঙ্গালী জাতির ইচ্ছাশক্তি বড় দুর্ব্বল। ব্রাহ্মগণ চতুর্দ্দিকে প্রতিকূল ঘটনা দ্বারা বেষ্টিত হইয়া বাস করেন। আমাদের সন্তানগণের ইচ্ছাশক্তি যদি দুর্জ্জয় না হয় তবে পদে পদে বিপদের সম্ভাবনা। বাল্যকাল হইতে তাহাদিগকে সেই শিক্ষা দিতে হইবে যাহাতে তাহারা যাহা সৎ বলিয়া জানে সামান্য ক্লেশকে অবহেলা করিয়া তাহা পালন করিতে পারে। ইচ্ছাকে সর্ব্ব প্রযত্নে দৃঢ় করিতে হইবে। বালকদের ইচ্ছাশক্তি স্বভাবতঃ খুব দৃঢ় থাকে। কিন্তু দেখা যায় অনেক নির্ব্বোধ পিতা মাতা বলপূর্ব্বক তাহাদের ইচ্ছাশক্তিকে দমন করিয়া ক্রমে তাহাদিগকে শক্তিহীন করিয়া ফেলেন। আস্তে আস্তে প্রতিকূল ঘটনা জয় করিতে উৎসাহিত করিলে বালকদের ইচ্ছাশক্তি ক্রমে দৃঢ় হইতে পারে। এ সম্বন্ধে মাতা যদি বালকদিগকে সুন্দর সুন্দর গল্প বলেন তবে ইচ্ছাশক্তি জাগরণের সহায়তা হইতে পারে। বালকের পড়িতে ইচ্ছা হইতেছে না, এই অনিচ্ছা জয় করাইতে হইবে, বালকের রবিবাসরিক বিদ্যালয়ে যাইতে ইচ্ছা হইতেছে না, তাহার প্রাণে তথায় যাইবার ইচ্ছা জাগাইয়া দিতে হইবে। কোন অস্বাস্থ্যকর দ্রব্য খাইবার লালসা হইয়াছে, সেই লালসাকে ভয় দেখাইয়া নহে, কিন্তু তাহার সদ্গুণের দোহাই দিয়া নিবৃত্ত করিতে উত্তেজিত করিতে হইবে। এইরূপ নানা উপায়ে বালকের ইচ্ছাশক্তিকে দৃঢ় করিতে হইবে।

(৪) ঈশ্বর-বিশ্বাস ও ভক্তি শিক্ষার স্থান গৃহ। গৃহ ব্যতীত আর কোথাও তেমন সুন্দররূপে ঐ শিক্ষা হইতে পারে না। পিতা মাতাই বালক-জীবনের আদর্শ। পিতা অপেক্ষা মাতাই অধিকতর আদর্শ। সন্তানগণ যদি দেখিতে পায় পিতা মাতা প্রতিদিন ভক্তির সহিত পরব্রহ্মের পূজা করিতেছেন। পিতা মাতার সেই ভক্তিমাখা মুখের দিকে চাহিয়া সন্তান ঈশ্বরভক্তি শিক্ষা করিতে পারে। সন্তানগুলি ঈশ্বরপরায়ণ হইতেছে না, কোন কোন ব্রাহ্মের মুখে এই খেদের কথা শুনিতে পাওয়া যায়। আমার বিশ্বাস, গৃহে উপাসনার ব্যবস্থা না থাকাই এই শোচনীয় অবস্থার প্রধান কারণ। প্রতি গৃহে নিষ্ঠার সহিত প্রতিদিন ব্রহ্মোপাসনা হউক, সে গৃহের সন্তান বিশ্বাস ও ভক্তির দৃষ্টান্ত দেখুক; ইহা দেখিয়া তাহারাও স্বভাবতঃ বিশ্বাসী ও ভক্তিপরায়ণ হইবে। পিতা মাতা বৃক্ষ লতা, চন্দ্র সূর্য্য, মনুষ্যদেহ প্রভৃতি প্রাকৃতিক বস্তুর সম্বন্ধে গল্প করিতে করিতে ঈশ্বরের অস্তিত্বের কথা সন্তানের প্রাণে সহজে মুদ্রিত করিয়া দিতে পারেন। নানা ঘটনার কথা উল্লেখ করিয়া পরমেশ্বর আমাদিগকে কেমন ভাল বাসেন তাহা বুঝাইয়া দিতে পারেন। সন্তানেরা ৮।১০ বৎসর বয়স হইলেই সোজাসুজি দুই এক কথায় ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনাও করিতে পারে। আহারের সময় পরমেশ্বর আমাদিগকে এই আহার দ্রব্য দিয়াছেন, ইহা মনে করিয়া তাঁহাকে কৃতজ্ঞতা অর্পণ করিতে পারে। কিন্তু সাবধান হইতে হইবে যেন সন্তানগণ প্রার্থনাটা কেবল কথার কথা মনে না করে। এইরূপে, পিতা মাতা, দৃষ্টান্ত, উপদেশ ও শিক্ষা দ্বারা সন্তানের প্রাণে ভগবদ্ভক্তি জাগ্রত করিয়া দিতে পারেন। ধনবল বা জনবলে ব্রাহ্মসমাজের শ্রীবৃদ্ধি হইবে না; ধর্ম্ম যেখানে শ্রী সেখানেই বাস করেন। জ্ঞান, প্রেম, ইচ্ছা ও ঈশ্বর-ভক্তির বিকাশের নামই ধর্ম্ম। এই ধর্ম্মই ব্রাহ্মদের একমাত্র লক্ষ্য। এই লক্ষ্য লাভের জন্য শিক্ষার প্রয়োজন। লাইকারগাস যেমন শিক্ষার বলে এক দুর্ব্বল নগণ্য জাতিকে প্রবল পরাক্রান্ত করিয়াছিলেন, আমরাও তেমনই এই পূর্ণ শিক্ষার বলে দুর্ব্বল ব্রাহ্মদিগকে এ দেশে দুর্জ্জয় শক্তিতে পরিণত করিতে পারি।

ব্রাহ্মদিগের সাংসারিক অবস্থা।

(৯ই মাঘ ব্রাহ্মসম্মিলনীতে শ্রীযুক্ত বাবু সূর্য্যকুমার চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক পঠিত)

মঙ্গল-বিধাতা পরমেশ্বরের কৃপায় এখন ব্রাহ্মধর্ম্ম দেশ বিদেশে প্রচারিত হইতেছে। ভারতবর্ষের নানা প্রদেশের ত কথাই নাই, সুদূর ইউরোপ ও আমেরিকাতেও ব্রাহ্মধর্ম্মের জয় পতাকা উড্ডীয়মান হইতেছে। এখন আর ব্রাহ্মধর্ম্মের আলোক কেবল মহানগরী কলিকাতাতে আবদ্ধ নাই। এখন আর কেবল মাত্র কতিপয় কলিকাতাবাসী ব্রাহ্ম একত্র হইয়া সপ্তাহে একবার উপাসনা করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন না। সে সকল দিন গত হইয়াছে। এখন নগরে নগরে, পল্লীতে পল্লীতে ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত ও ব্রাহ্মধর্ম্মের জয় ঘোষিত হইতেছে। এখন কত ভাই কত ভগিনী ব্রাহ্মধর্ম্মের নামে আকৃষ্ট হইয়া ব্রাহ্ম পরিবারভুক্ত হইয়া আমাদের সমাজ পরিপুষ্ট করিতেছেন। ব্রাহ্ম পরিবার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মসমাজের দায়িত্ব দিন দিন বৃদ্ধি হইতেছে। এক্ষণে ব্রাহ্ম ব্রাহ্মিকাদিগের জ্ঞান ধর্ম্মোন্নতির সুব্যবস্থার প্রয়োজন হইয়াছে। এক্ষণে ব্রাহ্মপরিবারের বালক বালিকাগণের শিক্ষার জন্য বিদ্যালয়ের আবশ্যক হইয়াছে। এক্ষণে বিদেশস্থ ব্রাহ্মবন্ধুগণের বালক বালিকাদিগের কলিকাতায় বাসস্থান, তত্ত্বাবধান ও শিক্ষার ব্যবস্থা না করিলে আর চলে না। এই সকল গুরুভার বহন করিয়াই যে ব্রাহ্মসমাজ নিশ্চিন্ত থাকিবেন তাহা পারিবেন না। আজ কাল আর একটি গুরুতর বিষয়ের আলোচনা নিতান্ত আবশ্যক হইয়াছে। কেবল আলোচনায় হইবে না, যাহাতে সেই বিষয়ের একটা মীমাংসা ও তদনুরূপ কার্য্য হয় তাহাই করিতে হইবে।

ব্রাহ্মসমাজে তিন অবস্থার লোক আছেন; সঙ্গতিপন্ন, মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র। আমাদের মধ্যে সঙ্গতিপন্ন লোকের সংখ্যা অতি অল্প, মধ্যবিত্ত ও দরিদ্রের সংখ্যাই অধিক। সঙ্গতিপন্ন ব্রাহ্মদিগের সাংসারিক অবস্থা সচ্ছল। তাঁহারা কাহারও মুখাপেক্ষা না করিয়া আপনাদিগের পারিবারিক সুব্যবস্থা

আপনারাই করেন। তাঁহারা অর্থদ্বারা সর্ব্বপ্রকার কল্যাণকর কার্য্যে ব্রাহ্মসমাজকে যথেষ্ট সহায়তা করেন। মধ্যে মধ্যে তাঁহারা নিস্ব ব্রাহ্মদিগকে অর্থসম্বন্ধে সাহায্য করিয়া তাহাদিগের কৃতজ্ঞতাভাজন হন। ইহাঁদিগের সাংসারিক অবস্থা সম্বন্ধে ব্রাহ্মসমাজের কিছু ভাবিবার বা করিবার নাই। মধ্যবিত্ত ব্রাহ্মদিগের অবস্থা এতাধিক সচ্ছল না হইলেও তাঁহারা অপরের সাহায্য ব্যতীত আপনাদিগের পরিবার প্রতিপালন ও বালক বালিকাগণের শিক্ষা দান করিতে সমর্থ। আপাততঃ তাঁহাদিগের এক প্রকার চলিতেছে। কিন্তু তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকেরই যত্র আয় তত্র ব্যয়। তাঁহারা কিছুই সংস্থান করিতে পারিতেছেন না। রোগাক্রান্ত হইয়া বা অন্য কোন প্রকারে অর্থোপার্জ্জনে অক্ষম হইলে তাঁহাদিগের দুরবস্থার সীমা থাকে না। তাঁহাদের মধ্যে কাহারও মৃত্যু হইলে মৃত ব্যক্তির পরিবারবর্গকে অকূলপাথারে ভাসিতে হয়। অন্যের গলগ্রহ হওয়া ব্যতীত তাঁহাদিগের উপায়ান্তর থাকে না। সুখের বিষয় যে ইঁহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ জীবনবীমা দ্বারা আপনাদিগের পরিবারবর্গকে এই অবস্থা হইতে রক্ষার উপায় করিয়া রাখিতেছেন। ইঁহাদিগের জন্য ব্রাহ্মসমাজের আপাততঃ কিছু করিবার না থাকিলেও ইঁহাদিগের অবস্থা সম্বন্ধে কতক চিন্তার কারণ আছে। দরিদ্র ব্রাহ্ম পরিবারের সাংসারিক অবস্থা অতি শোচনীয়। দরিদ্র ব্রাহ্মগণ অতি কষ্টে সংসার প্রতিপালন করেন। ইহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ দিবারাত্র পরিশ্রম করিয়া যাহা কিছু উপার্জ্জন করেন তদ্দ্বারা তাঁহাদিগের সকল ব্যয় সংকুলন হয় না, কোন না কোন অভাব সর্ব্বদাই রহিয়া যায়। অর্থাভাবে ইঁহারা বালক বালিকাদিগকে সুশিক্ষা দিতে নিজেরা না পারিয়া অন্যের সাহায্যের উপর নির্ভর করিতে বাধ্য হন। পরিবার মধ্যে রোগ বা অন্য কোন দুর্ঘটনা উপস্থিত হইলেও অন্যের সাহায্যের উপর নির্ভর করা ভিন্ন তাঁহাদিগের উপায়ান্তর নাই। কোন কোন নিস্ব পরিবার ইতিমধ্যেই অনন্যোপায় হইয়া ব্রাহ্মসমাজের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে বাধ্য হইয়াছেন। এরূপ ব্রাহ্ম পরিবারের সংখ্যা আপাততঃ অল্প বটে, কিন্তু ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার ও ব্রাহ্ম পরিবার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যে সংখ্যা বৃদ্ধি হইবে তাহার সন্দেহ নাই। সে যাহা হউক দরিদ্র ব্রাহ্মদিগের যেরূপ অবস্থা তাহাতে ব্রাহ্মসমাজ আর নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন না। ইঁহাদিগের অবস্থার উন্নতির কোন উপায় না করিয়া উদাসীন থাকিলে ভবিষ্যতে নিশ্চয়ই মহা অনর্থ সংঘটিত হইবে।

ইউরেসিয়ান ও দেশীয় খ্রীষ্টান সম্প্রদায়ের দরিদ্রলোকদিগের পারিবারিক অবস্থা যাঁহারা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, দারিদ্র্যের বিষময় ফল তাঁহারা সহজেই অনুভব করিতে সক্ষম হইবেন। অর্থাভাবে উক্ত সম্প্রদায়দ্বয়ের বালকবালিকাগণ সুশিক্ষা লাভে বঞ্চিত। এই জন্য তাঁহাদিগের মধ্যে কত প্রকার পাপ প্রবেশ করিয়া ক্রমে তাঁহাদিগের সমাজকে কলঙ্কিত ও ঘৃণিত করিয়া তুলিয়াছে। ব্রাহ্মসমাজের দারিদ্র্যের কোন প্রতিকার করিতে না পারিলে ইহারও যে সেইরূপ দুর্গতি হইবে তাহার আর সন্দেহ কি? এখনই দেখা যাইতেছে যে কোন কোন নিস্ব ব্রাহ্মের বালক বালিকাগণ অর্থাভাবে কোন ভাল বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতে পারিতেছে না। সুতরাং তাহারা অশিক্ষিত অবস্থায় থাকিবে এবং কালে ব্রাহ্মসমাজের কণ্টকস্বরূপ হইয়া উঠিবে। কেবল ইহাই নহে,দারিদ্র্য সাধারণতঃ মনুষ্যকে নীচ করিয়া ফেলে। দারিদ্র্য প্রযুক্ত লোকে মিথ্যা, প্রবঞ্চনা, চৌর্য্য ও অন্যান্য অসদুপায় অবলম্বন করিতে বাধ্য হয়। অতএব ব্রাহ্মসমাজের দারিদ্র্য যাহাতে দূর হয় সর্ব্বাগ্রে তাহার উপায় করা ব্রাহ্মদিগের নিতান্ত কর্ত্তব্য। ব্রাহ্মসমাজ এখনও এত বিস্তৃত হয় নাই যে ইহার দারিদ্র্য দূর করা অসম্ভব। চেষ্টা করিলে এখনও ব্রাহ্মপরিবারে অসচ্ছলতা ও অভাব অন্ততঃ কতক পরিমাণে দূর হইতে পারে।

বিষয়টীর গুরুত্ব সকলেই অনুভব করিয়াছেন। এক্ষণে ব্রাহ্মসমাজের দারিদ্র্য দূরীকরণের কয়েকটি উপায় ব্রাহ্মমণ্ডলীর সম্মুখে উপস্থিত করিতেছি।

১। ব্রাহ্ম-পল্লী-স্থাপন—কলিকাতায় বাস অতিশয় ব্যয়সাধ্য। এখানে সকল দ্রব্যই মহার্ঘ্য অথচ অস্বাস্থ্যকর। এই সকল কারণে মহানগরী মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র লোকের বাসের অযোগ্য। যাঁহারা এবিষয়ে চিন্তা করিয়াছেন, তাঁহারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, যে দরিদ্র ও এমন কি মধ্যবিত্ত অবস্থার ব্রাহ্মদিগের পক্ষেও কোন পল্লীগ্রামে বাস করা শ্রেয়স্কর। পল্লীগ্রামে পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া বাস করায় ব্রাহ্মদিগের অনেক অসুবিধা হইতে পারে, কিন্তু কতকগুলি পরিবার একত্র হইয়া বাস করিলে সে সকল অসুবিধার আশঙ্কা নাই। অতএব সুবিধাজনক ও স্বাস্থ্যকর স্থানে ব্রাহ্মদিগের একটি পল্লী স্থাপন অত্যন্ত প্রয়োজনীয় হইয়াছে। যে সকল ব্রাহ্মের এখানে কোন বিষয় কার্য্য নাই, তাঁহারা সেখানে গিয়া কোন ব্যবসায় বা কৃষি কার্য্য অবলম্বন করিয়া সুখ স্বচ্ছন্দে জীবিকানির্ব্বাহ করিতে পারিবেন। যাঁহারা কার্য্যোপলক্ষে এখানে অবস্থিতি করিতে বাধ্য, তাঁহারা ও আপনাদিগের পরিবার সেখানে রাখিয়া ব্যয় সংকোচ করিতে পারিবেন। অবসরানুসারে তাঁহারা মধ্যে মধ্যে তথায় যাইয়া তাঁহাদিগের তত্ত্বাবধান করিবেন এবং যে সকল বন্ধু স্থায়ীরূপ তথায় বাস করিবেন তাঁহারাই তাঁহাদিগের অনুপস্থিতি কালে তাঁহাদিগের রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন। নিকটে সুচিকিৎসক, বিদ্যালয় ও বাজার প্রভৃতি থাকে এরূপ কোন স্বাস্থ্যকর ও সুবিধাজনক স্থানে পল্লীটী সংস্থাপন করিতে হইবে! তাহার পর, যাঁহারা সেই পল্লীর অধিবাসী হইবেন তাঁহারা আপনাদিগের চেষ্টায় এবং ব্রাহ্মমণ্ডলীর সহায়তায় আপনাদিগের উপাসনার জন্য একটী উপাসনালয়, বালক বালিকাদিগের শিক্ষার জন্য একটী বিদ্যালয়, সাধারণের পাঠের জন্য একটী পাঠাগার প্রভৃতি শুভানুষ্ঠান সকল ক্রমশঃ করিয়া লইতে পারিবেন। কলিকাতার ব্রাহ্মছাত্রীনিবাস ও শিক্ষালয় অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য বলিয়া সকলেই অনুভব করিতেছেন। অনেকের ধারণা এই যে কোন স্বাস্থ্যকর পল্লীতে এই দুইটী স্থানান্তরিত করিতে পারিলে ব্যয়ভার অনেক লাঘব হইবে; অথচ তাহাতে মফ-

স্বল্প ব্রাহ্মবন্ধুদিগের বিশেষ অসুবিধা হইবে না। অতএব ব্রাহ্মছাত্রীনিবাস ও শিক্ষালয়ও কালে সংস্থাপিত পল্লীতে স্থানান্তরিত হওয়া বড় অসম্ভব নহে। আমার স্মরণ হয় কোন কোন শ্রদ্ধেয় বন্ধু ইতিপূর্ব্বে এ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছিলেন। আশা করাযায় যাহাতে তাঁহাদিগের অভিপ্রায় সিদ্ধ হয়, তাঁহারা তৎপক্ষে বিশেষ যত্নবান হইবেন। ব্রাহ্মছাত্রীনিবাস ও শিক্ষালয় সংস্থাপিত পল্লিতে স্থানান্তরিত হইলে সেখানে ব্রাহ্মদিগের আর অসুবিধার কারণ থাকিবে না। মধ্যবিত্ত ও সামান্য অবস্থার ব্রাহ্মগণ সেই পল্লিতে বাস করিলে অল্প ব্যয়ে সুখে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া কিছু কিছু সংস্থান করিতে পারিবেন। ইহা হইলে তাঁহাদের মৃত্যুতে তাঁহাদের পরিবারবর্গকে এক্ষণকার ন্যায় নিঃসম্বল হইয়া কাহারও গলগ্রহ হইতে হইবে না।

এসম্বন্ধে উল্লেখ করা কর্ত্তব্য যে শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত আনন্দমোহন বসু ও বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়দ্বয় পচম্বায় অবস্থিতি কালে তথায় বা তন্নিকটবর্ত্তী অন্য কোন স্বাস্থ্যকর ও সুবিধাজনক স্থানে একটি ব্রাহ্মপল্লী সংস্থাপনোদ্দেশে বহু চেষ্টা ও পরিশ্রম করিয়াছিলেন। পচম্বা ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থানগুলি অতিশয় স্বাস্থ্যকর ও অনেক প্রকার ব্যবসায় ও কৃষিকার্য্যের বিশেষ উপযোগী। এই সকল স্থানে আহারীয় দ্রব্যাদি অতি সুলভ, ভূমির কর যৎসামান্য এবং গৃহ নির্ম্মাণের ব্যয় অতি অল্প। এই সমস্ত কারণে তাঁহারা উক্ত স্থানগুলি মনোনীত করিয়াছিলেন। দুঃখের বিষয় তাঁহারা যাহাঁদিগের জন্য এতাধিক পরিশ্রম করিলেন তাঁহারা এবিষয়ে উদাসীন। যদি পচম্বা সম্বন্ধে বিশেষ আপত্তি হয় অন্য কোন সুবিধাজনক স্থান মনোনীত করা হউক, কিন্তু এবিষয়ে আর নিশ্চিন্ত থাকা বিধেয় নহে।

২। ব্যয় সংকোচ—নানা কারণে ব্রাহ্মপরিবারের ব্যয় ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতেছে। একদিকে যেমন কলিকাতা বাস ও বালক বালিকাদিগের শিক্ষার গুরুতর ব্যয়, অন্য দিকে সেইরূপ সভ্যতা ও আনুষঙ্গিক বিলাসিতার নানা প্রকার ব্যয় ব্রাহ্মসমাজের অর্থাভাবের প্রধান কারণ। ব্রাহ্ম ব্রাহ্মিকাগণ আপন আপন পারিবারিক কার্য্য সকল অপমান জনক মনে করিয়া অবহেলা করেন। পূর্ব্বে, অন্যের কথা দূরে থাকুক, সঙ্গতিপন্ন লোকের বাটীর মহিলারাও রন্ধন ও অন্যান্য পারিবারিক কার্য্য অতিশয় গৌরবজনক মনে করিয়া আগ্রহের সহিত সম্পাদন করিতেন। অদ্যাপিও অনেক হিন্দু পরিবারে সেইরূপ ব্যবস্থা রহিয়াছে। কিন্তু আমাদের সমাজের সামান্য সামান্য গৃহস্থদিগের বাটীতে এক একজন পাচিকা না হইলে চলে না। আমাদিগের মহিলারা রন্ধন অপমানের কার্য্য মনে করেন। কাহারও কাহারও সংস্কার এই যে রন্ধন রোগোৎপত্তির কারণ। রন্ধনে রোগোৎপত্তি হয় কিনা তাহা জানি না, তবে এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে আমাদিগের মাতা, পিতামহী, প্রপিতামহী প্রভৃতি সকলে দুই বেলা রন্ধন করিতেন, কিন্তু তাঁহাদিগের কোন রোগের কথা শুনা যায় না।

আমাদিগের পরিবারের পরিচ্ছদের ব্যয়ও কিছু অযথা বলিয়া বোধ হয়। সম্ভ্রম রক্ষা, লজ্জা ও শীত নিবারণের জন্য যে পরিচ্ছদের প্রয়োজন তাহাতে কাহারও আপত্তি নাই, কিন্তু বিলাসিতার জন্য পরিচ্ছদে অযথা ব্যয় করিয়া সমাজ মধ্যে কুদৃষ্টান্ত প্রদর্শন করা অতি অন্যায় কার্য্য।

পূর্ব্বকালে আমাদিগের দেশের মহিলাগণ পদব্রজে গঙ্গাস্নান ও তীর্থ দর্শনে যাইতেন; এখনও হিন্দু সমাজে সেই প্রথা রহিয়াছে। কিন্তু আমাদের সমাজে গাড়ি না হইলে উপাসনালয়ে বা কাহারও বাটীতে যাতায়াত হয় না। বিগত উৎসবের সময় শকটবানেরা ধর্ম্মঘট করিয়া গাড়ি বন্ধ করাতে মহিলাগণের উপাসনালয়ে যাতায়াতের যে কত ব্যয় হইয়াছিল তাহা সকলেই অবগত আছেন। এই সকল বিষয়ে ব্রাহ্মসমাজের দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়া নিতান্ত প্রার্থনীয়।

৩। অর্থ সংস্থান—ব্রাহ্মদিগের সাংসারিক অবস্থা সাধারণতঃ এত অস্বচ্ছল যে তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকে আপন আপন পরিবারের জন্য কিছুই সংস্থান করিতে পারিতেছেন না। এই জন্য কেহ কেহ কোন কোন জীবনবীমা সমিতির সহিত সংসৃষ্ট হইয়াছেন। ইঁহাদিগের মৃত্যুতে ইঁহাদিগের পরিবারবর্গ একেবারে নিরুপায় হইয়া পড়িবে না। আমার বিবেচনায় প্রত্যেক ব্রাহ্মেরই ইঁহাদিগের দৃষ্টান্তের অনুসরণ করা কর্ত্তব্য। ব্রাহ্মসমাজ হইতে এ সম্বন্ধে কিছু করিতে পারিলে ভাল হয়।

৪। স্বাধীন ব্যবসায়—পরের উপর নির্ভর অথবা সামান্য বেতনে পরের দাসত্ব করার পরিবর্ত্তে ব্রাহ্মগণ কোন না কোন লাভজনক ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া আপনাদিগের উদ্যম, পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ে প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করিয়া আপনাদিগের অবস্থার উন্নতি ও সুখ স্বচ্ছন্দে জীবনাতিপাত করিতে পারেন। এবিষয়ে পার্শি ও মাড়োয়ারি সম্প্রদায়ের দৃষ্টান্ত অনুকরণীয়। কোন ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইতে হইলে অভিজ্ঞতা ও অর্থ উভয়েরই প্রয়োজন। যাঁহারা যে ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইতে অভিলাষী তাঁহাদিগকে অগ্রে সেই ব্যবসায় সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা লাভ করিতে হইবে। তৎপরে অর্থ সম্বন্ধে ব্রাহ্মসমাজ হইতে কোন সুব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য। সঙ্গতিপন্ন ব্রাহ্মেরাও এবিষয়ে অনেক সহায়তা করিতে পারিবেন।

৫। মিলিত ভাণ্ডার (co-operative store)—ব্রাহ্মদিগের একটী মিলিত ভাণ্ডার হওয়া অত্যন্ত প্রার্থনীয়। ইহা দ্বারা একদিকে ব্রাহ্ম সাধারণের নির্দ্দোষ ও স্বাস্থ্যকর আহারীয় দ্রব্যাদি পাইবার বিশেষ সুবিধা হইবে, অপর দিকে কয়েক জন ব্রাহ্মের অর্থোপার্জ্জনের একটী উৎকৃষ্ট উপায় হইতে পারে।

উপসংহারে আমার এই প্রস্তাব যে ব্রাহ্মদিগের সাংসারিক অবস্থা উন্নতির উল্লিখিত অথবা অন্য কোন উপায় কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য একটী সমিতি সংগঠিত হইয়া এসম্বন্ধীয় আলোচনা শেষ হউক।

ব্রাহ্ম বালিকাদিগের শিক্ষা।

(১২ই মাঘ সম্মিলনীতে শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী কর্ত্তৃক পঠিত।)

ব্রাহ্ম বালিকাদিগকে কিরূপ শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য ; এই প্রশ্নের বিচার করিতে গেলেই অগ্র দুইটী বিষয়ে চিন্তা করিতে হয়। প্রথম—ব্রাহ্মসমাজ নারী-জীবনের কিরূপ আদর্শ সমক্ষে রাখিয়াছেন ?

দ্বিতীয়—ব্রাহ্মসমাজ ব্রাহ্ম পরিবারের কি আদর্শ অবলম্বন করিয়াছেন।

প্রথমে নারী-জীবনের আদর্শ—আমাদের সমক্ষে দুই প্রকার আদর্শ উপস্থিত। এক আদর্শ প্রাচীন হিন্দু সমাজের, যাহাতে বলে :—

নাস্তি স্ত্রীণাং পৃথক্ যজ্ঞো ন ব্রতং নাপ্যুপোষিতং
পতিং শুশ্রূষতে যেন তেন স্বর্গে মহীয়তে।

মনু।

অর্থ—নারীদিগের পৃথক্ যজ্ঞ নাই, পৃথক্ ব্রত বা উপাসনাদি নাই, ইঁহারা যে পতির শুশ্রূষা করেন, তদ্দারাই স্বর্গগামিনী হয়েন। এই মূল ভাবেরই অনুসরণে এই বিধি প্রচার হইয়াছে :—

বাল্যে পিতুর্বশে তিষ্ঠেৎ পাণিগ্রাহস্য যৌবনে
পুত্রাণাং ভর্ত্তরি প্রেতে ন ভজেৎ স্ত্রী স্বতন্ত্রতাং।

অর্থ—নারী বাল্যে পিতার অধীনে থাকিবেন, যৌবনে পতির অধীনে থাকিবেন, ও বার্দ্ধক্যে পুত্রগণের অধীনে থাকিবেন, রমণী কখনই স্বাধীনতা অবলম্বন করিবেন না।

পূর্ব্বোক্ত আদর্শ অনুসারে এই ভারতে লক্ষ লক্ষ রমণী চিরদিন আপনাদের প্রবৃত্তি ও অধিকারকে খর্ব্ব করিয়া পতি সেবাকে ও পরসেবাকে পরম ধর্ম্ম জ্ঞান করিয়া সন্তুষ্টচিত্তে দিন যাপন করিয়া আসিয়াছেন ও এখনও আসিতেছেন।

ব্রাহ্মসমাজ পরিস্ফুটরূপে না হউক অপরিস্ফুটভাবে নারী জীবনের আর এক আদর্শ ঘোষণা করিয়াছেন ও তাহার অনুসরণ করিতেছেন। সে আদর্শ এই—

"নরনারী সাধারণের সমান অধিকার, যার আছে ভক্তি পাবে মুক্তি নাহি জাত বিচার।" অর্থাৎ ভক্তি দ্বারা মুক্তি লাভ করা বিষয়ে নরনারীর সমান অধিকার। ইহার অর্থ এই পুরুষের স্তায় নারীও স্বাধীন ভাবে ঈশ্বরকে জানিবেন, তাঁহাকে প্রীতি করিবেন ও নিজ-জীবনের মহত্ত্ব সাধন করিবেন। ইহাই হইল সর্ব্ব প্রকার স্বাধীনতার ভিত্তি।

জীবনের মহত্ত্ব সাধন সম্বন্ধে পুরুষ ও নারীতে প্রভেদ নাই—পুরুষের পক্ষে যাহা জীবনের মহত্ত্ব-সাধনের পথ, নারীর পক্ষেও তাহাই মহত্ত্ব-সাধনের পথ। অর্থাৎ জ্ঞানকে উজ্জ্বল করিয়া সত্যকে গ্রহণ করা, প্রেমকে উজ্জ্বল করিয়া সত্যকে প্রীতি করা ও ইচ্ছাশক্তিকে দৃঢ় করিয়া সত্যের অনুসরণ করা। যে জীবনে এই ত্রিবিধ উপকরণ সম্মিলিত হয়, এবং জাগ্রত ঈশ্বর-প্রীতি তাহাদের পরিচালক হয়—সেই জীবনেই মহত্ত্ব সাধিত হয়।

এই আদর্শ অনুসারে চিন্তা করিতে গেলে এই ভাবিতে হইবে, কি প্রকারে শিক্ষা দিলে আমাদের বালিকাগণ জাগ্রত ঈশ্বর-প্রীতির দ্বারা উদ্দীপ্ত হইতে পারে এবং সেই জাগ্রত প্রীতি-দ্বারা পরিচালিত হইয়া, জ্ঞানের উজ্জ্বলতা, প্রীতির প্রবলতা, ও ইচ্ছা শক্তির দৃঢ়তা লাভ করিতে পারে। তাহাদিগকে সেই-রূপ শিক্ষাই দিতে হইবে, যাহাতে তাহাদের জ্ঞানসঞ্চার অপেক্ষা জ্ঞানস্পৃহা উদ্দীপ্ত করার দিকে, পরের চিন্তা মনে ঢালিয়া দেওয়া অপেক্ষা চিন্তাশীলতা উৎপাদনের দিকে, সাধুতার কাহিনী শুনান অপেক্ষা সাধুতার আকাঙ্ক্ষা জন্মানর দিকে অধিক দৃষ্টি থাকিবে।

সর্ব্বোপরি ইহা স্মরণ রাখিতে হইবে যে তাহাদের হৃদয়ে যদি ধর্ম্মাগ্নি না লাগে, তাহাদের দ্বারা ব্রাহ্মসমাজের বল বৃদ্ধি হইবে না। তাহারা হাজার শান্ত, সুশীল, পবিত্র ও মিষ্ট প্রকৃতি সম্পন্ন হউক না কেন, কিছুতেই তাহাদিগকে বিষয়াসক্তি, স্বার্থপরতা, অসার বিলাসপ্রিয়তা প্রভৃতি হইতে রক্ষা করিতে পারা যাইবে না। তবে এরূপ শিক্ষা কিরূপে দেওয়া যায়।

ভাবী ব্রাহ্ম-পরিবারের আদর্শের বিষয়ে চিন্তা করিলেও বালিকাদিগের শিক্ষাবিষয়ে বিশেষ মনোযোগী হইবার আবশ্যকতা অনুভব করা যায়। ব্রাহ্ম-পরিবারগুলির দ্বারা দুইটী উদ্দেশ্য সিদ্ধ হওয়া আবশ্যক। প্রথম ব্রাহ্ম পরিবার যেন এরূপ স্থান হয়, যাহাতে থাকিয়া পুরুষ ও রমণী প্রত্যেকেই স্বীয় স্বীয় জীবনের মহত্ত্ব সাধন করিতে পারে ; দ্বিতীয়, এক একটী পরিবার যেন এক একটী ধর্ম্মাগ্নির কুণ্ড-স্বরূপ হইয়া ব্রাহ্মসমাজের বল বৃদ্ধি করিতে পারে। নারীগণের প্রকৃত শিক্ষা ব্যতীত কখনই এ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে না।

কিরূপ শিক্ষা প্রণালীর দ্বারা পূর্ব্বোক্ত উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে ? সে প্রণালী যেরূপ হউক না কেন, বালিকাদিগের হৃদয়ে ধর্ম্মাগ্নি প্রজ্বলিত করা তাহার একটী প্রধান লক্ষ্য হওয়া কর্ত্তব্য। সেই সঙ্গে মানসিক শক্তি ও হৃদয়ের ভাব সকলকে বিকশিত করিতে হইবে। বর্ত্তমান সময়ে যাহাকে উচ্চ শিক্ষা বলে, তাহা অপেক্ষাও গভীরতর শিক্ষা আমাদের বালিকাদিগের পক্ষে আবশ্যক। এবং সেই প্রকার শিক্ষার আবশ্যকতা অনুভব করি বলিয়াই আমি অনেকের স্তায় বিশ্ব বিদ্যালয়ের বর্ত্তমান শিক্ষা-প্রণালীর উপরে আস্থা রাখিতে পারিতেছি না। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিপ্রাপ্ত অনেক যুবকের জ্ঞানের যে অবস্থা দেখি, তাহাকে উচ্চ শিক্ষা বলিয়া আখ্যাত করিতে লজ্জা বোধ হয়। আমি ত একজন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি প্রাপ্ত ব্যক্তি, আমি প্রকৃত জ্ঞান-সম্পন্ন ব্যক্তিদিগের নিকটে বসিয়া নিজের অজ্ঞতা অনুভব করিয়া অনেকবার এত লজ্জা পাইয়াছি যে তাহার বর্ণনা হয় না।

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা-প্রণালীর প্রতি আমার প্রথম আপত্তি এই, ইহাতে কতকগুলি জ্ঞানের কথা শুনায়, জ্ঞান স্পৃহাকে উদ্দীপ্ত করে না ; অপরের কতগুলি চিন্তা মনে ঢালিয়া দেয়, চিন্তাশীলতা উদ্দীপ্ত করে না। পরীক্ষা ও পাশ হওয়ার প্রতি প্রধান দৃষ্টি থাকাতে শিক্ষক ও ছাত্র উভয়েরই জ্ঞান-স্পৃহার উদ্দীপনার প্রতি প্রয়াস না থাকিয়া কতকগুলি

জ্ঞাতব্য বিষয়ের প্রতি প্রয়াস থাকে; হৃদয় মনের প্রশস্ততা ও চিন্তাশীলতা লাভ অপেক্ষা পরের চিন্তা গিলাইবার দিকে প্রবৃত্তি থাকে। যদি তাহাদের জ্ঞানের প্রশস্ততার উদ্দেশে তাহাদের নির্দ্দিষ্ট পাঠ্য পুস্তকের অতিরিক্ত আর পাঁচখানি সংগ্রহ পড়াইতে চাও, সেদিকে না শিক্ষক না ছাত্র কাহারও ভরাভর হয় না। তাহারা সেই পাঠ্য পুস্তকের কতিপয় বিষয় লইয়া থোড় বড়ি খাড়া, খাড়া বড়ি থোড় করিতে চায়। ইহা অনিবার্য্য।

দ্বিতীয় আপত্তি—একটা অতিরিক্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও উত্তেজনার মধ্যে পড়াতে ছাত্র ছাত্রীদিগের মস্তিষ্ক অতিমাত্র উত্তেজিত হয়; তাহারা তাহাদের শরীর ও মন উভয়ের অপকার করে।

তৃতীয় আপত্তি—বিশ্ববিদ্যালয় সভা যাহা নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন, তদতিরিক্ত অনেক জ্ঞাতব্য ও শিক্ষিতব্য বিষয় আছে, সে সকলের শিক্ষা দেওয়ায় সুবিধা হয় না। অগ্রে বাঙ্গালা ভাষাটাও যে ভাল করিয়া, পাকা করিয়া শিখাইব তাহাও ঘটিয়া উঠে না, দুধ দাঁত না ভাঙ্গিতে ভাঙ্গিতে কষ্ট মষ্টে ইংরাজী শিখাইবার প্রথাতে শিশুদিগের মনের বিকাশকে খর্ব্ব করিয়া ফেলা হয়।

চতুর্থ আপত্তি—যে ধর্ম্ম ও নীতিকে আমারা সর্ব্বোপরি স্থান দিতে ইচ্ছা করি, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রণালী নিঃশব্দ ভাষাতে এই বলে—ধর্ম্ম ও নীতির শিক্ষা মানবের শিক্ষার অন্তর্ভূত নহে। তুমি অসৎ ও অধার্ম্মিক কি না তাহার সহিত আমাদের সম্বন্ধ নাই, তুমি এতটা সাহিত্য, এতটা অঙ্ক শাস্ত্র, এতটা সংস্কৃত, এতটা ইতিহাস শিখিয়াছ কি না আমরা তাহাই দেখিতে চাই; ইহা যদি শিখিয়া থাক আমাদের প্রদত্ত উপাধি লইয়া যাও। এই নিঃশব্দ শিক্ষার ফল,—ধর্ম্ম-শিক্ষাকে শিক্ষিত ব্যক্তিদিগের পক্ষে হীন করা।

এক্ষণে প্রশ্ন এই, আমরা কি আমাদিগের বালিকাদিগকে বিশ্ববিদ্যালয় নিরপেক্ষ হইয়া উচ্চ শিক্ষা দিতে পারি না? বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রণালীর ভিতরে না থাকিলে যে উচ্চ শিক্ষা ও প্রকৃত শিক্ষা দেওয়া যায় না তাহা মনে করি না, বরং মনে করি এই প্রণালীদ্বারা প্রকৃত উচ্চ শিক্ষার ব্যাঘাত হইতেছে।

কেহ কেহ বলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রণালী একটা বেশ উত্তেজক কারণ—A good incentive, এই কারণ পরিহার করিলে এরূপ বিপদ ঘটিতে পারে যে আমাদের আদর্শ উচ্চ শিক্ষা কেবল মনেই থাকিবে, কার্য্যে হইল কি না দেখিবার কেহ থাকিবে না। ইহার উত্তরে এই বক্তব্য, আদর্শটা কার্য্যে হইতেছে কি না দেখিবার জন্য কোনও একটা উপায় উদ্ভাবন করা কঠিন নহে।

আর একটী কথা, যদি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রণালী পরিত্যাগ করিয়াও উৎকৃষ্ট শিক্ষা দেওয়া সম্ভব হয় ও অতি ভালরূপেই সম্ভব হয়, তবে আমরা বালিকাদিগের জন্য সে প্রণালীর আবশ্যকতা মনে করি কেন? দুই উত্তর—

প্রথম,—আমাদের অনেক বালিকা হয়ত চির কৌমার্য্য অবলম্বন করিয়া থাকিবে, হয়ত তাহাদের অনেককে আত্ম-পোষণ ও স্বজন-পোষণের জন্য উপার্জ্জন করিতে হইবে। কর্ম্ম করিতে গেলেই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও উপাধি আছে কিনা লোকে দেখিবে। সুতরাং সে শিক্ষা সকলকে দেওয়া চাই।

এ বিষয়ে চিন্তনীয় বিষয় একটী আছে,—কর্ম্ম কর্ম্ম বলিয়া ছায়ার পশ্চাতে ছুটিলে ত হইবে না। দেশে আজিও স্ত্রী শিক্ষার যে অবস্থা তাহাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ শিক্ষা প্রাপ্ত মহিলাদের কর্ম্ম করিবার স্থান কোথায়? কলিকাতার বেথুন কলেজ, ঢাকার ইডেন স্কুল প্রভৃতি দুই একটী বিদ্যালয় ছাড়িয়া দিলে, আর স্থান কোথায়? বরং ইহা বলিলে অযুক্ত কথা বলা হয় না, যে বর্ত্তমান বালিকা বিদ্যালয় সমূহের অধিকাংশের যে হীনাবস্থা তাহার শিক্ষয়িত্রী প্রস্তুত করিতে হইলে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের প্রণালী অপেক্ষা স্বতন্ত্র প্রণালী অবলম্বন করিয়া প্রস্তুত করিলে ভাল হয়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রণালীর দিকে গতির দ্বিতীয় কারণ—আমাদের রমণীদিগের মধ্যে যাহারা প্রতিভাশালিনী ও মনস্বিনী তাঁহারা যদি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি সকল গ্রহণ করিতে চান, অথবা কেহ যদি চিকিৎসা বিভাগে প্রবেশ করিয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে চান, সে দ্বার কি তাঁহাদের জন্য উন্মুক্ত থাকা আবশ্যক নহে? আমি বলি অবশ্য মুক্ত রাখিতে হইবে।

আমি এতক্ষণ যাহা বলিলাম তাহার সার নিষ্কর্ষ এই:—বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রণালীতে কি বলে, না বলে, তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া আমাদের অধিকাংশ বালিকাকে উৎকৃষ্ট শিক্ষা দিতে হইবে, যদ্দারা তাহারা যথার্থ জ্ঞানলাভ করিতে পারে, জ্ঞানস্পৃহা উদ্দীপ্ত হইতে পারে, চিন্তাশীলতা জন্মিতে পারে, হৃদয় মনের প্রশস্ততা হইতে পারে।

ধর্ম্মশিক্ষা এই শিক্ষার প্রধান অঙ্গ হওয়া উচিত।

সর্ব্বোপরি তাহাদের অন্তরে যাহাতে ব্রাহ্মসমাজের কাজ কর্ম্মের প্রতি অনুরাগ জন্মে এরূপ উপায় অবলম্বন করা কর্ত্তব্য। ব্রাহ্ম-শিক্ষকদিগের সংসর্গ ও ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যক্ষেত্রের সংগ্রাম ইহার একটী প্রধান উপায়।

জ্ঞানানুরাগ, সদনুষ্ঠানরুচি পরসেবা প্রভৃতি, কার্য্যের শৃঙ্খলা ও গৃহের সুব্যবস্থা প্রভৃতি শিক্ষা দিবার উদ্দেশে প্রত্যেক ব্রাহ্ম বালিকা কিছুদিন করিয়া উপযুক্ত চরিত্র সম্পন্না মহিলাদিগের অধীনে বোর্ডিংএ থাকিতে পারিলে ভাল হয়। আমি সন্তানদিগকে পিতামাতার নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন করিবার পক্ষ নহি। কিন্তু আমাদের অধিকাংশ ব্রাহ্মপরিবারের বর্ত্ত-মান অবস্থা যেরূপ তাহা দেখিয়া বোধ হয় যে সেখানে থাকা অপেক্ষা বয়ঃপ্রাপ্ত বালিকাদিগের বোর্ডিংএ থাকিলেই শিক্ষা-লাভের পক্ষে অপেক্ষাকৃত অধিক সাহায্য হইতে পারে।

অধিকাংশ বালিকার পক্ষে এইরূপ উপায় অবলম্বিত হইবে; অথচ যাহারা বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চমঞ্চে আরোহণ করিতে ইচ্ছুক তাহাদের জন্য দ্বার উন্মুক্ত থাকুক। তাহাও কঠিনবোধ হয় না। কিছুকাল আমাদের প্রণালীতে শিক্ষিত হইয়া পরে তাহারা সেই মঞ্চে পদার্পণ করিতে পারেন। সে জন্য শিক্ষার স্থান পাওয়া কঠিন নহে।

১৮৯৩ সালের

সঙ্গত সভার কার্য্য বিবরণ।

গত মাঘোৎসবে ৫ই মাঘ মঙ্গলবার এই সভার বিশেষ উৎসব হয়। তাহাতে শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় আচার্য্যের কার্য্য করেন। সঙ্গতের কার্য্য বিবরণ পাঠান্তে কয়েকটী ভ্রাতা নিজ নিজ জীবনের অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে কিছু কিছু বলেন।

গত বৎসর এই সভায় উপস্থিত সভ্যের সংখ্যা গড়ে ৮।১০ জন হইয়াছিল। এতদ্ভিন্ন সময়ে সময়ে কয়েকটী মহিলাও যোগ দিয়াছিলেন। ৩০এ চৈত্র, ২৮এ অগ্রহায়ণ ও ৫ই পৌষ এই তিন মঙ্গলবারে সমাজ-মন্দিরে উৎসব, বক্তৃতা ও ব্রাহ্ম সম্মিলনীর বিশেষ উপাসনা থাকায় এই তিন দিন বাদে এ বৎসর এ সভার ৪৭টী অধিবেশন হয়। তাহার ১৩টী অধিবেশনে উপনিষদাদি শাস্ত্র পাঠ ও ব্যাখ্যা হয়। আদি ব্রাহ্মসমাজের শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধু শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ শাস্ত্রী মহাশয় এই উপনিষৎ পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়া আমাদের কৃতজ্ঞতা ভাজন হইয়াছেন, সে জন্য আমরা তাঁহাকে ধন্যবাদ দিতেছি। অবশিষ্ট ৩৪টী অধিবেশনের মধ্যে ১৪টী অধিবেশনে নানা বিষয়ে আলোচনা ও ২০টী অধিবেশনে নিম্নলিখিত ১০টী বিষয়ের আলোচনা হয়:—

(১) "অভিমান" (২) "সংসার" (৩) "সংসার কেন ধর্ম্মের প্রতিবন্ধক হয় ও তাহা নিবারণের উপায় কি?" (৪) "ব্রাহ্মদের গৃহ কিরূপ হওয়া উচিত" (৫) সাধুর লক্ষণ কি?" (৬) "ব্রাহ্মধর্ম্মের লক্ষণ কি?" (৭) "ব্রাহ্ম সমাজে পরস্পরের প্রতি প্রীতির যোগ কেন হইতেছে না ও তাহা হইবার উপায় কি?" (৮) "আমাদের পরস্পরের মধ্যে প্রীতির যোগ করিবার কার্য্যগত উপায়।" (৯) "সর্ব্বমত্যন্তং গর্হিতং" (১০) "আত্মোৎসর্গ"। এই সকল বিষয়ের কোন কোনটী ৩।৪ দিন ধরিয়া আলোচিত হইয়াছিল। আমরা উপরোক্ত বিষয়ের কয়েকটীর সারমর্ম্ম নিবেদন করিতেছি—

২। ব্রাহ্মদের গৃহ কিরূপ হওয়া উচিত—"ব্রহ্মনিষ্ঠো গৃহস্থঃ স্যাৎ তত্ত্বজ্ঞান পরায়ণঃ। যৎযদ্ কর্ম্ম প্রকুর্ব্বীত তদ্ব্রহ্মণি সমর্পয়েৎ॥" ইহা আমাদিগের আদর্শ মত। কিন্তু ইহা কার্য্যগত করিতে হইলে, আমাদিগের কতকগুলি নিয়মে আবদ্ধ হওয়া উচিত। তাহা এই—১ম, প্রতিদিন প্রাতঃকালে ও সন্ধ্যাকালে ভক্তির সহিত ভগবানের পূজা করিতে হইবে। ২য়, পিতা মাতা প্রভৃতি গুরুজনের প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধা ও ভ্রাতা ভগ্নীদিগকে প্রেম করা কর্ত্তব্য। ৩য়, দাস দাসীগণের প্রতি সদয় ব্যবহার। ৪র্থ, সকলের প্রতি সরল ব্যবহার। ৫ম, বিনয়ের সহিত মৃদু বাক্যের দ্বারা কথাবার্ত্তা কহা। ৬ষ্ঠ, অতিথি-সেবা। ৭ম, জীবে দয়া। ৮ম, জ্ঞানালোচনা ও শাস্ত্রাদি পাঠ। এই সকল বিষয় ব্রাহ্ম মাত্রেরই অবশ্য কর্ত্তব্য। এইরূপ ভাবে আমাদের জীবন গঠন করিতে চেষ্টা করিলে আমাদের পরিবার ব্রাহ্মপরিবার নামের উপযুক্ত হইবে ও আমাদের পরিবারে যে সমস্ত সন্তান সন্ততি জন্মিয়াছে বা জন্মিবে তাহারাও আমাদের দৃষ্টান্তের অনুরূপ জীবন গঠন করিতে শিক্ষা করিবে।

৩। ব্রাহ্মধর্ম্মের লক্ষণ কি?—১ম, আত্মায় ব্রহ্মের প্রত্যক্ষ যোগ সাধনই ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রথম ও সর্ব্বপ্রধান লক্ষণ। ২য়, তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধন করা, ইহাও তদ্রূপ প্রয়োজনীয়। হিন্দুজাতির প্রধান ভাব আত্মাতে পরমাত্মার দর্শন বা আত্মার সহিত ব্রহ্মের প্রত্যক্ষ যোগ স্থাপন; আর য়িহুদী জাতির প্রধান ভাব মানব-ইতিহাসের মধ্যে ঈশ্বরকে দর্শন করা। মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় এই দুই জাতির দুই বিশেষ ভাব একত্র সম্মিলিত করিয়াছিলেন ও মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ সেই ভাব প্রাণে অনুভব করিয়া "তস্মিন প্রীতি স্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনামেব" ব্রাহ্মধর্ম্মের এই পূর্ণ লক্ষণ প্রচার করিয়াছেন।

৪। ব্রাহ্মসমাজে পরস্পরের প্রতি প্রীতির যোগ কেন হইতেছে না ও তাহা হইবার উপায় কি?—১ম, আমাদের পরস্পরের মধ্যে অবিশ্বাস থাকায় আমাদের মধ্যে প্রীতির যোগ হইতেছে না। ২য়, আমরা অন্যের দোষ দেখিতে যেরূপ তৎপর, নিজেদের দোষ দেখিতে তেমন নহি। ৩য়, ভাবপ্রধান, জ্ঞানপ্রধান ও কর্ম্ম-প্রধান এই তিন শ্রেণীর লোক আমাদের মধ্যে দেখা যায়; কিন্তু ইঁহাদিগের মধ্যে এক শ্রেণী অপর শ্রেণীর লোককে একটু অশ্রদ্ধার চক্ষে দেখেন। প্রধানতঃ এই তিনটী কারণে আমাদের মধ্যে প্রীতির যোগ হইতেছে না।

ইহা দূর করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে নিজকে হীন বলিয়া জানা প্রয়োজন। আমাদের আত্ম-দৃষ্টি প্রবল হইলে নিজেদের ত্রুটী দুর্ব্বলতা দেখিতে পাই ও তাহা দেখিলে অন্যের দোষ দেখিলেও তাঁহার প্রতি প্রীতির অভাব হইবে না বরং তাহা বৃদ্ধি পাইবে। ২য়, পরস্পর প্রাণ খুলিয়া আলাপ করার প্রয়োজন; এরূপ করিলে পরস্পরের প্রতি অবিশ্বাস ও সন্দেহ দূর হইবে। ৩য়, আমাদের নিজ নিজ মত সম্বন্ধে যে গোঁড়ামী আছে তাহা ভাঙ্গিয়া দিতে হইবে। ৪র্থ, আমরা সকলে ব্রাহ্মসমাজে আসিয়াছি ভগবানকে পাইবার জন্য, সকলেই পরিত্রাণাকাঙ্ক্ষী, এই ভাব মনে সর্ব্বদাই চিন্তা করা কর্ত্তব্য। ৫ম, যদি প্রেমময় পরমেশ্বরের দিকে সকলের মুখ থাকে তাহা হইলে পরস্পরের প্রতি প্রেম অবশ্যম্ভাবী হয়। অতএব আমাদের আত্মার গতি যাহাতে তাঁহার দিকে হয় তাহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপায়। ৬ষ্ঠ, পরস্পর পরস্পরের বাড়ী যাওয়া ও পরস্পরের সংবাদাদি লওয়াতে প্রীতি সংস্থাপিত হয়।

তৎপরে এই প্রীতির যোগ করিতে হইলে পর-দোষ কীর্ত্তন করা একবারে বিষবৎ পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য। যাঁহাদের সহিত আত্মীয়তা করিতে ইচ্ছা করি, তাঁহাদের কখনও কোথাও নিন্দা না করা। যদি তাঁহাদের কাহারও কোনও দোষ থাকে, তবে তাঁহার নিকটেই তাহা বিনীত ভাবে বলা

উচিত; কিন্তু অন্তের নিকট বলিয়া তাঁহাকে হেয় করিবার চেষ্টা করা কখনই উচিত নহে।

৫। আত্মোৎসর্গ—আত্মোৎসর্গ করা বড় কঠিন ব্যাপার। আমরা মুখে আত্মোৎসর্গের কথা বলি বটে, কিন্তু জীবনে তাহা সম্পন্ন করা সুকঠিন। একজন সাধু বলিয়াছেন "আত্মোৎসর্গ করিয়াছ, তবে প্রার্থনা কর কেন?" অর্থাৎ আত্মোৎসর্গ করিলে প্রার্থনার আবশ্যকতা থাকে না। আমি যখন নিজের মন প্রাণ সমুদয় দান করিয়াছি, তখন আর আমার নিজের কিছুই থাকিল না। আমার মনের উচ্চ নীচ প্রভৃতি সমস্ত বাসনা নির্ব্বাণ না হইলে যথার্থ আত্মোৎসর্গ হইবে না। এইরূপ সমস্ত বাসনা বিসর্জ্জন দিয়া আত্মোৎসর্গ করিলে যাঁহাকে আত্মোৎসর্গ করা যায় তখন তিনি যাহা বলিবেন তাহা করা সম্ভব হয়। সুতরাং নিজের বাসনার জন্ম প্রার্থনার আবশ্যকতা থাকে না; সে সময় আমার কেবল এই কর্ত্তব্য যে আমি কেবল তাঁহার মুখ-পানে তাকাইয়া থাকি।

কিন্তু আমাদের পক্ষে আত্মোৎসর্গ একটা সাধন। "আমি ভগবানের হইব" এইরূপ ভাব অল্লাধিক পরিমাণে সকলেরই হয়, কিন্তু এঅবস্থা আমাদের স্থায়ী হয় না। ইহা স্থায়ী করিতে হইলে আমাদিগকে সর্ব্বত্যাগী হইবার জন্ম অর্থ, সময় ইত্যাদি সমস্ত বিষয়েরই কিছু কিছু করিয়া ভগবানের কার্য্যে দিতে হইবে। এইরূপ ক্রমে ক্রমে সাধন করিতে করিতে আমাদের আদর্শের দিকে অগ্রসর হইতে পারিব। ইহাই ধর্ম্ম।

লোকে ধর্ম্ম সাধন করিবার জন্ম নানা প্রকার চেষ্টা করে। ১ম, প্রতিজ্ঞা; কিন্তু মানুষ ইহা রক্ষা করিতে পারে না, বিফল হয়। ২য়, অনুকরণ; মানুষ ইহা করিতে যাইয়া বিফল হইয়া থাকে। ৩য়, সাধু-জীবনের প্রভাব; ইহা আতস-প্রস্তরের ন্যায় অন্তের জীবনে কার্য্যকরে। ইহাতেই জীবনের যথার্থ পরিবর্ত্তন হয়।

মহাম্ পরমেশ্বরের কৃপায় এবৎসর সঙ্গত সভা কর্ত্তৃক নিম্নলিখিত কার্য্য দুইটী সম্পন্ন হইয়াছে।

১ম, সঙ্গতের একজন উৎসাহী সভ্য কর্ত্তৃক পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় এবৎসরও প্রতিদিন সন্ধ্যার পর সমাজ-মন্দিরে পরব্রহ্মের উপাসনা হইয়াছে।

২য়, পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় এবৎসরও সঙ্গত সভার কয়েক জন সভ্য ৩০এ অগ্রহায়ণ হইতে সমস্ত পৌষ মাস কলিকাতাবাসী ব্রাহ্মদিগের—কেবল সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের নহে, আদি ব্রাহ্মসমাজও নববিধান ব্রাহ্মসমাজের ব্রাহ্মদিগের বাড়ী বাড়ীও ভোর সংকীর্ত্তন ও উপাসনা করতঃ ভগবানের নাম প্রচার করিয়া আপনাদিগকে ধন্ত ও কৃতার্থ করিয়াছেন।

প্রাচ্য ও প্রতীচ্য ধর্ম্মভাব।

(চতুঃষষ্টিতম মাঘোৎসব উপলক্ষে ১২ই মাঘ ২৪এ জানুয়ারী শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী কর্ত্তৃক প্রদত্ত বক্তৃতার সারাংশ)

বর্ত্তমান সময়ে দুই প্রকার স্রোত এদেশে সম্মিলিত হইতেছে—একটী পূর্ব্ব দেশীয়, অপরটী পাশ্চাত্য। আমরা ইচ্ছা না করিলেও আমাদের সামাজিক রাজনৈতিক, পারিবারিক প্রভৃতি সকল সম্বন্ধ ধীরে ধীরে এই পরিবর্ত্তন-স্রোতে ভাসিতেছে। একান্নবর্ত্তিতা, পূর্ব্বতন পারিবারিক গঠন প্রভৃতি সকলই পরিবর্ত্তনশীল। পিতা, পুত্র, ধনী ও দরিদ্র, বর্ষীয়ান ও যুবক, পুরুষ ও নারী, রাজা ও প্রজা, জমীদার, ও রাইয়ত প্রভৃতি সকলেরই সম্বন্ধ এই উভয় চিন্তা-স্রোতের সম্মিলনে পরিবর্ত্তিত হইতেছে। এবং সর্ব্বশেষে এই স্রোত ধর্ম্মরাজ্যেও যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য এই উভয় ধর্ম্মভাবের সম্মিলন সংঘটিত হইতেছে।

এক্ষণে আলোচ্য—প্রাচ্য ধর্ম্মভাব কি? প্রাচ্য ধর্ম্ম বলিলে আমরা হিন্দুধর্ম্ম বুঝিব। কারণ পূর্ব্বদেশীয় অপর দুইটী ধর্ম্মের মধ্যে বৌদ্ধধর্ম্ম হিন্দুধর্ম্ম হইতে প্রসূত এবং ইস্লাম ধর্ম্মের মূলভাব য়িহুদী ধর্ম্ম হইতে উৎপন্ন। সুতরাং ইহাদের মধ্যেও প্রাচ্য এবং প্রতীচ্যভাব বিদ্যমান। এই প্রাচ্য ভাবের ভিত্তি ও প্রকৃতি কি তাহা নির্দ্দেশ করিবার পূর্ব্বে কিরূপে উহা উৎপন্ন হইল দেখা আবশ্যক। সাধারণতঃ যদি ধর্ম্মভাবের মূল ভিত্তি বিচার করি, তাহা হইলে এই প্রশ্নে উপনীত হই—ঈশ্বর, মানবাত্মা ও জগৎ এই সকলের স্বরূপ ও সম্বন্ধ-বিষয়ে সেই সেই ধর্ম্ম সংস্থাপকগণ কি কি মত প্রকাশ করেন? সেই সেই মতের উপর স্থাপিত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন ভাব প্রস্ফুটিত হইয়াছে। ঈশ্বর সম্বন্ধে আজ পর্য্যন্ত জগতে তিন প্রকার ভাব দেখিতে পাওয়া যায়—(১) জগতে, (২) মানবাত্মায় এবং (৩) ইতিহাসে তাঁহাকে দর্শন করা। জড়জগৎ, চেতনরাজ্য এবং মানবসমাজ সর্ব্বদা সকলের চক্ষুর সমক্ষে বিদ্যমান রহিয়াছে। কোনও কোনও জাতি জড়ে, কোনও কোনও জাতি চেতনে এবং অপরেরা ইতিহাসে ঈশ্বরের সত্তা সন্দর্শন করিয়াছেন। প্রাচীন গ্রীকগণ জড় জগতের শোভায় তাঁহাকে "সুন্দরং" রূপে দর্শন করিয়াছেন। জড় জগতে ঈশ্বর-দর্শন অভ্যাস করিলে তাহার সৌন্দর্য্য এবং শৃঙ্খলা মানব-প্রাণকে আকর্ষণ করিবেই করিবে। সামান্য বালুকাকণা হইতে সুবিশাল হিমালয় পর্য্যন্ত যেখানে দেখি, সর্ব্বত্রই সৌন্দর্য্য চারিদিকেই শৃঙ্খলা। অণুবীক্ষণ যোগে কীটাণুর দেহ পর্য্যবেক্ষণ করিলে শোভার'পরে শোভা পরিলক্ষিত হয়। জড়ে দেখিলে "সুন্দরং" ভাব জাগিবেই জাগিবে। এই কারণে গ্রীসদেশে স্থপতিবিদ্যা, শিল্প, কাব্য, অট্টালিকা প্রভৃতি যথেষ্ট উন্নতি লাভ করিয়াছে এবং যাহা কিছু হইয়াছে সমস্তই সুন্দর—ছবি রাস্তা, ঘর প্রভৃতি সমস্তই সুন্দর। আধুনিক ফরাসীজাতি যেরূপ সৌন্দর্য্যপ্রিয় প্রাচীন গ্রীকগণও সেইরূপ সৌন্দর্য্যের উপাসক ছিলেন। তাঁহারা জড়ের মধ্যে দেখিতে অভ্যাস করিয়াছিলেন বলিয়া, ঈশ্বরকে সুন্দর দেখিতেন। এই সৌন্দর্য্য জ্ঞান তাঁহাদের মধ্যে এতদূর বিকশিত হইয়াছিল যে, সৌন্দর্য্যই তাঁহাদিগের মধ্যে পুণ্য এবং কদর্য্যতা পাপ বলিয়া পরিগণিত হইত।

কোনও কোনও জাতি চেতনে বা আত্মাতে ঈশ্বর দর্শন অভ্যাস করিয়াছেন। তাঁহারা তাঁহাকে নিত্যরূপে দেখিয়াছেন। হিন্দুগণ নিত্যরূপে "ধ্রুবমধ্রুবেষু" সমুদয় অধ্রুব পদার্থের মধ্যে

তাঁহাকে ধ্রুবরূপে সন্দর্শন করিয়াছেন। এক্ষণে প্রশ্ন এই, আত্মাতে দেখিলে নিত্য জ্ঞান হয় কেন? জড়জগতে তাঁহাকে সুন্দর বলিয়া উপলব্ধি করা যায়, কিন্তু আত্মাতে দেখিলে তিনি কিরূপে নিত্য বলিয়া প্রতিভাত হন? ইহার কারণ আত্মাতে প্রবিষ্ট হইলে, বিশেষরূপে আত্মানুসন্ধান করিলে, পরিবর্ত্তনশীল নানারূপ অবস্থা প্রথমেই অনুভূত হয়। মানস সাগরে, হর্ষ, দুঃখ, শোক, ভয় বিস্ময় প্রভৃতি নিয়ত কত তরঙ্গই উঠিতেছে। ইহার সমুদয়ই অস্থায়ী, ক্ষণিক। এখনি এই বিশাল সমুদ্রে নিমগ্ন হও, দেখিবে তথায় কত তরঙ্গ উঠিতেছে, পড়িতেছে, পরস্পরে তুমুল আঘাত করিতেছে, আবার কোথায় বিলীন হইতেছে। এক্ষণকার যে চিন্তা, হর্ষ, শোক, তাহা পরক্ষণেই লয় প্রাপ্ত হইতেছে। কিন্তু এ সকলের মধ্যে কি স্থায়ী পদার্থ কিছুই নাই? এ সকল কি সূত্রবিহীন মুক্তার ন্যায়? চিন্তার মুক্তাগুলি কি পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইয়া ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে, অথবা এ সকলের মূলে অন্তর্নিহিত এমন কোনও সূত্র আছে, যাহা এই সকলের একত্র সন্নিবেশ দ্বারা অপূর্ব্ব মুক্তিকণহার রচনা করিয়াছে? অন্তরে প্রবেশ করিয়া দেখ এ সকলের মূলে আত্মত্ববোধ (personal identity) আছে কি না? এই আত্মত্ববোধ এই সমুদয় চিন্তাকে একসূত্রে বাঁধিয়াছে। এই আত্ম চিন্তাতেই "সূত্রে মণিগণাইব" সমস্ত সম্বদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। আত্মা সকলের মূলে স্থায়ীরূপে বিদ্যমান রহিয়াছে। অতএব আত্মাতে নিমগ্ন হইলে যখন সমুদয় অস্থায়ী ভাবের মধ্যে একটী স্থায়ী বস্তু দেখিতে পাওয়া যায়, তখন স্বভাবতঃ এই প্রশ্নের উদয় হয় যে—আমার মধ্যে যেমন এক স্থায়ী সূত্র রহিয়াছে, তেমনি এই বাহ্যজগতের সমুদয় পরিবর্ত্তনশীল ঘটনার মধ্যে এমন কোন্ সূত্র রহিয়াছে, যাহা এই সকলকে একত্র রাখিয়াছে? এই প্রশ্ন মানবকে সমুদয় অনিত্য বস্তুর মধ্যে সেই নিত্য পদার্থকে দেখাইয়া দেয়। এইরূপেই হিন্দুগণ ঈশ্বরকে নিত্য বলিয়া দর্শন করিয়াছিলেন।

তৃতীয়তঃ কোনও কোনও জাতি মানব ইতিবৃত্তে ঈশ্বরকে দর্শন করিয়াছেন। য়িহুদীগণ এই শ্রেণীর অন্তর্গত। তাঁহারা মানব ইতিবৃত্তে বিধাতার লীলা সন্দর্শন করিতেন। তাঁহারা ঈশ্বরকে মানবের কার্য্যের সাক্ষী, বিচারক বলিয়া অনুভব করিতেন। এ দেশের চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ যে সেরূপ ভাবে ঈশ্বরকে অনুভব করেন নাই তাহা নয়। মনুসংহিতাতে আছে—

"একোহহমস্মীত্যাত্মানং যত্বং কল্যাণ মন্যসে।
নিত্যং স্থিতস্তে হৃদ্যেষ পুণ্যপাপেক্ষিতা মুনিঃ॥"

হে ভদ্র! আমি একাকী আছি, এই যে তুমি মনে করিতেছ, এরূপ করিবে না। পুণ্য পাপদর্শী সর্ব্বজ্ঞ পুরুষ স্তব্ধ হইয়া তোমার হৃদয়ে নিত্য স্থিতি করিতেছেন।

এই বচন হইতে দেখা যাইতেছে যে হিন্দুগণও ঈশ্বরকে তাঁহাদের কার্য্যের সাক্ষী, বিধাতা ও বিচারক বলিয়া অনুভব করিতেন। কিন্তু এটী এদেশের মুখ্য ভাব নয়। এই ভাবটী য়িহুদীদের মধ্যে বিশেষ ভাবে প্রকাশিত হইয়াছিল। আত্মার মধ্যে যাঁহারা পরমাত্মাকে দেখিয়াছেন তাঁহারা দেখিয়াছেন যে পরমাত্মা ওতপ্রোত ভাবে সমুদয় বস্তুতে বিদ্যমান আছেন। তাঁহারা দেখিয়াছেন, যেমন এই নিত্য পুরুষ হৃদয়ের পরমাকাশ আত্মার পরমাত্মা হইয়া, জীবনের আধাররূপে বিদ্যমান রহিয়াছেন, আত্মা হইতে তাঁহার আকাশেরও ব্যবধান নাই, সেইরূপ তিনি সকল বস্তুতে গূঢ়রূপে অনুপ্রবিষ্ট রহিয়াছেন। যাঁহারা ইতিবৃত্তে তাঁহার অন্বেষণ করিয়াছেন তাঁহারা তাঁহাকে বাহিরেই দেখিয়াছেন। তাঁহারা দেখিয়াছেন তাঁহাদের ঈশ্বর কোনও এক সপ্তম স্বর্গে বাস করিতেছেন এবং মানবের কার্য্য সমুদয় পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন। তিনি নিজ গৃহে সিংহাসনে বসিয়া রাজদণ্ড হস্তে সমুদয় শাসন করিতেছেন।

হিন্দুগণ আত্মমধ্যে দেখিয়াছেন বলিয়া "অনিত্যের মধ্যে নিত্য" এই ভাব উপলব্ধি করিয়াছেন। তাঁহারা বলিয়াছেন:—

নিত্যোঽনিত্যানাং চেতনশ্চেতনানাং
একো বহূনাং যোবিদধাতি কামান্।
তমাত্মস্থং যেঽনুপশ্যন্তি ধীরাস্তেষাং
শান্তিঃ শাশ্বতী নেতরেষাম্॥"

যিনি তাবৎ অনিত্য বস্তুর মধ্যে একমাত্র নিত্য, যিনি সকল চেতনের একমাত্র চেতয়িতা, একাকী যিনি তাবতের কাম্যবস্তু বিধান করিতেছেন, তাঁহাকে যে ধীরেরা স্বীয় আত্মাতে সাক্ষাৎ দৃষ্টি করেন, তাঁহাদের নিত্য শান্তি হয়, অপর ব্যক্তিদিগের তাহা কদাপি হয় না।" তাঁহারা দেখিয়াছেন জড়ের মধ্যে যে শক্তি নিত্যরূপে বাস করিতেছে সেই শক্তিই মানবাত্মাতে চৈতন্যরূপে প্রকাশিত রহিয়াছে। পাশ্চাত্য পণ্ডিত H. Spencer ও একস্থানে বলিয়াছেন—'There is an infinite and eternal energy from which everything proceeds।' তিনি যে কেবল চৈতন্য তা নয় কিন্তু তিনি বিধাতা। তাঁহাকে আত্মস্থ বলিয়া জানিতে হয়। এই আত্মনিষ্ঠতা হিন্দুধর্ম্মের বিশেষভাব, আত্মাতে পরমাত্মাকে দর্শন করাই মুখ্য লক্ষ্য। ইহা হইতে আরও দুইটী ভাব সমুৎপন্ন হইয়াছে। ১ম নিত্যানিত্য বিবেক, ২য় মানবাত্মার পরাধীনতা। আত্মাতে দেখিলেই পরমাত্মা নিত্য ও অন্য সকল বস্তুই অনিত্য দেখা যায়। এ কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। এক্ষণে দেখা যাউক, এই মানবাত্মার পরাধীনতা আসিল কিসে? ভারতের চিন্তাশীল সাধকগণ, জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি আত্মার এই তিনটী অবস্থা উপলব্ধি করিয়াছেন। ইহাতে তাঁহারা দেখিতে পাইলেন যে স্বপ্ন ও সুষুপ্তি স্বাধীন অবস্থা নয়। স্বপ্নে যে সকল বিষয় দেখিতেছি তাহার কোনটীর উপরেই আমার হাত নাই। যে সকল বিষয় আমি কখনও ভাবি নাই হয়ত এমন কত বিষয় আমার কল্পনানেত্রের সম্মুখে উপস্থিত হইতেছে। ইহার কোনটীও আমার ইচ্ছামতে ঘটে নাই—সকলই আমার ইচ্ছা-নিরপেক্ষ। সুষুপ্তি অবস্থার ত কথাই নাই, তখন আমার আমিত্ব জ্ঞান পর্য্যন্ত ক্ষণকালের জন্য লুক্কায়িত হয়। এইরূপে তাঁহারা দেখিয়াছেন যে এই দুই অবস্থা সম্পূর্ণরূপে অন্য এক শক্তির অধীন। তাঁহারা আরও দেখিয়াছেন যে এই যে জাগ্রতাবস্থা, যাহাতে আমি যাইতেছি, খাইতেছি,

বসিতেছি, উঠিতেছি, যে অবস্থায় আমার কর্তৃত্বজ্ঞান সর্ব্বদা আমার সম্মুখে রহিয়াছে ইহাও সম্পূর্ণ স্বাধীন অবস্থা নয়। কারণ প্রত্যেক মুহূর্ত্তে আমাদের যে জ্ঞান ক্রিয়া (sensation) হইতেছে, এবং পরে মন যে মাল মসলায় চিন্তার প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিতেছে সেই জ্ঞান-ক্রিয়ার উপর আমাদের কোনও হাত নাই। চক্ষু খুলিবামাত্র সূর্য্যালোক আমাদের গোচরে আসিতেছে, তার উপর আমাদের কি হাত আছে? ইন্দ্রিয়-দ্বার দিয়া জড়জগৎ আমাদের উপর যে ভাব উৎপন্ন করিতেছে, তাহার উপর আমাদের কি হাত? এইরূপে দেখিতে পাই যে কোনও জ্ঞান ক্রিয়াই আমাদের ইচ্ছাধীন নয়। তৎপরে দেখিতে পাই যে আমাদের এই যে জীবন ইহার আদি ও অন্ত কিছুরই উপর আমাদের কর্ত্তৃত্ব নাই। এ জীবনের যখন আরম্ভ হইয়াছে, তখন আমাদের ইচ্ছাতে হয় নাই। আবার যখন এই জীবনের শেষ হইবে তখনও আমাদের ইচ্ছা নিরপেক্ষ ভাবেই হইবে। আমাদের জন্মের উপর কোনও হাত নাই, যে জীবন সকলে পোষণ করিতেছি, তার অন্তের উপর কর্ত্তৃত্ব নাই। জীবন যে এখন আছে তাহাতেও তার জ্ঞানের উপর কর্ত্তৃত্ব নাই। সমুদয় ইন্দ্রিয়জনিত জ্ঞান আমাদের ইচ্ছাধীন নয়। প্রতি নিয়ত যে সকল ক্রিয়ার উপর আমাদের জীবন নির্ভর করিতেছে, তার উপর কি হাত আছে? শ্বাস, প্রশ্বাস, রক্ত সঞ্চালন, পাকস্থলীর ক্রিয়া ইহার কোন্‌টা আমাদের ইচ্ছাধীন? কি আশ্চর্য্য যে সকল আমরা স্বহস্তে লইলে কোনও রূপ বিপদের সম্ভাবনা নাই, সেই গুলিই কেবল আমাদের হাতে, আর যেখানে পদে পদে বিপদ তাহার কোনওটাই আমাদের হস্তে অর্পিত হয় নাই, সমস্ত গুলিরই পরিচালনের ভার অন্য এক শক্তির হস্তে ন্যস্ত রহিয়াছে। যদি শ্বাসযন্ত্র পাকস্থলী প্রভৃতির কার্য্য আমাদের হস্তে থাকিত তাহা হইলে কি মুহূর্ত্ত কালের জন্যও আমাদের জীবনের আশা ছিল? তবে আর স্বাধীনতা কোথায়? পশ্চিমদেশীয় ঋষি এমার্শন বলিয়াছেন :—

"Life is a stream, it is descending into us, from where we know not."

"আমাদের এই জীবন-সরিৎ নিয়ত আমাদের মধ্যে প্রবাহিত হইয়া আসিতেছে, কিন্তু কোথা হইতে প্রবাহিত, তাহা আমরা অবগত নহি।"

(ক্রমশঃ)

দীক্ষার্থীদিগের প্রতি শ্রীমম্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের উপদেশ।

"ঈশ্বর আমারদিগের মনে কি এক স্পৃহা দিয়াছেন, যে স্পৃহাতে আমরা তাঁহাকে লাভ করিবার জন্ত সর্ব্বদাই লালায়িত। এই ঈশ্বর-স্পৃহা মনুষ্য মাত্রেরই হৃদয়ে জাগরুক; পশু মধ্যে ইহা দেখিতে পাওয়া যায় না। ঈশ্বর ব্যতীত আমারদিগের যে জীবন ধারণ সে পশু জীবনের সঙ্গে সমান। ঈশ্বর বিনা আমরা চলিতে, বলিতে, এমন কি নিঃশ্বাস কি নিমেষ ফেলিতেও পারি না। তাঁহার কৃপাতেই আমরা জীবন ধারণ করিতেছি, তাঁহার কৃপাতেই আমরা চলিতেছি, বলিতেছি এবং নিঃশ্বাস ও নিমেষ ফেলিতেছি। সকল সময়ে, সকল স্থানে, সকল কার্য্যে, সকল অবস্থাতেই তাঁহার কৃপার পরিচয় পাইতেছি। তাঁহার কৃপাই আমারদিগের সম্বল— "ব্রহ্মকৃপাহিকেবলম্।"

আমরা বিপদে পড়িলে কে এমন বন্ধু আছে যে, সেই বিপদ হইতে আমারদিগকে উদ্ধার করে? কে এমন বন্ধু আছে যে আমারদিগকে মোহ-পাপ হইতে রক্ষা করে? সে কেবল একমাত্র ঈশ্বর। আমরা বিপদে পড়িলে তিনি রক্ষা করেন, এমন কি বিপদে পড়িবার আগেও আমারদিগকে সাম্‌লাইয়া দেন্। সংসারে মা যেমন সন্তানকে বিপথে পতিত হইবার পূর্ব্বেই সাম্‌লাইয়া দেন্, সেইরূপ ঈশ্বর সর্ব্বদা আমারদিগকে সাম্‌লাইয়া দিতেছেন; এবং বিপদ হইতে রক্ষা করিতেছেন। তিনি অহরহ আমারদিগকে শুভবুদ্ধি প্রেরণ করিতেছেন। আমরা তাহা না শুনিয়া, তাঁহার আদেশ লঙ্ঘন করিয়া পাপে পড়িতেছি। কে সেই পাপ হইতে আমারদিগকে রক্ষা করিবে; কে সেই পাপ হইতে আমারদিগকে পরিত্রাণ করিবে? যাঁহার আদেশ লঙ্ঘন করিয়া পাপে পড়িয়াছি, তিনি ভিন্ন আর আমারদিগের সে পাপের পরিত্রাতা নাই। যখন পাপে পড়িব, তখন তাঁহার নিকট ক্রন্দন করিব, যখন বিপদে পড়িব তখন তাঁহাকেই ডাকিব; তিনি আমারদিগকে রক্ষা করিবেন— তিনি আমারদিগকে উদ্ধার করিবেন। নদীতে নৌকা ডুবু ডুবু হইলে, নৌকার লোক সকল যেমন "হে ঈশ্বর রক্ষা কর" বলিয়া আর্ত্তনাদ করে, সেইরূপ আমরা বিপদে পড়িলে "রক্ষা কর" বলিয়া তাঁহার নিকট কাঁদিব—ঈশ্বর ভিন্ন আমারদিগের আর গতি নাই। ঈশ্বর ভিন্ন কেমন করিয়া চলে?

তিনি আমারদিগের একমাত্র সুখদাতা ও সম্পদ বিধাতা। আমরা তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ হইব, আমরা তাঁহাকেই প্রীতি করিব, তাঁহাকেই ভক্তি করিব। আমারদের ভক্তি প্রীতি ও জ্ঞান সেই এক ঈশ্বর ব্যতীত আর কিছুতেই চরিতার্থ হয় না। আমারদের জ্ঞান তাঁহাকে জানিয়াই তৃপ্তি লাভ করে, আমারদের হৃদয় তাঁহাকে প্রীতি ও ভক্তি করিয়াই কৃতার্থ হয়। প্রীতি ও ভক্তি পুষ্পের দ্বারাই তাঁহার পূজা করিতে হয়। তোমরা তোমাদের প্রীতি ও ভক্তি পুষ্পের দ্বারা তাঁহার অর্চ্চনা করিবে।

তিনি আমারদিগের ইচ্ছাকে স্বাধীন করিয়া দিয়াছেন। আমরা ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে লাভ করিতে পারি। তবে আমরা তাঁহাকে পাই না কেন? ইচ্ছা করি না, চেষ্টা করি না বলিয়াই আমরা পাই না। আপন ইচ্ছায় তাঁহার প্রতি যে প্রীতি ও ভক্তি অর্পণ করা যায়, তাহাই প্রকৃত ভক্তি ও প্রীতি। জোর করিয়া চাবুক মারিয়া কাহারও ভক্তি ও প্রীতি আকর্ষণ করা যায় না। একজন অর্থলোভে ভক্তি, প্রীতি সমাদর দেখাইতে পারে; কিন্তু তাহা প্রকৃত ভক্তি বা প্রকৃত প্রীতি নহে। সেরূপ কপট ভক্তি ও প্রীতি কোন কাজেরই নয়। অনিচ্ছার ভক্তি প্রীতির কোন মূল্য নাই। তিনি চাহেন, আমরা ইচ্ছা

করিয়াই স্বাধীন ভাবেই তাঁহাকে ভক্তি করিব। ইচ্ছা দ্বারা আমরা জ্ঞান শিক্ষা করি এবং সেই জ্ঞান দ্বারা আমরা তাঁহাকে লাভ করিতে পারি। জ্ঞান দ্বারা তাঁহাকে লাভ করিতে হয়। আমরা যে তাঁহাকে পাই না, তাহা কেবল জ্ঞানের অভাবে। চেষ্টা করিলে আমরা জ্ঞান লাভ করিতে পারি। জ্ঞানের দ্বারা তাঁহাকে লাভ করিতে সচেষ্ট হও, দেখিবে তাঁহার প্রসাদ অবতীর্ণ হইবেই হইবে।

তাঁহাতে চিত্ত সমাধান কর, অবশ্যই তিনি প্রসাদ-বারি বর্ষণ করিবেন। কৃষক যেমন নিজে চেষ্টা করিয়া ক্ষেত্র কর্ষণ করে, তৎপর আকাশ হইতে বারি বর্ষণ করিলেই, সেই ক্ষেত্রে শস্য জন্মে, তেমনি আমরা তাঁহাকে লাভ করিবার জন্য সর্ব্বদাই চেষ্টা করিব, কিন্তু ফলদাতা তিনি; তাঁহার কৃপা হইলেই আমারদের চেষ্টা সফল হইবে। তাঁহাকে লাভ করিবার জন্য আমরা চেষ্টা করিলে, তিনি কৃপা করিবেন, তিনি আমারদের সহায় হইবেন, তাহাতে কিছু মাত্র সন্দেহ নাই।

শ্রীমান্ মনীন্দ্র ও শ্রীমান্ প্রিয়নাথ! চিরজীবন তাঁহাকে পাইবার জন্য তোমরা তোমারদিগের জ্ঞান বুদ্ধি নিয়োগ কর। যাগ্যবল্ক ঋষি বলিয়াছেন:—

"নতং বিদাথ যাইমাঃ জজানা ন্যৎ
যুষ্মাকং অন্তরং বভূব নীহারেন প্রাবৃতা
জল্প্যাচাসুতৃপ উক্থ শাসশ্চরন্তি।"

এই আশ্চর্য্য জগৎ দেখিয়া, চারিদিকে আশ্চর্য্য সৃষ্টিকৌশল দেখিয়াও তোমরা তাঁহাকে জানিলে না; যিনি অন্তরে রহিয়াছেন তোমরা তাঁহাকে অন্তরেও দেখিলে না? কেমন করিয়াই বা তাঁহাকে জানিবে? অজ্ঞান কুয়াসা সব যে ঢাকিয়া রাখিয়াছে। বৃথা জল্পনাতে রহিয়াছ। প্রাণের তৃপ্তি সাধন ও ইন্দ্রিয় চরিতার্থ করিতে ব্যস্ত রহিয়াছ। অতএব অজ্ঞানতাকে পরিহার কর, বৃথা জল্পনা বাচালতাকে পরিত্যাগ কর। ইন্দ্রিয় সংযম কর। সত্য বিনা জ্ঞান কখন তৃপ্ত হয় না, অজ্ঞানের কল্পনা তেত্রিশ কোটী দেবতা; কিন্তু জ্ঞানের দ্বারা যে সত্য আবিষ্কৃত হয় তাহাতে দেখি যে ঈশ্বর একই অদ্বিতীয়।" তোমরা সমাহিত চিত্ত হইয়া জ্ঞান প্রেম ও ভক্তি-যোগে সেই "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্মের" পূজা করিবে। তোমরা অপর দেবদেবীর পূজা করিও না। একমাত্র ঈশ্বরের আরাধনাই ব্রাহ্ম ধর্ম্মের মূল মন্ত্র। প্রতিদিন ঈশ্বরের উপাসনা করিবে। উপাসনাই আত্মার অন্নপান। আহার অভাবে শরীর যেমন কৃশ ও দুর্ব্বল হয়, উপাসনা অভাবে আত্মাও সেইরূপ দুর্ব্বল হয়। দিনাদৌ দিনান্তে, নিশাদৌ নিশান্তে, দিনার্দ্ধে নিশার্দ্ধে যখনই পারিবে তাঁহার উপাসনা করিবে। একদিনও যেন বন্ধ্যা না হয়। উপাসনাহীন হইয়া যেন দিন না যায়। কিন্তু ব্রাহ্মধর্ম্ম তোমাদিগকে বিধি দিতেছেন, যদি কোন দিন বিপদে বা রোগে একেবারে মুহ্যমান বা হতচেতন হইয়া পড়, সে দিন উপাসনা বাদ দিতে পার। নতুবা প্রতিদিন তাঁহার উপাসনা করিবে। ফুল চন্দন দিয়া তাঁহার উপাসনা করিতে হয় না। "তস্মিন প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব" তাঁহাকে প্রীতি এবং তাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধন করাই তাঁহার উপাসনা।

ব্রাহ্মসমাজ।

মনাই চা-বাগান ব্রাহ্মসমাজে গত মাঘোৎসবের সময় চন্দননগর নিবাসী বাবু কালীচরণ বসু নামক এক ব্যক্তি ব্রাহ্ম-ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছেন।

ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের পুত্র শ্রীমান্ মনীন্দ্রনাথ ও পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের পুত্র শ্রীমান্ প্রিয়নাথ বিগত ১লা ফাল্গুন সোমবার প্রাতে সার্দ্ধ আট ঘটিকার সময় পার্কষ্ট্রীটস্থ ভবনে পূজ্যপাদ শ্রীমন্মহর্ষির নিকট পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছেন। পূজ্যপাদ মহর্ষি উপাসনা ও দীক্ষা কার্য্য সমাধা করেন এবং আশীর্ব্বাদ করিয়া দীক্ষার্থী-দ্বয়কে উপদেশ প্রদান করেন। স্থানান্তরে তাঁহার উপদেশ প্রকাশিত হইল।

প্রচার—পশ্চিম প্রচার যাত্রীদল ১৯এ ফেব্রুয়ারী ভাগলপুরে শ্রীযুক্ত বাবু নিবারণ চন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বাড়ীতে উপস্থিত হন। ২০এ প্রাতে উক্ত বাসায় উপাসনা হয়, শ্রীযুক্ত গুরুদাস চক্রবর্ত্তী উপাসনা করেন। রাত্রিতে ব্রাহ্মবন্ধু বাবু জয়-কৃষ্ণ মিত্র মহাশয়ের বাসায় উপাসনা হয়, গুরুদাস বাবু উপাসনা করেন। ২১এ প্রাতে নিবারণ বাবুর বাসায় উপাসনা হয়, শ্রীযুক্ত প্রকাশদেব উপাসনা করেন। রাত্রিতে শ্রীযুক্ত বাবু রাধারমণ সিংহের বাসায় উপাসনা হয়, গুরুদাস বাবু উপাসনা করেন। ২২এ তারিখ ভাগলপুর ব্রাহ্মসমাজের বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে প্রাতে মন্দিরে গুরুদাস বাবু আচার্য্যের কার্য্য করেন ও উপদেশ দেন। ২৩এ তারিখ প্রাতে নিবারণ বাবুর বাসায় উপাসনা হয়, শ্রীযুক্ত কাশীচন্দ্র ঘোষাল উপাসনা করেন। অদ্য অপরাহ্নে প্রচারদল ভাগলপুর হইতে মুঙ্গেরে যাত্রা করেন এবং রাত্রিতে মুঙ্গেরের ব্রাহ্মবন্ধু শ্রীযুক্ত বাবু চণ্ডীচরণ সিংহের বাসায় উপস্থিত হন। তথায় উপাসনা হয়, গুরুদাস বাবু উপাসনা করেন। ২৪শে প্রাতে স্থানীয় উকিল বাবু মহেন্দ্র-লাল রায়ের বাড়ীতে উপাসনা হয়, শ্রীযুক্ত প্রকাশদেব উপাসনা করেন। অপরাহ্নে বাজারে কীর্ত্তন ও হিন্দি বক্তৃতা হয়। প্রকাশদেব বক্তৃতা করেন। রাত্রিতে মন্দিরে উপাসনা হয়। গুরুদাস বাবু উদ্বোধন সূচক পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়া আরাধনা করেন, তৎপরে শ্রীযুক্ত প্রকাশদেব উপদেশ প্রদান করেন। ২৫শে তারিখ প্রাতে চণ্ডীবাবুর বাসায় উপাসনা হয়, গুরুদাস বাবু উপাসনা করেন। ঐ দিন যাত্রীদল বাঁকি-পুরে গমন করিয়াছেন।

বিজ্ঞাপন।

আগামী ১১ই মার্চ্চ, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজউপাসনালয়ে সায়ংকালীন উপাসনার পর সাঃ ব্রাঃ সমাজের কলিকাতাস্থ উপাসক মণ্ডলীর বার্ষিক অধিবেশন হইবে।

বিবেচ্য বিষয়।

১। বার্ষিক কার্য্যবিবরণ ও আয় ব্যয়ের হিসাব।
২। আচার্য্য ও কর্ম্মচারী নিয়োগ ও কার্য্যনির্ব্বাহক সভা গঠন।
৩। গত ২৩এ জুলাই উপাসক মণ্ডলীর বিশেষ অধি-বেশনে মণ্ডলীর উন্নতি সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিবার জন্য যে কমিটী গঠিত হইয়াছিল, তাহার রিপোর্ট সম্বন্ধে মীমাংসা।
৪। বিবিধ।

সাঃ ব্রাঃ সমাজ কার্য্যালয়
৪ঠা মার্চ্চ, ১৮৯৪। } বঙ্কবিহারী বসু
সম্পাদক।

২১১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, ব্রাহ্ম মিশন যন্ত্রে শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দত্ত কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও ২৭এ ফাল্গুন প্রকাশিত।

ধর্ম্ম ও সমাজতত্ত্ব বিষয়ক পাক্ষিক পত্রিকা।

২৩শ সংখ্যা।
১৬শ ভাগ।

১লা চৈত্র, বুধবার, ১৮১৫ শক, ব্রাহ্ম সম্বৎ ৬৫।

বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২॥০
মফস্বলে ৩৲
প্রতি খণ্ডের মূল্য ৵০

প্রার্থনা।

হে জীবনদাতা! আমাদের নিকট সকল কথা যে পুরাতন হইয়া যাইতেছে। চারিদিক হইতে প্রতিদিন এমন কত উচ্চ উচ্চ উপদেশ শুনিতেছি, যাহা কর্ণে প্রবেশ করিতেছে, কিন্তু প্রাণকে স্পর্শ করিতে পারিতেছে না। যখন দশজনে মিলিয়া উপাসনাতে বসিতেছি, তোমার আরাধনাতে নিযুক্ত হইতেছি, তখন অভ্যাস বশতঃ অতি উচ্চ উচ্চ ভাব ও অতি উচ্চ উচ্চ কথা মুখে প্রকাশ পাইতেছে। তোমার নিকট যখন প্রার্থনা করিতেছি, তখন সর্ব্ব প্রকার আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য আকাঙ্ক্ষা জানাইতে ক্রটী করিতেছি না; কিন্তু জীবন যে নিম্ন ভূমিতে ছিল তাহাই থাকিয়া যাইতেছে। সেই বিষয়াসক্তি, সেই স্বার্থপরতা, সেই সুখ-প্রিয়তা। ক্রমে আমাদের জীবনের উপরে সাধু-জীবনের ও সাধুপদেশের শক্তি ম্লান হইয়া যাইতেছে। এই ব্যাধিতে আমাদিগের ধর্ম্মজীবনকে দুর্ব্বল ও নিষ্প্রভ করিয়া ফেলিতেছে। আমরা পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া, নিজ নিজ জীবনের স্বার্থপরতাতে নিমগ্ন হইয়া যাইতেছি। এই সংকট হইতে আমাদিগকে উদ্ধার কর। আমাদের বাক্য ও কার্য্য সকলকে তোমার জীবনী-শক্তির দ্বারা অনুপ্রাণিত কর। আমাদের সাধন সরস হউক; আমাদের ধর্ম্মজীবন সতেজ ও সবল হউক; তোমার চরণে এই প্রার্থনা।

সম্পাদকীয়

ধর্ম্মসমাজের শক্তি কোথায়?—আমরা যে কেবল ব্রাহ্মধর্ম্মকে নিজ নিজ জীবনে অবলম্বন করিয়া পরিতৃপ্ত হইতে চাহিতেছি তাহাই নহে, ইহাকে প্রচার করিতে চাহিতেছি। অর্থাৎ ইহাকে সামাজিক শক্তিরূপে পরিণত করিয়া এতদ্দ্বারা জন সাধারণকে উন্নত করিতে চাহিতেছি; জনসমাজের প্রচলিত কুসংস্কার, পাপ ও দুর্নীতি নিবারণ করিয়া তৎস্থানে সত্যজ্ঞান, ও উৎকৃষ্ট নীতিকে প্রচলিত করিতে চাহিতেছি। জন-সমাজের এ প্রকার সংস্কার করিতে যাহারা প্রয়াসী হয়, তাহাদের সহিত সমাজের লোকের বিরোধ ঘটনা হওয়া অনিবার্য্য; কারণ যাহারা প্রাচীন কুসংস্কার ও প্রাচীন রীতি নীতির পক্ষপাতী, তাহারা এই সংস্কার-পথাবলম্বীদিগকে সমাজের শত্রু বলিয়া গণনা করিবেই করিবে। কিন্তু আমাদিগকে ভাবিতে হইবে যে, সে শক্তি কি শক্তি যাহার বলে ব্রাহ্মধর্ম্ম ও ব্রাহ্মসমাজ দেশের প্রচলিত কুসংস্কার ও রীতি নীতিকে পরাজিত করিয়া তৎস্থানে সত্যের রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিবে? এই প্রশ্নের বিষয়ে চিন্তা করিতে গেলেই দেখিতে হইবে যে, জগতে যে সকল ধর্ম্ম সম্প্রদায় জয়লাভ করিয়াছে, মানবের চিন্তাকে পরিবর্ত্তিত করিয়াছে, মানবের রীতি নীতিকে উন্নত এবং সংশোধিত করিয়াছে, তাহারা কোন্ শক্তিতে তাহা করিতে সমর্থ হইয়াছে? যতই আমরা ইতিবৃত্ত আলোচনা করিব ততই দেখিতে পাইব যে বৈরাগ্যের শক্তি ভিন্ন অন্য কোনও শক্তির দ্বারা জগৎ জয় হয় নাই। স্বার্থনাশ, স্বার্থনাশ, স্বার্থনাশ, এই সকলের মূলমন্ত্র ছিল। কোন্ যুগ-প্রবর্ত্তক মহাজন এরূপ জন্মিয়াছেন যিনি বৈরাগ্যরূপ অস্ত্র ধারণ করেন নাই? যীশু নিজের বিষয়ে এই কথা বলিয়াছিলেন—"শৃগালদিগের গর্ত্ত আছে, পক্ষীদিগের বাসা আছে, কিন্তু আমার মস্তক রাখিবার স্থান নাই"—বুদ্ধ এই বৈরাগ্যের আবশ্যকতা এতদূর অনুভব করিয়াছিলেন যে নিজে রাজপুত্র হইয়া ভিক্ষা ব্রত অবলম্বন করিয়াছিলেন। মহম্মদ যখন মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিলেন তখন দশ টাকার সম্পত্তিও গচ্ছিত রাখিয়া গিয়াছিলেন কিনা সন্দেহ, অথচ তিনি মনে করিলে রাজেশ্বর রাজা হইতে পারিতেন। চৈতন্য সন্ন্যাস-ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছিলেন। নানক বিষয়কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া পথের ফকির হইয়াছিলেন। মেথডিষ্ট সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাকর্ত্তা জন ওয়েসলি বলিয়াছিলেন—"আমি ত্রিশ শিলিঙ্গের অধিক অর্থ নিজের নিকট রাখা পাপ বলিয়া মনে করি"। সুপ্রসিদ্ধ খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারক কেরির বিষয়ে এরূপ কথিত আছে যে যখন তিনি পরলোক গমন করিলেন, তখন তাঁহার ডেক্সের মধ্য হইতে চৌদ্দটী পয়সা মাত্র পাওয়া গেল। অথচ সেই কেরী নানারূপে মাসে অন্ততঃ ৭০০।৮০০ শত টাকা উপার্জ্জন করিয়া প্রচার কার্য্যে অর্পণ করিয়াছেন। ইতিহাস তন্ন তন্ন করিয়া দেখ কে কোথায় জগতকে কাঁপাইয়াছে, কে কোথায় মানব হৃদয়কে পরিবর্ত্তিত

করিয়াছে যে বৈরাগ্যের মন্ত্রে দীক্ষিত হয় নাই? তুমি আমি আপন আপন সুখ সচ্ছন্দতায় ডুবিয়া থাকিব, আপন আপন সাধ্যে ভোগ বিলাস যতদূর ভোগ করা যায় করিব, আর এই স্বার্থপর, আরাম-প্রিয় ও বিষয়াসক্ত জীবদিগের দ্বারা ব্রাহ্মধর্ম্মের শক্তি বাড়িবে, এ আশা-আকাশ কুসুমের ন্যায়।

শক্তির অপচয়—আমরা প্রতিদিন অনুভব করিতেছি, আমাদের শক্তির কত অপচয় হইতেছে। যে সময় যাইতেছে, সেই সময়ে প্রত্যেকের দ্বারা যতটা কাজ হইতে পারিত তাহা হইতে পারিতেছে না। দশজনে হৃদয়ে হৃদয়ে মিলিতে পারিলে যতটা কাজ হইতে পারিত, তাহা হইয়া উঠিতেছে না। আমরা সকলেই ব্রাহ্মসমাজকে ভাল বাসি। প্রত্যেকেই বলেন "আমি ব্রাহ্মসমাজকে ভাল বাসি"। একথা শুনিলেই একটা সহজ কথা মনে উদয় হয়—যদি ব্রাহ্মসমাজকে কেহ বাস্তবিক ভাল বাসে, তবে তাহার উন্নতির জন্য কি সচেষ্ট হয় না? যদি ব্রাহ্মসমাজের উন্নতি ও কল্যাণ আমাদের প্রত্যেকেরই প্রার্থনীয় হয়, তবে আমরা কেন তাহার কল্যাণোদ্দেশে মিলিত হইতে পারি না? পরস্পরের সহিত যে একটু প্রভেদ রহিয়াছে, তাহার বোধটা এত প্রবল রহিতেছে যে ব্রাহ্মসমাজের কল্যাণ চিন্তা তাহার নিকট স্থান পাইতেছে না—এরূপ হইতেছে কেন? ঈশ্বরের সত্য রাজ্য বিস্তারের জন্য যাঁহারা ইচ্ছুক তাঁহাদের সকলেরই যাহাতে শক্তির অপচয় না হয় সে দিকে দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। যাঁহার যতটুকু দিবার আছে, তিনি ততটুকু দিবেন, যাঁহার যতটুকু করিবার আছে তিনি ততটুকু করিবেন। মতভেদ ও কার্য্যের স্বতন্ত্রতার গুরুতর ও অলঙ্ঘনীয় কারণ না থাকিলে কার্য্যের স্বতন্ত্রতা হইতে দিব না, এরূপ একটা প্রতিজ্ঞা প্রত্যেকেরই মনে থাকা ভাল।

নিত্য উপাসনা কর—"নিত্য উপাসনা কর, উপাসনা মনুষ্যকে জঘন্য অপরাধ এবং যাহা কিছু দূষণীয় তাহা হইতে রক্ষা করে; আর ঈশ্বরকে স্মরণ করা নিশ্চয়ই মনুষ্যের একটী অতি গুরুতর কর্ত্তব্য।"—কোরাণ।

মহাত্মা মহম্মদ যখন পৌত্তলিকতাকে বর্জ্জন করিয়া একমাত্র নিরাকার ঈশ্বরের উপাসক হইলেন, তখন সর্ব্বাগ্রে এই উপাসনাকেই অবলম্বন করিলেন। তিনি ইহার আবশ্যকতা এতই প্রতীতি করিলেন যে আপন সম্প্রদায়ের মধ্যে পাঁচ বার উপাসনার নিয়ম করিলেন। এ সম্বন্ধে মুসলমানদিগের মধ্যে একটী গল্প প্রচলিত আছে। মুসলমানগণ এই গল্পটিকে সত্য ঘটনা বলিয়া বিশ্বাস করেন। আমরা সেরূপ বিশ্বাস করি না, কিন্তু ইহার উপদেশ গ্রহণ করিতে পারি। গল্পটি এই:—এক দিন রাত্রিতে ঈশ্বরের দূত জেব্রিল মহম্মদকে ঈশ্বরের নিকট লইয়া যায়। মহম্মদ জেব্রিলের সঙ্গে গিয়া ঈশ্বরের সহিত সাক্ষাৎ করেন। তিনি যখন ঈশ্বরের সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন তখন দেখিলেন স্বর্গ এক অপূর্ব্ব জ্যোতিতে আলোকিত হইয়াছে। তখন মহম্মদের প্রতি এই আদেশ হইল "মহম্মদ, তোমার শিষ্যদিগকে পঞ্চাশ বার উপাসনা করিতে আদেশ করিও"। মহম্মদ আজ্ঞা শিরোধারণ করিয়া প্রত্যাগমন করিলেন। পথে মুষার সহিত সাক্ষাৎ হইল। মুষা ইহা শ্রবণ করিয়া বলিলেন "মহম্মদ তুমি কি করিয়াছ, কেন পঞ্চাশ বার উপাসনার কথা স্বীকার করিলে? দুর্ব্বল, চঞ্চল মানুষ কি পঞ্চাশ বার উপাসনা করিতে পারে? আমি দুইবার উপাসনা করাইতে পারিলাম না, তুমি কি এত বার পারিবে? যাও ফিরিয়া যাও।" মহম্মদ ফিরিয়া ঈশ্বরের নিকট গেলেন। তখন তিনি ২৫ বারের আদেশ করিলেন। মহম্মদ চলিলেন; কিন্তু আবার মুষার অনুরোধে মহম্মদ ঈশ্বরের নিকট ফিরিয়া গেলেন। তখন ঈশ্বর পাঁচবার উপাসনার আদেশ দিলেন। এবারও মুষা মহম্মদকে ফিরিতে বলিলেন, কিন্তু আর তাঁহার কথা শুনিলেন না এবং আপন সম্প্রদায়ের মধ্যে পাঁচবার উপাসনার নিয়ম প্রবর্ত্তিত করিলেন।

এই গল্প হইতে বুঝা যায় মহম্মদ উপাসনার আবশ্যকতা কতদূর অনুভব করিয়াছিলেন। পঞ্চাশ বার উপাসনা করিতে হইবে এ ইচ্ছা তাঁহার হইয়াছিল।

এই উপাসনা কেবল নিয়মে ছিল তাহা নহে, মহম্মদের জীবনে ইহা দেখা যায়। যখন তিনি প্রথম পৌত্তলিকতা ছাড়িলেন, তখন তাঁহার পত্নী খাদিজাকে লইয়া নির্জ্জনে উপাসনা করিতেন, তাহাতেই খাদিজা দীক্ষিত হইলেন। খাদিজা বক্তৃতাতে দীক্ষিত হন নাই, উপদেশে দীক্ষিত হন নাই, কিন্তু সত্য প্রভুর উপাসনা মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছিলেন।

যখন চতুর্দ্দিকের লোকে জানিতে পারিল, মহম্মদ ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া উপাসনা করেন, তখন তাহারা দেখিতে আসিল আর উপাসনাতে দীক্ষিত হইতে লাগিল। এইরূপে একজন সস্ত্রীক দীক্ষিত হইলেন। তাঁহার স্ত্রীর এক দুর্দ্দান্ত ভাই ছিল। সে ক্রুদ্ধ হইয়া তরবারী হস্তে মক্কা হইতে বহির্গত হইল এবং কোরেসদিগের নিকট গিয়া প্রতিজ্ঞা করিল যেরূপেই হউক সে মহম্মদের মস্তক কাটিয়া আনিবে। এই প্রতিজ্ঞাতে দৃঢ় হইয়া সে মদিনার অভিমুখে যাত্রা করিল। তাহার ভগিনী মদিনাতে থাকিতেন। সে ভগিনীর বাড়ীতে গেল, ইচ্ছা সেখানে মহম্মদকে দেখিলে কাটিবে। তথায় গিয়া দেখে তাহার ভগিনী স্বামীর সহিত উপাসনা করিতেছে। দেখিয়া তাহার ক্রোধ হইল এবং ভগিনীকে ফিরাইবার জন্য অনেক যন্ত্রণা দিতে লাগিল ও তাঁহার স্বামীকে প্রহার করিল। কিন্তু তাঁহারা কিছু বলিলেন না। শেষে ঐ ব্যক্তি শয়ন করিলে রাত্রিতে তাঁহারা আবার উপাসনা করিতে লাগিলেন। যখন সেই উপাসনার বাণী সকল তাহার শ্রুতিবিবরে প্রবেশ করিতে লাগিল, তখন তাহার প্রাণে অসহ্য যাতনার উদয় হইল, সে আর স্থির থাকিতে পারিল না; উঠিয়া আসিয়া ভগিনীকে বলিল "তোমরা কি করিতেছিলে, আমার প্রাণ কেন অস্থির হইল, আমি যে আর স্থির থাকিতে পারি না?" ভগিনী বলিলেন "আমরা ঈশ্বরের উপাসনা করিতেছিলাম।" সেই ব্যক্তির প্রাণ আশ্চর্য্যরূপে

পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। এমন যে দুর্দ্দান্ত লোক, যে মহম্মদের প্রাণনাশে উদ্যত হইয়াছিল, ভগিনী ও ভগিনীপতির প্রতি উপাসনার জন্য উৎপীড়ন করিয়াছিল, উপাসনার দ্বারা তাহার জীবনের পরিবর্ত্তন হইল, সে দীক্ষিত হইল। তখন মক্কায় হুলস্থূল পড়িয়া গেল। মহম্মদ এই উপাসনা দ্বারাই প্রচার করেন। যে সাংঘাতিক রোগে মহম্মদের মৃত্যু হয় সেই দারুণ রোগের সময়েও তিনি প্রতিদিন ভজনালয়ে উপাসনা করিতে যাইতেন। এই নিয়ম ছিল রাত্রিশেষে একজন লোক রোজ আসিয়া বলিত "মহাপুরুষ, জাগ্রত হউন, সত্য প্রভুর উপাসনার সময় হইয়াছে, উপাসনা করুন।" তিনি গাত্রোত্থান করিয়া মন্দিরে যাইয়া উপাসনা করিতেন। যখন তাঁহার পীড়া বৃদ্ধি পাইল, তখন লোকে হাতে ধরিয়া তাঁহাকে মন্দিরে লইয়া যাইত, তিনি উপাসনা করিতেন। শেষে যে দিন একেবারে অক্ষম হইয়া পড়িলেন, সে দিন তিনি বলিলেন "আমি তোমাদের কাহার কাছে কি অপরাধ করিয়াছি বল, আর আমি তোমাদের সহিত উপাসনা করিতে পারিব না, এই আমার শেষ।" ইহা শুনিয়া সকলে উচ্চৈস্বরে কাঁদিতে লাগিল। এই যে নিত্য উপাসনা তিনি অবলম্বন করিয়াছিলেন ইহাই তাঁহার অবলম্বন ছিল। তিনি জানিতেন পৌত্তলিকতা ছাড়াইয়াছি তাহাতে কি, সত্য প্রভুর জীবন্ত উপাসনা দেওয়া চাই, তাই তিনি দিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন।

আমাদের ব্রাহ্মসমাজে দিবার কি আছে? এই সত্য-পুরুষের জীবন্ত উপাসনা যদি না দিতে পারি, তবে কিছুই হইবে না। ঈশ্বর করুন এই জীবন্ত উপাসনা আমাদের সকলের প্রাণের সম্বল হউক।

ব্রাহ্মগৃহে ব্রাহ্মধর্ম্ম—যখন একটী ব্রাহ্মবিবাহ হয়, তখন আমরা এই ভাবিয়া আনন্দিত হই, যে একটী ব্রাহ্ম-পরিবারের সংখ্যা বর্দ্ধিত হইল। আমরা এই আশা করি, যে সেই নববিবাহিত দম্পতি নিজ গৃহে ব্রাহ্মধর্ম্মকে রক্ষা করিবেন ও সাধন করিবেন এবং তাঁহাদের ক্রোড়ে যে সকল পুত্র কন্যা জন্মিবে তাহারাও ভাবী ব্রাহ্মসমাজের অঙ্গীভূত হইয়া ইহার বলবৃদ্ধি করিবে। কিন্তু তাহা না হইয়া যদি দেখিতে পাই যে ব্রাহ্মগৃহে যে সকল বালক বালিকা জন্মিতেছে, তাহারা ব্রাহ্মধর্ম্মের ভাব প্রাপ্ত হইতেছে না; বরং অনেকে ভাবে ও চরিত্রে ব্রাহ্মবিরোধী হইয়া উঠিতেছে, তাহা হইলে ব্রাহ্মবিবাহে আনন্দিত হওয়া উচিত নহে। আমরা ইতিমধ্যেই দেখিতে পাইতেছি, অনেক ব্রাহ্ম-গৃহের বালকগণ ব্রাহ্মধর্ম্ম ও ব্রাহ্মসমাজের প্রতি অনুরাগবিহীন হইয়া বর্দ্ধিত হইতেছে। বালিকাদিগের মধ্যে এ অনিষ্ট ফল এখনও তত প্রবলরূপে দৃষ্ট হয় নাই; কারণ বালিকাগণ বালক-দিগের ন্যায় বাহিরের লোকের সহিত সেরূপ মিশিতে পারি-তেছে না। কিন্তু বালকদিগের অনেকে ব্রাহ্মসমাজ হইতে দূরে পড়িতেছে। তাহাদিগের মধ্যে যাহারা বয়ঃপ্রাপ্ত তাহারা ব্রাহ্মসমাজে একবার পা দেয় না; উপাসনার কোনও ধার ধারে না; কথা বার্ত্তাতে বরং ব্রাহ্মদিগকে উপহাস বিদ্রূপ করে। এরূপ হওয়ার কারণ কি? উত্তর—পিতা মাতার অনবধানতাই ইহার কারণ। শৈশব হইতে তাঁহারা স্বীয় স্বীয় পুত্র কন্যাকে ব্রাহ্মসমাজের সংস্রবে (touch) রাখেন নাই; গৃহে তাহাদিগকে একটী দিনও ব্রাহ্মধর্ম্ম বা ব্রাহ্মসমাজের কথা বলেন নাই; বরং তাহাদেরই সমক্ষে ব্রাহ্মসমাজের লোক-দিগের সমালোচনা করিয়াছেন, হয়ত অনেক সময়ে উপহাস বিদ্রূপ করিয়াছেন; সমাজের যে সকল লোক তাঁহাদের পুত্র কন্যাগণের শ্রদ্ধা ও ভক্তির পাত্র হওয়া উচিত, এরূপ সকল ব্যক্তিকে হয়ত পিতা মাতা সামান্য মতভেদের জন্য পুত্র কন্যারই সমক্ষে অবজ্ঞাসূচক ভাষাতে সমালোচনা করিয়াছেন। এই রূপে তাহারাও অবজ্ঞাসূচক ভাষাতে সমালোচনা করিতে শিখিয়াছে। এইরূপ নানা কারণে অনেক গৃহের বালক ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতি আস্থাহীন হইয়া বর্দ্ধিত হইতেছে। অথচ এই জাতিভেদ-প্রপীড়িত দেশে ব্রাহ্মসমাজ ভিন্ন এই সকল বালক বালিকার অন্য সমাজ নাই। ইহাদিগকে ব্রাহ্মসমাজেই বিবাহ করিতে হইবে; ব্রাহ্মসমাজেই বাস করিতে হইবে; ব্রাহ্মসমাজের উন্নতি অবনতির ফলভোগ করিতে হইবে। তাহা হইলে এই দাঁড়াইল যে ভবিষ্যতে এরূপ অনেক পরিবার ব্রাহ্মসমাজে থাকিবে, যাহারা নামে ব্রাহ্মসমাজের লোক থাকিবে, কিন্তু আচরণে সম্পূর্ণ ব্রাহ্মবিরোধী হইবে। সেরূপ ব্রাহ্মসমাজের দশা কি হইবে, সেরূপ সমাজের প্রতি দেশের লোকের ভাব কি দাঁড়াইবে, সেরূপ সমাজের দ্বারা ব্রাহ্মধর্ম্মের গৌরব কতদূর রক্ষিত হইবে, তাহা ব্রাহ্মগণ একবার স্থিরচিত্তে বিবেচনা করুন। এই বিষয় বার বার আলোচনা হইতেছে অথচ দুঃখের বিষয় ব্রাহ্মগণের এ বিষয়ে মনোযোগ দৃষ্ট হইতেছে না। পুত্র কন্যার শিক্ষাবিষয়ে যেরূপ সতর্ক হওয়া উচিত সে সতর্কতা দৃষ্ট হইতেছে না। যতই চিন্তা করা যাইবে, ততই অনুভব করা যাইবে যে ব্রাহ্মবালক বালিকা-গণের শিক্ষার অপেক্ষা গুরুতর কার্য্যভার ব্রাহ্মসমাজের হস্তে অতি অল্পই আছে। এমন কি এ বিষয়ে অমনোযোগী থাকিলে ক্রমে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারও বন্ধ হইয়া আসিবে। উদরাময়ের রোগী যেমন লোভবশতঃ এক দিক দিয়া আহার করে, কিন্তু তাহা অপর দিক দিয়া বাহির হইয়া যায়—তাহাতে শরীর গড়ে না; সেইরূপ প্রচার কার্য্যের দ্বারা এক দিক দিয়া লোক ডাকিবে, ঘরের লোক অপর দিক দিয়া বিকৃত হইয়া বাহির হইয়া যাইবে; সে প্রচারে ফল কি? অতএব প্রচারকার্য্যের অপেক্ষাও বালক বালিকার শিক্ষার উপায় বিধান গুরুতর কর্ত্তব্য। এজন্য যদি সকলে সমবেত হইয়া কিঞ্চিৎ অর্থব্যয় করিতে হয়, তাহা সর্ব্বাগ্রে করা কর্ত্তব্য। ইহা কি আবার বুঝাইয়া দিতে হইবে?

বাধা বাহিরে নহে—আমাদের অনেকের জীবনে এমন এক সময় ছিল, যখন মনে হইত বাহিরের প্রতিবন্ধকতাতেই সাধন ভজন ভালরূপে চলিতেছে না। এমন কি অনেকের পক্ষে এমন সময়ও ছিল, যখন উপাসনা করিতেও সুবিধা হইত না। যখন ব্রাহ্মসমাজের সহিত সবে পরিচিত হইতেছিলাম।

সময় সময় সামাজিক উপাসনায় উপস্থিত হইতাম, কিন্তু প্রকাশ্য ভাবে ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করি নাই, তখন দৈনিক উপাসনার নিয়ম থাকিলেও উপাসনা করিবার স্থান ও সময় ভালরূপ যুটিত না। যাঁহাদের সহিত একত্রে থাকিতাম, তাঁহারা এরূপ উপাসনার সহিত পরিচিত নহেন। সুতরাং তাঁহাদের মধ্যে বসিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিয়া উপাসনা করিতে সুবিধাও হইত না, আবার ভয়ও হইত। তখন কোথায় একটু নির্জ্জন স্থান পাওয়া যাইবে, কোথায় নদীর ধারে বা অন্য কোন মনুষ্যের গতায়াতহীন স্থান পাইব সে জন্য কত চেষ্টা, হইত। কত ভয়ে ভয়ে তখন উপাসনা করিতে প্রবৃত্ত হইতাম। লোকে বা দেখিতে পায়, দেখিতে পাইলে নিন্দা করিবে এবং অভিভাবকগণকে বলিয়া দিলে বিষম অনর্থ ঘটিবে; এই সকল আশঙ্কায় তখন কত না সতর্ক ভাবে নির্জ্জন স্থানে উপাসনা করিতে প্রবৃত্ত হইতাম। সামাজিক উপাসনাস্থলে যাইতেও কত ঘুরিয়া ফিরিয়া বাঁকা পথ দিয়া সমাজে যাইয়া উপাসনা করিতাম। তখন মনে হইত, এই সকল বাধা যদি অতিক্রম করিতে পারি, তাহা হইলে আর কোন ভাবনা থাকে না। আশানুরূপ উপাসনাদি করিতে আর কোনই অসুবিধা থাকে না। তখন মনে করিতাম, যাঁহারা প্রাচীন সমাজ পরিত্যাগ করিয়া সম্পূর্ণরূপে ব্রাহ্মসমাজে যোগ দিয়াছেন, তাঁহারা কেমন সৌভাগ্যবান। তাঁহাদের কত সুবিধা। কেহ উপাসনা করিতে বাধা দিবার নাই। যখন ইচ্ছা হয় তখনই উপাসনা করিতে পারেন। কিন্তু যখন সেই দিন আসিল যখন বাহিরের প্রতিকূলতা কাটিয়া গেল, যখন সমস্ত দিন রাত্রি বসিয়া উপাসনা করিলেও নিষেধ করিবার কেহ থাকিল না বরং তাহাতে উৎসাহ পাইবারই সম্ভাবনা হইল। উপাসনা না করিলে নিন্দা করিবার লোক যুটিল, তখন দেখা গেল সাধন ভজনের প্রতিকূলতা শুধু বাহিরে নয়, কিন্তু ভিতরেই বেশী। যাঁহারা ব্রাহ্ম বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন, সামাজিক উপাসনাস্থলে না গেলে বা নির্জ্জন উপাসনা না করিলে তাঁহারা নিন্দিতই হন। উপাসনা করিবার পক্ষে তাঁহাদের বাহিরে কোনই বিঘ্ন নাই, বরং সুবিধাই আছে। ব্রাহ্মগৃহের সন্তানগণ যদি উপাসনা করে, তাহাতে সকলে প্রশংসাই করে, উৎসাহই দেয়, কিন্তু নিষেধ করিবার কেহই নাই। এ অবস্থায় যদি দেখি যে উপাসনাতে তেমন মন নাই— মধ্যে মধ্যে উপাসনা-বিহীন হইয়া দিন কাটাইতেও কষ্ট হয় না। এমন যে প্রিয় সামাজিক উপাসনা যাহাতে যোগ দিতে যাইয়া কত সময় তিরস্কার এমন কি প্রহার সহ্য করিতেও হইয়াছে; তাহাতে অনুপস্থিত হইলেও তেমন কষ্ট হয় না; এমন কি সামান্য কাজের ওজর করিয়া উপাসনা স্থলে না যাইতে মনের আগ্রহ বেশী, সামান্য অসুবিধা ঘটিলে আর উপাসনা স্থলে যাইতে প্রবৃত্তি হয় না, এমন কি আমোদ প্রমোদ করিয়া সেই সময়টুকু কাটাইতে বরং ইচ্ছা হয়, তথাপি উপাসনা স্থলে যাইতে প্রবৃত্তি হয় না; তখন সহজেই মনে হয়, বাধা বিঘ্ন বাহিরে নয় কিন্তু ভিতরে। ভিতরের অক্ষুধা, অরুচিই প্রাণকে এমন হীন অবস্থায় উপস্থিত করিয়া থাকে। এজন্য দেখা যায় যখন প্রাণ শুষ্ক ও ক্ষুধাহীন হয়, তখন সহজে সামাজিক উপাসনা উপদেশ ও সংগীতাদির সমালোচনা করিতে, তাহার দোষ অনুসন্ধান করিতে প্রবৃত্তি সমধিক প্রবল হয়। তখন সেই ভিতরের রোগ চাপা দিয়া রাখিয়া আত্মপ্রবোধের জন্য অপরের স্কন্ধে দোষারোপ করিয়া, সন্তুষ্টিলাভ করিতে প্রবৃত্তি হয়। যখন উপাসনা করিতে করিতে আন্তরিক রিপুসকলের সহিত সংগ্রাম উপস্থিত হয়, যখন প্রবৃত্তিকুলকে দমন করিয়া সংযতচিত্ত হইয়া চলিবার আবশ্যক হয়, বিষয়বাসনার মাত্রা হ্রাস করা আবশ্যক হয় তখনই বাস্তবিক সাধকের পক্ষে কঠিন সময় উপস্থিত হয়। বাহিরের প্রতিকূলতা বেশী দিন থাকে না। আর তাহা অতিক্রম করাও বেশী কঠিন নহে। কিন্তু ভিতরকার শত্রু—যাহার সহিত সংগ্রাম করিতে গেলেই আত্ম-নিগ্রহ করিতে হয়, আত্মসুখের কিয়ৎ পরিমাণে লাঘব করিতে হয়, তখনই প্রধান অন্তরায়ের সহিত সাক্ষাত হয়। সাধক এই সময় যদি দৃঢ় সংকল্প করিয়া—সাধনপথে অগ্রসর হইতে যত্নশীল না হন, তাঁহার পক্ষে এ পথে চলা দিনের পর দিন কঠিন হয়। তখন সাধক-সমাজে শরীরটা পড়িয়া থাকিলেও প্রাণ বহু দূরে চলিয়া যায়। এই সময়ের অবস্থা অতি শোচনীয়। এই সময়েই লোকে উপাসনাদিতে না যাইবার সুযোগ অন্বেষণ করিতে থাকে। এই সময়ে কেবল কার্য্যবাহুল্য ঘটে। কিন্তু একটা আশ্চর্য্য ব্যাপার এই যাঁহারা নিয়মিত রূপে সাধন ভজন করেন, তাঁহারা যে অন্যান্যের অপেক্ষা কাজ কম করেন এমন নয়। তাঁহারা যে বিষয়কর্ম্ম না করেন তাহাও নয়। দেখা যায় নিয়মিত রূপে উপাসনা করিলে কাজের কোনই ক্ষতি হয় না বরং তাঁহারাই বেশী কাজ করিবার সুবিধা প্রাপ্ত হন। তবে বৃথা জল্পনা গল্পাদি করিয়া বা ক্রীড়া ও আমোদ প্রমোদে হয়ত তাঁহারা সময় যাপন করিতে পারেন না। অভাব সময় বা সুবিধার নহে। অভাব— আন্তরিক পিপাসা ও প্রবৃত্তির। এই দুইটী থাকিলে সকল দিকেই সুবিধা হয়। সংসারের কাজও চলে, সাধন ভজনও চলে। আমরা আর কতকাল পরের উপর দোষারোপ করিয়া এবং বাহিরের প্রতিকূলতা নিবারণ করিয়া করিয়া বেড়াইব। অন্তরের রিপু সকল ধরিতে এবং তাহার মায়া এড়াইতেই আমাদের প্রবৃত্তি প্রবল হউক।

সম্পাদকীয় ও প্রাপ্ত প্রবন্ধ।

ব্যাপ্তি ও গভীরতা।

বর্ত্তমান যুগ ব্যাপ্তিরই অনুকূল, গভীরতার অনুকূল নহে। প্রত্যেক দেশের উৎপন্ন দ্রব্য, প্রত্যেক জাতির উৎপন্ন চিন্তাকে অল্পকালের মধ্যে দশদিকে ব্যাপ্ত করিয়া ফেলিবার জন্য কত প্রকার উপায় আবিষ্কৃত হইয়াছে। সমুদ্র বক্ষে দিবারাত্র অগণ্য বাষ্পীয়পোত তরঙ্গ বক্ষ বিদারণ করিয়া ছুটিতেছে, স্থলভাগে অগণ্য বাষ্পীয় শকট মেদিনীকে কম্পিত ও দিগ্‌বলয়কে ধূমাকীর্ণ করিয়া ধাবিত হইতেছে—জগতের কৃষিজাত দ্রব্য, চিন্তাজাত সাহিত্য, ও বার্ত্তা বহন করা ইহাদের প্রধান

কার্য্য। ইহার উপরে লোকের ধনলাভের প্রবৃত্তি প্রবল। যদি এরূপ কোনও দ্রব্য উৎপন্ন হয়, যাহা ব্যয়সাধ্য ও অপেক্ষাকৃত অল্পসংখ্যক লোকের ভোগযোগ্য, তাহাকে ত্বরায় সুলভ ও বহুজন-ভোগ্য করিবার জন্য বিবিধ প্রকার উপায় অবলম্বিত হইয়া থাকে। চিন্তালব্ধ সত্য সকল সম্বন্ধেও এইরূপ। প্রভূত চিন্তার দ্বারা একজন যাহা লাভ করিতেছেন, তাহাকে সুবোধ্য করিয়া সর্ব্বসাধারণের গ্রহণযোগ্য আকারে জনসমাজে ত্বরায় উপস্থিত করা হইতেছে। তাহার স্থূল স্থূল জ্ঞাতব্য কথা দুই মাসের মধ্যে সকলেরই কর্ণে উঠিতেছে। বিশেষতঃ জীবনসংগ্রামের কঠিনতা ও কার্য্যে অতিরিক্ত ব্যস্ততা বৃদ্ধি হওয়াতে, গভীররূপে কোনও বিষয়ের আলোচনা করিবার প্রবৃত্তি মানুষের থাকিতেছে না। দৈনিক সংবাদপত্র, তাহাও চিন্তার সহিত পাঠ করিবার অবসর অনেকের হইতেছে না। সকলেই যেন কি এক চক্রের অঙ্গীভূত হইয়া ঘুরিতেছে, ঘুরিতে ঘুরিতে যে দুই একটা বিষয় দেখিয়া লইতে ও যে দুই একটা কথা শুনিয়া লইতে পারিতেছে, এইমাত্র। এইরূপে জ্ঞানালোচনা সম্বন্ধে এখন এই দেখা যায়, যে জ্ঞানের স্থূল স্থূল তত্ত্ব সকল বহুদূর ছড়াইয়া পড়িয়াছে, বহুসংখ্যক লোকের কর্ণগোচর হইয়াছে, কিন্তু অল্প লোকেই গভীরতা লাভ করিবার প্রয়াস পাইতেছে।

প্রাচীন কালের ভাব ইহার বিপরীত ছিল। তখন ব্যাপ্তি অপেক্ষা গভীরতাই অধিক ছিল। লোকে বহুকষ্টে একজন সৎ গুরু পাইত বা দুইখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ সংগ্রহ করিতে পারিত। কিন্তু সেই দুইখানি গ্রন্থই গভীররূপে আলোচনা করিয়া ব্যুৎপত্তি লাভ করিত। যে দুই চারিটী জড়তত্ত্ব বা মনস্তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইত তাহাই গভীররূপে অনুশীলিত হইত। বর্ত্তমান কালের ব্যাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে সেই প্রাচীন কালের গভীরতাও রাখিতে পারিলে ভাল হয়।

ধর্ম্মসাধন ও সদনুষ্ঠান সম্বন্ধেও ঐ কথা। এই দুই দিকেও বর্ত্তমান সময়ে লোকের প্রবৃত্তি গভীরতা অপেক্ষা ব্যাপ্তির দিকে অধিক দৃষ্ট হয়। প্রথম, সদনুষ্ঠান সম্বন্ধে চিন্তা করিলে অনেক স্থলেই এইরূপ দেখি যে সে সদনুষ্ঠানটী স্থায়ী ভিত্তির উপরে স্থাপিত হইল কি না এবং তাহার উত্তরোত্তর উন্নতির উপায় কি, এ সকল চিন্তা লোকের মনে উদয় না হইয়া সর্ব্বাগ্রে তাহাকে বহুসংখ্যক লোকের বিদিত করিবার প্রবৃত্তিই প্রবল হয়। ধর্ম্মকেও এইরূপ প্রদর্শনের বস্তু করিবার প্রবৃত্তিও প্রবল দৃষ্ট হয়। কোনও কোনও ধর্ম্মসম্প্রদায়ের মধ্যে এই প্রবৃত্তি অতিশয় প্রবল। কিন্তু এরূপ প্রচারের স্থায়ী ফল দৃষ্ট হয় না। যেখানে গভীরতা অপেক্ষা ব্যাপ্তি অধিক সেখানে অসার ও গভীরতা-বিহীন লোক যুটিতে থাকে, এবং তাহারা অনেক সময় এক স্রোতে আসে, আর এক স্রোতে ভাসিয়া যায়। যদি একশত আসে তবে দুই বৎসর না যাইতে যাইতে তাহার ৭৫ জন স্খলিত হইয়া পড়ে। কিন্তু গভীরতার দিকে দৃষ্টি রাখিলে বিপরীত ফল ফলিয়া থাকে। যদিও অল্প সংখ্যক লোক থাকে, সেই অল্পসংখ্যক লোক স্থায়ী হয়, এবং সেই অল্পসংখ্যক হইতে উত্তরকালে বহুসংখ্যক লোক সেই ভাবাপন্ন হইয়া থাকে।

ব্রাহ্মসমাজের ইতিবৃত্তের বিষয় চিন্তা করিয়া দেখিলেও দেখিতে পাওয়া যায়, যে ইহার কার্য্যপ্রণালীর মধ্যে আমরা এতদিন গভীরতা অপেক্ষা ব্যাপ্তির দিকে অধিক দৃষ্টি দিয়া আসিতেছি। লোক আনিবার জন্য যেরূপ ব্যগ্রতা দৃষ্ট হইয়াছে, আনীত ব্যক্তিদিগকে উন্নত করিবার জন্য সেরূপ ব্যগ্রতা দৃষ্ট হয় নাই। এমন কি ইহার প্রচারক ও উপদেষ্টাগণকেও ব্রহ্মজ্ঞানে সুপরিপক্ক করিবার জন্য বিশেষ উপায় অবলম্বিত হয় নাই। ইহার ফল এই হইতেছে যে এক সময়ে যাঁহারা উৎসাহের সহিত ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিতেছেন তাঁহারাই অপর সময়ে ব্রাহ্মধর্ম্মকে ও ব্রাহ্মসমাজকে বর্জ্জন করিয়া যাইতেছেন। দেখিলে বোধ হয় যেন তাঁহারা জোয়ারের জলে আসিয়াছিলেন ভাঁটার জলে বাহির হইয়া যাইতেছেন। যেখানে গভীরতা লাভ করিবার দিকে দৃষ্টি অল্প, যেখানে ভাবের উপরেই সকলেই আছে, সেখানে মত ও ভাবগত চঞ্চলতা ও অস্থিরতা অনিবার্য্য। ভবিষ্যতে আমাদিগকে ব্যাপ্তি অপেক্ষা গভীরতার দিকে অধিক মনোযোগী হইতে হইবে, তদ্ভিন্ন আমরা ব্রাহ্মসমাজের মত ও কার্য্যপ্রণালীকে স্থির রাখিতে পারিব না।

জীবনের প্রভু কে?

(সাধারণ ব্রাহ্মসমাজমন্দিরে শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী প্রদত্ত উপদেশের সারাংশ)।

ঋষিরা ঈশ্বরের স্বরূপ কত প্রকারে নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। তাহার মধ্যে একটী এই,—

"মহান্ প্রভুর্বৈ পুরুষঃ"

তিনি মহান্, তিনি পুরুষ। প্রথমতঃ তিনি পুরুষ—অর্থাৎ তিনি অন্ধশক্তি নন, কিন্তু জ্ঞান, প্রেম, ইচ্ছাসম্পন্ন পুরুষ। আমাদের আত্মা যেমন পুরুষ, তেমনি তিনি পুরুষ। তাঁহার সহিত আত্মার যোগ, অন্ধশক্তির সহিত অন্ধশক্তির যোগ নয়। জ্ঞানের সহিত জ্ঞানের, প্রেমের সহিত প্রেমের ও ইচ্ছার সহিত ইচ্ছার যোগ, পুরুষে পুরুষে যোগ; যেমন তোমায় আমায় যোগ। আকাশের সঙ্গে আকাশ মিলিয়া যায়, জলের সঙ্গে জল মিলিয়া যায়, মহাকাশের সঙ্গে ঘটাকাশ মিলিয়া যায়, সেরূপ নয়; কিন্তু পুরুষে পুরুষে যে যোগ এ যোগ তাহা। অর্থাৎ জ্ঞান, প্রেম ও ইচ্ছার যোগ। আমাদের জ্ঞান, প্রেম, ইচ্ছা যখন দেখি, তখন দেখি তাহারা জ্ঞান, প্রেম, ইচ্ছারই অনুসন্ধান করে। তাহা না হইলে চরিতার্থ হয় না। এমন এক বস্তু যদি আমার সম্মুখে রাখ, যাহার জ্ঞান, প্রেম, ইচ্ছা নাই, আর তাহাকে যদি প্রীতি করিতে বল, তাহা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। মনে কর আমি একটি কুকুরকে ভাল বাসি। তুমি যদি বেশ সুন্দর একটি কুকুর নির্ম্মাণ করিয়া, তাহাকে কাচের চক্ষু দিয়া—নানা শোভায় সুশোভিত করিয়া আমার দিকে তাহার মুখ ফিরাইয়া রাখ, তাহা হইলে কখনও তাহাতে আমার প্রীতি হইবে না; তাহার উপর আমার প্রেম যাইবে না। কিন্তু তাহার পরিবর্ত্তে একটি জীবন্ত প্রাণী যদি আসে, তাহার প্রেম-পূর্ণ দৃষ্টি যদি আমার চক্ষের উপর পড়ে, তবেই আমার

প্রেম চরিতার্থ হয়, না হইলে নয়। লোকে যে প্রতিমা নির্ম্মাণ করিয়া পূজা করে, সেখানেও জ্ঞান, প্রেম, ইচ্ছা আরোপ করিয়া লয়। তাহা না হইলে জ্ঞান, প্রেম ইচ্ছা চরিতার্থ হয় না। সুতরাং তিনি পুরুষ অন্ধশক্তি নন। যেমন তাড়িত্ একটা শক্তি আছে, তিনি সেরূপ নহেন। কিন্তু জ্ঞান, প্রেম, ইচ্ছাময় হইয়া আমাদিগকে আকর্ষণ করিতেছেন।

দ্বিতীয়তঃ তিনি যে কেবল পুরুষ, তাহা নহে,—"তিনি মহান্ পুরুষ।" ইহার মধ্যে গভীর অর্থ আছে। ঈশ্বর করুন, আমরা যেন তাহা গ্রহণ করিতে সমর্থ হই।

"তিনি মহান্ ও প্রধান পুরুষ।" অনেক কার্য্যে এক একজন প্রধান পুরুষ থাকে। প্রত্যেকেই কাজ করে, কিন্তু তিনি অধ্যক্ষ। যেমন সৈন্যদিগের একজন অধ্যক্ষ থাকে। সৈন্যেরা তাহার অধীনে যুদ্ধ করে; তাঁহার কথায় প্রাণ দেয়। যখন জাহাজ সমুদ্রে যায়, একজন প্রধান অধ্যক্ষ, আর সকল তাহার অধীন থাকে। তাঁহার হুকুমেই কাজ করে। সংসারে একজন কর্ত্তা থাকে, সকলে তাঁহার অধীন হইয়া চলে। সেই প্রধান পুরুষের কর্ত্তৃত্ব। নিয়ম করিবার ভার তাঁহার, চালাইবার ভার তাঁহার উপর। তিনি নিয়ামক, অপর সকল তাঁহার নিয়মের অধীন। এক দিকে নিয়ন্তা, অপর দিকে বাধ্যতা। তাহা না হইলে কাজ হয় না। অধ্যক্ষের কথা যদি না শুনে তবে যে কার্য্যের জন্য তাঁহাকে নিযুক্ত করা হইয়াছে তাহা সম্পন্ন হয় না এবং তাহা হইলে এরূপ অধ্যক্ষের কোন অর্থ থাকে না। বাধ্যতা দ্বারাই কার্য্য হয়। তাঁহার ইচ্ছা প্রধান, অপর সকলের ইচ্ছা দ্বিতীয় স্থানে। তাঁহার ইচ্ছামত কাজ হয়। কিন্তু কার্য্যের গৌরব তাঁর।

কাজ করে সকলে, কিন্তু গৌরব তাঁর। প্রত্যেক সৈন্য যুদ্ধ না করিলে যুদ্ধে জয়লাভ হয় না, কিন্তু জয়ের প্রশংসা সেই সেনাপতির। তিনি হয়ত অশ্বারোহণে পশ্চাতে ছিলেন, সেনারা প্রাণপণ করিয়া যুদ্ধ করিয়াছে, কিন্তু গৌরব তাঁহারই। আপাততঃ একথা বোধ হইতে পারে একি অবিচার, তাঁহার গৌরব কেন? কিন্তু ইহাতে গভীর অর্থ আছে। গর্ডন না থাকিলে হাজার সাহসী সৈন্য থাকিলেও চীনের যুদ্ধে জয় হইত না। তাঁহার শৃঙ্খলা, তাঁহার কার্য্য তৎপরতা, তাঁহার বীরত্ব, তাঁহার সাহস, তাঁহার ধৈর্য্য, তাঁহার শৌর্য্য না থাকিলে সৈন্যগণ হাজার সাহসী হইলেও কখনই যুদ্ধে জয় হইত না। সুতরাং গৌরব তাঁহারই।

ঈশ্বরকে প্রধান পুরুষ বলিলে এই বলা হয়, তাঁহার অধীন হওয়া, তাঁহাকে জীবনের কর্ত্তা করিয়া চলা। জীবনের সমস্ত কার্য্যের গৌরব তাঁহাকে দেওয়া এই ভাবে তাঁহাকে গ্রহণ করিতে পারিলেই বলা যায় "মহান প্রভুর্বৈ পুরুষঃ।"

ধর্ম্মের আর কোন অর্থ নাই, কেবল তাঁহাকে প্রধান পুরুষ করিলেই হয়, আর কিছু নয়। অনেক সময় দেখা যায় মানুষ আপনাকে প্রধান পুরুষ করিয়া মুখে বলে ঈশ্বর আমরা কর্ত্তা। হৃদয় দেখিলে দেখা যায় নিয়ন্তা তিনি নন, কিন্তু মানুষ আপনি নিজে। তাঁহার ইচ্ছা নয় কিন্তু মানবের ইচ্ছাই প্রধান। আপনাদের জীবন পরীক্ষা করিলে দেখা যায়, নিজেকেই প্রধান পুরুষ করিয়া রাখিয়াছি, আমরাই জীবনকে নিয়মিত করিতেছি। তিনি প্রভু, আমি দাস, এভাব নয়। আমি তাঁহার ইচ্ছা পালন করিতেছি, আমি তাঁহার সন্তান হইয়াছি এভাব নয়, কিন্তু আমি এখানে প্রধান পুরুষ।

আপনার ইচ্ছাকে অনেক সময় প্রধান ভাবি। প্রার্থনা করি অনেক সময় এই ভাবে যে আমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক, তোমার দ্বারা। নিজের ইচ্ছাই পূর্ণ করিতে চাই তাঁহা দ্বারা। কিন্তু প্রকৃত ধার্ম্মিকের প্রার্থনা এই "তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক আমা দ্বারা।" "আমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক তোমার দ্বারা" এবং "তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক আমার দ্বারা" এই উভয় প্রার্থনাতে অনেক প্রভেদ।

সেইরূপ গৌরবও আমরাই গ্রহণ করি। প্রধান পুরুষ তিনি নন, কিন্তু আমরা। "মহান প্রভুর্বৈ পুরুষঃ" বলা যায়, তখন, যখন জীবনের উপর তিনি প্রতিষ্ঠিত হন। অর্থাৎ সকল কার্য্যে তাঁহারই গৌরব দেখি।

তিনি কেবল মহান্ পুরুষ নহেন কিন্তু প্রভু। প্রভু শব্দের অর্থ কি? না যাহার প্রভাব আছে, মনের উপর যাহার শক্তি আছে। প্রভুর যে শক্তি তাহা গূঢ়শক্তি, তাহা অব্যক্ত ভাবে মানবের চরিত্রের উপর কার্য্য করে। যেখানে পুরুষ দেখি, সেখানেই প্রভু দেখি, সেখানেই এই গূঢ়শক্তি দেখা যায়। এই গূঢ় শক্তির প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া মনু বলিয়াছেন :—

"দণ্ডঃ সুপ্তেষু জাগর্ত্তি দণ্ডোহি দুরতিক্রমঃ।"

অর্থাৎ সকল লোক যখন নিদ্রিত থাকে, রাজার শাসনদণ্ড তখন জাগিয়া থাকে। তুমি সামান্য মানুষ, অন্যায় কার্য্য অনুষ্ঠানের চেষ্টা করিতেছ, মনে করিতেছ কেহ তোমাকে দেখিতেছে না, কিন্তু রাজশক্তি তোমাকে দেখিতেছে। তুমি যে তোমার পার্শ্বস্থিত লোকের বক্ষে ছুরিকা আঘাত করিতে সাহস কর না তাহার কারণ কি? রাজার শাসন-ভয়। এই কোটী কোটী লোকের মধ্যে দুষ্প্রবৃত্তির বশবর্ত্তী মানুষ কি নাই? আজ যদি দণ্ডশক্তি ভাঙ্গিয়া ফেলা যায়, তবে কি ইহারা দেশকে অস্থির করিয়া তোলে না? পশ্চিমে কানপুর প্রভৃতি স্থান যখন বিদ্রোহ হইয়াছিল, তখন বাজার ব্যবসা বাণিজ্য সমুদায় বন্ধ হইয়া গিয়াছিল; কেহ দোকান করিতে পারিত না; হাট বাজার বা বাড়ীর প্রবেশ দ্বার বন্ধ, লোক ভয়ে ঘরের বাহির হইত না। কোন মতে দিন কাটাইত। সৈন্যেরা তরবারি হস্তে নগরে বেড়াইতেছে! সে যে কি অরাজকতা তাহা ভাষায় বলা যায় না। আজ রাজার শক্তি ভগ্ন করিয়া দেও, কল্য দেখিবে জনসমাজ ভগ্ন হইতেছে। কাল যদি শুনিতে পাই যে কেল্লাতে সৈন্য নাই, থানায় পুলিস নাই, গবর্ণমেণ্টের ধনাগার লুঠ হইয়াছে, তবে কে ঘরের বাহির হয়? প্রভুশক্তি না থাকিলে শাসন চলিত না। প্রভুশক্তি দণ্ডের ন্যায় কার্য্য করে। এই শাসনদণ্ড যদি না থাকিত, তবে আজ এতগুলি লোক নিরাপদে এখানে বসিয়া ঈশ্বরের নাম ক'রতে পারিতাম না। প্রত্যেক পদ বিক্ষেপে এই রাজশক্তির কথা কেহ ভাবে না, কিন্তু অব্যক্ত রূপে প্রত্যেকের মধ্যেই ইহা আছে। সেইরূপ প্রভুর শক্তির

তাবও অবাক। কোন বাড়ীতে গেলেই টের পাওয়া যায় গৃহস্বামী বাড়ীতে আছেন কি না? কর্ত্তা বাড়ীতে থাকিলে, ভৃত্যদের মধ্যে কর্ম্মের বাধ্যতা ও শৃঙ্খলা দৃষ্ট হয়, প্রভুর ভয়ে সকলেই আপন আপন কার্য্য শৃঙ্খলাবদ্ধরূপে সম্পন্ন করে। আর সেই প্রভু যদি বাড়ীতে না থাকেন, তবে সকল কাজেই বিশৃঙ্খলা।

আমরা যে ঈশ্বরকে প্রভু বলি আমাদের কি সেই শৃঙ্খলা ও নির্ভর আছে? তিনিত আমাদের প্রভু, কিন্তু আমরা কি অনুক্ষণ তাহা মনে রাখি, ও তাঁহার উপর নির্ভর করি? শিশুর গতি যখন দেখি সে স্বাধীনভাবে খেলা করিয়া বেড়ায়, সে আর কিছু জানে না. তাহার নির্ভর আছে তাহার মায়ের উপর। সে যে প্রত্যেক কার্য্যে ভাবে তার মা আছে, তাহা নহে; কিন্তু সে অব্যক্ত ভাবে মায়ের উপর নির্ভর করে। এই নির্ভরের কারণ হরণ কর তাহার সব যাইবে, প্রসন্নতা যাইবে। যদি প্রভুর উপর নির্ভর করিতে পারিতাম তবে কি শিশুর ন্যায় নির্ভর করিয়া প্রসন্ন থাকিতে পারিতাম না?

আর দেখি যেখানেই প্রভু সেখানেই নির্ভর সেখানেই প্রতীক্ষা। আমরা কি নির্ভর করি? কত সময় কত গুরুতর প্রশ্ন আমাদের মনে উঠে, আমরা কি প্রতীক্ষা করি তিনি সে সম্বন্ধে আদেশ করেন কি না?

নির্ভরের সঙ্গে সঙ্গেই আদেশ পালনের জন্য প্রস্তুত থাকা আবশ্যক। আমাদের নিজেদের জীবন দেখিয়া কি বলিতে পারি যে নির্ভর করিতে পারিয়াছি, তাঁহার আদেশের প্রতীক্ষা করিয়াছি, এবং সে আদেশ পালন করিতে পারিয়াছি? আমরা তাঁহাকে প্রভু করিতে পারি নাই। পরমেশ্বর করুন আমরা তাঁহাকে জীবনের প্রভু করি। তাঁহার আদেশের প্রতীক্ষা করি এবং তাঁহার আদেশ পালন করিয়া ধন্য হই।

প্রাচ্য ও প্রতীচ্য ধর্ম্মভাব।

১১ই মাঘ দিবসে শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী প্রদত্ত বক্তৃতার সারাংশ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

আমাদের প্রত্যেক জ্ঞানের রশ্মি অন্য স্থান হইতে আসিতেছে। প্রত্যেক সত্যের কিরণ অন্যস্থান হইতে বিকীর্ণ হইয়া তোমার হৃদয়ে উপনীত হইতেছে। ইহার একটীও তোমার নয়। তবে এ সকলের কর্ত্তা কোন্ জায়গায়? বর্ত্তমান সময়ে utilitarian (হিতবাদীগণ) এই প্রশ্নের মীমাংসা করিতে গিয়া neccessitarian হইয়াছেন, প্রাচীনকালে ভারতের ঋষিগণ ইহার সিদ্ধান্ত করিতে গিয়া আত্মার স্বাধীনতা দেখিতে পান নাই। যদি কর্ত্তৃত্বই নাই তবে আত্মা কিরূপে এই অনিত্য জগতে আসিল? তাঁহারা এই প্রশ্নের উত্তর অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইয়া কর্ম্ম-নিয়ম অনুভব করিলেন। আত্মা কর্ম্মফল ভোগের জন্য আসিয়াছে। তাঁহারা দেখিলেন জড় রাজ্যের সর্ব্বত্রই নিয়ম, কোথাও কাহারও স্বাধীনতা নাই। বিশাল সূর্য্য নভোমণ্ডলে নিয়মাধীন হইয়াই ভ্রমণ করিতেছে, সুশোভন করিতেছে, নিয়মাধীন থাকাতেই নক্ষত্র-মণ্ডল ...... আকাশমণ্ডল সুশোভিত করিতেছে, মেঘ সকল বাধ্য হইয়াই জলধারা বর্ষণ করিতেছে, প্রকৃতি বসন্তকালে নব শোভায় শোভিত হইয়া জগজ্জনের মনোহরণ করিতেছে; এইরূপ জড়জগতের সর্ব্বত্রই নিয়ম— বাধ্যতা। ইহা হইতে তাঁহারা এই সিদ্ধান্ত করিলেন যে মানবের কার্য্য সমুদয়ও দুর্ভেদ্য নিয়মশৃঙ্খলে আবদ্ধ রহিয়াছে। কর্ম্মের নিয়ম মানিয়া তাঁহারা ঈশ্বরের ন্যায়কারিতা রক্ষা করিলেন— পাপের শাস্তি ও পুণ্যের পুরস্কার স্বীকার করিলেন। জীবাত্মার সংসারে জন্ম, কর্ম্মফল ভোগের জন্য বলিয়া অবধারণ করিলেন। এইরূপে তাঁহারা আত্মা, জগৎ ও ঈশ্বর সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত করিলেন যে ঈশ্বর নিত্য, আত্মা কর্ত্তৃত্ব-বিহীন, নিয়মাবদ্ধ এবং জগৎ অনিত্য, মানবাত্মার কর্ম্মভোগের স্থান। প্রাচ্য ধর্ম্মভাবের মধ্যে এই তিনটী ভাব প্রস্ফুটিত দেখা যায়।

এ সকল ভিন্ন ইহার আরও একটী প্রধান ভাব আছে। সেটী এই—অনিত্য জগতে নিত্য আত্মার বাস প্রার্থনীয় কি না? ইহার উত্তর, প্রার্থনীয় নয়। যেহেতু জগৎ দুঃখময়—দুঃখময় জগতে আত্মার বাস কিরূপে প্রার্থনীয় হইতে পারে? জন্মগ্রহণ দুঃখেরই কারণ। জন্ম হইতে নিষ্কৃতিই মুক্তি। সংসার শব্দ সংস্কৃত সৃ ধাতু হইতে উৎপন্ন; ইহার অর্থ যাতায়াত, ভব শব্দের অর্থ জন্ম। তাঁহারা এই জগতে আগমন, এখানে জন্মকেই অত্যন্ত দুঃখময় মনে করিতেন। এই জন্যই সংসারও ভব শব্দ জন্মার্থক হইলেও দুঃখবাচক হইয়াছে। সংসারকে তাঁদের এত দুঃখময় মনে হইল কেন? দেখি সমুদয় প্রাণী জগৎকে মিষ্ট মনে করে। শিশুগণ মনে করে জগৎ মিষ্ট। তাদের নবীন চক্ষে সকলই নবীন, সকলই আনন্দদায়ক, যা দেখে তাতেই আনন্দ যা শুনে তাতেই তৃপ্তি। যত দেখে যত শুনে ততই কৌতূহল। আরও দেখিব আরও শুনিব আরও আনন্দিত হইব আরও মিষ্টতা উপভোগ করিব। তাদের নবীন হৃদয়ে কত আশা, কত উৎসাহ, উপভোগ-প্রবৃত্তি কত প্রবল। আর জগতে এত মিষ্ট জিনিষও রহিয়াছে। তবে এত দুঃখ কোথা হইতে আসিল? কেন প্রাচীন পণ্ডিতগণ জগৎকে দুঃখময় অনুভব করিলেন? বেদে কোথাও ত জগৎকে দুঃখময় দেখি না। বেদে enjoymentএর ভাব, জগৎকে উপভোগ করিবার ভাব, পূর্ণমাত্রায় দেখিতে পাই। বৈদিক ঋষিগণের ধর্ম্মভাব নূতন, তাঁদের দৃষ্টি নূতন, সমস্তই নূতন। তাঁদের নূতন চক্ষে তাঁহারা জগৎকে সৌন্দর্য্যের আকর, সুখের উৎস বলিয়া দেখিয়াছেন। বেদে কোনও কপটতা নাই, বৈষয়িক বিষয়ে প্রার্থনা করিতে হইবে না সে ভাব তখন ছিল না। তাঁহারা সর্ব্বদা ইন্দ্রিয়ভোগ্য সুখের জন্যই ব্যস্ত। সেই সুখকেই ধর্ম্মের পুরস্কার বলিয়া মনে করিতেন এবং ধর্ম্মপথে থাকিয়া তাহারই জন্য প্রার্থনা করিতেন। বেদে সর্ব্বদাই এরূপ প্রার্থনা প্রাপ্ত হওয়া যায়—"হে ইন্দ্র! আমাদিগকে ধন দেও, যাহা দিন দিন বর্দ্ধিত হয়; আমাদিগকে দুগ্ধবতী ধেনু দেও আমরা দুধ খাই।"

এমন কি ভেকের যে কুৎসিত শব্দ তাহার মধ্যে বৈদিক ঋষিগণ এক প্রকার স্বরমাধুরী অনুভব করিয়াছিলেন। বেদে বর্ষাকালে ভেকদিগের মক মকা ধ্বনির প্রশংসা আছে। কিরূপ সরল মন থাকিলে জীবনের সুখ এত অধিক অনুভব করা যায় যে ভেকের শব্দেও মন মুগ্ধ হইতে পারে! এই শৈশব-সুলভ সরলতা, এই জীবনের সুখভোগের শক্তি, এই ইন্দ্রিয়জনিত তৃপ্তির আস্বাদনের ক্ষমতা অতীব মধুর।

প্রথমে এই ভাব ছিল তবে কিজন্য জগৎ দুঃখময় মনে হইল? মহাত্মা বুদ্ধ দুঃখের চক্ষে জগৎকে দেখিয়াছিলেন। তিনি জগৎকে ভয়ানক দুঃখময় বলিয়া ধর্ম্মস্থাপন করিয়াছেন। এক্ষণে দেখা যাউক জগৎ দুঃখময় এ কথা সত্য কি না। জগৎ যদি দুঃখময় হয় তবে কি ঈশ্বর করুণাময় নহেন, অথবা পরমেশ্বর কি জগৎপিতা নহেন? জগৎকে যে দুঃখময় দেখি তাহার কারণ দুঃখের কথাটা আমাদের মনে থাকে সুখের কথা ভুলিয়া যাই। তজ্জন্য ঈশ্বরকে যথেষ্ট ধন্যবাদ দিই না। তুমি বৎসরের মধ্যে একদিন কি দুই দিন ভয়ানক রোগ যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছ সেই কথাটী হৃদয়ে অঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছ আর এতদিন যে সুখভোগ করিলে, এতদিন যে সুস্থদেহে প্রফুল্ল মনে কাল হরণ করিলে তাহা আর মনে থাকে না। পরমেশ্বর আমাদের ধন্যবাদ চান না এই জন্যই সুখের কথা মনে থাকে না। আর আমাদিগকে দুঃখ পরিহার করিতে হইবে এজন্য তার ছাপ মনে বিশেষরূপে অঙ্কিত থাকে। চিন্তাশীল হইয়া আমরা অনেক সময় মিষ্টতা হারাই। চিন্তাশীল হইয়া দেখিলে জগৎ দুঃখময়ই মনে হয়। দ্বিতীয়তঃ প্রাচীন কালের সহিত তুলনা করিয়া বর্ত্তমানকাল দুঃখময় মনে হয়। ইতিবৃত্তে ভাল কথাই লিখিত থাকে মন্দ কথা কেহ লিখিয়া রাখে না; ব্যাস বাল্মীকি ইহাঁদেরই কথা লেখা আছে আর যে কত 'হরে নরে' জন্মগ্রহণ করিয়াছিল তাহার কেহ সন্ধান রাখে না। কাজেই ইতিহাস পাঠে প্রাচীনের তত্ত্ব অবগত হইতে যাইয়া আমরা ভাল দিকটাই দেখিতে পাই মন্দভাগ কখনই আমাদের নয়নপথে পতিত হয় না। এই জন্যই অনেকে প্রাচীন, প্রাচীন প্রাচীন করিয়া বর্ত্তমানকে মলিন দেখিয়াছেন—জগতকে দুঃখময় মনে করিয়াছেন। এভাব য়িহুদীদের মধ্যেও ছিল। এই দুই জাতি জগৎকে মলিন চক্ষে দেখিল কেন? এমন কোনও কারণ ছিল যাহা দুই জাতিতেই বিদ্যমান ছিল। অসভ্যেরা এই জগৎকে তাজা সম্ভোগ করে। চিন্তা করিলে মনে হয় রাজনৈতিক পরাধীনতা, উৎপীড়ন, সামাজিক দারিদ্র্য প্রভৃতি জগৎকে দুঃখময় দেখিবার কারণ। য়িহুদীদের মধ্যে বন্দীদশা ও দুর্ভিক্ষ এই ভাব আনিয়া দিয়াছে। এদেশেও ব্রাহ্মণদের অত্যাচার প্রবল হইয়াছিল; অন্যান্য জাতি সর্ব্বদা প্রপীড়িত হইত; তাহাদের মন নিয়ত ম্রিয়মাণ থাকিত। এ সকলের উচ্ছেদ করিবার জন্যই বুদ্ধদেবের অভ্যুদয়। জগৎ দুঃখময় হওয়াতেই তৎপ্রতি বিরাগ উৎপন্ন হইয়াছে।

ঐ সকল কারণের সমাবেশে ১ম আত্মনিষ্ঠতা, ২য় বিষয়-বিরাগ ও ৩য় অদৃষ্টবাদের বিকাশ হইয়াছে। এই তিনটী ভাব প্রাচ্যধর্ম্মে প্রস্ফুটিত হইয়াছে। এবং তিনটীতেই আতিশয্য দেখা গিয়াছে। আত্মনিষ্ঠতা আত্মতৃপ্তিকে প্রসব করিয়াছে। প্রাচ্য ঋষিগণ সর্ব্বদা আপনার ধ্যান, চিন্তা সাধনেই তৃপ্ত থাকিতেন। ইহার দৃষ্টান্ত বেশী দিতে হইবে না। হাজার হাজার সন্ন্যাসী পরমহংস প্রভৃতি এবিষয়ের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। ২য় বিষয়-বিরাগ। ইহার মধ্যে সত্য আছে কিন্তু ইহা সন্ন্যাসকে উৎপন্ন করিয়াছে। ইহা হইতে এই ভাব জন্মিয়াছে যে মনুষ্য-সমাজ ঘৃণার বস্তু, দুঃখময়, উহা পরিত্যাগ কর। ৩য়তঃ অদৃষ্ট-বাদ। ইহাতেও সত্য আছে, সমুদয় নিয়মাবদ্ধ তাহাতে আর সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহার আতিশয্য বশতঃ নীতি বিষয়ে উদাসীন ভাব (Stagnation) উৎপন্ন করিয়াছে। নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক যে তিনটী মূল ভাব বলিয়াছি তাহার আতি-শয্য হইতে ঐ তিনটী উৎপন্ন হইয়াছে। ইহার ফল—ধর্ম্ম ও নীতির মধ্যে বিচ্ছেদ। এদেশে জ্ঞানমার্গ ও ভক্তিমার্গে প্রধা-নতঃ ধর্ম্মসাধন হইয়াছে। পরমহংস প্রভৃতি জ্ঞানমার্গাবলম্বী ও বৈষ্ণবগণ ভক্তিপথাবলম্বী। উভয় সম্প্রদায় মধ্যেই নীতি এবং ধর্ম্মের যোগ অপ্রস্ফুটিত রহিয়াছে। প্রাচ্য ধর্ম্মভাব এই।

এক্ষণে আলোচ্য, প্রতীচ্য ধর্ম্মের ভাব কি? প্রতীচ্য ধর্ম্ম য়িহুদী ধর্ম্ম হইতে উৎপন্ন। তাঁহাদের মুখ্যভাব ঈশ্বর মানব কার্য্যের বিচারক ও মানব ইতিবৃত্তের নিয়ামক। সেমিটিক ও হিন্দু জাতির মধ্যে প্রভেদ এই যে হিন্দুগণ আত্মজগতে অধিক বাস করাতে ভাবপ্রবণ। য়িহুদীগণ মানব ইতিবৃত্তের আলোচনা করিয়াছেন বলিয়া বহির্ম্মুখীন ও পরিচ্ছিন্ন ভাবাপন্ন (Exact) হইয়াছেন। হিন্দুদিগের ঈশ্বরের ভাব অব্যক্ত অনধিগম্য (Vague) তাঁহারা ঈশ্বরকে অচিন্ত্য, মহান্ ইত্যাদি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। "তিনি অকায়, তিনি অব্রণ, তিনি স্থূল, তিনি স্থূল নহেন, তিনি চলেন, তিনি চলেন না।" এইরূপ অস্পষ্টভাবে তাঁহারা ঈশ্বরের স্বরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

য়িহুদীগণ ইতিবৃত্তে দেখিয়াছেন বলিয়া তাঁহাদের ঈশ্বর-জ্ঞান পরিচ্ছিন্ন ভাবাপন্ন। ভারতের ঈশ্বর immanent in nature, প্রকৃতিতে, জড়ে চৈতন্যে ওতপ্রোতভাবে অবস্থিত। য়িহুদীদের ঈশ্বর সীমাবদ্ধ পরিচ্ছিন্ন, Extra-cosmic Being প্রকৃতির বহিঃস্থ। তাঁহাদের ঈশ্বর স্বরূপ নির্দ্দেশে কোনও প্রকার গোলমাল নাই। তাঁহাদের ঈশ্বরের একস্থানে বাস। তিনি তথা হইতে জগৎ কার্য্য দেখিতেছেন। Old Testa-ment এর ঈশ্বর বৃক্ষতলে পদচারণা করিতেছেন; কাহারও বাটীতে একরাত্রি থাকিতেছেন; কাহারও উপর ক্রোধ করিতে-ছেন; একজনের পরামর্শে অন্যের সর্ব্বনাশ করিতেছেন; ইত্যাদি প্রকার। য়িহুদীদিগের ধর্ম্মবিষয়ে সকল ভাবই পরিচ্ছিন্ন, সীমাবদ্ধ। তাঁহাদের যে সীমা নির্দ্দিষ্ট আছে তার ওপারে যাও আর তোমার রক্ষা নাই। মূষার দ্বারা যে নিয়ম প্রকাশিত হইয়াছে তার অতিরিক্ত আর কিছুই তোমাতে প্রকাশিত হইতে পারে না। আর এদেশে দেখুন এ সকল বিষয়ে কেমন উদারতা। অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই। এক ভগবদ্গীতা দেখুন—চিন্তার কেমন আশ্চর্য্য উদারতা

রিস্তদাদের মধ্যে এই উদারতার অভাব। সেই জন্যই মত লইয়া কাটাকাটি। ঈশ্বর জগতের বাহিরে,বাহির হইতে জগতের সকল ঘটনা নিয়মিত করিতেছেন, মানবের কাজ দেখিতেছেন, তাঁহাদের মূলভাব এই প্রকার। (ক্রমশঃ প্রকাশ্য)

প্রেরিত পত্র

(পত্রপ্রেরকদিগের মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন।)

ব্রাহ্মবালিকাদিগের শিক্ষা।

গত ১১ই মাঘের আলোচনা সভাতে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে উপরোক্ত বিষয়ে প্রস্তাব উপস্থিত করা হইয়াছিল। শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুত শাস্ত্রী মহাশয় যেরূপ ভাবে প্রস্তাবের অবতারণা করেন তাহাতে ইহা অনুমান করা গিয়াছিল যে ব্রাহ্ম বালিকাদিগের শিক্ষার প্রণালী লইয়াই আলোচনা হইবে কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ স্থলবিশেষে তাহা হইতে বিচ্যুত হইয়া আলোচনা অন্য পথাবলম্বন করিয়াছিল এবং তাহাতে সময়াতিবাহন ভিন্ন অন্য কোন ফললাভ হয় নাই। যাহা হউক মূল প্রস্তাব সম্বন্ধে আমার যে ২।১টী কথা বলিবার আছে তাহা এক্ষণে ব্রাহ্ম সাধারণের গোচর করিতে ইচ্ছা করি।

কেহ কেহ বলিয়াছেন যে আগেকার নারীগণ যেরূপ রন্ধনকুশল ছিলেন এখনকার ব্রাহ্ম মেয়েদিগকে সেরূপ দেখা যায় না; তাঁহারা রন্ধনশালার কার্য্যে তত পটু নহেন। আমি বলিতে বাধ্য যে এই কয়েকটী কথা কলিকাতার ব্রাহ্মগণের মুখেই শুনিতে পাওয়া যায়, এবং তাহার কারণও রহিয়াছে। কলিকাতায় কয়লার আগুণ শরীরকে কত দুর্ব্বল ও মস্তিষ্ককে কত পীড়িত করে তাহা, যাঁহারা গৃহিণীর রন্ধন আহার করিয়া পরিতৃপ্ত হন, তাঁহারা একবার ভাবিয়া দেখিতে পারেন, এবং অনুসন্ধানেও জানা যায় যে এই হেতুই অনেক গৃহিণী রন্ধন করিতে পরাঙ্মুখ হন। তবে ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য, যে মেয়েদের পক্ষে রন্ধনাদি যাবতীয় গৃহকার্য্য সুচারুরূপে না জানা বড়ই পরিতাপের বিষয়; কারণ নিজে না করিলেও তাহা অন্য দ্বারা করাইতে হইলে সে বিষয়ে বিশেষ জ্ঞান থাকা অত্যন্ত প্রয়োজন। ইহা স্বীকার্য্য হইলে সহজেই এই সিদ্ধান্ত আসিয়া পড়িল, যে মেয়েদের শিক্ষণীয় বিষয়ের মধ্যে গৃহকার্য্য শিক্ষা একটী মুখ্য স্থান অধিকার করিবে। এক্ষণকার মেয়েদিগকে রন্ধনাদিতে অকুশলতার জন্যও তত দোষ দেওয়া যায় না; আমি যদি ঠিক বুঝিয়া থাকি তবে বোধ হয় শ্রদ্ধেয় হেরম্ব বাবু ঐ সভায় ইহার ঠিক উত্তর দিয়াছিলেন; যে আগেকার গৃহিণীরা যেমন এখনকার গৃহিণীগণ অপেক্ষা গৃহকর্ম্মে শ্রেষ্ঠ ছিলেন এক্ষণকার গৃহিণীরাও তেমনি তাঁহাদিগের অপেক্ষা সাধারণতঃ বিদ্যা ও মানসিক চর্চ্চা বিষয়ে উন্নতি লাভ করিয়াছেন। গৃহকার্য্যের শৃঙ্খলাদি দ্বারা যেরূপ পরিবারবর্গের শারীরিক স্বচ্ছন্দতাবিধান করা যায় মানসিক ভাবের শৃঙ্খলা ও ভাব পর্য্যালোচনা দ্বারা সেইরূপ মানসিক স্বচ্ছন্দতা বিধান করা যাইতে পারে। যদি স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মানসিক বিকাশও ভাবের মিলন অধিক বাঞ্ছনীয় হয়, তবে গৃহের সাধারণ কর্ম্মের ভার বেতনভোগী ভৃত্যের হাতে দিয়াও স্ত্রী যদি সেই সময়ে অপেক্ষাকৃত উন্নততর মানসিক ভাবোন্মেষকর কার্য্যে স্বামীর সাহচর্য্য বিধান করিতে পারেন তবে জ্ঞানপিপাসু স্বামীর পক্ষে ইহাপেক্ষা অধিক প্রার্থনীয় আর কিছুই হইতে পারে না। এই হেতু আমি সর্ব্বতোভাবে ইহা মনে করি যে বালিকাদিগের পক্ষে যেমন গৃহকার্য্য শিক্ষা করা প্রার্থনীয় তেমনি জ্ঞানচর্চ্চা করাও অবশ্য কর্ত্তব্য। যদি ব্রাহ্মবালিকা বিদ্বান ও জ্ঞানী স্বামীর সাহচর্য্য লাভে অভিলাষিণী হন তবে তাঁহাকে যেমন স্বামীর শারীরিক স্বাচ্ছন্দ্যবিধান জন্য গৃহকর্ম্মের সুশৃঙ্খলা করিতে হইবে তেমনি তাঁহার মানসিক স্বাচ্ছন্দ্যও তাঁহার কর্ত্তব্যবিধানের অন্তর্গত থাকিবে। তৎপর সন্তানদিগকে লালন পালন ও কর্ত্তব্যানুষ্ঠানে নিয়োজন, এবং তাহাদিগকে জীবনের মহদুদ্দেশ্য আয়ত্ত করিতে ও তৎসম্পূরণে যত্নশীল হইতে, শিক্ষা প্রদান ইত্যাদি যাবতীয় কার্য্য মাতৃহস্তে ন্যস্ত হইয়া থাকে। এই সকল কারণে আমার বোধ হয় যে ব্রাহ্মগণের পক্ষে বালকদিগের শিক্ষা অপেক্ষা বালিকাদিগের শিক্ষার গুরুত্ব অধিকতর অনুভব করা উচিত। একটু অনুধাবন করিয়া দেখিলে প্রতীত হইবে যে ব্রাহ্মসমাজের অধিকাংশ দরিদ্রতা কেবল মাত্র উপযুক্ত শিক্ষার অভাবে ঘটিতেছে। ব্রাহ্মিকাগণের মধ্যে যত অৰ্দ্ধশিক্ষিতা ও অশিক্ষিতার সংখ্যা বাড়িবে ততই গৃহকর্ম্মে বিশৃঙ্খলা, সন্তান পালনে অক্ষমতা, সন্তানগণের শিক্ষাভাব, ও আয় ব্যয়ের সঙ্কুলানের অভাব বিশেষরূপে লক্ষিত হইবে। এক্ষণে প্রত্যেক ব্রাহ্মবালিকাকে যদি শিক্ষা প্রাপ্ত হইতেই হইবে তবে কিরূপে ঐ শিক্ষা প্রদান করা যাইতে পারে তদ্বিষয়ে সকলের চিন্তা করা কর্ত্তব্য।

ব্রাহ্মসমাজে 'আধ্যাত্মিক' কথাটী এত সাধারণ ভাবে প্রচলিত হইতেছে যে অনেকের কাছে তাহা নিত্যকণ্ঠ-মুখস্থ কথারূপে পরিণত হইয়াছে; কিন্তু তাহার ভাব বিষয়ে কয়জন চিন্তা করেন বলা যায় না। সমাজ 'আধ্যাত্মিক বিবাহের অত্যন্ত পক্ষপাতী! কিন্তু সেই আধ্যাত্মিক মিলন বা বিবাহ যে কি তাহা কয়জন ভাবিয়াছেন বলিতে পারি না। সচরাচর দেখা যায় স্বামী স্ত্রীতে একত্রে 'ধর্ম্মসাধন' অর্থাৎ একত্রে নিত্য নিয়মিত উপাসনা করা, ও একত্রে সমাজে যাওয়া ইত্যাদিই আধ্যাত্মিক মিলনের অঙ্গ ও ক্রিয়া বলিয়া পরিগণিত। কিন্তু এতদতিরিক্ত,ভাবের সমাবেশ দ্বারা মিলন, যাহাকে আমি প্রকৃত 'আধ্যাত্মিক মিলন' বলি, ঈশ্বর এবং জগতের যাবতীয় ভাব একাধারে উভয়ে এক ভাবে গ্রহণ করা তাহা কয়টী স্বামী ও স্ত্রীর ঘটিয়াছে তাহা বিবেচনা সাপেক্ষ। এমনকি কোন কোনও স্থলে ইহাও দেখা গিয়াছে যে ঐ সকল বিষয়ে স্বামী স্ত্রীর ভিতরে ভাববিরোধিতা পর্য্যন্ত বিদ্যমান রহিয়াছে। ইহার অধিকাংশ স্থল পরীক্ষা করিলেই দেখা যাইবে যে জ্ঞানচর্চ্চা দ্বারা উভয়ের মানসিক বিকাশ একরূপ না হওয়াতেই ইহা ঘটিয়া থাকে। এক্ষণে বিবেচনা করা কর্ত্তব্য যে যদি আধ্যাত্মিক মিলনই প্রকৃত বিবাহ, তবে সেই বিবাহকে সফলকাম করণার্থ আমাদের বালিকা-

দিগকে কিরূপ শিক্ষিতা করিতে হইবে? যে স্থলে কেবল গৃহকর্ম্মকুশল রমণীকে স্ত্রী করা একমাত্র বাঞ্ছনীয় হয় সে স্থলে আমি স্ত্রী শব্দের অর্থ 'গৃহকর্ত্রী (ইংরাজীতে যাহাকে 'house-keeper' বলে) করিতে পারি কিন্তু তাহাতে স্ত্রী সহধর্ম্মিণী হইল না, অথবা স্বামী স্ত্রীতে আধ্যাত্মিক মিলনও হইল না। আবার যে স্থলে স্ত্রী গৃহকর্ম্মে সম্পূর্ণ অকুশল, সে গৃহে শৃঙ্খলা থাকে না এবং মানুষের শারীরিক ধর্ম্মপালনে যথেষ্ট বিঘ্ন উৎপাদন করে; অতএব ধর্ম্মকে সর্ব্বতোমুখী সাধনবস্তু করিতে হইলে স্ত্রীকে সহধর্ম্মিণী করিতে হইলে, স্ত্রীর জ্ঞানোন্মেষকর শিক্ষা প্রধান এবং গৃহকর্ম্ম-শিক্ষা দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিবে; কিন্তু উভয়ই অবশ্য কর্ত্তব্যরূপে পরিগণিত হইবে, নতুবা শিক্ষা অপূর্ণ থাকিবে।

এক্ষণে আমরা শিক্ষার উদ্দেশ্য হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম হইলে তাহার প্রণালী আলোচনা করিতে পারি। কিন্তু তাহা করিবার পূর্ব্বে আরও একটী বিষয় বিশেষভাবে আলোচনা করিতে ইচ্ছা করি। কি পরিমাণে বালিকাদিগকে শিক্ষার জন্য পরিশ্রম করাইতে হইবে তাহা বিচার করিতে গেলে সহজেই 'অতিরিক্ত পরিশ্রমের' কথাটী আসিয়া পড়ে। কোন বয়সে কতদূর পর্য্যন্ত পরিশ্রম করাইলে তাহা সাধ্যাতিরিক্ত হইয়া পড়িবে না, তাহা এস্থলে বিচার করা কর্ত্তব্য। ইংরাজিতে একটী বই আছে তাহার নাম 'Overpressure in Schools'; ইহা ডাক্তার 'হর্ত্তেল' কর্ত্তৃক 'স্বদেশীয়' ভাষাতে প্রথম রচিত হয়; তৎপর প্রয়োজনীয়তা বোধে ইহা ইয়ুরোপের সকল সুসভ্য ভাষায় অনুবাদিত হইয়াছে। ঐ গ্রন্থে বালক বালিকাদিগকে শিক্ষার জন্য অতিরিক্ত পরিশ্রম করাইবার কি কি বিষময় ফল ফলিয়াছে তাহা বিষদরূপে দর্শান হইয়াছে। কিশোর বয়স্কা বালিকাদিগের মধ্যে শিরঃপীড়া, হিষ্টিরিয়া প্রভৃতি মস্তিষ্ক হানিকর রোগের প্রাদুর্ভাবই প্রথমতঃ 'হর্ত্তেল'কে ইহার তত্ত্বানুসন্ধানে নিয়োজিত করে। তাহাতে তিনি দেখাইয়াছেন যে স্কুলের ছাত্রীদিগের মধ্যে ১০ হইতে ১৬ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত রোগীর সংখ্যা অত্যন্ত অধিক; এবং ১১ হইতে ১৪ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত প্রায়শঃই শতকরা ৫০ জনের উপর রোগী দেখা যায়। এবং ইহাও দর্শান হইয়াছে যে ঐ বয়সে বালিকাগণ প্রায়ই ৮ হইতে ৯ ঘণ্টা করিয়া প্রতিদিন মানসিক পরিশ্রম করিয়া থাকে। অধিকন্তু বালকদিগের সহিত তুলনায় দেখা যায় যে ঐ বয়সে রোগী বালক অপেক্ষা রোগী বালিকার সংখ্যা প্রায় শতকরা ১৫ জন বেশী। ইহার কারণানুসন্ধান করিতে গিয়া হর্ত্তেল দেখাইয়াছেন (এবং অনেক বিখ্যাত চিকিৎসা ব্যবসায়ীও তাহাতে একবাক্যে মত দিয়াছেন) যে ঐ বয়সে বালিকাদিগের শারীরিক বিশেষ পরিবর্ত্তন সংঘটন হেতু তাহাদের ধমনীতে রক্ত সঞ্চালন অত্যন্ত উচ্ছৃঙ্খলভাবে হইয়া থাকে; অতএব তখন মস্তিষ্ককে অধিক পরিচালিত করিলে তাহাতে তাহাদিগের রক্ত সঞ্চালিত হইয়া মস্তিষ্ককে নানারোগের আধার করিয়া তোলে।

ইংলণ্ডে এই গ্রন্থ অনুবাদিত হইবার পরে মহা হুলস্থুল পড়িয়া গিয়াছিল এবং তদবধি অনেক পিতামাতার চক্ষু ফুটিয়াছে; তাঁহারা এক্ষণে এই নিয়ম করিয়াছেন যে বালিকাদিগকে কিশোর বয়সে গ্রন্থপাঠে অধিক নিয়োজিত না করিয়া চিত্র ও সঙ্গীত বাদ্যাদি চিত্তপ্রফুল্লকর বিদ্যাশিক্ষাতে নিয়োজিত করিতে হইবে। বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হওয়া সম্বন্ধেও এই নিয়ম রহিয়াছে যে ১৮ বৎসরের ন্যূন বয়সে কোন বালিকা কেম্ব্রিজ কিম্বা অক্সফোর্ডে প্রবেশাধিকার পায় না। তৎকালে তাহাদের ধমনীতে রক্ত সঞ্চালনের দুর্দমনীয় বেগ অপেক্ষাকৃত প্রশমিত হইলে তাহারা পুনরায় মস্তিষ্ককে নিয়োজিত করিয়া কার্য্য করিতে সক্ষম হয় বলিয়া ঐ বয়সে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থ কিঞ্চিৎ অতিরিক্ত পরিশ্রমও তাহাদের শরীরের পক্ষে তত অনিষ্টকারী হয় না।

ব্রাহ্মসমাজেও বিশেষ অনুধাবন করিয়া দেখিলে ইহার সত্যতা অনুভূত হইবে। এইরূপ স্থলে কি করা কর্ত্তব্য তাহা সমাজের শিক্ষা বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষদের বিশেষ বিবেচনার বিষয় হওয়া উচিত। আমার বিবেচনায় ইহা যুক্তিযুক্ত বোধ হয় যে বালিকাদিগকে ১২ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত গৃহ কার্য্যের জন্য তাড়া না দিয়া এক মনে বিদ্যাশিক্ষা করিতে দেওয়া কর্ত্তব্য। তৎপর ৪ বৎসর (অর্থাৎ ১৬ বৎসর পর্য্যন্ত) বিদ্যাশিক্ষার ভাগ কমাইয়া দিয়া শারীরিক পরিশ্রম যথা গৃহকর্ম্ম এবং সঙ্গীত, বাদ্য ও চিত্রাঙ্কনাদি চিত্তপ্রফুল্লকর কার্য্যে নিয়োজিত করিলে অল্পায়াসেই একটী কর্ম্মদক্ষা অথচ অল্পাধিক পরিমাণে শিক্ষিতা মেয়ে প্রস্তুত করা যাইতে পারে। অবশ্য এই সময়ে একেবারে বিদ্যাশিক্ষা বন্ধ করিয়া না দিয়া বরং শিক্ষার উদ্দেশ্য এবং সময় স্মরণ রাখিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে যে সময়ে যে টুকু শিক্ষা আয়ত্ত করা যায়, আমরা ভাষা বাদ দিয়া তদপেক্ষা অল্প সময়ে সেই পরিমাণ জ্ঞান আয়ত্ত করিতে পারিব কিনা তাহাই বিচার করিতে হইবে। ইংরাজি ভাষাকে গৌণ শিক্ষণীয় বিষয় করিয়া সাধারণ জ্ঞাতব্য বিষয় গুলি বাঙ্গালা ভাষাতে শিক্ষা দিলে এই অভাব অনেক পরিমাণে বিদূরিত হইতে পারে; এবং ব্রাহ্মসমাজে বালিকাদিগের শিক্ষার জন্য ইহা করা একান্ত প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। তাই একান্ত কর্ত্তব্য বোধে আমাদিগকে ইহা করিতেই হইবে। অবশ্য যাঁহারা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার্থিনী তাঁহাদের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের পথ খোলা রহিয়াছে, এবং তাঁহাদের জন্য স্কুল কলেজও রহিয়াছে! কিন্তু যাঁহারা সেই পর্য্যন্ত পৌছিতে আশা করেন না তাহাদের জন্য কি করা যাইতে পারে? তাঁহাদিগকে কেন কেবল ২।১ সংখ্যা Royal Reader পড়াইয়াই কোন বিশিষ্ট জ্ঞান ব্যতিরেকে গৃহে ফিরাইয়া পাঠান হয়? কেহ কি মনে করেন যে বাঙ্গালাতে কৃতবিদ্যা সঙ্গিনী ইংরাজিনবিশ স্বামীর জ্ঞানগৌরব বুঝিতে সক্ষম নহে? কেবলমাত্র ২।৪টী ইংরাজি শব্দের জ্ঞানাভাবে সাহিত্য ও বিজ্ঞানের স্থূল স্থূল বিষয় সকল সাধারণ ভাবে শিক্ষা দিলে অধিক উপকার দর্শিবে না? যাঁহারা বালিকাদিগকে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা দেওয়াইতে মনস্থ করেন তাঁহারা ঐ সময়টুকু পাঠের ভাগ কমাইয়া ১৬ বৎসরের পর পুনরায় তাহা বৃদ্ধি করিয়া দিতে পারেন। Over-pressure

কথাটা আলোচনা করিতে হইলে কোন স্থানে pressureটী পড়ে এবং তাহার সহিত অন্য কোন pressureএর সংশ্রব আছে কিনা ক্রমে বিশেষভাবে বিবেচনা না করিলে ঐ আলোচনা ফলপ্রদ হয় না। এইরূপ বয়সানুক্রমে শিক্ষা নিয়মিত করিলে আমরা অনায়াসে শিক্ষার বিষয় ও তদুপযোগী প্রণালী বিচার করিতে পারি।

যাঁহারা বর্ত্তমান বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা প্রণালীর বিরোধী, তাঁহাদের বিপক্ষে এই একটী যুক্তি খাড়া করা হইয়াছে যে এই প্রণালী ভিন্ন অন্য কিছু কার্য্যকরী হইবে না। যাঁহারা এরূপ বলেন তাঁহারা বিশ্ববিদ্যালয়ের এবং আমাদের উদ্দেশ্যের পার্থক্য বিচার না করিয়াই কথাটা বলিয়া থাকেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে আগে কথ ও পরে ফলা বানান শিখান হয় আমরা কিছু আগে ফলা বানান ও পরে বর্ণমালা শিখাইতে চাই না। তবে পার্থক্য কোথায়?—সেই পার্থক্য না বুঝিলে সমস্ত ব্যর্থ হইয়া যাইবে? স্বামী নিজের জ্ঞান ইংরাজি ভাষা ভিন্ন অন্য কোন ভাষায় ব্যক্ত করিলে তাহাতে কি জ্ঞানের অমর্য্যাদা হইবে মনে করেন, যে বাঙ্গালা শিক্ষিতা মেয়ে দ্বারা ঐ বিষয়ে তাঁহার সাহচর্য্য সুখ সম্ভোগ হইতে পারে না? আমিত এই বুঝি যে স্ত্রীর সুশিক্ষিতা হওয়া অত্যাবশ্যক; তাহার জ্ঞান পরিস্ফুট হইবে, ভাষা যাহাই হউক না কেন? অতএব আমার বোধ হয় ব্রাহ্মবালিকাদিগের জন্য এমত বিদ্যালয় হওয়া আবশ্যক যাহাতে কেবল বাঙ্গালাতেই সাধারণ জ্ঞানপ্রদ বিষয় সকল পঠিত হইবে এবং ইংরাজ একটা গৌণভাষারূপে শিক্ষার্থিনীদিগের ইচ্ছাধীন থাকিবে।

আমি এই স্থলেই আমার বক্তব্য শেষ করিয়া ব্রাহ্ম সাধারণের মতের প্রতীক্ষা করিব এবং তাহা জ্ঞাত হইতে পারিলেই তৎপর শিক্ষণীয় বিষয় সম্বন্ধে আলোচনাতে প্রবৃত্ত হইব।

এস্থলে আনন্দের সহিত বিজ্ঞাপিত করিতেছি যে সম্প্রতি 'ব্রাহ্মবালিকা শিক্ষালয়ে' শ্রদ্ধেয় শাস্ত্রী মহাশয়ের প্রবর্ত্তিত মত কার্য্যে পরিণত করণার্থ কথঞ্চিৎ উদ্যোগ করা হইয়াছে। ইতি।

কলিকাতা, ফাল্গুন। ১৩০০। } বিনয়াবনত শ্রীঅপূর্ব্বচন্দ্র দত্ত

ব্রাহ্মসমাজ।

বিগত বড়দিনের ছুটিতে চেরাপুঞ্জিতে খাসিয়া পাহাড়স্থ ব্রাহ্মদিগের এক সম্মিলনী সভা হইয়াছিল। নানা স্থান হইতে পুরুষ ও রমণী প্রায় ৪০ জন উপস্থিত হইয়াছিলেন; ইঁহাদের অধিকাংশই খাসিয়া। বাবু নীলমণি চক্রবর্ত্তী সভাপতির কার্য্য করেন। ২৩এ হইতে ২৮এ ডিসেম্বর পর্য্যন্ত সম্মিলনীর কার্য্য হয়। তাহাতে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি আলোচিত হইয়াছিল;—(১) খাসিয়া মিশনকে অর্থ, পরামর্শ ও অন্যান্য উপায়ে সাহায্য করা। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তক প্রচারের সাহায্য করা। প্রত্যেকের ধর্ম্ম প্রচার করা। (২) প্রত্যেক সমাজের আবশ্যকীয় ব্যয়াদি স্থানীয় ব্রাহ্মদের বহন করা, পরস্পরের মধ্যে সদ্ভাব ও প্রীতিবর্দ্ধন করা এবং সকলে সমবেত ভাবে সমাজের উন্নতি সাধনে চেষ্টা করা। (৩) উপাসনা, প্রার্থনা, সংগীত, আত্মচিন্তা প্রভৃতি দ্বারা নিজে ধর্ম্ম সাধন করা এবং পরিবারে ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠা করা, স্ত্রী পুত্রাদি সকলকে ধর্ম্ম শিক্ষা দেওয়া। এই সম্মিলনীতে যাঁহারা যোগ দিয়াছিলেন সকলেই উপকার লাভ করিয়াছেন।

আমাদের শ্রদ্ধাস্পদ সভাপতি শ্রীযুক্ত আনন্দমোহন বসু মহাশয় স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য আগামী ৪ঠা এপ্রিল বিলাতযাত্রা করিবেন। তাঁহার ইচ্ছা এই সুযোগে ইউরোপের নানা দেশ পর্য্যটন করিয়া তথাকার সমাজ, নীতি ও ধর্ম্মের উন্নতি বিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভ করেন। আমরা আশা করি তাঁহার এ যাত্রায় যে কেবল স্বাস্থ্যেরই উন্নতি হইবে তাহা নহে, ব্রাহ্মসমাজেরও প্রভূত কল্যাণ সাধিত হইবে।

গত ২রা হইতে ৫ই মাঘ পর্য্যন্ত বর্দ্ধমান ব্রাহ্মসমাজের সাম্বৎসরিক উৎসব হইয়া গিয়াছে। এতদুপলক্ষে শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, নবদ্বীপচন্দ্র দাস ও অঘোরনাথ মুখোপাধ্যায় তথায় গমন করিয়াছিলেন। উৎসবে, উপাসনা, বক্তৃতা, নগরসংকীর্ত্তনাদি হয়। ইহার অধিকাংশ কার্য্যই ইঁহারা সম্পন্ন করেন। নববিধান প্রচারক শ্রীযুক্ত বঙ্গচন্দ্র রায় এবং আদি ব্রাহ্মসমাজের শ্রীযুক্ত ক্ষিতিন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় এই উৎসবের কতক কার্য্য সম্পন্ন করেন।

গত ৯ই হইতে ১১ই মার্চ্চ পর্য্যন্ত টাঙ্গাইল ব্রাহ্মসমাজের উৎসব সম্পন্ন হইয়াছে। এতদুপলক্ষে বাবু নবদ্বীপচন্দ্র দাস, কৃষ্ণকুমার মিত্র এবং অঘোরনাথ মুখোপাধ্যায় তথায় গমন করিয়াছিলেন। রাজকৃষ্ণকুমার মিত্র দুই দিন "প্রকৃত জীবন" ও চৈতন্য ও তাঁহার ধর্ম্ম", বিষয়ে বক্তৃতা করেন। এতদ্ভিন্ন উপাসনা, আলোচনা, পাঠ ব্যাখ্যা নগরকীর্ত্তন ও দ্বারে দ্বারে ঊষাকীর্ত্তনাদি হয়। নগরকীর্ত্তনে কৃষ্ণবাবু বক্তৃতা করেন। উৎসবের কার্য্য উক্ত বন্ধুত্রয় ও বাবু ইন্দুভূষণ রায় সম্পন্ন করেন। করুণাময় পরমেশ্বরের কৃপায় উৎসবে সকলেই উপকৃত হইয়াছেন।

প্রচার—পশ্চিম প্রচারযাত্রী দল ২৫শে ফেব্রুয়ারী ভাগলপুর হইতে রওনা হইয়া বাঁকিপুরে শ্রীযুক্ত বাবু ব্রহ্মদেব নারায়ণ ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের বাসায় অবস্থিতি করেন। সেখানে নিয়ত উপাসনা ও ছাত্রদিগকে লইয়া ধর্ম্মালোচনাদি করেন। একদিন শ্রীযুক্ত প্রকাশদেব স্থানীয় বেহার ন্যাসন্যাল কলেজ গৃহে উর্দ্দু ভাষায় ব্রাহ্মধর্ম্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। শ্রীযুক্ত কাশীচন্দ্র ঘোষাল এবং শ্রীযুক্ত সুন্দর সিংহ তথা হইতে মজফরপুর নগরে গমন করেন। তথায় আমাদের প্রিয় ব্রাহ্মভ্রাতা শ্রীযুক্ত বাবু কুঞ্জবিহারী বিশ্বাসের বাসায় ইঁহারা অবস্থিতি করেন। শ্রীযুক্ত বাবু হাজারিলাল ও কুঞ্জবাবু বাজারে উপাসনাদি করেন। স্থানীয় প্রধান উকিল শ্রীযুক্ত বাবু ত্রৈলোক্যনাথ বসুর বাসায় একদিন রাত্রে কীর্ত্তন, প্রার্থনা এবং আলোচনা হয়। মুখার্জ্জি সেমিনরী নামক ইংরাজি স্কুলগৃহে এক দিন নীতি সম্বন্ধে বক্তৃতা হয়। উর্দ্দু ভাষায় শ্রীযুক্ত সুন্দর সিং এবং বাঙ্গলাতে কাশী বাবু বলেন। স্থানীয় প্রধান প্রধান উকীল হাকিম ও অন্যান্য সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক ও ছাত্রমণ্ডলীতে প্রায় আড়াই শত লোক উপস্থিত হইয়াছিলেন। ইঁহারা তথা হইতে রওনা হইয়া বাঁকিপুর

হইয়া ৭ই মাঘ তারিখে গয়া গমন করেন। সেখানে আমাদের শ্রদ্ধেয় ব্রাহ্মবন্ধু বাবু চন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের বাসায় অবস্থিতি করেন। উক্ত বাসায় পারিবারিক উপাসনা হয়। একদিন স্থানীয় জেলাস্কুলগৃহে নীতি সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত সুন্দর সিং উর্দ্দু ভাষায় বক্তৃতা করেন। বক্তৃতা স্থলে স্কুলের ছাত্র ও অন্যান্য ভদ্রলোক প্রায় ১০০ শত শ্রোতা উপস্থিত হইয়াছিলেন। একদিন রবিবার রাত্রিতে ব্রাহ্মবন্ধু বাবু উমাচরণ সেনের বাসায় স্থানীয় ব্রাহ্মবন্ধুদিগকে লইয়া উপাসনা করা হয়। কাশী বাবু উপাসনা করেন। ইহাঁরা সেখান হইতে রওনা হইয়া আরা গমন করেন। ইতঃপূর্ব্বে বাঁকিপুর হইতে শ্রীযুক্ত প্রকাশদেব এবং গুরুদাস বাবু তথায় গিয়া ডেপুটি কলেক্টার শ্রীযুক্ত বাবু গঙ্গাগোবিন্দ গুপ্ত মহাশয়ের বাসায় অবস্থিতি করিতেছিলেন। শ্রীযুক্ত প্রকাশ দেব, শ্রীযুক্ত সুন্দর সিং, শ্রীযুক্ত শ্রীরঙ্গবিহারী লাল এবং শ্রীযুক্ত গুরুদাস চক্রবর্ত্তী তথায় কিছুদিন অবস্থিতি করিয়া বেহার ও উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে প্রচার করিবেন। শ্রীযুক্ত কাশীচন্দ্র ঘোষাল কলিকাতা পুনরাগমন করিয়াছেন। উক্ত দল শীঘ্রই লক্ষ্ণৌ অঞ্চলে প্রচারার্থে বাহির হইবেন, সংকল্প জানাইয়াছেন।

গত ১৯ ফাল্গুণ ঢাকা প্রচার আশ্রমে মাণিকদহ নিবাসী শ্রীমান দেবেন্দ্রমোহন ভৌমিকের পিতার আদ্যশ্রাদ্ধ ক্রিয়া ব্রাহ্ম পদ্ধতি অনুসারে সম্পন্ন করা হইয়াছে। শ্রীযুক্ত চণ্ডী-কিশোর কুশারী মহাশয় আচার্য্যের কার্য্য করেন। এই অনুষ্ঠান করিয়া দেবেন্দ্রমোহনকে পরীক্ষায় পড়িতে হইয়াছে। ঈশ্বর তাঁহাকে বলবিধান করুন।

শ্রীযুক্ত বাবু দ্বিজদাস দত্ত তাঁহার পুত্রের নামকরণ উপলক্ষে বরিশাল ব্রাহ্মসমাজে এক শত টাকা দান করিয়াছেন। অর্থাভাবে ব্রাহ্মসমাজের অনেক কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হইতেছে না; ব্রাহ্মগণ পারিবারিক অনুষ্ঠানাদির সময় যদি দত্ত মহাশয়ের এই দৃষ্টান্ত অনুসরণ করেন, তবে সমাজের যথেষ্ট সাহায্য হইতে পারে।

সাধনাশ্রমে বাবু হরিমোহন ঘোষালের পুত্রের নাম করণা-নুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়াছে। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী আচার্য্যের কার্য্য করেন। শিশুর নাম পূর্ণেন্দুমোহন রাখা হইয়াছে।

ফরিদপুরের অন্তঃর্গত কোটালিপাড়া প্রভৃতি স্থানে লোকের অতিশয় অন্নকষ্ট উপস্থিত হইয়াছে। তাহার বিবরণ আমরা প্রতি দিন সংবাদ পত্রে পাঠ করিতেছি। ফরিদপুর হইতে কয়েক জন সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের নিকট সাহায্যের জন্য আবেদন করিয়াছেন। তাহাদের পত্রে জানা যায় যে লোকের অন্নকষ্ট এতদূর হইয়াছে যে, কোন কোন স্থলে দরিদ্রা স্ত্রীলোক নিরুপায় হইয়া শিশু সন্তানের ক্লেশ দেখিতে না পারিয়া উদ্বন্ধনে আত্মহত্যা করিয়াছে; টুপুরিয়া নামক গ্রামে কয়েক জন স্ত্রীলোক আহারাভাবে প্রাণত্যাগ করিয়াছে; একজন স্ত্রীলোক পেটের জ্বালায় আপন কন্যাকে একজন কুলটা স্ত্রীলোককে দান করিয়াছিল, ফরিদপুরের কতিপয় ভদ্রলোক তাহা জানিতে পারিয়া কন্যাটীকে ফিরাইয়া আনিয়াছেন; অনেকগুলি বিধবা স্ত্রীলোক অনন্যোপায় হইয়া বহুদূর হইতে হাঁটিয়া ফরিদপুর সহরে আসিয়াছে; "ফরিদপুর পারিবারিক সংস্থান সমিতির" সম্পাদক তাহাদিগের উপায় করিতে না পারিয়া বিব্রত হইয়া পড়িয়াছেন। ঐ সকল বিধবার নাম ও ধাম আমাদের নিকট প্রেরিত হইয়াছে। এই সকল বিবরণ পাঠ করিয়া সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ অন্নকষ্টগ্রস্ত ব্যক্তিগণের সাহায্য করা আবশ্যক বোধ করিয়াছেন।

ব্রাহ্মবালিকা বোর্ডিং ও শিক্ষালয়—বর্ত্তমান বর্ষের প্রারম্ভ হইতে ব্রাহ্মবালিকা শিক্ষালয় ও বোর্ডিংএর কার্য্য নূতন প্রণালীতে আরম্ভ হইয়াছে। প্রণালীটীর মধ্যে প্রধান প্রধান দ্রষ্টব্য বিষয় নিম্নে প্রদর্শিত হইতেছে। এই প্রণালী অনুসারে বালিকাগণ সপ্তম বৎসরে পাঠ আরম্ভ করিয়া ১৬ বৎসর বয়সে পাঠ সাঙ্গ করিতে পারিবে। এই নয় বৎসর কাল প্রধানতঃ ৩ ভাগে বিভক্ত হইবে। প্রথম চারি বৎসর প্রধানতঃ বাঙ্গালা ভাষাতেই শিক্ষা দেওয়া হইবে, কেবলমাত্র চতুর্থবর্গে ইংরাজী প্রথম পাঠ্য দুই একখানি পুস্তক পড়াইয়া দেওয়া হইবে। এই চারি বৎসর অন্তে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ একটী পরীক্ষা করি-বেন ও সার্টিফিকেট দিবেন। এই চারি বৎসরে বালিকাগণ বাঙ্গালা লিখিতে পড়িতে শিখিবে, ও অঙ্ক, ইতিহাস, ভূগোল, সূচীকার্য্য, সংগীত, পদার্থবিদ্যার স্থূল স্থূল তত্ত্ব, নীতি ও ধর্ম্মের তত্ত্ব প্রভৃতি বাঙ্গালাতে শিক্ষা করিবে। তৎপরে আর তিন বৎসর দ্বিতীয় কোর্স। এই তিন বৎসরেও বাঙ্গালার প্রতি বিশেষ মনোযোগ থাকিবে কিন্তু সেই সঙ্গে ইংরাজীতেও পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক মনোযোগ দেওয়া হইবে। এই কোর্সেও ধর্ম্ম ও নীতি শিক্ষার বিশেষ ব্যবস্থা আছে। এই তিন বৎস-রান্তে সমাজ আবার একবার পরীক্ষা করিবেন ও দ্বিতীয় সার্টিফিকেট দিবেন। এখান হইতে বালিকাগণ দুই দিকে গমন করিবে। যাহারা বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ পরীক্ষাতে গমনেচ্ছু তাহারা দুই বৎসরে এণ্ট্রান্স পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইবে, আর যাহারা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশেচ্ছু নহে তাহারা আর দুই বৎসর বিশেষ কোর্সে প্রস্তুত হইবে। অর্থাৎ ইংরাজী সাহিত্য, ইতিহাস, সংস্কৃত, ধর্ম্মবিজ্ঞান প্রভৃতি যে কোনও একটী বা দুইটী বিষয় লইতে চাহিবে তাহাকে তাহা দেওয়া হইবে; এবং সেই কোর্সের অনুসারে শিক্ষা দেওয়া হইবে। এই কোর্সের শেষে সমাজ পুনরায় পরীক্ষা করিবেন ও শেষ সার্টিফিকেট দিবেন। এই সার্টিফিকেট হাতে থাকিলে যদি কোনও বালিকা কর্ম্ম কাজ করিতে চাহেন, তাঁহার কর্ম্ম কাজ পাইবার সুবিধা হইবে। দ্বিতীয়তঃ সমাজও জানিতে পারি-বেন বালিকাদিগের শিক্ষা কি প্রকার হইয়াছে। এই নূতন প্রণালার আর একটী গুণ এই, ইহার গবর্ণমেণ্টের প্রবর্ত্তিত নূতন প্রণালীর সহিত সাদৃশ্য আছে, সুতরাং গবর্ণমেণ্টের অবলম্বিত কোর্স গুলিও গ্রহণ করা হইয়াছে। তদ্দ্বারা গবর্ণ-মেণ্টের নিকট কিছু সাহায্য পাইবার সম্ভাবনা আছে। এই নূতন প্রণালীর দ্বারা আমাদের মধ্যে সকল শ্রেণীর মতের সমতা বিধান করা হইয়াছে। এক্ষণে সকলে শিক্ষালয়টীর উন্নতি বিধানে মনোযোগী হইয়া ইহাকে রক্ষা করুন।

বিজ্ঞাপন।

আগামী ১২ই এপ্রিল বৃহস্পতি বার অপরাহ্ন ৫½ ঘটিকার সময় ১৩নং মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীটস্থ সিটি কলেজ ভবনে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অধ্যক্ষ সভার প্রথম ত্রৈমাসিক অধিবেশন হইবে।

বিবেচ্য বিষয়।

১। কার্য্যনির্ব্বাহক সভার প্রথম ত্রৈমাসিক কার্য্যবিবরণ এবং আয় ব্যয়ের হিসাব।

২। অধ্যক্ষ সভার সভ্য বাবু চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পদ পরিত্যাগ হেতু শূন্য পদ পূরণ।

৩। হিসাব পরিদর্শক নিয়োগ।

৪। বিবিধ।

সাঃ ব্রাঃ সমাজ আফিস
১৫ই মার্চ্চ
১৮৯৪

শ্রীরজনীনাথ রায়
সম্পাদক।

২১১ নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, ব্রাহ্মমিশন যন্ত্রে শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দত্ত কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও ২ই চৈত্র প্রকাশিত।

তত্ত্ব-কৌমুদী

ধর্ম্ম ও সমাজতত্ত্ব বিষয়ক পাক্ষিক পত্রিকা।

২৪শ সংখ্যা। ১৬শ ভাগ।

১৬ই চৈত্র, বৃহস্পতিবার, ১৮১৫ শক, ব্রাহ্ম সম্বৎ ৬৫।

বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২৸০
মফস্বলে ৩৲
প্রতি খণ্ডের মূল্য ৵০

প্রার্থনা।

হে প্রভো! আমরা কেন অল্পে সন্তুষ্ট হইয়া পড়ি? ঊর্ণনাভির জালে পতিত মক্ষিকার ন্যায় কেন অনেক সময় ভগ্নোদ্যম হইয়া সংগ্রাম পরিত্যাগ করি? এবং অল্প জ্ঞান, অল্প প্রেম, অল্প বিশ্বাস ও অল্প বৈরাগ্যে সন্তুষ্ট হইয়া গা ঢালিয়া দি? এই অল্প-সন্তুষ্টতা আমাদের জীবনে একটা ব্যাধির মত হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অতি উচ্চ উচ্চ বিষয়ের আলোচনা চলিতেছে, অতি মহৎ মহৎ আদর্শসকল আমাদের সমক্ষে আসিতেছে, সমুদয় দেখিতেছি শুনিতেছি, আলোচনা করিতেছি, প্রশংসা করিতেছি, কিন্তু নিজেরা সেই পূর্ব্বকার হীন ও মলিন ভাব লইয়াই সন্তুষ্ট হইয়া থাকিতেছি। দিন দিন যে সকল উচ্চ উচ্চ সত্য রসনাতে প্রকাশ পাইতেছে, ও কর্ণে প্রবেশ করিতেছে, তাহার দুইটী কার্য্যে পরিণত হইলে জীবনের অবস্থা ফিরিয়া যায়, কিন্তু সে চেষ্টা আমাদের আসিতেছে না। এই ঘোর ব্যাধিতে আমাদিগকে অন্তঃসার-বিহীন করিয়া ফেলিতেছে। তুমি আমাদিগকে এই ব্যাধি হইতে রক্ষা কর; যেন আমরা বিনীত, ব্যাকুল, ও তাজা মন লইয়া সত্যের নিকটবর্ত্তী হইতে পারি এবং প্রাণপণে তাহা সাধন করিতে সচেষ্ট হই। আমাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ কর।

সম্পাদকীয় মন্তব্য।

শ্রদ্ধা ও অনুকরণ—ধর্ম্মজীবনে কোনও আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ করিলে যথাসাধ্য তাহার অনুকরণ করিতে চেষ্টা করিবার জন্য যে আমরা দায়ী এ কথা আমরা অনেক সময়ে ভুলিয়া যাই। লোকে যেমন দূর হইতে একটা উৎকৃষ্ট ছবির প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া তাহার প্রশংসা করে, এবং পরক্ষণে তাহা ভুলিয়া বিষয়ান্তরে ব্যাপৃত হয়, সেই ক্ষণিক আনন্দ ও প্রশংসার অতিরিক্ত তাহাদের করিবার কিছু থাকে না, সেইরূপ আমরাও অনেক সময় মহাজনগণের চরিত্র আলোচনা করি, যেন ক্ষণিক আনন্দ লাভ করা ও প্রশংসা করার অতিরিক্ত আমাদের করিবার কিছু নাই। বক্তা উজ্জ্বল বর্ণে চৈতন্যের প্রেম, যীশুর বিশ্বাস, মহম্মদের দাস্যভাব, বুদ্ধের বৈরাগ্য প্রভৃতির ছবি চিত্রিত করিলেন, শ্রোতাগণ পুলকিত হইয়া বলিলেন—"বাঃ কি সুন্দর ছবি!" এইখানেই যেন সকল দায়িত্ব পর্য্যবসিত হইয়া গেল। তৎপরে বক্তা ও শ্রোতা উভয়েই বিষয়ান্তরে ব্যাপৃত হইলেন; কাহারই আর ভাবিবার বা করিবার কিছু রহিল না। আমরা যেন অনেকটা এইরূপ ভাবে মহাজনদিগের চরিত্রের আলোচনা করিতেছি। ব্রাহ্মগণ যেন জগতের সমুদায় মহাজনগণের মুরুব্বি (patron) হইয়া বসিয়াছেন। নিজেরা এক উচ্চস্থানে বসিয়া ইহাঁদিগের প্রতি কিঞ্চিৎ অনুগ্রহ দৃষ্টি করিয়া ইহাঁদের গুণাবলী স্বীকার করতঃ জগতের নিকট আপনাদের উদারতার পরিচয় দিতেছেন।

এই এক প্রকার ভাব, আর বিনীত শিষ্যত্বের আর এক প্রকার ভাব। বিনয়ে অবনত হইয়া ইহাঁদের গুণাবলী স্মরণ করিতেছি, এবং প্রাণপণে ঐ বিশ্বাস, বৈরাগ্য প্রেম প্রভৃতি জীবনে লাভ করিবার চেষ্টা করিতেছি। আমাদের মধ্যে এই বিনয়ের অভাব বড়ই লক্ষ্য করিতেছি। কি এক প্রকার অহমিকার উষ্মা যেন আমাদের সকল কার্য্যের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া আমাদিগকে অসার ও প্রেমবিহীন করিয়া দিতেছে। আত্ম-পরীক্ষা ও অনুতাপ হৃদয়ে জাগ্রত থাকিলে মানবের মুখে যে বিনয়ের ছায়া পড়ে, ব্রাহ্ম-মুখে সেই বিনয়ের ছায়া দেখিতে অত্যন্ত ইচ্ছা হয়। আত্ম-পরীক্ষা ও অনুতাপে যাহাদের হৃদয় পূর্ণ থাকে, তাহারা পরদোষ চর্চ্চাতে অধিক সময় দিতে পারে না। এই একটী সংকেতের দ্বারা আমরা সর্ব্বদাই আপনাদিগকে পরীক্ষা করিতে পারি। যদি প্রত্যেকে আপনাকে নিম্নলিখিত প্রশ্ন করি,—"আমরা দশজনে একত্র হইলে নিজ নিজ জীবনের দুর্গতির কথা অধিক হয় কি পর-দোষ কীর্ত্তন অধিক হয়?" তাহা হইলেই বুঝিতে পারি স্রোত কোন দিকে বহিতেছে। আমরা সকলে ঈশ্বর-চরণে এই প্রার্থনা করি যে তিনি আমাদের বিনয় ও ব্যাকুলতাকে সর্ব্বদা জাগ্রত রাখুন।

গুণত্রয়—আমাদের দেশে সত্ত্ব রজঃ তমঃ এই তিন প্রকার গুণকে দার্শনিক পণ্ডিতেরা কল্পনা করিয়াছেন। ইহার মধ্যে তমোগুণ সর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট।

তম—অন্ধকার, যে ভাবের দ্বারা জ্ঞানকে আবৃত করিয়া রাখে। ইহার ধর্ম্ম মোহ। যে সকল মানুষ তমোভাবাপন্ন তাহারা স্থূল ইন্দ্রিয়ের অতীত কিছু বুঝিতে পারে না; স্থূল সুখের অতিরিক্ত কিছু জানে না; স্থূল পদার্থ ও ইন্দ্রিয়ের বিষয় লইয়াই বাস করে; আসক্তিতে অন্ধপ্রায় হইয়া আবদ্ধ থাকে; ইন্দ্রিয় সুখের বিষয়েতেই মুগ্ধ থাকে। এই হইল তমোগুণের কার্য্য।

রজোগুণের ধর্ম্ম অহং বুদ্ধি। রজোগুণ-সম্পন্ন ব্যক্তির কার্য্যে উৎসাহ এবং অহং প্রাধান্য প্রকাশ পায়। মানুষ তম হইতে রজোগুণের মধ্যে যখন প্রবেশ করে,তখন তাহার সকল কার্য্যেই অহং ভাব প্রকাশ পায়। বাহিরের জাঁক জমক, আমি সব করিতেছি, কেবল এই ভাবে পরিপূর্ণ। এই গুণে প্রবেশ করিলে বুদ্ধি কিছু খোলে, মানুষ কিছু উপরে উঠিয়া আসে।

কিন্তু ইহা হইতে প্রধান সত্ত্বগুণ। ইহার ধর্ম্ম পবিত্রতা, নিষ্ঠা। এই গুণসম্পন্ন লোক স্বার্থবিরহিত, সর্ব্বদা মঙ্গলভাবে পূর্ণ। নিজের সুখ স্বার্থ বিসর্জ্জন দিয়া অপরের মঙ্গল সাধন করা তাঁহার স্বভাব। তিনি ধর্ম্ম করেন, কোন স্বার্থের জন্য নহে, তাহাতে তাঁহার আমিত্ব নাই, তাঁহার সকলি ঈশ্বরার্থে।

এই যে তিন প্রকার গুণের কথা বলা হইল, ইহার প্রথমটি তম,—এই তম মানুষের জ্ঞানকে আবৃত করে, মানুষকে ইন্দ্রিয়-সুখে মগ্ন করে এবং সেই ইন্দ্রিয়ের বিষয় হইতে যে দূষিত প্রবৃত্তিরূপ বাষ্প উত্থিত হয় তাহাতে মানবাত্মাকে অন্ধ করিয়া রাখে। তাহাকে ইন্দ্রিয়ের অতীত কোন বিষয় ভাবিতে দেয় না; পবিত্র বিষয় চিন্তা করিতে দেয় না; ধর্ম্ম করিতে দেয় না, ইহা নিকৃষ্টাবস্থা।

ইহার পর লৌকিক ক্রিয়া কর্ম্মে যাহারা লিপ্ত, যাহারা কর্ম্মফল কামনায় ধর্ম্মের কার্য্য করে, বাহিরের কার্য্য ও অনুষ্ঠান করে এবং সকল কাজেই অহং বুদ্ধি প্রবল থাকে, তাহারাও কিছু ভাল। ইহা রজোগুণের কার্য্য।

কিন্তু ইহার পর সত্ত্বগুণ, ব্রহ্মদর্শনের অবস্থা। ইহাতে কর্ম্ম থাকে কিন্তু কর্ম্মফলের কামনা থাকে না; লৌকিক ক্রিয়া থাকে কিন্তু মন তাঁহার জন্যই ব্যাকুল হয়। সর্ব্ব প্রকারের স্বার্থ হিংসা, দ্বেষ বিলুপ্ত হয়, প্রেমে হৃদয় পূর্ণ হয়, তাঁহাতেই চিত্ত নিমগ্ন থাকে।

যতক্ষণ পর্য্যন্ত এই অবস্থা না পাওয়া যায় ততক্ষণ ধর্ম্মের বিমল সুখ পাওয়া যায় না। যখন বাসনা যায়, বাহিরের ক্রিয়া কলাপ যায়, নিঃস্বার্থ ভাবে তাঁহার পূজার জন্য প্রাণ ব্যাকুল হয়, তখনই বিমলানন্দ, সুখ পাওয়া যায়।

নীরব সাধন—নির্জ্জন বনে একাকী একটী গৃহে বসিয়া রহিয়াছি, বাহিরে সবেগে এক পসলা বৃষ্টি হইতেছে। ঝিমির ঝিমির ঝিম, বৃষ্টি ধারা তরুশিরে পড়িতেছে, পত্রে পত্রে পড়িতেছে, টপ টপ বৃক্ষতলে ঝরিতেছে. এক ধারা না পড়িতে আর এক ধারা আসিতেছে, তরু পত্রগুলি ধারার আঘাতে নত হইয়া পড়িতেছে, যেন পরম সুখে সেই সুস্নিগ্ধ ধারা সম্ভোগ করিতেছে! অর্দ্ধ ঘণ্টা পূর্ব্বে ঐ সকল তরুপত্র প্রখর তাপে ম্লান ও ধূলিতে সমাচ্ছন্ন ছিল, আর অর্দ্ধ ঘণ্টার মধ্যে কি পরিবর্ত্তন! তরুপত্রে সহস্র ধারা পড়িতেছে দেখিয়া ও মনে সুখ হইতেছে. যেন বৃক্ষের সঙ্গে মাথা পাতিয়া তাহা নিজ মস্তকে লইতেছি। মনে প্রশ্ন উদিত হইল বৃক্ষটীর প্রতি প্রভুর এত করুণা কেন? সে কি করিয়াছে যে এত অনুগ্রহ পাইতেছে। মনেই উত্তর হইল—বৃক্ষ ত এই অনুগ্রহ পাইবারই উপযুক্ত। বৃক্ষ কথা বলে না, আমাদের ন্যায় লম্বা লম্বা প্রার্থনা করে না, ঈশ্বর চরণে বড় বড় সংকল্প ও বড় বড় প্রতিজ্ঞা জানায় না; কিন্তু নিঃশব্দে তাঁহার বিধি পূর্ণ করিতেছে; বৃক্ষজীবনের যে কার্য্য তাহা নীরবে সাধন করিতেছে; সুতরাং সুসময়ে তাঁহার কৃপা বারিও পাইতেছে। আমরা ও যদি নীরবে আমাদের জীবনের বিধিকে পূর্ণ করিয়া যাইতে পারি, তাহা হইলে সুসময়ে তাঁহার সাহায্য পাইতে পারি। কিন্তু ভাবিয়া দেখি আমাদের অনেকের প্রকৃতি অতিশয় অসার. যদি মনে আকাঙ্ক্ষা করি একগুণ, করিব করিব বলিয়া হাঁক ডাক করি দশগুণ। কার্য্য করিবার পূর্ব্বেই গগন-মেদিনী ফাটাইয়া তুলি। ফলে কার্য্য অল্পই হয়। নীরব সাধনের এক প্রকার সৌন্দর্য্য আছে, এক প্রকার গাম্ভীর্য্য আছে, এক প্রকার প্রভাব আছে। ঈশ্বর করুন আমরা দিন দিন যেন তাহা অধিক পরিমাণে অনুভব করিতে পারি।

ঈশ্বরে আশান্বিত হও—সময়ে সময়ে পরমেশ্বরের বিধিপালন করিতে গিয়া আমাদের মন অবসন্ন হইয়া পড়ে, যেন নিরাশ্রয় হইয়া পড়ি। তখন এরূপ মনে হয় যেন ঈশ্বর সাহায্য করিতেছেন না। বিপদের উপর বিপদ যাইতেছে, চারিদিক অন্ধকারময়; নিরাশা আসিয়া প্রাণকে অস্থির করিয়া তুলিতেছে; চেষ্টা করিয়াও কার্য্যে ফল লাভ করিতে পারি না। এই অবস্থা হইতে মুক্তি লাভ করিবার জন্য নিজে যে সকল উপায় অবলম্বন করিতেছি, সকলই ব্যর্থ হইয়া যাইতেছে। একদিকে যখন এরূপ অবসন্নতা এবং কার্য্যে ফলহীনতা, তখন আবার চারিদিকে লোকের অবিশ্বাস। তাহারা আমার অবস্থা দেখিয়া বলে "তুমি যার উপর নির্ভর করিয়াছিলে, দেখ সে কিছু নয়।" এসময় মানুষের মন নিরাশ হইয়া যায়। এসময় যদি মনকে বলি "Hope thou in the Lord" তুমি ঈশ্বরে আশান্বিত হও, যদি তাঁহার উপর নির্ভর করিয়া চলি, তাঁহাকে আমার করিতে পারি, তবেই মঙ্গল। বিপদ আসিয়াছে তাহাতে কি? তুমি আশান্বিত হও। দুর্দ্দিন আসিয়াছে, তাহাতে তুমি ভীত হইও না আশান্বিত হও। কৃষক যেমন বীজ বপন করিয়া আশা করে, ফল ফলিবেই, বিজ্ঞানবিৎ যেমন আশা করেন তাঁহার পরীক্ষায় ফল ফলিবেই, সেইরূপ ধর্ম্ম জগতেও

আশা চাই। তুমি তাঁহার উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়া আশান্বিত হও। তাঁহাকে মঙ্গলময় বিধাতা জানিয়া, তাঁহাকে বিপদের সহায় জানিয়া, তাঁহাকে পরিত্রাতা ও প্রেমের আধার জানিয়া আশান্বিত হও। তুমি ফলাফলের দিকে কেন দৃষ্টি কর? তুমি কতটুকু জানিতে পার যে ফলাফল দেখিবে? অনেকে নিষ্ফল হইয়াছে তাহাতে কি? তুমি আশা কর। আশা কর যে একজন আছেন; এমন একজন আছেন যিনি মানবের আশ্রয় স্থল; আশা কর একজন কর্ত্তা আছেন; এই আশা করিয়া তাঁহার বিধি পালন কর। সত্যকে আলিঙ্গন কর, পাপকে পরিত্যাগ কর, অবিশ্বাস দূর কর এবং তাঁহার উপর আশা স্থাপন কর। ফলের জন্য ভাবিও না, তিনি তাহা দিবেন। ঈশ্বর করুন, আমরা তাঁহার বিধি পালন করিতে সক্ষম হই।

খাসিয়া মিশন—কিছু দিন পূর্ব্বে খাসিয়া মিশনের কার্য্য বিবরণ সম্বন্ধে "খাসিয়া জাতি ও খাসিয়া মিশন" নামে এক খানি পুস্তিকা প্রকাশিত হইয়াছে। খাসিয়া জাতি অজ্ঞতা এবং কুসংস্কারের মধ্যে নিমগ্ন রহিয়াছে। তাহাদের কোনও ধর্ম্ম, ধর্ম্মশাস্ত্র বা ধর্ম্ম-শিক্ষক নাই। রোগ বা বিপদের সময় স্বার্থানুরোধে তাহারা নানা প্রকার উপদেবতার পূজা করিয়া থাকে। পড়িবার কোনও পুস্তক তাহাদের ছিল না, লিখিবার কোনও ভাষাও তাহারা জানিত না। এই সকল বিষয় চিন্তা করিলে তাহাদের অজ্ঞ অবস্থার কথা কিয়ৎ পরিমাণে বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু তাহাদের এই অবস্থা ক্রমে ক্রমে অনেক পরিমাণে পরিবর্ত্তিত হইতে চলিয়াছে। বিগত অর্দ্ধ শতাব্দীর অধিক কাল খৃষ্টীয় ধর্ম্ম-প্রচারকগণ খাসিয়া পাহাড়ে আসিয়া নানা প্রকারে তাহাদের উন্নতির জন্য কার্য্য করিয়াছেন। খাসিয়া ভাষায় ইংরাজী অক্ষর প্রবর্ত্তিত করিয়া কয়েক খানি পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন, নানা স্থানে পাঠশালা স্থাপন করিয়া খাসিয়াদিগকে শিক্ষা দিতেছেন, ঔষধালয় খুলিয়া তাহাদের রোগের চিকিৎসার উপায় করিয়াছেন এবং অনেক লোককে খৃষ্টীয় ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছেন। কিন্তু সরল প্রকৃতি খাসিয়াগণ খৃষ্টীয় ধর্ম্মের ত্রিত্ববাদ বুঝিতে না পারিয়া উহাতে পরিতৃপ্ত হইতে পারিতেছে না। তাহারা উপদেবতার পূজা করে বটে, কিন্তু তাহারা সর্ব্বদাই স্বীকার করে যে একমাত্র ঈশ্বরই সকলের স্রষ্টা, পাতা ও পরিত্রাতা। তাই ব্রাহ্মধর্ম্মের মতের সঙ্গে তাহাদের হৃদয়ের সম্পূর্ণ সহানুভূতি। পরমেশ্বরের কৃপায় অতি আশ্চর্য্য কৌশলে খাসিয়া পাহাড়ে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রবেশ করিয়াছে এবং পাঁচ বৎসরের মধ্যে অল্পে অল্পে তাহা তাহাদের মধ্যে বদ্ধমূল হইতেছে। খৃষ্টীয়ানদিগের ন্যায় আমাদের অর্থবল এবং কার্য্য করিবার লোক নাই; তথাপি আশাতীত ভাবে এই অল্প সময়ের মধ্যে আমাদের ক্ষুদ্র মিশন উন্নতি লাভ করিয়াছে। পূর্ব্বে একজন মাত্র কার্য্য করিবার লোক ছিলেন, এক্ষণে অপর তিন জন (একজন বাঙ্গালী এবং দুই জন খাসিয়া) তাঁহার সঙ্গে যোগ দিয়াছেন। কোনও খাসিয়া খৃষ্টীয় ধর্ম্ম প্রচার করিতে আসিলে তাঁহাকে যথেষ্ট পরিমাণে বেতন প্রদান করা হইয়া থাকে। যে দুই জন খাসিয়া বন্ধু খাসিয়া মিশনের কার্য্য করিতে আসিয়াছেন তাঁহারা নানা প্রকার অভাব ও অসুবিধার মধ্যে নিঃস্বার্থ ভাবে পরমেশ্বরের নামে কার্য্য করিতেছেন। খাসিয়া ভাষায় ব্রাহ্মধর্ম্ম সম্বন্ধে পাঁচ খানি পুস্তক রচিত হইয়াছে। ছয় স্থানে ছয়টী ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত হইয়াছে। তিন স্থানের খাসিয়া বন্ধুগণ আপনারাই আপনাদের সমাজের কার্য্য চালাইতেছেন। একটী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়া তাহাতে বালকবালিকা এবং যুবাদিগকে জ্ঞান শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। একটী দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। অনেক রোগী তথা হইতে প্রতিদিন নিয়মিতরূপে ঔষধাদি পাইতেছে। এতদ্ব্যতীত বালকবালিকাদিগের জন্য একটী ক্ষুদ্র নৈতিক বিদ্যালয় খুলিয়া তাহা হইতে নীতি ও ধর্ম্ম শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। স্থানে স্থানে অনেকগুলি পুরুষ ও রমণী ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন, এবং অন্যান্য অনেকে ক্রমে ক্রমে ব্রাহ্ম ধর্ম্মের দিকে আকৃষ্ট হইতেছেন। পাহাড়ের নানা স্থানের লোক এক বাক্যে স্বীকার করিতেছে যে ব্রাহ্মধর্ম্মই একমাত্র পরিত্রাণ-প্রদ সত্য ধর্ম্ম। এইরূপে দেখা যাইতেছে যে প্রভু পরমেশ্বরের কৃপা অবতীর্ণ হইয়া অল্প সময়ের মধ্যে খাসিয়া মিশনকে কেমন সবল ও পরিপুষ্ট করিয়াছে!

নানা ভাবে খাসিয়া মিশনের উন্নতি হইয়াছে বটে, কিন্তু অর্থাভাবে অনেক সময় আশানুরূপ কার্য্য হইতে পারিতেছে না। চেরাপুঞ্জিতে একটী সমাজ মন্দিরের নিতান্ত প্রয়োজন। যে গৃহে উপাসনাদি হয়, তাহাতে অধিক লোকের স্থান হয় না। এই জন্য অর্থের অভাবে বিশেষ ক্ষতি হইতেছে। যে প্রচার-আশ্রম নির্ম্মিত হইতেছে তাহারও নির্ম্মাণ কার্য্য শেষ হইতে পারিতেছে না। যাঁহারা খাসিয়া মিশনের কার্য্য করিতেছেন, তাঁহাদিগকেও অনেক অভাবের সঙ্গে সংগ্রাম করিতে হইতেছে। ব্রাহ্মধর্ম্ম সম্বন্ধীয় পুস্তকাদি প্রচার, একটী চিকিৎসালয় গৃহ নির্ম্মাণ এবং নূতন ২।৩টী সমাজ গৃহ নির্ম্মাণের ও বিশেষ আবশ্যক হইয়াছে। খাসিয়া জাতির কল্যাণ সাধনের জন্য সুদূরস্থ ইংলণ্ড হইতে খৃষ্টীয়ানগণ কত প্রকারেই সাহায্য করিতেছেন! আমাদের প্রিয় ব্রাহ্মধর্ম্ম আমাদেরই স্বদেশীয় খাসিয়া জাতিকে দিবার জন্য যদি আমরা তাহার কিয়দংশ সাহায্যও করিতে চেষ্টা করি, তাহা হইলেও যথেষ্ট হইতে পারে।

সম্পাদকীয় ও প্রাপ্ত প্রবন্ধ।

বল্মীকমিব পুত্তিকাঃ।

প্রাচীন নীতিশাস্ত্রে একটী মহোপদেশ এই আছে:—

"ধর্ম্মংশনৈঃসঞ্চিনুয়াৎ বল্মীকমিব পুত্তিকাঃ।"

অর্থ—পুত্তিকারা যেরূপ ধীরে ধীরে বল্মীক নির্ম্মাণ করে সেইরূপ ধীরে ধীরে ধর্ম্মকে সঞ্চয় করিবে। মানব-চরিত্র অতি

ধীরে ধীরেই গঠিত হইয়া থাকে। অনেক সংগ্রাম ও অনেক আশা নিরাশা ভোগ করার পরে ধর্ম্মজীবনে একটু উন্নতিলাভ করিতে সমর্থ হওয়া যায়। বিধাতার বিধিই এই প্রকার। কেহ কেহ হয়ত জিজ্ঞাসা করিবেন, ব্রহ্মসঙ্গীতে আছে,—

"নিমেষে পাতকী যায় পুণ্যধামে"

সে কি তবে কল্পনা বা কবির অত্যুক্তি? চিরদিন ভক্ত-মুখে শুনিয়া আসিতেছি, প্রভু নিমেষের মধ্যে পাতকীকে তরাইয়া লইয়া থাকেন, তাহা কি বাক্যের অলঙ্কার মাত্র? তাহা বাক্যের অলঙ্কার মাত্র নহে। তাহার মধ্যে সত্য আছে। এক মুহূর্ত্তে পাপীর মন পাপ-পথ পরিত্যাগ করিয়া ফিরিতে পারে; এক মুহূর্ত্তে মোহনিদ্রাভিভূত মানবের নিদ্রা ভাঙ্গিতে পারে; এক মুহূর্ত্তে মানুষের আকাঙ্ক্ষা সংসার হইতে ফিরিয়া ঈশ্বরমুখীন হইতে পারে। বহুসংখ্যক লোকের জীবনে এ কথার প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। সাধুজনের সঙ্গে গিয়া বা কোনও একটা বিপদে বা কোনও একটা আকস্মিক ঘটনাতে পড়িয়া তাহাদের চিত্ত জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছে। এরূপ দৃষ্টান্ত ইতিবৃত্তে অনেক পাওয়া গিয়াছে। মহাত্মা বুদ্ধ একদিন স্বীয় পিতার রাজপুরী হইতে নির্গত হইবার সময়ে জরামৃত্যুর ছবি দেখিয়া হঠাৎ বৈরাগ্যভাবে পূর্ণ হইয়াছিলেন। সেণ্ট ডামস্কস্ নগরাভিমুখে যাইবার সময় বিদ্যুৎ ও বজ্রাঘাতের মধ্যে পড়িয়া হঠাৎ পরিবর্ত্তিত হইয়াছিলেন। লালাবাবু সন্ধ্যাকালে একটী সামান্য স্ত্রীলোকের একটী কথা শুনিয়া জন্মের মত ফকীর হইয়াছিলেন। লুথার স্বীয় সমক্ষে স্বীয় বন্ধুকে বজ্রাঘাতে হত হইতে দেখিয়া পরিবর্ত্তিত হইয়াছিলেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ শ্মশানে শবদাহ করিতে গিয়া পরিবর্ত্তিত হইয়াছিলেন। এইরূপ অনুসন্ধান করিলে হঠাৎ হৃদয় পরিবর্ত্তনের অসংখ্য দৃষ্টান্ত প্রাপ্ত হওয়া যায়। সুতরাং "নিমেষে পাতকী যায় পুণ্য-ধামে" এ কথাটা সম্পূর্ণ অলীক বা কবির কল্পনা প্রসূত নহে।

কিন্তু ইহার মধ্যে একটী কথা আছে। মানব-হৃদয় এক মুহূর্ত্তে ফিরিতে পারে, কিন্তু পুণ্যে প্রতিষ্ঠিত হওয়া ও ধর্ম্ম-জীবনকে গঠন করা একদিনের কর্ম্ম নহে; তাহা পুত্তিকা-দিগের বল্মীক নির্ম্মাণের ন্যায় শ্রমসাধ্য ও কাল সাপেক্ষ। এক মুহূর্ত্তে একজনের পাপের প্রতি ঘৃণা জন্মিয়া পুণ্যের প্রতি আকাঙ্ক্ষার উদয় হইতে পারে, কিন্তু পাপ-পথকে সম্পূর্ণরূপে বর্জ্জন করিয়া পুণ্যপথে প্রতিষ্ঠিত হওয়া একদিনের কার্য্য নহে। ধর্ম্মজীবন গঠনের চেষ্টাতে প্রবৃত্ত হইলেই আত্ম-নিগ্রহ করার প্রয়োজন হয়। আত্মনিগ্রহের প্রয়াস উপস্থিত হইলেই দেখিতে পাওয়া যায় যে, অভ্যাস-শৃঙ্খল সকল শৃঙ্খল অপেক্ষা দৃঢ়। যে ব্যক্তি বহুদিন কোনও প্রবৃত্তি বিশেষের চরিতার্থতাতে অভ্যস্ত হইয়াছে, তাহার পক্ষে সেই প্রবৃত্তি বিশেষের দাসত্ব হইতে নিষ্কৃতি লাভ করা বড় সহজ নহে। যখন সে সর্ব্বান্তঃকরণে তাহাকে দমন করিতে চাহিতেছে এবং সে জন্য কাতর অন্তরে পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতেছে, তখনও দেখা যায় যে, সে বার বার সেই পুরাতন শত্রু কর্ত্তৃক পরাজিত হইতে থাকে; তাহার পুরাতন প্রবৃত্তি প্রতিজ্ঞার রজ্জু ছিন্ন ভিন্ন করিয়া তাহাকে পুরাতন দুর্ব্বলতার মধ্যে পতিত করিতে থাকে। ব্যাকুল ও মুক্তি-পিপাসু আত্মার পক্ষে এই অবস্থা অতিশয় যন্ত্রণাদায়ক। মন স্বর্গের পবিত্র বায়ুতে বিচরণ করিতে চাহিতেছে, কিন্তু রক্তমাংসের দুর্ব্বলতা তাহাকে বার বার কর্দ্দমে বিলুণ্ঠিত করিতেছে। এইরূপে বার বার প্রতিজ্ঞা, বার বার প্রার্থনা করিয়াও মানুষ যখন দেখিতে পায় যে তথাপি বার বার পতিত হইতেছে, তখন তাহার প্রার্থনার উপকারিতা বিষয়ে সন্দিহান হইবার সম্ভাবনা। এইরূপে অনেক লোক প্রার্থনাকে ও পরিশেষে ধর্ম্মকে পরিত্যাগ করিয়াছে।

একবার শোনা গেল যে একজন অতিশয় দুষ্ক্রিয়াম্বিত ছিলেন, হঠাৎ ব্রহ্মোৎসবে যোগ দিয়া তাঁহার হৃদয় পরিবর্ত্তিত হইল। প্রথম উদ্যমে দেখা গেল যে এক সময়ে যেমন তাঁহার দুষ্ক্রিয়ার আতিশয্য ছিল, ধর্ম্মজীবনের প্রার্থী হইয়া তেমনি তাঁহার বৈরাগ্যের আতিশয্য হইল। তিনি সাধনের কঠোর নিয়মের দ্বারা আপনাকে শাসন করিতে লাগিলেন। ইহাতে তাঁহার প্রাণ শান্তিহীন হইয়া পড়িল। তাঁহার বৈরাগ্য ও ব্যাকুলতা দেখিয়া লোকে স্তব্ধ হইয়া গেল। কিন্তু কিছুদিন পরে হঠাৎ শুনিতে পাওয়া গেল যে তিনি আবার সেই পুরাতন দুষ্ক্রিয়া সকলে লিপ্ত হইয়াছেন। লোকে বিস্মিত ও অবাক হইয়া গেল। সকলেই জিজ্ঞাসা করে লোকটা আবার পতিত হইল কেন? ভিতরকার কারণ এই সে ব্যক্তি বাহিরে যখন ধর্ম্মজীবন লাভের জন্য সংগ্রাম করিতেছিল, তখনও তাহার পুরাতন শত্রুকুলের হাত হইতে সম্পূর্ণ নিষ্কৃতি পায় নাই। লোকে না জানুক তখনও গোপনে সে বার বার পুরাতন প্রলো-ভনের নিকট পরাজিত হইতেছিল। বার বার প্রতিজ্ঞা ও প্রার্থনার দ্বারা আত্মরক্ষার প্রয়াস পাইতেছিল, কিন্তু সম্পূর্ণ কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই। অবশেষে প্রার্থনার প্রতি অবিশ্বাস ও নিজের প্রতি নিরাশার উদয় হইল। সে ভাবিল আর সংগ্রাম করা বিফল, তাহাতে কেবল জীবন তিক্ত হইয়া যায়। ঈশ্বর যদিও থাকেন, মানবের প্রার্থনা শ্রবণ করেন না। এই ভাবিয়া সে আবার পুরাতন স্রোতে গা ভাসাইয়া দিল।

আমাদের সকলেরই জীবনে এইরূপ বার বার প্রতিজ্ঞা ও বার বার পতন ঘটিতে পারে, তখন আমাদিগকে মনে করিতে হইবে—"বল্মীকমিব পুত্তিকাঃ" পুত্তিকারা যেরূপ ধীরে ধীরে বল্মীক নির্ম্মাণ করে সেইরূপ ধীরে ধীরে মানবচরিত্র গঠিত হইয়া থাকে। নিরাশ হইলে চলিবে না। ধর্ম্মজীবনের যে এই ক্রমোন্নতি ইহা বিধাতার বিধি। যেমন দৈহিক বল একদিনে লাভ করা যায় না, নিয়মিত রূপ অন্ন পান গ্রহণ করিতে করিতে কালে বলের সঞ্চার হয়, সেইরূপ মানসিক বলও একদিনে লাভ করা যায় না। মানসিক বল লাভের উপায় সকল অবলম্বন করিতে করিতে কালে বলের সঞ্চার হইয়া থাকে। জগদীশ্বর যদি পুণ্যকে এইরূপ আয়াস-সাধ্য না করিতেন তাহা হইলে আমাদের নিকট পুণ্যের মূল্য থাকিত না। ঘোর পাতকী যদি এক লম্ফে সপ্তম স্বর্গে উঠিতে পারিত, তাহা হইলে মানবকুলে স্বর্গরাজ্যের আদর থাকিত না। মনুষ্য-জীবনের সর্ব্বত্রই এই নিয়ম। যাহা একদিনে ভাঙ্গা যায়,

তাহা গড়িতে দশ দিন লাগে। ইহা আমাদিগের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা, কারণ এইরূপ ব্যবস্থা থাকাতেই আমরা ভাঙ্গিতে ভীত হই, গড়িতে প্রয়াস পাই।

ধর্ম্মজগতে দুই শ্রেণীর লোক। *

বাইবেলের এক স্থানে এইরূপ একটী আখ্যায়িকা আছে—একদিন এক ব্যক্তি আসিয়া যীশুকে জিজ্ঞাসা করিল, "হে গুরো, পরিত্রাণ লাভ করিবার জন্য আমাকে কি করিতে হইবে?" যীশু তদুত্তরে বলিলেন—"সকল প্রকার নীতি পালন কর এবং পিতা মাতাকে ভক্তি কর।" সে বলিল—"যৌবনকাল হইতে আমি ঐ সকল নীতি পালন করিয়া আসিতেছি।" তখন যীশু পুনর্ব্বার বলিলেন—"এক বিষয়ে তোমার অভাব রহিয়াছে দেখিতেছি, যাও তুমি গৃহে ফিরিয়া যাও, এবং তোমার যে সকল সম্পত্তি আছে, তাহা বিক্রয় করিয়া দরিদ্রদিগকে বিতরণ কর, তাহা হইলে স্বর্গীয় ধনলাভ করিতে পারিবে। যাও, ফিরিয়া আসিয়া আমার অনুসরণ কর।" ঐ ব্যক্তির অনেক অর্থসম্পত্তি ছিল এবং সে তাহা ছাড়িতে প্রস্তুত ছিল না, সুতরাং সে যীশুর বাক্য শুনিয়া দুঃখিত হইয়া চলিয়া গেল। উক্ত বাইবেলের আর এক স্থানে সাধু দায়ুদ নিম্নলিখিত বাক্যগুলি বলিয়াছেন বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে—"আমি মেষ, প্রভু পরমেশ্বর আমার মেষপালক। আমার কিছুরই অভাব হইবে না। তিনি আমাকে শস্যপূর্ণ ক্ষেত্রের মধ্যে শয়ান করিয়া রাখিবেন; তিনি আমাকে নির্ম্মল নির্ঝরিণীর নিকটে লইয়া যাইবেন। যদি মৃত্যুর ছায়াচ্ছন্ন উপত্যকার মধ্যেও বিচরণ করি, তথাপিও আমি ভীত হইব না। কারণ, হে প্রভু, তুমি আমার সঙ্গে রহিয়াছ। তোমার শাসন-দণ্ড আমাকে রক্ষা করিবে। তোমার করুণা ও মঙ্গলভাব চিরজীবন আমার অনুসরণ করিবে। আমি চিরকাল প্রভুর গৃহে বাস করিতে পাইব।" বাইবেলের দুই স্থান হইতে দুইটী বিষয়ের উল্লেখ করা হইল। ইহা দ্বারা ধর্ম্মজীবনের অতি গভীর দুইটী ভাব আমরা বুঝিতে পারি। পূর্ব্বোক্ত দুই ব্যক্তিই ধর্ম্মপিপাসু, উভয়েই পরমেশ্বরকে লাভ করিতে চান। কিন্তু প্রথম ব্যক্তি পরমেশ্বরকে লাভ করিবার জন্য আপনার পার্থিব ধন মান ছাড়িতে প্রস্তুত নন। আমার সুখ সম্পদ সব পূর্ণ মাত্রায় থাকুক, আমার মস্তকের একটী কেশও না বিচ্যুত হয়, অথচ পরমেশ্বরকে লাভ করিতে পারি—যদি এমন হয়, তবে তাঁহাকে চাই। আর যদি বল, এ সকল ছাড়িতে হইবে, তবে তাঁহাকে পাইব, তাহা হইলে বলি, এত দুঃখ ক্লেশ ও অভাবের মধ্যে তাঁহাকে লইয়া কি লাভ? তাহার মনের এইরূপ ভাব। আর দ্বিতীয় ব্যক্তির ভাব সম্পূর্ণ অন্য প্রকার। তিনি আপনার প্রভুকে পাইবার জন্য আপনার সুখ দুঃখ, স্বার্থ সম্পদ সকল ভুলিয়া গিয়াছেন। তিনি বলিলেন—"তুমি আমার জীবনের নেতা, আমি তোমার অনুগত দাস। মেষ যেমন আপনার প্রভুর অনুসরণ করে, আমি সেইরূপে তোমার অনুসরণ করিব। কোথায় ভাল খাদ্যদ্রব্য আছে, কোথায় উপযুক্ত পানীয় আছে, কোথায় আরামদায়ক বিশ্রামস্থান আছে মেষ ত তাহা জানে না। তাহার প্রভুই সে সকল জানেন, এই জন্য সে সম্পূর্ণভাবে তাঁহার অনুগত হইয়া তাঁহারই অনুসরণ করে। কোনও বিপদজনক স্থানে গমন করিলেও সে ভীত হয় না, কারণ সে জানে যে তাহার প্রভু যখন তাহার সঙ্গে রহিয়াছেন, তখন তাহার সকল ভার ত তাহার প্রভুরই হস্তে। সেইরূপ আমি কি খাইব, কি পরিব, কোথায় থাকিব তাহা কি আমি জানি? আমার প্রভু আমার সে সকল ভার ত তোমার উপর। বিপদ, দুঃখ পরীক্ষা বা অন্ধকার আসে, তাহাতে আমি ভীত হইব কেন? তুমিত চিরদিন আমার সঙ্গে রহিয়াছ, তোমার করুণা, তোমার মঙ্গলভাব সর্ব্বদাই ত আমার জীবনের সঙ্গেই রহিয়াছে। আমি তোমারই, যেখানে লইয়া যাইবে যাও, যাহা করিবে কর, আমি তোমাকে পাইবার জন্য, তোমার ইচ্ছাকে জয়যুক্ত করিবার জন্য সব করিতে প্রস্তুত।

ধর্ম্মজগতে এইরূপ দুই শ্রেণীর লোক আমরা সর্ব্বদা দেখিতে পাই। মানুষ যখন পরমেশ্বরকে লাভ করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া তাঁহার দ্বারে আসে, তখন সে তাঁহাকে সত্যসত্যই চায় কি না, ইহা তিনি পরীক্ষা করিতে চান। প্রাণের কাণে কাণে তিনি আসিয়া জিজ্ঞাসা করেন,—"যদি তুমি আমাকে চাও, তবে আর কিছুই চাহিতে পারিবে না; যদি আমার হইবে, তবে আর কাহারও হইতে পারিবে না; যদি আমাকে প্রাণ দিবে, তবে আর কাহাকেও প্রাণ দিতে পারিবে না।" এই কথা শুনিয়া এক শ্রেণীর লোকের প্রাণ স্তম্ভিত হইয়া যায়। তাহারা মনে করে দুই দিক থাকিবে সেই ত ভাল, এ আবার কি? তাহারা অনেক ভাবিয়া, চিন্তা করিয়া, তৌলদণ্ডের এক দিকে পরমেশ্বরকে রাখিয়া অন্য দিকে সংসারের সুখ সম্পদ প্রভৃতি রাখিয়া দেখে। তাহাদের নিকট সংসারের দিকটাই অধিক ভারী হয়। তখন তাহারা আর হইল না মনে করিয়া ক্ষান্ত হয়, ধর্ম্মজীবনের পথে আর অগ্রসর হইতে পারে না। আর দ্বিতীয় শ্রেণীর লোকে যখন আপনার প্রাণের মধ্যে পরমেশ্বরের ঐ বাণী শুনিতে পান, তখন বলেন "হাঁ, সত্য সত্যই ত আমি তোমাকে চাই, তোমাকে পাইবার জন্য যাহা করিতে হইবে, আমি সে সকলে প্রস্তুত। যদি তুমি আমার সমস্ত প্রাণ চাও, তবে তাহা এখনই গ্রহণ কর। আর আর আমার যাহা আছে, সব তুমি লও। আমি কেবল মাত্র তোমাকে চাই। ধন মান আমি বুঝি না, সুখ সম্পদ আমি জানি না, দুঃখ ক্লেশেও আমি ভীত নই। আমি তোমাকে লাভ করিতে চাই। তোমার সঙ্গে থাকিলে আমার আর কি ভয়? তোমার উপরেই ত আমার সকল ভার। আমাকে যেখানে রাখিলে ভাল হয় সেইখানেই তুমি রাখিবে, যাহা করিলে মঙ্গল হয় তাহাই তুমি করিবে, যে পথে লইলে প্রকৃত কল্যাণ হয়, সেই পথে লইবে।" এইরূপ লোকেই বস্তুতঃ পরমেশ্বরকে লাভ করিতে চান এবং তাঁহাকে লাভ করিতে সমর্থ হন। তাঁহারা যখন আপনার প্রাণের তৌলদণ্ডের এক

* কোনও মফঃস্বলস্থ ব্রাহ্মসমাজে প্রদত্ত উপদেশের সারাংশ

দিকে আপনা প্রাণের দেবতাকে বসান এবং অন্যদিকে সংসার ও তাহার সকল সুখ সম্পদকে রাখিয়া তুলনা করেন, তখন পরমেশ্বর যে দিকে তাঁহাই তাঁহাদের নিকট ভারী হয়। অপর দিককে তাঁহারা কিছু নয় বলিয়া মনে করেন। ভক্ত যখন এইরূপ ব্যাকুলাত্মাদিগের কথা উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন ;—

"এক বুদকে কারণ চাতক নিত দুঃখ পাবে,
প্রাণ গয়ে সাগর মিলে, ফুণ কাম ন আবে।

চাতক এক বিন্দু জলের জন্য সর্ব্বদা কতই ক্লেশ পাইয়া থাকে; সাগরে কত জল রহিয়াছে তাঁহাতে তাহার কিছুই কাজ হয় না। আমাদের দেশে এরূপ প্রবাদ আছে যে চাতক বৃষ্টির জল ব্যতীত অন্য জল পান করে না। কত দিন সে এক বিন্দু জলের জন্য শুষ্ককণ্ঠে উর্দ্ধমুখ হইয়া প্রতীক্ষা করে। পৃথিবীতে কত জল রহিয়াছে, পিপাসায় তাহার প্রাণও বহির্গত-প্রায়, তথাপি সে সে জল পান করে না। তাহার নিকট পৃথিবীর সমস্ত জল থাকিয়াও যেন নাই। ঈশ্বরের জন্য ব্যাকুলাত্মাদিগের অবস্থাও সেইরূপ। তাঁহাকে না পাইলে সংসারের শত সহস্র সুখে তাঁহাদিগকে কিছুমাত্র শান্তি দিতে পারে না। সে সকল সুখ তাঁহাদের নিকট থাকিয়াও যেন নাই। তাঁহার জন্য তাঁহারা সকল ছাড়িতে সর্ব্বদাই প্রস্তুত।

উপরে যে দুই শ্রেণীর লোকের বিষয় উল্লিখিত হইল, আমরা তাহার মধ্যে কোন্ শ্রেণীর অন্তর্গত? আমরা কি পরমেশ্বরকে লাভ করিবার জন্য সকল ছাড়িতে প্রস্তুত হইয়াছি? তিনি যদি বলেন, "সকল স্বার্থ বলিদান করিলে তবে আমাকে পাইবে," তবে কি আমরা নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারি "এই লও, প্রভু, আমার সব লও"? প্রাণের তৌলদণ্ডের এক-দিকে যদি তাঁহাকে এবং অন্য দিকে সকল সংসারকে রাখি, তবে কি তাঁহার দিক আমাদের অধিক ভারী বোধ হয়? পরমেশ্বর করুন আমরা প্রকৃত ভাবে তাঁহার হই এবং তাঁহাকে জীবনের সার করি।

প্রাচ্য ও প্রতীচ্য ধর্ম্মভাব।

১২ই মাঘ শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী প্রদত্ত বক্তৃতার সারাংশ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

প্রাচ্য ধর্ম্মে পাপ কাহাকে বলে? মোহ,—অনিত্যকে নিত্য বলাই পাপ। য়িহুদীদিগের পাপ বিদ্রোহ, ঈশ্বরের আজ্ঞার বিরুদ্ধ কাজ। আমাদের মুক্তি জ্ঞানে; তাহাদের মুক্তি ঈশ্বরেচ্ছার অধীনতাতে। এই বিদ্রোহ নিবারণ করিয়া মানবকে ঈশ্বরেচ্ছার অনুগত করাই ধর্ম্মের উদ্দেশ্য। এদেশের ঋষি বলেন—

"ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষূপজায়তে।
সঙ্গাৎ সংজায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে॥
ক্রোধাদ্ভবতি সংমোহঃ সংমোহাৎস্মৃতি বিভ্রমঃ।
স্মৃতিভ্রংশাদ্ বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি॥"

"বিষয় চিন্তা করিতে করিতে তাহাতে পুরুষের আসক্তি জন্মে। আসক্তি হইতে কামনার উৎপত্তি হয়, এবং কামনার পথে প্রতিবন্ধক উপস্থিত হইলেই ক্রোধের সঞ্চার হয়; ক্রোধ হইলে মানুষের হিতাহিত বুদ্ধি লোপ পায়; হিতাহিত বুদ্ধির বিনাশ বশতঃ আত্ম-বিস্মৃতি উপস্থিত হয়; আত্ম-বিস্মৃতি হইতে বুদ্ধি নাশ; এবং বুদ্ধি নাশ হইলে সর্ব্বনাশ ঘটে।" ঋষিগণ বলেন, অজ্ঞানবশতঃ বিষয়ের, অনিত্য বস্তুর চিন্তা হইতে সকল অনর্থের উৎপত্তি। অতএব সর্ব্ব প্রযত্নে ঐ সকল অনিত্য বিষয়কে বিনাশের কারণ জানিয়া সেই সকল হইতে চিত্তের প্রত্যাহার কর এবং নিত্য বস্তুর ধ্যানে নিমগ্ন হও। তাহা হইলেই নিত্যবস্তু জানিবে এবং মুক্তিলাভ করিবে। য়িহুদীগণ বলেন মুসাদ্বারা যে আজ্ঞা প্রচারিত হইয়াছে তাহা পালন করিলেই মুক্তি। খৃষ্টান বলেন যীশুর দ্বারা যে আদেশ প্রচারিত হইয়াছে, তাহা পালন কর। তবেই দেখ, মানবের ব্যক্তিত্বজ্ঞান ও দায়িত্বজ্ঞান য়িহুদী ধর্ম্মের মূলে নিহিত রহিয়াছে। খৃষ্টীয়ধর্ম্ম য়িহুদীধর্ম্ম প্রসূত। ইহাতে ব্যক্তিত্বজ্ঞান আরও প্রস্ফুটিত করিয়াছে। মুসার ধর্ম্ম নিয়মে বরং স্বাধীনতা কিছু খর্ব্ব হইয়াছে, খৃষ্টীয় ধর্ম্মে উহা সম্পূর্ণ প্রস্ফুটিত। দুই মহাপুরুষের দ্বারা খৃষ্টীয় জগতে এই ব্যক্তিত্বজ্ঞানের বহুল প্রচার হইয়াছে ১ম সেণ্ট পল, ২য় মার্টিন লুথার। মানবাত্মার যে মূল্য আছে, মহত্ত্ব আছে, যীশুর উক্তিতে এই ভাব থাকিলেও সেণ্ট পল এবং লুথার ইহা বিশেষ রূপে ব্যক্ত করেন। যীশু নিজে মানবাত্মার মহত্ত্ব ঘোষণা করিয়াছিলেন। তাঁহার শিষ্যগণ কোনও এক বিশ্রাম দিনে শস্যের শীষ ভক্ষণ করিয়াছিল। য়িহুদীগণ ইহা দেখিয়া মুসার নিয়মের ব্যতিক্রম হইল বলিয়া যীশুর শিষ্যগণের প্রতি বিষম আক্রোশ করিতেছিল। তখন যীশু বলিলেন—"Sabbath is made for man and not man for the Sabbath." মানবের জন্যই বিশ্রাম দিন, কিন্তু বিশ্রাম দিনের জন্য মানব সৃষ্ট নহে। তাঁহার এই উক্তিতে মানবাত্মার মহত্ত্বই প্রকাশ পাইতেছে। তার পর যীশুর মৃত্যু হইলে তাঁহার ভ্রাতা জেমস্ খৃষ্টীয়মণ্ডলীভুক্ত হইলেন। সেখানে তাঁহার বিষম প্রতাপ হইয়া উঠিল। তিনি একজন নিষ্ঠাবান্ য়িহুদী ছিলেন। য়িহুদী ধর্ম্মের যাবতীয় নিয়ম পালনে তাঁহার বিশেষ আগ্রহ। তিনি খৃষ্টীয়মণ্ডলী মধ্যে যাইয়াও য়িহুদীর ভাব পরিত্যাগ করিতে পারিলেন না। মণ্ডলী মধ্যে অনেকের মনে এইভাব মুদ্রিত করিলেন, যাঁহারা য়িহুদীর অনুষ্ঠান সমুদয় সম্পাদন করেন নাই, তাঁহারা খৃষ্টান হইতে পারিবেন না, তাঁহাদের মুক্তির আশা সুদূরপরাহত। অনেকে তাঁহার এই মতের সমর্থন করিলেন। তাঁহার একটী গণ্ডী গঠিত হইল। যখন তাঁহাদের মধ্যে এই অসত্য প্রবেশ করিল, তখন ধর্ম্মবীর বিশ্বাসী সেণ্টপল নিজ বিক্রম ধারণ করিলেন। তিনি এই অসত্যের সমর্থন করিলেন না। বিশ্বাসে মানুষ তরিয়া যায়, নিয়ম পালন কিছুই নয়—পল ভীমনাদে এই মহাসত্য ঘোষণা করি-লেন। তিনি বলিলেন য়িহুদী হও আর জেণ্টাইল হও, তাহাতে কিছুই যায় আসেনা, তুমি য়িহুদী অনুষ্ঠান প্রতিপালন কর আর না কর, তাহাতে কিছুই ক্ষতি বৃদ্ধি নাই—যদি তুমি বিশ্বাসী হও,

যদি সন্দেহের বিষম ঝড়ে আন্দোলিত সংসার-সমুদ্র মধ্যে বিশ্বাসের নিরাপদ বন্দর পাইয়া থাক, তাহা হইলে মুক্তি তোমার করতলে। এই মত প্রচার করিয়া তিনি সকল খৃষ্টীয় ও যিহুদীদের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া নিজের জীবনে ব্যক্তিত্বের (individualism) পরাক্রম দেখাইলেন। ইহার কয়েক শত বৎসর পরে লুথার আবার দুর্দ্দান্ত পোপের পরাধীনতারূপ নিগড় ভগ্ন করিয়া ব্যক্তিগত স্বাধীনতার পতাকা উড্ডীন করিলেন। তার পর ক্রমাগত এই ব্যক্তিত্বের আগুণ জ্বলিতে লাগিল। সমস্ত ইউরোপ বিপ্লবময় হইয়া উঠিল। বর্ত্তমান সময়ে এই ব্যক্তিত্বভাব অতিরিক্ত মাত্রায় প্রকাশিত হইয়াছে। "যে যার আপনার" এই ভাব ইউরোপে অত্যন্ত প্রবল। আমাদের দেশে জাতিভেদের প্রবল প্রতাপে ব্যক্তিত্বের প্রভাব নিতান্ত হীন। আমি কি খাইব, কিরূপ কাপড় পরিব, আমি শ্মশ্রু রাখিব কি না সমস্তই সমাজ নির্ণয় করিয়া দিবে। কিন্তু সে দেশে প্রত্যেকে সম্পূর্ণ স্বাধীন। প্রতিবেশী কি করে, কি খায়, কেহ তাহার কোন সন্ধান রাখে না। তাহাদের প্রত্যেকের সুখ দুঃখের সহিত অপরের কোনও সম্বন্ধ নাই। তুমি নিজ গৃহে যথারুচি খাও বা অনাহারে থাক, তুমি যথেষ্ট পরিধেয় ব্যবহার কর অথবা নগ্ন গাত্রে দিনযাপন কর—কেহ সে সম্বন্ধে কিছু জিজ্ঞাসা করিবে না। এই স্বাধীনতার জন্য প্রত্যেকে আপনাকে ইচ্ছানুরূপ গঠন করিতে পারে। সে দেশে স্বাধীনতার ভাব এতই প্রবল যে, কাহারও অবস্থা জিজ্ঞাসা করিলে সে রাগ করে। আমি কি খাই, কি পরি, কিরূপ ভাবে দিন কাটাই, আমার সঙ্গতি আছে কি না, তোমার তাহা জানিবার প্রয়োজন কি? সেরূপ জিজ্ঞাসা করিবার অধিকার কি? ইংরেজদের আবার জাত্যভিমান অত্যন্ত অধিক। ইঁহাদের ব্যক্তিত্ব এত প্রবল যে, ইহারা ভাই বোনেরও খবর লয় না। সে জন্য যে কত সামাজিক দুর্নীতি ও ক্লেশ হইয়াছে তাহা বর্ণনাতীত। তাহারা প্রত্যেকে নিজের পায়ের উপর দাঁড়াইতে সচেষ্ট। এই ব্যক্তিত্বের মাত্রা এখানে অত্যন্ত অধিক হইয়াছে, আবার সেখানকার চিন্তাশীল লোকেরা অন্য দিকে এতই ঝুঁকিয়া পড়িয়াছেন যে তাঁহারা ব্যক্তিত্ব সমূলে বিনাশ করিয়া সামাজিকতা (socialism) প্রতিষ্ঠিত করিতে উৎসুক হইয়াছেন এবং state কে সমুদয় ক্ষমতা দিতে প্রস্তুত হইয়াছেন।

এই ব্যক্তিত্বের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে দায়িত্ব বোধের প্রাবল্য বশতঃ খৃষ্টীয়ধর্ম্ম নীতি-প্রধান হইয়াছে। এইজন্য খৃষ্টীয় ধর্ম্মের ইতিহাসে এক মহাভাব পরিলক্ষিত হয়। খৃষ্টীয় ধর্ম্ম জন্মগ্রহণ করিয়াই সমাজের পাপ ও দুর্নীতি সকল দূর করিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিল। শিশু হত্যার (infanticide) নিবারণ নর-পশু ক্রীড়ার (gladiator shows) দমন ও দাম্পত্য নীতির উন্নতি, এই সকল বিষয়ে সেই মুষ্টিমেয় খৃষ্টানগণ আশ্চর্য্য পরাক্রম প্রকাশ করিয়াছেন। তৎকালে এতদ্দেশীয় রাজপুতগণের ন্যায় রোমীয়গণ শিশুদিগকে হত্যা করিত। বর্ত্তমান কালে ইংলণ্ডীয়গণ গৃহে গৃহে উষ্ণ জলে নিক্ষেপ করিয়া বিড়াল-শিশুদিগকে হত্যা করেন। তাঁহাদিগকে এই অন্যায় কার্য্যের বিষয় বলিলে তাঁহারা তজ্জন্য কিছু মাত্র দুঃখিত হন না, প্রত্যুত হাসিতে হাসিতে বলেন "সকলেই এইরূপ করে।" সকলেই এমন কি পৃথিবীর সমস্ত লোকে অনুষ্ঠান করিলেও যে অন্যায় কখনও ন্যায় বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না, তাঁহারা ইহা বুঝিতে পারেন না। রোমবাসিগণ বিড়াল শিশু বধের ন্যায় মানব শিশুকে বধ করিতেন। কেহ প্রতীকারের কথা বলিলে হয় ত ঐরূপই উত্তর দিতেন। প্রাচীন খৃষ্টীয়গণ এই কুপ্রথা রহিত করেন।

রোমদেশে ইহা অপেক্ষাও এই এক বীভৎসকাণ্ড প্রচলিত ছিল যে তথাকার ধনীগণ স্ব স্ব দাসবর্গকে হিংস্র পশুর সহিত যুদ্ধ করিতে প্রবর্ত্তিত করিতেন। কখনও তাহাদের হস্তে অস্ত্র প্রদত্ত হইত, কখনও হতভাগ্যগণ নিরস্ত্রই এই সিংহ ব্যাঘ্রের সম্মুখীন হইত। এই ব্যাপার দেখিবার জন্য ভদ্র বংশীয় সহস্র সহস্র পুরুষও রমণী একত্র হইতেন এবং যখন হিংস্র শ্বাপদকুল হতভাগ্য দাসদিগের দেহ খণ্ড বিখণ্ড করিত তখন তাঁহারা করতালি ধ্বনি করিয়া আনন্দ প্রকাশ করিতেন। যথাকালে রোমদেশে এই ভীষণ কাণ্ডের অনুষ্ঠানও সেই সময়ের অপরাপর পাপ ও দুর্নীতি দূর করিবার জন্য ঈশ্বরের বিধানে খৃষ্টধর্ম্মের উৎপত্তি হইল। কাজেই ঐ নিষ্ঠুর কার্য্য আর অনুষ্ঠিত হইবার সুবিধা পাইল না। একদিন রঙ্গস্থলে ঐরূপ ক্রীড়া হইতেছে; সহস্র সহস্র নরনারী একত্রিত হইয়াছেন, ক্রীড়া আরম্ভ হইতেছে মাত্র। হতভাগ্য দাসগণ সশস্ত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছে এখনও যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয় নাই, এমন সময়ে একজন সাধুপুরুষ কোথা হইতে ছুটিয়া আসিয়া বলিলেন "হাঁ হাঁ কর কি! কর কি! এরূপ ভীষণ নিষ্ঠুর কার্য্যে প্রবৃত্ত হইও না।" এই বলিতে বলিতে তিনি তাহাদের মধ্যস্থলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দর্শক পুরুষ ও মহিলাগণ বিরক্ত হইয়া চতুর্দ্দিকে চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল, কি! একটা সামান্য সন্ন্যাসীর এত বড় সাধ্য যে সে আমাদের কৌতুক বন্ধ করে! এখনি উহার প্রাণনাশ কর।" তাহাদের এই আদেশ চতুর্দ্দিকে ধ্বনিত হইবা মাত্র একজন সেই সাধু পুরুষের বক্ষে ছুরিকা আঘাত করিল। যখন সাধু পুরুষ ধূলায় লুণ্ঠিত হইতে লাগিলেন, যখন তাঁহার বক্ষঃ হইতে রুধির ধারা প্রবাহিত হইয়া রঙ্গভূমির অঙ্গনকে রক্তাক্ত করিতে লাগিল, তখন তাহাদের চৈতন্য হইল, তাহারা বলিল "দেখ দেখি এই সাধু পুরুষ কে?" অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারিল তিনি একজন ধার্ম্মিক মহাপুরুষ। যখন সকলে এই কথা জানিতে পারিল তখন লজ্জা ও অনুতাপ সকলের অন্তরকে অভিভূত করিল। সেই দিন হইতে আর সেই ভীষণ ক্রীড়ার কথা কেহ মুখেও আনিত না। এইরূপে একজন খৃষ্টীয় সাধু পুরুষের রক্তে এই বিষম দুর্নীতি রোমনগর হইতে বিধৌত হইল।

তৎকালে দাম্পত্য নীতিও অত্যন্ত শিথিল ছিল। প্রাচীন গ্রীসে হেটিরি নামে এক শ্রেণীর কুলটা স্ত্রীলোক ছিল; তাহারা সমাজে সম্মান পাইত। এমন কি সক্রেটীশের ন্যায়

একজন মহাজ্ঞানীও এই শ্রেণীর নারীগণের গৃহে গমন করিয়া নানাবিধ প্রসঙ্গ করিতেন। খৃষ্টীয় ধর্ম্ম এই কুপ্রথার মূলেও কুঠারাঘাত করিয়াছে।

নীতির প্রাধান্য এবং দায়িত্ব জ্ঞানের প্রবলতা থাকাতে, ঈশ্বর মানবের বিবেকে প্রতিষ্ঠিত, এবং চরিত্র দ্বারা ধর্ম্ম সাধন করিতে হইবে, এই ভাব খৃষ্টধর্ম্মে উজ্জ্বল দেখিতে পাওয়া যায়। এই ভাব প্রবল থাকাতেই খৃষ্টীয় জগতে মানবের অকস্মাৎ জীবন পরিবর্ত্তন (sudden conversion) এবং মৃত্যু-শয্যায় পাপ স্বীকার (death-bed confession) যত দেখিতে পাওয়া যায়, অন্যত্র তত দেখা যায় না। এদেশেও লালা বাবু প্রভৃতির দৃষ্টান্ত আছে সত্য, কিন্তু খৃষ্টীয় জগতেই এরূপ দৃষ্টান্ত অনেক অধিক।

প্রাচ্য ভাবের অতিরিক্ততা জন্য যেমন তিনটী দোষের উৎপত্তি সেইরূপ প্রতীচ্য ভাবের আতিশয্য হইতেও তিনটী দোষ উৎপন্ন হইয়াছে। (১ম) ঈশ্বর কার্য্যের বিচারক; এই ভাব হইতে অতিরিক্ত কার্য্য-তৎপরতা। (২য়) বিষয় ঈশ্বর সেবার ক্ষেত্র; ইহা হইতে বিষয়-তৎপরতা। এবং (৩য়) অতিরিক্ত ব্যক্তিত্ব হইতে সমাজিক বিশৃঙ্খলা উৎপন্ন হইয়াছে।

যদি এই প্রাচ্য ও প্রতীচ্য ভাবদ্বয় মিলিত হয়,—আত্ম-নিষ্ঠতার সহিত কার্য্য-তৎপরতা, বিষয়-বিরাগের সহিত নরসেবা, এবং ব্যক্তিত্বের সহিত একতার সম্মিলন হয় তাহা হইলেই পূর্ণ ধর্ম্ম সংস্থাপিত হয়। ব্রাহ্মসমাজ এই জন্যই জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় এই প্রাচ্য এবং প্রতীচ্যকে একত্র মিলাইবার জন্যই জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার জীবনের এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিবার জন্য বেদান্তের এক নূতন ভাষ্য করিলেন। তাহাতে এদেশীয় নিষ্ক্রিয় ব্রহ্মের মধ্যে পাশ্চাত্য ক্রিয়াশীল ঈশ্বরকে প্রবেশিত করিলেন। এদেশের যে ব্রহ্ম শব্দ তাহার অর্থ অব্যক্ত চৈতন্য, যাহা জগতের অতীত। এই জন্য ব্রহ্ম শব্দ ক্লীবলিঙ্গ। ব্রহ্মের যে প্রকাশ ইহাকে এদেশীয়গণ ঈশ্বর বলেন। ব্রাহ্মসমাজের ব্রহ্ম নিষ্ক্রিয় নহেন। আর কিছু দিন পরে সমগ্র ভারতে ব্রহ্ম ও ঈশ্বর শব্দ একার্থ হইবে। ব্রাহ্মসমাজ কেবল আত্মতৃপ্তি উৎপন্ন করিবে না। এখানে সমস্ত সম্মিলিত হইবে। কেহ কেহ বলিতে পারেন তাহা কি সম্ভব? পশ্চিমের ভাব কি এদেশে আনা যায়? আমি বলি বসরাই গোলাপ, ও কপি এসব ভারতে কিরূপে আসিয়াছে? আধ্যাত্মিক জগতেও naturalisation আছে। বর্ত্তমান সময়ে দেখা যাইতেছে যে কর্ম্ম-প্রধান ইংলণ্ড দেশেও জর্ম্মণীর চিন্তা-স্রোত প্রবাহিত হইতেছে এবং ইংলণ্ডের কর্ম্ম-তৎপরতা জর্ম্মণ দেশে ক্রমশই পরিব্যাপ্ত হইতেছে। পাশ্চাত্য ভাব এদেশে আসিবে। যাঁহারা নিজ নিজ জীবনে এই উভয় ভাবকে সম্মিলিত করিতে চেষ্টা করিতেছেন তাঁহারাই প্রকৃত ব্রাহ্ম ধর্ম্মের সাধন করিতেছেন; আর যাঁহারা একাঙ্গের সাধনা করিতেছেন তাঁহারা পশ্চাতে পড়িয়া আছেন। ভগবান্ করুন আমরা সকলে স্ব স্ব জীবনে এই সম্মিলিত ধর্ম্মভাব সাধন করিতে পারি।

রামমোহন রায়ের মহত্ত্ব।

(প্রাপ্ত)

যাঁহারা রাজা রামমোহন রায় সম্বন্ধে কিছুমাত্র জানেন, তাঁহাদের অনেকেই তাঁহার অসাধারণ মহত্ত্ব স্বীকার করিয়া থাকেন। কিন্তু আমার আশঙ্কা হয়, অতি অল্প লোকেরই মনে এই মহত্ত্বের প্রকৃত পরিমাণ ও প্রকৃতি সম্বন্ধে একটা স্থির ও সুস্পষ্ট ধারণা আছে। এরূপ হওয়াও কিছুই আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। তাঁহার মহত্ত্ব মানব মনের মহত্ত্ব ছিল; তাঁহার শক্তি আত্মার শক্তি ছিল; তাঁহার চরিত্রের বহিঃজ্যোতিঃ অন্তরের আলোকের আভা মাত্র ছিল। আত্মার মহত্ত্বের ওজন কে করিবে? আত্মার গভীরতার নির্দ্ধারণ কে করিবে? আত্মার আলোক কোন্ চক্ষু দেখিয়া শেষ করিতে পারে? এবং আত্মার মিষ্টতা কত ঘন ঘন আস্বাদনে অরুচিকর করিয়া তুলিতে পারে? এই সকল উৎকর্ষ যদিও মানবের সংকীর্ণতার ভিতর দিয়াই প্রকাশিত হয়, তথাপি প্রকৃতপক্ষে, মানবের নহে, কিন্তু বিধাতা পুরুষেরই গুণাভাস মাত্র, এবং তজ্জন্য সর্ব্বদাই অনন্তের সংবাদ বহন করে বলিয়া এ সকল মানব জ্ঞানের সম্পূর্ণ আয়ত্তাধীন হয় না। প্রকৃত মহৎলোকের চরিত্র চিত্রবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে দৃষ্ট চিত্রফলকের ন্যায় প্রতীয়মান হইয়া থাকে। যত বেশীক্ষণ এই চিত্র নিরীক্ষণ করা যায়, যত সূক্ষ্মরূপে ইহাকে দৃষ্টি করা যায়, ততই ইহার সৌন্দর্য্য চক্ষুর উপরে প্রকাশিত হইতে থাকে, এবং ততই যতটুকু সৌন্দর্য্য দেখা ও ভোগ করা যায়, তাহার অতীত আরো অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য যেন তাহাতে আছে, এরূপ মনে হয়, ক্রমে দেখিতে দেখিতে পূর্ব্বে যাহা অদৃষ্ট ছিল তাহা দৃষ্টির বিষয়ীভূত হয়, পূর্ব্বে যাহা অস্পষ্ট ছিল তাহা সুস্পষ্ট হয়, এবং এইরূপে ক্রমে সেই চিত্রের মধ্যে যেরূপ আছে বলিয়া পূর্ব্বে কল্পনাও করা যায় নাই, তাহা বিকশিত হইয়া উঠে এবং দর্শকের চিত্তকে সেই সামান্য তিন চারি ইঞ্চি পরিসর চিত্রের এই নিয়ত-বিকাশোন্মুখ সৌন্দর্য্যের মধ্যে একেবারে নিমগ্ন করিয়া দেয়। রামমোহন রায়ের চরিত্র সম্বন্ধে কি ঠিক এরূপ হয় নাই? এদেশে তাঁহার সমসাময়িক লোক-মণ্ডলীর চক্ষে তাঁহার সৌন্দর্য্যের কি শতাংশের একাংশও দৃষ্ট হইয়াছিল? এই মহৎ চরিত্রের সৌন্দর্য্যের আভাস মাত্র দেখিতে সমর্থ হইবার পূর্ব্বে এজাতির চক্ষুকে অর্দ্ধশতাব্দী-ব্যাপী শিক্ষা লাভ করিতে হইয়াছে। এবং তাহার পরে আরো দশ বৎসর ঘনিষ্ঠও নিবিষ্ট ভাবে তাহা নিরীক্ষণ ও আলোচনা করিয়াও আজ আমাদিগকে ইহা স্বীকার করিতে হইতেছে, যে আমরা রামমোহন রায়ের চরিত্রের সৌন্দর্য্য ও মহত্ত্ব

কেবল বুদ্ধির দ্বারাও, আংশিকরূপে, আয়ত্ত করিতে সমর্থ হই নাই।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, এই মহত্ত্ব, আত্মার মহত্ত্ব। এবং আত্মার মহত্ত্ব যাহা, তাহা সর্ব্বোপরি দৃষ্টি শক্তিরই মহত্ত্ব। মানসিক ও আধ্যাত্মিক মহত্ত্ব মাত্রই এইরূপ। বৈজ্ঞানিক, নৈয়ায়িক, কবি ও প্রবক্তা, ইঁহাদের সকলেরই শক্তি দৃষ্টিতে। ইঁহাদের সমসাময়িক ও স্বদেশীয় লোকেরা যাহা দেখিতে পায় না, ইঁহারা তাহা দেখেন বলিয়াই ইঁহারা শ্রেষ্ঠ। গ্যালিলিও, নিউটন, কি ডারবিন জড় ও প্রাণী-জগতের সত্য সমূহ আপন আপন সমসাময়িক জনগণ অপেক্ষা অধিক দেখিয়াছিলেন বলিয়াই ইঁহাদের নাম জড়বিজ্ঞানের ইতিহাসে বিখ্যাত হইয়াছে। মনোবিজ্ঞানের ইতিহাসে এইরূপ ডেকার্ট, ক্যাণ্ট বা হিগেলের নাম প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। কবি ও প্রবক্তার শক্তি যে দৃষ্টিগত ইহা সকলেই স্বীকার করেন। কিন্তু লোকে স্বীকার করুন আর নাই করুন,—সর্ব্ব প্রকারের মানসিক ও আধ্যাত্মিক মহত্ত্বই যে দৃষ্টিগত, একথা অগ্রাহ্য করা অসাধ্য।

এই দৃষ্টি-শক্তি আত্মার। এবং আত্মার চক্ষুর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম এই যে শরীরের চক্ষু যেস্থলে আকারের বিভিন্নতা দর্শন করে, আত্মার চক্ষু সেস্থলে মুল বস্তুর একত্ব উপলব্ধি করিয়া থাকে। বাহ্য বিভিন্নতার মধ্যে আন্তরিক একতা স্থাপনের শক্তি দ্বারাই সর্ব্ব প্রকারের মানসিক ও আধ্যাত্মিক শক্তি ও শ্রেষ্ঠতার পরিমাণ হইয়া থাকে। এই জড় জগতের সর্ব্ব প্রকারের বিচিত্রতার মধ্যে একই পরমাণুপুঞ্জের লীলা আবিষ্কার করিয়াছিলেন বলিয়াই রসায়ন শাস্ত্র-বিশারদ পণ্ডিত মণ্ডলী মধ্যে ড্যাল্টন এরূপ শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। উদ্ভিদ্ ও জীব-জগতের একই ক্রমবিকাশশীল প্রাণতার ক্রিয়া লক্ষ্য করিয়াছিলেন বলিয়াই—বিবর্ত্তনবাদের প্রতিষ্ঠাতা ডারবিন্ বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক সমাজের শীর্ষ স্থান অধিকার করিয়াছেন। মহামতি ক্যাণ্টের পূর্ব্বে আধুনিক দর্শন জড়বাদ ও মায়াবাদ, এই পরস্পর বিরোধী দুই দলে বিভক্ত ছিল, এবং এই বিরোধিতা-নিবন্ধন মনোবিজ্ঞানের সাংঘাতিক অপকার সাধিত হইতেছিল। এই পরস্পর বিরোধী দল দ্বয়ের মতের মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপন করিয়াছিলেন বলিয়াই ক্যাণ্ট সর্ব্ব সম্মতিতে আধুনিক দার্শনিকগণের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও আধুনিক দর্শনের উদ্ধার-কর্ত্তা বলিয়া পরিগণিত হইয়াছেন। এবং রসায়ন বিজ্ঞানে ড্যাল্টন, প্রাণীবিজ্ঞানে ডারবিণ, মনোবিজ্ঞানে ক্যাণ্ট যাহা করিয়াছেন, ধর্ম্মবিজ্ঞানে, আধুনিক সময়ে, রাজা রামমোহন রায় ঠিক তাহাই করিয়াছেন, এবং ঠিক অনুরূপ স্থান অধিকার করিয়াছেন। তিনিই সর্ব্ব প্রথমে, আধুনিক কালে, জগতের বিভিন্ন আকারের ধর্ম্ম বিশ্বাসের মধ্যে মূলগত একটা একত্ব দর্শন করিয়া, জনমণ্ডলীর নিকটে তাহার সত্যতা প্রতিপাদন করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন। পণ্ডিতপ্রবর মোক্ষমূলরের কথায় তিনিই সর্ব্বাদৌ সর্ব্ব প্রকারের ধর্ম্মের অভ্যন্তরে মানবাত্মার এক অস্ফুট ক্রন্দন ধ্বনি শ্রবণ করিয়াছিলেন, এবং অব্যক্তকে ব্যক্ত করিবার জন্য, অজ্ঞেয়কে জানিবার জন্য মানবপ্রাণের একটা ব্যগ্রতা লক্ষ্য করিয়াছিলেন। তিনি *সকল ধর্ম্মেই অনন্তের প্রতি প্রাণের একটা গভীর টান ও ঈশ্বরের প্রতি সরল প্রেম প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন।* বিগত অর্দ্ধশতাব্দী সময় মধ্যে সভ্য জগতের ধর্ম্ম বিষয়ক চিন্তাতে এক মহা বিপ্লব সংঘটিত হইয়াছে। অন্ধ বিশ্বাসের ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত প্রাচীন তত্ত্ববিদ্যা ধর্ম্ম-বিজ্ঞানকে আপনার আসন পরিত্যাগ করিয়া দিতেছে, জগতের সর্ব্বত্র শিক্ষিত লোকে তাঁহাদিগের পূর্ব্ব পুরুষগণ অপেক্ষা ধর্ম্মের এক মহত্তর পূর্ণতর ও উদারতর আদর্শ লাভ করিয়াছেন। ধর্ম্ম-বিষয়ক সংকীর্ণতা ও অসহিষ্ণুতা আপনাদিগের চিরন্তনী অধিকার হইতে এতটা চ্যুত হইয়াছে যে এক খৃষ্টধর্ম্ম-প্রধান দেশে সকল ধর্ম্মের এক মহা সমিতির অধিবেশন বিগত বর্ষে সম্ভবপর বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে, এবং আপনারা জানেন যে ভারতে প্রায় সপ্ততি বর্ষ পূর্ব্বে রাজা রামমোহন রায়ের মন যে সকল চিন্তা ও ভাবের দ্বারা আন্দোলিত হইয়াছিল, তাহার অনুরূপ চিন্তা ও ভাবের প্রাবল্যই সভ্য জগতের ধর্ম্ম বিষয়ক চিন্তা ও ভাবে এরূপ প্রলয় উপস্থিত করিয়াছে। তুলনায় বিভিন্ন ধর্ম্ম শাস্ত্র আলোচনার (Comparative Theology) প্রথম পথ-প্রদর্শক, রামমোহন রায়; ইহার প্রতিষ্ঠাতা তিনি একথা বলা অসঙ্গত নহে; কারণ তিনিই আধুনিক পণ্ডিত মণ্ডলী মধ্যে সর্ব্ব প্রথমে হিন্দু, বৌদ্ধ, খৃষ্টীয় ও মুসলমান এই ধর্ম্মচতুষ্টয়ের তুলনায় পাঠ ও আলোচনা করিয়াছিলেন। মোক্ষমূলর প্রভৃতি তাঁহারই প্রদর্শিত পথে বিচরণ করিয়া আজ সভ্য সমাজের ধর্ম্ম চিন্তাতে এই যুগান্তর উপস্থিত করিতেছেন। ধর্ম্মের দর্শন (Philosophy of religion) বা ধর্ম্ম-বিজ্ঞান অতি অল্প দিন হইল পাশ্চাত্য জগতে প্রতিষ্ঠিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। বস্তুতঃ ক্যাণ্ট, হিগেল, ও শ্লিয়ারমেকার, এই তিন জন সুপ্রসিদ্ধ দার্শনিক পণ্ডিত বর্ত্তমান সভ্য জগতের চিন্তাতে যে আমূল পরিবর্ত্তন আনয়ন করিয়াছেন, তাহার দ্বারাই কেবল এই নূতন বিজ্ঞানের উৎপত্তি সম্ভাবিত হইয়াছে। এবং ক্যাণ্ট' হিগেল, ও শ্লিয়ারমেকার, এই তিন জনই রাজা রামমোহনের সমসাময়িক লোক। ক্যাণ্ট রাজা অপেক্ষা অনেক বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন বটে, এবং রাজা যখন ত্রিংশতি বর্ষের যুবক তখন তিনি পরলোক গমন করেন। কিন্তু হিগেল রাজা অপেক্ষা চারি বৎসরের বড় ও রাজার দুই বৎসর পূর্ব্বে পরলোকগত হয়েন। শ্লিয়ারমেকার রাজার ছয় বৎসরের বড় ছিলেন, এবং রাজার মৃত্যুর পর বৎসর মানব লীলা সংবরণ করেন। অতএব বিধাতা-পুরুষের পবিত্র নিশ্বাস হইতে উৎপন্ন হইয়া যে দার্শনিক চিন্তাস্রোত বিগত শতাব্দীর প্রারম্ভে ইউরোপের উপর দিয়া প্রবাহিত হইয়া ক্যাণ্ট হিগেল প্রভৃতির মধ্য দিয়া স্ফূর্ত্তি লাভ করিয়াছিল, তাহাই ভারতের উপর দিয়া প্রবাহিত হওয়া রাজা রামমোহনের বুদ্ধি ও আত্মাকে জাগ্রত করিয়া,

তাঁহার দ্বারা ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। কোনও শক্তিশালী ব্যক্তি যেরূপ কার্য্য জীবনে সম্পাদন করিয়া যাইতে সমর্থ হন, তদপেক্ষা, এই সকল সম্পাদিত অনুষ্ঠানের "মধ্য দিয়া মানব-মনে যে আশা ও আদর্শের উদয় করিয়াছিল, তদ্দ্বারাই তাঁহার মানসিক শক্তিশালীতার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। ক্যাণ্ট, ও হিগেল প্রভৃতি মানব মনে যে আশা ও আদর্শ সঞ্চার করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের বহুসংখ্যক শিষ্য (এবং তাঁহাদের মধ্যে বর্ত্তমান কালের সভ্য জগতের অনেকানেক পণ্ডিতাগ্রগণ্য ব্যক্তি রহিয়াছেন) সে আশা ও আদর্শকে আরও পরিপূর্ণ করিবার জন্ত প্রাণপণে পরিশ্রম করিয়া ক্যাণ্ট প্রভৃতির চিন্তা ও জ্ঞানকে ক্রমশঃ বিস্তৃত, বিকশিত ও পরিবর্দ্ধিত করিয়া তুলিয়া জগতের অশেষবিধ কল্যাণ সাধনা করিতেছেন। কিন্তু রামমোহন রায়ের চিন্তার আলোক, কি ব্রাহ্মমণ্ডলী মধ্যে কিম্বা তাহার বাহিরে, আজ অতি অল্প লোকই বহন করিতেছেন; এবং স্বর্গীয় কেশব চন্দ্র সেন ব্যতীত আর কেহ সে অমৃত আলোককে বর্দ্ধিতও উজ্জ্বলতর করিতে সক্ষম বা যত্নবান হন নাই। আজ যে রাজা রামমোহনের নাম ও জ্ঞান-দীপ্তি ক্যাণ্ট প্রভৃতির নাম ও জ্ঞানের স্তায় জগতে ব্যাপ্ত হইতে পারে নাই, ইহার কারণ রামমোহন রায়ের প্রতিভার ক্ষুদ্রতা নহে, কিন্তু যে জাতির মধ্যে তিনি জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, তাহার অপকৃষ্টতা; এবং এই সকল দেখিয়া শুনিয়া লোকের মনে সহজেই এই আক্ষেপ হইতে পারে যে বিধাতা কেন এমন ব্যক্তিকে এই নরাধম জাতিতে ও এই অধঃপতিত সমাজে প্রেরণ করিলেন।

পত্রপ্রেরকদিগের প্রতি।

গুরুবাদ সম্বন্ধে অনেকগুলি প্রেরিত পত্র আমাদের হস্তগত হইয়াছে। মনোরঞ্জন বাবুর তৃতীয় পত্রও পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু তৎপূর্ব্বে তাঁহার প্রথম দুই পত্রের অনেকগুলি প্রতিবাদ আসিয়াছে। সে সমুদয় মুদ্রিত করা সম্ভব নহে। এবারে তাঁহার প্রতিবাদের একখানি মুদ্রিত করা গেল। আগামী বারে মনোরঞ্জন বাবুর তৃতীয় পত্র ও আর একখানি পত্র ছাপিয়া এবিষয়ের বিচার বন্ধ করা যাইবে। ত—স।

প্রেরিত পত্র।

(পত্রপ্রেরকদিগের মতামতের জন্ত সম্পাদক দায়ী নহেন।)

শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত তত্ত্ব-কৌমুদী সম্পাদক মহাশয়
সমীপেষু।

অভ্রান্ত গুরুবাদ ও ব্রাহ্মধর্ম্ম।

মহাশয়,

আমার বক্তব্য অতি সংক্ষেপেই বলিতেছি। আশা করি অনুগ্রহ করিয়া প্রকাশ করিবেন।

১। শ্রদ্ধেয় মনোরঞ্জন বাবু তাঁহার প্রথম পত্রে লিখিয়াছেন, "মানুষ আপনার অভিজ্ঞতা ও বুদ্ধির উপর নির্ভর করিয়া যে সকল কথা বলে তাহা আমরা বহুপরিমাণে বিশ্বাস করিতে পারি, কিন্তু অভ্রান্তরূপে স্বীকার করিতে আপত্তি করিতে পারি।" অর্থাৎ বুদ্ধি ভ্রান্ত, সুতরাং বুদ্ধিপ্রসূত যুক্তি তর্ক দ্বারা মীমাংসিত সিদ্ধান্তকে অভ্রান্ত সত্য বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। মনোরঞ্জন বাবু নিজেই যখন এরূপ সিদ্ধান্তকে অভ্রান্ত সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে প্রস্তুত নহেন, তখন অপরের নিকট ইহাকে সত্য বলিয়া প্রমাণ করিবার জন্ত এত চেষ্টা করিতেছেন কেন? তিনি কি বলিতেছেন না "আমি যুক্তি তর্ক দ্বারা গুরুর অভ্রান্ততা প্রমাণ করিলাম। কিন্তু ইহাকে আমি অভ্রান্ত রূপে গ্রহণ করিতে প্রস্তুত নহি।" ইহা কি আত্ম-বিরোধ নহে?

২। "মানবাত্মায় ঈশ্বর-বাণী অভ্রান্তরূপে প্রকাশিত হইতে পারে না" এই ভয়ানক মতের প্রতিবাদে তিনি বলিয়াছেন "আত্মসংকল্প ও বিবেক-বাণীকে আদেশ ভাবিলেই এরূপ সন্দেহ উপস্থিত হয়" অর্থাৎ ভ্রান্ত আত্মসংকল্প ও ভ্রান্ত কিম্বা ভ্রান্তরূপে প্রকাশিত বিবেককে আদেশ ভাবিলেই আদেশবাদের অভ্রান্ততা সম্বন্ধে সন্দেহ জন্মে।

বিবেকবাণীও যখন ভ্রান্ত বা ভ্রান্তরূপে প্রকাশিত, তখন বিবেক দ্বারা গুরুর অভ্রান্ততা নির্ণয় করা সম্ভব নহে।

৩। প্রত্যাদেশ অভ্রান্ত এবং অভ্রান্তরূপে প্রকাশিত, ইহা আমরা সকলেই স্বীকার করি। কিন্তু মনোরঞ্জন বাবুর মতে ব্রহ্মযোগে অযুক্ত আত্মায় ব্রহ্মবাণী প্রকাশিত হয় না, সুতরাং গুরু অভ্রান্ত কি না ইহাও প্রকাশিত হয় না। সুতরাং ব্রহ্মযোগে অযুক্ত ব্যক্তি গুরুর অভ্রান্ততা জানিতে পারে না।

৪। অভ্রান্ত সত্যের সঙ্গে গুরুবাক্য মিলাইয়া দেখিলেও গুরুবাক্যের সত্যাসত্য নির্ণয় করা যাইতে পারে। প্রত্যাদেশই একমাত্র অভ্রান্ত বাণী। কিন্তু ব্রহ্মযোগে অযুক্ত আত্মা অনাদিষ্ট। সুতরাং তাহার পক্ষে গুরুবাক্যের সত্যাসত্য নির্ণয় করা অসম্ভব। গুরুবাক্যের অভ্রান্ততা জানিতে হইলে শিষ্যকে পূর্ব্বেই উক্ত সত্য বিষয়ে অভ্রান্ত হইতে হইবে—ইহার প্রতিবাদে মনোরঞ্জন বাবু বলিয়াছেন—"ইহার উত্তর দেওয়া অতি সহজ, কেন না ব্রাহ্মগণ আপনারা অভ্রান্ত সর্ব্বজ্ঞ ও পূর্ণ পবিত্র ইত্যাদি না হইয়াও ঈশ্বরকে ঐ সকল গুণযুক্ত বলিয়া স্থির করিয়াছেন।"

জ্ঞান জ্ঞাতবস্তু অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ইহার প্রতিবাদে লিখিত হইয়াছে:—

"এরূপ চিন্তা করা বালকতা মাত্র। কেন না আমরা আত্মবুদ্ধি দ্বারা ঈশ্বরকে নির্ণয় করিয়াছি। এবং ঈশ্বরের অভ্রান্ততা জানিয়াছি। ইত্যাদি।"

মনোরঞ্জন বাবুর মতে ঈশ্বরের অস্তিত্ব, অভ্রান্ততা পূর্ণপবিত্রতা ইত্যাদি সমুদয়ই আত্ম-বুদ্ধি দ্বারা নির্ণীত। কিন্তু তাহার মতে আত্মবুদ্ধি দ্বারা নির্ণীত সিদ্ধান্তকে অভ্রান্তরূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে না। সুতরাং "ঈশ্বর আছেন" "তিনি অভ্রান্ত," "তিনি সর্ব্বজ্ঞ", ইত্যাদি মতকে অভ্রান্ত বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে না। এরূপ কথা আমরা বলিলে মনোরঞ্জন বাবু আমাদিগকে নিশ্চয়ই বলিবেন,—

"এরূপ চিন্তা করা বালকতা মাত্র।" "ইহা যিনি বলেন তিনি অজ্ঞেয়বাদী" সন্দেহবাদী বা নাস্তিক "কিন্তু ব্রাহ্ম নহেন।"

বুদ্ধিদ্বারা ব্রহ্মকে প্রকাশিত করা যায় ইহা চিন্তা করিলেও মনে হয়, অমাবস্যা রজনীতে দেশলাই জ্বালিয়া সূর্য্য দর্শন করা অসম্ভব, এরূপ চিন্তা করাও বাতুলতা।

৫। যে উপায়ে ব্যক্তিবিশেষের অভ্রান্ততা প্রমাণ করা হইয়াছে, সেই উপায়ে সমুদয় মানবাত্মারই অভ্রান্ততা প্রমাণ করা যায় :—

(৩) "ঈশ্বরবাণী মানবাত্মার প্রকাশ পায়।"

(৪) সুতরাং দুই একজন মানুষ কেন, সকলেই সেই বাক্য শুনিয়া উপদেশ দিতে পারে।

(৫) "ঈশ্বরের বাণী শুনিয়া উপদেশ দিলে সে উপদেশ অভ্রান্ত।"

(৬) সকলেই যখন এইরূপ অভ্রান্ত উপদেশ দিতে পারে, তখন সকলেই ত অভ্রান্ত গুরু।

সুতরাং অভ্রান্ত গুরুবাদ মানববাদে পরিণত হইল।

৬। আপত্তি উঠিতে পারে—মানবাত্মা চৈতন্যযোগযুক্ত মানবাত্মাকেই বলা হইয়াছিল। তাহা হইলে আমরা তিনটী প্রশ্ন করিব।

(ক) একটী আত্মার পক্ষেও কি সদাসর্ব্বদা ব্রহ্মযোগে যুক্ত থাকা সম্ভবপর?

(খ) যোগযুক্ত হইলেই কি প্রত্যেক বিষয়ে ব্রহ্মবাণী প্রকাশিত হয়?

(গ) গুরু কি কেবল আদিষ্ট বিষয়েই উপদেশ দেন?

ইহার একটীও যখন সত্য নহে, তখন কেমন করিয়া বলিব গুরুবাক্য অভ্রান্ত?

৭। দ্বিতীয় বক্তব্যে দেখান হইয়াছে যে মনোরঞ্জন বাবু বিশ্বাস করেন, বিবেকবাণীকে আদেশ বলিয়া ভ্রম করা সম্ভব। গুরুও যখন মানুষ, তখন তাঁহার পক্ষেও ত ভ্রম করা সম্ভব। সুতরাং গুরু অভ্রান্ত নহে।

৮। গুরু মহাশয়গণ অহরহ অভিজ্ঞতার কথাই বলিয়া থাকেন। ঈশ্বরবাণী বলিয়া অতি কম সত্যই প্রচার করা হয়। ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় আমাদের শ্রদ্ধেয় বন্ধু প্যারীলাল ঘোষ মহাশয়কে যে পত্র লিখিয়াছিলেন বিগত পক্ষের তত্ত্বকৌমুদী হইতে তাহার অংশ বিশেষ উদ্ধৃত করা গেল।

"আমি নিজ অভিজ্ঞতা দ্বারা জানিয়াছি............সৎগুরুর কৃপা ভিন্ন তাহা (ব্রহ্ম দর্শন) হইবার নহে।"

এইরূপ অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করিয়া সমুদয় গুরুই অনেক সময়ে ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিয়া থাকেন।

মনোরঞ্জন বাবু অবশ্যই বিজয় বাবুর উক্ত মত অভ্রান্তরূপে গ্রহণ করিতে প্রস্তুত নহেন। কারণ উক্ত কথা অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করিয়া বলা হইয়াছে।

৯। মনোরঞ্জন বাবু আমাদিগকে সাবধান করিয়া দিতেছেন, গুরু অজ্ঞ হইতে পারেন, ভ্রান্ত নহেন। কিন্তু অজ্ঞতা কি ভ্রান্তি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর? অজ্ঞতা অভাবাত্মক অবস্থা; উক্ত অবস্থা হইতে পলায়ন করিবার সময় পদস্খলন হইলে সেই পদস্খলনকেই ভ্রান্তি বলা হয়। অজ্ঞতা জ্ঞানের সম্পূর্ণ অভাব; ভ্রান্তি অপূর্ণ জ্ঞানের পরিণাম। জ্ঞানের অতীত বিষয় সম্বন্ধেই মানুষকে অজ্ঞ এবং জ্ঞানের বিষয়ীভূত বিষয় সম্বন্ধেই মানুষকে ভ্রান্ত বা অভ্রান্ত বলা যায়। ভূকেন্দ্রস্থ উত্তাপ বিষয়ে শিশু অজ্ঞ, আর শিক্ষিত মানবকেই উক্ত বিষয়ে ভ্রান্ত বা অভ্রান্ত বলা সম্ভব। অজ্ঞতার মূলে চিন্তাহীনতা নিশ্চেষ্টতা, উদ্যম-বিহীনতা এবং জড় প্রকৃতি, আর চিন্তাশীল ও উদ্যমশীল মানবের পক্ষেই চেষ্টাবলে ভ্রান্ত বা অভ্রান্ত হওয়া সম্ভবপর। সুতরাং ভ্রান্তি অজ্ঞতা অপেক্ষা উন্নততর অবস্থা। উষালোক কি অন্ধকার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নহে? সেই জন্যই আমরা বিশ্বাস করি অজ্ঞ গুরু অপেক্ষা ভ্রান্ত গুরু সহস্রগুণে শ্রেষ্ঠ; অজ্ঞ গুরুকেও এক সময়ে ভ্রান্ত গুরু হইতে হইবে।

১০। অভ্রান্ত গুরুবাদ না মানিলেই যে অভ্রান্ত অহংবাদ মানিতে হইবে কে বলিল? সাধন-পথকে অভ্রান্ত না মানিলে কখনই সাধন নিষ্ঠা হয় না অতি সত্য কথা। কিন্তু বিধাতার নির্দ্দিষ্ট সাধন পথ অবলম্বন করিলে কি কম নিষ্ঠা হয়? মনোরঞ্জন বাবু কি সত্যই বলিতে চান গুরু ভিন্ন অপর সকলের সাধন পথই স্বকপোল কল্পিত? আর গুরুবাক্য অভ্রান্ত ইহা কল্পনা করিয়া লইলেও সাধন-নিষ্ঠা হওয়া সম্ভব নহে। কারণ ইহা কল্পনা।

১১। জগতের শৈশবকাল হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত প্রকাশিত সত্যকে অমান্য ও অগ্রাহ্য করিয়া একজন মানবকে গুরু বলিয়া গ্রহণ করা বালকতা ও ধর্ম্মবিরোধী বলিয়া মনে হয়। চার্ব্বাক, মিল স্পেনসার হইতে আরম্ভ করিয়া মহাত্মা ঈশা পর্য্যন্ত সকলেই আমাদের গুরু। সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন, মৌখিক উপদেশ, বক্তৃতা গৃহকর্ম্ম সমুদয়ই ধর্ম্ম-পথের সহায়।

১২। সত্যাসত্য নির্ণয় না করিয়া ব্রাহ্মগণ অপরের মতামতকে অভ্রান্ত বলিয়া স্বীকার করিতে পারেন না। সত্য আমরা তিনটী উপায়ে গ্রহণ করিতে পারি।

(ক) অভ্রান্ত যুক্তি প্রণালী, যাহা অভ্রান্ত।

(খ) Conscience যাহা অভ্রান্ত।

(গ) সত্যের সাক্ষাৎ প্রকাশ, যে সত্য অভ্রান্ত।

প্রচলিত ভাষায় এই conscienceকেই বিবেক বলা হইয়াছে।

আজ এই স্থানেই উপসংহার করিতে হইল। সময় এবং সুবিধা হইলে ভবিষ্যতে আরও অনেক কথা বলিব ইচ্ছা আছে।

রামপুরহাট } বিনীত
১০ই জানুয়ারী ১৮৯৪ } শ্রীমহেশচন্দ্র ঘোষ।

ব্রাহ্মসমাজ।

দুর্ভিক্ষ সংবাদ—ফরিদপুরের অন্তর্গত কোটালিপাড়া প্রভৃতি স্থানে খুব দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইয়াছে। গত সংখ্যায়

তত্ত্বকৌমুদীতে আমরা তাহার কথঞ্চিৎ বিবরণ প্রকাশ করিয়াছি। অতঃপর কিছুদিন হইল সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ অন্নকষ্ট গ্রস্ত লোকদিগের সাহায্য করিবার জন্য কিছু টাকাসহ শ্রীযুক্ত বাবু কাশীচন্দ্র ঘোষাল মহাশয়কে দুর্ভিক্ষ-প্রপীড়িত স্থানে পাঠাইয়াছেন। তিনি কোটালিপাড়ার অন্তর্গত রাধাগঞ্জ হইতে লোকের অন্নকষ্টের যে বিবরণ লিখিয়া পাঠাইয়াছেন তাহা অতীব শোচনীয়। তিনি লিখিয়াছেন যে তথায় অনেকেই দিনে একবারও খাইতে পায় না। কেহ কেহ বা কচু, লাউ সিদ্ধ করিয়া খাইতেছে। কাশী বাবু তথায় উপস্থিত হইলে সাহায্য প্রাপ্তির আশায় অনেকে তাঁহার পিছনে পিছনে ছুটিয়াছিল। তিনি প্রথমতঃ তাহাদিগকে দুই, চারি আনা করিয়া বিতরণ করেন। অবশেষে একমণ চাউল খরিদ করিয়া যাহারা ঐ দিবস সন্ধ্যা পর্য্যন্ত কিছুই খাইতে পায় নাই তাহাদিগের প্রতি জনকে এক পোয়া হিসাবে দিতে লাগিলেন। দুর্ভিক্ষের বিবরণে আমরা কয়েকটী হৃদয় বিদারক সংবাদও পাইয়াছি। একজন বিধবার দুটী ছেলে ছিল। ছেলে দুটীকে খাইতে দিতে না পারিয়া সে উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করিয়াছে। অপর এক স্থানে মাঠের মাঝখানে শৃগাল কুকুরে একটী স্ত্রীলোকের মৃতদেহ খাইয়াছে। জনরব স্ত্রীলোকটী অনাহারে মরিয়াছে।

শুনা গেল গবর্ণমেণ্ট অন্নকষ্ট-প্রাপ্ত লোকদিগকে ধান দিতেছিলেন। তাহারা ধান ভানিয়া দুই সের করিয়া চাউল রাখিয়া অবশিষ্ট চাউল ফেরত দিত। এইরূপে অনেকের বেশ সাহায্য হইতেছিল। কিন্তু যে সকল কর্ম্মচারী ধান বিতরণের কাজে নিযুক্ত ছিলেন তাঁহাদের অসাধুতা এবং কাজের ত্রুটীতে গবর্ণমেণ্ট উক্ত সাহায্য বন্ধ করিয়াছেন।

কাশী বাবু লিখিয়াছেন যে তিনি ক্ষুধার্ত্তদিগের হাহাকার এবং ক্রন্দন ধ্বনিতে নিতান্তই ব্যথিত হইয়া পড়িয়াছেন। এসময়ে যদি তিনি তাহাদিগকে উপযুক্তরূপে সাহায্য করিতে না পারেন তবে তাঁহাকে যারপর নাই কষ্ট ভোগ করিতে হইবে। বাস্তবিক অবস্থা যেরূপ শোচনীয় তাহাতে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ এইরূপ দুর্ঘটনায় কখনই উদাসীন থাকিতে পারেন না। অথচ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের তহবিলে এমন অর্থ নাই যাহাতে দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত লোকদিগকে যথোপযুক্ত রূপ সাহায্য করা যাইতে পারে। বিগত বর্ষাকালে বিক্রমপুরের দুর্ভিক্ষের সাহায্যার্থ যে একটী তহবিল সংস্থাপিত হইয়াছিল তাহারই উদ্বৃত্ত কিছু টাকা সঙ্গে করিয়া কাশী বাবু রওনা হইয়া গিয়াছেন। কিন্তু তিনি জানাইয়াছেন যে উক্ত টাকা প্রায় নিঃশেষিত হইয়াছে। আশা করি উপস্থিত দুর্ঘটনায় চারিদিক হইতে দেশ হিতৈষী সহৃদয় মহাত্মাগণ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যের সাহায্যার্থ অগ্রসর হইবেন। এসম্বন্ধে যিনি যাহা কিছু দান করেন তাহা সাদরে গৃহীত হইবে এবং দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত লোকদিগের সহায্যার্থ প্রেরণ করা যাইবে।

চিঠিপত্র এবং টাকা নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে। তত্ত্ব-কৌমুদীতে টাকার প্রাপ্তি স্বীকার করা যাইবে ইতি।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ
২১১নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট
কলিকাতা। } গুরুচরণ মহলানবিশ।

নামকরণ—গত ১৮ই মার্চ্চ বাবু শশিভূষণ বসু এম,এ, মহাশয়ের প্রথমা কন্যার নামকরণানুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় আচার্য্যের কার্য্য করেন। কন্যার নাম সুব্রতা রাখা হইয়াছে।

জাতকর্ম্ম—গত ৪ঠা মার্চ্চ শিলংস্থ বাবু কৈলাশচন্দ্র সেনের দ্বিতীয় কন্যার জাতকর্ম্মানুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়াছে। বাবু নীলমণি চক্রবর্ত্তী মহাশয় উপাসনার কার্য্য করেন।

বিবাহ—গত ২০এ ও ২৪এ মার্চ্চ দুইটী ব্রাহ্ম বিবাহ হইয়া গিয়াছে। প্রথমটীর পাত্রের নাম বাবু রজনীকান্ত দাস, বয়স ২৫ বৎসর। পাত্রী শ্রীমতী কুসুমকুমারী ঘোষ, বয়স ১৫ বৎসর। এই বিবাহে শ্রীযুক্ত নবদ্বীপচন্দ্র দাস মহাশয় আচার্য্যের কার্য্য করেন। দ্বিতীয় পাত্র আমাদের বন্ধু বাবু কামাখ্যাচরণ ঘোষের পুত্র শ্রীমান রজনীনাথ ঘোষ বি, এ. বয়স ২৬ বৎসর। পাত্রী বাগআঁচড়া নিবাসী পরলোকগত মতিলাল মল্লিকের কন্যা শ্রীমতী রামরঙ্গিনী, বয়স ১৫ বৎসর। এ বিবাহে শ্রীযুক্ত অঘোরনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় আচার্য্যের কার্য্য করেন। দুই বিবাহই ৩ আইন অনুসারে রেজেষ্ট্রী করা হইয়াছে।

শোক সংবাদ—আমরা দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে আমাদের বন্ধু বাবু গৌরীনাথ বসুর একমাত্র শিশু কন্যাটীর গত ২৩.শ মার্চ্চ মৃত্যু হইয়াছে। পরমেশ্বর শোক সন্তপ্ত পিতা মাতার প্রাণে শান্তি বর্ষণ করুন।

আমরা ব্রাহ্মসমাজের আর একজন হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধু হারাইলাম। গত ২৫শে মার্চ্চ রবিবার রায় গুণাভিরাম বড়ুয়া বাহাদুর একটী বিধবা কন্যা ও দুইটী নাবালক শিশু সন্তান রাখিয়া জ্বররোগে ৬০ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন। ইনি অনেক দিন সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অধ্যক্ষ সভার সভ্য ছিলেন। এবং নানারূপে ব্রাহ্মসমাজের সেবা করিয়াছেন। ইনি গবর্ণমেণ্টের পেন্সন ভোগ করিতেছিলেন। গবর্ণমেণ্ট ইঁহার কার্য্যে সন্তুষ্ট হইয়া ইঁহাকে রায় বাহাদুর উপাধি প্রদান করিয়াছিলেন। ইঁহার অভাবে ইঁহার সন্তানগণ একেবারে অভিভাবক-বিহীন হইয়া পড়িয়াছে। পরমেশ্বর শোকার্ত্ত সন্তানদিগকে সান্ত্বনা এবং মৃত আত্মাকে শান্তি প্রদান করুন।

প্রচার—বাবু নীলমণি চক্রবর্ত্তী শিলং হইতে কলিকাতা আগমনের পথে মৈমনসিংহে একদিন ইংরেজি হাই স্কুলে "স্বাভাবিক ধর্ম্ম" বিষয়ে বক্তৃতা করেন। স্থানীয় মুনসেফ বাবু নিস্তারণ বন্দ্যোপাধ্যায় এম,এ, বি,এল, মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। আর একদিন আমাদের শ্রদ্ধেয় বন্ধু বাবু কৃষ্ণদয়াল রায় মহাশয়ের গৃহে উপাসনা করেন।

২১১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, ব্রাহ্মমিশন যন্ত্রে শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দত্ত কর্তৃক মুদ্রিত ও ১৮ই চৈত্র প্রকাশিত।